

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৩-তম বর্ষ

(১৩৬৭-মাঘ হইতে ১৩৬৮-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৬৭ হইতে পৌষ—১৩৬৮)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা



শ্রীশ্রীবিবেকানন্দাষ্টকম্

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দধদ্ দিব্যজ্যোতিঃ পরমরমণীয়ং নয়নয়োঃ
প্রসন্নাস্যঃ সৌম্যো মণিকনকশোভাধরবপুঃ।
সুধীঃ সত্যদ্রষ্টা ভুবনবরণীয়ঃ শ্রুতিধরো
বিবেকানন্দোঽয়ং মনুজতনুধারী স্মরহরঃ॥ ১॥
কিশোরো ধ্যানস্থো ভুজগভয়শূন্যো হ্যবিচলো
যুবা দণ্ডী বৈশ্বানরসদৃশদীপ্তির্ভুবি চরন্।
স্বধর্মভ্রষ্টানাং কলুষিতধিয়াং ত্রাণনিরতো
বিবেকানন্দোঽয়ং গহনতিমিরে ভাস্বররবিঃ॥ ২॥
গুরোরন্তেবাসী পরমপুরুষস্য প্রিয়তমো
নরেন্দ্রঃ সর্বেষামবনতজনানামভয়দঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং ভীষ্মো বিপদি চ মহীধ্রোন্নতশিরা
বিবেকানন্দোঽয়ং কুসুমললিতো বজ্রকঠিনঃ॥ ৩॥
গৃহে বিত্তাভাবাদ্‌বিচলিতমনাঃ শান্তিরহিতো
গতো বারং বারং গুরুবচনতো মাতৃসদনম্।
'ধনং মাতর্দেহী'ত্যনুনয়বচস্তু প্রতিহতং
বিবেকানন্দঃ কিং ভবতি ধনতৃষ্ণাবশগতঃ? ॥ ৪
গুরোঃ পাদং ধ্যাত্বা কিমপি নবতেজো হৃদি বহন্
মহাসিন্ধুং তীর্ত্বা নিখিলজগতো ধর্মসদসি।
নবীনঃ সন্ন্যাসী বিজিতজয়মাল্যো বহুমতো
বিবেকানন্দোঽয়ং ভুবনবিজয়ী ভারতনিধিঃ॥ ৫॥

অবিদ্যায়া বৈরী শ্রুতিবিহিতবিদ্যামধুকরঃ
সুখে চানাসক্তঃ পরমপদচিন্তাস্থিরমতিঃ।
জগৎসেবামন্ত্রৈর্জগদধিপতেঃ পূজনপরো
বিবেকানন্দোঽয়ং ভুবি সুবিরলো মানবগুরুঃ ॥ ৬ ॥
দরিদ্রাণাং বন্ধুর্নিখিলমনুজানাং প্রিয়করঃ
সমো জ্ঞানে কর্মণ্যবিচলিতভক্ত্যাং গুরুপদে।
সমঃ শত্রৌ মিত্রেঽপ্রতিম-মহিমোদ্দীপ্ততপনো
বিবেকানন্দো মে হৃদয়গগনে ভাতু সততম্ ॥ ৭ ॥
অভয়-বরদ-মূর্তিঃ কালিকা বিশ্বধাত্রী চরণকমলসংস্থৌ সারদা-রামকৃষ্ণৌ
শরণগত-বিবেকানন্দ-সানন্দমূর্তির্ভবভয়হরদৃশ্যং পশ্য রে মুগ্ধ নেত্র ॥ ৮ ॥

(বঙ্গানুবাদ)

নয়নদ্বয়ে পরমরমণীয় দিব্যজ্যোতির্ধারী, প্রসন্নবদন, সৌম্য, মণিকাঞ্চনতুল্যশোভাময় দেহ-বিশিষ্ট সুধী, সত্যদর্শী, জগতের পূজনীয় এবং শ্রুতিধর এই বিবেকানন্দ মানবদেহধারী মহাদেব। ১

কৈশোরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্পভয়শূন্য ও অবিচল, যৌবনে অগ্নিসদৃশদীপ্তিমণ্ডিত সন্ন্যাসী-রূপে জগতে ভ্রমণকারী এবং স্বধর্মভ্রষ্ট ও কলুষিতমতি মানবগণের ত্রাণকর্তা এই বিবেকানন্দ নিবিড় অন্ধকারে জ্যোতির্ময় সূর্যস্বরূপ। ২

পরমপুরুষ গুরুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রিয়তম শিষ্য, নরেন্দ্র (তন্নামধারী পুরুষ, তথা নরশ্রেষ্ঠ) অধঃপতিত জনগণের অভয়দাতা, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম এবং বিপদে পর্বতের ন্যায় উন্নতমস্তক এই বিবেকানন্দ কুসুমের ন্যায় কোমল ও বজ্রের ন্যায় কঠিন। ৩

গৃহে অর্থাভাবে বিচলিতহৃদয় এবং শান্তিশূন্য অবস্থায় গুরুর আদেশে পুনঃ পুনঃ মাতৃ-মন্দিরে গমন করিলেও 'মা, আমাকে ধন দাও'—এই বাক্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি ইহা বলিতে পারেন নাই। 'বিবেকানন্দ' কি ধনাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইতে পারেন? ৪

গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া হৃদয়ে কি এক নবশক্তি লাভ করিয়া যিনি মহাসিন্ধু অতিক্রম করিয়া বিশ্বধর্মসভায় জয়মাল্য এবং প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই নবীন সন্ন্যাসী এই বিবেকানন্দ ভুবনবিজয়ী ভারত-রত্ন। ৫

অবিদ্যার অরি, বেদবিহিত বিদ্যার মধুকর, সুখে অনাসক্ত পরমপদ-চিন্তায় স্থিরমতি এবং জগৎসেবা-মন্ত্রে জগৎপতির পূজাপরায়ণ এই বিবেকানন্দ জগদ্‌দুর্লভ মানবগুরু। ৬

দরিদ্রের বন্ধু, সকল মানবের প্রিয়কারী, জ্ঞানে ও কর্মে অবিচলিত, গুরুভক্তিতেও সমান নিষ্ঠাশীল, এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী ও অতুলনীয় মহিমায় উদ্দীপ্ত সূর্যস্বরূপ বিবেকানন্দ আমার হৃদয়গগনে সর্বদা বিরাজ করুন। ৭

রে মুগ্ধ নয়ন! বরাভয়-মূর্তিতে বিরাজমানা বিশ্বজননী কালিকা, তাঁহার চরণপদ্মাশ্রিত সারদা ও রামকৃষ্ণ, এবং শরণাগত বিবেকানন্দের আনন্দময় মূর্তি,—এই ভবভয়হর দৃশ্য দর্শন কর। ৮

কথাপ্রসঙ্গে

নূতনের উদ্বোধন

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৬৩তম বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া, পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা নববর্ষে উদ্বোধনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেছি। আশা করি উদ্বোধনের আদর্শ—শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও সাধনা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা—সমাজ-শরীরে সর্বস্তরে সঞ্চারিত হইয়া দেশবাসীর মনপ্রাণ সুস্থ ও সবল করিবে।

* * *

বৎসরের পর বৎসর আসে যায়, কিন্তু প্রতিটি বৎসর সমান ভাবে আসে না, সমান ভাবে যায়ও না। এ বৎসরের শেষ প্রেস কনফারেন্স-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'This is a bad year for the world, but good year for India.' পৃথিবীর দিক দিয়া যে এটি দুর্বৎসর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বৎসরের প্রথম দিকে স্থায়ী বিশ্ব-শান্তির আশায় বিশ্ববাসী উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু সহসা সে আশার আলো ঘন মেঘে ঢাকিয়া গেল; আজ কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও বা ঝঞ্ঝা বহিতেছে।

বিশ্বের বিশাল আঙিনা হইতে ভারতের দিকে চাহিয়াও আমরা আশান্বিত হইতে পারি না। হয়তো আন্তর্জাতিক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসর ভারতের পক্ষে ভাল কাটিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা অনুভব করিতে পারে না। তাহারা দেখিতেছে, এ বৎসর ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রীতি নষ্ট হইয়াছে; সংবিধান লইয়াও টানাটানি চলিয়াছে। ভারতের অবহেলিত প্রান্ত বাংলার গৃহকোণে তাকাইলে অবশ্যই বলিতে হইবে—বড়ই দুঃখে সারাটি বৎসর কাটিয়াছে।

বর্তমানের দুঃখই বড় কথা নয়, ভবিষ্যতের আশঙ্কাই মানুষকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করে। ভাবী কল্যাণের আশায় মানুষ চিরকাল অনেক দুঃখই হাসিমুখে বরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যেখানে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অধিক, সেখানে মানুষ কল্যাণের কর্মে উদ্বুদ্ধ হইবে কিরূপে? আজ যে ধ্বংসের পূর্বাভাষ চিন্তাশীল মানুষের মনে ধরা পড়িয়াছে—তাহা এই শতাব্দীর চরম অভিশাপে পর্যবসিত হইতে পারে। বিজ্ঞানের শতাব্দী বলিয়া বিংশ শতাব্দীর যে গৌরব, তাহা চিরতরে কালিমা-লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞান দ্বিমুখী অস্ত্রের মতো; মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ—দুই করিবার শক্তিই ইহার আছে; ফলাফল নির্ভর করে—কে উহাকে কি ভাবে ব্যবহার করিতেছে তাহার উপর।

হিরোশিমার পর হইতে প্রকাশ্যভাবে বরাবরই বিজ্ঞানশক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু লৌহ এবং স্বর্ণ—উভয় যবনিকার অন্তরালেই ধ্বংসাত্মক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাম নাই। মুখে শান্তির প্রস্তাব, আর কার্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি—এই দ্বিমুখী ভাবই আজ মানুষের সঙ্কট টানিয়া আনিতেছে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, এ যুগের সঙ্কটের প্রধান কারণ—যাঁহাদের

কথা ও কাজের উপর কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের মন মুখ এক নয়; অথচ তাঁহারা বিধাতার আসনে বসিয়া বিভিন্ন ধাঁচের গণতন্ত্রের নামে জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবি করিতেছেন। কোথাও দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল, কোথাও গণতন্ত্রের স্বর্ণশৃঙ্খল! মানুষের মুক্তমহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতিই আজিকার সমস্যার সমাধান

যাঁহারা রাজনীতিক দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁহাদের চোখে সঙ্কটের প্রকৃত কারণ ধরা পড়িতে পারে না, বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাই সঙ্কটের কারণ; সাধারণ মানুষের স্বার্থ, সুখ-দুঃখ তাঁহাদের কাছে বড় কথা নয়; দলীয় স্বার্থ ও নিজ নিজ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহা হইলে দল বা নেতৃত্ব তাঁহারা বজায় রাখিতে পারেন না।

সেই জন্য দেখা যায়, কি দেশে কি বিদেশে, বহু নেতাই প্রকৃত সঙ্কট অস্বীকার করিয়া সর্বদা জাতিকে ভবিষ্যতের এক রঙীন আশার নেশায় মাতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। অস্বীকার করিয়া কখনও সঙ্কট এড়ানো যায় না! জাতীয় জীবনে সঙ্কট আসিবেই। অভিজ্ঞ মাঝি দূর আকাশে মেঘ দেখিয়াই সাবধান হয়, শেষে ঝড়-তুফান আসিয়া পড়িলে তাহার সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করে; সেইরূপ বিশ্বস্ত নেতার নির্দেশে সংগ্রাম করিয়া পুরুষকার সহায়ে একটি জাতি সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়! নতুবা দুর্বল ক্ষীণদৃষ্টি মাঝির নৌকা যাত্রীসহ ভরাডুবি হইবে!

* * *

বর্তমান যুগে উচ্চতম ভাবরাশির অভাব নাই, সেগুলির প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের অপব্যবহারের মতো সেই উচ্চভাবগুলিরও অপব্যবহার হইতেছে। 'বিশ্বশান্তি', 'সত্য-অহিংসা', 'জনগণ', 'সকলের কল্যাণ' 'সমাজ-সেবা' প্রভৃতি কথাগুলি যদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবী আজ অন্যরূপ ধারণ করিত। সাধারণ মানুষকে আজ মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত হইয়া, জীবিকা সংস্থান-চেষ্টায় ও জীবিকাচ্যুতির ভয়ে সর্বদা সচকিত ভাবে জীবন্মৃতবৎ জীবনধারণ করিতে হইত না।

এক শ্রেণীর মানুষের চিন্তা ও কর্মই আজ মানবজাতিকে এই ভৃগুপতনের ভয়াল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এ অগ্রগতি তাহার দুর্গতিরই কারণ হইয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা আজ নাই বলিলেই চলে। নিজ হাতে যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া মানুষ আজ সেই যন্ত্রেরই চক্রতলে পিষ্ট হইতেছে। যন্ত্র শুধু শিল্পসৃষ্টিরই সহায়ক নয়, গণতন্ত্রের যন্ত্র আইন প্রণয়নও করে। জনগণেরই মতাধিক্যে এমন আইন প্রণীত হইতে পারে, যাহার সাহায্যে জনগণেরই জীবন নিপীড়িত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হইত গণতন্ত্রই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে, আজ আর কেহ তাহা মনে করে না। তবে চিন্তাশীল রাজনীতিকগণ বলিতে শুরু করিয়াছেন: আমরা বুঝিয়াছি গণতন্ত্রের যথেষ্ট ত্রুটি আছে; কিন্তু এতদপেক্ষা ভাল কোন শাসন-পদ্ধতিও আমরা পাইতেছি না। দিকে দিকে গণতন্ত্র বিফল হইতেছে, সেই বিপুল বিফলতার স্তূপ হইতে নব নব বিশেষণে বিশেষিত হইয়া নব নব গণতন্ত্র নিত্য নূতন নামে দেখা দিতে চাহিতেছে। ঐ সকল শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা চলে কি না, তাহাও আজ বিবেচ্য।

বিংশ শতাব্দীর এ এক বিশেষ সঙ্কট—গণতন্ত্রের পরীক্ষা ও ইহার ব্যাপক বিফলতা। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নূতনতর এক বিশ্বশাসনপদ্ধতির জন্মযন্ত্রণাই বর্তমান অশান্তির কারণ। এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে গেলে প্রথমত জানিতে হইবে—গণতন্ত্র কেন বিফল হইতেছে; দ্বিতীয়ত বুঝিতে হইবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন কি।

দুইটি প্রশ্নের একটি উত্তর: মানুষ! আদর্শ-গণতন্ত্রের খসড়া যাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন—মানুষ-মাত্রেই সৎ ও সচেতন, সকল মানুষ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল; তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন—নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—নির্বাচকমণ্ডলী যেমন অজ্ঞ ও অচেতন, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও তেমন চিন্তাহীন ও স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, দলীয় নেতার ইঙ্গিতে চালিত ভৃত্যমাত্র

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে প্রয়োজন প্রকৃত মানুষের—শিক্ষিত, সচেতন মানুষের। যে মানুষ প্রয়োজন মত চিন্তা করিবে, প্রয়োজন মত কাজও করিবে! সমাজে প্রকৃত মানুষের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা—যাহা পশু-মানবকে যথার্থ পূর্ণ-মানবে পরিণত করিবে, তাহাকে শুধু কেরানি বা কারিগরে পরিণত করিবে না। উনবিংশ শতাব্দীর কেরানিগিরির শিক্ষাকে আজ বিংশ শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় পরিবর্তিত করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে মনুষ্যত্বের; তারপর সে নিজেই স্থির করিবে তাহার জীবিকা। প্রয়োজন-বোধে মানুষই কেরানি হইবে, প্রয়োজন-বোধে সেই মানুষই স্বেচ্ছায় সসম্মানে কারিগর হইবে। মনুষ্যত্বের শিক্ষা না থাকিলে শুধু উপদেশ শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া কেহ কখনও যে-কোন বৃত্তিকে সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিলেও মর্যাদা বজায় রাখিয়া সে-কাজ সে করিয়া যাইতে পারে না। সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা, প্রশাসনিক পদমর্যাদা যেখানে কারণে অকারণে অধিকতর সম্মানিত, সেখানে সকলেই চায় সমাজের উপর-তলায় উঠিতে।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ-বৃদ্ধি। আগামী যুগের শিক্ষায় তাই মনুষ্যত্বের দীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে! জন-সংখ্যার কম-বেশীর উপরে দেশের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে না, করে 'মানুষের' সংখ্যার উপর! অতএব সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে দেশে মানুষের সংখ্যা বাড়ে। আত্ম-বিশ্বাসসম্পন্ন, আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়িয়া চলে—তবেই পৃথিবীতে 'স্বর্গরাজ্য' স্থাপিত হইবে। মানুষের অন্তরে সত্য ও প্রেমের, শক্তি ও পবিত্রতার, শান্তি ও সন্তোষের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহিরেও সমাজে তাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে।

মানুষের অন্তরে স্বর্গরাজ্য-স্থাপন, পশু-মানবকে পূর্ণমানবে রূপান্তরিত-করণ, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বা পূর্ণত্বকে বিকশিত করিয়া তোলা—একই কথা। ইহা পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করিয়া সম্ভব নয়। মানুষের এই আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন আর্থিক মানোন্নতি বা বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রসারের উপরও নির্ভর করে না। আর্থনীতিক সাম্য মানুষের স্বার্থদ্বন্দ্বকে সাময়িক ভাবে চাপা দিতে পারে, কিন্তু নির্মূল করিতে পারে না; অথচ সমষ্টিগত ভাবে

মানুষের সুখশান্তি নির্ভর করে সমাজে ও সংসারে স্বার্থদ্বন্দ্বজনিত পারস্পরিক সংঘর্ষ কতটা কমিয়াছে—তাহারই উপর।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানই দেহকেন্দ্রিক সচেতনতা হইতে মানুষকে অন্যতর উচ্চতর বিরাট এক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন করে। তাহারই ফলে জাগ্রত মানুষ দেশে কালে সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, 'সকলে আমি, আমাতে সকল' এই মহানুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলের সুখের জন্য সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। আধ্যাত্মিক সাম্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সর্বকল্যাণ-প্রচেষ্টাই আজিকার রুগ্‌ণ পৃথিবীকে তাহার স্বাস্থ্যসম্পদ্‌ ফিরাইয়া দিতে পারে।

সমাসন্ন বিবেকানন্দ-শতবর্ষজয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর এই মহান্‌ ভাবরাশি দেশে দেশে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সঞ্চারিত হউক; তবেই শক্তির সহিত শান্তি, বুদ্ধির সহিত সরলতা, জ্ঞানের সহিত প্রেম, কর্মের সহিত ধ্যান—ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব-উন্নয়নের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

১৯৬১ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসর; বিশ্ব-ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রতি শহরে শহরে, বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে, বহুস্থানে প্রতি ঘরে ঘরে—সারা বৎসর ধরিয়া উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'—কে কোথায় কি ভাবে তাঁহার কাব্য পড়িতেছে এবং পড়িয়া জীবনরস সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তরে কবি অনুভব করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবী নেহাতই 'ছোট তরী'—কবির 'ছোট ক্ষেতে'র ফসলেই তরী ভরিয়া যায়। এ তরীতে কাব্য-ফসলের স্থান আছে, কবির স্থান নাই। কবি যে কাব্যের চেয়ে অনেক বড়: 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'!

শতবার্ষিক উৎসব কবির জন্য নয়—কবিকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হইবে নানা ভাবে; এ সকলের মাধ্যমে আমরা যেন কবির অন্তরবীণার অন্তরতম গভীর রাগিণীটি ধরিতে পারি। যেন বিশাল কাব্য-সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোলের শ্রুতি-মাধুর্যে আত্মহারা হইয়া, বেলাভূমিতে বসিয়া শুধু তরঙ্গ দর্শন করিয়া, শুধুমাত্র ঝিনুক কুড়াইয়া আমরা যেন সময় ক্ষেপণ না করি। আমরা যেন রত্নাকরের রত্ন-সংগ্রহেও মনোনিবেশ করি, অমৃতভাণ্ডার সমুদ্রের জীবনপ্রদ স্পর্শে আমরা যেন আমাদের ম্রিয়মাণ জীবন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি। নৈরাশ্য যেন আশার আলোকে ঝলিয়া উঠে, বিফলতা যেন সফলতার সম্ভারে ভরিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। তাঁহার শত-বার্ষিকীতে কাব্য-নাটক প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবশ্যই হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে শিল্প-চর্চার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া আমরা যেন না মনে করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যথেষ্ট হইল।

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি, তাঁহার মর্মবীণার গভীরতর গম্ভীর সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে আধ্যাত্মিক সংবেদনে, তাহারই জন্য তিনি বিশ্বকবি! বিশ্বমানবতার গোপন রহস্যটি তাঁহার জীবন-সাধনায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বের সর্বত্র অগণিত হৃদয়ে তাঁহার বাণীর অনুরণন।

রবীন্দ্রনাথ অলস কল্পনার কবি নন; সংসারের কাঁটাগুলি বাদ দিয়া শুধু ফুলের মধুলোভী প্রজাপতিধর্মী কবি তিনি ছিলেন না। জাতীয় জাগরণে তাঁহার দান, তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার যেন আমাদের চিরদিন উৎসাহিত করে।

শান্তিনিকেতনে কোমল শিল্পসাধনার সহিত তাঁহার কঠোর শিক্ষার সাধনা, সেবার সাধনা—যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করে অনুরূপ কর্মে। কর্মযোগী কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা যেন প্রার্থনা করিতে পারি:

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ।
সঞ্চার কর সকল কর্মে—
শান্ত তোমার ছন্দ।

চলার পথে

'যাত্রী'

জাগো, বন্দী, জাগো। কতদিন আর বদ্ধ থাকবে তুমি তোমার তমিস্রার কারাগারে, তোমার স্বার্থের তন্দ্রাপ্রদ ক্লান্তিময় অন্ধকারের আরাম-গুহায়? দেখছ না, শীতের কুহেলী ভেদ ক'রে সূর্য উঠেছে। আপন চেষ্টায়, নিজস্ব দীপ্তিতে, স্বকীয় উজ্জ্বলতায় নিজেরই সৃষ্ট কুহেলীর কঠিন কারাগার ভেঙে সূর্য উঠল, আর আত্মবান তুমি, থাকবে নিশ্চেষ্ট দীপ্তিহীন হ'য়ে—তোমার নিজস্ব স্বার্থের কুহেলিকার মধ্যে জড়িয়ে? তা কি হয়? আত্মার সর্বময় স্বাধীনতার বাণী যে তোমার দিকে দিকে আজ বিঘোষিত! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি, তোমার কি সাজে এই পরাজয়, এই ক্লীবতার জড়িমায় পঙ্গু হ'য়ে পড়ে থাকা? তাই বলি, জাগো বন্দী, জাগো, আপনার আত্মোপলব্ধির মহান প্রচেষ্টায় একান্তভাবে লাগো।

তুমি তো নিজেরই স্বার্থের অন্ধকার গুহায় বন্দী! তোমার স্বার্থ, অর্থাৎ স্ব-অর্থ, নিজেকে কেন্দ্র ক'রে জগতের যে অর্থ, নিজের ভুলবোধ দিয়ে জগতের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছ সেইতো স্ব-অর্থ, স্বার্থ! তাই বলি, তোমার মতো ক'রে জগতের যে অর্থ তুমি করেছ সেই অর্থে, সেই মায়ায় তুমি আটকে গেছ। গুটিপোকা যেমন আপন গুটির জালে জড়িয়ে মনে করে অন্য কেউ আমায় জড়িয়ে দিল তেমনি তুমি তোমার নিজের রচিত স্বার্থে জড়িয়ে মনে করছ অন্য কেউ বন্দী করেছে তোমায়।

আবার বলি, তোমার মনের নিজস্ব গতিতে যে জগৎ গতিময়, তোমার স্বকীয় প্রাণ-স্পন্দনের মাধ্যমে জগতের যে প্রাণসত্তা দেখছ—এইটেই ঠিকঠিক স্বার্থ। বিশদ ক'রে বললে যার মানে দাঁড়ায়—নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার চারিদিকে যা সব রয়েছে তার তুমি যা অর্থ ক'রছ। তাই যখনই এই নিজের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ 'অর্থ' করা থামবে, অর্থাৎ স্বার্থ থাকবে না, তখনই জগতের রূপ যাবে বদলে। তখন সমুদ্রের সামান্য জলবিন্দু তুমি, সমুদ্রের পরিমাপ করতে গিয়ে দেখবে তাতেই একাকার হ'য়ে গেছ। সমুদ্র থেকে উঠে এসে আর সমুদ্রের বর্ণনা দিতে পারবে না। তাই বলি, তুমি যাকে ধরে স্পন্দিত, চেতনময়, তাকেই দূরে ঠেলে, তাকেই তোমার জ্ঞানের বিষয় ক'রে, তাকে আবার জানবে কি ক'রে? সূর্যের আলোতেই দেখছ, সেই আলোককে সরিয়ে সূর্যকেই আবার দেখবে কি ক'রে!

এই রকম কেন ঘটে? এর উত্তর দেওয়া যায় না। ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবে—এইটুকুই বুঝি, এবং ঐ 'বোঝার' পারে গিয়ে এর কারণ ও কার্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়—এটুকুও ঐ বুদ্ধি দিয়েই অনুভব করি। কবির ভাষায় তাই বলা চলে—'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। সত্যই তো, যে জিনিষ চোখে দেখছি না, কানে শুনছি না, স্পর্শশক্তি দিয়ে ছুঁতে পারছি না, অথচ তা 'আছে', প্রকটভাবে সত্যকারেই আছে—তাকে তাই আর বুঝবার চেষ্টা না ক'রে, কেবল বিশ্বাস ক'রে নিয়ে এগোনই ভাল। তাকে তাই কানে না

শুনলেও প্রাণে শুনবার চেষ্টা করাই মঙ্গল। দেখ না কেন, বিন্দুর সংজ্ঞা—'যাহার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নাই' সত্যই দুর্বোধ্য; তবুও সেই দুর্বোধ্যকে বিশ্বাস করেই তো আমরা অঙ্ক-শাস্ত্রের অত বড় সৌধটা দাঁড় করাতে পেরেছি। সেই রকম এই আত্মবস্তুকেও গোড়াতেই বুঝে নেবার চেষ্টা না ক'রে বিশ্বাসের অনুবর্তী হ'য়ে এগিয়ে গেলেই আশ্বাসের নিবিড়তা জাগবে, সত্যকার 'বস্তুলাভ' হবে। আর এই লাভ হ'লে যে অনুভূতি হবে, তাকে আর তখন 'উচ্ছিষ্ট' করা চলবে না, অর্থাৎ তা আর মুখে ব'লে অন্যকে বোঝানো যাবে না। কেবল ঠারেঠোরে তার সঙ্কেত মাত্র দেওয়া চলবে। নিজের দিক থেকে তখন কিন্তু ঐ পরম আনন্দানুভূতি অন্তরকে এক চিরন্তন চেতনাময় ব্যঞ্জনার ক্রোড়ে মায়ের মতো উষ্ণ স্নেহে আঁকড়ে ধরে রাখবে। অবশ্য, বোঝাবার জন্যই ঐ 'মা' ও 'ক্রোড়ের' উল্লেখ—তা না হ'লে সে যে কি, তা মুখে বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—পাঁচিলের ও-পারের না-দেখা দৃশ্য দেখতে একজন পাঁচিলের ওপরে উঠে হাসতে হাসতে ওপারেই পড়ে গেল, কোন খবর আর এদিকের লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে না। অবশ্য অবতার এপারের লোকদের কাউকে কাউকে হাত ধরে পাঁচিলে তুলে নিতেও পারেন।

তাই বলি, সর্বজীবের ঐতিহ্যবাহী তুমি মানব, তোমার ঐ আনন্দময় মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণ করা উচিত। জাগানো উচিত তোমার স্বভাব বা স্বধর্মবোধকে, সেই সঙ্গে তোমার আত্মস্ফূর্তিকেও। মনে রেখো, বাইরের এই বহু বিচিত্রের পিপাসার তৃপ্তিতে তোমার পৌরুষের উৎকর্ষ হবে না। তাই ওদিকে না এগিয়ে, তোমার অন্তর-সরোবরের শতদলকে ফোটাও। সেই প্রস্ফুটিত শতদলের উন্মাদকর সৌরভে জাগবে এক অপূর্ব রসপিপাসা। এই রসপিপাসাই বুঝিয়ে দেবে মহাজীবনের অর্থ কি ও কেন! তখন অমিতবীর্য তুমি, আলোর নিশান তুলে এগিয়ে যেতে পারবে জয়ের পথে। তাই বলি, বন্দী, জাগো। তোমার জীবন-মধ্যাহ্নের অলস দিনগুলোকে আর দীর্ঘায়ত হ'তে দিও না। কারাগারের বন্ধ্যা ব্যথা বুকে নিয়ে মনকে আর অভ্যস্ত সুখ দিয়ে ঝিমিয়ে রেখো না—তাকে তার দুঃসহ মুহূর্তগুলির পেষণ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রাণের ঘোষণা শোনাও। বিপুল-ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর মায়া-মালঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল, নিজেকে আজ নূতন ক'রে আবিষ্কার করলাম আমি; এতবড় পাওয়া যে কোথায় আছে, বহুদিন সেটাই ভুলে ছিলাম, আজ কিন্তু সেই চরম-পাওয়ার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জ্বলে উঠল। তাই আজ আর কণ্ঠস্বরে ভিখারীর আকুতি নেই—আছে বজ্রনির্ঘোষ। চৈতন্যের স্নায়ুস্রোতে আজ তাই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে: আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি—ব্রহ্ম আনন্দময়। আনন্দেই জীবগণের জন্ম, আনন্দেই তাদের জীবনযাপন, আনন্দের মাঝেই তাদের প্রয়াণ। সেই সর্বগত আনন্দের অমৃতসমুদ্রে আবার কান্নার ঢেউ গোনা কেন পথিক?

তাই বলি, চল পথিক, এই মহান আনন্দরাজ্যের বোধ জাগাবে চল। চল, সেই মধুময় আনন্দলোকে—যার আস্বাদন পেলে বলতে হবে—'মধুর মধু কিবা, মধুর মধু সব'। সেই সর্বমধুময়ের মধ্যে তুমি মধু হবে চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

'ডুব দে রে মন কালী ব'লে'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

ডুব দে রে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥

ঠাকুর সেটা দেখালেন জীবন দিয়ে। একবার ঠাকুর 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন' গানটি অশ্বিনীবাবুকে শোনাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে, একেবারে শান্ত স্থির। আর কে গান গাইবে! তিনি তো একেবারে ডুবে গেছেন। ঠাকুরের কাছে এসে এইটি শিখতে হয়—ডুবতে হয়, ভাসলে হবে না। ডুবতে দেয় না কে? কাম-কাঞ্চনের সোলা। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: গেরস্তর বাড়ীতে বেজী থাকে। ল্যাজে ইঁট বেঁধে দেয়। উঠানেই ঘুরছে ফিরছে! সময় সময় দেওয়ালের গর্তে উঠে বসে, মনে করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। কিন্তু ল্যাজের ইঁট টেনে নামিয়ে দেয়।

অশ্বিনীবাবুকে ঠাকুর বলছেন, 'তোমার ইচ্ছা হয়—তাঁর একটু নাম করি, জপ করি, কিন্তু পিছনে ওই যে দড়ি দিয়ে ইঁট বাঁধা আছে, তাই হয় না।' আসক্তির দড়ি—এই আসক্তি মানুষকে টেনে রেখে দেয় সংসারে। তাঁর জীবন দেখে ভক্তেরা কি শিখতেন? ডুব দিতে হয়, আর এগিয়ে পড়তে হয়।

'মধুসূদন'-স্তোত্রে আছে:

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসার-বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

—বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি। জন্মমৃত্যু, গর্ভবাস; যাতায়াতের মানেই তাই। তখন বলি, 'ত্রাহি মাং মধুসূদন!' সেটা কখন হয়? ধাক্কার ভেতর দিয়ে বেশী হয়। আঘাতের ভেতর দিয়ে হয়। বাইরের দিকে এত এগিয়ে গেছি। এখন ভেতরে ফিরতে হবে তো! ঠাকুর একটি গান গাইতেন:

আপনাতে আপনি থেকো মন,
যেও নাক' কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

কোথাও যেতে হবে না। সব ভেতরে আছে। তবে এর জন্য একটা তৃষ্ণা থাকা চাই, পিপাসা চাই। সে পিপাসা কোথায়? এদিকে এগোবার সে ক্ষুধা কোথায়? ভজনে তৃপ্তি আর ভোজনে তৃপ্তি। ভোজনে তৃপ্তি কখন? যখন ঠিক ঠিক ক্ষুধা আছে। এদিকে লিভার খারাপ হ'য়ে গেছে, খেলে শরীর আরও খারাপ করবে। তখন আমরা কি করি? ডাক্তারের কাছে যাই, একটা ঔষধের জন্য। লিভার ঠিক হ'য়ে গেলে আবার ক্ষুধা হয়। তেমনি ভজনের ক্ষুধার জন্য সাধুর কাছে যেতে হয়। সাধুর কাছে গেলে ভগবানে বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা আসে, যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থেকে ভক্তি আসে; ভক্তি থেকে ভাব, ভাব থেকে মহাভাব। এ সব সাধনের ব্যাপার আরম্ভ হয় বাইরের ঘোরা শেষ হ'লে। তাই রামপ্রসাদ একটা সার কথা বলেছেন, 'ডুব দে রে মন কালী ব'লে।' আমরা বাইরে খুঁজছি। ঠাকুর বলেছেন, 'আপনাতে আপনি থেকো মন।' যখন বাহির থেকে ফিরে আসবে, তখন ঠিক ঠিক ধর্ম-জীবন আরম্ভ

* লখনৌ সেবাশ্রম, ২১.৯.৫৬—পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ; শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রুত-লিখিত।

হবে। যখন দেখবে বাইরে শান্তি নেই, তখন দরজায় এসে বসবে; দরজায় ধাক্কা দেবে, বলবে, 'ওগো ভেতরে কে আছ, দরজা খোল।' ধাক্কা দাও, তবে দরজা খুলবে।

ঈশ্বরকে চাই, আবার বিষয় চাই; এ কেমন ক'রে হবে? ক্রাইষ্ট বলেছেন, 'God and Mammon-এর সেবা একসঙ্গে হয় না।' তুলসীদাস বলেছেন, 'রাম আর কাম এক সঙ্গে মিলতে পারে না।'

ডুবি কি ক'রে? রামপ্রসাদ কি বলেছেন?

'কামাদি ছয় কুমীর আছে,
আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।'

তিনি নিজে করেছেন কিনা! তাই বলছেন, তুমি বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে ডুবতে পারবে। প্রবাদ আছে, গায়ে হলুদ মাখা থাকলে কুমীর ছোঁবে না। বিবেক থাকলে কামাদি কিছু করতে পারে না। বিবেকের মানে কি? সদসদ্ বিচার, নিত্যানিত্য বিচার, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ এই বিচার। ঠাকুর ছোট্ট কথায় বলতেন, দুধে জলে মিশে আছে—রাজহংস জলটা ফেলে দুধটা খেয়ে নেয়। যারা বিবেকী, তারা বিষয়-রস ফেলে চিদানন্দ-রস পান করে। বালিতে চিনিতে মিশে আছে। পিঁপড়ে বালিটা ফেলে চিনিটুকু নেয়।

তাঁরই তো মায়া। গীতায় ভগবান্ বলেছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' তিনিই তো বেঁধেছেন, ঠুলি পরিয়েছেন। তাঁর কৃপা না হ'লে হবে না, জীবের মুক্তির চাবিকাঠি তাঁর হাতে। তিনিই তো অবতার। যারা ভক্ত, তাদের ভয় কি? ভক্ত হ'তে হবে। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তারা সব দিয়ে ফেলে, কিছু রাখে না, খোঁজে আর কি দেবার আছে। তখন ভগবান ভরিয়ে দেন তাদের হৃদয় অনন্ত আনন্দ দিয়ে। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের ভাবনা কি? তাদের তিনিই সহায়, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল—সব কিছু। তাই তিনি বলেছেন:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—আমার মায়ার পারে যাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যাঁরা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁরাই কেবল এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। রামপ্রসাদও বলেছেন, মা চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছেন। আমরা সংসারের কত হিসাব-নিকাশ করছি; কিসে কত লাভ, কত লোকসান। এতেই বুদ্ধি খরচ করছি। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা কি করছেন? কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য—এই বিচার করছেন।

ভগবান বলেছেন, আমার শরণাগত হ'লে আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। দেখ জাঁতায় 'কীল' থাকে। জাঁতায় ডাল পিষে যাচ্ছে, কিন্তু গোটাকতক ডাল—যেগুলো কীলের কাছে থাকে, একেবারে গোটা থেকে যায়। তারা কীলটার আশ্রয় নিয়েছে। 'চলতি চাক্কী সব কোঈ দেখে, কীল না দেখে কোঈ।'

তাঁকে লাভ করতে হ'লে ফিরে আসতে হবে। ফিরে আসার নাম হচ্ছে 'নিবৃত্তি'। রামপ্রসাদ বলেছেন, নিবৃত্তি-জায়া সঙ্গে নিতে হবে, প্রবৃত্তি-জায়া নিলে হবে না।

বেঁধেছেন তিনি, আবার খুলবেনও তিনি। এইটি ঠিক ঠিক জানতে পারলে তবেই হবে। পুরুষকার চাই, তারপর দৈব। গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'। এই প্রীতি-মাখানো ভজন যারা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই,

যে বুদ্ধি দিয়ে ভক্ত আমাকে লাভ করবে। তিনি চাইছেন কি? একটু প্রীতি। আমরা প্রীতি সংসারে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কাজেই প্রীতি-পূর্বক ভজন কেমন ক'রে হবে? তুমি একটু প্রীতি-মাখানো ভজন কর দেখি। প্রীতি যে সংসারই সবটুকু নিয়ে রেখেছে! উপনিষদ্ বলেছেন: তদেতৎ প্রেয়: পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।...... আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

এই যে ভেতরে যিনি বসে আছেন—তোমার আমার ভেতরে, তিনি সকলের চেয়ে প্রিয়। তিনি অন্তরাত্মা। তাই তাঁকে প্রিয়ভাবে ভালবাসতে হবে। সেইজন্য অর্জুনকে বলেছেন,'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'। ঠাকুর বলতেন, খোল-মাখানো জাব গরু যেমন আনন্দের সঙ্গে খায়, তেমনি প্রীতির সঙ্গে ভজন করলে ভগবানের আনন্দ হয়। স্নেহ-প্রীতি—তাঁরই তো দান। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো। তাহলে সংসারে আসক্তি আসবে না।

স্বামীজী বলতেন: Attachment and detachment (আসক্তি ও অনাসক্তি)। আমরা attached (আসক্ত) হ'তে শিখে রেখেছি, এখন detached (অনাসক্ত) হ'তে হবে। স্বামীর প্রতি, ছেলের প্রতি কত প্রীতি! —তাঁর বেলাই যত প্রীতির অভাব।

বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। নিত্যানিত্য বিচার করতে হবে। মানব-প্রকৃতি দু-রকম—কুলো-প্রকৃতি আর চালুনি-প্রকৃতি। দেখ, ঠাকুরের কেমন সব কথা। কুলো কি করে? ভালো জিনিসটা রেখে খারাপটা ফেলে দেয়। আর চালুনি কি করে? ঠিক উল্টো - খারাপটা রেখে ভালোটা ফেলে দেয়। যারা বিষয়ী তাদের চালুনি-প্রকৃতি। যারা বিবেকী তাদের কুলো-প্রকৃতি। ভুসি ফেলে সার বস্তু নেয়।

ভগবান চাইছেন শুধু প্রীতি। মীরা বলেছেন, 'ভজন করনা চাহিয়ে মনুয়া, প্রীত করনা চাহিয়ে'। দেখ না, ভগবান বিদুরের ঘরে গেলেন। বিদুর-পত্নী সব ভুলে গেলেন। কি খাওয়াবেন, গরীব তো। তাই একটা কলা ছাড়িয়ে ভুলে খোলাটাই খেতে দিচ্ছেন। ভগবান আনন্দের সঙ্গে তাই খাচ্ছেন। কেননা প্রীতি মাখানো আছে। বাল্যবন্ধু সুদামা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, কাপড়ের তলায় চিঁড়ে লুকিয়ে নিয়ে গেছেন। সিংহাসনে বসা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তিনি লজ্জায় আর চিঁড়ে বার করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন। তিনি সুদামাকে বললেন, 'ভাই কি এনেছ—শীঘ্র দাও, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণ যত চাইছেন, সুদামা তত কাপড়ের তলায় লুকাচ্ছেন। শেষে ভগবান কেড়ে খেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন দেখ। আমজাদ ডাকাত দু-বার জেল খেটে বেরিয়েছে; সকলেই ভয় করে। কিন্তু মা তাকে এটা দেন, সেটা দেন, সে মায়ের কাজ ক'রে দেয়। এই নিয়ে মায়ের ওপর সকলেই বিরক্ত; সবাই ভাবে আবার হয়তো কোন্ দিন ডাকাতি করবে। মা আবার তাকে একদিন বাড়ীতে খেতে বললেন। Orthodox (গোঁড়া) ব্রাহ্মণের বাড়ী, তায় আবার মুসলমান। মা কি একটা কাজে ব্যস্ত আছেন, ভাইঝি খেতে দিয়েছে। সে আর কি করে—পিসীমার আদেশ। অগত্যা দু হাত দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। মা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছেন। ভীষণ বিরক্ত হলেন। আমজাদের কাছে এসে মা বললেন, বাবা, আর কি দেবো? এটা খাও, সেটা খাও, যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছেন। তাই আমি বলি 'গণ্ডি-

ভাঙা মা'। আমরা কাউকে খাইয়ে কি করি? Return visit দিই—প্রতিদান চাই। একটা দিই আর একটা চাই। আমজাদ তখন আর খাবে কি, তার চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল পড়ছে! মা প্রীতি মাখিয়ে ডাল-তরকারি দিচ্ছিলেন। ডাকাতকে ওই ভাবে শুধরে দিলেন।

গিরিশবাবুর কাছে যখন যাই, তখন আমরা যুবক, তিনি হাঁপানিতে ভুগছেন। বিছানায় শুয়ে আমাদের বলতেন—দেখ, দেখ আমি কি ছিলাম, আমাকে তিনি দেবতা ক'রে দিয়েছেন ভালবেসে। এই হ'ল ভালবাসা। এই ভালবাসা তাঁকে দিতে হবে। তাই ভগবান বলছেন প্রীতিপূর্বক ভজন কর। খোল মাখিয়ে জাব দাও। প্রীতিপূর্বক ভজন করলে তাঁকে আসতে হবেই।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আমি শুধু বুদ্ধিযোগ দিয়ে ক্ষান্ত হই না। তাদের প্রতি করুণায় আমি অন্তর্যামী-রূপে হৃদয়ে থেকে জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার সরিয়ে দিই। ঠাকুর বলতেন, হাজার বছরের অন্ধকার—দেশলাই জ্বাললে এক ক্ষণে চলে যায়।

তাঁর কৃপাই হ'ল আসল জিনিস। এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন। যাঁরা ভগবান লাভ করেছেন, তাঁরা একবাক্যে এই কথাই ব'লে গেছেন; পুরুষকারের অহঙ্কার করেননি, কৃপার দ্বারাই পেয়েছেন। আর এই কৃপা করার জন্য তিনি দরজায় দরজায় বেড়িয়েছেন। মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে বেড়িয়েছিলেন। ঠাকুর মায়ের কাছে বলতেন, মা আমার শরীরটা এমন করলি যে আমায় গাড়ী ক'রে যেতে হয়। ছুটলেন কেশব সেনের বাড়ী, বিদ্যাসাগরের বাড়ী—অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কোন দরকার নেই, অপ্রয়োজনে যাচ্ছেন। গিরিশবাবুর ঘটনা বলি। দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর খেতে বসেছেন। ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তাঁকে তুলে কাছে বসিয়ে বলছেন, গিরিশ এসেছ, খাও। হাতে ক'রে খাইয়ে দিচ্ছেন। বোঝো, অপ্রত্যাশিত ভালবাসা। উনি তো একেবারে নীরব। ভাবছেন—এই ওষ্ঠ কি না স্পর্শ করেছে! আর উনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এই ওষ্ঠ স্পর্শ করছেন! চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ছে! কথা বলতে পারছেন না। ঠাকুর স্নেহের সঙ্গে বলছেন, খাও গিরিশ। গিরিশবাবু বলতেন, ভেতরটায় কত আবর্জনার গন্ধ ভ্যাট্ ভ্যাট্ ক'রত, আর উনি সব দূর ক'রে দিলেন। এই হ'ল অবতার-পুরুষের ভালবাসা।

শ্রীশ্রীমা-ও সব দিয়ে দিতেন। এতটুকু নিজের সত্তা রাখতেন না। সংসারের মা ৪।৫টি ছেলেমেয়ের মধ্যেই নিজেকে বিস্তার ক'রে রাখেন, পাশের বাড়ীর ছেলেদের খবর রাখেন না। তাই বলি 'গণ্ডির মা'। কিন্তু শ্রীশ্রীমা নিজেকে সকলের মধ্যে বিস্তার ক'রে রেখেছিলেন, তাই বলি 'গণ্ডিভাঙা মা'।

বেশী শাস্ত্রপাঠের কি দরকার? ঠাকুরের জীবন দেখ। চোখের সামনে দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি। তিনি এসে পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু, কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আসেননি। তাঁর যে পথ, সেই পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে। কিসের জন্য? শান্তি পাবার জন্য। তাঁকে পেতে হ'লে প্রেম চাই, পুরুষকার চাই। শিশু মায়ের কাছে যেতে পারছে না, তবু হামা দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, তারপর নিজেই এসে কোলে তুলে নিলেন। তোমার দিক দিয়ে চাই পুরুষকার, তাঁর দিক থেকে আসবে দৈব। এই দুয়ের মিল হলেই হ'য়ে গেল।

আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর 'পত্রাবলী' পড়া এখন আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। যত পড়ছি, ততই তাঁর বাণীর মধ্যে নতুন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছি। গুরুদেব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য-গুলি কী গুরুত্বপূর্ণ! রামকৃষ্ণ-অবতারের ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তাঁর কী গভীর বিশ্বাস! ১৮৯৪ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রে লিখছেন :

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ—চারিদিকে প্রচার করতে হবে, যেন সমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়।

আর একখানি পত্রে রয়েছে : তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি।

আবার বলছেন : যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্য-যুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

ঠাকুর সম্পর্কে এমন পর্যন্ত বলেছেন : যাঁর পবিত্রতা, প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণামাত্র প্রকাশ।

আশ্চর্যের কথা, ঠাকুর সম্পর্কে যিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে এই ধরনের নানা মন্তব্য করেছেন, তিনি কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনে ভাবী গুরুদেবের প্রতি তেমন একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে পারেননি। ঠাকুরের হাব-ভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই প্রকৃতিস্থ নয়। সংশয়ের পর সংশয়ের অন্ধকার পার হ'য়ে তবে স্বামীজী বিশ্বাস করেছিলেন, 'তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্যে এসেছেন, পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।'

নিবেদিতার The Master as I saw him গ্রন্থে দেখতে পাই, স্বামীজী তাঁর এই সংশয় সম্পর্কে একদা বলেছিলেন : I fought my Master for six long years, with the result that I know every inch of the way !—Every inch of the way !

—ছ-টি বছর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, ফলে এ পথের প্রতিটি পদক্ষেপ আমি জেনেছি।

কেন তিনি ঠাকুরের জীবন এবং উপদেশ চারিদিকে ছড়াবার উপরে এত জোর দিয়ে-ছিলেন? কারণ সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্মেরই লক্ষ্য হচ্ছে : তাদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি রয়েছে, সেগুলি পৌঁছে দেওয়া যথাসম্ভব বেশী নরনারীর কাছে, যাতে তারা মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জীবনে সার্থক করতে পারে। আর মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল—ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন করা ও তাঁর অনির্বচনীয় আনন্দে ডুবে থাকা। ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর An Historian's Approach to Religion-এ পড়ছিলাম :

The true purpose of a higher religion is to radiate the spiritual counsels and truths that are its essence into

as many souls as it can reach, in order that each of these souls may be enabled thereby to fulfil the true end of Man. Man's true end is to glorify God and to enjoy Him for ever....

[ভাবার্থ পূর্বের অনুচ্ছেদেই অনূদিত]

ঠাকুর বলতেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ।' কেন? কারণ ঠাকুরেরই ভাষায়: ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। কর্মকে ঠাকুর কখনও জীবনের উদ্দেশ্য বলেননি। হাসপাতাল-ডিস্পেন্সারি করার উপরেও জোর দেননি।

স্বামীজীর কণ্ঠেও গুরুদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি; ১৮৯৪ খৃঃ ২৬শে জুন স্বামীজী কয়েকজন মহিলাকে সম্বোধন ক'রে যে পত্র লিখছেন, তার মধ্যে আছে:

এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি, তোমরা এই সুযোগ অবহেলা ক'রে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ, সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান কর; সেই পরমবস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক্, তাহলে নিশ্চিত সেই পরমবস্তু লাভ করবে।

নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন: His work in the world, as he saw it, was the sowing broadcast of the message of his own Master. —স্বীয় আচার্যদেবের বাণীকে সর্বত্র ছড়ানোই ছিল স্বামীজীর জীবনব্রত। আর ঠাকুরের সমস্ত উপদেশের সার মর্ম ছিল 'এগিয়ে পড়ো।' অর্থাৎ 'আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরলাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে! ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।' মানুষের চরম দুর্গতির প্রকাশ হচ্ছে: 'বৃক্ষ সম হৈনু।'—কাম-কাঞ্চন-খ্যাতির মিছা মায়ায় এমন বদ্ধ হ'য়ে রইলাম যে ভুলে গেলাম, জীবনের পরম সত্য, 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।' ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের যে অনির্বচনীয় শান্তি রয়েছে, সেই শাশ্বত শান্তির মতো চরম সত্য আর কি আছে? অবতার-পুরুষেরা পৃথিবীতে আসেন এই পরম সত্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দিতে। আমরা যখন গাছের মতো একই জায়গায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকি, চলতে চাইনে সেই চিরন্তন আনন্দলোকের দিকে, তাঁরা এসে তখন কানে মন্ত্র দেন: 'এগিয়ে পড়।' আমরা যখন বই প'ড়ে প'ড়ে হদ্দ হ'য়ে যাই, চোখের সামনে থেকে মুছে যায় সব আলো, তাঁরা এসে বলেন, 'এগিয়ে পড়।' বলেন: বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

বিবেকানন্দকে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল—তাঁর উপদেশকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্যে। নরেন্দ্রনাথ যখন অখ্যাতনামা কিশোর, তখন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জীবনে কি চাস্ তুই?' সঙ্গে সঙ্গে নরেন জবাব দিয়েছিল, 'সমাধির মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।' জবাব শুনে ঠাকুর শুধু বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আরও বৃহত্তর কাজের জন্যে তুই পৃথিবীতে এসেছিস।' নরেন্দ্রনাথের ভুল ভেঙে গেল ঠাকুরের ঐ একটি কথায়। নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: We may take it, I think, that the moment marked an epoch in the disciple's career.—ঠাকুরের ঐ কথা শুনে শিষ্যের জীবনধারা বইতে শুরু ক'রল সম্পূর্ণ নূতন খাতে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ হ'য়ে আমরা যখন ধর্মের সিংহাসনে টেক্‌নলজিকে বসাবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে

ছিলাম, স্বামীজী তখন কুড়িয়ে আনলেন আমাদের ছড়িয়ে-পড়া মনকে ধর্মের কেন্দ্রে, শোনালেন: 'প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল-স্রোত ধর্ম; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলি উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।' আরও শোনালেন: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?'

ইওরোপ ভেবেছিল, তার ভাববন্যায় এশিয়া তলিয়ে যাবে, সে যা বলবে এশিয়া তার প্রতিধ্বনি করবে, স্টীমারের পেছনে গাধাবোটের মতো সে চলবে তার পেছনে পেছনে। এশিয়া অস্বীকার ক'রল ইওরোপের তল্পীবাহক হ'তে। ভারতবর্ষ তার কবির কণ্ঠে ঘোষণা ক'রল:

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা,
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর!
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী সে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

এশিয়ার এই নব প্রভাতের সূচনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণায় এশিয়া মেরুদণ্ড সোজা ক'রে প্রথম দাঁড়ালো ইওরোপের মুখোমুখী হ'য়ে। পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করবার মোহ সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে—এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারিনে। খৃষ্টান পাদ্রীরা এখনও আমাদের দেশে জোর গলায় প্রচার করছেন: পরিত্রাণ শুধু খৃষ্টান ধর্মের মধ্য দিয়েই।

কিন্তু সত্যি কি তাই? আর একবার ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর মাপকাঠি দিয়ে খৃষ্টান ধর্মের বিচার করা যাক। দেখা যাক পাদ্রীদের অহঙ্কার ধোপে টেঁকে কি না।

ধর্মের বিচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন:

The touchstone of a religion is its comparative success or failure, not merely in divining the truths and interpreting the counsels but also in helping human souls to take these truths to heart and to put these counsels into action. So the last word has not been said about a religion when we have accepted or rejected its definitions of the nature of Reality and of the true end of Man. We have also to look into the daily lives of its adherents and to see how far, in practice, their religion is helping them to overcome Man's Original Sin of self-centredness.

এর সারমর্ম: কোন নির্দিষ্ট ধর্মের ভালো-মন্দ বিচার করবার কষ্টিপাথর শুধু ঐ ধর্ম সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে নয়, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাতেও নয়; আমাদের এও দেখতে হবে, কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসরণ-কারীরা স্বার্থ-কেন্দ্রিকতার আদিম পাপ থেকে কী পরিমাণে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। কারণ, কোন প্রাণীরই অধিকার নেই তার প্রতিবেশীর, বিশ্বের অথবা ভগবানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবার, যাতে মনে হ'তে পারে—বিশ্বের কেন্দ্রে তারই আসন এবং আর যারা আছে, তাদের কাজ হচ্ছে তার দাবি মেটানো।

ধর্মের এই যে কষ্টিপাথর টয়েন্‌বী আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন; এতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রচলিত ধর্ম হিসাবে খৃষ্টধর্ম যে-গৌরবের দাবি ক'রে আসছে, সে-গৌরবে তার কোন অধিকার নেই। লিখছেন টয়েন্‌বী:

But, if the Infidels were to agree to submit to a competitive examination in which the

marks were to be awarded for intelligence, for learning, and for military virtues—we ought to take them at their word ; for in these terms, they would inevitably be beaten at the present day. On all these three points they are far inferior to us Christians. We enjoy the fine advantage of being far better versed than they are in the art of killing, bombarding, and exterminating the Human Race.

এর ভাবার্থ: বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং সামরিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে (খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসী) অন্যধর্মীরা খৃষ্টানদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। তাদের তুলনায় আমরা অনেক বেশী ওস্তাদ নরহত্যার কাজে, গোলাগুলি ছোঁড়ায় এবং মানব-জাতিকে নির্মূল করার ব্যাপারে।

খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বের একজন প্রথিতযশা খৃষ্টান ঐতিহাসিকের এই হ'ল সুচিন্তিত এবং সুস্পষ্ট অভিমত।

পৃথিবী অপেক্ষা ক'রে আছে এমন এক ধর্মের জন্যে, যার বাণীর মধ্যে মানুষের আদিম পাপ স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের কোন স্থান নেই; আছে আত্মবিশ্বাসের, আত্মপ্রতিষ্ঠার। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সমান অধিকার সকল ধর্মেরই আছে এবং প্রতিবেশীর ধর্মকে সম্মান করা প্রত্যেকেরই উচিত—একথা হিন্দুধর্ম যত জোরের সঙ্গে প্রচার করেছে, এমন আর কোন ধর্ম করেছে কি? আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' কি হিন্দু ঋষিদের চিন্তাধারার নির্যাস নয়?

স্বামীজীর উদ্দেশে

শ্রীপঞ্চানন মল্লিক

সারা পৃথিবীতে একি তাণ্ডব মিথ্যা-বেসাতি-ভারে,
ধর্ম নিয়েছে বিদায় আজিকে নিষ্ঠুর পাপাচারে।
ক্ষমার আজিকে নেই কোন দাম, আত্মার নেই মূল্য,
মানুষ মানুষে পদাঘাত করে, জীবন তৃণের তুল্য।
কোথা ভারতের জ্ঞানের গরিমা বিশ্বের দরবারে?
কোথা প্রাচ্যের ত্যাগের মহিমা সংসার-পারাবারে?
পরম ধর্ম অহিংসারই বা কোথায় আজিকে স্থান?
কেন হ'ল আজ মানব-প্রেমের প্রোজ্জ্বল শিখা ম্লান?
বস্তুবাদের নাস্তিকতায় আছে মৌখিক সাম্য,
বিজ্ঞান-জাত ভোগ্য পণ্য শুধু বিলাসের কাম্য।
স্বার্থের লোভে বাধে সংঘাত, নেতারা ক্ষমতালুব্ধ,
সম্মেলনেতে শান্তির নামে বাধিছে কথার যুদ্ধ।
মরণবিজয়ী হে মহামানব, এসো ফিরে আর বার,
রোধ কর এই দম্ভনিনাদ,—প্রলয়ের হুঙ্কার।
চারিদিকে আজ ঘোর অনাচার, আত্ম-সুখের দ্বন্দ্ব,
জ্ঞান দাও তুমি বিবেক-অন্ধে, স্বামীজী বিবেকানন্দ।

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন প্রকার দর্শন-মত কোন অর্থে বিশ্বজনীন হইতে পারে কিনা, এবং যদি তাহা হয়, তবে তাহার ভাবধারা বা মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, বিশ্বজনীন দর্শন কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কোন্ অর্থে উহা সম্ভব নয় ও কোন্ অর্থে উহা সম্ভব? তার পর প্রশ্ন—উহার মূল ভাবধারা ও প্রধান সিদ্ধান্তই বা কিরূপ হইবে। এই কয়টি প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছি।

বিশ্বজনীন দর্শন (World Philosophy) বলিতে এমন কোন দার্শনিক মত বুঝি না, যাহা সর্বদেশে ও সর্বকালে সব লোকই সঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবে বা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবে। এ অর্থে দর্শন কেন, কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন অর্থাৎ সার্বকালিক, সার্বদেশিক ও সার্বলৌকিক নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে সচরাচর আমরা বলি, যে কোন বিজ্ঞান সর্বজনীন (universal), উহা দেশ কাল বা জাতি বিশেষের জন্য নহে; উহা সকলের নিকট সত্য এবং সব কালে ও সব দেশে সত্য। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশ-কাল-জাতিভেদে আমরা ভেদ করি না, বলি না—ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞান, উহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান; ইহা ভারতীয় বিজ্ঞান, উহা ফরাসী বা ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞান। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ ভেদ করা হয় এবং প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্ন ধারণা ও ব্যবহারের মূল কারণ এই নয় যে, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সব দেশে ও সব কালেই সত্য ও স্বীকৃত, আর দার্শনিক মতগুলি কোথাও সত্য, কোথাও মিথ্যা; কোথাও স্বীকৃত, কোথাও অস্বীকৃত। এ সব দিক দিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের ভেদ করা যায় বলিয়া মনে হয় না। সব বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সর্বত্র সত্য ও স্বীকৃত, এ কথা বলা যায় না। এক বৈজ্ঞানিকের মত আর এক বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, প্রাচীন পদার্থবিদ্যার জড়তত্ত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অস্বীকৃত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ হয়, আবার এমন স্থান আছে যেখানে উহার কোন ক্রিয়া নাই এবং পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য ভারী, সে সব স্থানে তাহাদের কোন ভারই নাই। যোগবলে এই পৃথিবীতেই যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহা যোগশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব উপরে লিখিত অর্থে বিজ্ঞানকে সর্বজনীন এবং দর্শনকে অসর্বজনীন বা কাদাচিৎক বলা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদ করা হয়, তাহার প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে, এক এক দর্শনমতের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য দেশ ও কালের আশ্রয় লওয়া হয় এবং এজন্যই এদেশের দর্শন বা ওদেশের দর্শন—এরূপ কথা বলা হয়। বিজ্ঞান ও চারুকলার ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ শব্দব্যবহার করি,—যেমন প্রাচীন পদার্থবিদ্যা,

আধুনিক পদার্থবিদ্যা; গ্রীক কলা, ভারতীয় কলা ইত্যাদি।

আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বজনীন দর্শন বলিতে সব দেশে কালে ও লোকে সত্য এবং স্বত কোন বিশেষ দর্শন মত বুঝায় না, এবং এই অর্থে কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন নহে। এই অর্থে দর্শন বা বিজ্ঞানের সর্বজনীন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখন দেখা যাক্ কি অর্থে উহাদিগকে সর্বজনীন বলা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তত্ত্ব বা মুখ্য সূত্র আছে, যাহা সার্বত্রিক বা সর্বত্রব্যাপী, আর কতকগুলি গৌণতত্ত্ব বা অপ্রধান সত্য আছে, যাহা দেশে ও কালে অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ। যে বিজ্ঞানে যত বেশী মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় এবং মূল-তত্ত্বগুলির সাহায্যে অপ্রধান তত্ত্ব বা সত্যগুলি এবং তাহাদের দেশ-কালে ব্যতিক্রম যতটা বুঝা যায়, তাহা ততটা সর্বজনীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই হিসাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদকে (Theory of relativity) নিউটনের নিরপেক্ষিক (absolute) বৈজ্ঞানিক মত অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক সর্বজনীন ও সমাদরযোগ্য বলা হয়। গ্রীক্ দার্শনিক আরিস্টটল দর্শনের সর্বজনীনতা বা বিশ্ব-জনীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দর্শনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 'দর্শন মূল তত্ত্ব-গুলির বিজ্ঞান (Science of first principles)।' অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যে দর্শনে পরতত্ত্ব বা পরম সত্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদের সাহায্যে অপর তত্ত্বগুলির এমন কি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরও ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাই বিশ্বজনীন দর্শন হইবে। এই অর্থে আমরা বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলিতে পারি।

যদি এই অর্থে বিশ্বজনীন দর্শন বা দার্শনিক মত সম্ভব হয়, তবে তাহার ভাবধারা অর্থাৎ মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, তাহাই আলোচনা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বজনীন দর্শনে পরম তত্ত্বের এরূপ নির্দেশ থাকিবে যে, তদ্দ্বারা অন্য ও অপর তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, উহা এমন এক দর্শন-মত হইবে যে, তাহাতে অন্যান্য দর্শনমতের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় এবং তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়; বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিতও উহার একান্ত বিরোধ হইবে না।

পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা যায়। কেহ বলেন, অচেতন জড় পদার্থ পরম-তত্ত্ব; কেহ বলেন, উহা জড়-বিরোধী চেতন সত্তা; কেহ বলেন, উহা এক ও অদ্বৈত; কেহ বলেন, উহা দ্বৈত বা অনেক ও বহু; কেহ বলেন, উহা সগুণ, সক্রিয় ও সবিশেষ; কেহ বলেন, উহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিশেষ। আবার কেহ বলেন, উহা পরিণামশীল বিজ্ঞানধারা মাত্র এবং উহাতে বাহ্য বা জড় বস্তুর স্থান নাই। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয়-গোচর অথচ জ্ঞানাতিরিক্ত ও জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুনিচয়ের সঙ্ঘাত-মাত্র। আবার কেহ বলেন, উহা চিরপরিণামী শক্তি; কেহ বলেন, অপরিণামী শাশ্বত সত্তা; আবার কেহ বলেন, উহা জড় প্রকৃতি ও চেতন আত্মার যুক্ত সত্তা; কেহ বলেন উহা চিদচিদ্‌বিশিষ্ট পরমাত্মা বা তত্ত্বত্রয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতের অন্ত নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মত-বিরোধেরও শেষ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত দেখা যায় কেন?

এবং কিভাবেই বা তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়? যদি এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়, তবে তাহা এক বিশ্বজনীন দর্শনের সূচনা করিবে। আমরা এখন তাহারই চেষ্টা করিব।

সকল দর্শন-মতের মূলে কোন না কোন প্রকার অনুভূতি (experience) নিহিত আছে। কেবল দর্শন কেন, সকল জ্ঞানের মূলেই কোন এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি আছে। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ দেখা যায় তাহাদের মূলেও কোন না কোন প্রকার অনুভূতি বিদ্যমান। এ হিসাবে সকল দর্শন-মতকেই কোন না কোন ভাবে সত্য বলা যায়। উহারা পরমতত্ত্বের এক বা একাধিক গুণ ধর্ম বা রূপের পরিচয় দেয় বলিয়াই উহাদিগকে আংশিকভাবে সত্য বা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি কোন মত একভাবে সত্য হয়, তবে উহাকে সর্বভাবে সত্য বলা ঠিক হয় না; উহা আংশিকভাবে সত্য হইলে উহাকে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলা ঠিক নয়। দার্শনিকগণ যখন নিজ নিজ মতকেই সর্বভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া ভিন্ন মতগুলিকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়। যদি কেহ তাঁহাদের বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদের সকলের মতই একভাবে না হয় আর একভাবে সত্য, কিন্তু কোন মতই সর্বভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়, তবে তাঁহাদের মতবিরোধ দূর হইবে এবং বিবাদের অবসান ঘটিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ স্মরণ করা উচিত। চার অন্ধ ব্যক্তি এক হস্তী-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া হস্তী সম্বন্ধে চারটি বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ মতটি সত্য ও অপর মতগুলি মিথ্যা বলিয়া কলহ করে। দার্শনিকেরাও এই অন্ধ ব্যক্তিদের মত নিজ নিজ মতটিকেই সত্য এবং অপর সকল মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়াও এই কথাই বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এক বহুরূপীকে বিভিন্ন বর্ণ-যুক্ত দেখিয়া প্রত্যেকে নিজদৃষ্ট বর্ণটিই উহার প্রকৃত বর্ণ বলিয়া ঝগড়া করিতে থাকে। তার পর বহুরূপী যে বৃক্ষে থাকিত, তাহার তলদেশে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করিত, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাদের প্রত্যেকের কথিত বর্ণ বহুরূপীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা যায়, আবার কখন উহার কোন বর্ণই দেখা যায় না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিয়া কলহ হইতে নিবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর দৃষ্টান্তে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পরমতত্ত্ব (Reality বা Absolute) এমন এক সার্বভৌম তত্ত্ব যে, তাহাতে সব জীব-জগৎ, সব গুণ-ধর্ম-রূপ আছে, আবার উহা এ-সকলের অতীত; উহা সর্বগুণের আশ্রয় আবার সর্বগুণাতীত, সর্বগুণাভাস ও সর্বগুণ-বিবর্জিত। ঋগ্বেদ উপদেশ করিয়াছেন: একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ (১.১৬৪.৪৬)। এ শ্রুতিবাক্যের অর্থ হইতেছে যে, সব দেবদেবী এক পরমতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব এক বা অদ্বিতীয় হইলেও উহা অনন্তরূপে, অনন্তধর্মে, অনন্ত আকারে ও অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে তত্ত্ব অনেকান্ত ও অনন্তধর্মক। শুধু পরমতত্ত্ব কেন, বিশ্বের যে কোন বস্তুতেই অনেক ও অনন্ত ধর্ম দেখা যায়। একটি মনুষ্যে

যে সব ধর্ম বিদ্যমান এবং যে সব ধর্ম অবিদ্যমান অর্থাৎ অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক (positive, negative) ধর্ম, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এজন্য আমাদিগকে আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্ব যেমন অনেকান্ত, তেমনি সত্যও অনেকান্ত, অনেকরূপ ও অনেকপ্রকার। বিভিন্ন বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্মমত একতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের বা রূপের প্রকাশ, উহারা এক পরম সত্যের বিভিন্ন অংশের বা কলার পরিচয় দেয়

এখন জিজ্ঞাস্য, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায় কি? তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মানুষের মনের এমনই গঠন এবং তাহার অনুভূতির এমনই গতি ও রীতি যে, সে এককালে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি জ্ঞান-স্তর হইতে যে কোন তত্ত্বের অনুভূতি করিতে পারে। একথা পর বা অপর—উভয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। একটি প্রাসাদ আমরা মাত্র একদেশ হইতে ও এককালে দেখিতে পাই। উহাকে সব দেশ হইতে এবং সব কালে যুগপৎ দেখিতে পাই না। আবার এক দেশ ও কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন আমাদের ঐ প্রাসাদের জ্ঞানও এক বিশেষ প্রকারের হয়, এবং ভিন্ন দেশ ও কালে লব্ধ জ্ঞান হইতে কতকটা ভিন্ন হয়। এ জন্য বলিতে হয়, কোন তত্ত্বের অনুভূতি বা জ্ঞান আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর-সাপেক্ষ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর-ভেদে তত্ত্বের অনুভূতিরও প্রকারভেদ ঘটিবে। সকলেরই এক প্রকার তত্ত্বানুভূতি হয় না। যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা জ্ঞানের যে স্তর হইতে তত্ত্বের অনুভূতি করেন, তাঁহার তত্ত্বানুভূতিও তদুপযোগী হয়। আর একথা সত্য যে, তত্ত্বানুভূতিতেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব বলিতে হয় যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান-স্তর-ভেদে তত্ত্বের অনুভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন হইবে এবং তদনুসারে বিভিন্ন লোকের তত্ত্বজ্ঞানও কতকটা বিভিন্ন হইবে। এজন্যই আমরা দর্শনের ইতিহাসে তত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত দেখিতে পাই।

এখন কিভাবে আপাতবিরোধী বিভিন্ন দর্শনমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিভাবে তাহাদের একটা সমন্বয় সাধন করা যায়, তাহা আলোচনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি জ্ঞানের স্তরভেদে তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ ঘটে এবং তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরও কতকটা প্রকার-ভেদ ঘটিবে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সর্ব-সাধারণ এবং সম্ভবতঃ সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তর হইতে মানুষ তত্ত্বের যে অনুভূতি পায়, তাহাতে তত্ত্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় বলিয়া প্রকাশিত হয় এবং এজন্য সে তত্ত্বকে রূপ-রস-গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও দেশকালান্তর্গত জড় পদার্থ বলিয়া বুঝে ও নির্ণয় করে। ভারতীয় চার্বাক দর্শন এবং পাশ্চাত্য জড়বাদ, মার্কস্‌বাদ, দৃষ্টবাদ, (positivism), স্বভাববাদ (naturalism), যদৃচ্ছাবাদ (mechanism), নাস্তিকবাদ (atheism) মানুষের এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই ব্যাখ্যা ও আলোচনায় নিবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষ যখন তাহার মনোবুদ্ধির স্তর হইতে তত্ত্বকে অনুভব করে এবং প্রজ্ঞার (reason) সাহায্যে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার নিকট তত্ত্ব মনোময় বা বিজ্ঞানময় অর্থাৎ চেতন বলিয়া প্রকাশিত হয়। এখন যদি সে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে, তবে তাহার দর্শন বিজ্ঞান-বাদে (subjective idealism) পর্যবসিত হইবে। যোগাচার বৌদ্ধদের এবং বিশপ বার্কলের

'বিজ্ঞানবাদ' জ্ঞানের এই স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মনে হয়। আবার যদি সে প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সততা ও উপযোগিতা স্বীকার করে, তবে তাহার নিকট তত্ত্বের দুইটি রূপ প্রকাশিত হয়, একটি চেতনরূপ, অপরটি অচেতন বা জড়রূপ। এই রূপকেই স্বীকার করিলে তত্ত্বকে দ্বৈত বলিয়া বুঝিতে হয়, যদিচ মনোবুদ্ধিলব্ধ চেতন-রূপকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এইভাবে তত্ত্বকে এক পরম চেতন সত্তার এবং বহু চিদচিৎ সত্তার মিলন বা সংযোগ বলিয়া বুঝিতে হয়। যে সব ধর্মে বা দর্শনমতে দুই বা বহু তত্ত্ব (dualism ও pluralism) স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে চেতনকে প্রধান ও স্বতন্ত্র এবং অচেতনকে অপ্রধান ও অস্বতন্ত্র, অথবা উভয়কেই স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জ্ঞানের এই স্তরে অধিষ্ঠিত বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মধ্বাচার্যের দ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তর্গত ডেকার্ট, লক, কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ এই স্তরের জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত মনে হয়।

ধ্যানযোগে ও সবিকল্প সমাধির স্তরে তত্ত্বের যে অনুভূতি হয়, তাহাতে তত্ত্ব চৈতন্যগুণ-বিশিষ্ট আত্মা বা পুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের এই স্তরে আত্মা ও চৈতন্য বা জ্ঞান ভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য—এরূপ প্রত্যয়ও হয়। আত্মা ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ অনুভূতির সঙ্গে তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতির ভিত্তিতে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, অংশী ও অংশ—এসব সম্বন্ধ-প্রত্যয়ের (categories of relation) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় তত্ত্ব আমাদের নিকট অনন্তগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বর ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বা উপনিষদের সগুণ- ও সবিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলে জ্ঞানের এই স্তর নিহিত আছে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজার অখণ্ড ও অদ্বিতীয় দ্রব্যবাদ (philosophy of substance as absolute) এবং হেগেলের পরম চেতন-বাদকেও (absolute idealism) জ্ঞানের এই স্তরে উদ্ভূত ও অবস্থিত বলা যায়।

জ্ঞানের শেষ স্তর হইতেছে নির্বিকল্প সমাধি। ইহাকে তুরীয় বা ব্রহ্ম বলা হয়। এটি শুদ্ধ-জ্ঞানের অবস্থা। ইহাতে সব চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মনের এক-কালীন লয় হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী, আত্মা ও চৈতন্য দুইটি ভিন্ন অথচ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে উহারা এক ও অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, আত্মাই জ্ঞান এবং জ্ঞানই আত্মা—এরূপ অনুভূতি হয়। প্রকৃত-পক্ষে এ অবস্থায় আত্মা, জ্ঞান ও এতদুভয়ের অভেদ জ্ঞান—এরূপ অনুভূতি থাকে না, বরং এক জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদ-বিনির্মুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র থাকে। উহা সাধারণ বিষয়জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে। এজন্য কেহ কেহ উহাকে অজ্ঞানের অথবা একটি কাল্পনিক বা অসত্য জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে; উহা বিষয়জ্ঞান নহে বটে, কিন্তু অজ্ঞানও নহে, উহা পর-জ্ঞান বা জ্ঞানাতীত জ্ঞান। এই জ্ঞানে তত্ত্বের যে প্রকাশ ঘটে, তাহা অন্য সব জ্ঞানস্তরলব্ধ প্রকাশ হইতে ভিন্ন হইবে। এ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে অন্য সব জ্ঞান-প্রত্যয় (categories of experience) ছাড়িয়া

কেবল 'অদ্বৈত' এই প্রত্যয় (category of non-dual) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় আমরা তত্ত্বকে অদ্বৈত, নিগুর্ণ, নির্বিশেষ সন্মাত্র বা চিন্মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করি; এবং কখন কখন উহাতে জীবজগৎ ও ঈশ্বর পর্যন্ত ত্রিকাল-নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণা করি। শ্রুতির নিগুর্ণ ও নির্বিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং সগুণ-সবিশেষ-বাচক বাক্যের নিন্দাসূচক বাক্যগুলির মূলে এই অদ্বৈতানুভূতি নিহিত আছে। গৌড়পাদাচার্য ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ বেদান্তীদের অদ্বৈতবাদ এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এই অদ্বৈতানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পারমিনাইডিস, প্লেটো, প্লোটিনাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এবং আধুনিক কালে এফ. এচ. ব্রাডলির দর্শন-মতেও অদ্বৈতানুভূতির কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মগুরু দ্বৈত এবং অদ্বৈত মতের মিলন-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যেন সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয় স্তরের জ্ঞানকেই স্বীকার করিয়া তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইভাবে বৈষ্ণব বেদান্তী নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদ, শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈত এবং অভিনবগুপ্ত-বর্ণিত শৈবদর্শনের কোন কোন শাখা, বিশেষতঃ কাশ্মীর শৈবদর্শন, ভগবদ্‌গীতার পুরুষোত্তমবাদ এবং তন্ত্রের শিবশক্তিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রসার ঘটিয়াছে, মনে হয়। ইঁহারা পরম তত্ত্বকে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকারই বলিয়াছেন এবং উহাতে একত্বের সহিত বহুত্বের মিলন সাধন করিয়া পরব্রহ্মকে জীবজগদ্‌রূপে প্রকাশমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীঅরবিন্দও দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের, চেতন আত্মা ও অচেতন জড়ের, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে সামগ্রিক চেতন-বাদ (Integral Idealism) আখ্যা দেওয়া হয়।

পূর্বে বলিয়াছি অনুভূতি তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় এবং সব অকৃত্রিম ও অকপট অনুভূতিতেই তত্ত্ব এক না এক ভাবে প্রকাশিত হয়। মনের বিভিন্ন ভূমিতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ত্ব কিরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়—তাহাও বলিয়াছি। নির্বিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ত্ব নিগুর্ণ ও নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়। সবিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ত্ব সগুণ বা সবিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হয়। নির্বিকল্প ভূমির শুদ্ধ অধ্যাত্ম-জ্ঞানে (pure spiritual consciousness) তত্ত্ব নিত্য অপরিণামী ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার প্রাণচেতনার সাক্ষাৎ অনুভূতিতে (intuition of life process বা vital consciousness) এবং প্রযত্নচেতনায় (intuition of volitional process বা conative consciousness) উহা চিরপরিণামশীল ও চঞ্চল শক্তিরূপে অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতি হইতেই বৌদ্ধ দর্শন, হার্টম্যান ও শোপেনহাওয়ারের দর্শন এবং বার্গসোঁর দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। এভাবে অন্যান্য জ্ঞানের স্তরে তত্ত্ব অন্যরূপে অনুভূত হয় এবং আমরা উহাকে অন্যরূপে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি।

সর্বনিম্নে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্তরে তত্ত্ব আমাদিগের নিকট রূপ-রস-গন্ধাদিময় জড়জগদ্‌রূপে প্রকশিত হয় এবং আমরা জড় জগৎকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া বুঝি। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোন এক জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের যে রূপ পাই, তাহাই উহার

একমাত্র বা সম্পূর্ণ রূপ নহে। এক একটি জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের এক একটি মাত্র রূপের পরিচয় পাই। তত্ত্বের কোন একটি রূপ যেমন উহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, তেমনি উহার অনুভূত কোন রূপই মিথ্যা বা অলীক নয়। যেমন এক জলতত্ত্ব বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার কোন একটি রূপই জল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা নয়, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ রূপ তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নয়। যেমন আমরা একই জলে রাসন-ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বাদ-গন্ধাদি গুণ স্বীকার করি, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ রূপকে তাহার বিভিন্ন-ভাবের প্রকাশ ও সত্য রূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জলে নীল বা সাদা বর্ণ আছে, কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই বলা চলে না, আবার স্বাদ আছে, গন্ধ বা স্পর্শগুণ নাই, তাহাও বলা যায় না। একই জলে বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ আছে এবং উহারা তাহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। ঠিক এই ভাবেই তত্ত্ব নির্গুণ, সগুণ নহে; নিরাকার, সাকার নহে; জড়মাত্র, চিদ্রূপ নহে; গতিশীল, স্থিতিশীল নহে—এরূপ বলা যায় না। যদি অনুভূতি-সামান্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতি একই তত্ত্বকে প্রকাশ করে, তবে বলিতে হইবে যে তত্ত্ব সাকারও বটে, নিরাকারও বটে; সগুণ ও সবিশেষও বটে, নির্গুণ ও নির্বিশেষও বটে; নিত্য অপরিণামীও বটে, লীলায়িত পরিণামীও বটে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন: এক তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হইবে এবং একই তত্ত্ব যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায়, তাহা কিরূপে বুঝিব? ইহার উত্তরে প্রথমে বলিব, একই জল কিভাবে রস- ও স্পর্শ-গুণযুক্ত হইতে পারে এবং তরল দ্রব্য বাষ্প ও কঠিন পদার্থ হইতে পারে। তাহা বুঝিলে একথা বুঝা যাইবে, জলে আমরা রস ও স্পর্শ অথবা স্বাদ ও শৈত্যগুণ স্বীকার করি। কিন্তু এগুণ-দুইটি একেবারে ভিন্ন; রস স্পর্শ নহে, স্বাদ শৈত্য নহে, ইহাদের পরস্পরাভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। রস স্পর্শ হইতে ভিন্ন, স্পর্শ রস হইতে ভিন্ন, সেইরূপ স্বাদ ও শৈত্য; তথাপি উহারা এক জলেরই দুইটি গুণ। তারপর একই জল কখন তরল পানীয়, আবার কখন বাষ্প, কখন কঠিন বরফ হইয়া যায়, কিন্তু মূলে ও স্বরূপে সে জলই থাকে। জলে স্বাদ ও শৈত্যরূপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণের সমাবেশ অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ তরল বাষ্পীয় ও কঠিন রূপের সম্ভাব্যতা আমরা সহজে এবং নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। তাহার কারণ জলে এ-সব ভিন্ন গুণের ও বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভূতি আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম যে সগুণ ও নির্গুণ দুইই হইতে পারেন, তাহা আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না, কারণ সেইরূপ অনুভূতি আমাদের সচরাচর ও সকলের হয় না। যদি কেহ বলেন জল তো দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে তরলাদি রূপ ধারণ করে, একই দেশ কাল ও অবস্থায় তো সেরূপ হয় না, তাহার উত্তরে বলিব তত্ত্ব বা ব্রহ্মও অবস্থাভেদে সগুণ ও নির্গুণ হন। তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ম করেন, তখন তাঁহাকে সগুণ বলি; আবার যখন সে সব কর্ম হইতে বিরত হন ও স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তাঁহাকে নির্গুণ বলি। অথবা যেমন জলের অবস্থান্তরের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'জল তরল না কঠিন?'—এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় 'জল তরলও বটে, কঠিনও বটে,' তেমনি তত্ত্ব বা ব্রহ্মে জগদ্ব্যাপারের

ভাবাভাবের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে হয় 'ব্রহ্ম সগুণও বটে, নির্গুণও বটে'। কিন্তু জল ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জলকে একই অবস্থায়, একই দেশ-কালে তরল ও কঠিন বলা যায় না, ব্রহ্মকে একই কালে ও অবস্থায় সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আত্মাই ব্রহ্ম এবং আত্মাকে একই কালে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আমি যখন কোন কর্ম করি, তখন কর্ম-নিষ্পাদক হিসাবে আমি সক্রিয় ও সগুণ, কিন্তু ঐ কর্মের নিশ্চল দ্রষ্টা বা সাক্ষী হিসাবে আমার আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ।

আর এক তত্ত্বই যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায়, তাহা আমরা স্মৃতির সাহায্যে বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যে একই ব্যক্তি একই জগতের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে, তাহা স্মৃতি-সহায়ে বুঝা যায়। তেমনি নির্বিকল্প সমাধি হইতে সবিকল্প জ্ঞানে নামিয়া আসিলে অথবা সবিকল্প হইতে নির্বিকল্প জ্ঞানে উঠিলে পূর্বানুভূতির কিছু স্মৃতি বা বোধ থাকিয়া যায় এবং তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে উভয় জ্ঞানস্তরেই এক তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন দিক বা রূপের পরিচয় দেয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটিই একভাবে সত্য, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সত্যটিই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হইবে। এই ভাবে আমরা বিভিন্ন ও আপাত-বিরুদ্ধ দর্শনমতের একটা সঙ্গত সমন্বয় সাধন করিতে পারি এবং যে ভাবধারা দ্বারা তাহা সাধিত হইবে, তাহাকেই বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা বলা যাইবে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূলে এই ভাবধারা নিহিত আছে এবং তাহা পরিস্ফুট ও প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইবে। এখানে তাহার আভাস-মাত্র দেওয়া হইল।

Open your eyes and see Him. This is what Vedanta teaches. Give up the world which you have conjectured, because your conjecture was based upon a very partial experience, upon very poor reasoning, and upon your own weaknesses.

Swami Vivekananda in Jnana Yoga.

চিরকালের আশ্রয়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কোন নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণ মানুষের একটি সহজাত এবং প্রবল সংস্কার। ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটানো অপেক্ষা আমরা অনেক সময়ে এই চেষ্টাটিকেই অধিকতর জরুরী বলিয়া মনে করি। তীর্থ-দর্শনে বা কোন নূতন স্থানে বেড়াইতে গিয়া সর্বাগ্রে আমরা একটা 'ঠাঁই' খুঁজি। বলি, রোসো একটা থাকার জায়গা ঠিক করি আগে, তারপরে খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা।

রামবাবুর মনে বড় অশান্তি, যদিও মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেছে, ছেলেরা চাকরি করিতেছে, নিজেও এক বৎসর পেন্সন লইয়া দিনের পর দিন দশটা-পাঁচটা আফিসে কলম পিষিবার একঘেঁয়েমি ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অশান্তির কারণ, রামবাবু এখনও একটি স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করিতে পারেন নাই। "ভাড়াটে বাসায় থেকে কি সুখ আছে?"—রামবাবু নাক সিঁটকাইয়া বলেন। ভাড়াটে বাসা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাস, জল, বিদ্যুতের সর্বপ্রকার সুবিধাসংযুক্ত হইলেও রামবাবুর চোখে উহা একদিক দিয়া দুঃখকর। উহা 'নিজের' বাসা নয়। উহাতে রামবাবু তাঁহার 'মমত্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।

যে আশ্রয়ে নিজের পুরাপুরি অধিকার নাই, সে আশ্রয় তো নিরাপদ আশ্রয় নয়। যখন শিশু ছিলাম তখন হইতেই প্রাণে প্রাণে এই বোধ সঞ্চারিত হইয়াছে। তখন দুগ্ধপান অপেক্ষা মায়ের কোলে সংলগ্ন হওয়াটাই ছিল বেশী কাম্য। এক ঝুড়ি খেলনা, বড় রকমের খাওয়ার প্রলোভন, কাকীমা-জেঠিমা-দাদু-দিদিমার অজস্র আদর—কিছুই আমার ক্রন্দন থামাইতে পারিত না, যদি বুঝিতাম মাতৃ-ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শিশু-জগতের অসংখ্য সামগ্রী থাকিত একদিকে, আর আমার জননীর—হাত বাড়াইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লওয়া, লইয়া বুকে ধরিয়া রাখা থাকিত আর একদিকে। শেষেরটি ছিল আমার স্বতঃ-কাম্য, সর্বতোবরণীয় আকর্ষণ।

যখন মাটিতে পা ফেলিয়া আমরা চলি, তখন আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, মাটি আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই মাটি যদি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া উঠিতে বাধ্য। কী সর্বনাশ, যে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি, সেই মাটিই পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে! 'খাইব কি?', 'করিব কি?' প্রভৃতি প্রশ্নে যত না সঙ্কট ও বিপর্যয় ফুটিয়া উঠে, তদপেক্ষা বোধ করি অনেক বেশী বিপদ প্রকাশ পায় 'দাঁড়াইব কোথায়?' এই জিজ্ঞাসায়। দাঁড়ানো, আশ্রয়-লাভ, স্থায়ী হইয়া বসা—ইহা মানুষের জীবনের একটি অতি প্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

লৌকিক জীবন হইতে ধর্মজীবনেও এই সমস্যাটি সংক্রামিত হয়। বস্তুতঃ এক দিক দিয়া দেখিলে আমাদের যত কিছু ধর্মচর্যা, উহাদের অন্যতম লক্ষ্য একটি ভাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ—যে আশ্রয় নড়ে না, বদলায় না, ক্ষয় পায় না,—যে আশ্রয়ে আমরা কায়েমী হইয়া বসিতে পারি—যে আশ্রয়কে আমরা বরাবর আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারি। এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া

খুঁজিয়া ঐরূপ স্থায়ী নিবাস পাই না বলিয়াই তো আমরা স্বর্গের দিকে চাই, ভগবান হরির বৈকুণ্ঠলোকে যাইবার প্রত্যাশা রাখি। এই প্রকার বৃহৎ নিরাপদ আশ্রয়লাভের জন্যই আমরা পুণ্য কাজ করি, কত প্রলোভন, কত অধর্ম-আচরণ হইতে নিজেকে সংযত করি, কত কৃচ্ছ্রতা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও পূজার্চনা করি।

কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি স্বর্গে গতি লাভ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্বস্তও হই। আশ্রয়লাভের একটি মহত্তর এবং বিপুল-তর রূপ যেন এখন তাঁহার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মৃতের জন্য তাই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার স্বর্গে গতি হয়। এই গতি বা সুষ্ঠুতর আশ্রয়লাভ যেন মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। মানুষের অপর যাহা কিছু অন্বেষ্টব্য, তাহা যেন এই আশ্রয়-প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গে আশ্রয়লাভ ও ভগবানের সান্নিধ্য-লাভ এই দুইটির মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। স্বর্গের আশ্রয় চিরন্তন নয়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে গতি হয়, কিন্তু ঐ সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে জীবাত্মাকে আবার মর্ত্য-লোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। স্বর্গ পৃথিবীরই মতো একটি স্থান বিশেষ, অবশ্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক নিরাপদ, অনেক বাধাবিপত্তি-ঝঞ্ঝাট-শোক-দুঃখহীন। স্বর্গে দেবতারা থাকেন। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভোগ ওখানে করিতে পারা যায়। কিন্তু বিষয়ভোগ—তাহা যত স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্মই হউক—কখনও মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না। উহা আত্মাকে বাঁধে, উহা এক প্রকারের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব স্বর্গের দিকে তাকাইয়া স্বর্গের আশ্রয় লাভ করিয়াই আমাদের অন্বেষণ যেন ক্ষান্ত না হয়। স্বর্গের অপেক্ষাও উর্ধ্বতর আশ্রয় আমাদিগকে খুঁজিতে হইবে। সেই আশ্রয় শ্রীভগবানের সামীপ্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, এই পৃথিবীতে থাকিতে যদি শ্রীভগবানে মন স্থির করিতে পার, তাঁহাতে বুদ্ধি স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও যে, মৃত্যুর পরেও তাঁহা হইতে তুমি বিযুক্ত হইবে না, অকূলে ভাসিবে না, সেই শ্রীভগবান-রূপ পরম আশ্রয়েই তুমি বাস করিবে। (গীতা—১২।৮)

বস্তুতঃ বিশ্বাসী ভক্তের নিকট আশ্রয়লাভের সমস্যা চিরকালের জন্য মিটিয়া যায়। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, এই জীবনে যে ভগবানের শরণ লইয়াছি, তাঁহার স্মরণ মনন আরাধনা করিতেছি, তাঁহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতেছি, ইহা তো ছেলেখেলা নয়। ভগবান নিশ্চিতই সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, মৃত্যুর পরও এমনই ভাবে তাঁহার সহিত সংযোগ বজায় থাকিবে, তাঁহাকে ডাকিয়া চলিব, তাঁহাকে ভালবাসিয়া যাইব। এই জীবনে শ্রীভগবানই যেমন পরম আশ্রয়, এই জীবনের পরেও তিনিই পরম অবলম্বন থাকিবেন। তিনি যদি কাছে থাকেন, তাহা হইলে ভাবনা কিসের, দুঃখ কিসের?

এইরূপ ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'মরিতে ভয় হয় কি?' তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, 'না, মরিতে ভয় পাইব কেন? মৃত্যু অর্থে এই দেহটাই ছাড়িয়া যাওয়া, এই সংসারের খেলাঘর এবং কতকগুলি খেলনাই ফেলিয়া যাওয়া; কিন্তু জীবনের যিনি পরম প্রিয়, পরম অভয় তাঁহার সহিত তো ছাড়াছাড়ি হইবে না। তবে আর ভয় পাইবার কি আছে?'

আবার যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়,

'আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী আরও কত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সকলকে তো ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই পৃথিবীতে আপনার কত রকমের কাজ ছিল, কর্তব্য ছিল, গান-বাজনা ভালবাসিতেন, দেশভ্রমণের সখ ছিল, দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন—এ সবও তো মরিয়া গেলে আর করিতে পাইবেন না, তাহাতে কষ্ট হইবে না কি?' তাহা হইলে ভক্তটি নিশ্চিতই হাসিয়া বলিবেন, 'না, আমার কষ্ট হইবে না।' একের পিঠে শূন্য দিলে দশ হয়, দুটি শূন্য বসাইলে একশত হয়, তিনটি শূন্যে হাজার, আরও শূন্য বাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কও বাড়ে। কিন্তু শূন্যের আগেকার এককে যদি মুছিয়া ফেলি, তাহা হইলে শুধু শূন্য দিয়া কি অঙ্ক হয়? ভগবানই অঙ্কের এক। আর যাহা কিছু সব শূন্যের পর্যায়ের। ভগবান আছেন বলিয়াই অপর সব কিছুর মূল্য। ভগবানের মধ্যেই সব কিছু মূল্য ওতপ্রোত। তাঁহাকে যদি না হারাই, তাহা হইলে কিছুই হারাইবে না। তাঁহারই মধ্যে সব ভালবাসা, সব আকর্ষণ সব তৃপ্তি, সব সার্থকতা মিশিয়া আছে।

ভক্ত যখন বলেন, ভগবান আমার পরম আশ্রয়, তখন 'আশ্রয়' শব্দটির অর্থ তাঁহার নিকট আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র রকমে প্রতিভাত হয়। আশ্রয়-অর্থে শুধু বাসস্থান নয়, সকল প্রাপ্তব্য বিষয়ের, সকল অন্বেষণের পরাকাষ্ঠাও। ভগবান চিরকালের আশ্রয়, ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবানকে লাভ করিলে অনন্তকালের জন্য ছুটাছুটি, দাপাদাপি, অসহায় ক্রন্দন থামিয়া যায়। ক্ষয়হীন, হ্রাস-বৃদ্ধিহীন অস্তিত্ব শুধু নয়, অনন্ত আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তিও লাভ করা যায়। শিশুকাল হইতে আশ্রয় লাভ করিবার যে দুর্নিবার প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তির চরম পরিপূর্তি ঘটে তখনই, যখন আমরা ভগবানকে ধরিতে পারি। ভগবানকে আশ্রয় জানিয়া আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, এইবার গৃহের মতো গৃহ পাওয়া গিয়াছে, যথার্থ নিজের গৃহ—যে গৃহ হইতে কখনো বিচ্যুতি ঘটিবে না। যে গৃহের মধ্যে আমার যাহা কিছু দরকার, সব সুসজ্জিত আছে।

* * *

এই পৃথিবীর চাওয়া-পাওয়া লেনদেনের বাহিরে যাঁহার দৃষ্টি যায় না, তাঁহার নিকট চিরকালের আশ্রয় বলিয়া কিছু নাই। তিনি এই পৃথিবীতেই যতটা পারা যায়, নিরাপদ একটি আশ্রয়ের চেষ্টা করেন—নিজস্ব একটি উদ্যানবেষ্টিত, সুন্দর, বড়, সব রকমের সুবিধা-সমেত সুরক্ষিত সুপরিকল্পিত সুনির্মিত পাকা বাড়ি; বিশ্বাসী আত্মীয় এবং বন্ধুগণের সংস্পর্শ; ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা জমা অঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি এই পৃথিবীর আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে দুইটি পন্থার বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাকে হয় পরকালের দিকে তাকাইয়া পুণ্যকর্ম করিতে হয়, যাহাতে উহার ফলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারেন, অথবা ইহলোক-পরলোকের মালিক, জন্ম-মৃত্যু সুখদুঃখের বিধাতা, বিশ্বমূল, বিশ্বসার, করুণা-নিধান শ্রীভগবানকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই চিরকালের আশ্রয় বলিয়া জানিতে হয়।

তাঁহার পক্ষে আর একটি তৃতীয় পন্থাও সম্ভবপর—আত্মজ্ঞানের পথ। বেদে যেমন স্বর্গের কথা আছে, ভগবানের কথা আছে, তেমনি আত্মবিজ্ঞানেরও কথা আছে। স্বর্গ-রূপ আশ্রয় যদি চাও তো তাহার উপায় পুণ্যকর্ম। ভগবান-রূপ পরম আশ্রয় যদি অন্বেষণ কর তো সেই

আশ্রয়লাভের উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি। আর নিজের নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া উহাতেই যদি দাঁড়াইতে চাও তো তাহার উপায় হইল বেদান্ত-বিচার। শঙ্করাচার্য বলিতেছেন :

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু ॥
(বিবেকচূড়ামণি, ৪৫)

বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত সত্যসমূহের পর্যালোচনা ও গভীর অনুধ্যান দ্বারা আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। ঐ জ্ঞান হইলে সংসারের যাবতীয় দুঃখ চিরকালের জন্য মিটিয়া যায়।

ভক্ত যেমন ভগবানের মধ্যে সমুদয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার পর্যবসান দেখিতে পান, জ্ঞানী সেইরূপ তাঁহার নিজের চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভিতর সকল অন্বেষণের পরিসমাপ্তি খুঁজিয়া পান। তিনি দেখেন, আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭।২৫।২)

—আত্মাই নীচে, আত্মা উপরে, আত্মা পশ্চার্তে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই যাহা কিছু সব।

জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বিশ্বসংসারের আশ্রয় কি? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন, 'আমি'—দেহমনবদ্ধ ক্ষুদ্র 'আমি' নয়, চৈতন্যস্বরূপ সর্বব্যাপী ভূমা 'আমি'। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি মরিতে ভয় পান? —তিনি অবিলম্বে বলেন, না, ভয় কিসের? আমার প্রকৃত স্বরূপের তো আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। আমি তো চিরকাল থাকিব—যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু মঙ্গল, সুন্দর উহাদের সহিত এক হইয়া থাকিব। আমিই যে আমার চিরকালের আশ্রয়।

ভক্তের নিকট ভগবান যেমন কথার কথা নয়, তাঁহার বিশ্বাস ও ভালবাসার অপ্রত্যাখ্যেয় সম্পদ্, তাঁহার প্রাণের প্রাণ, আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষা; জ্ঞানীর নিকটও তাঁহার আত্মস্বরূপ সেইরূপ সুস্পষ্ট নিঃসন্দিগ্ধ সতত-প্রত্যক্ষ সত্য। ভক্ত ও জ্ঞানী দুই বিভিন্ন পথ দিয়া একই সত্যে পৌঁছিয়াছেন—যেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, সন্তাপ নাই ক্ষুদ্রতা নাই, বন্ধন নাই। তথায় আলো, কেবলই আলো—আনন্দ, কেবলই আনন্দ। ঐ সত্যই আমাদের চিরকালের আশ্রয়—ভক্তি-দৃষ্টিতে ভগবান, জ্ঞান-দৃষ্টিতে আমাদের আত্মস্বরূপ।

আমরা যেন এই আশ্রয়ের মূল্য বুঝিতে পারি, এই আশ্রয়কে এই জীবনেই লাভ করিতে পারি। এই পরম আশ্রয়—প্রেমময় ভগবান —আমাদের আপন ভাস্বর চৈতন্যস্বরূপ—যিনি সর্বদা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের তো হুঁশ নাই। আমরা বালুকার উপর ঘর বাঁধিতে ব্যস্ত, ভিখারীর মতো দ্বারে দ্বারে কানা কড়ি ভিক্ষা করিতে তৎপর। আমাদের মূর্খতা দূর হউক, শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, চিরকালের আশ্রয়ের প্রতি হৃদয় উন্মুখ হউক।

স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

স্বাধীন ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্যাই আমাদের নিকট অন্যতম প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। জাতীয় সরকারের নিকট আমরা যেরূপ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আশা করি দৈহিক দিক্ থেকে, সেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থাও আশা করি মানসিক দিক্ থেকে সমভাবে। সেজন্য আজ স্বাধীন ভারতে, নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, দেশনায়ক সমাজ-সেবক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই জনশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সকলেরই দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হয়েছে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতি। স্বাধীন দেশের নূতন নাগরিক গঠনের দিক্ থেকে যে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী পূর্ণাঙ্গ নয়—সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু কি উপায়ে সেই পরিবর্তন সাধিত হ'লে সত্যই তা প্রকৃত পূর্ণতা ও অভ্যুন্নতির জনক হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ও মতভেদের উদ্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তে পারিনি ব'লে স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনের পুণ্য কার্য আজও সমাপ্ত হ'তে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের স্থির ক'রে নিতে হবে যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি; তার পরে শিক্ষার প্রণালী আপনিই স্থির হ'য়ে যাবে। আজ পর্যন্ত সাধারণতঃ শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি কেবলই পুঁথিগত বিদ্যা, কেবলই পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া; এবং শিক্ষার লক্ষ্য বলতেও বুঝি কেবলই চাকরি-লাভ; কেবলই অর্থনৈতিক উন্নতি। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আমাদের শিক্ষানীতি আজও পরিচালিত হচ্ছে ব'লে শিক্ষা যেন হ'য়ে রয়েছে একটি বাইরের জিনিস, একটি চাকচিক্যময় আভরণ অথবা আবরণই মাত্র; অন্তরের অন্তঃস্থলে তার সঞ্জীবনী স্পর্শ আজও আমরা অনুভব ক'রে ধন্য হ'তে পারছি না; তার স্বুবর্ণ আলোকচ্ছটা আজও আমাদের তমসাচ্ছন্ন মনোমন্দিরকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলতে পারছে না। এর অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-তত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথও একবার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন:

"আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী-গুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।"

শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে এরূপ শোচনীয় সম্পর্কহীনতা দূর করবার জন্য, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির ক'রে নিতে হবে; তারপর শিক্ষার উপায় বা পদ্ধতি আপনিই নির্দিষ্ট হ'য়ে যাবে। এই বিষয়ে অবশ্য আমাদের নূতন তত্ত্ব কিছুই আবিষ্কার

করতে হবে না, পরের দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে উপস্থিতও হ'তে হবে না—কেবল একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও বরণ ক'রে নিতে হবে আমাদেরই অতি নিজস্ব শাশ্বত আদর্শকে, আমাদের বদ্ধ জীবনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে সাদরে আহ্বান ক'রে নিতে হবে প্রকৃত প্রজ্ঞার সেই আলোককে, যার দ্যুতিতে একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। সেজন্যই সেই যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা শিক্ষার তথা মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করেছিলেন 'ভূমা' লাভকে :

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি,
ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

—যা ভূমা, যা বিরাট ও মহান্, কেবল তাই সুখ; যা অল্প, যা ক্ষুদ্র ও তাতে সুখ নেই; একমাত্র ভূমাই সুখ, একমাত্র ভূমাকেই জানতে ইচ্ছা করবে। ৭।২৩।১

এর অর্থ হ'ল কেবল এই যে, মনুষ্যত্বের মহিমা, সমগ্র সত্তার পূর্ণতম বিকাশই হ'ল মানবজীবনের, তথা শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এরূপে ভারতীয় মতে, বিদ্যা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে চাকরি-লাভ বা ধনার্জন-মাত্রই নয়; এর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল আত্মোপলব্ধি, আত্মোন্নতি, আত্মবিকাশ। এরূপ আত্মবিকাশের অর্থ হ'ল : মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্বের, তার সমগ্র সত্তার সর্বতোমুখী বিকাশ। শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হচ্ছে না বলেই আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও মানুষের মতো মানুষের দর্শনলাভ অতি বিরল। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পুনরায় বলি :

"অতএব চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকার বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"

এরূপে যদি আমরা মনুষ্যত্ব-লাভকেই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করি, তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতিও হওয়া কর্তব্য কেবল পুঁথিগত-বিদ্যা-শিক্ষা-পদ্ধতির স্থলে নীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-পদ্ধতি। বর্তমান অত্যুগ্র রকম বিজ্ঞানের যুগে, জড়বাদের যুগে, বস্তুতন্ত্রবাদের যুগে নীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আমরা যেন অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে রেখেছি শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু যদি অচিরে এরূপ জড়বাদের স্থলে অধ্যাত্মবাদকে, বস্তুতন্ত্রবাদের স্থলে আদর্শ-বাদকে, অর্থনৈতিক উন্নতির স্থলে নৈতিক অভ্যুন্নতিকে আমরা স্থাপিত করতে না পারি, তবে কোন শিক্ষা-প্রণালীই যে ফলপ্রসূ হবে না, তা সুনিশ্চিত।

প্রথমতঃ নীতিমূলক শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে বিশেষভাবে প্রয়োজন এইজন্য যে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'Intellect' ও 'Morality' বা বিদ্যাবুদ্ধি ও নীতিবোধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, তা প্রায় বিলুপ্তই হ'তে চলেছে বর্তমান জগতে। সেই জন্যই দেখা যাচ্ছে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরদেশে আরোহণ করেও, 'জ্ঞানিগুণিগণ'—সজ্জনরূপে পরিচিত হ'তে পারছেন না। তার কারণ হ'ল এই যে, যে তত্ত্বজ্ঞান-লাভে তাঁরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, সেই জ্ঞানকে পুণ্য ও নিষ্কাম কর্মে পরিণত ও প্রকাশ করা তাঁদের সাধ্যায়ত্ত যেন নয়। এরূপে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ক্রমশঃ

দেখা দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড ব্যবধান। কিন্তু সত্য যদি সত্তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচরণকেও উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলতে না পারে স্বীয় আলোকচ্ছটায়, তাহলে তার আর সার্থকতা কি? সেজন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ও নীতি, জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ ছিল অবিচ্ছেদ্য। দ্বাদশবর্ষব্যাপী উচ্চতম ও অশেষ প্রকারের জ্ঞান লাভ ক'রে ছাত্র যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু হতেন, তখন সমাবর্তন-কালে গুরু তাঁকে সরলতম নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দান ক'রে বলতেন:

"সত্যং বদ, ধর্মং চর।......
মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব।......
শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যে জ্ঞানলাভে তুমি ধন্য হয়েছ, সেই জ্ঞান যেন নিষ্ফলে না যায়। যেমন বৃক্ষের সার্থকতা সুমিষ্ট ফলে, তেমনি জ্ঞানেরও সার্থকতা সুমিষ্ট কর্মে। সেজন্যই সত্যকথন, ধর্মাচরণ, মাতাপিতৃভক্তি, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান প্রভৃতি সাধারণ কর্মেই তো হবে প্রাপ্ত ও আহৃত জ্ঞানের পরীক্ষা; এবং এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে, জ্ঞান থাকবে চিরকাল প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে, আমাদের একটি আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় আভরণস্বরূপই মাত্র হ'য়ে

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের প্রস্তাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হয়তো অনেকেই বিস্মিত হবেন। কিন্তু ধর্ম ও সম্প্রদায়, তত্ত্ব ও গোঁড়ামি নিশ্চয়ই এক নয়। সেজন্য প্রকৃত ধর্মতত্ত্বশিক্ষা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির জনক নয়। ধর্মের অতি সুন্দর সংজ্ঞাদান ক'রে মহাভারত বলছেন:

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়॥

অর্থাৎ যা আমাদের ধারণ করে, তাই হ'ল ধর্ম।

এরূপে মহত্ত্বের দিকে, পূর্ণতার দিকে, প্রবৃদ্ধির দিকে, পরিব্যাপ্তির দিকে যুগে যুগে মানবজীবনের যে অভিযান, তাই হ'ল ধর্মের মূল কথা। এই মূল কথাকেই আজ পুনরায় নির্ভয়ে স্থাপনা করতে হবে আমাদের জীবনের অন্তঃস্থলে।

তৃতীয়তঃ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হ'ল আত্মার সংস্কার করা,—যে মলিনতা, ক্লেদ, অন্ধকার আমার অমৃত, আলোক-স্বরূপ আত্মাকে বর্তমানে আবৃত ক'রে রেখেছে, তারই সংস্কার সাধন করা। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, সেবাপ্রমুখ সদ্‌গুণ ও সৎকর্মসমূহ আমাদেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত হ'য়ে রয়েছে—তাদেরই পুনরায় ভাস্বর ক'রে তুলতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর উপমার সাহায্যে একবার বলেছিলেন:

আমাদের অন্তঃস্থ দিব্যালোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবৃত হ'য়ে থাকে। লৌহ-পেটিকার মধ্যস্থিত প্রদীপের রশ্মি যেমন বাইরে থেকে দেখা যায় না, মানবের সত্তাগত জ্ঞানালোকও ঠিক তাই। পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার সাহায্যে আমরা ক্রমশঃ সেই অস্বচ্ছ আবরণকে স্বচ্ছ ক'রে তুলতে পারি।

এরূপে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা হবে বাইরে থেকে চাপানো বা অধ্যস্ত শিক্ষা নয়, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা; নূতন গুণের সৃষ্টি নয়, পূর্ব-নিহিত গুণেরই প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় পুনরায় বলি:

কেহ কোনদিনই অন্যের দ্বারা শিক্ষিত হয়নি। প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান করেছে। বাহিরের শিক্ষক অন্তরের প্রকৃত

শিক্ষককে জাগ্রত করবার উপায়-স্বরূপই মাত্র—অন্তরের এই শিক্ষকই প্রকৃতকল্পে জ্ঞানদাতা।

এইভাবে স্বাধীন ভারতের সত্য-শিক্ষার তিনটি মূল স্তম্ভ হ'ল—নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি। সত্য তো হ'ল এই তিনটির সমন্বয়ই মাত্র—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির,—নীতিরূপ কর্ম, ধর্মরূপ ভক্তি, সংস্কৃতিরূপ জ্ঞানের—একটি অপূর্ব মিলনই মাত্র। যে পুণ্যভূমি ভারতের মূল মন্ত্র হ'ল 'সত্যমেব জয়তে'—সেই ভারতে এই সত্যকেই আশ্রয় ক'রে আমরাও যেন আজ সেই বৈদিক প্রার্থনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করতে পারি :

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

—অসত্য থেকে আমাদের সত্য নিয়ে যাও ;
অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকে নিয়ে যাও ;
মৃত্যু থেকে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী যমুনা দেবী

আদিম বাসনা কবে
রচেছিল মানবের ঘর ;
পার্থিব চেতনা মাঝে
এনেছিল নব রূপান্তর ?
জ্যোতির অলকানন্দা
নেমেছিল কার হৃদিপুরে ;
চৈতন্যের দিব্যদ্যুতি
ছুঁয়েছিল সঙ্গীতের সুরে ?
উষার প্রথম ছন্দে
গেয়েছিল কোন্ কবি গান ;
শাশ্বতের বাণী তার
অন্তরেতে পেয়েছিল স্থান ?

ধরণী কি ভুলে গেছে
মানুষের জন্ম-ইতিহাস ;
কাহার উদার বীর্যে
জেগেছিল প্রথম নিঃশ্বাস ?
অতীতের সেই স্মৃতি
কোথা আজ বিস্মৃতির তলে ;
কার মনে কোন্ বনে
বসন্তের কোন্ পুষ্পদলে ?
ধ্যানের প্রশান্তি মাঝে
সমাধি-বিলীন কোন্ জন,
এ সৃষ্টির সাক্ষী রূপে
নিত্য জাগি আছে চিরন্তন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

বীরপূজা মানুষের সহজাত ধর্ম। যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, সুন্দর ও শক্তিমান্, তাহা সেই সুন্দরতম সর্বশক্তিমান্ ভগবানেরই বিশেষ প্রকাশ। গীতার বিভূতিযোগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

—তাই মানবমনে তাহার আবেদন নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। এই বীরপূজার নামই আদর্শনিষ্ঠা, যাহা যোগায় তদনুযায়ী আত্মোন্নতির প্রেরণা। আদর্শনিষ্ঠারূপ ভিত্তির উপরই তুলিতে হয় সার্থক জীবনের সৌধ; আদর্শ-বিহীন অপরিকল্পিত জীবন বৈশিষ্ট্যহীন কতকগুলি দিন-মাস-বৎসরের সমষ্টিমাত্র। আজ আমরা যে বীরের আলোচনা করিতেছি, তিনি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত সংস্কারমুক্ত ভাবধারার জন্য সর্বজনীন আদর্শরূপে যিনি জগদ্বরেণ্য।

যুগপ্রয়োজনে সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য উপযুক্ত শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে—একথা একটি ঐতিহাসিক সত্য। প্রাণহীন বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাবে যাগ-যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে বদ্ধ কোটি কোটি প্রাণীর করুণ আর্তনাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন করুণাবতার ভগবান্ তথাগত। বৌদ্ধধর্মের পতনে কাপালিকতা ও আভিচারিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে তাহার কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন জ্ঞানাবতার আচার্য শঙ্কর। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নিগড়ে ও বিধর্মীর অত্যাচারে কণ্ঠাগতপ্রাণ ধর্মের রক্ষার জন্য বঙ্গ-মনের আকুতি শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারে মূর্ত হইয়া উঠিলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। উনবিংশ শতকের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে যখন পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য ভাবধারার প্লাবনে দেশ প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন আসিয়া দাঁড়াইলেন মহামনীষী রামমোহন। উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সমবায়ে জন্ম লইল ব্রাহ্ম সমাজ, বিপর্যয়ের মুখ হইতে দেশের রক্ষায় যাহার দান অপরিসীম। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের আবেদন শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাহা শহর ছাড়িয়া পল্লীভারতে পৌঁছিতে পারিল না; মিটিল না তাহার দ্বারা দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন। ফলে প্রাথমিক স্রোতোবেগ প্রতিহত হইলেও সমস্যার সমাধান হইল না, প্রয়োজন হইল সমন্বয়-পন্থী বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাতজাত এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—প্রাচ্যের সাধনার সহিত পাশ্চাত্যের মনীষার অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীকরূপে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ-আত্মা, দুই বিচ্ছিন্ন শক্তির সমাবেশ নহেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে স্থৈতিক শক্তি বা Potential energy ও গতিশক্তি বা Kinetic energy উভয়ে যেরূপ স্বরূপতঃ এক, শুধু প্রয়োজনানুরোধে প্রকাশ-ভঙ্গির বৈচিত্র্য; রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ঠিক সেইরূপ। আরও সরলভাবে বলা যায়,

রামকৃষ্ণ যেন ভাব, আর বিবেকানন্দ তার ব্যাখ্যা—সম্প্রসারণ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু সহজে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের পাদমূলে নিজের ব্যক্তিত্ব বিলাইয়া দেন নাই। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক যুগের প্রতীকরূপে নানারূপ পরীক্ষা-সমীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তি যখন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাঁহার জীবনস্রোত সেই করুণাগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া লোক-কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবাহিত হইতে থাকে। কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় রোগশয্যাশায়ী শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন মনে করাইয়া দেয় গীতায় শ্রীভগবানের কাছে অর্জুনের আত্মসমর্পণের কথা:

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এই বিশেষ তাৎপর্য- ও সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা-প্রসঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার লেশ-মাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল।

তারপর? তারপর গঙ্গাযমুনার মিলনে যে প্রবল স্রোতস্বতীর সৃষ্টি হইল, তাহাকে রোধ করে কাহার সাধ্য? ভূমানন্দের আস্বাদ যে পাইয়াছে, ক্ষুদ্রানন্দের সাধ্য কি তাহাকে ধরিয়া রাখে? সংসার-সুখের প্রলোভন, পরিবার-পরিজনের চিন্তা, জননীর অশ্রুজল—কিছুই তো আর তাহাকে ঠেকাইতে পারে না। ফলে—'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'; নরেন্দ্রনাথের উদ্বর্তন ঘটিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দে—'আত্মনো মোক্ষার্থম্' নয়, 'জগদ্ধিতায়'।

স্বামীজীর বিচিত্র জীবনকে ইংরেজ কবি শেলীর ভাষায় বলা যায়: A dome of many-coloured light—অর্থাৎ আলোর বিবিধ বর্ণ বিচ্ছুরণকারী স্ফটিকাবরণ। এই বিবিধবর্ণের উৎসরূপে কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে—ধর্মের দীপশিখা। তাঁহার এই জীবনচ্ছটার কয়েকটিমাত্র রশ্মির বিষয় এখানে আলোচনা করিব।

সমন্বয়ী ধর্মের প্রচারক

প্রথমেই আমরা স্বামীজীকে দেখিতে পাই ভারতের সমন্বয়ী আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবকরূপে। ভারতেতিহাসের সূচনা হইতে রাজনৈতিক কীর্তিকাহিনীর বহিরঙ্গ কাঠামোর অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তার সমন্বয়ী আর্যধর্মের ধারা—বহুর মধ্যে একের সাধনা। এই সমন্বয়ী ধর্মের প্রভাবে শুধু আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশান, হুন, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলিও সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বহুল-প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। খৃঃ দশম শতকের পর মুসলমান বিজয়কালে এই সমন্বয়ী ধর্ম সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবার তাহার উজ্জীবনের জন্য আবির্ভূত হন রামানন্দ, কবীর, নানক ও নিমাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে মূল সুর আবার হারাইয়া যায়। তারপর আসিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্ঘাত এবং তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, যাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। এই সময়ে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মন্ত্রে দীক্ষিত বিবেকানন্দ এই মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়া ভারতের সমন্বয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবন করিলেন। এবার আর এ ধর্ম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; স্বামীজীর নেতৃত্বে চলিল তাহার বিজয় অভিযান দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মকে আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে মুক্ত করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সহনশীল করিয়া তুলিবার জন্য, তাহাদের আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্ঝটিকা-মুক্ত করিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্য, সর্বপ্রকার সীমার মাঝে অসীমের যে সুর বাজিতেছে, তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে এমন এক সর্বজনীন দার্শনিক মতবাদের সাধারণ ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান জানাইলেন, যে-মতবাদ মানুষের সত্যানুভূতির ও সুসংবদ্ধ চিন্তাশক্তির মহত্তম বিকাশ। 'বেদান্তবাদ' নামে পরিচিত এই জ্ঞানরাশি স্বকীয় মহিমায় ও তাঁহার প্রচেষ্টায় সমগ্র সত্য জগতে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিভিন্ন ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন করিয়া উৎসরূপে তাহাদের মধ্যে সঞ্জীবনী রসের সঞ্চার করিতেছে। আধুনিক কালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনীষী টয়েনবী বলিয়াছেন:

> The spirit of Indian religions, blowing where it listeth, may perhaps help to winnow the traditional Pharisaism out of Muslim, Christian and Jewish hearts.

—অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মের ভাবধারার স্পর্শে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীদের হৃদয় হইতে আত্মকেন্দ্রিকতার অপসরণ সম্ভবপর। টয়েনবীর আশার সফলতা নির্ভর করিতেছে স্বামীজীর নেতৃত্বে আরব্ধ সমন্বয়ী ধর্মের এই অভিযানের উপর। শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে দণ্ডায়মান ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসী প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া আমেরিকাবাসিগণকে 'ভাই ও ভগিনীগণ' বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাও এই মনোভাবেরই সার্থক প্রয়োগ এবং আমার বিশ্বাস, এই ঐতিহাসিক সম্বোধনের উচ্চারণ-জাত তরঙ্গ অনুক্ষণ সক্রিয় থাকিয়া এই বিশ্বকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

ধর্মজগতে এই সমন্বয়-অভিযান ছাড়া বর্তমান আদর্শ-বিপর্যয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিপরীতমুখী আদর্শের মধ্যে স্বামীজীর প্রচেষ্টায় রচিত হইতে চলিয়াছে সমন্বয়ের মহাসেতু, অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—কিপ্লিং-এর উক্তি: 'East is East and West is West; never the twain shall meet'—অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্; এই দুই-এর মধ্যে কখনও মিলন হইবে না। স্বামীজীর শিক্ষায় আজ ভারত বুঝিয়াছে তাহার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের বলিষ্ঠ মিলনের অপরিহার্যতা, আর পাশ্চাত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহার উন্নত ব্যাবহারিক জীবনে দিব্য পিপাসার ('Divine dis-content'-এর) শান্তিবিধানের প্রয়োজনীয়তা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে হইলে 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ'; এবং মানুষকে হইতে হইবে, কবি Words-worth-এর ভাষায়, 'True to the kindred points of heaven and home'—অর্থাৎ স্বর্গ-সন্ধানী, কিন্তু সংসার-সচেতন। তাই আজ ভারত চায় বিবেকানন্দকে তাহার আধ্যাত্মি-কতাকে ব্যবহারমুখী করিবার জন্য, আর পাশ্চাত্য

জগৎ তাঁহাকে চায় তাহার ব্যাবহারিক বা পার্থিব জীবনকে শুদ্ধ, সংস্কৃত ও ঊর্ধ্বগামী করিবার জন্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের এই যে সমন্বয়, তাহা রূপ পরিগ্রহ করিবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে,—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,—এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে', গাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু দেশের ভিত্তিতে নয়, কালের ভিত্তিতেও এই সমন্বয়ী ধর্ম আজ সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল। আদর্শগত বিপ্লবের জন্য অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও ছিল না ক্রমবিকাশের সূত্র। 'উদ্বোধনের' ভাদ্র (১৩৬৬) সংখ্যায় 'কথাপ্রসঙ্গে' এই আদর্শ-বিপর্যয় 'মানসিক স্তরচ্যুতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একমাত্র স্বামীজীর সমন্বয়ী ধর্মের প্রভাবেই স্তরচ্যুত মানবের মানসিক পুনর্বাসন সম্ভব এবং তার চিহ্নও সুস্পষ্ট। তাঁহার শিক্ষায় সভ্য ও চিন্তাশীল জাতি বা মানবমাত্রেই আজ বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে অতীতের প্রান্তভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে বর্তমানের আলোকস্তম্ভ, যাহার উজ্জ্বলজ্যোতি দিক নির্দেশ করিবে ভবিষ্যৎ মহামানবতার দিগ্বিজয়-অভিযানের।

আমরা স্বামীজীকে দেখি মনুষ্যত্বের উদ্বোধকরূপে। তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে লীন থাকিতে চাহিলে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুই এত স্বার্থপর, নিজের মুক্তি খুঁজছিস্! ওরে, তোর মুখ চেয়ে যে কোটি কোটি মানুষ বসে আছে।' এইখানেই জন্ম হইল মানবধর্মী বিবেকানন্দের; অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত গুরুর মুখে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, লীলার মধ্যেই নিত্যের প্রকাশ। তাই শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের করুণা লইয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন: জীবের কল্যাণের জন্য এই দুঃখময় সংসারে হাজার বার জন্মগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এই রোগ-শোক-অজ্ঞতা-অভাবক্লিষ্ট জীবগণই আমার উপাস্য দেবতা, সর্বজাতির দুষ্ট ও দুর্বৃত্তগণই আমার আরাধ্য ঈশ্বর। শুধু সঙ্কল্প গ্রহণ নয়, অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে তিনি মানবমনের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সমর্থ করিবার জন্য মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, আত্মায় আত্মায় প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—এক কথায় মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন এবং কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন জ্ঞান ও প্রেমের, তথা সেবাধর্মের মহাবাণী:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

তাঁহার এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠায়, যাহা অরণ্যচারী পর্বতগুহাবাসী মায়ামমতাহীন সন্ন্যাসীকে টানিয়া আনিয়াছে জীবসেবায় লোকালয়ে, ত্যাগের সহিত ঘটাইয়াছে সেবার অপূর্ব সমন্বয়।

সমাজ-দর্শনের ব্যাখ্যাতা

মার্ক্স-এর সমাজদর্শনে ধর্মের স্থান নাই; কারণ তাঁহার মতে ধর্মের উৎপত্তি ভয় হইতে ও শোষণের যন্ত্ররূপে এবং যেহেতু তাঁহার পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজ হইবে শোষণহীন, সেই হেতু শোষণের যন্ত্রস্বরূপ ধর্মের স্থান সেই

সমাজে থাকিতে পারে না। কিন্তু স্বামীজীর সমাজ-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ তাহাতে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে ও স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসার যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষের ধর্মচেতনার উৎপত্তি ভয় হইতে তো নয়ই, বরঞ্চ তাহা মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহার প্রভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে সে পায় তাহার পরম দেবতার সন্ধান। এই যে স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা বা ধর্ম, তাহা কখনও শোষণের যন্ত্র হইতে পারে না। যখনই প্রকৃত ধর্মের অভাব ঘটে, তখনই হয় অচলায়তন-রূপ বিশেষ বিশেষ সুবিধাবাদ বা Privilege-এর সৃষ্টি এবং তাহাই হইয়া উঠে ধর্মনামে ভয়ের কারণ ও শোষণের যন্ত্র। প্রকৃত ধর্ম শোষণের নয়, শোষণ-অবসানের উপায় এবং সেইজন্যই দেখা যায় ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভেদ-বৈষম্যের নিগড় ভাঙিয়া ফেলিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তাই বিবেকানন্দ পরিকল্পিত সভ্যসমাজের ভিত্তি ধর্ম। এই সমাজের সাধারণ মানুষও দেবভাব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে; কারণ তাঁহার মতে—মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা স্বতই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাশের নামই সভ্যতা, 'Civilization is the manifestation of the spirituality in man'. সামাজিক উদারতা ও প্রীতির বন্ধন মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার বিকাশের উপরই নির্ভরশীল।

দেশপ্রেমিক স্বামীজী

গুরুর নির্দেশে শিবজ্ঞানে জীবের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বামীজী পরাধীন মাতৃভূমির—দুর্গত দেশবাসীর সেবাকেই তাঁহার সেবাব্রতের প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিলেন। পরিব্রাজক-রূপে সমগ্র ভারত পরিক্রমা দ্বারা পরাধীন দেশবাসীর অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা দৃষ্টিগোচর করিয়া তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলাসনে ধ্যানমগ্ন যোগীর অন্তরে ভাসিয়া উঠিল শাশ্বত ভারতের মহিমময়ী মূর্তি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিল উদাত্ত ঘোষণা: 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন।'

দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা স্বামীজীর কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়মাত্র ছিল না, এজন্য তিনি মর্মে মর্মে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন। দেশবাসীর দারিদ্র্যস্মরণে আমেরিকার ধনকুবেরগণের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যাও তাঁহার নিকট কণ্টকশয়নবৎ প্রতীয়মান হইত, তিনি গৃহতলে পতিত হইয়া হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন এই দেশপ্রেমের তুলনা কোথায়?

ঝঞ্ঝার মতো তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতৃভূমি—তাঁহার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী—তাঁহার চিত্তপটে ছিল অনুক্ষণ জাগরূক। শুধু ভাবাবেগই নহে, তাঁহারই জীবন হইতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন পাইয়াছিল প্রত্যক্ষ প্রেরণা; তাঁহারই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সৈন্যগণ; তাঁহারই সাধনায় মেষত্বপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র শাবক ভারতবাসীর জীবনমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহার স্বস্বরূপের প্রতিচ্ছবি।

দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁহার ছিল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এবং তদনুযায়ী

দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের আলোকে দেশের প্রাণহীন আচারসর্বস্ব আধ্যাত্মিকতাকে কলুষ-মুক্ত করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত করিতে, জাতির কূপমণ্ডুকতা দূর করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ের দ্বারা জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে এবং শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা দুর্বলকে প্রবলের শোষণ হইতে মুক্ত করিতে ও নারীজাতির যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হউক বা না হউক, স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রায় আবার তাহাই করিবে পথ-নির্দেশ, তাহাই করিবে স্তিমিত গতিতে বেগের সঞ্চার

মুমূর্ষু মাতৃভূমির ধমনীতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলার মধ্যেই কেবল তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল না। দেশের সুযোগ্য সন্তানরূপে আমেরিকা হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীব্যাপী বিজয়-অভিযানের দ্বারা তিনিই সর্বাগ্রে দীনা ভারতজননীকে মহিমময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন জগৎসভায় সম্মানের উচ্চাসনে। তাঁহার বিদেশ-যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: 'বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা ইহাই সর্ব-প্রথম সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয় যে, ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জাগে নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও তাহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।'

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিক্ষা-বিদ্‌গণ প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, তদনুসারে আধুনিক কালে শিক্ষা বলিতে বুঝায়—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরি-স্ফুরণ। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন: মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা, 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' এই শিক্ষাদর্শ নির্দেশ করিতেছে—মানুষের আত্মোন্নতির এক অনন্ত পথ, যেহেতু মানুষের অভ্যন্তরস্থ পূর্ণতার বিকাশ যতই বিরাট হউক না কেন, বস্তু- ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক (objective & subjective) জগৎ অতিক্রম করিয়া উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সেই আদর্শে পরিচালিত হইতেছে না। লর্ড মেকলে-দ্বারা কেরানি-তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে এবং একটু আধটু পরিবর্তনের ভিতর দিয়া এখনও চলিতেছে। স্বামীজীর ভাষায় এই শিক্ষাব্যবস্থায় হাতুড়িপেটা করিয়া শিশুর মস্তিষ্কে বিভিন্ন-বিষয়ক তথ্যরাশি প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয় এবং অজীর্ণ অবস্থায় তাহা তথায় ঘুরপাক খাইতে থাকে। স্বামীজীই জানাইলেন, Man-making education অর্থাৎ মানুষ তৈয়ার করিতে পারে—এমন শিক্ষার দাবি। দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, 'শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকর জ্ঞান অর্জন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেষণ করে, তাহা নহে।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে তাহার মূলমন্ত্র।' তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক এবং শারীরিক শিক্ষারও ইঙ্গিত দিতেছেন এবং চরিত্রগঠন ও সংযমশিক্ষার জন্য ধর্মকে প্রধান স্থান দিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কল্যাণমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

কিন্তু স্বাধীন ভারতেও স্বামীজী-প্রদর্শিত এই শিক্ষাদর্শ এখনও গৃহীত হয় নাই। শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করার জন্য কিছুটা প্রয়াস হইতেছে বটে, কিন্তু গতি মন্থর ও পরিকল্পনা বিতর্কের বিষয়ীভূত। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত হয় নাই। সবল দেহই সুস্থ মনের ধারক ও বাহক। স্বামীজী দুর্বলতাকেই পাপ মনে করিতেন। শরীরচর্চা ও খেলাধূলা কেবল শারীরিক পটুত্বলাভের উপায় নহে, পরন্তু শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তাহাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী করিবার পক্ষেও তাহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই ক্রীড়াক্ষেত্র বা ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের অবসরকালীন জীবনধারা সুস্থ ও আনন্দময় খাতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগের অভাবে পূতিগন্ধময় খানা-ডোবার সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার জন্য স্বামীজীর যে সুস্পষ্ট নির্দেশ, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শ্রীপ্রকাশ-কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও তাহার সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণই জানেন। 'ধর্ম' বলিতে স্বামীজী কোন সাম্প্রদায়িক আচারসর্বস্ব ধর্মের কথা বলেন নাই; বলিয়াছেন—উপনিষদের আত্মতত্ত্বের কথা, যাহা মানুষের হৃদয় হইতে সকল প্রকার দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে সক্ষম। এই ধর্মকে বলা যায় মানব-ধর্ম। রাষ্ট্র সাধারণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হইলেও মানবধর্ম-নিরপেক্ষ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই মানব-ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দিলে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হইতে পারে না, বরং ঐ শিক্ষা দেশবাসীকে উদার করিয়া সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবে।

বর্তমানে ছাত্রমহলে একটা অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার ভাব এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা জাতীয় সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। স্বামীজীর সুনিশ্চিত অভিমত অনুযায়ী ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দিলে তাহা শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্থাপনের দ্বারা তাহাদিগকে চরিত্রবান্‌, সংযত ও নিয়মানুবর্তী হইতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

এ বিষয়ে কেবল রাষ্ট্রকে দায়ী করিলে বা কেবল রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও এ-বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে। পারিবারিক শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তি, যাহার উপর রচিত হয় জীবনের কাঠামো। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কয়েকটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম ছাড়া আজকাল অধিকাংশ পরিবারেই সন্তানগণের ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। হয় উদাসীন, না হয় অতিমাত্রায় সংসারব্যস্ত আমাদের মতো পিতা-মাতা বা অভিভাবক-

বর্গের নিজেদের চালচলনই যে অনেক ক্ষেত্রে সন্তানদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্থাপন করে না, একথা রূঢ় শুনাইলেও সত্য। ঠাকুরমা-ঠাকুরদার দলও আজকাল আর পৌত্র বা পৌত্রীকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য নিয়োগ করেন না। এই সব কারণে বালক-বালিকারা সর্বপ্রকার উচ্চ সংস্কার, মহৎ আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণায় বঞ্চিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল আরণ্য মনোবৃত্তি লইয়া বাড়িয়া উঠে এবং যখন তাহারা শিক্ষার্থীরূপে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের আগাছা-পূর্ণ মনের অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করা বিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অসংযম ও বিশৃঙ্খলার আতিশয্য এই মৌলিক অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

যুগাচার্যের নির্দেশিত পথে নিজ নিজ সন্তানদের মধ্যে উদার ধর্মীয় সংস্কার, আদর্শবাদ ও সামাজিক মূল্যবোধ ফুটাইয়া তুলিতে যদি পিতামাতারা সচেষ্ট হন, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিক্ষার্থীরাও যেন এই উদার, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, তরুণ ভারতের প্রতীক বীর সন্ন্যাসীকে আদর্শরূপে বরণ করে এবং নিয়মিতভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংযমশীল ও বীর্যবান্ হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে তাহারা এমন কোন বড় সমস্যার সম্মুখীন হইবে না, যাহার সমাধান 'বিবেকানন্দ'রূপ বিশ্বকোষে নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে আরব্ধ ধর্মীয় আদর্শগত বিপ্লবের যুগে, তাহার জটিল সমস্যাবলীর সমাধানে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষিবর্গের চলিয়াছে যে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহী যুগাচার্য বিবেকানন্দ তাহার পুরোভাগে থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে করিতেছেন প্রেরণার সঞ্চার, ও তাঁহার সমন্বয়ী মানবধর্মের উজ্জীবন-মন্ত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের মনে করিতেছেন শুভচেতনার উদ্বোধন, যাহার ফলে 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' ভরা হইবে বিশ্বমৈত্রীর মঙ্গলঘট, রচিত হইবে ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এক কথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে জগৎ-কল্যাণে মূর্ত হইয়াছে ভারত-আত্মার বাণী, নূতন করিয়া শোনা যাইতেছে উদাত্ত ঝঙ্কার :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ

স্বামী আপ্তকামানন্দ

হিন্দু ভারতের অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে। ত্রিচিনাপল্লী বা তিরুচিরপল্লী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। ইহা বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষগণের আকরসদৃশ, শ্রীরামানুজাচার্য-প্রবর্তিত শ্রী-সম্প্রদায়ের লীলা-ভূমি। কলিকাতা হইতে প্রায় চৌদ্দ শত মাইল দক্ষিণে ত্রিচিনাপল্লী, শহরের প্রান্তভাগে শ্রীরঙ্গম্। শ্রীরঙ্গনাথের আকর্ষণে চলিয়াছি। দেবতা ভক্তকে ভালবাসিয়া বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহার কৃপার তুলনা নাই; দুঃখে বিপদে, অনলে অনিলে—নিকটে থাকিয়া ভক্তকে তিনি রক্ষা করেন। ভক্তও পূজার্চনায় তাঁহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। ভক্তের ঐকান্তিক সাধনায় পাষাণ-প্রতিমা স্পন্দিত হন, মৃন্ময় মূর্তি চিন্ময় হইয়া উঠেন।

বিশ্ববীজ নারায়ণের লীলাস্থল দেখিবার জন্য চলিয়াছি; অনন্ত-শয্যায় শায়িত নারায়ণকে দর্শন করিব, প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তর যাঁহার পূজা বিধান করিবার জন্য রাক্ষসরাজ শ্রীরামৈক-শরণ বিভীষণ ঐ পুণ্য পীঠে আসিয়া থাকেন।

মাদ্রাজ হইতে বাহির হইয়া মনে মনে কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলাম। এই অজানা অচেনা দেশে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কেমন করিয়া ঘুরিব? কোথায় যাইব, কোথায় আশ্রয় লইব? ক্রমে ক্রমে তিরুওনি, তিরুপতি, শ্রীকালহস্তী, বিল্লুপুরম্, ত্রিভন্নামালাই, পণ্ডিচেরী, কাডালোর, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোনম্, তাঞ্জোর প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিলাম।

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচি বাসে মাত্র ষাট মাইল। গ্রামের দরিদ্র পল্লী, কৃষিক্ষেত্র, ত্রিফসলী ধান্য রোপণ, মাইলের পর মাইল নারিকেল কলা ও টেপিওকার চাষ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ৭॥ টায় ত্রিচি শহরে আসিয়া বাস হইতে নামিলাম। তামিল-ভাষাভাষী অঞ্চলে মন্দির ছাড়া কোন গ্রাম আছে বলিয়াই মনে হয় না। কয়েক দিন ধরিয়া শিব বিষ্ণু কার্তিক গণেশ কত বিগ্রহই না দেখিলাম! প্রত্যেকের মধ্যেই আমার আরাধ্য দেবতার আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। দেবালয়ে দেবালয়ে কত ভক্ত দেখিলাম—তাঁহাদের চালচলন ও হাবভাব, তাঁহাদের শারীরিক মানসিক প্রয়াস কেবলমাত্র প্রভুর দর্শনের নিমিত্তই। তাঁহারা আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন। তাঁহারা সহনশীলতার জীবন্ত প্রতীক। তাঁহাদের দর্শন করিয়া, তাঁহাদের পূতসঙ্গে কাল কাটাইবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। প্রকৃত ভক্তের হৃদয় ভগবানের বাসভূমি। দুঃখ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। অন্ধ যেরূপ চক্ষুষ্মানের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ চলিতে পারে না, অজানা জায়গায় আমিও সেইরূপ। একটি পথ-প্রদর্শকের চিন্তায় আকুল হইলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, 'চলুন'।

শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদী ও উত্তর দিকে উহারই শাখা কোল্লিড়ম্ নদী প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। সহস্র দস্যুর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়া ঐ শাখা 'কোল্লিড়ম্' নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় উহার অর্থ 'হত্যাস্থল'। শ্রীরঙ্গমের

নৈসর্গিক শোভা পরম রমণীয়। শ্রীরঙ্গম্ শ্রীরঙ্গনাথের আপন ধাম। শ্রীরামচন্দ্র পরম সুহৃদ্ বিভীষণকে এই রঙ্গনাথ-বিগ্রহ উপহার-স্বরূপ দিয়াছিলেন। বিভীষণ তাঁহার পুষ্পক-রথে করিয়া বিগ্রহটিকে স্বীয় দেশ লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিলেন। প্রাকৃতিক শোভায় বিমোহিত হইয়া দেবতা এখানেই রহিয়া যান। শ্রীরঙ্গম্ সর্বসৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের লীলানিকেতন

সহযাত্রী আমায় শ্রীরঙ্গমে না লইয়া শহরের দশ মাইল দূরে ত্রিপুরাইতরাই গ্রামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্'-এ লইয়া গেলেন দিবসত্রয় এইখানেই যাপন করিলাম। এখানে কখন কাবেরী-তীরে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কখন নদীর অগভীর স্বচ্ছ জলে স্নান করিতাম; কখন বা তপোবনের তপোভূমিতে, অরণ্যে, মাঠে-ঘাটে, নদীসৈকতে একান্তে বসিয়া থাকিতাম। একদিন প্রাতঃ-কালে একজন ব্রহ্মচারী আমায় ত্রিচিনাপল্লীর দর্শনীয় বস্তু দেখাইতে লইয়া চলিলেন। কাবেরীর তীরে তীরে কিছু দূর পর্যন্ত 'বাস' চলিল। এক স্থানে দেখিলাম কাবেরী-পারাপারের সেতু, অন্য এক স্থানে খেয়া ঘাট। বিচিত্র দেশের বিচিত্র খেয়া-নৌকা, প্রকাণ্ড বাঁশের চুপড়ি ত্রিপল দ্বারা আচ্ছাদিত। যাত্রী-গণ সমতা রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট।

বরাবর পীচ-ঢালা রাস্তা, এক পার্শ্বে জলাভূমি, আর এক পার্শ্বে সমতলভূমি, কোথাও কল-কারখানা, কোথাও বাসস্থানের ঘর-বাড়ী। শহরের মধ্যস্থল পর্যন্ত 'বাস' আসে। আমরা তাহার পূর্বেই বাস হইতে অবতরণ করিলাম। 'টেপ্পাকুলম্' নামে এক বৃহৎ সরোবর দর্শন করিলাম—ইহার মধ্যভাগে কারুকার্য-শোভিত মণ্ডপ, ইহারই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেন্ট জোসেফ কলেজ। অনতিদূরে পুরাতন প্রাসাদ, টাউন হল্, চুন্দ্ সাহেবের স্মৃতি-স্তম্ভ। উহারই পশ্চাতে 'স্বর্ণ-রক্' মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। তাহারই সন্নিকটে জেলখানা। প্রধান বাজার অতিক্রম করিয়া 'ত্রিচি রকে' উঠিলাম। পাহাড়ের স্তরে স্তরে মন্দির। প্রথম স্তরে গণেশের মূর্তি, দ্বিতীয় স্তরে বড় হল্। দেওয়ালগুলি বিভিন্ন প্রকারের পৌরাণিক চিত্রকলায় সমুজ্জ্বল। তৃতীয় স্তরে মাঙ্গাভূতেশ্বর দেবতা ও পার্শ্বে মাতৃমূর্তি—মাতুয়াকারেলেমুয়ি। উপরে বিনায়ক বা গণেশজীর মন্দির। উহারই অল্প নীচে দক্ষিণ দিকে পানীয় জলের সরোবর, শহরের জল সরবরাহ—এখান হইতে হইয়া থাকে। গণেশজীর মন্দিরের চারিধার রেলিং দ্বারা ঘেরা।

পর্বতচূড়া হইতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলাম রাজপথে মানুষের শ্রেণী, মাঠে গরু ও ভেড়ার পাল, মন্দির, মসজিদ্, চার্চ, ক্ষুদ্র বৃহৎ বাড়ী, নদী, নালা, ক্ষেত, খামার, বৃক্ষরাজি, জঙ্গল, খেলার মাঠ, বাগ-বাগিচা কোনটির পৃথক্ অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই। সব একসঙ্গে মিশিয়া যেন পটে আঁকা ছবির মতো দেখা যাইতেছে। দূরে রেল লাইনের উপর ট্রেনগুলিকে দিয়াশলাই-বাক্সের ন্যায় বোধ হইতেছে।

কয়েক মাইল দূরে জম্বুকেশ্বরের মন্দির; বাসে করিয়া আসিলাম। পঞ্চ-প্রাকারে বেষ্টিত মন্দিরে পঞ্চ গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণদ্বার। জম্বুবৃক্ষের নীচে মহাদেবের আবাসভূমি বলিয়া ইনি জম্বুকেশ্বর নামে বিখ্যাত। দেবী অখিলেশ্বরী অর্থাৎ শিবানী। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে গর্ভমন্দির। জলমগ্ন অবস্থায় পাতাল-প্রদেশে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সর্বদা জলে বাস করেন বলিয়া ইহার আর একটি নাম অপ্পলিঙ্গম্। অর্চকেরা প্রদীপের সাহায্যে

দর্শনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় প্রাকারের একদিকে তীর্থ-সরোবর; তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাকারের মধ্যেও দুইটি সরোবর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী প্রভৃতি আরও বহু দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান।

১৯৫৭ খৃঃ ১লা মে। প্রখর রৌদ্রকিরণে সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শহরের কোলাহলময় চঞ্চল পরিবেশ পশ্চাতে ফেলিয়া নির্জন শান্ত ধামে চলিয়াছি। প্রায় এক মাইল রাস্তা। অগ্নিবৃষ্টির ঝলকায় দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে, এতটুকু পথ পদব্রজে গমন করাও কষ্টসাধ্য। কাবেরীর উপর দিয়া ৪৯ ফুট লম্বা একটি সেতু—শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপের সহিত সাধারণ ভূমির যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সেতু পার হইয়া আমরা তীর্থের সীমানায় উপনীত, তীর্থ-দেবতার সুউচ্চ প্রাচীর ও গোপুরম্ আমাদের ডাকিতেছে, আমাদের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। প্রথম প্রাকারের ভিতরে বাজার।

একে একে সপ্ত প্রাকার পার হইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। শ্রীবিষ্ণু শ্রীরঙ্গনাথ অনন্ত-শয্যায় শায়িত। শত শত ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্যহস্তে অপেক্ষমাণ। আমিও করজোড়ে স্থির হইয়া রহিলাম। তালে তালে দামামা কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে, শানাইএর মধুর রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছে। পূজারী পূজা শেষ করিয়া আরতি করিতেছেন। গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য স্থানটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে, মন্দির-প্রাঙ্গণ গম্‌গম্ করিতেছে। আরতি থামিতে কুসুম কর্পূর ফল ভগবৎ-উদ্দেশে সমর্পণ করিবার জন্য অর্চকের হস্তে দিলাম। তিনি যথাবিধি নিবেদন করিয়া প্রসাদ দিলেন। ভগবৎ-পাদুকা-চিহ্নিত স্বর্ণমুকুট (শঠকোপ) আমাদের অবনত মস্তকে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলাম। যেমন বিশাল মন্দির, তেমনি বিরাট দেহ অনন্তনাগের শয্যায় শায়িত, নাগগণ তাঁহার মস্তকে ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। জগৎকারণ ব্রহ্মা নাভিকমলে সমাসীন, লক্ষ্মীদেবী পদ-সম্বাহনে রত।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর তিন মূর্তি। প্রথম রূপ—শ্রীদেবী, শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী; দ্বিতীয় রূপ—ভূদেবী, নারায়ণের দৃষ্টিরূপ বিলাসের ক্ষেত্র; তৃতীয় রূপ—নীলাদেবীই বিগ্রহবতী অণ্ডাল নামে বিখ্যাত, বিষ্ণুকে পতিভাবে পাইয়াছিলেন,—নারায়ণের মাধুর্য ও মহিমাদি কীর্তন করিয়া ও হরিপ্রেম-মদিরাপানে নিরন্তর বিহ্বল হইয়া উন্মত্তা থাকিতেন, ইনিই শ্রীরঙ্গনায়কী বা শ্রীরঙ্গনাথ-মহিষী।

মন্দিরটি ওঁকারাকৃতি। প্রশস্ত গম্বুজ চূড়াসহ স্বর্ণনির্মিত। প্রবাদ—এই গম্বুজ-স্পর্শ বিগ্রহ-স্পর্শের তুল্য। বেশকারীর কৃপায় আমাদের উহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মন্দির, নাটমন্দির, উৎসব-মন্দির, চারিপাশের অলিন্দ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধভাবপূর্ণ। শয্যা-গৃহ মণিমাণিক্য-খচিত মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, শয়নের নিমিত্ত সোনার খাট। দাক্ষিণাত্যে প্রতি মন্দিরে দেবতার দুইটি বিগ্রহ। অচল ও সচল। অচল বিগ্রহ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে কখন বহির্দেশে গমন করেন না। সচল বিগ্রহই বিশ্রামের জন্য শয্যাগৃহে নীত হন, উৎসবের সময় উৎসব-মন্দিরে বিমানযোগে বাহিত হন। সচল বিগ্রহের আর একটি নাম উৎসব-বিগ্রহ।

দ্বিপ্রহর সমাগত। সাথী বলিলেন 'এখন

প্রভুর বিশ্রামের সময় মন্দির-দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে।' শ্রীরঙ্গমে কয়েকদিন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প সাথীকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, 'ঐ যে মঠ দেখা যাইতেছে, ঐখানেই পড়িয়া থাকিব, মাধুকরী করিয়া খাইব।' ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ণ হইল।

* * *

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ারের চেষ্টায় শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সুবৃহৎ দেবালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা এক দেবাদিষ্ট নির্মাণকার্য। 'আল্' শব্দের অর্থ শাসন, 'ওয়ার' শব্দের অর্থ কর্তা। সর্বকালে সর্বদেশে ইঁহাদের শাসন ও আধিপত্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপর অক্ষুণ্ণ থাকায় 'শাসনকর্তা' নামটি সর্বতোভাবে সমীচীন। বিংশ বৎসর বয়সে তিরুমঙ্গই তাঁহার চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গমের পবিত্রভূমিতে পদার্পণ করেন। ভগ্নপ্রায় শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, গভীর জঙ্গল, অসংস্কৃত পথঘাট, হিংস্র জন্তুর ভয়ে পূজারীর পূজায় অবহেলা, টিকটিকি ও চামচিকার দুর্গন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর কলুষিত। বিগ্রহের দুর্দশা-সন্দর্শনে ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমন্দির-নির্মাণ-বাসনা প্রবলভাবে চাপিয়া বসিল। তিনি ধনীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অর্থগৃধ্নু ধনিক-মণ্ডলী তাঁহাকে এক কপর্দকও দান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার চারিজন শিষ্যই যোগবলে বলীয়ান্, অনতিবিলম্বে তাঁহারা দস্যুদের সহায়তায় প্রভূত রত্ন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণ আনাইয়া শুভক্ষণে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। শুভযোগে মন্দির আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র শিল্পী অহরহ পরিশ্রম করিয়া প্রথম প্রাকারবেষ্টিত গর্ভমন্দির, মহোচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত অন্তঃপুরী বৎসরদ্বয়ে গড়িয়া তুলিল। চারি বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া প্রথম বহিঃপুরী, ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসরে পঞ্চম ও অষ্টাদশ বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক শিল্পীর প্রাণপাতী সাধনায় নির্মিত হইল। পঞ্চদশ গোপুরম্-সহ সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত পুরীর নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে দিকে দিকে বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া উঠিল। নিকটবর্তী নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সহস্রাধিক দস্যুর দলপতি বলিয়া ভয় ও শ্রীহরির যথার্থ ভক্ত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইহার পর কত বার কত বিপর্যয়ে, ধর্মবিপ্লবে, মুসলমানদের অত্যাচারে মন্দির স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আবার গড়িয়া উঠিয়াছে। অধুনা বহু গোপুরম্, প্রাকারের কতকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তীর্থ-সরোবরগুলির চতুঃসীমায় নন্দনকাননগুলি আর শোভাবর্ধন করে না, নিশিদিন অন্নসত্রের মেলা আর শ্রীরঙ্গম্দ্বীপকে মুখরিত করিয়া তুলে না। শ্রীরঙ্গমস্থ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ মন্দির। সুন্দর কারুকার্যের তুলনায় ইহা অনেকাংশে নিষ্প্রভ হইলেও, বিশালত্বই ইহার গৌরব। সুবৃহৎ অঙ্গনের মধ্যে অসংখ্য অর্চক-পরিবারের বসবাস। তাঁহাদের সুখ-সুবিধার্থে বাজার-হাট, দোকান-পসার কিছুরই অভাব নাই। শান্তি-বিধানার্থ ইহারই একপার্শ্বে দণ্ডনিবাস (পুলিশ থানা) অবস্থিত। প্রাঙ্গণের বিশালতার পরিমাপ সহজ ব্যাপার নয়। ইহারই একাংশে সহস্রটি স্তম্ভের উপর এক মহামণ্ডপ।

* * *

শ্রীরঙ্গমে তিন দিন তিন রাত্রি মহানন্দে কাটাইলাম। সূর্য পাটে বসিয়াছে, ভক্তটির সহিত আমি গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। গ্রামের মানুষ অতি সহজ ও সরল, তাহারা ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া পায়ের কাছে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের অধরের মধুর হাসি আমার হৃদয়ে স্পর্শ করিল, তাহাদের নীরব সম্ভাষণ জানাইলাম। কাবেরী-তীরে বালুর শয্যায় গ্রাম্য বালকেরা গড়াগড়ি দিয়া খেলা করিতেছে, আমরা কাবেরী-প্রবাহে ডুব দিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। পথে পড়িলেন ভক্ত-শিরোমণি আলোয়ারগণের বিগ্রহ—পৌহে, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশি, শঠারি, মধুরকবি, রাজা ফুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল, তোণ্ডাবাড়িপ্পোড়ি, তিরুপ্পানি, তিরুমঙ্গই—এই দ্বাদশ জন বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষ বিষ্ণুর সাধনায় সিদ্ধ।

সান্ধ্য পূজা ও আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতার শয়ন আরতি পর্যন্ত দেখিলাম, শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবকদের পদচ্ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইলাম। কিন্তু কই কমলনয়ন নারায়ণ? তবে কি সাধন-ভজন, রাগ-অনুরাগ—সবই বৃথা? শেষশায়ী নারায়ণের জয়ধ্বনি দিয়া সকলেই দর্শনের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ উজ্জ্বল পীতবস্ত্র-পরিহিত, প্রস্ফুটিত অতসীপুষ্পের ন্যায় সুশোভিত, দীপ্তিমান্ কিরীট, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠিকা ও মণিশ্রেষ্ঠ এবং নূপুর প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বিমানে উপবিষ্ট। অগ্রে সঙ্গীত-অর্চক সুমধুর আহ্বান-গীতি গাহিতেছেন, অপূর্ব সুরলহরীতে ভগবান ও ভক্তগণ আমোদিত। হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় প্রেম-সুধাসিক্ত এই স্তোত্রমালা! ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ত্রিলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিতেছেন, শ্রীরঙ্গনাথ ভক্তিমান্ বাহক কর্তৃক বাহিত হইয়া আসিতেছেন। ভক্তদের প্রাণে এক সুর, এক ধ্যান, এক চিন্তা! সেই স্বর্গীয় পরিবেশ অবর্ণনীয়। সেই অপরূপ ভাবের সমাবেশ, সেই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার কে সন্ধান দিবে? শিল্পীর তুলি এ রূপ অঙ্কন করিতে অসমর্থ, কবির কল্পনাও ইহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এ শুধু প্রাণ দিয়া স্পর্শ বুঝিবার বস্তু, হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার চিত্র। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বিষ্ণুপাদ-নিঃস্যন্দিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার পবিত্রতা ও শীতলতা অনুভূত হইতেছে। দেবতার বিগ্রহ পালঙ্কে শায়িত। রাত্রি সাড়ে নয়টায় এই দিব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

অদূরে শ্রীরামানুজাচার্যের মঠ। একটি মন্দিরে রামানুজাচার্যের মূর্তি স্থাপিত। প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতিটি ভক্ত ও শিষ্যগণের অনুরোধে তাঁহার জীবিতাবস্থায় নির্মিত হইয়াছিল। শুদ্ধ কাবেরীর জলে সুস্নাত করাইয়া তিনি নিজেই এই প্রতিমূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরঙ্গমে বিষ্বক্‌সেনের মূর্তিও প্রসিদ্ধ। ইনি নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্তি, বৈষ্ণবী সেনার অধিনায়ক—নারায়ণের সেনা-নায়ক, সর্ববিঘ্নবিনাশী। বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগণপতি ও শ্রীশ্রীকার্তিকের পরিবর্তে বিষ্বক্‌সেনের পূজা করেন। আরও বহু দেব-দেবীর মূর্তিতে শ্রীরঙ্গম্ পূর্ণ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভক্তবৎসল শ্রীমৎ রামানুজাচার্য শ্রীরঙ্গম্‌কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন

শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতমতের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ; শ্রীরঙ্গনাথ যেন শ্রীরামানুজাচার্যকেই বৈষ্ণব ধর্মের উপযুক্ত প্রচারক নির্বাচিত করিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ব্যতীত বিষ্ণু-মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইজন্য শেষশায়ী শ্রীরঙ্গনাথ আচার্যপুঙ্গবকে 'উভয়বিভূতিপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখন হইতে সন্তপ্তের সন্তাপ-নিবারণ ও ভক্তপরিপালন-ক্ষমতা তাঁহার বিভূতি হইয়া রহিল। শ্রীরামানুজ নারায়ণের সেবাপূজার অভিনব ব্যবস্থা করিলেন। নারায়ণের মন্দিরে 'বৈখানস্' প্রথার পরিবর্তে 'পাঞ্চরাত্র' প্রথার প্রবর্তন তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব কীর্তি। কেবল সেবাপূজাই বৈখানস্ প্রথার উদ্দেশ্য। এমনকি নারায়ণের সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণ, আলোয়ার-মণ্ডলী, মঠাধিপতি, আচার্যের পূজা ইহাতে নিষিদ্ধ ; আলোয়ার-গণের স্তোত্র আবৃত্তি, অণ্ডাল-প্রবন্ধ পাঠ, দেব-শরীরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত করা অশাস্ত্রীয় বলিয়া পরিগণিত। পাঞ্চরাত্রপ্রথা ইহার বিপরীত ও বিস্তৃত। দেবতা প্রধান হইলেও তাঁহার লীলা-পার্ষদের ও বিশিষ্ট ভক্তজনের পূজা এ-মতে বাঞ্ছনীয়। বৈখানসে যে সমস্ত নিবিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া বর্জনীয়, পাঞ্চরাত্রে সেইগুলি গ্রহণীয়। পাঞ্চরাত্র প্রথার উদ্দেশ্য তৈলধারাবৎ নারায়ণের সেবন, পূজন ও কীর্তন। শ্রীরামানুজের সংগঠন-শক্তি ছিল অপরিসীম। দৈনন্দিন বিধিব্যবস্থায় সজাগ দৃষ্টি। উৎসব-সময়ে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইত। আদর-আপ্যায়ন আহারাদির ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইত না। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রত্যেকের প্রতি প্রীতির সম্বন্ধ দেশবাসী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। শ্রীরঙ্গম্ তাঁহার হৃৎপদ্মাসন। শ্রীরঙ্গনাথই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-দাতা।

নারায়ণের স্বীয় ধাম শ্রীরঙ্গম্। নিত্য পঞ্চবার পূজার্চনায় উপস্থিত হইয়া কয়দিন ধরিয়া মাতিয়া রহিয়াছি। দিবাভাগে শ্রীরঙ্গম্ তীর্থের এক রূপ, রাত্রিতে অন্য রূপ। এক সময়ে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি, আর এক সময়ে স্নেহময় প্রফুল্ল মূর্তি। প্রাতঃকালে বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রাণের প্রার্থনা জানাইলাম। বিরাট পুরুষের সত্তায় সত্তাবান্ শ্রীরঙ্গম্।

স্বপ্নের পুরুষোত্তম আজ ধরা পড়িয়াছেন। শিশুর প্রফুল্ল বদনে সেই অমৃতময় হাস্য, নারীর কমনীয় স্মিতবিকশিত মুখেও সেই হাস্য, ফলে ফুলে বৃক্ষরাজিতে, আকাশে বাতাসে সেই একই আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের ঐকান্তিকী উন্মুখতা ও প্রাণে-শ্বরের দুর্নিবার আকর্ষণ—আজ সব মিশিয়া একাকার। নদী আসিয়া সাগরে মিলিয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের দুইখানি পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী ২.৫.২০

শ্রীমান—,

তোমার ২৮শে এপ্রিলের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর এখনও বেশ সুস্থ হয় নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন ওখানে থাকিলে যদি ভাল হয় তো থাকিবে। শরীর সুস্থ থাকার দরকার, নহিলে কোন কাজই হইবার নহে। তোমার প্রশ্নের আর কি দিব উত্তর? দীক্ষা তো গ্রহণ করিতেই হয়। আমি কিন্তু দীক্ষাদি কখনও দিই নাই এবং দিবও না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমাকে অন্যত্র চেষ্টা পাইতে হইবে। আমি যেমন বুঝি—যথাসাধ্য উপদেশাদি দিয়া থাকি, এই মাত্র। কর্ণে মন্ত্র দেওয়া প্রভৃতি কার্য আমার দ্বারা হইবে না, হয়ও নাই। সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই ভাল। ভগবান অন্তর্যামী। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি তোমার ইচ্ছামত সকল বিধান করিবেন। আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি তোমার আন্তরিক দীক্ষাগ্রহণ-কামনা পূর্ণ করুন—প্রার্থনা। আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই চলিয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল ও গরমের জন্যও কষ্ট তো আছেই।…অন্যান্য সংবাদ কুশল। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি—

* * * *

১০.৫.২০

তোমার ৮.৫.২০ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি ক্রমে বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া প্রীতিলাভ করিতেছি। যখন ভাল বুঝিবে, তখনই এখানে আসিবে। আমরা তোমাকে দেখিলে সুখী হইব। দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তোমার মনের চিন্তা দূর হইয়াছে জানিয়া আনন্দ হইল। তুমি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। দীক্ষাগ্রহণ ধর্মজীবন-লাভের সহায়ক নিশ্চিত। তবে যিনি জীবন ধর্মলাভের জন্য উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, অন্তর্যামী স্বয়ংই তাঁহাকে সকল প্রকার সুযোগ করিয়া দেন। দীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আসল কথা হইতেছে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা এবং যাহাতে লাভ হয়, তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকা এবং নিজেকে নিযুক্ত করা। তাহা হইলেই কার্যসিদ্ধি আপনিই হইয়া যায়। গুরুরূপে তিনিই সকল দীক্ষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা আমি দীক্ষাগ্রহণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছি না। অনেকের ইহাতে উপকার হয় এবং অধিকাংশের ইহা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধাই বিশেষ কার্যকরী, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়।

গীতাপাঠ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। গীতা ভবেদ্বেষিণী। গীতা ভগবানের হৃদয়। গীতার তুলনা নাই। যাহারা বোঝে না, তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাঁহার দোষদর্শনে মহা অপরাধ। 'অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্য-শেষতঃ'—এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। গীতার অনুশীলন ও সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল

বিষয় সম্যক্ অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরা শান্তি লাভ হয়। তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইতেছে বুঝিতে পারিতেছ, ইহাতে আমি যার-পর-নাই প্রীতি অনুভব করিতেছি। তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোমার পক্ষে যাহা ভাল তাহাই করাইবেন। অধীর হইও না। তিনিই পথ দেখাইয়া দিবেন। যেখানেই থাক, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে কোন ভয় নাই। খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে পড়িতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। 'দেবর্ষিভূতাত্মনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্! সর্বাত্মনায়ং শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যম্'—ইহা ভাগবতোক্তি। কোন চিন্তা নাই, যেমন চলিতেছ, চলিয়া যাও। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তাঁতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করিও না। দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। লাটু মহারাজের ভাণ্ডারা প্রভৃতি হইয়া গেল।......

তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্যাল

ঠাকুরের মহাভক্ত, হে সাধক! লীলা-ভাষ্যকার,
তোমার কৃপায় মোরা হেরি আজি অতীতের ছবি।
অবতার জীবনের তুমি কিগো শুধু গ্রন্থকার?
বিশুদ্ধ রসের স্রষ্টা, তুমি কবি, শুধু মাত্র কবি?
ভাষার বাহ্যিক ছটা নয় এতো প্রাণহীন লেখা,
কঠোর সাধনা মাঝে এ যেন গো স্বরূপ দর্শন,
শোনা নয়, গল্প নয়, দিব্য চক্ষে সব হ'ল দেখা;
হৃদয়ের ধ্বনি শুনি সাক্ষ্য তার—করিলে বর্ণন।

ভিতরে বাহিরে যুদ্ধ—কত জয়, কত না প্রার্থনা,
সংগ্রামের পরে শান্তি—জগতেরে দিলে তা বিতরি
অন্ধকারে জাগিতেছে শাশ্বতের অভয় দ্যোতনা,
সবার কল্যাণ তরে দেহাতীত আসে দেহ ধরি।
কত ভক্ত সাধকের দিবানিশি হ'ল আনা-গোনা—
অপূর্ব দর্শন কত—সমুজ্জ্বল সেদিনের স্মৃতি,
সকল মতের তন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে হ'ল বোনা
মনের বসন এক—সহিষ্ণুতা সেবা-ত্যাগ-প্রীতি।
প্রতি গৃহে মনে মনে এনে দিলে তাহার স্পন্দন,
তোমার হৃদয়ে পড়ে মহাসূর্য মহিমার আলো—
চন্দ্রের মতন তুমি—তারে করি নিভৃই রচন,
বলিতেছ কানে কানে 'বাসো ভালো, তাঁরে বাসো ভালো'।

সমালোচনা

The Fundamentals of Hinduism—(A philosophical Study) by Sri Satis Chandra Chatterjee M.A., Ph. D.—First published by author in 1950. Reprinted in 1960. To be had of Das Gupta & Co. (P) Ltd , 54/3 College St. Calcutta, pp. 180 + x, Price Rs. 3·50.

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত 'হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব' বিষয়ক সুন্দর সুলিখিত পুস্তকখানি কয়েক বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়া দেশে বিদেশে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, বর্তমানে উহা পুনর্মুদ্রিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

১২টি অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব, জন্মান্তর, কর্মবাদ, বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তির স্বাভাবিক গতি—বর্ণাশ্রম ধর্ম; যোগচতুষ্টয়—রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সরল ভাষায় যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহারা একখানি পুস্তকের মধ্যে 'হিন্দুধর্মে'র মূল কথাগুলি জানিতে চান, পুস্তকখানি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। কোন একটি পুস্তকে নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা শুধু অহিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত নয়, হিন্দুগণও জানেন না—তাঁহাদের ধর্মের মহিমময় স্বরূপ; এ পুস্তকখানি উভয়েরই অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, এবং ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা (প্রথম ভাগ)—প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃঃ ২০৪; মূল্য—আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁরা জানেন যে এই মহামানবকে কেন্দ্র ক'রে একদল সাধকপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যাঁরা যে কোন দেশে, যে কোন যুগে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ এই সাধকপুরুষদের অন্যতম। তাঁর অমূল্য জীবন ও অমৃত বাণী অধ্যাত্মপিপাসুদের চির-আদরের সম্পদ।

আলোচ্য স্মৃতিকথার সঙ্কলনটিতে মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত কয়েকজন ভক্ত তাঁদের স্মৃতিসম্পদ সাজিয়ে দিয়েছেন। সূচনায় স্বামী গম্ভীরানন্দ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীটি এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। সহজ সরল ভাষায় যে ঈশ্বরতন্ময়তা এই স্মৃতিকথায় ফুটে উঠেছে, তা পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করবে। পুস্তকে একটি সূচীপত্রের অভাব অনুভূত হয়। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

বিজ্ঞানস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীতারকদাস মল্লিক প্রণীত। ১।১।৪এ, বেণীনন্দন স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৯ + ৮৶০; মূল্য চার টাকা।

শিরোনামায় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও প্রচ্ছদ-পটে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিবেদিত-পুস্তকের প্রতিকৃতি থাকায়, বইখানি দেখে ভক্তমণ্ডলী স্বভাবতই আকৃষ্ট হবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন যে সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই পরিপূরক—এই ভাবটুকু ছাড়া, এই বই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাবার আশা করলে নিরাশ হ'তে হবে।

আইন্‌স্টাইনকেও লেখক বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের সমগোষ্ঠীতে ফেলেছেন। বইটিতে অজস্র বানান ভুল, কতকগুলি সংখ্যাগত ভুলও আছে, শেষ দুই পৃষ্ঠায় ভ্রম-সংশোধনের তালিকায় সবগুলি উল্লিখিত হয়নি। আবার অশুদ্ধ (?) 'নির্দিষ্ট' স্থলে শুদ্ধ 'নিদৃষ্ট' এবং অশুদ্ধ 'অব্যাং মানস গোচরম্' স্থলে 'আবাং' কি ক'রে শুদ্ধ হ'ল তা বোঝা গেল না।

তবে লেখকের চিন্তাধারা বহুমুখী; জীব জগৎ, চিৎ জড়, শক্তিসঞ্চার, পরমাণুবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, পুনর্জন্ম ও ক্রমবিকাশবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদকে তিনি স্বমতে আনবার জন্য বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা করেছেন; পাঠককে তা প্রচুর চিন্তার খোরাক দেবে।

বর্তমান বিজ্ঞানের সব তথ্য সঠিক না জানা থাকায় (যেমন বস্তুর মূল উপাদান এখন ৩টির স্থলে ১৬টি) এবং কোন কোন স্থলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিভাষার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে রচনায় যথেষ্ট প্রমাদ উপস্থিত হয়েছে।

এইরূপ প্রবন্ধ প্রধানতঃ যাঁদের (অর্থাৎ বিজ্ঞানসেবীদের) উদ্দেশ্যে লিখিত; তাঁরা এই পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। মনে হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে ছোট ছোট প্রবন্ধাকারে বিজ্ঞানের কোন মুখপত্রে প্রকাশিত হ'লে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। —**শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভারত-কোষ (নমুনা সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা)— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হইতেছে। আকার ডবল ক্রাউন ১/৪, আনুমানিক মোট ৩২০০ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম, টাইপ '১০। আনুমানিক মূল্য চল্লিশ টাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসর সময় লাগিবে।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। অ-কারাদি ক্রমে মুদ্রিত হইয়া ইহা চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ভারত-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় এবং ভারতের বাহিরের ভারত-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। বঙ্গ ও বঙ্গ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করিবে।

আলোচ্য মূল বিষয়গুলি নির্বাচন করিবেন এক একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি এবং তাঁহাদের নির্দেশে লিখিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ যথারীতি সম্পাদিত হইয়া কোষগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে। সম্পাদক-সমিতির সভাপতি: শ্রীসুশীলকুমার দে; সদস্যবৃন্দ: শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীঅমল হোম, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই বিরাট প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

আলোচ্য নমুনা সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য আছে: ইহাতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম প্রবন্ধ 'চৈতন্যদেব' আশানুরূপ সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। 'সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র'—ইহা ঠিক নহে। '...নিমাই কাটোয়ায় **পলাইয়া** গিয়া কেশব ভারতী কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।' এরূপ গ্রন্থে এ-জাতীয় শব্দপ্রয়োগ বর্জনীয়।

বানান মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে, সেদিকে সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'পুঁথি' শব্দের চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত করিলে চলিবে না। 'কখনও' বানানের পর 'এখনো' চলিবে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ৯ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন, ভজনগান, ভোগরাগ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর প্রায় ৭,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী তেজসানন্দ বলেন, বর্তমান সঙ্কটকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে। সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্তসমাগমে মঠ-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী: যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও কালীকীর্তন হইয়াছিল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর 'কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্যান-বাটী' কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি), স্বামী সুন্দরানন্দ এবং স্বামী মিত্রানন্দ। রাত্রে বিশিষ্ট গায়ক-গণের ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

২রা জানুআরি অপরাহ্ণে স্বামী মহানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী তেজসানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন এবং স্বামী সুন্দরানন্দ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্ম-সমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন। রাত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী 'রাবণ-বধ' পালা কথকতা করেন।

৩রা জানুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রাত্রে সালিখা বীণাপাণি সমিতি-কর্তৃক মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' যাত্রাভিনয় হয়।

উৎসবের কয়েক দিন উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি: যোগোদ্যানেও প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন-ভবনে গত ২৩শে ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, সারদানন্দ-জীবনীপাঠ, ভজন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। প্রায় ৬০০ নরনারী বসিয়া এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা :—

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়: বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছবি আঁকা, বাগান করা, গান বাজনা প্রভৃতিও শেখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৮২ জন ছাত্র ছিল।

বেসিক ট্রেনিং স্কুলঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৯ ছাত্র ছিল। '৫৯ খৃঃ ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

সিনিয়র বেসিক স্কুল : 'কলা-নিলয়ম্' নামে পরিচিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫৬৩ (ছাত্রী ২২২)। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

বি. টি. কলেজ: ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জন উত্তীর্ণ হয়। জুলাই মাসের শেষ দশ দিন শিক্ষাশিবির পরিচালনা করা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ শিক্ষাদান-অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়।

সমাজসেবা: S. E. O. T. C.তে এ যাবৎ পাঁচ বারে ১৬৮ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাদ্রাজের ১৮, অন্ধ্রের ১৩, মহীশূরের ২ এবং বোম্বাইএর ৫ জন।

শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা: সভাসমিতি, পাঠ-চক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন, কারখানা, শ্রুতিচাক্ষুষী শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা করা হয়। কোয়েম্বাতুর, সালেম ও নীলগিরি জেলার ১৭৪টি বিদ্যালয়ের ৮৬৬ জন শিক্ষক এই কার্যে সহযোগিতা করেন।

গবেষণা: '৫৮ খৃঃ কোয়েম্বাতুর জেলার হাইস্কুলের ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য এই বিভাগ কার্য করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা করা হইয়াছে।

শারীর শিক্ষা কলেজ: আলোচ্য বর্ষে ৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ৮৩ জন।

গ্রামীণ শিক্ষা: ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৭৪, কৃষিবিদ্যালয়ের ২৯ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ১৫২।

গ্রামে চিকিৎসা: এক্স্-রে-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। ১৪,২৮৭ রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে পুরুষ ৮,৩০৮, নারী ১,৫৬৯ এবং শিশু ৪,৪১০।

গ্রন্থাগার : বিভিন্ন বিষয়ের ২২,৩০০ বই রাখা হইয়াছে। ১৭,৩১৭ বই ছাত্রদিগকে এবং ৫,৮৮২ বই শিক্ষক ও কর্মীদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১,৮০৫ বই সংযোজিত হইয়াছে।

কনখল : সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ৬টি ওআর্ডে ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৫৮৪ রোগী ভরতি হয় এবং ১,৪২৫ রোগী আরোগ্য-লাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১০০,৪৪৫ (নূতন ২৪,৭৪৭); অস্ত্র-চিকিৎসা ৩৩৬, দন্ত-চিকিৎসা ৬২২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ২,০৪৮, ইলেক্‌ট্রোথেরাপি চিকিৎসা ৭৭৫। লেবরেটরিতে ৪,৯৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৪,৫২৬; পাঠাগারে ১৮টি পত্র-পত্রিকা আসে। গড়ে দৈনিক ২৯১ জনকে গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

মাঙ্গালোর : ১৯৪৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ কেন্দ্রটি ১৯৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দৈনিক নিয়মিত পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে 'আত্মবোধ', 'জীবন্মুক্তিবিবেক' প্রভৃতি বেদান্ত-গ্রন্থের আলোচনা হইয়াছিল। আশ্রম-গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কয়েকটি ধর্ম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে কন্নড় ভাষায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, মানসোল্লাস, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিষ্ণু-সহস্রনাম এবং ইংরেজীতে বিষ্ণু-তত্ত্ব-বিনির্ণয় (মূল সংস্কৃত সহ অনুবাদ) উল্লেখযোগ্য।

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের বিস্তার ও তাহার পরিচিতি :

৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ২৬,৩৫৪ গ্রন্থ-সমন্বিত ফ্রি লাইব্রেরি, আলোচ্য বর্ষে ৩০,২৭০ (পূর্ববর্ষে ৩০,৭৫৮) পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু ভাষায় ২৭ দৈনিক এবং ১২৫ সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা :

বর্ষ	১৯৫৫	'৫৬	'৫৭	'৫৮	'৫৯
পাঠক	১২৫	১৭৫	২০০	২২৫	৩২৫

গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ৯৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২০। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। ১৫টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। সপ্তাহে দুই দিন বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন-গুলি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ প্রথম বক্তৃতাটি প্রদান করেন; অন্যগুলি দেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ অথবা তাঁহার সহায়ক স্বামী বুধানন্দ।

সেপ্টেম্বর ঃ অমরত্বের সন্ধানে মানুষ; হিন্দুধর্মের সার; মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা।

অক্টোবর ঃ বেদান্তে যুক্তির স্থান; অসৎ জগতে কেন সৎ হইতে হইবে? বাহিরে কর্মকুশলতা, অন্তরে শান্তি; হিন্দুর উদারতার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা; অগ্রগতি—ঐহিক ও পারমার্থিক।

নভেম্বর ঃ মানুষ চায় ঈশ্বর; অতীন্দ্রিয় জ্ঞান; পুরুষকার ও ভগবৎকৃপা।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাস এবং শুক্রবার ঐ সময় গীতা ব্যাখ্যা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা ডিসেম্বর ৬০ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করেন। তিনি আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আশ্রমের উন্নয়ন-মূলক কার্যে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব

কলিকাতা ঃ ১লা জানুআরি শ্রীহরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের কলিকাতা বাসভবনে ৫১ তম 'কল্পতরু' উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ সমস্ত দিনব্যাপী নামগান ও কীর্তনাদি ও 'কল্পতরু' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উৎসবে বহু ভক্ত ও সাধু উপস্থিত ছিলেন।

বারাসত ঃ গত ১৪ই ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) ১০৫ তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারাসত শহরস্থিত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে পূজা এবং চণ্ডী ও 'শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র'পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক শ্রীরামনাম-সংকীর্তন গীত হইবার পর স্বামী সংশুদ্ধানন্দ শিবানন্দ-জীবনী এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শিবানন্দ-বাণী আলোচনা করেন।

আমেদাবাদ ঃ স্থানীয় অখণ্ডানন্দ-হলে গত ৩রা ডিসেম্বর বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দশম বার্ষিক অধিবেশন গুজরাত রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বলেন, স্বামীজী ভারতের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক

জাগরণের পথ-প্রদর্শক। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর উদার সার্বভৌম ভাব ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

কার্যবিবরণী

লক্ষ্মীপুর ২৪ পরগনা: স্বামীজী সেবাসংঘের ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়াছি। গ্রামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের প্রচেষ্টায় গত ১৯৫২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র সংঘটি নানা সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম হইতেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা-পরিষদ-কর্তৃক অনুপ্রাণিত। উল্লিখিত দুই বছরের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

বিভাগ	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	
	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (৫ম—১০ম শ্রেণী)	২৭	৩৪
দুঃস্থ ছাত্রদের ছাত্রাবাস	২১	২৮
শিশু-বিভাগ (৬-১৪ বছর পর্যন্ত)	৩৪	৪৪
বয়স্কশিক্ষা-বিভাগ	৩১	৪০
সারদা পাঠচক্র (সভ্য-সংখ্যা)	২৭৬	৩০০
দুগ্ধবিতরণ (প্রতিদিন)		৩০০

কলিকাতা: দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা পরিস্ফুট। দুঃস্থদিগকে সাহায্য, দুগ্ধবিতরণ, গ্রন্থাগার-পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। চিকিৎসা-বিভাগে লক্ষাধিক রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। কর্মকুশলতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে, ইহাতে আমরা আনন্দিত।

নবদ্বীপ: শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির ১৩৬২-৬৫ বর্ষের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। সমিতি কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজার্চনা, ভোগ ও আরাত্রিক ব্যতীত সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ১লা জানুআরি বোম্বাই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ৮ দিন ব্যাপী ৩৬তম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। শ্রীনেহরু বলেন, রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ তাঁহার যে গভীর বেদনাবোধ তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহা-রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বাংলা সাহিত্যের সহিত মারাঠী সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ কবির বাল্যকাল হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনালেখ্য বিবৃত করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, সম্মেলনের উদ্যোক্তা শ্রীসঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। সম্মেলনে বহু বিদেশী প্রতিনিধির সমাবেশ হইয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

গত ৩রা জানুআরি রুড়কীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন: প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়া মানুষ যে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে, উহা এত বিশাল যে, উহার অপব্যবহারে আবিষ্কারকের দলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও বিদেশ হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। সাত দিন ব্যাপী সম্মেলনে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে সভাপতিত্ব করেন, মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীলরতন ধর।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন

গান্ধীগ্রাম (মাদ্রাজ): এ বৎসর আন্তর্জাতিক যুদ্ধপ্রতিরোধী সম্মেলনের দশম ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন (Tenth Triennial of War Resisters' International) অনুষ্ঠিত হয় ভারতে। এশিয়াতে এরূপ সম্মেলন এই প্রথম। গত ২১শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরাই জেলায় গান্ধীগ্রামে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতের সর্বোদয়-কর্মিগণ এবং ইওরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগণ অহিংস উপায়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনের একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা করেন।

এ বৎসর সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শান্তিসেনা-গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সেনাবাহিনী সমস্ত সরকার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে স্বাধীন থাকিবে। আলোচনার সার সিদ্ধান্তসমূহকে একটি বিবৃতির আকারে উত্থাপন করেন বৃটেনের প্রধান শান্তিবাদী নেতা স্টুয়ার্ট মরিস। আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি হ্যারল্ড বিং এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দেশের অগ্রগণ্য চিন্তানায়কগণ বিশ্বশান্তিসেনা-সংক্রান্ত আলোচনা করেন। সম্মেলনের আবেদন অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের ১০।১২ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবিত সেনাবাহিনীর সৈনিকরূপে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৫ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (১৯.২.৬১) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।



ঊর্ধ্বমূল

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫ ৩,৪

সাধারণ বৃক্ষের মূল নিম্নদিকে, শাখাপ্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তারিত—কিন্তু সংসাররূপ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে, মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ইহার মূল। অহঙ্কার প্রভৃতি ইহার শাখাসমূহ নিম্নদিকে এবং কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমুদয় ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে 'অশ্বত্থ' অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্ত থাকিবে কিনা বলিয়া মনে করেন, তিনিই বেদবিৎ। এই সংসার-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলি নূতন পল্লবের ন্যায় সেই শাখাসমূহ হইতে ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সংসাররূপ অশ্বত্থের অবান্তর মূলসমূহ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ। অধোদিকে এইগুলি মনুষ্যলোকে প্রসৃত হইতেছে।

ইহলোক এই অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপ, ইহার আদি অন্ত—এমন কি মধ্যও উপলব্ধ হয় না, স্বপ্ন ও মরীচিকার ন্যায় ইহা দৃষ্ট হয় ও লুপ্ত হয়। এই সংসারের আরম্ভ নাই, ইহা অনাদি; ইহার অন্ত নাই, ইহা জ্ঞাননাশ্য, অন্য প্রকারে নাশ্য নহে; ইহার স্থিতিও জানা যায় না, কারণ ইহা যথার্থ নয়, প্রতীতি মাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্প আর অনুভূত হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞান হইলে আর পৃথক্ জগৎ অনুভূত হয় না।

দৃঢ়মূল অনিত্য সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া সেই নিত্য ব্রহ্মপদের অন্বেষণ করা উচিত। যে অনুভূতি হইলে আর সংসার অনুভূত হয় না, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। 'যেখান হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি ব্রহ্মপুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি'—এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে

অচিনে গাছ

১৮৮৩ খৃঃ ২১শে জুলাই কলিকাতার রাজপথে গাড়ীতে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চলিয়াছেন ভক্তগৃহে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানের আকর্ষণে। পথিমধ্যে 'মণি' ('কথামৃত'-লেখক মাস্টার মশাই) উঠিলেন গাড়ীতে। ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?'

মণি কি উত্তর দিবেন? বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া স্বত-উৎসারিত স্তবের মতো বাহির হইল দুটি কথা: আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন; যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে পার্শ্ববর্তী রামলাল প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন: ওরে বলে কি রে?

বালকস্বভাব ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল না।

কিছু দিন পরে সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন, বলিতেছেন: সেদিন কলকাতা গেলাম—গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি—সবাইয়ের পেটের চিন্তা!··· তবে দু-একটি দেখলাম উর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।···

ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন: যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য! শেষে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন:

আচ্ছা আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?

মণি: আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ: কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি: আজ্ঞে না! আপনার তুলনা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): অচিনে গাছ শুনেছ?

মণি: আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ: সে এক রকম গাছ আছে, তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি: আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার যো নেই!

*   *   *

'মণি'র সহিত নিভৃত গুহ্যকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ আভাসে ইঙ্গিতে কি আত্মপরিচয় দিতেছেন? তিনি কি সূর্যোদয়ের সূর্য? রাত্রির রুদ্ধ অন্ধকারের শেষে—প্রভাতের প্রথম লগ্নে বিস্ফারিত নেত্রে অনায়াসে যাহাকে দেখিতে পারা যায়?—যাহাকে দেখিলে নয়ন-মনের তৃপ্তি হয়? মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, চোখ চাহিয়া সে সূর্য দেখা যায় না—চারিদিকের তীব্র বিচ্ছুরিত আলোকেই তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু সূর্যোদয়ের সূর্য?—ঐশ্বর্য সংবৃত, মাধুর্যের প্রতিমূর্তি; আশায় সমুজ্জ্বল, আশীর্বাদে টলমল। 'ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন।' শেষের কথা দুইটি 'কথামৃতে'র উদ্ধৃতি, শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীকৃতি!

অচিনে গাছ?

না, দেখিবার কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই জিজ্ঞাসা করিলেন 'অচিনে গাছ শুনেছ?'

কে কোথায় শুনিবে? তন্ত্র-পুরাণে পড়িবার

কথা নয়, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল শ্রুতিতেও কি কেহ কখন শুনিয়াছে এই অশ্রুতপূর্ব 'অচিনে গাছে'র কথা?—যাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। কি করিয়া চিনিবে? চেনা তো পূর্ব-দৃষ্ট বস্তুকে পুনর্বার দর্শন করিয়া পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া লওয়া?—কিন্তু এখানে কে কাহাকে কিসের দ্বারা চিনিবে? যাহার দ্বারা আমরা সব কিছু জানিতেছি, সেই জ্ঞানস্বরূপই যে জ্ঞেয়বৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান! 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'—সূর্যের আলোক দ্বারাই আমরা সব কিছু দেখিতেছি, কিন্তু সেই আলোকস্বরূপ সূর্যকে দেখিব কিসের দ্বারা? তবু তো দেখিতে হয়। অনন্তকোটি যোজন বিস্তৃত জলন্ত সূর্য কিরণজাল সংহত করিয়া যখন প্রতিদিন দিক্‌চক্রবালে উদিত হন—তখন তো আমরা প্রতিদিনই দেখি বা দেখিতে পারি—সেই উদীয়মান সূর্যকে, সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বান্তারি দিবাকরকে!

কিন্তু অচিনে গাছকে চিনিব কি করিয়া?

নামেই যে তাহার পরিচয়—তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। গাছ চিনিবার উপায় তাহার পাতা, ফুল ও ফল! কিন্তু এ গাছের পাতা, এ গাছের ফুল, এ গাছের ফল—কিছুরই সহিত আমাদের জানা গাছপালার কোন মিল নাই।

এ সংসারের গাছপালার শিকড় শক্ত মাটিতে, ডালাপালা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত কি এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, এ-সকল গাছের ফুল ফুটিয়া ওঠে নববসন্তের সমীরণ-স্পর্শে, এ-গাছের ফল দেখা দেয় ফুলের পর, ফলের ভারে গাছ হয় অবনত পৃথিবীরই অভিমুখে।

আর অচিনে গাছ? ঊর্ধ্ব আকাশে ইহার মূল, অধঃ ঊর্ধ্বে প্রসৃত শাখা—ইহার আদি অন্ত মধ্য—কিছুই বোঝা যায় না! এ গাছের নিত্য নূতন ধারা, অনিত্যের মাঝে নিত্য, পুরাতনের মাঝে চির নূতন—সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টির বহির্ভূত অথচ সৃষ্টির কারণীভূত—এ এক অনির্বচনীয় সত্তা।

মাঝে মাঝে এ তরুর এক একটি জঙ্গম রূপ দেখা দেয় ধরণীর ধূলিতে, মানুষ মনে করে তাহাকে চেনে; কিন্তু জানা শত-সহস্র জিনিসের সহিত মিলাইতে গিয়া দেখে, মেলে না—কিছুরই সঙ্গে মেলে না; ভাবে, একি বাস্তব, না স্বপ্ন, না কল্পনা! ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখে—না বাস্তব ঠিকই। তবে তথাকথিত বাস্তব পদার্থের মতো নশ্বর নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়—অনিত্য নয়! এ এক শাশ্বত অমোঘ শক্তির অপরূপ বিকাশ! সংসারের মানুষ তাহাকে নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে মাপিতে যায়। বেগুনওয়ালা দেখিতে যায়—এ গাছে বেগুন ফলিবে কি না! রুটিওয়ালা হিসাব করে, ইহার ফলন হইতে কতজনের খাদ্যসংস্থান হইতে পারে! কিন্তু সকলের সাংসারিক সকল আশা ব্যর্থ করিয়া এ গাছ বলিয়া ওঠে: এ অচিনে গাছ—এ লাউ কুমড়া বা বেগুনের গাছ নয়, ধান যব বা গমের চারা নয়, যে পাতা দেখিয়া চিনিয়া লইবে! এর পাতা ফুল ফল—সব একাকার!

অচিনে গাছের অমৃত ফল! দেহের অতীত যে ক্ষুধা, মনেরও মনে যে তৃষা—তাহা মিটাইবার জন্যই এ গাছের অঙ্কুরোদ্‌গম!

অবতার অচিনে গাছ! তিনি না চিনাইলে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না, তিনি ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না! সংসারের সৃষ্ট পদার্থের কোন কিছুর সহিত তাঁহার মিল নাই। সৃষ্টির ভিতরে থাকিয়াও তিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে!

বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রুতিযুক্তি সহায়ে বেদান্তের অখণ্ড সত্তা-চৈতন্য-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্ব যদি বা কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়, অবতার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ সহজ নহে, ইহা প্রধানত বিশ্বাসের বস্তু! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ঈশ্বর কিভাবে সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মানব-শরীরের মধ্যে বাস করেন?—এবং যে কয় বৎসর এরূপ বাস করেন, সে কয় বৎসর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চালাইবার ভার কাহার উপর দিয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন?—কি ভাবে এবং কেনই বা তিনি ক্ষুদ্র নশ্বর মানবদেহ পরিগ্রহ করেন? অবতারবাদ মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এগুলিই প্রবল প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাইব? অবশ্যই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। উপনিষদের অতিরিক্ত যদি কোন তত্ত্ব গীতায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই অবতার-তত্ত্ব!

গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন: আত্ম-মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম এবং ধর্মস্থাপনাদি কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে, তাহাদের জন্ম ও জীবন সার্থক; তাহারা জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়। অপরপক্ষে মূঢ় মানব তাঁহাকে প্রাকৃত মানুষের মতো মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, ঈর্ষা করে, এবং নিজ অজ্ঞতার জন্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়

মানুষ যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে চায় বা বুঝিতে চায়, তবে এই অবতার-তত্ত্বের ভিতর দিয়াই বুঝিতে হইবে। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা করা দেহবান্‌ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইলেও দৃঢ়সংকল্প অদ্বৈতবাদী সাধকের ধ্যানের শেষে বাক্যমনের অগোচর 'বোধে বোধ'রূপে সেই তত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত! সগুণ নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা ঈশ্বর। ইনিই তথাকথিত 'একেশ্বরবাদী'দের উপাস্য এবং প্রার্থনার লক্ষ্য। তদপেক্ষা আরও নিকটে ধ্যান-চিন্তার উপযোগী সগুণ সাকার দেবতা-মূর্তি; সেবা-পূজার মাধ্যমে ইনি সাধকের অন্তর্যামী, হৃদয়-বিহারী! অবতার ঈশ্বরের করুণা-বিগ্রহ, ভক্তের জন্যই অবতার, নরলীলা না দেখিলে যে মানুষের বিশ্বাস হইবে না। তাছাড়া ভক্তি ও ভক্ত লইয়া খেলা করাই অবতার-লীলার প্রধান অঙ্গ, ধর্মস্থাপন তাহার অবান্তর ফল।

নির্গুণ এবং নিরাকার সত্তার ধ্যান যতই উচ্চ হউক, জীব যতদিন নিজেকে দেহমন-বিশিষ্ট মানুষ বলিয়া মনে করিবে, নিজের উন্নতির জন্য ততদিন তাহার একটি আদর্শ প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্য তাহাকে ঈশ্বরের মানুষী লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। সে নিজে চিন্তা করিয়া, কল্পনা করিয়া যত উচ্চ আদর্শই খাড়া করুক না কেন, দেখা যায়—ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত মহচ্চরিত্রের আদর্শভূত এই মহামানবেরা তাহার কল্পিত আদর্শ হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের কল্পিত আদর্শগুলি নিতান্তই অপূর্ণ। তবে দেশকালের প্রয়োজনে তাহাদের প্রকাশ বিভিন্ন; মানব মনের ধরিবার বুঝিবার শক্তি অনুযায়ীই তাঁহাদের প্রকাশ। আদর্শ মানব-জীবনের একটি ছাঁচ (cult) তাহারা রাখিয়া যান, নিজ নিজ জীবন সেই ছাঁচে ঢালিয়া দিলে মানুষ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারে।

ও সমষ্টি জীবনের দ্রুত উন্নতির এই সকল আদর্শচরিত্র মহামানবের উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন নিশ্চিত উপায়

নাই। উপাসনা অর্থে এখানে শুধু মন্দিরে বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে পূজা বা প্রার্থনা করা নয়। উপাসনা অর্থে সমীপে আসীন হইয়া আদর্শানুযায়ী চারিত্রিক গুণগুলি আয়ত্ত করা, নতুবা শুধু স্তবস্তুতি পূজাপাঠেই যদি উপাসনা পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে মতান্তরিত বা ধর্মান্তরিত হইলেও তাহাতে জীবন রূপান্তরিত হইবে না।

ঈশ্বর-শক্তি যখনই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই তিনি নিজ জীবন দ্বারা অতি কঠোর কঠিন আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং এই পৃথিবীর মাটি হইতে কতকগুলি মানুষ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দিব্য জীবন সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি কথাগুলি লইয়া মানুষের কত মত-বিরোধ! মানুষ এটুকু বুঝে না একই জিনিস বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। চরম-জ্ঞানে যিনি ব্রহ্ম, সৃষ্টির দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর। অন্তর্যামি-রূপে তিনিই পরমাত্মা—ভক্তের চোখে তিনি ভগবান্, কখন বা নরদেহধারী অবতার!—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি কথ্যতে।'

কি অভ্রান্ত ভাষায় বিরোধের মীমাংসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া গেলেন সমন্বয়ের বাণী: বেদে যাঁকে বলেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, পুরাণে তাঁকেই বলেছে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। আবার তন্ত্রে তাঁকেই বলেছে সচ্চিদানন্দ শিব।—আমি তাঁকেই 'মা' বলে ডাকি।

কি অপূর্ব সমন্বয়! একই জলকে কেহ বলে জল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওয়াটার, কিন্তু বস্তু সেই একই জল, পানে হয় তৃষ্ণা-নিবারণ। আমরা বস্তু ছাড়িয়া নাম-রূপ লইয়া কলহ করিতেছিলাম; শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া নিজের জীবন দিয়া দেখাইয়া গেলেন—শত শত উপমা দিয়া বুঝাইয়া গেলেন, প্রকৃত তত্ত্ব কি! 'ষড়্‌দরশনে না পায় দরশন' এমনই গভীর এই তত্ত্ব। আবার সরল পবিত্র হৃদয়ে ইহা আপনা হইতেই উদ্‌ভাসিত হয়।

অচিনে গাছের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে শত শত হৃদয়ের আবিলতা দূরীভূত হয়, কুটিলতা সরল হইয়া যায়। শত শত রাজপুত্র ও কত বণিক্‌শ্রেষ্ঠ ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ-সাধকে পরিণত হয়! ব্যর্থকাম ধীবরের দল মাছ ধরা ভুলিয়া মানুষ-ধরা সাধুসন্তে রূপান্তরিত হয়! তার্কিক জ্ঞানী অশ্রু-অভিষিক্ত ভক্তে পরিণত হয়!

মানুষ তাঁহাদের নানা নাম দিয়াছে—ঋষি, অবতার, মেসায়া, প্রফেট; ইঁহারা জগতের হইয়াও জগতের অতীত, যেন দুই জগতের সংযোগ-সূত্র। ইঁহারা আর এক জগতের এক উচ্চতর জীবনের বার্তা লইয়া আসেন; মানুষ ইঁহাদের না চিনিয়াও বুঝিতে পারে—ইনি আত্মার আত্মীয়।

এমনই এক অচিনে মানুষের প্রভাবে আবার এক রূপান্তরের পালা শুরু হইয়াছে। এবার বাহ্য ঐশ্বর্যের একান্ত অভাব, শাস্ত্রপাণ্ডিত্য প্রায় বর্জিত বলিলেই হয়। অথচ তাঁহার গ্রাম্য ভাষার কি অমোঘ শক্তি, বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াও তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ভাষার খোসার অভ্যন্তরে ভাবের শস্য লুকানো রহিয়াছে; ক্ষুধার্ত মানবের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য। দেশ-বিদেশে বিদ্বান্-মূর্খ নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা পড়িয়া, আলোচনা করিয়া জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছে। কেহ মনে করেন, তিনি জ্ঞানী; কেহ বলেন, না,

তিনি ভক্ত; কেহ বলেন, তিনি সাধক; কেহ বলেন, তিনি সিদ্ধ; সংসারী দেখেন, তিনি সংসারী; সন্ন্যাসী ভাবেন, তিনি সন্ন্যাসী; কাহারও মতে তিনি অবতার; কেহ বা অনুভব করিয়াছেন: যেখান হইতে যুগে যুগে অগণিত অবতার আবির্ভূত হইতেছেন, তিনি সেই অবতরণের উৎস-মুখ! শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ এই 'অচিনে গাছ'কে কে চিনিতে পারিয়াছে?

মাঝে মাঝে তিনি স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন 'কথামৃতে'র অমৃত-কথায়—সেই বহুরূপীর গল্পে! বহুরূপীর বহুরূপ; কেহ দেখে উহা লাল, কেহ দেখে উহা নীল, কেহ বা দেখিয়াছে উহা সবুজ, কখনও বা উহা হলদে। বিবদমান ব্যক্তিদের বিরোধের সমাধান করিবে কে? বহুরূপীর সেই গাছের তলায় যে সর্বদা বসিয়া আছে সেই পারে সমাধান করিতে, আর বহুরূপীই জানে নিজের স্বরূপ!

আবার একটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—সেই কাপড় ছোপানোর গল্পে! 'তুমি কি রঙে তোমার কাপড় ছোপাতে চাও, লাল? এই নাও লাল। তুমি? নীল? এই নাও নীল।' শেষে একজন নীরব দর্শককে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'তুমি যে রঙে রঙেছ আমার সেই রঙ চাই!' সে রঙ কি? সে রঙ অচেনা, অতি-চেনা! সে বর্ণ বর্ণাতীত, বর্ণনাতীত।

তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ আক্ষেপ: বাউলের দল এসেছিল, নেচে গেয়ে তারা চলে গেল। কেউ চিনতে তাদের পারলে না।' তবু এ বাউলের দলকে আসিতে হইবে, বারে বারে আসিতে হইবে—অচেনাকে চিনাইয়া দিবার জন্য; যে ধরিতে চায় না, যে ধরিতে পারে না, তাহার কাছে নিজেকে ধরা দিবার জন্য।

'বীরেন ও ধীরেন'

আসামের অভিমুখে পদযাত্রার পথে—আচার্য বিনোবা ভাবে গত ১০ই ফেব্রুআরি বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই দিনই ইসলামপুরে একটি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। বাঙালী চরিত্রের যে দুইটি দিক বিনোবার চোখে ধরা পড়িয়াছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙালী যদি ইহার মর্ম গ্রহণ করিয়া জীবন গঠন করিতে পারে, তবে সে নিশ্চয় একটি শক্ত ও সবল জাতিতে পরিণত হইয়া আজিকার দুরবস্থা অতিক্রম করিতে পারিবে।

বিনোবা বলিয়াছেন: বাংলা দেশে দুটি নাম প্রায় শোনা যায়, বীরেন ও ধীরেন। এ দুটির মধ্যে 'ধীরেন'ই বেশি প্রচলিত। 'বীরেন্দ্র' শক্তি এবং সাহসের প্রতীক, তবু অনেক সময় সে অধৈর্যের লক্ষণ প্রকাশ করে। কিন্তু সাহস ও ধৈর্যকে একসঙ্গে চলিতে হইবে। তাই চাই—'বীরেন' ও 'ধীরেন' মিলিত হউক; অর্থাৎ চাই বীরত্বের সহিত ধীরতার মিলন।

মানুষ যদি এই দুইটি গুণের অনুশীলন করে—অর্থাৎ রজোগুণের অনুশীলন করিয়া বীর হয় এবং সত্ত্বগুণের অনুশীলন করিয়া ধীর হয়, তবেই সে তমোগুণ-জনিত জড়বৎ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-সমাজে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে; সচেতন মানুষের মতো জীবন যাপন করিতে পারে

চলার পথে

'যাত্রী'

ছোট ছেলে তার সুমুখের সাজানো খেলনার সবগুলিকেই চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কোন একটার উপরেই তার মন বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। সেই রকম আমাদের সুমুখে বাসনার নানান খেলনার ভিড়ে, আমাদের চিরন্তন শিশুমন নানান চাহিদাকে আঁকড়ে রাখতে চাইলেও কোন একটিমাত্র বাসনাই তাকে বেশীক্ষণ আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারে না। তাই দেখা যায়, এই মুহূর্তে যে বাসনা আমাদের উৎপীড়িত করছিল পরমুহূর্তেই আবার তাকে ছেড়ে, অন্য আর একটাকে ধরেছি। এর কারণ বোধ হয়, শিশুর মতো মন নিয়ে, আমরাও ঠিক কোন্‌টিকে যে চাই, তা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া, কোন্‌টা যে চাই তা সঠিক বুঝতে হলেও মন ও মননের যে স্তরে আমাদের ওঠা উচিত, সাধারণতঃ তার অনেক নীচেই থাকি ব'লে আমাদেরও যথার্থ দিগ্‌দর্শন হয় না।

ঐ দিগ্‌দর্শন করতে গেলে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেতে হবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের মধ্যে আমি তো একটি কণামাত্র। কথাটা ঠিকই, তবুও এইভাবে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে ধরে নিজের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করলে আমাদের স্বমহিমার প্রকাশ হয় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা পরিমাণে ক্ষুদ্র হলেও মহিমায় বিরাট। আমাদের ক্ষুদ্রবিন্দুর মধ্যেই তো জ্বলছে সেই স্বয়ংজ্যোতি! আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে, সমুদ্রের সামান্য জলকণাও যেমন স্বরূপত সমুদ্রের পরমাত্মীয়; তেমনি আমি মানুষ, দেহের পরিমাপে ক্ষুদ্র হলেও, অন্তর-সত্তায় ব্রহ্মের বিরাট সত্তার উত্তরাধিকারী। তাই আমার যোগ—অল্পের সঙ্গে নয়, ভূমার সঙ্গে। আর ঐ যথার্থ সম্বন্ধের আবিষ্কারের পথেই আমার স্বরূপ, আমার মনুষ্যত্ব, আমার 'আমিত্বকে' ধরতে পারি। আমি সামান্য বীজ হলেও মহামহীরুহের সম্ভাবনাও যে রয়েছে আমারই মধ্যে—এই বোধকেই তো করতে হবে আবিষ্কার। আর সেই জন্যই আমার শক্তি, সেই জন্যেই তো এই হৃদ্‌-স্পন্দন।

আমার মধ্যেকার বিরাট-সত্তার 'বোধকে' আবিষ্কার করবার জন্যই তো এই জগৎ। আর এই জগতের মাঝে সেই 'সঠিক'কে অনুভব করবার জন্যই তো এই জগদ্‌-ভ্রান্তি। চারিদিকে এই ভুলের পুঞ্জীভূত সমারোহের মধ্যে কোন্‌টি নির্ভুল, কোন্‌টি ধ্রুব, কোন্‌টি সত্য, তা জানাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব!

তাহলে মাতৃরূপা মায়া-শক্তির রচা এই জগৎ বা সৃষ্টিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। মা-ই এ সব করেছেন—তাঁর ছেলেদের ভোলাবার জন্য, আবার ভুল ভেঙে সে যথার্থকে পাবে বলেও। মা দেখতে চান: ছেলে মাকে চায়, না খেলনাকে চায়। এ জগতে এসে যে কেবল খেলনা নিয়েই মেতে রইল, তার আর নিরন্তর মায়ের কোলে চড়া হ'ল না। তা বলে, মা কিন্তু এজন্য দায়ী নন। তিনি তাঁর সন্তানের মধ্যে দুটো বৃত্তিই দিয়ে রেখেছেন। এক বৃত্তিতে সে খেলে, আর এক বৃত্তিতে সে খেলা ছেড়ে মাকে ধরে। এই বৃত্তিদ্বয়ের যে কোন

একটিকে বাছাই করবার জন্য কিন্তু মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তবে মা চান, ছেলে ভালটাই বেছে নিক—তার রুচি মতো। তাই তাঁর ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য মা এ জগতে এনে দেন তাঁর ভাল ছেলেদের, সাধকদের, সত্যপথে চলার বিভিন্ন যাত্রীদের। যাঁরা এসে তাঁদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান—শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধানটিকে, পথ-শেষের মহান্ গন্তব্যটিকে। এই সঙ্গে তাঁরা আরো বুঝিয়ে দিয়ে যান—জীবনই মানুষের সবচেয়ে দামী জিনিষ; এবং এই দামী জিনিষ সবচেয়ে চড়া মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া উচিত অর্থাৎ মহত্তম উদ্দেশ্যেই জীবন যাপন করা উচিত।

আমরা কিন্তু তা না ক'রে সাধারণভাবে উদরপূর্তির চেষ্টায় ও বাসনা-ভোগেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে এ পৃথিবী থেকে সরে যেতে বাধ্য হই। মহারত্ন এই জীবনকে সামান্য কাচখণ্ডের মতো হেলায় হারাই। এই হারানোকে তথা নষ্ট করাকে আটকাতে গেলে আমাদের বাসনার উর্দ্ধায়ন চাই।

বাসনা থেকে নিবৃত্ত হওয়াটাই সব নয়। প্রবৃত্তির পরগাছা ও আগাছা শুধু কেটে ফেলে দিলেই হবে না—একেবারে শিকড়-সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তা না হ'লে, আবার তারা অনুকূল আবহাওয়ায় সঞ্জীবিত হ'য়ে আবার আমাদের প্রবৃত্তির আওতায় টেনে নিয়ে আসবে। তাইতো সংসার ছেড়ে হিমালয়ের কন্দরে ছুটে গেলেই যে সব ছাড়া হ'য়ে গেল, তা নয়। কারণ, বাসনার বীজ ও শিকড়গুলো যদি সেই সঙ্গে মনের আঙিনায় গুপ্ত ও সুপ্ত থেকে যায়, তা হ'লে সেই নির্জন হিমেল-আলয়েও তারা আমাদের দুর্বল-মুহূর্তের বারিসিঞ্চনে পত্রে পুষ্পে শোভিত হ'য়ে উঠবে। তাই বাহ্যত্যাগ বা ছাড়াটাই বড় কথা নয়; যোগটাই অর্থাৎ ধরাটাই আসল কথা। তাইতো বাসনা ছাড়লাম, সেটাই সব কথা নয়—ঈশ্বরকে ধরলাম, তাঁর সঙ্গে যোগ-সৃষ্টি করলাম, সেইটেই আসল কথা। ভগবান নিজ মুখেই বলেছেন: তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।—যারা তাদের চিত্ত নিঃশেষে আমাকে দিয়েছে, ভালবাসায় যারা আমারই ভজনা করে, তাদের আমি নির্মল জ্ঞান দান করি, আর তারাও সেই নির্মল জ্ঞানের পথ ধরেই আমাকে লাভ করে।

চল পথিক ফাগুনের ঝরা-পাতার সূত্র ধরে আমরাও আমাদের বাসনার হলদে পাতার রাশি ঝরিয়ে, নতুন পাতায় সবুজ হ'য়ে উঠি, চল। শুধু ত্যাগের শূন্যতা নয়, গ্রহণের পূর্ণতায় ভরে উঠি, তারপর চল সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ হবার পথে চলি। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ

স্বামী নির্বেদানন্দ

ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের ভাটার টান

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে এসেছে। ভারতের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার ললাট উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে মহামূল্য মণিরত্নে—বৈদিক যুগের তরুণ আর্যজাতির আধ্যাত্মিক পিপাসায় উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতির আবেগোচ্ছল বাণীতে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের নৈতিক নিষ্ঠায়। দেখা যায়, তাকে মহিমান্বিত ক'রে রেখেছে অমর মহাকাব্যগুলির আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজন-বোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-প্রবণতা এবং মুনিঋষিদের অনুপম পবিত্রতা ও বিমল ভক্তি। আর দেখা যায়—সংস্কার-সাধনের প্রবল ইচ্ছা-প্রবাহ ছুটে চলেছে তার যুগান্তকারী ধর্মান্দোলনগুলির সঙ্গে সঙ্গে। আদিম ও মধ্যযুগের ভারতের এই অপূর্ব সাফল্যের কথা ভাবলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী সংস্কৃতির এই গৌরবোজ্জ্বল ক্রমোন্নতির কথা চিন্তা করলে হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষদের অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন ভরে ওঠে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতের এই মহিমা দেখে তার ঐতিহাসিক অভিযানের পরিণতির কথা জানবার ইচ্ছা স্বতই মনে জেগে ওঠে। নবযুগের আবির্ভাবে এই অভিযান কি থেমে গেছে? মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত কি মিশরীয় 'মমি'-র মতো গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সুচারু অলঙ্কার-ভূষিত, ক্রমক্ষীয়মাণ মৃতদেহমাত্রে পরিণত হয়েছে? মহত্তর গরিমময় ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলার মতো তার জীবনের স্পন্দন, তার প্রাণশক্তি কি চির-স্তিমিত? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরপেক্ষ দর্শকের মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ভারত চলেছে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পঙ্কিল পথ বেয়ে অতিকষ্টে। ইংরেজ এসে দেশের স্বাধীনতা হরণ করার পর তার ওপর বিদেশী সভ্যতার প্রভাব অতি দ্রুত বিস্তৃত হ'তে থাকে। রাজনীতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ভারত সন্দিহান হ'য়ে উঠল তার প্রাচীন সভ্যতায়; হীনতা-বোধের কালিমায় তার ললাট হ'ল কলঙ্কিত। বিজেতার সভ্যতাকে নিজের সভ্যতার চেয়ে মহত্তর ব'লে মনে করার ফলে সে-সভ্যতার দিকে চেয়ে তার চোখ গেল ঝলসে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবাসীর মনের ওপর এই প্রাধান্যের আসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় আদর্শবাদের যে প্রবাহ উত্তাল-তরঙ্গে এসে দেশের বুকে আছড়ে প'ড়ল, প্রাচীন সভ্যতার নোঙর থেকে ভারতকে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্ট।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হ'ল, তার ঝোঁক ছিল এমন সব মানুষ গ'ড়ে তোলার দিকে, জাতিতে ভারতীয় হলেও তাদের রুচি ও চিন্তাধারা হবে ঠিক ইংরেজদের মতোই। সে শিক্ষার প্রভাবে ভারতের অন্তর্জীবন ভেঙে যাবার গতিবেগ হ'য়ে উঠল দ্রুততর। এই বিজাতীয় শিক্ষার

মাধ্যমে তরুণের দল সংস্কৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা অর্জন করতে লাগল; যেমন: সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, ভারতে তার কিছুই নেই; তার সমগ্র অতীত ব্যয়িত হয়েছে শুধু কতকগুলো অলীক সত্যের সন্ধানে; সত্যি যদি ভারত বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে নিজেকে পুরোপুরি ইওরোপীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢেলে গড়তে হবে। বলা বাহুল্য, এই সব যাদুমন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে ভারতের চেতনা ঝিমিয়ে প'ড়ল।

সাংস্কৃতিক মোহের প্রচণ্ড প্রভাবে ভারতবাসীরা যখন এভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, তখন নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির অনুগামী কতকগুলো অশুভ প্রভাব এসে নিজস্ব আদর্শ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল।

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের ওপর দিয়ে নাস্তিকতার প্লাবন বয়ে গেল। নামজাদা নাস্তিকদের বিপুলশক্তিময় চিন্তাধারায় ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের জড়বাদ-সহায়ক আবিষ্কার-কাহিনীতে ইংরেজী সাহিত্য তখন ভরপুর। শূন্যবাদী চিন্তাও হিন্দুবিশ্বাসের দুর্গ আক্রমণ ক'রল। শতশত চিন্তাশীল মনীষী তখনই আত্মসমর্পণ ক'রে প্রকাশ্যভাবেই বশ্যতা স্বীকার করলেন জড়াত্মক বস্তুবাদের কাছে; আর শুরু করলেন তারই ছাঁচে জীবন গঠন করতে। এত বড় আঘাত হিন্দুসমাজ সহ্য করতে পারল না, ভিত নড়ে গিয়ে তার ভাঙন শুরু হ'ল।

এ আঘাত সয়েও যাঁরা রয়ে গেলেন, আরও একটা বিধ্বংসী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হ'ল তাঁদের। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন আর খৃষ্টধর্ম-প্রচার একসূত্রে গাঁথা ছিল, খৃষ্টান মিশনারীরা এ-দুটি কাজ একসঙ্গেই করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, প্রচারক হিসাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব সঙ্কীর্ণ। র মতবাদের ওপর তাঁদের একগুঁয়ে বিশ্বাস, আর মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহ, এই দুই মিলে তাঁদের ক'রে তুলেছিল অন্যধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং অন্য মতবাদের উৎকট সমালোচক। অখৃষ্টান ধর্মগুলিকে কোন মহৎ বা হিতকর ভাবের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, খৃষ্টধর্ম ছাড়া আর সব ধর্মের ওপরই তাঁরা উপেক্ষাভরে ঘৃণার বিষ উদ্‌গিরণ করতেন, আর বর্ষণ করতেন অজস্র অভিসম্পাত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পদমর্যাদার জন্য তাঁদের প্রচারকার্য দেখাতও খুব জমকালো। জনসেবক-মর্যাদা-ভূষিত ও শাসকজাতির কুলগর্বমণ্ডিত হ'য়ে তাঁরা দেখা দিতেন শিক্ষাব্রতী, সংবাদপত্র-সেবী ও সমাজসেবক রূপে। তাছাড়া আচরণে তাঁরা লোকের চিত্তহরণ করতে পারতেন, এবং তাঁদের ভেতর কয়েকজন অন্ততঃ এদেশের লোকদের সত্যই ভালবাসতেন। এই সব কারণে তাঁদের প্রভাব আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছিল। খৃষ্টধর্মের এই সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা শিক্ষামন্দিরগুলির তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে তাদের খৃষ্টধর্মে অনুরাগীও ক'রে তুলতেন। এইসব ধর্মান্ধ উৎসাহীদের অপরকে ধর্মান্তরিত করার প্রবৃত্তি হিন্দুসমাজে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

এভাবে পরাধীনতা আর তার সহচর নতুন শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি হিন্দুসমাজের বুকে দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে। উৎকট সংস্কৃতি-সঙ্কট-জাত লোকের দল সারা দেশজুড়ে হঠাৎ মাথা তুললেন। রুচি, আচরণ,

চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবননীতি—সব বিষয়েই এঁরা ছিলেন না ভারতীয়, না ইংরেজ। নিজেদের পূর্বপুরুষদের ও প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর এঁদের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না; দেশ-শাসক ও দেশের চিন্তাধারার নিয়ন্তারূপে আবির্ভূত ইংরেজদের অনুকরণ করাকেই এঁরা সমীচীন ব'লে ধরে নিয়েছিলেন, যদিও সে অনুকরণ ঠিকমত হ'ত না।

কাজেই কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে সে-সময়কার সমাজে, বিশেষ ক'রে ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত মহলে, সংস্কৃতির চরম বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। হিন্দুসমাজের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি সেদিন ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, সে-কাঁপনে হয়তো একেবারেই গুঁড়িয়ে যেত সে। হিন্দুজাতি তখন চিরবিলুপ্তিরূপ বিপদ্-সাগরের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভারত তখন টলমল করছে; মনে হয়েছিল ধ্বংস তার অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কার-আন্দোলন

কিন্তু তা হবার নয়। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে ভারত যেন মন্ত্রবলে বেঁচে গেল। অলক্ষিতে কি যেন একটা ঘ'টল! বোধ হয় দৈবী ইচ্ছাতেই সেটা হয়েছিল, যার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের বহু অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে সংস্কৃতি-সঙ্কটের পঙ্কে ভারত যখন প্রায় পূর্ণ নিমজ্জিত হ'তে বসেছে, তখন পায়ের তলায় হঠাৎ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে প্রাণপণ সচেষ্ট হ'য়ে উঠল। জাতির অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রাণশক্তি এতদিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠে সে অভিযান শুরু ক'রে দিল ভারতীয় সংস্কৃতির বিলোপসাধনে উদ্যত প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির এই সংগ্রামেচ্ছা বাঞ্ছিত ফলই প্রসব করেছিল। হিন্দুজাতির জাগরিত আত্ম-প্রত্যয়ের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বিদেশী সভ্যতার মোহের আবরণ ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে সরে যেতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে তাকে চালিত করার জন্য একের পর এক দেখা দিতে লাগল সমাজ-সংস্কারের ও ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন।

ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজই এই-জাতীয় আন্দোলনগুলির অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নবভারতের প্রথম বরেণ্য দেশপ্রেমিক ও সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এর প্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়া হিন্দু-আচারপ্রিয়তার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সম্পূর্ণ আধুনিক ও উদার এক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, খৃষ্টান মিশনারীদের দোষদর্শী সমালোচনার ও নাস্তিকদের যুক্তিতর্কের সামনে দাঁড়িয়ে, সে-সবের প্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তার ভেতর থেকে কিছু কাটছাঁট ক'রে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, হিন্দুদের সমস্ত দেবতাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ না করলে আধুনিক সমালোচকদের নিরস্ত করা সম্ভব হবে না কিছুতেই। ভেবেছিলেন, যেমন করেই হোক সর্ববিধ সাকারোপাসনার অবসান ঘটাতেই হবে; সেটুকু ঘটানো সম্ভব হ'লে হিন্দুধর্মের ভেতর লজ্জাজনক কিছু আর থাকবে না। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সাকার-ভাবের

সঙ্গে যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য-বিধান তিনি করতে পারেননি। ঈশ্বরের সাকারত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিচালিত আধুনিকবুদ্ধিজাত গোঁড়া বিদ্বেষ নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। উপনিষদ্ থেকে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক অংশগুলি পরমানন্দে গ্রহণ করলেন তিনি। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদের এই ধারণা একেশ্বরবাদী মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে তিনি বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছিলেন। উপনিষদে ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ছাড়া আরও যে সব ভাবের উল্লেখ রয়েছে, সে-সবের সন্ধান যে তিনি পাননি, তা সহজেই বোঝা যায়। যাই হোক, হিন্দুধর্ম থেকে প্রয়োজনমত উপাদান আহরণ ক'রে এবং সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে রাজা রামমোহন একটি উচ্চাঙ্গের একেশ্বরবাদ গ'ড়ে তুললেন। বৈদেশিক একেশ্বরবাদগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অবলীলাক্রমে হবার মতো শক্তি ছিল সে মতবাদের।

এই মতবাদ তুলে ধরার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। যদিও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্ববিধ সুরলহরী তোলার মতো তন্ত্রীর অধিকার-গৌরবে হিন্দুধর্ম মহিমান্বিত, তবু আসর জমাবার জন্য তৎকালীন প্রবল চাহিদার অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদের একতারাটিই বেছে নিয়েছিল। যাই হোক, যারা সর্বতোভাবে সাকারোপাসনা পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত, তাদের সকলের জন্যই জাতি-বর্ণ-সমাজ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার ছিল অবারিত। শর্তটি অবশ্য অনেকের পক্ষেই প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, অনমনীয় বা একগুঁয়ে গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, ব্রাহ্মসমাজে তার কিছুই ছিল না।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের একটা সাড়া প'ড়ে যায়। সামাজিক প্রথাগুলির পুনর্বিন্যাসের এই কাজ পেয়ে নবশিক্ষাপদ্ধতি-সঞ্জাত সাম্য ও স্বাধীনতাবোধ স্বচ্ছন্দ বিহারের একটা অবকাশও পেয়েছিল। সর্বপ্রকার সামাজিক দুর্নীতির হাত থেকে স্ত্রীজাতিকে উদ্ধার করার কাজে ব্রাহ্মসমাজ উঠে প'ড়ে লাগল। বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতা-মূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সে; এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রতী হ'ল আধুনিক প্রথায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রদানের কাজে। পরবর্তীকালে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ক'রে ব্রাহ্মসমাজ নিজ গণ্ডির ভেতর জাতিভেদপ্রথা একেবারে তুলে দিতেও সমর্থ হয়েছিল।

এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতবাদ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল নাস্তিকতা, খৃষ্টধর্ম ও গোঁড়া হিন্দুমতের বিরুদ্ধে—একই সঙ্গে। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান্ নেতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর এসে যান। সুযোগ্য পরিচালনায় সমাজকে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে যান তাঁরা। আন্দোলনটি মোটামুটি বাংলা দেশেই এবং ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে। বাংলার বাইরে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বড় একটা ছিলেন না কেউ।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় ব্রাহ্মসমাজ কখন কখন বৈদেশিক আদর্শের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ত। তার ওপর খৃষ্টধর্মের ছাপ পড়েছিল প্রথম থেকেই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে নিজ মতবাদের ব্যাখ্যার জন্য রামমোহন প্রটেস্টান্ট একেশ্বর-

বাদীদের যুক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অস্থিমজ্জায় খৃষ্টান আদর্শকে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। সামাজিক প্রথাগুলিকেও পাশ্চাত্যভাব-রঞ্জিত করা হয়েছিল—একটু বেশী রকমেই। বিদেশী ধর্মভাব ও সমাজপ্রথা গ্রহণেচ্ছার এই উৎকট আগ্রহ ব্রাহ্মসমাজকে চিরাচরিত হিন্দুত্বের কাছে পর ক'রে তুলেছিল। তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়াতে হয় তাকে।

তবু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, তার কথা চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যা করা অতি প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক তাই-ই করেছে সে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের কাঠামোটি ইওরোপীয় সভ্যতার চকচকে পাত দিয়ে মুড়ে না দিলে এ-সময় দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে পুরোপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়ার উন্মাদনা থেকে রক্ষা করতে পারা যেত না কিছুতেই। ব্রাহ্মসমাজ ঠিক এই কাজই করেছিল—যেন হিন্দুদের একটি বিশেষ ধরনের সুরা সে বিতরণ করেছিল পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী-করা পাত্রে পুরে। আশানুরূপ ফল এতে পাওয়া যায়। শত শত যুবককে নাস্তিকতা ও খৃষ্টধর্মের বজ্রমুষ্টি থেকে রক্ষা করার কাজে সমাজ এতে খুবই সহায়তা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের এ-কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, সন্দেহ নেই।

আর্যসমাজ

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ব্রাহ্মসমাজ যখন খৃষ্টীয় আদর্শের আবর্তে প্রায় মজ্জমান, তখন সর্ববিধ বৈদেশিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব নিয়ে আর একটি প্রবল ধর্মান্দোলন ভারতের অন্যত্র দেখা দেয়। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে নির্ভীক, অটল, নিরাবরণ প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে তার আবির্ভাব। এই আন্দোলন অবলম্বন ক'রে ভারত আবার তার নিজের পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। এবার তার কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে সে নির্বাধ, বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ আপসহীনভাবে অভিব্যক্ত ক'রল। আধুনিকতার প্রবাহে প্রায় ভেসে যাবার মুখে নিজস্ব আদর্শের সুদৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন ক'রে ভারত হঠাৎ রুখে দাঁড়াল।

এটি হ'ল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক বোম্বাই প্রদেশে প্রবর্তিত আর্যসমাজ-আন্দোলন। হিন্দুধর্মের সর্ববিধ ঐতিহাসিক আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেরও প্রবর্তক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। দয়ানন্দ ছিলেন অভিজাত হিন্দু সন্ন্যাসী, বেদে অগাধ জ্ঞানবান্ পণ্ডিত এবং ভারতীয় রীতিসম্মত দুর্দান্ত তার্কিক। সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসন্তান। সেজন্য হিন্দুমত ও আধুনিতার মধ্যপন্থানুসন্ধী, পাশ্চাত্যধারায় চিন্তাশীল ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে মতের মিল হ'ত না তাঁর মোটেই। হিন্দু-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে বেদের পক্ষ নিয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মতো তিনি নির্ভয়ে লড়ে যেতেন। বিদেশী প্রচারকদের বিদ্বেষের আঘাত সহ্য ক'রে যাবার মতো লোক তিনি ছিলেন না, সমভাবে প্রত্যাঘাত করতেন তাঁদের। খৃষ্টান প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের ওপর যে আক্রমণ চালাত, তার প্রত্যুত্তরে তিনিও খৃষ্টধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। কোনরূপ হীনম্মন্যতা তাঁর ছিল না। মুসলমান-

ধর্মের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প। প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন ব'লে সামনাসামনি একহাত না ল'ড়ে কারও সঙ্গে আপস করতে চাইতেন না তিনি। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্ততা-স্বীকারে এবং পুনর্জন্মবাদ-স্বীকারে তাঁর মতে মত দিতে পারেননি ব'লে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে পারেননি। তাছাড়া হিন্দুধর্মের বৈদিকযুগোত্তর ক্রমোন্নতিতে কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। যথার্থ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে না মিললে তিনি অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রচারিত বৈদিক ধর্মমতের সমালোচনা করতেন নির্মমভাবে।

নিজের মতো ক'রে তিনি বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজ মতানুগ শুদ্ধ বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অতি প্রবল। অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মের কোন স্থান ছিল না তাঁর ধর্মে, সাকারবাদীর বহুনামরূপবিশিষ্ট উপাস্যেরও না। তাঁর এই 'কালাপাহাড়ী' মনোভাবের জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দুসমাজ-সীমার বাইরে এসে দাঁড়াতে হ'ল তাঁকে, আর্যসমাজকে দাঁড় করাতে হ'ল আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে।

সামাজিক প্রথার আমুল পরিবর্তন-সাধনও শুরু হ'ল এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। ধর্মের অঙ্গ হিসাবে জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যক্ত হ'ল, বেদের অধিকারী হিসাবে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য অস্বীকৃত হ'ল, এবং স্ত্রীলোকদের মুক্তি দেওয়া হ'ল বহু সামাজিক অক্ষমতার হাত থেকে। তাছাড়া শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্য বহুমুখী জনহিতকর কর্মসাধনে উৎসাহ আর্যসমাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বেদের প্রতি একদেশী মনোভাবের জন্য আর্যসমাজের ভেতর বহু দোষ এসে ঢুকেছিল। কিন্তু এ আন্দোলনটি যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সুরের পর্দাতেই লহরী তুলেছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। আর এইজন্যই জাতির ধর্মপ্রেরণার মর্মপ্রদেশে গভীরভাবে তা গেঁথে গিয়েছিল। তাছাড়া সাকার-উপাসনার প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ব'লে আধুনিক চিন্তাশীলদেরও রুচিগ্রাহ্য হ'তে পেরেছিল। মূর্তিপূজার পরিবর্তে অগ্নিতে আহুতি-প্রদানরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলনও একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণের সৃষ্টি করে। শেষকথা, সমাজ-প্রথার আমূল পরিবর্তনসাধন তৎকালীন মনোভাবের সর্বথা অনুকূলে গিয়েছিল। এই সব কারণে আর্যসমাজের দীক্ষাদানের প্রয়াস খুব সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। সমগ্র আর্যাবর্তে, বিশেষ ক'রে পঞ্জাবপ্রদেশে, এই নতুন ধর্ম দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। অল্প কয়েক দশকের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক আর্যসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে ভারতের একটি অতি বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশী সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিহত ক'রে আর্যসমাজ এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিপুল সাফল্যের অধ্যায় রচনা ক'রে রেখেছে।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি

ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদেশাগত আর একটি ধর্মান্দোলনের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে; সেটি হচ্ছে থিওজফি-আন্দোলন। পূর্বোক্ত হিন্দু-আন্দোলনগুলির মতো তারও প্রভাব সে সময় খৃষ্টধর্মের ও জড়বাদের আক্রমণ কিছুটা প্রতিহত করেছিল। সোয়েডেনবার্গ, মেষ্টার একহার্ট, জ্যাকব বোমে, শেলিং, ব্যাডার ও মলিটর নামক যশস্বী মনীষিগণ কর্তৃক এই মতবাদ ইওরোপে প্রবর্তিত ও পুষ্ট হয়। অবশ্য রাশিয়ান মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কী এবং সেনাবিভাগের একজন পূর্বতন ইংরেজ অফিসার

কর্ণেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার মতো শক্তিশালী মতবাদে রূপায়িত হয়েছিল। এর ধারাবাহিক সুনিয়ন্ত্রিত প্রচারের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটিও স্থাপিত হয়।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের রহস্যঘন নিগূঢ় তথ্যরাজি থেকে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ ক'রে, এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের রীতির অনুকরণে তাকে মার্জিত ক'রে প্রবর্তকগণ থিওজফির বহিরঙ্গে একটি প্রাচ্য-ভাবের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের দলে। রহস্যময়তা অটুট রেখে নিজ মতবাদকে বিচারসম্মত ক'রে তোলার জন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্ত্বের কয়েকটি উচ্চ আদর্শ মিশিয়ে অদ্ভুত এক ভাব-সংমিশ্রণ তৈরী করেছিলেন। আধুনিক অধ্যাত্মবাদের চিন্তা-প্রণালীর ও নিয়মপদ্ধতির রহস্যময়তার সুগন্ধও একটু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে।

সম্পূর্ণ বিদেশাগত এবং বহু ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এর প্রভাব ভারত-বাসীদের ওপর যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। একদল শিক্ষিত ভারতবাসী দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষা ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিজ ধর্মবিশ্বাস জড়িত রাখতে চাইতেন। অদ্ভুত আনন্দ পেতেন তাঁরা এতে। এই জাতীয় লোক সহজেই আকৃষ্ট হলেন এই মতবাদের প্রতি। তাঁরা দেখলেন, থিওজফি তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কৃত্রিম ঠাটটুকু রক্ষা ক'রে বুদ্ধিজ আনন্দও দিতে পারবে, আবার রহস্য-প্রিয়তার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার খোরাকও জোগাতে পারবে সেই সঙ্গে। কাজেই এ আন্দোলনটির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে নাস্তিক বা খৃষ্টান হওয়ার হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেন তাঁরা।

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অবশ্য থিওজফি হস্তক্ষেপ করেনি, বে-পরোয়া ভাবে কোন সমাজ-প্রথার পরিবর্তন-সাধন করতে যায়নি। এইজন্যই হিন্দুসমাজে থেকেও থিওজফি নিয়ে মাথা ঘামাতে কোন বাধা ছিল না। এই অভিনব ধর্মমতটিকে নিজের ঘরে স্থান দেবার মতো পরিসর হিন্দুধর্মের যথেষ্টই ছিল। তাছাড়া ব্যাপকভাবে হিন্দুশাস্ত্রের সানুবাদ প্রকাশনের মাধ্যমে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হিন্দুধর্মের জন্য কিছু যথার্থ কাজও করেছিল। শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত করার কাজে তার অবদান বাস্তবিকই অনেকখানি।

বহুধর্মের সার-সঙ্কলনে গঠিত ও নতুন মত ব'লে প্রতীত হলেও থিওজফি এভাবে এদেশে যে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল, তা হিন্দুসমাজে শুভ ফলই প্রসব করে। সে দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে. হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল অনেক-খানি, নাস্তিকতার ও খৃষ্টধর্মের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের—বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাঁচিয়েছিল সে; যেমন ক'রে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ বাঁচিয়েছে আর্যাবর্তবাসী হিন্দুদের।

[ক্রমশঃ]*

*The Cultural Heritage of India—(Sri Ramakrishna Centenary Memorial Volume) এর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক অনূদিত। দেহত্যাগের পূর্বে লেখক অনুবাদের প্রথমাংশ দেখিয়া অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া !

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

আমার শরীর ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন,
আমার দু-চোখ ভ'রে আলোকের শরীরী প্রতিমা :
অবধার্য সীমারেখা, অবচ্ছেদি পৃষ্ঠার বন্ধন
উন্মোচিল ইতিবৃত্ত অলৌকিক আপন মহিমা।
পুরাতন পৃথিবীর তন্দ্রালীন রাত্রি-অবশেষে
উন্মুখ উষার তীরে অরুণের দীপ্ত বর্তি নিয়া,
অভীপ্সার নব বেদ-বন্দনার সুরের আবেশে
ব্যাপ্ত হ'লে শুচিস্মিতা তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া।
আত্মার শাশ্বত সুরে নবজন্ম মোর কবিতার :
উদ্গীত আমার কণ্ঠে অনাহত প্রাণের প্রণব ;
উজ্জীবিত হৃদয়ের মুকুলিত স্বপ্নের সম্ভার,
শতাব্দীর সম্ভাবনা—প্রত্যাশার অনন্ত বিভব।
মূর্তিমতী হে দ্বিতীয়া, হে সাবিত্রি, মনোময়ী প্রিয়া,
মনের মুকুরে তুমি পৃথিবীর হৃদয় জানিলে ;
তিমিরের তন্দ্রা ভাঙি—'জন্মদিন'—নবজন্ম দিয়া
চিরন্তনী অধরার সন্ধানেরে নিকট করিলে।
আঁধার হইতে আরো আঁধারেতে ছিল যেই গতি,
তামসী রাত্রির পথে অদ্বিতীয়া তুমি দীপান্বিতা,
আতুর আঁধারী জীবে দীপ ধরি দেখাইলে পথি,
জন্মদিন—তব শিশু শুনাইল জীবনের গীতা।
তাই আমি পথ চলি চিনে চিনে তোমার প্রদীপে
সংশয়-সন্দেহলীন পথে আঁকা জীবন্ত স্বাক্ষর ;
জীবন-জলধি ঘিরে অজানিত প্রাণ-অন্তরীপে,
পিছে ফেলি প্রতিদিন কত বন, কত মরু-চর।
আলোর প্লাবন তব ভেঙে দেছে মোর যত বাঁধ,
রুদ্ধ স্রোত খুলে দেছে মুক্ত ধারা মোর চারিদিক ;
চিত্ত আজি বিত্তবান্ শির-শীর্ষে ধ্রুব আশীর্বাদ,
বক্ষে বহি বহ্নি-শিখা আমি যাত্রী চলেছি নির্ভীক।
জন্মান্তের সঙ্গে আনা, আমার সে ভালবাসা-প্রেম,
সমগ্র চেতনা চিন্তা অনুভূতি—এষণা উথল,
আমার সাধনা দিয়ে, দিয়ে প্রাণ যাহারে পেলেম,
তারি ছন্দ গন্ধ আলো পৃথিবীরে করুক উজল।

বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের দান

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

ধর্মই ভারতীয় ভাবধারার সনাতন গতি-নিয়ামক। বলিষ্ঠ ধর্ম জ্ঞানাশ্রয়ী। তাই নিরন্তর অজ্ঞানান্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের সাধনায় নিমগ্ন অর্থাৎ 'ভা-রত' বলিয়া এদেশের নাম ভারত। কিন্তু উত্থান-পতনের স্বাভাবিক নিয়মে এই 'ভা-রত' ভারতেও পর্যায়ক্রমে ধর্মের অভ্যুত্থান ও অধঃপতন ঘটিয়া আসিতেছে। তবে আশার কথা এই যে, যখনই কোন 'দানবোত্থা' বাধা বা 'ধর্মের গ্লানি' উপস্থিত হয়, তখনই আবির্ভাব ঘটে এমন কোন শক্তিধর পুরুষের, যিনি স্বকীয় মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন মহামানবের আসনে এবং বিস্ময়-বিমূঢ় মানব তাঁহাকে ভগবৎ-সত্তার বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে জানায় প্রণতি। উনবিংশ শতকে বর্ণাঢ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে এদেশে ঘটিয়াছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং তাহারই পটভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচ্যের সাধনার অপূর্ব প্রতীকরূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী আজ সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাঁহার জীবনের স্বরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

The life of Sri Ramakrishna was an extra-ordinary search-light under whose illumination one is able to really understand the whole scope of Hindu religion. He showed by his life what the Rishis or Avataras really wanted to teach. The books were theories, he was the realisation. The man had in fifty-one years lived the five thousand years of national spiritual life, and so raised himself to be object-lesson for future generations.

—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনন্যসাধারণ সন্ধানী আলোর উজ্জ্বল প্রভায় মানুষ হিন্দুধর্মের সমগ্র পরিসর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হয়। ঋষি ও অবতার-পুরুষগণ বাস্তবিকপক্ষে যাহা শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জীবন দ্বারা তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম-গ্রন্থগুলি মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদের সমষ্টি; কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের বাস্তব রূপায়ণ। তিনি তাঁহার একান্ন বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে জাতীয় জীবনের পাঁচ হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি দ্বারা ভবিষ্যৎ মানবের জন্য নিজেকে আদর্শ দৃষ্টান্তে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবন ছিল যেমন অলোকসামান্য, তাঁহার অবদানও ছিল ঠিক তদনুরূপ। অপরাপর ধর্মগুরুগণ নিজ নিজ নামাঙ্কিত বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উনবিংশ শতকের এই মহান্ ধর্মগুরুর কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি এই 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদ-কণ্টকিত পৃথিবীতে নূতন কোন 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদ প্রচার করিয়া অধিকতর বিভেদসৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন নাই। বিভিন্ন ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সংগ্রামশীলতা রহিয়াছে তাহা বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার এই অভিনব অবদান বিশ্বকৃষ্টিকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন করিয়া বিশ্বশান্তির পথ সুগম করিতেছে।

তিনি নিজ জীবনে কেবল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা ও দ্বৈত অদ্বৈত দার্শনিক মতবাদেরই নহে, পরন্তু খৃষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মেরও সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মীয় মতেই সত্যের স্ফুলিঙ্গ নিহিত রহিয়াছে এরূপ সাধারণ শিষ্টাচার-সঙ্গত কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তদ্ভাবভাবিত-সাধনা-জাত উপলব্ধির ফলে তাহাদের প্রত্যেকটিই যে একক ও সামগ্রিকভাবে সত্য, একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-লাভের জন্য আবহমান কাল হইতে যে প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সাধারণভাবে বলা যায় —Eternal Religion বা শাশ্বত ধর্ম। সেই প্রচেষ্টার বিশেষ বিশেষ পন্থা হিসাবে সকল ধর্ম বা দার্শনিক মতবাদই সেই শাশ্বত ধর্মের অঙ্গীভূত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের উদ্‌গাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ী ধর্মের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহা কার্যকর। সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, তেমন যাহাদের ভিতর দিয়া এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, নানারূপ বৈষম্যসত্ত্বেও সেই মানবজাতিও মূলতঃ এক। আত্মোন্নতি বা ক্রমবিকাশ সব ক্ষেত্রে এক তালে চলে না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির রাজ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেখানে একঘেয়ে সমতার স্থান নাই। কিন্তু এই যে বৈচিত্র্য তাহার ধারকরূপে রহিয়াছে এক শাশ্বত সত্তা—ঠিক চলচ্চিত্রের পর্দার মতো, যাহার উপর অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল আলোক-পাত সত্ত্বেও তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারার অনুবৃত্তিক্রমে বহুর মধ্যে একের বা মৌলিক ঐক্যের এই যে জ্ঞান, একমাত্র তাহাই বর্তমান জাতিধর্ম-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা বহুধা-বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বুলি নিতান্ত মৌখিক ও ভিত্তিহীন

৷৷র জীবনের আর একটি দান তাঁহার সামাজিক উদারতা। জ্ঞানাশ্রয়ী প্রেমের সাধনার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা। ইহা দ্বারা তিনি মানুষের পারস্পরিক বা সামাজিক সম্পর্ককে প্রীতির বন্ধনে পরিণত করার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈত-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন লীলার মধ্যে নিত্যের প্রকাশ এবং তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল শঙ্করের জ্ঞান ও চৈতন্যের প্রেম—এই দুয়ের অপূর্ব সমাবেশ। তাই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে মানব-সাধারণের প্রতি ছিল তাঁহার শিবজ্ঞানে জীবসেবার নির্দেশ—যাহা মানুষে মানুষে, প্রাণীতে প্রাণীতে, পারস্পরিক সম্পর্কের মহত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

ব্যক্তিজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দান—ধর্ম-ভিত্তিক জীবনাদর্শ। তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করিতে শিখুক, ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা করুক, এই তাঁহার উপদেশ। কিন্তু তিনি সকলের জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট পন্থার ব্যবস্থা করেন নাই। বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তিনি প্রতিভাত হইতেন বিভিন্নরূপে—বহুরূপীর মতো, এবং তাহাদের ভাবানুযায়ী প্রেরণা দান করিতেন। কিন্তু যে যে-ভাবেই অনুপ্রাণিত হউক না কেন, সিদ্ধি-লাভের উপায়স্বরূপ তিনি সকলকেই মন-মুখ এক করিয়া সরল হইতে, ভগবানে মন গুস্ত

রাখিয়া সংসারে কাজ করিয়া যাইতে, কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঁকাল মাছের মতো সংসারের কাদামাটি হইতে মুক্ত থাকিতে এবং স্ত্রী-জাতিকে মাতৃ-ভাবে দর্শন করিতে বলিয়াছেন এবং নিজের জীবনে সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন

অবশেষে শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বলিয়াছিলেন, চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই। কথাটি নিতান্ত সাদাসিধা রকমের হইলেও ইহার তাৎপর্য গভীর। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শুধু ব্যাবহারিক জ্ঞান দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিদ্যা বিদ্যাই নহে। অবশ্য পার্থিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দও তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানলব্ধ শক্তির মত্ততায় জীবনের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। বর্তমান জড়বাদী জগৎ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

উপনিষদের ঋষির নির্দেশ: দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। ভারত চিরদিন পরা বিদ্যার সহিত অপরা বিদ্যারও সাধনা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পরা বিদ্যার সহায়ক ও অনুসারীরূপে। শুধু প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যেই তাহা ছিল সীমাবদ্ধ; কখনই তাহা খুব গৌরবের আসন লাভ করিতে পারে নাই। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরের স্থপতির কলা-কৌশলের প্রশস্তি আছে, কিন্তু সেই ব্যক্তিটি 'দানব'-আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন; 'ময়দানব'-রূপেই তাঁহার পরিচয়।

আধুনিক কালের মানুষ টেক্‌নোলজির মধ্যেই খুঁজিতেছিল তাহার নূতন দিনের স্বর্গকে; কিন্তু দৈত্যরূপী ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টিনের—আণবিক শক্তির—আবিষ্কারের পর হইতে তাহার সর্ব-প্রকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন দেখিয়া আজ সে বুঝিতে পারিতেছে যে, ধর্মের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহার নবজীবনের সমুদয় সম্ভাবনা।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলিতে কোন আত্মকেন্দ্রিক মতবাদ বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দেশিত বেদান্তজ্ঞানের কথা, যাহা সকল শক্তির উৎস এবং যাহা মানুষের মন হইতে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীভূত করিয়া সৃষ্টি করে এমন এক নূতন মানুষের, যাহার প্রয়োজন আমাদের ঘরে ঘরে। এই ধর্মকে বলা যায় 'মানবধর্ম'। ভবিষ্যৎ মানবকে এই ধর্মে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী ইহাকে শিক্ষা-সূচীতে বিশিষ্ট স্থান দিয়া শিক্ষার্থীকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতেই বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণপ্রদ হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সরল বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটিয়াছে অভিজ্ঞতার অপূর্ব মিলন, দার্শনিক মতবাদ হইয়াছে কার্যকর ধর্মে (Practical Religion-এ) রূপান্তরিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাময় জীবনই তাঁহার বাণী। দেশের সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে সকল তরুণ-প্রাণের উপর ন্যস্ত, তাহাদিগকে তাঁহার এই জীবন্ত বাণী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে হইবে।

শিশু-শিক্ষা

শ্রীমতী রেণুকা সেন

শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে তার অভ্যাস ও চিন্তাধারা সৎপথে চালিত করা প্রত্যেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্তব্য। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিক্ষাবিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্গণ আজ বুঝতে পেরেছেন যে, শৈশবের অভিজ্ঞতার উপরেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে উঠে। তার মধ্যে আবার প্রথম পাঁচ-ছ বছরের মূল্য অতুলনীয়। 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'—এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে প্রথম পাঁচ-ছ বছরের লালনের মাধ্যমে শিক্ষাই শিশুর সারা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

বর্তমান শতাব্দীতে তাই পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষাবিদ্গণ শিশুশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য শিক্ষাকে 'শিশুকেন্দ্রিক' ক'রে গ'ড়ে তোলার আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আর সুফলও পেয়েছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মনীষীরা মানব-জীবনের শৈশবকালকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রীস দেশের কয়েকজন মনীষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লে গেছেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষাকে অবহেলা করে, সে দেশে কখনও উৎকৃষ্ট জাতি গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাঁরা বলেছেন যে শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক ক'রে তৈরী করার ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

আধুনিক কালে শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ফ্রোয়েবেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানির এক ক্ষুদ্র গ্রামে ফ্রোয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হ'য়ে অবশেষে তিনি জঙ্গল-পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে এবং তিনি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করতে মনস্থ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ 'শিশু-কানন' —এই নাম দিয়ে শিশুদের উপযোগী একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। 'শিশু-কানন' সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাগানের চারাগাছ যেমন উপযুক্ত জল, হাওয়া, মাটির রস আর রোদ পেলে আপনিই বেড়ে ওঠে, তেমনি শিশুরাও উত্তম পরিবেশে স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ফুল যেমন বাগানে ফোটে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের নিয়মে, শিশুও তেমনি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব শক্তির প্রকাশ করবে আপনার স্বাভাবিক নিয়মে, অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে; জোর ক'রে ফোটাতে গেলেই সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়বে।

এর পর আমরা আসি 'মন্তেসরি' প্রণালীর যুগে। মাদাম মন্তেসরি (Madame Montessori, ১৮৭০-১৯৫২ খৃঃ) ছিলেন ফ্রোয়েবেলের সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী। ফ্রোয়েবেলের প্রধান শিক্ষা ছিল যে শিশু-প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে তবেই তার সম্পূর্ণ বিকাশ-সাধনে অগ্রসর হওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। মাদাম মন্তেসরিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের নিজের কাজ ক'রে যাবে। শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজন মতো তাকে সাহায্য করবেন, নির্দেশ দেবেন মাত্র; কিন্তু তার কোন

প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না। শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন্তেসরি-উপকরণগুলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, শিক্ষিকাকে সেইজন্য আগে থেকেই শিক্ষা-সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ (environment with educational possibilities) রচনা ক'রে রাখতে হবে এবং তারই ফলে শিশুর আনুভূতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হবে।

ফ্রোয়েবেল অপেক্ষা মাদাম মন্তেসরি শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রবর্তন তিনিই প্রথম করেন। শিশু স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীকে 'শিশুর শতাব্দী' আখ্যা দিয়ে সমস্ত সভ্য দেশই যে আজ শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার বিষয়।

ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরও দান অপরিসীম। শিশু-মন কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তাঁর শত শত গানে ও কবিতায় সে কথা তিনি ঘোষণা ক'রে গেছেন। শিশুর জীবন কিভাবে প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে এবং পরিশেষে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে রয়েছে, তা তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মা ও শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর 'শিশু' কবিতা-গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

মায়ের সঙ্গেই শিশুর যত আদর-আবদার, ভাব-বিলাস আর কল্পনা! মাকে কেন্দ্র করেই শিশুর মনের স্বপ্ন সার্থক হ'য়ে ওঠে। তাই শিশুর বিচিত্র মনের সন্ধান মাকেই প্রথমে রাখতে হবে। আশানুরূপ শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন আমাদের দেশে না হচ্ছে, ততদিন শিশুশিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব মাকেই নিতে হবে। ভূমিষ্ঠ হবার পর অসহায় শিশু নিকটতম নির্ভররূপে পায় তার মাকে। তাই মায়ের প্রতিই অধিকতর ভালবাসা ও আকৃষ্ট হওয়া শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। ঠিক এই কারণেই মায়ের সুষ্ঠু পরিচালনার ও তত্বাবধানে শিশুর আত্মবিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে। শিশু অমানুষরূপে গ'ড়ে ওঠবার প্রধানতম কারণ শৈশবে লালন-পালনে ত্রুটি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা। তাই প্রয়োজন সুশিক্ষিতা সুদক্ষা ধৈর্যশীলা স্নেহময়ী মায়ের।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সমানভাবে হচ্ছে কি না, তা প্রত্যেক পিতা-মাতারই লক্ষ্য রাখা উচিত। জন্মের পর থেকে শিশুর শারীরিক সুস্থতার দিকে যেমন নজর রাখা দরকার, ঠিক তেমনি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর। কারণ, শিশুর মানসিক বিকাশ প্রধানতঃ নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপরেই। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় দু জায়গায়—এক গৃহে আর এক বিদ্যালয়ে। তাই গৃহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আর অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংযোগ প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর মঙ্গলার্থে অভিভাবক ও শিক্ষক এক আদর্শ নিয়ে যদি পথ চলতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, কারণ সু-নাগরিকের ওপরেই তো সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করছে

মা ও ছেলে

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী

মথুরানাথের অচলা ভক্তি,—করেছে সমর্পণ
শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণকমলে আপনার প্রাণ-মন।
ঠাকুরের মাঝে মূর্ত দেখেছে জগজ্জননী কালী,
তাঁহার সেবায় দেয় অকাতরে আপন অর্থ ঢালি।
ভাবিছে মথুর : বিশাল বিত্ত অথবা কণিকা তার
'বাবা'র চরণে দিতে পারি যদি, সার্থক হবে তার।
সংশয় পুন জাগিতেছে মনে : ঠাকুর লবে কি বিত্ত,
মাটি আর টাকা দুই যাঁর সম, শিশুর সমান চিত্ত?
আহার-নিদ্রা যে জন ভুলেছে, পাগল মায়ের গানে—
বিষয়ের কথা বলিলে কি তাহা উঠিবে তাঁহার কানে?

তথাপি একদা আবেগের ভরে হৃদয়ের অভিলাষ
জানালো ঠাকুরে ; পলকের মাঝে ঘটিল সর্বনাশ!
বিষয়ের নামে (যেন) লাঠির আঘাতে ঠাকুর মূর্ছা যায়,
—সুস্থ হইলে ভয়েতে মথুর পলায়ে রক্ষা পায়।
সেই দিন হ'তে বিষয়ের কথা ঠাকুরে কহে না আর,
মনে জানে সদা বিষয়-বিত্ত সকলি ব্যর্থ তার।
চিত্ত তাহার শান্তি মানে না, ঠাকুর নিলে না দান!
শয়নে স্বপনে, দিবসে নিশিতে, ভাবনা নাহিক আন।
অবশেষে ভাবে, চন্দ্রাদেবীরে দিবেক বিত্ত ধন,
জননীরে দিয়ে দিবে সে পুত্রে,—পূরাবে আকিঞ্চন।

ভূমিতে লুটায়ে প্রণমি কহিলা, 'ঠাকুমা, একটি কথা—
তোমায় আজিকে রাখিতেই হবে, নহিলে পাইব ব্যথা ;
মোর হাত হ'তে লবে কিছু দান, যেমন ইচ্ছা হয়,
তোমাকে অদেয় কিছু নাই মোর।' চন্দ্রাজননী কয়—
'কিবা নিব ভাই, সকলি তো আছে, কিছুরই অভাব নাই,
যখনি যা লাগে, তোমার আদেশে, তখনি পেতেছি তাই।'
এবারে মথুর নাছোড়বান্দা, কহিল, 'নিতেই হবে।'
গদাই-জননী কহিলা হাসিয়া, 'দিবে যদি দাও তবে—
তামাকের পাতা একটি আনিয়া, দাঁতের নাই যে গুল।'
শুনিয়া মথুর শিরে হানে কর—হায়রে আবার ভুল!

এমনি মায়ের এমনি পুত্র, বিষয়-বাসনাশূন্য,
এই ভারতের মাটিতেই ঘটে এমন কাহিনী পুণ্য।

ব্যক্তি-সত্তা ও বৃহৎ চৈতন্য

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ব্যক্তি একরূপে একক, নিঃসঙ্গ, ক্ষুদ্র চৈতন্যের অধিকারী। আর একরূপে সে সামাজিক; তার চেতনার ব্যাপ্তি বিশ্বময়—এই প্রসারিত ব্যক্তি-সত্তাকে বলা চলে বিশ্বরূপ। সভ্যতার আদি যুগ থেকে মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্যের পরিধি থেকে মুক্ত হ'য়ে বৃহৎ চৈতন্যময় সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনায়। এই সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; কঠিন কঠোর কণ্টকাকীর্ণ সে পথের রেখা 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' এই দুস্তর পথের যাত্রী ব্যক্তিমানব সকল বাধা অতিক্রম ক'রে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছেন, আর নিজের মধ্যে মহাশক্তির লীলা অনুভব ক'রে ব্যক্তিচেতনায় বিমূঢ় ক্ষুদ্র মানুষকে শুনিয়েছেন মহৎ জীবনের বাণী। অধিকাংশ ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন মানুষের মধ্যে বাস করেও এঁরা তাই মহামানব—এঁরা দেশোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ; সমগ্র বিশ্ব এঁদের দেশ, অখণ্ড কালের এঁরা সাক্ষী। এঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন, প্রচলিত সংস্কার ও জীর্ণ জীবনধারাকে আঘাত ক'রে এঁরা সমাজকে ক'রে তোলেন সজীব ও সচল। এঁদেরই বৃহৎ চেতনাস্পর্শে সমস্যাজর্জর মানুষ যুগে যুগে নতুন পথের ইঙ্গিত পেয়েছে, সমকালীন সীমায়িত জীবনদৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে বৃহৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে নতুন জীবনের বাণী শুনিয়ে মানবেতিহাসে যাঁরা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বুদ্ধ, খৃষ্ট, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানব। ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেও দুর্লভ জীবনসাধনার সাহায্যে এঁরা যে সত্য লাভ করেছিলেন, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের জীবন কার্যতঃ না হোক, বাহ্যতঃ সে জীবনদর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এমনি একজন বৃহৎ-চৈতন্যময় মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমাদেরই বাঙলা দেশে—যিনি সমকালীন জড়তাগ্রস্ত দেশবাসীর কানে মহৎ জীবনের বাণী শুনিয়ে জীবনকে জাগিয়ে তুললেন ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতর উপলব্ধিতে। ইনি হলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা মুখ্যতঃ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি ও সে শক্তির জাগরণের সাধনা। শতাধিক বৎসরের বিদেশী শাসনের ফলে দেশবাসী তখন আত্মপ্রত্যয়হীন, নিবীর্য। অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা, নিঃসীম দারিদ্র্য, বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ অনুরাগ এবং দেশীয় সুপ্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা প্রবল অক্টোপাসের মতো ভারতীয় জীবনকে তখন চেপে ধরেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদ্রষ্টা শক্তিমান্ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেখলেন, ভারতবাসীকে জড়তামুক্ত করতে হ'লে প্রথমেই দরকার ব্যক্তি-সত্তার মহিমার প্রতি তার বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সে বিশ্বাস, সে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয় বাইরের কোন বৃহত্তর শক্তির আশ্রয়ে নয়, ব্যক্তির মধ্যে যে অনন্ত শক্তির উৎস আছে সে শক্তির উপলব্ধিতে ও উদ্বোধনে। সবল কণ্ঠে বীর সন্ন্যাসী শুনিয়েছিলেন তাই দুর্বল আত্মবিশ্বাস-হীন জাতিকে সেই পরম বিশ্বাসের বাণী।

'Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but the waves on the boundless ocean which *I am*.

ভারতীয় 'সোঽহম্'-তত্ত্বের এরূপ আধুনিক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর বোধ হয় শোনা যায়নি। তোমার নিজের ভিতরে ভগবানের যে অনন্ত বিভূতির প্রকাশ আছে, তাকে জাগ্রত কর। বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতিও ছিলেন অসীম সত্তা-সমুদ্রের ওপর তরঙ্গমাত্র। অন্তর্নিবিষ্ট সাধনার দ্বারা তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি-সত্তার অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তাঁদের ক্ষুদ্র সত্তা প্রসার লাভ করেছিল বৃহৎ চৈতন্যময় মহাসত্তায়। দেহধারী মানব হয়েও তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দেশ-কালাতীত বিশ্বমানবের পর্যায়ে। অগণিত মানবজীবনের গতি দিয়েছিলেন তাঁরা ফিরিয়ে —সৃষ্টি করেছিলেন নতুন ইতিহাস!

ব্যক্তি-সত্তার ভিতর অমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টিতে ভগবান রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন 'বহুরূপে'। সমাজের যে কোন স্তরের লোক—সে যতই হেয়, যতই দরিদ্র ও নির্যাতিত হোক না কেন,—তার ভিতরকার আত্মার ঐশ্বর্য উপলব্ধি ক'রে স্বামীজী হয়েছিলেন সকল শ্রেণীর অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত :

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.

বৃহৎ চৈতন্যের অধিকারী না হ'লে অবাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি এরূপ প্রত্যয়শীল ভাবনা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই নবযুগের মানবতাধর্মের (New Húmanism) প্রধান উদ্‌গাতা।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে আর একজন বাঙালী মনীষীর সীমায়িত ব্যক্তি-সত্তা জাগ্রত হয়েছিল বৃহৎ চৈতন্যের প্রভাবে—তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে বিশ্বচেতনার অনুভূতি তাঁর চিত্তে ভাবোচ্ছাসিত রূপে আত্ম-প্রকাশ করলেও পরিণত বয়সে সে অনুভূতি একটি মননশীল রূপ পেয়েছে 'বিশ্বমানব' বা 'Universal man'-এর উপলব্ধিতে। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্যানুভূতি তাঁর কালজয়ী কবি-প্রতিভা ও ও শিল্পী-প্রতিভার বিকাশের মূলে। এই বৃহৎ চেতনার প্রভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে এক অখণ্ড মিলন-সূত্রে গেঁথে তিনি যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করছে 'হিংসায় উন্মত্ত' বর্তমান পৃথিবীতে

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বাঙলা দেশের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৃহৎ চেতনাময় এই দুই মহামানব, যাঁদের প্রসারিত প্রাণের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল দেশ, ধন্য হয়েছিল জাতি, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের মনুষ্য-সমাজ। বৃহৎ-চৈতন্যযুক্ত মহামানবদের স্মরণীয় ও বরণীয় জীবন অদৃশ্য সঙ্কেতে যেন আমাদের ডেকে বলছে :

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!

মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের অধিকারী বর্তমান বাঙালী জাগরণের এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিবে না কী?

সৃষ্টিরহস্য-সূক্তমালা

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

'মহামৌনের প্রাক্‌কালে' নামক পুস্তকে পাশ্চাত্য মনীষী মেটারলিঙ্ক লিখিয়াছেন—পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর এ-যাবৎ মানব জীবন বা মৃত্যু, ঈশ্বর বা বিশ্বজগৎ, কাল বা আকাশ, অসীমতা বা চিরন্তনতা, পদার্থসকলের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য বা পরিণতি—কোন বিষয়ই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলা হয়—কিন্তু অজ্ঞেয়তা-বোধেরই শুধু অগ্রগতি হইয়াছে। নিখিলের স্বরূপ কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, কোন্ দিকে ইহার গতি, এখানে আমাদিগের জীবনের সার্থকতা বা প্রয়োজন কি—এ সব প্রশ্নের উত্তরে আজিকার তুলনায় মানুষের জ্ঞান কখনই ন্যূন ছিল না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এ সকল বিষয়ে আরও কমই আমরা জানিয়াছি; আবার যেখানে জানা হইয়াছে, সেখানে না জানি কি নিষ্ক্রিয় নৈরাশ্যই না আমাদিগকে অভিভূত করিবে? এই অসীম বিস্ময় ও অনির্বাণ কৌতূহলে বিজ্ঞানের জন্ম, জীবনের প্রেরণা, কল্পনার উল্লাস। ভারতীয় মনীষা এই বিশ্ববোধের উন্মেষে যে বিচিত্র প্রকাশে বিস্ফারিত হইয়াছিল, কয়েকটি বৈদিক সূক্ত তাহার অপূর্ব নিদর্শন। সৃষ্টির রহস্য, চৈতন্যের সর্বময়তা, সমাজ-বিন্যাস ও ধর্মের বিকাশ, দিব্য অনুভূতির স্ফুরণ এই সূক্তগুলির বিষয়-বস্তু। তাই শাশ্বত সাহিত্য-রূপে এগুলির মর্যাদা, ইহাদের প্রত্যেকটি ভূমার উপলব্ধিতে চিত্তকে উন্নীত করে।

নাসদীয় সূক্ত

(ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, ১২৯ সংখ্যক)

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ
কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১

তখন সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত দশায় সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ভূলোক বা অন্তরীক্ষ (বায়ুমণ্ডল)-ও ছিল না, পরব্যোম (মহাকাশ)-ও ছিল না। কি আবরণ করিল, কোথায় বা তাহা অবস্থিত ছিল? কাহার জন্যই বা উহা (আবরণ ও আধার)? গহন ও গভীর সলিলরাশি কি (অখিল ব্যাপিয়া) ছিল?

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২

মৃত্যু তখন ছিল না, অমৃত (মৃত্যুহীন প্রাণ)-ও ছিল না। দিবারাত্রির কোন বোধই ছিল না। সেই এক (পরমার্থ) সত্তা নিজ আশ্রয়ে (মায়ার সহিত অভিন্ন) থাকিয়া নির্বাত পরিবেশেও প্রাণক্রিয়া দ্বারা বর্তমান ছিলেন। তাহা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে-
ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩

সৃষ্টির সেই পূর্বে অন্ধকারে আচ্ছন্ন অন্ধকারই ছিল। এ সকলই ছিল কারণরূপে অব্যক্ত কারণ-সলিল-আকারে। তুচ্ছপ্রায় ব্যাপক অজ্ঞানে সকলই পরিবৃত ছিল। তপস্যার (সৃষ্টি-সংকল্পের) মহিমায় সেই কারণে লীন তত্ত্ব তখন (নামরূপে) ব্যক্ত হইলেন।

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪

আদিতে উদ্ভূত হইল কামনা (সৃষ্টির ইচ্ছা), উহাই মনের প্রথম বীজ। যাহা কিছু পরে হইল, সে সকলের কারণ এই অব্যক্তে নিহিত ছিল। কবি (চরমদর্শী প্রাজ্ঞ)-গণ ইহা অন্তরে গভীর মনের দ্বারা জানিয়াছেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫

উহাদের কার্য জ্যোতিরেখার মতো মধ্যে, সকল পার্শ্বে, অধোদিকে বা ঊর্ধ্বে সকল দিকে প্রসৃত হইল কি? উহারাই (ভোক্তা জীবরূপে) কর্মবীজ নিহিত করিল, উহারাই মহিমা-সকল (ভোগ্যসমূহ) হইল—তন্মধ্যে স্বধা (অন্ন বা ভোগ্যনিচয়) হইল নিকৃষ্ট, আর বিধায়ক বা ভোক্তা জীব হইল উৎকৃষ্ট।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন
অথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬

প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে, কে বা বলিতে পারে —কোন্ উপাদান-কারণ হইতে জগৎ প্রকট হইয়াছে, কি নিমিত্ত কে এই বিচিত্র সৃষ্টি করেন? দেবগণও এই সৃষ্টির পরবর্তী। কেমন করিয়া অপর কেহ জানিবে কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

যাঁহা (যে বিধাতা) হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, এক তিনিই ইহা ধারণ করিতে পারেন, অথবা হয়তো পারেন না। যিনি ইহার কর্তা ও নিয়ন্তারূপে পরমব্যোমে (স্বয়ম্প্রকাশ-ভাবে) অধিষ্ঠিত, সেই বিশ্রুত পুরুষই সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব জানেন কিংবা জানেন না।

হিরণ্যগর্ভসূক্ত

(ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সংখ্যক)

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১

সৃষ্টির পূর্বে সম্ভূত হইলেন হিরণ্যগর্ভ (জ্যোতির্ময় সৃষ্টিবীজের মধ্যস্থ প্রজাপতি—হিরণ্যের মতো ভাস্বর ও সকলের উদ্ভাসক বিশ্বচৈতন্য)। তিনিই ভূতসমূহের (সৃষ্টির) প্রথম এবং জন্মিয়াই নিখিলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক তিনি ধারণ করিলেন। হবির্দ্বারা অন্য কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিব?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

তাহা হইতেই সকল আত্মার উদ্ভব, তিনি বল দান করেন, নিখিল জীব এবং দেবগণ তাঁহার প্রশাসনের অনুবর্তী, অমৃত (সুধা বা

অমরতা) তাঁহার ছায়া, মৃত্যু (যম)-ও তাঁহার অনুগামী। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা
এক ইদ্রাজা জগতো বভুব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

যাহারা প্রাণবান্ ও যাহারা নিমেষশীল সে জীবসকলের তিনি নিজ মহিমায় একমাত্র রাজা হইলেন। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর তিনি শাসক প্রভু। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

হিমালয় পর্বতমালা যাঁহার মহিমা, নদীসকল সহ সমুদ্র যাঁহার মহিমা, দশ দিক যাঁহার বাহু-স্বরূপ, তাঁহা ভিন্ন অপর কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

যিনি দ্যুলোক ঊর্ধ্বে ধরিয়াছেন, পৃথিবী করিয়াছেন দৃঢ় স্থির, স্বর্লোক সুপ্রতিষ্ঠিত ও আদিত্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং অন্তরিক্ষে (মেঘলোকে) জলরাশি রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহা ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে
অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সুর উদিতো বিভাতি
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আলোকময় দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্তব্ধ (স্থিরভাবে বিধৃত) হইয়া মনে মনে যাঁহাকে (আপন মহিমার কারণ) জানিয়াছিলেন, যাঁহার অধীনে সূর্য উদিত হইয়া দীপ্তিময় তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৭

কারণভূত সলিলরাশি যখন নিখিল ব্যাপিয়া ফেলিল এবং অগ্নি প্রভৃতির সৃষ্টির জন্য প্রজাপতিকে গর্ভরূপে ধারণ করিল, তখন সকল দেবতার অনন্য প্রাণ—এক প্রজাপতি উদ্ভূত হইলেন। তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্
দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮

স্বমহিমায় তিনি (সেই প্রজাপতি) সেই সলিলসমূহ পর্যালোকন করিলেন—যজ্ঞের (বিশ্বজগতের) উদ্ভব এবং দক্ষের (প্রজাপতির) ধারণ উহাতে হইল। তিনি হইলেন দেবতাসকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা
যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯

যিনি পৃথিবীর জনক এবং সত্যধর্মা যিনি দ্যুলোক সৃজন করিয়াছেন, যিনি বিপুল ও আহ্লাদকর জলবিস্তারের স্রষ্টা, তিনি যেন (প্রজাপতি) আমাদিগের প্রতি হিংসা প্রকাশ

না করেন। তাঁহাকে ভিন্ন কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব?

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো
বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০

হে প্রজাপতে, তোমা ভিন্ন কেহ নিখিল এই সৃষ্ট জগৎ পরিব্যাপ্ত করে নাই, যে কামনা লইয়া তোমাকে আহুতি দান করি, তাহা সিদ্ধ হউক। আমরা যেন প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করি।

পুরুষসূক্ত

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সংখ্যক)

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১

অনন্ত তাঁহার মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত পদ—এ হেন বিরাট পুরুষ নিখিল জগৎ সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াও দশাঙ্গুল প্রমাণ অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ বিশ্বের বাহিরও ব্যাপিয়া) অবস্থান করিলেন।

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২

সেই বিরাট পুরুষই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই তাঁহার স্বরূপ। দেবত্বের বিধাতা তিনি—কারণ কর্মফল-ভোগেই সৃষ্ট প্রাণী কারণাবস্থা হইতে দৃশ্যমান অবস্থায় পরিণত হয়।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩

এই (ত্রিকালবর্তী) সমস্তই ঐ বিরাট পুরুষের মহিমা এবং তিনি ইহা হইতেও বৃহৎ। নিখিল জীব তাঁহার পাদমাত্র (চতুর্থ ভাগ)—তাঁহার অবিনশ্বর ত্রিপাদ (ত্রি-চতুর্থাংশ) দিব্যধামে (স্বপ্রকাশরূপে) অবস্থিত।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪

সেই ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইয়া (চরাচর অতিক্রম করিয়া) রহিলেন। তাঁহার পাদমাত্র ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। তাহা হইতেই বহুরূপে (দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণী হইয়া) আহারপুষ্ট ও আহারহীন (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন) সৃষ্ট পদার্থসকলকে তিনি পরিব্যাপ্ত করিলেন।

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুরঃ ॥৫

তাঁহা হইতে বিরাট (ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ) জন্মিয়াছিল ও সেই বিরাট দেহের আধারে (উহার দেবতা) পুরুষ উদ্ভূত হইলেন। জাত হইয়া সেই বিরাট পুরুষ তাহারও অতিরিক্ত (দেব-মনুষ্যাদি) হইয়াছিলেন, তাহার পর ভূমি এবং অনন্তর পুর (অর্থাৎ জীবশরীর) সৃষ্টি করিলেন।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬

যখন দেবগণ ঐ পুরুষকে হবিঃ জ্ঞানে (মানস) যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তখন বসন্ত ঋতু ঐ যজ্ঞের ঘৃত, গ্রীষ্মকাল সমিধ্ ও শরৎ কাল (পিষ্টকাদি হোমে অর্পণের বস্তু) হবিঃ হইয়াছিল।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭

সৃষ্টির অগ্রে উদ্ভূত, যজ্ঞের পশুরূপে কল্পিত, সেই পুরুষকে মানসযজ্ঞে সংস্কৃত করিয়াছিলেন এবং উঁহার দ্বারা দেবগণ, (সৃষ্টিসমর্থ প্রজাপতি আদি) সাধ্যগণ এবং (সৃষ্টির অনুকূল মন্ত্রদর্শী) ঋষিগণ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮

(সর্বময় পুরুষ যাহাতে হুত হন) সেই সর্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিসহ ঘৃত প্রভৃতি ভোগ্য-সমূহ সম্পাদিত হয়, আর বায়ব্য (বায়ু-দেবতার অধিষ্ঠিত), আরণ্য (হরিণাদি বনচর) এবং গ্রাম্য (গো অশ্ব প্রভৃতি) পশুসকল উৎপাদিত হইয়াছিল।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯

সেই সর্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম মন্ত্রসকল উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে (গায়ত্রী প্রভৃতি) ছন্দ এবং তাহা হইতে যজুর্মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥১০

তাহা হইতে অশ্বসকল এবং (গর্দভাদি) দুই-দন্তরাজিবিশিষ্ট জন্তুসমূহ জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে গাভীসকল এবং ছাগ ও মেষসকল উৎপন্ন হয়।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥ ১

যে সময়ে বিরাট পুরুষকে উদ্ভূত করেন, তখন (দেবগণ) কোন্ কোন্ বিশেষভাবে তাঁহাকে কল্পনা করিয়াছিলেন? কি ইহার মুখ হইয়াছিল, বাহুদ্বয় কি হইয়াছিল, ঊরুদ্বয়ই বা কি, পাদদ্বয়ই বা কি হইয়াছিল?

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥১২

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ বাহুদ্বয়রূপে কল্পিত হয়, তখন ইঁহার যে ঊরুদ্বয়, তাহা বৈশ্য হয় এবং পাদযুগল হইতে শূদ্র উদ্ভূত হয়।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥১৩

(প্রজাপতির) মন হইতে চন্দ্র জন্মিল, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উদ্ভূত হইল।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ
তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪

তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষলোক, মস্তক হইতে দ্যুলোক উদ্ভূত হইল, পদদ্বয় হইতে ভূমি, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইল। এই ভাবে (দেবগণ) লোকসকল কল্পনা করেন।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫

(গায়ত্রী প্রভৃতি) সপ্ত ছন্দঃ এই মানস যজ্ঞের পরিধি (উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণের বেষ্টন-কাষ্ঠ) হইয়াছিল, (দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য) একবিংশতি-সংখ্যক সমিধ্ (ইন্ধন-কাষ্ঠ) কল্পিত হইয়াছিল। যিনি বিরাট পুরুষ তাঁহাকে দেবগণ মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া (যূপবদ্ধ) পশুরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা-
স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬

(প্রজাপতির প্রাণরূপ) দেবগণ সঙ্কল্পময় সেই যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ (প্রজাপতিকে) যজন করিয়াছিলেন। সেই (যজন) হইতে সেই (প্রসিদ্ধ) ধর্ম (জগতের ধারক)-গুলি প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইয়াছিল। যেখানে সেই পুরাতন (বিরাট পুরুষের উপাসক) সাধ্য দেবগণ আছেন, সেই স্বর্লোক মহাত্মগণ (অধুনা বিরাটের আরাধকসকল) পাইয়া থাকেন।

মার্কিন কবি ও দার্শনিক এমার্সন

শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতিগত ও ধর্মভিত্তিক মানসিকতা গড়ে তোলায় মার্কিন চিন্তানায়কগণের উপর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র—গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তের প্রভাব এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অনুপ্রেরণা বিশ্বেতিহাসের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সময়ে শুরু হয়েছিল ভারতীয় বেদান্তবাদ, অ্যাংলো-স্যাক্সন পবিত্রতাবাদ (puritanism), প্রয়োগবাদ (pragmatism), বিজ্ঞানবাদ (idealism) আর প্রচণ্ড আশাবাদ (optimism) প্রভৃতির সংমিশ্রণের অক্লান্ত চেষ্টা। আমেরিকার ইতিহাসের এই আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়টির অনুধাবন ও পর্যালোচনা আগামী কালের অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের জন্য অপেক্ষমাণ। এ যুগের ঋত্বিক, চিন্তানায়ক ও চারণ হলেন এমার্সন, থোরো এবং হুইটম্যান।

প্রাচ্যের অতুল অধ্যাত্মসম্পদ্ এমার্সনকে এতখানি মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রতীচ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছিলেন : প্রাচ্য চমৎকার, তার তুলনায় প্রতীচ্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়—'The east is grand and makes Europe appear the land of trifles.' ভারতের সঙ্গে তিনি যেন একীভূত হ'য়ে গিয়েছিলেন—প্রবহমান কোন নদী দেখলেই তাঁর মনে প'ড়ত পবিত্র গঙ্গার কথা, সুন্দর আবহাওয়ার কথা উঠলেই বলতেন কলকাতার আবহাওয়ার কথা। কেবল তাই নয়—নিজের বাগানে ভারতের ও প্রাচ্য দেশের নানা গাছপালাও তিনি লাগিয়েছিলেন।

তারপর তাঁর ভাবের অনুগামী কবি হুইটম্যানও আহ্বান জানিয়েছিলেন :

'ভারত-পথযাত্রী
হে হৃদয়, চলো
সেই আদিম মননে
*　　*　　*
সেই প্রথম স্বচ্ছ সঞ্জীবতায়
জীবনবেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
*　　*　　*
এই পাড়ি কি সত্যি দিতে চাও হে হৃদয়?
লীলা তোমার কি এই মহাতরঙ্গে ?
সংস্কৃত ও বেদ কি তোমার প্রাণে ধ্বনিত ?
তাহলে মুক্ত করো বেগ !'

[অনুবাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র]

এর পরেই এমার্সনের শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও সতীর্থ মনীষী থোরোও সেই সুরে বললেন : এশিয়ায় যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত রয়েছে, সেই আলোয় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত কর, সেই আলোর বন্যায় সমগ্র চিত্তকে প্লাবিত কর।

মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনের পথ এবং জন্ম, জীবন ও মৃত্যু রহস্যের উত্তর তাঁরা পেয়েছিলেন ভারতের ও প্রাচ্যের বাণীতে। এমার্সন বলেছিলেন, 'পৃথিবীর আর কোথাও যখন মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি, তখন ভারত সকল মানুষকেই নারায়ণের আসনে বসিয়েছে। নরনারায়ণের সেবার এই আদর্শকে অনাসক্ত কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যদি মানবজাতির লক্ষ্য হ'ত, তবে তো অনেক সমস্যারই সমাধান

হ'য়ে যেত; কোথায় থাকত পরাধীনতার অভিশাপ, দাসত্বের গ্লানি! তার পরেই বলেছেন, আমরা যে কী, কী আমাদের স্বরূপ, তার কতটুকুই বা আমরা জানি, তার জন্য চাই আসক্তিবিহীন কর্ম। অজ্ঞানতার জন্য মনে হয়, যেন আমরা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক—এ হ'ল অবিদ্যা, বন্ধন, নিজের উপরে আবরণ। ঈশ্বর যে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছেন—'Spirit incarnates itself in the human form.'—এ কথা মনে প্রাণে কর্মে উপলব্ধি করলেই সেই আচ্ছাদন খসে পড়ে, ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে। তবে কেবল আত্মসমর্পণ নয়, অভীপ্সাও চাই।

তিনি 'কোরাস্ অব্ স্পিরিটস্' ও 'দাইন ওন থিয়েটার আর্ট দাউ' নামে কবিতায় বলছেন: 'হে মানুষ, তোমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে তুমিই অভিনেতা, তুমিই দর্শক'। ভক্ত ও ভগবান এখানে যেন এক হ'য়ে মিলে গেছেন। তারপরে বলছেন, 'আত্মা অবিনশ্বর—সে যে-রূপ পরিগ্রহ করে তা বদলায়, রূপ হ'তে রূপান্তরে তার যাত্রা—কত শত জীবন পেরিয়ে প্রতিটি মানুষ এই জীবনে এসে পৌঁছেছে।' পুত্রের মৃত্যুর পরে তিনি 'ওড টু টিয়ার্স্' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে এই জন্মান্তরবাদই প্রতিধ্বনিত। আর একটি বিখ্যাত কবিতায়ও তিনি বলেছেন:

হত্যাকারী যদি মনে ক'রে থাকে
সেই হত্যা করেছে,
আর মৃত মানুষ যদি মনে ক'রে থাকে
সে নিহত হয়েছে,
তবে তাদের কেউ জানে না
যাওয়া-আসার মরণ-জীয়নের গোপনরীতি।

এ যেন গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

এঁরা তিনজনই স্বামী বিবেকানন্দের পুরোগামী। স্বামীজী শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে পৃথিবী জয় ক'রে এসেছিলেন, তার পটভূমিকায় এঁদের প্রচারের প্রভাব কম ছিল না। স্বামীজী কবি হুইটম্যানকে 'আমেরিকার সন্ন্যাসী' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

তবে আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শের বর্তিকাবাহী প্রথম পুরোহিত হলেন এমার্সন। উপরিলিখিত উদ্ধৃতি তাঁর 'ব্রহ্ম' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই পার্থিব সত্তার অন্তরালে যে একটি মূলগত ঐক্য রয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একই সূত্রে গ্রথিত, তার শাশ্বত প্রমাণ ও পরিচয় রয়েছে তাঁর আত্মোপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল এ ধরনের বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে।

এমার্সন থোরোর মাধ্যমেই ভারতের এই অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ এমার্সন লিখছেন: থোরো তাঁর 'এ উইক অন দি কনকর্ড অ্যাণ্ড মেরিম্যাক রিভার' নামে একটি গ্রন্থের অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতেন। এই গ্রন্থে থোরো গীতা, ভারতীয় দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে।

১৮৪০ খৃঃ ফরাসী ভাষায় অনূদিত বার্নকের গীতা প্রকাশিত হয় এবং চার্লস উইলকিন্সনের ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গীতা প্রকাশিত হয় এর ছ বছর পরে। থোরো এই দু-খানি

গ্রন্থেরই পরিচয় পেয়েছিলেন। আমেরিকায় গীতার আদর্শ প্রচারে এই গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। উইলকিন্সনের গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৮৬ খৃঃ এই গ্রন্থের একখণ্ড তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেণ্টকে উপহার দিয়ে লিখেছিলেন : ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য লুপ্ত হবার পর তার সেই সম্পদ্ ও শক্তির কথা কেউ স্মরণ করবে না, সবই শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তার বহুকাল পরেও বেঁচে থাকবেন ভারতীয় দর্শনের উদ্গাতাগণ। তিনি এ প্রসঙ্গে এই বেদভূমির আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ১৮৫৪ খৃঃ জনৈক ইংরেজ থোরোকে প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্যের ৪৪ খণ্ড পুস্তক দান করেন। থোরো নিজেই বলেছেন, তখনকার দিনে আমেরিকায় এই সকল পুস্তক পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৩৭ থেকে ১৮৬২ খৃঃ পর্যন্ত এমার্সন ছিলেন থোরোর প্রতিবেশী। থোরোর সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত এমার্সন 'দি ডায়ল' নামক একটি পত্রিকায়ও হিন্দুধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি-সহ নানা আলোচনা করতেন। প্রাচ্য দর্শন এবং সাহিত্যাদির অনুবাদও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। তখন হাইপেশিয়া মার্গারেট ফুলার ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদিকা। ঐ সময়ে এমার্সন, থোরো, হুইটম্যান, মার্গারেট ফুলার অতীতের ইতিহাসের যত কিছু জঞ্জাল, যত কিছু মলিনতা অন্ধসংস্কার সব মুছে ফেলে দিয়ে নতুন মানুষের জয়গান ও মানুষের নতুন ইতিহাসের বুনিয়াদ রচনায় ব্রতী হলেন। এমার্সন মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন :

নিজকে জানা—আত্মপরিচয়-লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীর কোন কিছুই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, শান্তির উৎস রয়েছে মানুষের অন্তরে, আত্মবিশ্বাস—আত্মবিশ্বাস চাই, পরানুকরণ নয়।····· শান্তি-সমাহিত মুহূর্তে আত্মার মধ্যে সত্তানুভূতি উপলব্ধি করা যায়।······এই আকাশ, আলোক, কাল কিংবা মানুষ তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—এ সবের সঙ্গেই তা একীভূত হ'য়ে আছে।···সাধারণতঃ আমরা যাকে মানুষ আখ্যা দিয়ে থাকি সে মানুষ হিসেবী, খায়-দায়, চাষ-বাস করে···। আমরা যে হিসাবে তাকে জানি—তা তার আসল পরিচয় তো নয়ই বরং ভুল পরিচয়। আমরা যে সম্মান দেখাই সে মানুষকে নয়, তার আত্মাকে, সে যার যন্ত্রস্বরূপ।

* * *

র‍্যাল্‌ফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন জন্মগ্রহণ করেন এক ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে ১৮০৩ খৃঃ ২৫শে মে। তাঁর ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষই ধর্মযাজক। আট বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

বস্টনে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে চোদ্দ বছর বয়সে ওয়াল্ডো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভরতি হলেন। প্রশ্ন দাঁড়ালো—খরচ জোগাবে কে? বেয়ারার কাজ ক'রে পড়াশুনার খরচ জোগালেন তিনি নিজেই। কিছুদিন মাষ্টারিও করলেন। ১৮২৮ খৃঃ এমার্সন বষ্টনের নর্থচার্চের সহকারী প্যাস্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। ধর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেও ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না তাঁর জীবনে। কিন্তু গির্জায় পৌরোহিত্য করার চেয়ে সভাসমিতিতে, আলোচনা-সভায় বক্তৃতা করতে তাঁর বেশী ভাল লাগত। তিনি বলতেন, 'সেই সব সভায় আমি মুক্ত, আমি সেখানে আমার ইচ্ছামত বলতে পারি, যুক্তি বিচার করতে পারি।'

১৮৩২ খৃঃ চার্চের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ইওরোপ যাত্রা করলেন। সেখানে কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্লাইলের মতো সাহিত্য-মহারথীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁরও জীবনের যে একটি বিশেষ ব্রত আছে, একথা তিনি এঁদের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলেন। গ্যটের অতীন্দ্রিয়বাদের ধারণা ও আদর্শ ইংলণ্ডে এসেছিল কার্লাইলের মাধ্যমে, আর যুক্তরাষ্ট্রে সেই আদর্শ প্রচার করেছিলেন এমার্সন।

১৮৩৪ খৃঃ ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি ম্যাসাচুসেটস-এর কনকর্ডে ঘর বাঁধলেন। এই খানেই তাঁর পিতৃপিতামহেরা বসবাস ক'রে গেছেন। ১৮৩৫ খৃঃ এলেন লুই টাকারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। চারটি সন্তানের মধ্যে তাঁর অতি আদরের বড় ছেলেটি ১৮৪১ খৃঃ মারা যায়। তারপর ১৮৭২ খৃঃ তাঁর এই গৃহ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। তবে বন্ধুবর্গ চাঁদা তুলে ঠিক পূর্বের মতো ক'রে বাড়িটি আবার তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন।

কনকর্ডে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন ব্রনসন অলকট, হেনরী ডেভিড থোরো, ন্যাথনিয়েল হথর্ন, মার্গারেট ফুলার প্রভৃতি। কর্নেল অলকট ১৮৭৫ খৃঃ ভারতে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। থোরো ছিলেন গৃহকর্তার মতো। আর ন্যাথনিয়েল হথর্ন থাকতেন কিছুটা দূরে। এঁরা ছিলেন সকলেই অতীন্দ্রিয়বাদী (Transcendentalist) ও আদর্শবাদী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবীর সংস্কার তাঁরা ভেতর থেকে করবেন। তাঁদের আস্থা ছিল বোধি বা 'ইনটুইশানে'র ওপর, আর ভরসা ছিল মানুষের ওপর।

তাই এমার্সন বলেছেন: 'কোন দেশের সভ্যতার যথার্থ বিচার সে দেশের জনসংখ্যা দিয়ে হয় না, নগর-নগরীর বিরাট আয়তন দিয়ে হয় না, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিপুল পরিমাণ দিয়েও হয় না। এ-সব কিছুই নয়। কোন দেশের সভ্যতার বিচার হয়—কি রকম মানুষ সে দেশে জন্মালেন তাই দিয়ে।'

তবে এমার্সন নিজেকে কোন গোষ্ঠীভুক্ত ব'লে স্বীকার করতেন না। কিন্তু তিনিই ছিলেন দলের মধ্যমণি, তাঁদের প্রেরণার উৎস। ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ফিরতেন। এই সকল বক্তৃতাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৪১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুগামী অতীন্দ্রিয়বাদীরা ১৮৪০ খৃঃ 'দি ডায়ল' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। এমার্সনও প্রায় দুই বৎসর-কাল এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ এমার্সনের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খৃঃ তিনি পুনরায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। দ্বিতীয়বার ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি দাসপ্রথা উচ্ছেদ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

কবি হিসাবে এমার্সন খুব খ্যাতিলাভ না করলেও তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফসল। বিখ্যাত সমালোচক ভ্যান ওয়াইক ব্রুকস্ তাঁর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: পাহাড়ী ঝরনা-ধারার ন্যায় তাঁর কাব্যপ্রবাহ স্বচ্ছ শীতল ও চটুলগতি-সম্পন্ন, রচনাশৈলী আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল।

সারাজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন এমার্সন, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি বলতেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, কারও অনুকরণ ক'রো না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মৌলিকত্বই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

সত্যান্বেষীদের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশা জোটে, তাঁর ভাগ্যেও তার কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে তার স্বাক্ষর নেই; কারণ তাঁর আদর্শ জীবনে রূপায়িত হয়েছিল, কেবল মুখের কথা ছিল না; তিনি ছিলেন নিরাসক্ত বৈরাগী। তাই তাঁর কাছে মৃত্যুও আনন্দময়। 'মৃত্যোর্মামৃতংগময়', এই বাণীই তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত :

The debt is paid,
The verdict said,
The furies laid,
The plague stayed,
All fortunes made,
Turn the key and bolt the door,
Sweet is death forever more.

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে এপ্রিল কনকর্ডেই আনন্দময়ের আহ্বানে তিনি আনন্দলোকে যাত্রা করেন

অন্তর্মুখী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

(১)

মৃত্যুর ছায়াতে শুয়ে ভাবি বারম্বার :
আয়ুসূর্য অস্ত গেলে রহিব না আর ?
নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হবো নিঃসীম তিমিরে ?
একমুষ্টি চিতাভস্ম উড়িব সমীরে ;—
এই মোর পরিচয় ? অনন্ত অনাদি
নিত্য তুমি,—এ বিশ্বাস মানসিক ব্যাধি ?
উহাদের অসংলগ্ন প্রলাপ-বচন ?
সতদ্রষ্টা ঋষি যাঁরা, যাঁদের লোচন
পরম-আনন্দ-ঘন-মূরতি তোমারে
হেরিল জ্যোতির জ্যোতি তমসার পারে—
তাঁরা কি ছিলেন ভ্রান্ত ? কখনোই নয়।
তুমি সত্য ; অমৃতের আমিও তনয়।
মৃত্যুরূপে তুমি বক্ষে লইবে তুলিয়া ;
সাগরের ঊর্মি যাবো সাগরে মিলিয়া।

(২)

পরম ঐশ্বর্য তুমি এ জীবনে মোর—
রেখে দাও মর্মে শুধু এ-টুকু গুমোর ;
আর সব গর্ব প্রভু করো চুরমার।
নাহং নাহং—আমি তোমার, তোমার।
'আমি ও আমার' চির-রসাতলে যাক্ ;
চরণ-কমলে শুধু 'দাস-আমি' থাক্।
দিব্যরত্ন তুমি মম ; ভুলিয়া তোমারে
কাচখণ্ড খুঁজে খুঁজে ফিরেছি সংসারে।
ধন-জন-প্রতিষ্ঠার গলায় ছুরিকা !
আজ আছে, কাল নাই ! ওরা মরীচিকা-
জীবনে এনেছে দাহ, নৈরাশ্য কেবল !
—আর তীব্র আত্মগ্লানি—ভুলের ফসল
কামনার পঙ্ক যত নিক্ষেপিয়া দূরে
নির্মল আকাশে তব কবে যাবো উড়ে ?

রাজনারায়ণ বসু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

রাজনারায়ণ বসু এদেশে জন্মেছিলেন*, কিন্তু তাঁর মনটি সব দেশের সব যুগের মানুষের সঙ্গী হ'তে পারত। যে অন্তরের সারল্য মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং যে চিরনবীনতা এই নিয়ত পরিবর্তনের রাজ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, রাজনারায়ণ সে দুটিই প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিলেন, উনিশ শতকের যুগমনীষাকে রাজনারায়ণ নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; সে সমৃদ্ধির পরিচয়-লাভই এ প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য।

মধুসূদন ও ভূদেবের সতীর্থ রাজনারায়ণ তাঁর ছাত্রাবস্থায় একদিকে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অধ্যাপনা, অন্যদিকে মদ্যপান—এই দুটি নেশায় বিভোর ছিলেন। কঠিন রোগের মূল্য দিয়ে তিনি মদ্যাসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তি পান, কিন্তু হিন্দুকলেজের অধ্যাপনার গুণে তাঁর সাহিত্যশিক্ষার মানস পরিমণ্ডলটি সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।[১]

প্রবন্ধকারদের মধ্যে মেকলে এবং কবিদের মধ্যে স্পেন্সার, টমসন ও বাইরন রাজনারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। অবশ্য মেকলে সম্বন্ধে এই প্রীতি পরে বদলে ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয়: 'তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম, তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (Essay) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে।'[২]

* জন্ম ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৬

১, ২, দ্রষ্টব্য—আত্মচরিত রাজনারায়ণ বসু।

বালক-বয়সে রাজনারায়ণ অন্যান্য হিন্দু ছেলেদের মতোই পূজা দেখতে ও অনুকরণ করতে ভালবাসতেন। তাঁর বাবা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের বেদান্ত-মতের পক্ষপাতী হলেও বাইরে লৌকিক আচার পালন করতেন। বাবার কাছেই রাজনারায়ণ শুনেছিলেন যে রামমোহন তাঁর নিজের ধর্মকে Universal Religion (বিশ্বজনীন ধর্ম) বলতেন। হিন্দুকলেজে পড়বার সময়ে রাজনারায়ণ ধর্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন, যে-সময় যখন যে-ধর্মের বই পড়তেন, কৈশোরোচিত ভাবাবেগে সেই ধর্মমতের দ্বারাই প্রভাবিত হ'য়ে পড়তেন। সর্বপ্রথম 'শেভালিয়র র‍্যামজের সাইরাসেজ্‌ ট্রাভেলজ্‌' পড়ে সেকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস বিচলিত হয়, তারপর রামমোহন রায়ের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাব্লিক ইন ফেভর অফ্‌ দি প্রিসেপ্টস্‌ অফ্‌ জীসাস্‌' এবং "চ্যানেঙ্গের গ্রন্থপাঠে ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই। পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে 'হিউম' পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায়, তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।"[৩]

মুসলমান ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা আসে কোরান এবং গিবনের গ্রন্থের Mahamed and his Successors. অধ্যায়টি পড়ে। এই সব বিভিন্ন মতামতের চর্চা উনিশ শতকের যুগলক্ষণ, সেদিক থেকে রাজনারায়ণের কৌতূহল শ্রদ্ধার যোগ্য, কলেজ ছাড়বার আগে তাঁর যে

৩ তদেব

সংশয়বাদ দেখা দেয়, স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুতে সে সংশয়ে আঘাত লাগে। আত্মস্থ রাজনারায়ণ নিজের অধ্যাত্ম-সংস্কারে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বাবা বিশ্বাস করতেন বেদান্তের সোঽহম্-বাদে। রাজনারায়ণ কিন্তু ভক্তশ্রেণীর লোক, তাই তত্ত্ব-বোধিনীসভার প্রচারিত ভক্তিমূলক ব্রাহ্ম-ধর্মেই তাঁর অনুরক্তি দেখা দেয়, এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞাতি নন্দলাল বসুর একটি উক্তি তাঁকে প্রভাবিত ক'রে থাকবে – 'চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।' ১৮৪৬ খৃঃ গোড়ার দিকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।'[৪]

তখন অবধি ব্রাহ্ম হওয়ার ফ্যাশন প্রচলিত হয়নি। তাই হিন্দুকলেজের ছেলেরা রাজ-নারায়ণকে একটি অদ্ভুত জীব মনে ক'রত, কলেজের কোন ভাল ছেলে যে ব্রাহ্ম হ'তে পারে, সে কথা সেই সংশয়বাদের যুগে অবিশ্বাস্য ছিল, এই বৎসরই রাজনারায়ণ 'তত্ত্ববোধিনী' সভার উদ্যোগে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনুবাদ ক'রে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজে সর্বপ্রথম প্রীতির ভাব সঞ্চারিত হয় ব'লে তিনি নিজে দাবি করেছেন; তাঁর সাধনায় জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির আবেগ বেশী ছিল সন্দেহ নেই।[৫] অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে 'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কিনা' এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে, এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত এই যে—"আমরা তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।"[৬] মনে হয়, তখন অবধি বেদ রাজনারায়ণ বেশি পড়েননি।

'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব-বেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত—এই মত অক্ষয়বাবুর দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।'[৭] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাধারণতঃ আমরা অক্ষয়-কুমারকেই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের পুরো গৌরব-টুকু দিয়ে থাকি, এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবুর মত : 'ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়, তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে···। যিনি সর্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন আদৌবেই সাধিত হইতে পারিত না, তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল, অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না।'[৮]

১৮৫১ খৃঃ ফেব্রুআরি থেকে ১৮৬৬ খৃঃ মার্চ অবধি রাজনারায়ণ মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মেদিনীপুরকে একান্ত আপনভাবে গ্রহণ ক'রে তিনি এ জেলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নানা সময়ে ভাল চাকরির আকর্ষণ এসেছে; কিন্তু মেদিনীপুরের আকর্ষণই তাঁর কাছে বড় হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সব কাজের তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়, (১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-

৪, ৫ তদেব

৬, ৭, ৮ তদেব

সমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতি-সাধন। (৩) জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা সংস্থাপন (৪) সুরাপান-নিবারণী সভা সংস্থাপন (৫) বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন (৬) ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা গ্রন্থরচনা। (৭) Defence of Brahmoism and Brahmosamaj গ্রন্থরচনা।[৯]

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ ছাত্রদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার দিকেই নজর দিতেন বেশী, এবং একশ বছর আগেই বুঝে-ছিলেন যে শারীরিক শাস্তি দান ছাত্রদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভায় ইংরেজী ভাষার আতিশয্য ছেড়ে বাঙলা শব্দের দিকে শিক্ষিতদের মনঃসংযোগের চেষ্টা করা হয়। এই সভার সভ্যেরা 'Good night' না ব'লে 'সু-রজনী' বলতেন। কথাবার্তায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করলে তাঁদের শব্দ-প্রতি এক পয়সা জরিমানা দিতে হ'ত। ১লা জানুআরির পরিবর্তে ১লা বৈশাখে পারস্পরিক অভিনন্দন করতেন। এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবে বাংলাদেশের চিন্তাধারাকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিমণ্ডলটিই এই স্বদেশী সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। সেই জন্য কেশব সেন প্রমুখ ব্রাহ্মেরা যখন খ্রীষ্টীয় মতবাদের অতিরিক্ত আবর্তনে ক্রমে এদেশী ভাবধারা থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছিলেন, তখন দেশের লোকও তাঁদের আপন ভাবতে পারেনি। অবশ্য কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শ ঘটবার পর এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পূর্ণ সাকার-সাধনায় আত্ম-নিয়োগের পর ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র ভাবধারা আর হিন্দু-সাধনার পন্থা সম্বন্ধে সংশয় জাগাতে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বাবু সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণীয়—পরবর্তী 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম'দের মতো রাজনারায়ণ কিন্তু জন্মগত জাতিভেদকে অস্বীকার করতে পারেননি। এটি তাঁর চিন্তাধারার দুর্বলতা। এ দুর্বলতার বীজ আদি ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারাতেই ছিল।

রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[১০] বক্তৃতাটির প্রতি আধুনিক কালে আমরা একটু উদাসীন। তার কারণ, আজকের দিনে ধর্মগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আন্দোলন উপহাসের বিষয়। কিন্তু একশ বছর আগের পরাধীন ভারতবর্ষে তা ছিল না। হিন্দুধর্মের চিন্তাধারায় যে সব দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু যুবারাই সর্বপ্রথম সচেতন হ'য়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যেই কেবল এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মযুগের সূচনা থেকে রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রমুখ নেতারা হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা ব'লে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা ক'রে হীন দৃষ্টিতেই দেখেছেন। অধিকারী-ভেদে মূর্তি পূজা থেকে আরম্ভ ক'রে নিরাকারবাদে উপনীত হওয়ার স্তর-পরম্পরাগুলি তাঁরা অনেকটা উপেক্ষাই ক'রে গেছেন। তাছাড়া ব্রাহ্ম-নেতাদের অধ্যাত্মচর্চা তাঁদের নৈতিক বিশুদ্ধির চেয়ে গভীরতর কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল এমন কথা সেই সত্যসন্ধ সাধকেরা কোথাও বলেননি। অথচ তাঁরা অনায়াসে ঈশ্বর-স্বরূপকে শুধুমাত্র নির্গুণ নিরাকার (রামমোহন) ও পরে সগুণ নিরাকার (দেবেন্দ্রনাথ) ব'লে গেছেন—অন্যান্য মতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে। তবে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতারা হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকতে

৯ তদেব

১০ ১৮৭৩ খৃঃ প্রদত্ত বক্তৃতা। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন।

চেয়েছেন সব সময়। কিন্তু হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁদের চিন্তা ও আচরণের পার্থক্য ছিল। তা-ছাড়া ডফ্ সাহেবের সময় থেকে খ্রীষ্টানী প্রচার সক্রিয়ভাবে এদেশে চলতে থাকে। এই সময় থেকে রাজশক্তির পরোক্ষ সমর্থনও খ্রীষ্টানী প্রচারের সঙ্গে এসে মিশেছিল।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মনোভাবও সূক্ষ্মভাবে কাজ করছিল যে, জগতের সভ্যজাতিরা যখন নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী, তখন আমাদের ধর্মমতেও যে নিরাকার বিশ্বাস আছে, সে কথা জানিয়ে দিয়ে সভ্য সমাজে আসন লাভ করি না কেন! এই সব দিক থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানোটাই ছিল সে যুগের ফ্যাশান।

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতাটির উৎস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন: 'হিন্দু-ধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার-মাত্র মনে করি। একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, মত এত উৎকৃষ্ট যে, উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে, হিন্দুধর্মের পক্ষেও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও ত দেখাইতে পারি। ইহাতে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।'[১১]

এক হিসেবে উনিশ শতকে হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার মোড় ফিরেছে এই বক্তৃতায়, অতীত ঐতিহ্য থেকে যে সঞ্জীবনী সুধা আহরণের অভিযান রামমোহনের সময় থেকে হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, সে অভিযানের উদ্দেশ্যে বঙ্গমনীষার এই প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ। ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি মোটামুটি বারোটি দিক থেকে হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কৌতূহলবশে বিভিন্ন ধর্মমতের যে চর্চা করেছিলেন, সে চর্চা এই সময়ে খুবই কাজে লেগেছিল।

রাজনারায়ণ তাঁর এই বক্তৃতায় প্রথমেই হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তাঁর মতে—পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে এই কথা বলে যে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু। হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের বক্তব্য: সেই আদিম আর্যেরা যে কেবল সূর্যচন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। তাঁহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।' সেই আদিম আর্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতামাতা, ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। 'উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালের ঋষিরা যেমন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মার আত্মা রূপে উপলব্ধি করিতেন'।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি অমূলক অপবাদ নিরসন ক'রে তিনি দেখিয়েছেন:

(ক) 'বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতাপ্রধান ধর্ম নয়'।.........যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি

১১ আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু

নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের উপাসনার সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তিলাভ হয় না।—'

(খ) '......আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে—হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম। যে মতে বলে যে এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে*।.........বেদান্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্করাচার্য-প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়,—নিজ বেদান্ত-সূত্র বুঝায় না; যেহেতু শঙ্করাচার্য যেমন বেদান্তসূত্র অদ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজস্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে (?) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক, বেদান্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না।' 'বেদান্তসূত্র' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মতকে সমর্থন করা গেলেও 'সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর' অদ্বৈত বেদান্ত এই কথা বলে না।

(গ) 'হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসধর্মের পোষকতা করে......তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস-ধর্মের সৃষ্টিকর্তা।' —সন্ন্যাস-ধর্মের স্রষ্টা শঙ্কর নন, এ কথা বলা বাহুল্য। সন্ন্যাস সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। বোধ করি, ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের বাড়াবাড়িই তার কারণ। কিন্তু সন্ন্যাস আসলে মানব-চেতনার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, জীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি। সংসারের সব আকর্ষণের মধ্য দিয়ে গিয়েই ক্রমে মানুষ ত্যাগের সার্থকতা বুঝতে পারে—তখন ফুলের ফলে পরিণতির মতো মানুষের হৃদয়ে পরম সত্যের প্রতি একান্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

(ঘ) রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের 'Do unto others as ye would be done by' বচনটির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হ'য়ে ভেবেছিলেন যে এমন মহৎ নীতি আর কোন ধর্মে নেই, পরবর্তী ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু রাজনারায়ণ 'আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ' এবং 'তদাত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—বচন দুটি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে এ কথা হিন্দুধর্মেও সমান গভীরতার সঙ্গেই উচ্চারিত।

(ঙ) জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন—'ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই।......পুরাকালে কর্ম ও চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।' রাজনারায়ণ আরও কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ করেছেন, যাদের আলোচনা তত প্রয়োজনীয় নয়। মোটামুটিভাবে পূর্বপক্ষের যে সিদ্ধান্তগুলিকে রাজনারায়ণ নাকচ করেছেন, তা থেকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তখনকার শিক্ষিত লোকদের মতামত বুঝতে পারা যায়। রাজনারায়ণ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যেদিন বক্তৃতা করা হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য, এই জন্য লোকে লোকারণ্য যে—এমন যে পচা জিনিষ হিন্দুধর্ম, ইহার পক্ষে একজন কি বলিতে পারে, তাহা শুনা কর্তব্য।' (ক্রমশঃ)

* অদ্বৈতবাদের এই সংজ্ঞা ঠিক নহে।

আমার বাঁশী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাঁশী আমার বোবা হ'য়ে রইল প'ড়ে ভুঁয়ে।
বাজ্‌ল না আর মধুর সুরে মুখবায়ুর ফুঁয়ে।
একদা যা লাগ্‌ল ভালো
বহু জনের মন ভুলালো
বৃথাই তারে আদর করি আমার অধর ছুঁয়ে।

দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজ্‌ল এবার,
নতুন সুরে উঠ্‌ল বেজে লাগ্‌ল চমৎকার।
এ সুর আমি শোনাব কায়?
এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়,
তুমি ছাড়া ইহার শ্রোতা মিলবে কোথা আর?

প্রাণ-ধারা

শ্রীনিতাইদাস সান্যাল

বহু যুগ যুগান্তর ধ'রে
বহিয়া চলেছে এক অনাবিল প্রাণ;
আজ এল মোর কাছে ফিরে;
আপন বলিয়া কত করি অভিমান।
বেঁধে রাখি ক্ষুদ্র দেহ-মাঝে
কত যত্নে, কত ভয়ে, কতই শঙ্কায়।
পেতে চাই মোর সব কাজে,
দু-জনেতে এক হ'য়ে রহিব ধরায়।
অকলঙ্ক চিন্ময় পরাণ,
দেহের কালিমা-মাখা দুষ্ট পরশনে
কভু হও তুমি যদি ম্লান,
কাঁদিবে কি সে ব্যথায় অশ্রু-বরষণে?

কবে জানি, যাত্রা-পথে মাতি,
তোমাতে আমাতে মিলি জীবন-ধারায়
অনাদি কালের তুমি সাথী;
আমারে লইলে তুলি তোমার লীলায়
কোন্ দূর গ্রহতারা হ'তে
এসেছ হেথায় মহাকালের আদেশে।
অনন্ত এ সময়ের স্রোতে
নিজেই দিয়েছ ধরা, দেহের আবেশে।
আমি অতি ক্ষুদ্র, শক্তিহীন;
মহা শক্তিধর তুমি অসীম অপার।
তোমাতে রয়েছি আমি লীন,
দু-জনে মিলিয়া গড়ি মর্ত্যের সংসার।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

[রায়রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ]

শ্রীমতী সুধা সেন

দক্ষিণভারত তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিদ্যানগরে গোদাবরী নদীর তীরে এক তরুণ গৌরকান্তি অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হাতে জপমালা, কমলনয়ন দুইটি যেন কাহার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত।

সেদিন বিদ্যানগরে আপন ইষ্ট-মন্দিরে বসিয়া ধ্যানস্থ রায় রামানন্দ, উড়িষ্যা-রাজের অধীন এ প্রদেশের শাসনকর্তা। পরম ভক্ত রসিক-শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ; কিন্তু আজ মন রাধাকৃষ্ণ-ধ্যানে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাহিতেছে না, হৃদয়ে বারে বারেই চপলা-চমকের মতো এক গৌর সন্ন্যাসীর অপরূপ লাবণ্যঘন অঙ্গকান্তি যেন ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। কে এই সন্ন্যাসী—দীনকরুণ-নয়নে চাহিয়া? কি চাহেন তিনি রায় রামানন্দের কাছে?

পূজা-ধ্যান সমাপন করিয়া একটু বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে রায় উঠিলেন। মধ্যাহ্ন-স্নানের আয়োজন প্রস্তুত; অগ্রে পশ্চাতে বাদ্য ভাট পুরোহিত লইয়া দোলায় আরোহণ করিয়া রায় গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন।

সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি রায়ের প্রতি ধাবিত হইল, রায়ের চিত্তও চমকিত আলোড়িত হইয়া উঠিল। এ কি, এই তো সেই ধ্যানে-দেখা সন্ন্যাসী? কে ইনি? দোলা হইতে নামিয়া দ্রুত অধীর চরণে রায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া রায়কে হাত ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো—তুমি কি রায় রামানন্দ?' রামানন্দ কহিলেন, 'হাঁ, আমি সেই অধম দাস।'

শুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল; এইবার সময় হইল—রায় রামানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সত্তা হৃদয়ে-হৃদয়ে মিশিয়া গেল। অসহ্য আনন্দের আবেশে—অশ্রু-স্তম্ভ-পুলকের আবেগে দুইজনে দীর্ঘকাল বিবশ হইয়া রহিলেন। সঙ্গের লোকজন বিস্মিত হইলেন: এ কি, এই পরমসুন্দর সন্ন্যাসী কেন শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন? আর এই পরম মান্য, পরম ধীর আমাদের রাজাই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন?

মহাপ্রভুর স্থৈর্য ফিরিয়া আসিল। চারিদিকে যাহারা, তাহারা বহিরঙ্গ; প্রভু তাই ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'রায়, নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌম তোমার অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমাকে বলিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দর্শনের জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত সহজে তোমার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।'

রায় বলিলেন, 'সার্বভৌম আমাকে ভৃত্য-জ্ঞান করেন, তাই আমার চিত্ত-শোধনের জন্য কৃপাময় আপনাকে এই অধমের কাছে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আপনার রাতুল চরণ দর্শন করিলাম। আজ আমার সমস্ত দুর্দিনের অবসান হইল, আমার জন্ম সফল হইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনার আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও পূর্ণ অবতার-লক্ষণ দেখিতেছি। আমি বিষয়ী—

আপনার অস্পৃশ্য, তথাপি স্পর্শ করিয়া আপনি আমাকে ধন্য করিলেন। শুধুমাত্র আপনার উপস্থিতি দ্বারা আপনি সমবেত এই সমস্ত লোকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া কৃষ্ণনাম স্ফুরণ করাইতেছেন।'

প্রভু স্বভাবসিদ্ধ নম্র বচনে বলিলেন, 'না রায়, আমি সন্ন্যাসী, আমার চিত্ত নীরস কঠিন, তাই তাহা কৃষ্ণপ্রেমামৃতে স্নিগ্ধ দ্রবীভূত করিবার জন্যই সার্বভৌম আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।'

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়, এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় চিত্তের প্রবল উৎকণ্ঠাকে দমিত করিয়া প্রভু উঠিলেন, রায়ও গৃহে ফিরিলেন।

কোনরূপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা আসিল। বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া প্রভু প্রতীক্ষমাণ; একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া রায় আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

এক নিভৃত নির্জন স্থানে বসিলেন দুইজনে; একজন পিপাসার্ত, আর একজন তৃষ্ণাহর,—দুইজনেই কৃষ্ণ-রসে রসিক।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের বহিঃসীমানায় প্রথম পদক্ষেপ হইল; অভ্রভেদী হর্ম্যের নিভৃত মণিময় প্রকোষ্ঠে রত্নবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব মনোহর মূর্তির পদতলে রায় ধীরে ধীরে প্রভুকে লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভু বলিলেন: রায়, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু-ভক্তি হয়॥

প্রভু রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। রায় তাঁহার উক্তির সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ হইতে বলিলেন:

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥

—পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই।

'প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।' প্রভু যাহা জানিবার জন্য এতদূরে আসিয়াছেন, রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ ছাড়া যে-তত্ত্বের আর দ্বিতীয় বক্তা নাই, তাহা এত স্থূল, এত বাহিরের নয়; তাহা অকৈতব শুদ্ধ প্রেম—ঐশ্বর্যের নামগন্ধ তাহাতে নাই।

অল্প-অধিকারীর জন্যই কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের ব্যবস্থা। বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান, বিশ্বধাতা; তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান করিতে সক্ষম, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম দেওয়া তাঁহার কাজ নয়। কাজেই প্রভু বলিলেন, 'রায়, এত বাহিরের কথা শুনাইও না—অগ্রসর হইয়া চলো।'

রায় বলিলেন, 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য-সার।' নিজের মতের সমর্থনের জন্য তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে বলিলেন:

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, হোম-দান-তপস্যাদি যাহা যাহা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

প্রভু বলিলেন, 'না রায়, এও বাহিরের কথা তুমি আরও অগ্রসর হও।'

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে 'বাহ্য' বলিলেন কেন?

অর্জুন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ আসন্ন—আকস্মিক বৈরাগ্যের উদয়ে অর্জুন আজ যে যুদ্ধে নিরুদ্যম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাহা তাঁহার স্বভাবধর্ম নয়। জ্ঞানমিশ্র কর্মেই

তাঁহার অধিকার, শুদ্ধ প্রেমে কোন অভিরুচি বা অধিকার তাঁহার নাই, কাজেই তাঁহার জন্য কর্ম তথা কর্মফলত্যাগের ব্যবস্থা।

যাঁহারা সংসারী—যাঁহারা বৈধী ধর্মের আচরণকারী, তাঁহাদের জন্যও এই ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধা অনন্যা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাদের স্বকীয় কোন কর্মই নাই, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ দ্বারা অনুষ্ঠিত যত কর্ম সকলই কৃষ্ণময়। কেবল কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থেই তাহা হৃত, কাজেই কৃষ্ণময় কর্ম আর কৃষ্ণে অর্পণ করিবার কোন প্রয়োজনই তাঁহাদের হয় না।

প্রভু সন্তোষ লাভ করিলেন না। রায় এইবার বলিলেন, 'স্বধর্ম-ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার'। প্রমাণ-স্বরূপে তিনি ভাগবত হইতে একটি ও গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন :

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ধব, ধর্মশাস্ত্র আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহার দোষগুণ জানিয়া স্বকীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অতিক্রমপূর্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিই সাধুত্তম।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

—হে অর্জুন, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব।

প্রভু বলিলেন, 'এহো বাহ্য'।

কর্ম, যোগ, জ্ঞান—সমস্ত সাধনার কথা বর্ণনা করিয়া সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ সারাৎসার সর্বগুহ্যতম কথাটি পরম প্রিয় অন্তরঙ্গ অর্জুনের কানে কানে বলিলেন : অর্জুন! এতক্ষণ এত পথ—এত সাধনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু এইবার তোমাকে—শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে পাওয়ার উপায়টির কথা; সব ধর্মাধর্ম—সব কিছু ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ লও, একবার শুধু বলো, 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার।' তাহা হইলে সব মলিনতা—সব ধূলা ঝাড়িয়া আমি তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা—শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, পার্থেরই সারথি পার্থ-সারথি। তাই শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে যে দূরস্থিত দেউলের স্বর্ণচূড়াগ্রের দীপ্তির আভাসমাত্র তাঁহাকে দেখাইলেন, সে দেউল মথুরা দ্বারকা ইন্দ্রপ্রস্থে নয়, সে দেউল হৃদয়ের বৃন্দাবনে। কি করিয়া সর্বধর্ম, কুল-শীলমান, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্রাণ, নিজ সুখবাঞ্ছা—এমন কি মুক্তিবাঞ্ছা পর্যন্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণ লইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজগোপীগণ—আর কেহ নয়।

অর্জুন সখা, গোপীভাব তাঁহার নয়। তাঁহার সর্বধর্ম-ত্যাগজনিত আশঙ্কার (!) পশ্চাতে আছে কৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্য—'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

অর্জুনের আশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্তু গোপীর তাহা নাই; তাই গোপী সকল কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করিতে পারেন।

প্রভুর কর্ণ তৃষিত হইয়া আসে, সেই সব-দেওয়া প্রেমের সুধা পান করিবার আশায়, তাই বলিলেন, 'রায়, এ-ও বাহিরের, আরও ভিতরে চলো।'

রায় বলিলেন, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার' সমর্থক শ্লোক (গীতা ৮।৫৪):

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।

—ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

প্রভু বলিলেন, 'ইহাও বাহিরের কথা।'

মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়। শ্রুতি-মতে বিদ্যা দুইটি—অপরা ও পরা। অপরা—মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরা বিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ইহাই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বভাবা, যাহা হৃদয় হইতে অবিদ্যার আবরণ দূর করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

পরা বিদ্যা ও পরা ভক্তি একই বস্তু। মূলতঃ দুইটি অভিন্ন, প্রভেদ কেবল আস্বাদন-বৈচিত্র্যে। যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ তথা ব্রহ্মবিহার-জনিত এক সমাধিরসে মগ্ন থাকেন। ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত পরাবিদ্যা লাভ করা দুষ্কর। পরা বিদ্যায় সংবিদ্ তথা শুদ্ধ জ্ঞানেরই প্রাধান্য, কিন্তু হ্লাদিনী তথা ভক্তির আনন্দদায়িনী শক্তিরও বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিই অসম্ভব হইত।

আর পরা ভক্তির যে পরিণতি কৃষ্ণবিহার, তাহাতে হ্লাদিনীর প্রাধান্য, কিন্তু সংবিদ্ তথা জ্ঞানের সাহচর্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, নতুবা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব।

প্রভু এই পরা বিদ্যা তথা পরা ভক্তিকে 'বাহ্য' বলেন নাই, বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা, মমত্ব-বুদ্ধিহীন, সঙ্কুচিত যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই বাহ্য।

ভাদ্র মাস; কৃষ্ণা অষ্টমীর গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-তলে, মধ্য নিশীথের নীরব কারাগৃহে, কঠিন লৌহশৃঙ্খলের ব্যথার মধ্যে যখন সর্বদুঃখহর শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বসুদেব ও দেবকী নবজাত শিশুকে বিষ্ণু-জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ সম্বরণ করিয়া দ্বিভুজ হইলেন, তথাপি যেন দেবকীর সশঙ্ক হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষোলগ্ন করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী জানেন, তাঁহার পুত্র বিশ্বের অধীশ্বর; কাজেই তাঁহার মমত্ব-জ্ঞান দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত।

শুধু মথুরায় নয়, দ্বারকায়ও দেখিতে পাই এই ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির প্রকাশ।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রধানামহিষী স্বয়ং লক্ষ্মী-রূপা রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন: দুষ্ট শিশুপালের হাত হইতে রুক্মিণীর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রুক্মিণীতে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তিনি অকিঞ্চন, নিরাসক্ত, অসংসারী; কাজেই তিনি রুক্মিণীর পতি হওয়ার অযোগ্য। তিনি রুক্মিণীকে মুক্তি দান করিতেছেন, রুক্মিণী যাঁহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করুন।

পতির পরিহাস শুনিবামাত্র রুক্মিণীর মন ভয়ে ও আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল—সত্যই তো তিনি কেবল আমার পতি নহেন, তিনি যে জগৎ-পতি। মায়ার সংসার কি ইঁহাকে বাঁধিতে পারে কোন দিন? তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ভয়াতুরা কপোতী মূর্ছিতা হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিতা হইলেন।

মহাপ্রভু এই ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বলিলেন, 'এহো বাহ্য'।

রায় এবার বলিলেন—'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার'। প্রমাণ-শ্লোক:

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্‌॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'হে অজিত, তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিচারের কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা কেবলমাত্র সাধুগণের আবাস-স্থানে অবস্থান পূর্বক সাধুগণের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপ-গুণ-লীলাদির কথা, তোমার চরিতকথা বা তোমার ভক্তদের কথার কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্বক জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারাই প্রায়শঃ তুমি বশীভূত হও।

প্রভু বলিলেন—'এহো হয়'। সুনিপুণ সুদক্ষ পথিকৃৎ রায় রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণ-ময় নানা রুক্ষপথের মধ্য দিয়া প্রভুকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এবারে ছায়াঘন কুসুমাস্তীর্ণ পথে প্রভুসহ আসিয়া পৌঁছাইলেন—অদূরে প্রেম-দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর বেশী দূর নয়; এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া অচিরেই পৌঁছাইয়া দিবে সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদার স্নেহ-বন্ধনে ধরা পড়িয়াছেন।

কচি মুখখানি ভরিয়া মাটির দাগ; সখা ভ্রাতা সব সাক্ষী উপস্থিত—তবুও দুষ্ট ভীত বালক বলিতেছে, 'আমি মাটি খাই নাই, মাগো, এরা মিথ্যা কথা বলিতেছে, এই দেখ না আমার মুখ?'

গোপাল হাঁ করিলেন, যশোদা দেখিলেন তাঁহার গোপালের মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মুহূর্তের জন্য পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল, নারায়ণ-জ্ঞানে স্তুতি করিলেন ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডো-দরকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিত হইয়া উঠিলেন? কি সর্বনাশ! কোন যক্ষ, রক্ষ না প্রেতাশ্রিত হইল আমার গোপাল? রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া দিলেন পুত্রের কণ্ঠে, পুত্রের মঙ্গল-কামনায় বারে বারে প্রার্থনা জানাইলেন নারায়ণের পায়।

ঘরে ঘরে ননী চুরি! রোজ অভিযোগ কানে আসে। আজ চোর ধরা পড়িয়াছে—আর নয়, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না গোপালকে; আজ তাহাকে বন্ধন করিতে হইবে—মাতা রজ্জু লইলেন।

ঐটুকু তো কোমল অঙ্গ—বেষ্টন করিতে কতোটুকুই বা রজ্জুর প্রয়োজন? কিন্তু কি আশ্চর্য! রজ্জুর পর রজ্জু সংগৃহীত হইতে লাগিল, তবু ঐ পরিমিত শিশু-তনুখানি বেষ্টিত হইল না। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, তাঁহাকে বন্ধন করিবে কে—কিসের দ্বারা? শ্রান্ত ক্লান্ত—ঈষৎ বা ক্রুদ্ধ যশোদার বদন হইতে স্বেদধারা নির্গত হইতে লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চেষ্টা। একবার মনে হইল, না—এ তো গোপাল নয়, এ যে বিশ্বপালক বিশ্বধাতা।

মায়ের ক্লান্তির বেদনার ছোঁয়া বুঝি স্পর্শ করিল ঈশ্বরকে—তাই ক্রন্দনরত ভীরু চোখে-মুখে অপরূপ মায়ার কাজল মাখিয়া বন্ধনে ধরা দিলেন গোপাল।

অঘাসুর, বকাসুর, পুতনাবধ, কালীয়দমন—ঐশ্বর্যের কত লীলাই তো ঘটিল বৃন্দাবনে, কিন্তু নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী তাঁহাদের কানাই-এর উপরে নারায়ণের কৃপার প্রকাশই প্রত্যক্ষ করিলেন মাত্র? গোপাল তো সাধারণ বালক, তাহার আবার কোথা হইতে আসিবে এই অলৌকিক ক্ষমতা? তাহাকে রক্ষা করিতেছেন নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে সমস্ত ব্রজধাম যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার

পরম প্রিয় উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠাইলেন —সখা-সখী, গোপ-গোপী ও মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিতে।

রাজরথে আরোহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন; মনে আছে গুরুদায়িত্বের গৌরব। জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধব—সর্বত্র তাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি, জানেন না কৃষ্ণ-বিরহের তীব্রতা কত দূর। শোকাচ্ছন্ন ব্রজে প্রবেশ করিয়া মন বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া বিরহের যে রূপ দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কথা কহিবার সাহস হইল না। দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকের সম্মুখে নীরব থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নন্দ মহারাজ! ধন্য আপনার ভাগ্য, ধন্য আপনার কৃষ্ণপ্রেম! কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে আপনি কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং ভগবান—এ নিখিল বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি'

যে প্রবল মানসিক শক্তিতে নন্দ আপন উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর শোককে এতদিন দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উদ্ধবকে দর্শন করা অবধি তাহা আর বাধা মানিল না, প্রবলবেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'উদ্ধব, জানিতাম—মহাজ্ঞানী মহাশাস্ত্রজ্ঞ আপনি, কিন্তু কি অজ্ঞের মতো কথা বলিতেছেন আজ? কে স্বয়ং ভগবান, আমার গোপাল? উদ্ধব মহাশয়! আপনি কি জানেন না, সে যে আমার কত অবোধ, কত বা তাহার শিশুসুলভ চঞ্চলতা? সারাদিন ঘরে ঘরে ননী ক্ষীর চুরি করিয়া খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও তো ধরা পড়িয়াছে? চুরি তো করেই—আবার ধরা পড়িয়া মিথ্যা কথাও বলে; বলে, আমি ননী খাই নাই। বলুন তো মহাজ্ঞানী উদ্ধব! ভগবান কি চুরি করেন—না মিথ্যা কথা বলেন?'

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি বলিবেন তিনি এই বাৎসল্যকাতর নন্দ মহারাজকে? এই প্রেমের রাজ্যের খবর তো তাঁহার জানা নাই!

আর এক ভক্ত দেবর্ষি নারদ—একদিন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বারকায় আসিয়াছেন; দেখেন অপরিসীম শিরঃপীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ কাতর। নারদ বিস্মিত হইলেন, তথাপি ব্যাকুলচিত্তে প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া নারদের পদধূলি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন, শিরঃপীড়ার এই একমাত্র মহৌষধ—ভক্ত-পদধূলি মস্তকে ধারণ।

শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, জিহ্বা দংশন করিয়া নারদ শত হস্ত দূরে সরিয়া গেলেন। দ্বারকার মহিষীবৃন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ত্রিভুবনের সমস্ত দেব, ঋষি—সকলের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ নারদকে পাঠাইলেন—ভক্ত-পদধূলির আশায়। শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে নারদ ফিরিয়া আসিলেন, কে দিবেন ভগবানের মস্তকে পদধূলি, কাহার আছে সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ?

পথে পড়িল বৃন্দাবন—গোপপল্লী। কি যে আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের এই মূঢ় গ্রাম্য গোপ-গোপীর প্রতি—দেবর্ষি তাহা বুঝিতে পারেন না; তথাপি আজ হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া ভাবিলেন, একবার দেখিয়াই যাই না?

ব্রজধামে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেবর্ষি, অমনি চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ব্রজগোপীগণ—তাঁহাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন: 'বলুন দেবর্ষি! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি? তাঁহার কুশল বলিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।'

নারদ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া ও অদ্ভুত ঔষধের কথা বলিলেন; এবং ত্রিভুবন ঘুরিয়াও যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাও জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর কিশলয়তুল্য শত শত পদ মহাপূজ্য দেবর্ষির সম্মুখে প্রসারিত হইল, গোপীগণ কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'নিন মহর্ষি, এই মুহূর্তে আমাদের পদধূলি নিয়া শীঘ্র কৃষ্ণকে আগে সুস্থ করিয়া তুলুন; আমাদের পাপের কথা পরে ভাবা যাইবে।'

ইহাই শুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, স্বার্থগন্ধ-হীন ভালবাসা। এই প্রেম যেন মধ্যাহ্ন জ্ঞান-সূর্যের প্রখর জ্বালার পর্যবসান গোধূলির স্নিগ্ধ প্রেমের আলোতে, যেন প্রজ্বলিত ধূপকাঠির শিখাটি স্তিমিত করার পরে স্নিগ্ধসুগন্ধ-বিস্তার।

তাই একদিন ব্রজকান্তাদের এই প্রেমের পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে নতলুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যেন বৃন্দাবনের লতা গুল্ম তৃণ হইয়া জন্ম লাভ করি; গোপীগণের চরণধূলায় সেদিন আমি অভিষিক্ত হইব।'

প্রভু আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন; প্রসন্ন স্মিত হাস্যে বলিলেন, 'এহো হয়, আগে কহ আর,'

'রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য-সার।'

প্রমাণ-স্বরূপ 'পদাবলী' হইতে তিনি দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই:

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ (পদ্যাবল্যাং ১৪)

—যদি কোন ক্রমে (সৌভাগ্যাতিশায়ী) কোন কারণবশতঃ মিলিয়া যায়, তবে (যেমন করিয়াই হ'ক) কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (জারিত) মতি (বুদ্ধি) ক্রয় করিবে। কৃষ্ণে তাদাত্ম্য-বুদ্ধি ক্রয় করিতে গেলে লালসাই হইবে একমাত্র মূল্য। কিন্তু কোটি জন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না। [ক্রমশঃ]

লহ প্রণাম

শ্রীশান্তশীল দাস

শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম,
হে মহাজীবন, হে অভিরাম!
অন্তর-মাঝে ধ্বনিত নিত্য
সঙ্গীতসম ও-প্রিয়নাম।

তুমি অপরূপ, তুমি অভয়,
তুমি নিরুপম, জ্যোতির্ময়!
চিরসুন্দর ও-মুরতিখানি,
ও-জীবন চির দিব্যধাম।

তুমি দীপশিখা চির-উজ্জ্বল,
শান্ত, সৌম্য, অচঞ্চল!
'নর'রূপে তুমি এলে 'নারায়ণ'—
ধন্য হ'ল এ মর্ত্যধাম।

অশরণে তুমি দিলে শরণ,
মন্ত্রটি দিলে দুখহরণ:
সেখানেতে জীব সেখানেই শিব,
এ-মন্ত্র জপি অবিশ্রাম।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশে দেখা দেয় নবযুগের অপূর্ব লক্ষণ। স্বামীজীর জাগরণের বাণী সুপ্তোত্থিত ভারত-বাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দেশপ্রেমে। কক্ষভ্রষ্ট বহু ধূমকেতুই স্বামীজীর আহ্বানে ও আকর্ষণে কল্যাণের কক্ষপথে চালিত হইয়া জাতীয় জাগরণের মহাব্রতে নিয়োজিত হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহাদেরই একজন ; আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। আত্মবিস্মৃত বঙ্গবাসীর অধিকাংশই আজ জানে না শতবর্ষ পূর্বে (১১ই ফেব্রুআরি, ১৮৬১) মুক্তির এই উপাসক বাংলাদেশে—হুগলি জেলার এক অখ্যাত পল্লীতে (খন্যান গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বালক ভবানীচরণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন, কেশব-চন্দ্রের মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ; ক্রমশঃ খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে প্রটেস্টাণ্ট, পরে রোম্যান ক্যাথলিক সাধু হইয়া তিনি সিন্ধুদেশে প্রচার করিতে থাকেন ; তখন তাঁহার নাম হয় রেভারেণ্ড থিওফিলাস (Theophilus = Lover of God). ১৮৯৪ খৃঃ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতো গৈরিক ধারণ করিয়া নাম পরিবর্তন করেন 'ব্রহ্মবান্ধব'। তখনও তিনি Sophia পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া ক্যাথলিক ধর্মই প্রচার করিতেন।

১৮৯৩ খৃঃ শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্য তাহাকে বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই কালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার মনের এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

১৯০২ খৃঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি কপর্দকশূন্যহস্তে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে যান এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

১৯০৩ খৃঃ ভারতে ফিরিয়া তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক পথে পদক্ষেপ করিলেন। এক পয়সা মূল্যের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া তিনি জাতীয়তাবোধ ছড়াইতে লাগিলেন। বিদেশীর মোহ কাটাইয়া দেশবাসীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে 'সন্ধ্যা'র স্থান অতি উচ্চে। উপাধ্যায় ক্রমশঃ 'স্বদেশী আন্দোলনে'র নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ আন্দোলন শক্তিশালী করেন।

১৯০৭ খৃঃ কঠোর দমননীতির ফলে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার পরই 'সন্ধ্যা' রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। 'সন্ধ্যা' প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মবান্ধব সরকারকে জানান, তিনি বিচারের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবেন না ; আরও জানান, বিদেশী সরকারের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে শাস্তি দেয়। দেশপ্রেমিক ও ঈশ্বর-প্রেমিক এই সাধুর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। বিচারাধীন থাকা কালেই ২৭শে অক্টোবর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমালোচনা

শিখের মন্ত্র—অনুবাদক : শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা কারূচারাল সেণ্টারের ব্যবস্থাপনায় অমৃতসর শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৫ ; মূল্যের উল্লেখ নাই।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যেমন বেদ, খৃষ্টধর্মের বাইবেল এবং ইসলাম ধর্মের কোরান, সেইরূপ শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের নাম 'আদি-গ্রন্থ'। শিখেরা ইহাকে 'গুরু-গ্রন্থ'ও বলেন। উপনিষদের সার যেরূপ 'গীতা', 'আদিগ্রন্থে'র সারভাগ সেইরূপ 'জপজী'। 'জপজী' গ্রন্থই 'শিখের মন্ত্র' রূপে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ।

'জপজী' গুরু নানকের মর্মবাণী, তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সাধকের মঙ্গলের জন্য তাহা 'জপজী'তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সত্যগুলি সাধনপথের বিশেষ সহায়ক—ইহাতে যে কোন মতের ও যে কোন পথের সাধক সাধনার সার্বভৌম ভাব ও আদর্শ উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন। সুধী গ্রন্থকার এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় সহজ সরস অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শিখধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল পাঠককে এই বইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভক্তমালা—সাধু অঘোরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি কর্তৃক ৯৫, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও দেবর্ষি নারদের আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সমবেত উপাসনা ও প্রার্থনার উপর জোর দিলে ব্রাহ্ম ভক্তগণের মন ব্যাকুলতা ও ভক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই ভক্তি-রস ব্রাহ্মসমাজ-জীবনকে সরস ও উর্বর করিয়া তোলে। সেই সময় কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় অঘোরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ভাগবত-পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে আদর্শ ভক্ত-জীবনের আখ্যায়িকা সঙ্কলন করিয়া সকলকে শুনাইতেন, পরে সেইগুলি একত্র করিয়া তিনি 'ভক্তমালা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহার মধ্যে 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ' ১৮৭১ খৃঃ এবং 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন-লাভ' ১৮৭৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বহুদিন পূর্বে রচিত এরূপ একখানি পুস্তকের পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করিয়া শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় এইরূপ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। বইটিতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও নারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে।

পুস্তকে উদ্ধৃত ভাগবত ও পুরাণের শ্লোক-গুলি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সন্ধান করিয়া সন্নিবেশিত হইলে পুনঃপ্রকাশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর: গত ৯ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের নবনবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসারদামঠে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয়। প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে একটি মহিলা-সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা কর্তৃক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পর সুরশিল্পী শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার স্বামীজীর স্তব ও গান গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা স্বামীজী-চরিত্রের বিভিন্ন দিক এবং নব্যসমাজ-গঠনে স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। অতঃপর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা 'প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করেন। সভানেত্রী ডাঃ কল্যাণী মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক মিলন ও উহার প্রভাবে তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সার্থক প্রকাশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০ মহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বর: স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৮ই জানুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নবনবতিতম জন্মোৎসব মহা উৎসাহে সম্পন্ন হয়। অতি প্রত্যুষ হইতে মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, পূজা ও চণ্ডী-পাঠাদি হইতে থাকে। বেলা ১১টায় কলিকাতা হইতে আগত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ' নামক তদ্রচিত কথকতা সুমধুর গীত-সহযোগে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করেন।

দ্বিপ্রহরে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় তিন সহস্র নরনারী পরম ভক্তি-ভরে অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করেন।

বৈকাল ৫টায় সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে উড়িষ্যা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কে. এন. মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ও শ্রীগৌরীনাথ ব্রহ্ম গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুমধুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের আগমনের কারণ বর্ণনা করেন।

সভাশেষে কলিকাতার কীর্তন-বিশারদ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় সুমধুর কীর্তনে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

সর্বশেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর একান্ত প্রিয় শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন সাধু ও ভক্তগণ কর্তৃক গীত হইলে ঐ দিনের উৎসব সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বহু ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুকৃথঙ্কর মহাশয়ও কিছু সময়ের জন্য আশ্রমে আসিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যান।

কার্যবিবরণী

বারাণসী: কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ১৯০০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি ইহা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে আর্তসেবায় রত।

১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবা-শ্রমের কর্মধারা:

(১) সাধারণ হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে ৩,৪০১ রোগী ভরতি হয়, ২,৯০৩ আরোগ্য লাভ করে। অস্ত্র-চিকিৎসা: ৭২৬। গড়ে দৈনিক ১০২টি শয্যায় রোগী ছিল।

(২) বৃদ্ধ অসমর্থ পুরুষ ও নারীর আশ্রয়-ভবন: ভবন দুইটিতে যথাক্রমে ২৫ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা-বিভাগে ২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাভাবে অধিক ভরতি করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) সাধারণ চিকিৎসালয় (বহির্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে (শিবালা শাখা-কেন্দ্রের রোগীসহ) মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা: নূতন ৬২,৯০২; পুরাতন ২,০১,৯৭২। গড়ে দৈনিক রোগী ৭৩৫; অস্ত্র-চিকিৎসা (ইঞ্জেকশন সহ) মোট ৫২,৫৫৯।

(৪) সাহায্য: ১০৬ জন দরিদ্র অসহায় নারীকে সাহায্য বাবদ ২,২৮৫.৬০ টাকা এবং ২৬ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বেতন, বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকের জন্য ৫৬৪৲ টাকা ব্যয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৪০ জনকে ১,১৯৫.২৪ টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৪১টি কম্বল ও ৫৫ খানি ধুতি বিতরণ করা হয়।

(৫) দৈনিক ৭৯৮ (বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, জননী, শিশু ও রুগ্ণ) জনকে দুধ দেওয়া হইয়াছিল।

(৬) প্যাথলজি এবং এক্স্-রে ও ইলেক্ট্রো-থেরাপি বিভাগের পরীক্ষা-কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৯ খৃঃ (৩৯ তম) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি হাই স্কুল (২টি বালিকাদের), ৪টি মিডল স্কুল, ৩টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ২টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে।

গত ৫ বৎসরের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার তালিকা:

বর্ষ	সংখ্যা
১৯৫৫	৪,৩১৪
'৫৬	৪,৬৩৯
'৫৭	৬,০২০
'৫৮	৬,৪৭৩
'৫৯	৬,৭৯৭

শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে বালক—৩,৭৩৮, বালিকা—৩,০৫৯; ক্রমিক-বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবাস-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪ জন ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৫০৩ (পূর্ব বর্ষের সংখ্যা ২,৯৮৬); পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ৩টি সাপ্তাহিক এবং ১২টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১২টি স্কুল লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৪,১৩৬। সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সিংহল: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ ও '৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তার। বাট্টিকালোয়া, বাদুল্লা, জাফনা, ভাবুনিয়া ও ত্রিঙ্কোমালি জেলায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবিস্তার-কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমেত মোট ২৬টি বিদ্যালয়ে ২৯৬ জন শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যালয়-

গুলিতে সর্বসমেত ৮,৬৭৬ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যচর্চা ও ধর্মানুশীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়; শিল্প ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। ৩টি অনাথ-ভবন (২টি বালিকাদের) এবং ২টি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত হইতেছে, এইগুলির মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩৩৫।

কলম্বো আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরেও নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জন-সাধারণ তাঁহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। গ্রন্থা-গারের পুস্তক-সংখ্যা ২,১৫০; পাঠাগারে ৫টি দৈনিক ও ৩১টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসে।

আলোচ্য বর্ষে সিংহলের বিভিন্ন জেলায় মিশনের বন্যার্ত-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩৫টি গ্রামে ৪,৬৬৮ পরিবারকে দুইমাসব্যাপী সাহায্য এবং ২০০ পরিবারের গৃহনির্মাণে অর্থ সাহায্য করা হয়।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
১৯৬০, জুলাই	
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ভগবদ্‌ভক্তি	শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ধর্ম ও শিক্ষা	স্বামী অজজানন্দ
শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
আগস্ট:	
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	স্বামী জীবানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকথা	„ জীবানন্দ
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ
গীতা	ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য
মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
সেপ্টেম্বর:	
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
স্বামী অভেদানন্দ	„ নিবৃত্যানন্দ
শক্তিপূজা	„ নিরাময়ানন্দ
অক্টোবর:	
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব	„ সুন্দরানন্দ
ধর্মপ্রসঙ্গ	„ শুদ্ধসত্ত্বানন্দ
নভেম্বর:	
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	স্বামী সুশান্তানন্দ
„ সুবোধানন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ধর্মের দশবিধ লক্ষণ ও তাহার প্রয়োগ	স্বামী জীবানন্দ
গীতার বাণী	„ বোধাত্মানন্দ
নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
ডিসেম্বর:	
বর্তমান ভারত ও স্বামীজীর আদর্শ	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কীর্তন (দানলীলা)	রাধারমণ কীর্তন-সমাজ
নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান	শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) ঃ

নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় :

সেপ্টেম্বর : ধ্যান ও সমাধির প্রকার; ধর্মে যুক্তি ও অনুভূতির স্থান; ঈশ্বর আছেন কি ?—তাহার প্রমাণ; যোগ ও বেদান্ত।

অক্টোবর : মরণের পারে; মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ; আমরা যাহা অনুসন্ধান করি, তাহা এখানেই আছে এবং এখনই পাওয়া যাইতে পারে; আধ্যাত্মিক শিক্ষা কি ? শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার শিক্ষা; জগন্মাতাকে কিরূপে উপাসনা করিব ? কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়; ঈশ্বরের জন্যই জীবনধারণ; ঈশ্বর ও স্বেচ্ছাচারী রাজা।

নভেম্বর : যে শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে; কুণ্ডলিনী শক্তিকে কিরূপে জাগানো যায় ? ধ্যান কাহাকে বলে ? জীবাত্মার উন্নতি ও অবনতি; আত্ম-প্রভুত্ব কিভাবে লাভ করা যায় ? আত্মা ও মনের সম্পর্ক; ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ; স্বামী প্রেমানন্দকে যেরূপ জানিয়াছি; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮ টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

বক্তৃতা-সফর

দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ১১ই জুলাই হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বক্তৃতা-সফর করেন। ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরে এবং মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সাইগন, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম ও ব্রহ্মদেশের প্রধান নগরগুলিতে বিশিষ্ট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁহার প্রধান বক্তৃতাগুলি সিঙ্গাপুর, জাকর্তা, কুয়ালা-লামপুর, সাইগন, ব্যাঙ্কক ও রেঙ্গুনে প্রদত্ত হয়। নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় :

ভারতীয় কৃষ্টির তাৎপর্য, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন, উপনিষদের সৌন্দর্য, হিন্দু-ধর্মের মূল উৎস, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পট-ভূমিকা, বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, গীতার প্রধান ভাব, যীশুখৃষ্টকে কেন পূজা করি, ইসলামের মূল ভাব, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, ভারতে ও বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান গণতন্ত্র ও ধর্ম, ভারতের নবজাগরণ, ভারতে নারীজাতির অভ্যুদয়, নাগরিকতার নীতি, শিল্পযুগে আধ্যাত্মিকতা, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, বিবেকানন্দের বাণী, ভারতের মহাপুরুষগণ।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন : আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২১শে জানুআরি রাত্রি ৮-৩০ মিঃ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন ৮৬ বৎসর বয়সে 'করোনারি থ্রম্বসিস্' রোগে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহত্যাগ করেন। ঢাকার বিক্রমপুরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল ছিল। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অল্প বয়সে সামান্য বেতনে তিনি বরিশালে সরকারী চাকরি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। মাঝে কিছুকাল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ ও তাঁহার সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। অবসর পাইলেই তিনি নিয়মিতভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা দরিদ্রের সেবা করিতেন। 'স্বামীজীর কথা'-গ্রন্থে সুরেন্দ্রকুমার স্বামীজী সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বরিশালে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে স্বামীজীর শিষ্য ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করেন এবং আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ কেন্দ্রের উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্র : দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে জানুআরি রাত্রে ব্রহ্মচারী নরেন্দ্র বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্র চন্দ্র সেন। পূর্বে তিনি অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সোনার-গাঁ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন। কিছুকাল ময়মনসিংহ আশ্রমে কাটানোর পর তিনি হিমালয়ে অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন, শেষ জীবনে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে কাটান। রাঁচি যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব

সালেপুর (কটক) ঃ গত ১লা জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, কীর্তন, ভজন ও গ্রন্থপাঠাদি হইয়াছিল। রেভেন্‌সা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহরিহর মিশ্র ও শ্রীবংশীধর মিশ্র প্রমুখ ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। প্রসাদ-বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ৯ই জানুআরি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ৯৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, ভজন ও সাধুসেবা এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি' পাঠ করা হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে গত ৯ই হইতে ১৪ই জানুআরি পর্যন্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৯টি প্রদীপ জ্বালাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রথম দিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ডক্টর রাধাবিনোদ পাল, মেয়র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অন্যান্য দিন ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিভিন্ন বক্তার মূল বক্তব্য: স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্যমুখিতা ও অনুকরণপ্রিয়তা হইতে ফিরাইয়া যুগোপযোগী আদর্শ দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৫ই জানুআরি রবিবার জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বেলা ৩ ঘটিকায় শ্যাম স্কয়ার হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কলেজ স্কয়ার পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে।

বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব গত ২৯শে জানুআরি সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

বিষ্ণুপুর: গত ১৩ই জানুআরি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, কথকতা ও দরিদ্র-নারায়ণসেবা হয়।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

শিকড়া-কুলীনগ্রাম (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে জানুআরি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য, রামনাম, তীর্থপরিক্রমা, রামায়ণ-কথকতা (লবকুশ-যুদ্ধ), তরজা-গান, যাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। উৎসবের শেষ দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

জাতীয় কৃষিমেলা

আলিপুর টাঁকশালের সন্নিকটে তারাতলা রোডের পার্শ্বে প্রায় ৩৩ একর জমির উপর আয়োজিত জাতীয় কৃষিমেলা কলিকাতার ইতিহাসে নূতন। ভারত কৃষকসমাজের উদ্যোগে ১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে প্রথম বিশ্ব কৃষিমেলা হইয়াছিল। সেই কৃষিমেলার সাফল্য ও প্রেরণায় এই কৃষিমেলা আয়োজিত হয়।

এই মেলায় আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপান, পশ্চিম জার্মানি ও সোভিয়েট রাশিয়া অংশ গ্রহণ করেন। মণ্ডপগুলির রূপসজ্জা ও আয়োজন বিশেষ আকর্ষণীয়।

পশ্চিম জার্মানির মণ্ডপটিতে বিগত বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি দুর্জয় আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠনমূলক কাজে কিরূপ বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে।

আধুনিক কৃষিতে সমবায়ের ব্যাপক প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাশিয়ার কৃষিমণ্ডপের আকর্ষণীয় বস্তু। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কৃষিক্ষেত্রে উহার ব্যবহার দেখিবার জন্য বহু দর্শক পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ার মণ্ডপ-দুইটিতে ভিড় করে।

বিদেশী রাষ্ট্র ছাড়া ভারতের নয়টি রাজ্য যথা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, আন্দামান এই মেলায় যোগদান করিয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তাহার অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয় নানাবিধ চিত্র মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, সঞ্চয় পরিকল্পনা, কুটীরশিল্প প্রদর্শনীও সুন্দর হইয়াছে।

সমগ্র মেলাটির তিনটি ভাগ: জাতীয় বিভাগ, রাজ্য বিভাগ এবং গ্রামীণ শিল্প বিভাগ।

জাতীয় বিভাগে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা, ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ও কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং গ্রামীণ শিল্প বিভাগে খাদি কুটীর-শিল্প ও তন্তুজ শিল্প প্রদর্শিত হয়।

জাতীয় বিভাগের ৪৬টি মণ্ডপ এবং রাজ্য-বিভাগের ১০টি মণ্ডপ ছাড়া আরও ২৮টি কেনাবেচার পশরা বসে এই মেলায়। মেলাটি জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও আছে।

রেঙ্গুনে সংস্কৃত ও পালি অভিনয়

গত খ্রীষ্টমাসের বন্ধে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে রেঙ্গুনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'শক্তি-সারদম্' ও 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' এবং পালি নাটক 'বিম্ব-সুন্দরী-পটিবিম্বনম্' প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহাই ভারতের বাহিরে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় এবং জননী যশোধরা-গোপার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত পালি নাটকটি সুপ্রাচীন ও সুবিশাল পালি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক। তিনদিনই রামকৃষ্ণ মিশনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষে বহু বাঙালী ও অবাঙালী দর্শক-সমাগমে তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রারম্ভে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী সুললিত সংস্কৃত ও ইংরেজীতে মাতৃলীলাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতে প্রচারের নিমিত্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পালি নাটকটির টেপ রেকর্ড করা হইয়াছে।

প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্যা

গত বৎসর (এপ্রিল '৫৯—মার্চ '৬০) জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত নূতন পুস্তকের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল।

	গত বৎসর	তৎপূর্ব বৎসর
মোট	২৪,৮৫৬	২৭,৬৬০
ইংরেজী	১২,৫৮৫	১২,৮৭৩
হিন্দী	৩,৭৫১	৪,৮৪১
বাংলা	১,৭৫০	১,৫৬১
মারাঠী	১,৪০১	১,৪৫৭
গুজরাতী	১,১২৪	১,৮১৬
তেলুগু	৮১১	৯৮৬
মালায়ালাম্	৬৭৮	৮৩৮
কন্নাড়	৪৬৩	৫৮৭
উর্দু	৩৯১	২৭২
গুরুমুখী	২৪১	৩৫৪
ওড়িয়া	২১৬	২৪২
তামিল	১৭২	২৭২
সংস্কৃত	১৩৭	২৭২
অসমীয়া	১১০	৮৪
অন্যান্য	১,০২৬	১,০৭৮



মিলন-মন্ত্র

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।।

[সংজ্ঞানসূক্তম্—ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২-৪]

বহু মতের জন্য ছিন্ন ভিন্ন সমাজে এবং মতান্তর হইতে মনান্তরের জন্য দুঃখসাগরে পরিণত এই সংসারে বৈদিক যুগের সংবনন ঋষি সংজ্ঞান বা সকলের ঐকমত্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন :

হে স্তবকারিগণ ! তোমরা মিলিত হও, একসঙ্গে স্তব উচ্চারণ কর, একপ্রকার বাক্য ব্যবহার কর, তোমাদের মন সমানভাবে একই প্রকার অর্থ অবগত হউক—অর্থাৎ তোমরা সকলে একমত হও, পূর্ববর্তী উন্নতস্বভাব দেবতাগণ যেরূপ একমত হইয়া হবির্ভাগ (নিবেদিত ভোগ্যবস্তু) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ ধনধান্যাদি ভোগ কর ।

এই সকল পুরোহিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ একরূপ হউক, সম্মিলিত প্রাপ্তি একপ্রকার হউক, অন্তঃকরণ একই ভাবে ভাবিত হউক, জ্ঞান একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হউক, আমিও ঐক্য-বিধানের জন্য তোমাদিগকে একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতেছি। হে দেবগণ, সর্বসাধারণের হবির দ্বারা আমি তোমাদিগকে আহুতি প্রদান করি ।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয়গুলি মিলিত হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি) এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে পার। ঐক্য ভিন্ন উন্নতির অন্য উপায় নাই ।

কথাপ্রসঙ্গে

'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ'

এ বৎসর আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা উপলক্ষে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর্ল এটলি ভারতে আসিয়াছিলেন। ক্লিমেণ্ট এটলির সহিত ভারতের সম্পর্ক একাধিক কারণে চিরস্মরণীয়; তিনি ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের মতো রূঢ় হস্তে ভারত শাসন করিবার জন্যই প্রধানমন্ত্রী হন নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'দেউলিয়া' করিবার জন্যও তিনি সে গৌরবের আসন গ্রহণ করেন নাই, শ্রমিকদলের এই সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বহু পূর্ব হইতেই 'দেওয়ালের লেখা' পড়িতে পারিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যুগ-প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক জনমানসে তিনি আবেদন জানাইয়াছিলেন। বহু আলাপ-আলোচনার পর—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারত বিভক্ত করিয়া ইংরেজ এ দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছে দেশবাসীর হাতে। এ অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে মিঃ এটলিরই মন্ত্রিত্বকালে। ভারত তাঁহার নিকট ঋণ অস্বীকার করিতে পারে না।

তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাহার আগমনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ করা সঙ্গত নয়। ভারতের মৃত্তিকায় রোপিত পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের বৃক্ষশিশুটি কত বড় হইয়াছে, কেমন বাড়িতেছে—তাহাই যেন তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। এই অভিজ্ঞ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্‌ বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় আমাদের স্থান লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা যেন আমরা উপেক্ষা না করি।

দিল্লীতে তাঁহার দুই দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল (১) Future of U. N. O.—রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ, (২) Future of Democracy গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতাতেও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আহূত সভায় তিনি (১) ভারতের গণতন্ত্র (২) বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থা (World Government) (৩) কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ (Future of Commonwealth) আলোচনা করেন। মোটামুটি তিনি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

তাঁহার আলোচনার প্রথম ও প্রধান বিষয়—বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও ব্যাপক শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় সন্ধান। এতদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের কার্যের তিনি সময়োপযোগী সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রসংঘের গঠনতন্ত্র আজ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে। কয়েকটি বৃহৎ শক্তির উপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পিত রহিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যার সহিত মতামত প্রকাশের বা ভোটসংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর অধিবাসীর এক বৃহৎ অংশকে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে রাষ্ট্রসংঘ কখনই বিশ্বজনীন সংস্থারূপে পরিগণিত হইতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় শক্তিও সংগ্রহ করিতে পারে না।

লর্ড এটলি বিশ্বশান্তির জন্য আরও দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন: সুসংগঠিত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন রাষ্ট্রসংঘ (U. N.O.) স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর তিন বৃহৎ শক্তি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তারপর এশিয়া ও আফ্রিকায় যুগোপযোগী জাগরণের ফলস্বরূপ নব নব জাতীয় শক্তি উদ্বুদ্ধ হইতেছে। আজ সেগুলিকে বাদ দিলে বা উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জাতীয় শক্তি ছাড়াও আর একটি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা মানব জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয় করিয়া তুলিয়াছে, সে শক্তি মানুষেরই বুদ্ধিজাত অপরিমেয় আণবিক শক্তি।

এই শক্তি—একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিয়াছে, আবার অন্যদিকে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব করিয়া ইহা স্থায়ী শান্তি স্থাপনের গৌণ কারণ-রূপেও পরিগণিত হইতে পারে। উহা নির্ভর করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ঐ শক্তির নিয়ন্ত্রণের উপর।

রাষ্ট্রসংঘ এখন যেভাবে গঠিত আছে, তাহা দ্বারা ইহা সম্ভব নয়; অতএব বিশ্বের এই পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া যদি রাষ্ট্রসংঘকে বিশ্বশাসন-সংস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কতকটা নিরাপদ, নতুবা শক্তির লড়াই যে কতদূর গড়াইবে, কেহ বলিতে পারে না। রাসেল প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা শুধু বলিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির না হইলেও আণবিক যুদ্ধে সমুদয় সভ্যজাতির ধ্বংস অনিবার্য।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও সীমানা রক্ষার ভার রাষ্ট্রসংঘের উপর অর্পণ করে এবং ঐ বিষয়ে তাহার বিচার ও নির্দেশ মানিয়া চলে, তবেই উহা একটি বিশ্বশাসন-সংস্থায় পরিণত হইয়া বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আসন্ন ভবিষ্যতে এইরূপই একটা ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

আজাদ-বক্তৃতার দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি জীবননীতির দিক্ দিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ। আভিজাত্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যেই রচিত গণ-তান্ত্রিক ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের আসন রচনা করিয়াছেন যে ক্লিমেণ্ট এটলি, তাঁহার চোখে 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' কিভাবে প্রতিফলিত হইতেছে—তাহা সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তাঁহার বিশ্লেষণে টয়েনবি-র ঐতিহাসিক দৃষ্টি না থাকিতে পারে, পেশাদার রাজনীতিকের উন্মাদনাও তাহাতে নাই, আছে অভিজ্ঞতার কঠোর ব্যাবহারিক মাপকাঠি!

তিনি গণতন্ত্রকে রাজনীতি হিসাবে না দেখিয়া জীবননীতি হিসাবেই দেখিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, সভ্য ও শিক্ষিত মনুষ্য-সমাজেই ইহা সম্ভব, অন্যত্র নহে। গণতন্ত্রের পথ তা বলিয়া নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ নহে। পদে পদে ইহার বাধা। একনায়কত্বই ইহার প্রধান বাধা নয়, ইহার প্রধান বাধা আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়—শাসন-ব্যাপারে জনগণের উদাসীনতা। গণতন্ত্র এক নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতার ও জীবনব্যাপী সতর্কতার সাধনা। এজন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত ও সর্বদা সচেতন জনগণ। সরকার-পক্ষের স্বাধীনতা থাকিবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার, বিরোধী পক্ষের স্বাধীনতা থাকিবে উহার গঠনমূলক সমালোচনা করিবার, সামর্থ্য থাকিবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিকল্প সরকার গঠন করিবার। শুধু প্রতিবাদ করিয়াই তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে না, তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতাও থাকিবে।

ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে। অপরিবর্তনীয় সংবিধান গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। মুক্ত জীবনবিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করাই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। নূতন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে এখনও গঠনতন্ত্র অপূর্ণ রহিয়াছে। আর্ল এটলি ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন: ভারত কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি (federation); আমি জানি না—রাজ্যগুলির সহিত কেন্দ্রের সঠিক সম্বন্ধ কি, কোন্ কোন্ বিষয় কাহার হাতে আছে। তবে ভারত যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া চালাইয়া যাইতেছে, ইহা তাহার যথেষ্ট শক্তির পরিচয়।...পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাইতেছে যে গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে

গণতন্ত্র চালু রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বিবেক (Social consciousness and Social conscience); তাহা হইতেই দেখা দিবে—প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা ও উপযুক্ত শিক্ষা,—বিশেষত কিছু পরিমাণ রাজনীতিক শিক্ষা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে কি ধরনের মানুষ নির্বাচিত হইতেছে তাহার উপর। শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী জাগ্রত স্বার্থবোধ (enlightened self-interest) দ্বারা চালিত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করিবে। এই শিক্ষা শুধু বড় বড় শহরে সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। পল্লীর সমস্যা সমাধান করার উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর করে। অতএব নবতম শিক্ষার স্রোত হইতে পল্লীকে বঞ্চিত রাখিলে গণতন্ত্র পঙ্গু হইয়া যাইবে; স্বার্থপর বুদ্ধিজীবী বা মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে গণতন্ত্র একটি প্রচণ্ড রাজনীতিক-আর্থনীতিক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া অজ্ঞ দুর্বল দরিদ্রকে শোষণ করিবে। এ অবস্থা রোধ করিতে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও গণতান্ত্রিক ভাবের প্রচার। গণতন্ত্রের ভিত্তি পল্লীর কুটিরে। 'নাগরিক' কথাটি আজকাল খুব চালু হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত বা অন্য শব্দ চয়ন করা কর্তব্য। 'নাগরিক' বলিতে যেন শুধু নগরবাসীকেই না বুঝায়। সুদূর গ্রামের কুটিরের অধিবাসীরাই গণতন্ত্রের অদৃশ্য একক (unit), ভিত্তির প্রস্তর।

ভারতকে বাহিরের রাজনীতির দিকে বেশি তাকাইতে না বলিয়া লর্ড এটলি ঘরের দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের পূর্বে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সাম্য রক্ষাই অধিকতর প্রয়োজন। এরূপভাবে সাবধান করা সত্ত্বেও ভারতকে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন: এশিয়ায় এই নূতন পরীক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে—বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত কিভাবে ইহাকে কার্যকর করে তাহার উপর। কয়েকটি দেশে নবপ্রবর্তিত গণতন্ত্র ব্যাহত হইয়াছে, তাহারাও ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। ভারত যদি সাফল্যের সহিত গণতন্ত্রের পথে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভে সমর্থ হয়, তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

গণতন্ত্র পৃথিবীতে নূতন কিছু নয়, যেদিন মানুষ নিজ ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ ও শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছে, সেদিনই গণতন্ত্রের সূচনা হইয়াছে! গ্রীসে নগররাষ্ট্রগুলি ইহার দৃষ্টান্ত; ভারতে যদিও রাজতন্ত্র অধিকতর প্রচলিত ছিল, তথাপি গ্রাম-জীবনে পঞ্চায়েত-

প্রথা সুপ্রাচীন। পাঁচজনের মত লইয়া একটি বিষয়ের মীমাংসা করা এখানে চির-প্রচলিত।

গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলি রোমের সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হইল ; গণতন্ত্র সাম্রাজ্য-বাদরূপ রাহুদ্বারা গ্রস্ত হইল। নানা বিপর্যয়ের পর ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় আবার গণতন্ত্রের অভ্যুদয়! কিন্তু এক এক দেশে ইহা এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ড রাজার হাতে কলম দিয়া 'ম্যাগ্না কার্টা' সহি করাইয়া লইয়াছে, রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছে, আবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়াছে। রাজচ্ছত্র স্বীকার করিয়াও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত!

ইওরোপীয় সভ্যতার উৎক্ষিপ্ত এক অংশ আমেরিকায় এক বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেখানে রাজা নাই, কিন্তু বলা যায়, চার বৎসর অন্তর সেখানে একজন 'রাজা' নির্বাচিত হন! পশ্চিম গোলার্ধে বা 'নূতন পৃথিবী'তে উহাই একপ্রকার আদর্শভূত। ভাষার বিভিন্নতায় ইওরোপ আজও বিচ্ছিন্ন, আমেরিকার অনুকরণে 'সংযুক্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্র'গঠন এখন স্বপ্ন হইতে শূন্যে বিলীনপ্রায়। ইওরোপের পূর্বপ্রান্তে যে মহান্ আদর্শ জনগণের মুক্তির পতাকা উড়াইয়া বিপ্লবের বন্যায় 'জার'কে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহা কিন্তু এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, হয়তো সুদীর্ঘকাল জার-শাসিত সেই মহাভূখণ্ডে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার মতো মুক্ত মনোভাবের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই।

ভাবের দিক দিয়া এইখানেই পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ওয়েণ্ডেল উইল্‌কির 'এক পৃথিবী' হয়তো চিরদিন স্বপ্নেই থাকিয়া যাইবে। হয়তো বা তাহাতেই কল্যাণ, কারণ জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত একত্ব একনায়কত্ব। ঐ একত্ব বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, উহা কদর্য যান্ত্রিক একরূপতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমান সভ্যতার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কিন্তু আজ বিচার করিবার দিন আসিয়াছে—এই যন্ত্রবিজ্ঞান আমাদের জীবনে কতটা সুখের এবং কতটা দুঃখের কারণ হইয়াছে; আরও দেখিতে হইবে—ইহা গণতান্ত্রিক জীবন ও চিন্তাধারার সহায়ক না অন্তরায়!

যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, সংবাদ আদানপ্রদান দুরূহ ছিল, তখন স্বভাবতই শাসন-শক্তিও সীমিত ছিল; দূরবিস্তারী সাম্রাজ্য থাকিলেও শাসনযন্ত্র স্থানীয় অধিবাসীদের আয়ত্তাধীন ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দ্রুত ও দ্রুততর যানবাহন পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করিয়া শাসন-পদ্ধতিকে ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখী করিতেছে, ইহার শেষ ফল একনায়কত্ব। তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন অতি উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষা

আধুনিক প্রচার-যন্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আর্ল এটলি বলিয়াছেন: রেডিও টেলিভিসন এবং নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাযন্ত্র (Controlled Press) হইতে গণতন্ত্রের বিশেষ বিপদ। রেডিও বা টেলিভিসন যতই বাড়িবে, পথের ধারের সভা—হাটে-মাঠে বৈঠক ততই উঠিয়া যাইবে, নেতা ও জনগণ ততই পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ঐ সকল সভায় ও আলোচনায় নির্বাচন-প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটিত; ইহার অভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র অপেক্ষা দলগত আদর্শ ও উদ্দেশ্যই প্রধান হইয়া উঠিবে।

সংবাদপত্রের ব্যাপারেও দেখা যায় ছোট-খাট কাগজ আজকাল বড় বড় কাগজের কুক্ষিগত হইতেছে। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বহু ছোট ছোট সংবাদপত্র প্রয়োজন ; বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকদের না আছে মহৎ কোন নীতি, না আছে চিন্তার কোন উচ্চ মান।

রাষ্ট্রসংঘকে যদি কার্যকরী বিশ্বশাসন-সংস্থায় (World Government) রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবেই আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে; নতুবা এ পৃথিবী তিন পৃথিবীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে, তাহারই সম্ভাবনা সমধিক। দুই প্রান্তে দুই বিরোধী শক্তি, মধ্যে একটি নিরপেক্ষ মণ্ডল, কিন্তু নিরপেক্ষ মণ্ডল নিষ্ক্রিয় বা শক্তিশূন্য নয়। এইখানেই পড়িবে সর্বাধিক চাপ, এই নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জই পৃথিবীর শান্তি ও সাম্য রক্ষা করিতে সক্ষম। আর্ল এটলি ইঙ্গিত করিয়াছেন: গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছা-সম্মিলিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলিকেই হয়তো ভবিষ্যতে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন নিজ নিজ রাষ্ট্রগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সম্মান করা ও সাহায্য করা। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি সুস্থ থাকে, তবেই পরিবারের সামগ্রিক শান্তি। রাষ্ট্রেও যদি এই ভাব প্রতিফলিত হয়, তবেই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় কমনওয়েলথ-ভাবটির উপর বিশেষ জোর দিয়া লর্ড এটলি কমনওয়েলথকে একটি পরিবারের সহিত তুলনা করেন। একটি পরিবারের সকলে যেমন পারিবারিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া সমাধান করেন, তেমনি কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। এখানে নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র বা ভোটাধিক্যের কোন ব্যাপার নাই। কিন্তু দেখা যায় বহুক্ষেত্রে আলোচনার সিদ্ধান্তগুলি কল্যাণপ্রসূ হইয়াছে। বিভিন্ন বিশ্বসমস্যা তাঁহারা বিভিন্ন দিক হইতে দেখেন, কিন্তু সমাধানের লক্ষ্য একটি।

লর্ড এটলি মনে করেন, কমনওয়েলথ-ভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। কালক্রমে ইহাই একটি শক্তিশালী বিশ্বসংস্থায় পরিণত হইতে পারে। কমনওয়েলথের দুটি বড় কথা: ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান এবং সমষ্টিগত কল্যাণ। বৈধ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জন করিতে হইবে ও রক্ষা করিতে হইবে। এখানে পারস্পরিক সাহায্য ও শুভেচ্ছা থাকিবে, কিন্তু শর্ত থাকিবে না; বন্ধুত্ব থাকিবে, কিন্তু বন্ধন থাকিবে না।

সর্বকল্যাণ একটি বিশ্বজনীন ভাব। সর্বোদয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক উন্নতিসাধন (Co-prosperity) প্রভৃতি নানা রূপে ইহা আজ প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিছক রাজনীতি বা অর্থনীতির পথে জাতীয়তার ঊর্ধ্বে এই বিশ্বভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন হৃদয়ের বিস্তার, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই মানুষের ভিতর এই পরিবর্তন আনিয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে নগরে প্রান্তরে কুটিরে মন্দিরে সর্বত্র সর্বকল্যাণের জন্য প্রার্থনা-মন্ত্র ধ্বনিত হইত:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা আজ প্রার্থনা করি: মানব-কল্যাণের জন্য মানুষের সকল সাধুপ্রচেষ্টা সফল হউক, সকলে সুখী হউক, সকলের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হউক, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

চলার পথে

'যাত্রী'

নিজেকে বড় করতে হ'লে বড় হবার আদর্শ সামনে রাখতে হবে, আর রাখতে হবে তার পেছনে মহতী প্রচেষ্টাকেও। এই দুটোর উপযুক্ত সংমিশ্রণেই সঠিক ফল লাভ হয়। কয়লা যদি হীরা হবার স্বপ্ন না দেখে, তাহলে হীরা হবে কি ক'রে? তাই তো হীরার আদর্শ নিয়ে কয়লা নিজেকে একান্তে মাটির চাপের তলে লুকিয়ে রাখে শতসহস্র বৎসর ধরে। ওখানেই আরম্ভ হয় তার আদর্শ-সাধন ও তপস্যা। তারপর হীরা হ'লে সেই হীরার খোঁজ পড়ে—তার তখন মূল্যও যায় বেড়ে। কয়লার হীরত্ব-প্রাপ্তিতে তখন আর সেই কয়লা হেলা-ফেলার জিনিষ থাকে না, রাজারাণীর মাথার মণি হয় তখন সে।

কয়লার এই হীরা হওয়ার স্বপ্নই মানুষের সত্যকার মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। শতসহস্র কলঙ্ক ও কালিমার প্রলেপ লেগে লেগে আমরা তো সকলেই এক-এক খণ্ড কয়লা হয়ে আছি। বারে বারে নিজেকে ঘসছি, মাজছি কিন্তু তাতে কয়লার মলিনত্ব ঘুচছে না। কারণ বাইরের ঘর্ষণে এবং চেষ্টায় যথার্থ পরিবর্তন আনা শক্ত, তাইতো শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা দূর হয় না। কিন্তু একবার আন্তর পরিবর্তন হ'লে সব কিছুই পালটে যায়। তখন অমন যে মসীবর্ণ কয়লা, তাও শুভ্র দ্যুতিতে ভরে ওঠে; তখন তার ভারও বাড়ে, দামও বাড়ে। তাই তো আমাদের হীরা হওয়ার এত আগ্রহ।

হীরা হ'তে গেলে কয়লাকে যে সাধন—যে নিভৃতে অবস্থান—করতে হয়, তাও আমাদের অনুকরণীয়। আমাদের যথার্থ সাধনা বা তপস্যার আরম্ভ সেখানেই। আর এই তপস্যার জন্য আমাদের তীব্র তপস্যার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। কিছু হ'তে গেলে কিছু করতে হবে। কেবল স্বপ্নবিলাস দিয়ে 'হওয়া' যায় না, নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় মাত্র।

এই তপস্যার জন্য একটা বিশেষ যোগ সৃষ্টি করা চাই, তা না হ'লে সবই বৃথা। দেশলাই ও কাঠি পাশাপাশি রাখলেই আগুন জ্বলে না—ঘষবারও দরকার আছে। এই ঘষাটাই যোগ।

পূর্ণ হ'তে গেলে, শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে গেলে নিষ্ঠা ও চেষ্টার মূল্য তাই সর্বাগ্রে। মনে রাখতে হবে:

"We must endure
On going hence, e'en as our coming hither
Ripeness is all."

এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সদ্‌বস্তুর জন্য প্রার্থনাও থাকবে প্রচণ্ড। এই প্রার্থনা নিজের কাছে নয়, তাঁর কাছে—যাঁকে আমরা সর্বনিয়ন্তা বলে জানি। যদি এই সর্বনিয়ন্তা আমার 'আমি' হয়, তাহলে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে বৈদিক ঋষির মত ব'লব: স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঽঘ্নতা জানতা সং গমেমহি—সূর্য ও চন্দ্রের মতো আমরা যেন নিত্যই মঙ্গলকর পথে চালিত হই; এবং দাতা, অহিংসক ও বিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে যেন সতত মিলিত হই। কারণ আমরা ঐ ভাবে যদি আলোর পথে চলতে পাই, তাহলে সূর্য-চন্দ্রের মতোই

অন্যকে আলোক ও জীবন দিতে পারব। সেই চলাই তো সার্থক চলা, যখন আমরা চাইব সদাই সৎসঙ্গে ও শুভ পরিবেশের মধ্যে চলতে। দাতা, অহিংসক ও বিজ্ঞদের মাঝে তাই থাকার প্রার্থনা জানিয়ে ব'লব : যো দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজতা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। তো নো রাসান্তামরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ যাঁরা অমর, নির্ভীক ও ধার্মিক এবং দেবলোক ও পার্থিব লোকের দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত তাঁরা এখন আমাদের শ্রেয়ের পথ দেখান। এবং ঐ সকল লোক তাঁদের সদিচ্ছা দিয়ে আমাদের পালন করুন।

এই ভাবে চারিদিকের অনাদর ও অযত্নের কান্না ছেড়ে আলোকের পথে, সত্যের পথে, চলতে হবে আমাদের। বহু দীর্ঘনিশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগের মধ্যেই প্রেমে ও তপস্যায় আমাদের হ'তে হবে নির্বিষ ও পবিত্র। এর জন্য দেহের মৃত্যু যদি আসে আসুক, মনের মৃত্যু যেন না আসে। বাইরে বসন্তের ঐ পত্রঝরা গাছের মধ্যেও এই সত্য-সাধনা চলছে। ঐ বৃক্ষের বাইরের আপাত-মৃত্যুর মধ্যে মনের মৃত্যু নেই। তাইতো সে আবার একদিন ত্যাগের মহিমার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। আবার ফিরে পায় তার পত্রসম্ভারকে—পুরাতনের জীর্ণ-মলিন পত্রসম্ভার নয়—নূতন কিশলয়ের শতসহস্র শিহরণের লীলাখেলাকে। ঐ শিহরণের মধ্যেই জীবনের অসীম অভিনন্দন সদাই মূর্ত হয়ে রয়েছে। সাধক কবি ব্রাউনিং বলেছেন :

Earth changes, but the soul and God stand sure
What entered into thee
That was, is, and shall be ;
Time's wheel runs back or stops ; Potter and clay endure.

তাই বলি, চল পথিক, আদর্শ-সাধনার পথে চল। শুধু বাহিরের ক্ষুধা নয়, অন্তরের ক্ষুধার আহার জোগাবে চল। মনে রেখ, অন্তরের ক্ষুধা মানুষকে অন্তরের সাধনায় টেনে নেয়। এই সাধনার বিকাশ বিভিন্ন, প্রকাশও বিচিত্র। সাহিত্যে, কলায়, চিত্রে, সঙ্গীতে—এক কথায় অব্যক্তকে ব্যক্ত করার সাধনায় তার পরিপূর্তি। বড় হবার সাধনাই তাই সবচেয়ে বড় সাধনা। বসন্তের এই মহা আহ্বানে পত্র-ঝরা বৃক্ষশ্রেণীর মতো আমরাও চলো সেই অব্যক্তকে ব্যক্তের সবুজ সম্ভারে ভরিয়ে দিতে যাই চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম*

স্বামী অখণ্ডানন্দ

অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগের নিকট বলিয়াও থাকেন যে—'আপনারা সন্ন্যাসী, কোথায় নিভৃতগিরিগুহাবাসী ভগবদ্‌ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত-মানস হইয়া জীবনযাপন করিবেন, তা না এই অনাথ-বালক প্রতিপালন-রূপ [আশ্রম-চালনারূপ] বিষম সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন!'

ইহার প্রকৃত উত্তরদানে আমরা সক্ষম কিনা বলিতে পারি না, তবে আমরা যতদূর পারি—সন্ন্যাসী হইয়াও উক্ত কার্য করার বিশেষ আবশ্যকতা-বিষয়ে দুই চারিটি মনের কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

* * *

এ জগতে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী জীব আর নাই। মনুষ্যই সমুদয় শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কি আছে? তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

মনুষ্যাকার ঋষি-হৃদয়েই অপূর্বছন্দোময়ী বেদরাশির প্রকাশ; চিরশান্তিপ্রদ, জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ্—মনুষ্যোন্নতির চরম সীমা—এই দ্বিপদ-হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যের বহু তপস্যা, সাধনা ও আদরের ধন! বাক্যমনের অগোচর সর্বব্যাপী মহান্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব এই মনুষ্যহৃদয়ে! বেদমূর্তি ঋষিবৃন্দ, অবতার, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি প্রভৃতির আবির্ভাব আমরা এই মনুষ্যেই দেখিতে পাইয়াছি।

মনুষ্যের উপমা-স্থান এ জগতে নাই! নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশ-স্থল একমাত্র মনুষ্যে! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই কেন্দ্রীভূত। মনুষ্য এতাদৃশ শক্তিশালী হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করে তো তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। লুপ্ত-গৌরব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ!

মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর প্রেমের অসদ্‌ভাব হইলে ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি—কেবল কথার কথা মাত্র, ইহা সকল সভ্য জাতিই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তত্ত্ববেত্তা পুরুষ-মাত্রেরই জীবনে আমরা বিশ্বপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।

এই ভারতে এই মনুষ্যত্বের জন্য কে জানে কত শত শত জন আনন্দমনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ করিয়াছে!—যাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে লেখনীশক্তি নিঃশেষিত হইবে। সেই বিপুল প্রবন্ধের অবতারণা না করিয়া আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের বর্তমান অধঃপতনের কারণ : বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি

জীবন-ধারণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রাভাবে যে ভারতবাসী হতজ্ঞান, সামান্য ঔষধপথ্যাভাবে যে ভারতবাসী রোগ-শোকে জরজর, সামান্যবাসোপযোগী কুটীরাভাবে যে ভারত-বাসী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণায় বিকল-

* একটি পুরাতন অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

শরীর, সামান্যশিক্ষা-বিহনে যে ভারতবাসী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, প্রবলের অত্যাচারে যে ভারতবাসী সদাকাল উৎপীড়িত, এবং সংসারের যাবতীয় দুঃখের আধার-স্বরূপ তাহার এই মহান্ দুঃখের উপশমোপায় চিন্তা বা নিবারণ চেষ্টা না করিয়া—তাহাকে এক্ষণে বেদান্তের 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র নহে? —তাহার নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাওয়া কি হৃদয়বান্ মনুষ্যের কার্য?

সকল কার্যের উপযুক্ত সময় আছে। ভারতবাসী আজ যে কি কঠিন জীবন-সমস্যায় উপস্থিত, তাহা কি একবার আমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি অস্থিসার পুত্তলিকামাত্র, কি এক ভৌতিক-ক্রিয়াতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কেবল মনুষ্যের আকার ভিন্ন তাহাদিগের মনুষ্য-জনোচিত আর কিছুই নাই!

এই অধঃপতনের কারণ কি? একমাত্র সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই বৈষম্যদোষে উন্নতির চরম স্থান হইতে—অতুল সুখসমৃদ্ধিকে জলধির অতল জলে ডুবাইয়া—পতনের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই সত্য ঘোষণা করিবে!

যে জাতিতে বা যে সমাজে স্বার্থের বশীভূত হইয়া কতকগুলি লোক মনুষ্য-জীবনের প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপূর্বক নিজস্ব করিয়া সাধারণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত হইতে হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত, লোক-সমাজেরও যত অকল্যাণ তাহা একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন:

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ।
ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ।
লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক প্রভৃতি তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাদিগকে আপন আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে।

এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও ব্যবহার-বৈষম্য। আর এই বৈষম্যই যাবতীয় দুঃখের মূল। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত ও অন্যান্য প্রকার বৈষম্য-দোষেই মনুষ্যসমাজে ঈর্ষা দ্বেষ প্রবল হয়, এবং আপনি আপনাকে নষ্ট করে।

জাতির উন্নতি যুগ: সাম্য ও উদারতায়

কোন জাতিরই উন্নত দশায় এইরূপ বৈষম্য দোষ থাকা সম্ভব নহে। আর্য জাতির প্রথম অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈদিকযুগে পূর্বোক্ত বৈষম্য-দোষের আদৌ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদসমূহের আদি সংহিতা-ভাগে এরূপ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমানভাবে কল্যাণ কামনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বৌদ্ধ যুগের কথার অবতারণা করিতেছি। —ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পর ভারতে যে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, সেই শান্তি ও সেই সর্বজনীন ভাব কি ভারতের ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান্ বুদ্ধ যে শান্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি

এই মহান্ অনিষ্টজনক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদকারী নহে? সেই সময়ে ভারতগর্ভে যে কত শত সুসন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই শান্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া জগতে তাঁহারা যে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সকল মহাসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্তিস্তম্ভ ও বিজয়-পতাকা আজও সমগ্র সভ্য জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতের এই গৌরব-কাহিনী কি বৌদ্ধ ধর্মের উদারতার নিদর্শন-স্বরূপ নহে? ভারতের সে সৌভাগ্য-রবি আজ অস্তমিত! সঙ্কীর্ণতা ও বৈষম্যরূপ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আজ ভারত সমাচ্ছন্ন! ভারত পুনর্বার সেই মহাসূর্যের উদয় প্রতীক্ষা করিতেছে! বিশ্বপ্রেমের সেই সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

আমরা সর্বদাই অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে: হে প্রভো! আমাদিগকে তেজ দাও, ওজঃ দাও, বল দাও!—যাহা দ্বারা পুনর্বার আমরা সেই লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারি!

প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব স্ব সুখ সাধনের সমান অধিকার আছে; যে সমাজ-শাসন ইহা স্বীকার করে, এবং স্বাধীনভাবে মনুষ্যমাত্রকেই উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং সেই সমাজেই চিরশান্তি, সেখানেই মনুষ্যাকারে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। মহাশক্তি তাঁহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন। মনুষ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ শাসন কু-শাসন; এবং সেই কু-শাসনের বিষময় ফলেই আজ ভারত মহাদুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত!

উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান : প্রাথমিক অভাব পূরণ

আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিব যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, কিসে ভারতবাসী সবলকায় হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং আর্য জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

ভারতবাসীর জীবন মরণ সমান হইয়াছে। ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত; তাহাকে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের কূটতর্ক, সাংখ্যের জটিল মীমাংসা ও বেদান্তের মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইবে?

ঐ সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় এখন নয়। ঐ সকল দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনা মনে হয় যে 'মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা'!

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চায় যদি প্রসুপ্ত ভারত জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, এরূপ জ্ঞানচর্চার সার্থকতা আছে; তাহা হইলে আর আজ সমগ্র ভারতকে এইরূপ কালনিদ্রা-সম অবস্থায় থাকিয়া মহাবিভীষিকা উৎপাদন করিতে হইত না।

যাহার পেটে অন্ন নাই, পরনের কাপড় নাই, থাকিবার স্থান নাই এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ-চিন্তায় যে সদাকাল বিব্রত, তাহার চিত্তে কি ঐ সকল বিষয় স্থান পায়? তাহার কি অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার সময় আছে?

অতএব আইস, আমরা সর্বাগ্রে তাহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিবার উপায় করি। তাহার প্রদীপ্ত জঠরানল নির্বাপিত করিবার কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করি। 'শরীরমাদ্যং খলু

ধর্মসাধনম্'—শরীরই ধর্মসাধনের প্রধান কারণ, তাহার সংরক্ষণ না করিলে ধর্মজীবন লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আবার সকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংরক্ষণে পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন লাভ করা যায় না।

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহারা সহজসাধ্য জীবিকা উপার্জনোপযোগী কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করণান্তর জীবনের অবশিষ্ট কাল মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, সমর্থ, স্বদেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়?

ভারতের এই বিষম অন্নচিন্তার কিছুমাত্র উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভারত পুনর্বার স্বধর্মে বলীয়ান্ হইয়া, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া, ধর্মরাজ্যের অশ্রুতপূর্ব অননুভূত তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবে!

ঐ-কালে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত দুইখানি পত্র হইতে সংকলিত :

এখন আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর এই যে, অর্থসাধ্য লোকহিতে ব্রতী হইয়া আমাকে অর্থচিন্তান্বিত হইতে হয় নাই, বরং ঈশ্বরচিন্তাতেই অধিক সময় গিয়াছে ও যাইতেছে, এবং ইহাও জানি যে, তাঁহার কার্যই তিনি আমাদিগকে দিয়া করাইতেছেন। বহু জীবনের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা নাই।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নির্জন সেবা করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি চিরকালই করিবে? মানুষ যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল হইবে। জীবসেবা করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও উজ্জ্বল হয়, নিষ্কাম অনুষ্ঠান যে করে তার। ইহা যে অমুক করিবে, অমুক করিবে না, এইরূপ বাঁধাবাঁধি হওয়া অসম্ভব। কারণ যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া, অতএব সে ক্রিয়া নিষ্কাম হওয়াই চাই; এবং আত্মজ্ঞানী সহস্র কার্য করিয়াও স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকেন। এ নিগূঢ় তত্ত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইহা সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষের হৃদয়েই লুক্কায়িত আছে। (১৯.১০.১৮৯৮)

আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে।

দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সেই অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদানে নির্মিত বা বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধ্বনি সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিসনি? একথা যে শোনে, তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না। (১০.১.১৮৯৯)

সংসারে সাধন-ভজন*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরতরের—চিরকালের। আগে তিনি তারপর তো সব। এটা ভুলে গেছি। উপনিষদ্‌ও এই কথা আমাদের শেখাচ্ছেন: তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ।

সংসারে আসক্তি টান কার প্রতি? এই সব সম্পদ্‌-ঐশ্বর্য, পুত্র-বিত্তের প্রতি। এই সবেই তো আমাদের আসক্তি। কিন্তু আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে—এ সবের চেয়েও প্রিয়। কাজেই তাঁকে প্রিয়-ভাবে উপাসনা করতে হবে। সত্যি আগে ভগবান, তার পর সংসার। আগে এক, তার পর শূন্য বসাতে হয়। এটা আমরা ভুলে গেছি। আগে তিনি। তিনিই সব দিয়েছেন। কাজেই সবার প্রতি আমার কর্তব্য যেটুকু তা পালন করতে হবে। এই হ'ল আসল কথা। এটা আমরা ভুলে যাই। কাজেই এই কথাটা সব সময় মনে রেখে চলতে হবে যে, আগে তিনি—তারপর সংসার। এই যে ছেলেমেয়ের প্রতি, সংসারের প্রতি আসক্তি—ভালবাসার আকর্ষণ, টান, সব তাঁরই জন্য। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। 'আর সব তাঁর ইচ্ছায় পেয়েছি, তাঁর ইচ্ছা হ'লে চলে যাবে। এই সব তিনি আমার কাছে দিয়েছেন, আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।' এইটি ভাবো যে, সব তিনি, সব তাঁর। কতটা ভালবাসা আসলে এটা সম্ভব হয়, বল দেখি? আর সেই ভালবাসাটা আসে না কেন? এই টানটা আসে না কেন? সংসারে টেনে রেখেছে। সংসার—জরু-জমি-রুপেয়া, এই সংসারকে জন্ম জন্ম ধরে ভালবাসছি, আপনার ব'লে মনে ক'রে রেখেছি। সেটা থেকে মন ওঠাতে হবে। সেইজন্যই ঠাকুরের শিক্ষা: হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙতে হবে, তা না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়। আর সেই আঠা ছাড়ানো যায় না। হাতে যদি তেল মাখানো থাকে, তা হ'লে আর আঠা লাগে না। লাগলেও অল্প চেষ্টাতেই উঠিয়ে দিতে পারা যায়। আসক্তি হ'ল আঠা। সেই আঠা মনে লেগে আছে। তেলটি কি? অনুরাগ, ভক্তি, ভালবাসা, ভগবানের প্রতি একটা আকর্ষণ। তিনি আমার চিরকালের আপনার। তিনি আছেন বলেই তো আর সব কিছু। যা কিছু আমাদের আকর্ষণ, ভালবাসা, টান সব তাঁরই জন্য। সেই জন্য হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙা—ভক্তিভাব নিয়ে সংসার করা। সংসারের প্রতি টান ভালবাসা, এতো থাকবেই; ভগবান দিয়েছেন আমাদের ভেতর, না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? আমরা কি দেয়াল, ইট, কাঠ, পাথর হবো? স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নিয়েই তো এই সংসার। সংসার থেকে কি প্রীতি ভালবাসা একেবারেই চলে যাবে? মোটেই না। সেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হবে। ছেলে-মেয়ে, স্বামীর সেবা সব। বুঝতে পারলে? এসব তাঁরই দান। তবে সংসারের সেবা করতে গিয়ে যে একেবারে সব গুলিয়ে

---

* ১৩.১১.৫৯, লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে। শ্রুতলেখক—শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলছি। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারছি না। সেইজন্যই ওই হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙার উপদেশ।

প্রীতি ভালবাসা অনুরাগ ও টান সংসারের প্রতি যা রয়েছে, তা থাকুক। তা না হ'লে আমাদের সংসারের কর্তব্য পালন হয় না। প্রীতি, ভালবাসা আবার ভগবানকেও দিতে হবে তো? সেই অনুরাগ, সেই যে টান, সেই প্রীতিটুকু, সংসারের প্রতি যা রয়েছে, সেটি তো ভগবানকে আমরা দিতে পারি না।

এই সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে যখন আবার পূজায় বসি, তখন কোথায় সেই প্রীতি? কোথায় সে ভালবাসা, আকর্ষণ, টান?

কিন্তু যদি সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি থাকে? কর্তব্য পালন করলে, আঠা লাগলো না। আবার সেই প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ নিয়ে বসো পূজায়, বসো জপে, বসো ধ্যানে, বসো প্রার্থনায়। সেইটি আমরা শিখিনি। এই জন্যই ঠাকুরের শিক্ষা: হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙো।

Attachment and Detachment—এই দুটো কথা আছে, মানে আসক্তি এবং অনাসক্তি। হাতে তেল মাখানো না থাকলে আঠা লেগে যাবে; ভালবাসা নিয়ে সংসারের যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একটা বড় কর্তব্য আছে। যাঁর সংসার, যিনি এই সব দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। উপাসনার সময় ডাকতে যাই, কিন্তু হয় না; এরা সব টেনে রেখে দিয়েছে, আঠা লেগে গেছে, যেহেতু হাতে তেল মাখানো নেই। কি সুন্দর ছোট্ট উপমা, আঠা-মুক্ত হয়ে প্রীতি ভালবাসা নিয়ে বসো পূজায়, ডাকো তাঁকে। এই প্রীতিটুকুই হ'ল আসল। ঠাকুর বলতেন, 'খোল মাখানো জাব'। ছেলে বলো, স্বামী বলো, সকলে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নিজেদের সংসারে দেখছ তো? সেইটুকু যদি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আস্বাদন না করে তো সংসারটা একেবারে শুকনো হয়ে যায়। এ তো তোমরা জানো। অনেক সময় শুনেছি, ছেলে মাকে বলছে, 'মা তুমি আর আগের মতো ভালবাস না।' সেই প্রীতিটুকু পাচ্ছে না ব'লে এই কথা বলে। স্বামী স্ত্রীকে বলছে, 'তুমি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ!' এই প্রীতি নিয়ে সংসারের এত আকর্ষণ। এইটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, ভালবাসা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। তেমনি ভগবানের দিকেও আকর্ষণ আছে তো! সকলের ভিতর তিনি। তিনি না থাকলে কোথায় থাকবে এ সব? এটা ভুলে গেছি। শরীরের সম্বন্ধই সার করেছি। কাজেই এর বেশী আর আমরা দেখতে পাই না। কাজেই এই প্রেম প্রীতি ভালবাসা আবার ওঠাতে হবে। উঠিয়ে ভগবানকে দিতে হবে। এই জন্যই গীতায় এত উপদেশ; ভগবান শ্লোকের পর শ্লোকে বলছেন: অনাসক্ত হও, আমায় ভালবাস। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'পানকৌটির মতো সংসারে থাকো'। দেখ, আর একটি দৃষ্টান্ত! পানকৌটি জলে রইল, ডানা ভিজে গেল, একবার ঝেড়ে নিলে, একেবারে শুকনো হয়ে গেল।

ঠাকুর বলতেন, পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকবে। দেখ, পাঁকের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তেলা গায়ে পাঁক লাগে না। অনাসক্তির মূলে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা। ভগবানের কাছে সেইটি আমরা দিতে পারি না। সংসারে আমরা প্রত্যেক জিনিসটি করছি প্রীতির সঙ্গে। এমনকি কুকুর, বেড়াল—তাদেরও

ভালবাসা দিচ্ছি। কুকুরটা পর্যন্ত তোমার প্রেম প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। সেখানে ভাষা নেই, কিন্তু তুমি কিভাবে তাকে যত্ন ক'রছ। খাওয়ানো দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে। কি হয়ে যাচ্ছে? গোলাম হয়ে যাচ্ছে।

যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে। সেই উলঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, আবার সেই ভাবেই ফিরে যেতে হবে। কোন্ অজানা দেশ থেকে এসেছ, কোন্ অজানা দেশে যেতে হবে! এই মাঝখানেরটা নিয়েই আমাদের যত কিছু। তিনি সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। আমরা সব তাঁতেই রয়েছি। তিনিই আমাদের গন্তব্য স্থল। সংসার তো আর গন্তব্য স্থল নয়। তবে সংসার কিভাবে করতে হবে? আগে তিনি, তাঁকে ভালবাসতে হবে; সংসারে যারা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে, কেন না তিনি ইহকাল পরকালে রয়েছেন। সব সময় আমার আপনার। ছেলেমেয়েদের দেখছ তো সংসারে। কখন দিচ্ছেন, কখন নিচ্ছেন, আবার কার কখন ডাক আসে! তার জন্য নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল বড় কথা। এইটি যেন কখনো ভুলো না।

সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর বলতেন, ছুতারনির মতো। এটি অভ্যাস করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয়া যায় না। চিঁড়ে কোটে ছুতারনি। চিঁড়ে তুলছে, দেখছে—চিঁড়ে কাঁড়া হ'ল কি না। খদ্দের এসেছে, তাকে চিঁড়ে বিক্রি করছে। আবার কে কবে কি দাম বাকি রেখেছে, তার হিসাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে। কিন্তু মনটা রেখেছে কোথায়? ঢেঁকির মুষলের দিকে।

দেখ, ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত: আড়ায় ডিম রয়েছে। কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মন আছে সেই ডিমের দিকে। এইটি হ'ল আসল জিনিস। নিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে অভ্যাস করতে হবে। এ সব কি একদিন, কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে বা ধ্যান করলে হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব সময় এ যোগটি তাঁর সঙ্গে রাখতে হবে। এটা কি ক'রে সম্ভব? তাঁকে ভালবাসতে পারলে হয়, না হ'লে অসম্ভব। এটি যেন আমরা কখন না ভুলি। তার কারণ হচ্ছে সংসারের সব জিনিস কাঁটালের আঠার মতো জড়িয়ে গেছে। তোমাদের এইগুলি সব মনে ভেবে নিয়ে সাধন করতে হবে। আর সেইটি দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে কি ভাবে হবে, ঠাকুর তাও দেখাচ্ছেন। যা কিছু করবে ভগবানকে স্মরণ ক'রে।

যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, ভগবানকে স্মরণ ক'রে করতে হবে। সব সময় এটা করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—সব সময়ে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমাকে স্মরণ কর আর কর্তব্য পালন কর। এইটি হ'ল আসল জিনিস। আর আমাদের এইখানেই ভুল! তাঁকে স্মরণ ক'রে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হবে। এটি অভ্যাস ছাড়া হয় না। তবে ভোগের মধ্যে এ ভাব আসে না। তাই চাই সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ একটা বড় জিনিস; ঠাকুরের ভাষায় 'ঘড়ি মেলানো'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতেন, তাঁদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে

আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। 'ঘড়ি মেলালে' বিবেক জাগে। বিবেক ব'লে দেয়, আমরা ভগবানের থেকে কত দূরে চলে এসেছি। এইজন্য মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়—regulate ক'রে নিতে হয়। এই এক বড় জিনিস জানবে তোমাদের জীবনে—'সাধুসঙ্গ'। এইটি ঠিক থাকা চাই।

সাধুসঙ্গ হুঁশ এনে দেয়। এইটি ঠাকুর বার বার বলতেন। সাধুসঙ্গে বিশ্বাস, অনুরাগ লাভ হয়; এমন কি ভগবৎদর্শনও হয়। হচ্ছে না কেন! কারণ মন বিষয়ে বাঁধা পড়েছে। মন তো আমাদের হাতে নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে। সাধুসঙ্গ খুব দরকার, এইটি সর্বদা মনে রাখবে।

আর একটা জিনিস খুব মনে রাখবে, যা রোজ শোনো, শোনার পর একটু চিন্তা করবে। তোমাদের শোনা হয়ে গেল, ব্যস্, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে এ-গল্প সে-গল্প জুড়ে দিলে। কিছুই মনে থাকে না যা শুনলে; শ্রবণ হয়, কিন্তু মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার! ভাল সংস্কার হ'লে মন্দ সংস্কারটা চলে যায়। তোমাদের শ্রবণ হয়, মনন হয় না। চিন্তা করা চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, গরু একপেট খেলো, তার পর এসে জাবর কাটতে লাগলো। এইগুলি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে চেষ্টা করবে। তা না হ'লে হবে না। এই ভাবেতে তোমরা চলবে। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অন্য সংস্কারগুলো চলে যাবে; তোমাদের রাজসিক মন এই সবের দ্বারা সাত্ত্বিক হবে, ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবে। দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস কর, এই ভাবে কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অবস্থায় উঠবে।

ভগবানের লীলা-চিন্তন, নাম-জপ, সাধুসঙ্গ সব কিছু দ্বারা মনকে শুদ্ধ, পবিত্র করবে। এইগুলি দৈনন্দিন করতে হবে, না হ'লে মনটা ওঠানামা করবে। সেইজন্য গীতায় বলেছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'। ঠাকুরও বলতেন, মনটাকে তাঁতে রেখে কাজ করতে হবে। কচ্ছপ জলে চরছে, আড়ায় ডিম আছে, মনটা তাতে ফেলে রেখেছে। ছুতারনি চিঁড়ে কুটছে, কত কি করছে, কিন্তু খানিকটা মন সর্বদা পড়ে আছে মুষলের দিকে। তোমরাও খানিকটা মন তাঁতে রেখে সংস্কারের কর্তব্য কর্ম করবে। এইটি রোজ অভ্যাস করবে।

ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শিক্ষা পাই। মনটাকে সংসার থেকে একেবারে তুলে নেওয়া নয়। গীতারও শিক্ষা: আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। দৈনন্দিন জীবনে খানিকটা মন তাঁর স্মরণে, তাঁর চিন্তায় রাখবে। এইটি তোমরা অভ্যাস কর দেখি, ধর্ম একটা আস্বাদন করার জিনিস। ভগবান রয়েছেন, তাকে আস্বাদন করতে হবে। কুকুরটাকে ভালবাসছ, বেড়ালটাকে ভালবাসছ, তারাও তোমার ভালবাসা আস্বাদন করছে। তেমনি তোমাদেরও আস্বাদন করতে হবে তাঁর ভালবাসা। ওইটি হচ্ছে না বলেই সংসারে অশান্তি। তাঁর সংসার তিনি দিয়েছেন; তাঁকে নিয়ে তো এটা আস্বাদন করতে হবে। এই শুনলে, কিন্তু আবার হয়তো সব গুলিয়ে যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব সেখানে সদ্গ্রন্থ পড়বে। যেটা শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিন্তা করবে, মনে করবে, অভ্যাস করবে।

সংসারের কর্তব্য যেমন করছ, তেমনি কর; যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থা থেকেই তাঁর দিকে এগোতে হবে।

ভারতের আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ

স্বামী নির্বেদানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সিংহাবলোকন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক জাগরণের উদ্ভব হয়। নিমজ্জমান হিন্দু-বিশ্বাসকে উদ্ধার করার কাজে এদের সবগুলিই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব-বিশেষকে গ্রহণ ক'রে সেটিকে পাশ্চাত্যের গোঁড়া ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সমালোচনা সহ্য করার মতো সবল ক'রে তুলতে এগুলির প্রত্যেকটিই চেষ্টা করেছিল। বহিরাগত সভ্যতার ধ্বংসাত্মক তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দুধর্মের অন্ততঃ কয়েকটি দিকে এভাবে মাথা তুলেছিল কয়েকটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

ঘটনাস্রোতের গতিপথও পরিবর্তিত হ'ল এতে। যে-সব মনীষীরা প্রলোভনে পড়ে হিন্দুয়ানি ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিলেন, তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফিরে চাইলেন পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে। সে শিক্ষার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করা, এমনকি তার কিছু কিছু গ্রহণ ক'রে জীবন গঠন করাও শুরু হ'য়ে গেল।

এভাবে এ-সব আন্দোলনগুলির ভেতর দিয়ে হিন্দুদের আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্বুদ্ধ হ'য়ে সব বাধা ঠেলে হিন্দুসংস্কৃতিকে নব প্রাণশক্তিতে বলীয়ান ক'রে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়লাভেচ্ছার যে যে অভিযান শুরু হয়েছিল, এবং ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরীদের প্রচারের ফলে যার গতিবেগ হয়েছিল দ্রুততর, তাকে হটিয়ে দেবার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয় এইভাবে। এই সাফল্য এইসব সময়োচিত আন্দোলনগুলির মূল্যকে অতুলনীয় ক'রে রেখেছে। কিন্তু সবটা প্রয়োজন এতেও মিটল না; হিন্দু-বিশ্বাসের পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। এইসব আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের অংশবিশেষকে অবলম্বন ক'রে। সেখান থেকে সযত্নে বেছে নেওয়া কয়েকটি মতবিশেষের প্রতীকমাত্র-রূপে।

হিন্দুধর্মে কেন্দ্রগত মহান্ একটি একত্বের মূলসূত্রে বহুবিধ মতবাদ অপূর্ব সমন্বয়ে গাঁথা রয়েছে। এই একত্বের—এই মূলসূত্রের সন্ধান যে পায়নি, তার কাছে কিন্তু সর্বভাবময় হিন্দুধর্ম পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলেই মনে হবে। অতি নিম্ন থেকে অতি উচ্চ পর্যন্ত সর্ববিধ ভাবই সে দেখতে পাবে সেখানে—পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রূপে। কাজেই এরূপ কোন লোক যদি হিন্দুধর্মকে সমর্থন করতে চায়, তাহলে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করার মতো একটিমাত্র মতবাদকে পছন্দ ক'রে সেখান থেকে বেছে নেওয়া ছাড়া সে আর করবেই বা কি?

সংস্কারকদেরও ঠিক তাই করতে হয়েছিল। সমন্বয়ের গূঢ় রহস্য ধরতে না পারার জন্য, এবং হিন্দুধর্মের বহুবিধ সারগর্ভ ভাবকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ব'লে ভুল বোঝার জন্য শাস্ত্রের একদেশী অর্থবোধই হয়েছিল তাঁদের। আর সেই একদেশী বোধের আলোক ফেলে হিন্দু-ধর্মের ভেতর যা কিছু অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন

ব'লে মনে করেছিলেন তাঁরা, তা সবই ছাঁটাই করতে লেগে গিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে হিন্দু ঋষিরা যে বিশাল সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শগুলি প্রবর্তন ক'রে গেছেন, সর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির দিকে চাইতে পারেননি বলেই সেগুলির মর্মগ্রহণেও অসমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

তবু নিজ নিজ দৃঢ় বিশ্বাসের তড়িৎ-স্পর্শে প্রাণোচ্ছল হ'য়ে তাঁরা ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল বিশ্বাসের ওপর।

ফলে, সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সমগ্র হিন্দু-সমাজের সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতর যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য নিষ্ঠা নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এঁদের দলে। প্রাচীনপন্থী অগণিত জনগণ কিন্তু এইসব সংস্কারকদের মত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না; তাঁদের তুলনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সে-জন্য হিন্দুবিশ্বাসের প্রায় সবটাকেই একটা জঞ্জালের স্তূপবিশেষ ব'লে মনে ক'রে যে সংস্কারক দলগুলি তার সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই অকৃতকার্য হ'য়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল—অল্প কয়েকজন সমর্থক মাত্র সংগ্রহ ক'রে।

সনাতনপন্থীদের মনোভাব

সনাতনপন্থী জনসাধারণ কিন্তু সমাজ ও ধর্মের ধরাবাঁধা পথ ধরেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলতে লাগলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের মামুলি নির্দেশ অনুযায়ী। হিন্দুদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে বিদেশী সভ্যতার যে সঙ্ঘাত চলছিল, সেটাকে তাঁরা গ্রাহ্যই করেননি। বৈদেশিক চিন্তাধারা যে দেশের ওপর চড়াও হ'য়ে এগিয়ে চলছিল, সেদিকেও বোধহয় তাঁরা চেয়েছিলেন একটু উপেক্ষাভরে—গর্বোন্নত ভাব নিয়ে। আধুনিক সমালোচকদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের মতবাদকে যুক্তির বর্মে সজ্জিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা-বোধই জাগেনি তাঁদের মনে। বহুপ্রাচীন নিজস্ব বিশ্বাসের দুর্গের ভেতরে থেকে নিজেদের বোধ হয় সুরক্ষিত ভেবেছিলেন তাঁরা। তাই অন্ধভাবে আঁকড়ে ছিলেন বৈচিত্র্যবহুল, পুরুষানুগত মত ও আদর্শকে। ভুলই হ'ক, আর ঠিকই হ'ক, সনাতনপন্থীরা হিন্দুয়ানিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে হয় বেঁচে থাকতে, নয় বিনষ্ট হ'তে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন; সংস্কারকদের কাছ থেকে কোনরূপ আংশিক হিন্দুয়ানি গ্রহণ করতে চাননি তাঁরা। প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই মনোভাবকে উৎকট ও একটু বিপজ্জনক বলেই ধরে নিয়েছিলেন সংস্কারকেরা। তাঁরা ভেবেছিলেন—যুগনিয়ন্তা শক্তির প্রতি, এবং নিজ মতবাদের আমূল সংস্কার-সাধনের অতি-প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের এই নির্বোধ উপেক্ষা পরিণামে একটা বিপত্তি ঘটাবেই। তাঁদের ভয় ছিল, পুরাতন ধর্মাদর্শ ও ধর্মমতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তৎকালীন সুস্পষ্ট চাহিদার অনুরূপ ক'রে সনাতনপন্থীরা যদি ধর্মকে না গড়ে তোলে, তাহলে হিন্দু-সমাজের প্রধান ইমারতটি অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে না কিছুতেই।

সংস্কারকদের এই শঙ্কাকে ভয়ার্তের যুক্তিহীন আশঙ্কা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সে সময় যে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই মনে

করতেন যে, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতাকে যদি সমগ্রভাবে বাঁচিয়ে দেয় তো আলাদা কথা, তা না হ'লে বহু ভাব ও বহু আদর্শের বিশাল সমন্বয়ভূমি প্রাণবন্ত হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে চিরতরে ; আধুনিক চিন্তাধারার তোপের মুখে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে হিন্দুসমাজ। প্রাচীনপন্থীরাই অবশ্য এতদিন হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তবু এই সঙ্কটকালে এরূপ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটার কোন লক্ষণ যে পর্যন্ত না দেখা যাচ্ছিল, সে পর্যন্ত তাঁদের নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের এই স্থির সঙ্কল্প ভারতের অতি প্রাচীন ধর্মটির চিরবিলুপ্তির বিপদকে যে বাড়িয়েই তুলছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। জনসাধারণের এই মনোভাব শুধু সংস্কারকদের চোখেই নয়, নিরপেক্ষ দর্শক এবং সমালোচকদের চোখেও একটু গোঁয়ারতমি বলেই মনে হয়েছিল। কারণ, হিন্দুধর্মরূপ সুবিশাল ইমারতটির সবটাকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীনপন্থীদের এই জেদের ফলে সমাজজীবনের অবস্থা হ'য়ে উঠেছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন।

হিন্দুর নবজাগরণ

কিন্তু আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে হিন্দুসমাজ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল। গোঁয়ারতমি ব'লে মনে হলেও প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই একগুঁয়ে মনোভাব হাস্যকর বিফলতায় পর্যবসিত হ'ল না। বেশী দিন অপেক্ষাও করতে হ'ল না; হিন্দু-বিশ্বাসের সব শাখাপ্রশাখা জুড়ে অমিত শক্তি সঞ্চার ক'রে হিন্দুধর্মকে পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করার মতো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘ'টল।

যাঁর প্রথম জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থের* প্রকাশ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনেই ঘ'টল সেটি। গভীর আধ্যাত্মিকতায় ভরা হিন্দুধর্মের উদার ও সমন্বয়-সাধক দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আবির্ভাব ঘ'টল, হিন্দুধর্মতত্ত্বের সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের অতি প্রাঞ্জল জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যারূপে।

হিন্দুভাব ও হিন্দু আকাঙ্ক্ষার প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন ও বাণী। সেজন্য পূর্বগ মুনি, ঋষি ও আচার্যদের জীবন ও বাণীর পূর্ণ সমন্বয় সেখানে ঘটেছিল। তাঁদের মতোই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির ওপর নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কথাও বলতেন একজন আধিকারিক-পুরুষের মতো। সে সময়কার জরুরী দাবি মেটাবার মতো শক্তি ছিল তাঁর প্রাণখোলা কথায়, যা অপরের প্রাণ স্পর্শ ক'রত সহজেই। প্রাচীন-পন্থীরা এবং সংস্কার-পক্ষপাতীরা— সকলেই ধীরে ধীরে বুঝলেন যে, হিন্দু জীবন-বেদের একজন পরিত্রাতা হ'য়ে তিনি এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ডাক শোনা মাত্রই হিন্দু-সমাজ সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল কেন, সে কথা বোঝা যায় গোঁড়া হিন্দুদের মনস্তত্ত্ব একটু তলিয়ে দেখলেই।

অনুভূতিই হিন্দুধর্মের প্রাণ। ধর্মের সর্বোচ্চ ভাবগুলি যে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গেই যে সত্যকার ধর্ম-জীবন শুরু হয়, এই মূল বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে হিন্দুজীবন নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছে। ভারতের মহানুভব মুনি, ঋষি ও আচার্যেরা জীবন ও অস্তিত্বের অবলম্বন—মূল চিরন্তন সত্যকে জগতের অনিত্য বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতেন, অনেক বেশী মূল্যবান্ ব'লে জ্ঞান করতেন। এ ছিল তাঁদের দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয়।

* গতমাসের লেখার শেষে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁদের সব চিন্তা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব কৃতিত্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই শুদ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। সেজন্য হিন্দুধর্মের এই সব দিব্য-ভাবময় প্রতিভূরা ব'লে গেছেন: ধর্ম যেন আলোচনা, কল্পিত মতবাদ, উপদেশ ও সম্প্রদায়-গত দলমাত্রে পর্যবসিত না হ'য়ে তার মূল সত্যগুলির অনুভূতি-লাভকেই চরম লক্ষ্য ক'রে রাখে। ধর্মজীবনে আর সব ঘটনার চেয়ে এই চরম চাহিদাটিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে গেছেন বেশী। হিন্দু-মন এই সব অনুভূতি-সম্পন্ন আচার্যদের গুরুপদে বরণ ক'রে নিয়ে ধর্মের এই সহজ সুস্পষ্ট প্রবল চাহিদাটিকেই তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাণস্বরূপ ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির এই মূল চাহিদার প্রতি আনুগত্য আছে বলেই হিন্দুরা—আধ্যাত্মিক সত্যলাভের কার্যকর পথ দেখাতে পারে, এমন যে কোন সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সমর্থ। এভাবেই আপাতবিরোধী বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। হিন্দুধর্ম দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে তার সবগুলিকেই বুকে ঠাঁই দিয়ে এসেছে। অমর, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য হিন্দুধর্মের আকুল প্রচেষ্টার ফলেই এখানে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েছে অদ্বৈতবাদীদের অতি উচ্চাঙ্গের মনোবিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ধারা, রাজযোগীদের মনঃ-সংযোগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, হঠযোগীদের কঠোর শরীর-নিয়ন্ত্রণ, এবং শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্যান্য ভক্তিমার্গীদের উপাসনা ও ঈশ্বরকে ভালবাসার সাধনা। এই আকুল প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষের নীতিবিগর্হিত গুহ্য সাধন-প্রণালীর এবং কাপালিকদের তামসিক ও ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপাদির। ঈশ্বর-লাভের জন্য হিন্দু-মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই হিন্দুধর্মের ভেতর ছোট বড় সর্বস্তরের এত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে।

তাছাড়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভের এই একই প্রেরণার ফলে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে এদেশে। সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী তাঁরা। আজও দেখা যায়, ভারতে হাজার হাজার লোক সংসার ছেড়ে এসে আধ্যাত্মিক সত্য-লাভের জন্য বিভিন্ন সাধনায় জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা দেশের কোন কাজে লাগেন না, ঠিক কথা; তবু হিন্দুসমাজ স-সম্ভ্রমে তাঁদের সমর্থন করে। এতেই বোঝা যায় যে, বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ কবীর মীরাবাঈ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সত্য-দ্রষ্টারা অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে মহান্ আদর্শের জন্য জীবনপাত ক'রে গেছেন, তার ওপর সমাজের যথার্থ ও গভীর অনুরাগ আজও বেঁচে আছে। সনাতনপন্থী জনসাধারণ সন্ন্যাসজীবনে এই অত্যুচ্চ আদর্শটিকে দেখতে পায় বলেই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকে সেই জীবনের উদ্দেশে।

ধর্মজীবনের ভিত্তি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি প্রাচীনপন্থীদের অনুরাগ এত গভীর বলেই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এমন একজন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়েছিল, চরম সত্যকে যিনি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেছেন। যাঁর কাছে সেই সত্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত মনোরম বিষয় বা সুবিন্যস্ত কল্পনাজাল-মাত্র নয়, যাঁর কাছে তা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চেয়ে যাঁর কাছে তার মূল্য অনেকগুণ বেশী। সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন এরূপ একজন সত্যদ্রষ্টা ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না প্রাচীন-পন্থী জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন ক'রে তাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিন্দু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের ধর্মে নতুন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একজন মহাশক্তিধর ঋষির, যাঁর জীবনের গভীর ও বিশাল অনুভূতিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সবই প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রয়োজনই মেটাতে এসেছিলেন। প্রাচীনপন্থী সমাজ তাঁর ভেতর দেখেছিল সমগ্র হিন্দুধর্মে বিরাট জাগরণ আনার উপযোগী বিপুল শক্তিধর এক সত্য-দ্রষ্টাকে। এই দেখাটা যে এখনও চলেছে, এবং জনসাধারণ যে এবিষয়ে সজাগ হ'য়ে উঠছে, তা বেশ বোঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর কথায়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীকে ধর্ম-সাধনার ইতিহাস বলা যায়। তাঁর জীবনী পড়লে, 'একমাত্র ভগবানই সত্য, আর সব অলীক'—এ কথায় বিশ্বাসী না হ'য়ে পারে না কেউ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরতত্ত্বের জীবন্ত মূর্তি। তাঁহার বাণী কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, সে বাণী জীবনবেদ হ'তে উদ্ধৃত অনুভূতির বিবৃতি। কাজেই পাঠকের মনের ওপর তার প্রভাব অনিবার্য। জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাস কাকে বলে, এই অবিশ্বাসের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তার ফলে হাজার হাজার নরনারী আশ্বস্ত হ'ল। এটা না দেখতে পেলে আধ্যাত্মিকতার আলোকের সন্ধানই পেত না তারা।

এরূপ জীবন যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মন অধিকার ক'রে সেখানে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির ভেতর তাঁদের বুদ্ধিজ সংশয়গুলির অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেলেন। নাস্তিকতার দূষিত ভাবধারা এবং ব্রাহ্ম আস্তিকতার বিশুদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ—এই দুয়েরই সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)। তাঁর মতো ব্যক্তিও এই অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন অতি-মানবের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁর দৃপ্ত ভাষায় বলা যায়ঃ মহামনীষী, মহিমান্বিত ও বর্তমান ভারতের সর্ববিধ উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় যথাযথভাবে মহাগর্বিত একটি মানুষ শ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণপ্রান্তে নিজেকে অবনত করেছিল।

এ ঘটনাটির তাৎপর্য খুব গভীর। যে-সব আধুনিক যুক্তিবাদের যথার্থ ও তীক্ষ্ণধী প্রতি-নিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তার সবগুলির ওপরই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির প্রভাব এই ঘটনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড যুক্তি-নিষ্ঠ মনে এই বাস্তব সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিলঃ ধর্ম-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে, সে সম্বন্ধে বিচার করতে হ'লে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাকে নিন্দিত প্রতিপন্ন করতে হ'লে ধর্মচেতনার প্রকৃত অবস্থা আগে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে হবে। এইটাই হ'ল এ কাজের সর্বপ্রথম যোগ্যতা। সত্যদ্রষ্টারা নিজ অনুভূতিতে যা প্রত্যক্ষ করেন, তার বিবরণ দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে সকলেই ঠিক সেই অনুভূতি লাভ করতে পারেন। ইচ্ছা করলেই যুক্তিবাদীরা আগে নিজ সমীক্ষা সহায়ে সত্যদ্রষ্টাদের কথার সত্যা-সত্য পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে পারেন। এভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিলে তবে সে সব অনুভূতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করার বা সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করার যোগ্য অধিকার

আসবে তাঁদের। স্বামী বিবেকানন্দের অস্থি-মজ্জায় যুক্তিপ্রবণতা প্রবল ছিল ব'লে এই পরিস্থিতিটি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। নিজ অনুভূতিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সত্যতা নিরূপণে অগ্রসর হলেন তিনি। এই গুরুতর পরীক্ষার কাজে মনেপ্রাণে ব্রতী হ'য়ে অক্লান্ত সাধনান্তে তিনি ফিরে এলেন আধ্যাত্মিকতা-দীপ্ত ও দিব্যানন্দমণ্ডিত হ'য়ে। নিজ অনুভূতির কষ্টিপাথরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সত্যতা যাচাই করার পর তিনি বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ ও ভাষার মাধ্যমে জগতে সেই সুপরীক্ষিত বাণী প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বুদ্ধিজ সন্দেহ, যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসা ও সযত্ন পরীক্ষা সহায়ে যে সত্যজ্ঞানাগ্নি আহরণ করেছিলেন, তা দিয়ে আধুনিক চিন্তারণ্যের রাশীকৃত অবাঞ্ছিত জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলে যুক্তিবাদীদের জন্য একটি বিশাল রাজপথ নির্মাণ ক'রে দিয়ে গেছেন। সে পথ হিন্দুমত ও হিন্দু আদর্শের অধ্যাত্ম-জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে তাঁর জীবন একটি আলোক-স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে—তিমিরাচ্ছন্ন আধুনিক মানুষকে পথ দেখাতে। হিন্দুধর্মের যে সব তথ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ব'লে মনে হয়, তার তাৎপর্য নির্ধারণকালে বিবেকানন্দের জীবন বর্তমান যুগের চিন্তাশীল মনীষীদের সর্ববিধ অকপট জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংশয়গুলিরও নিরসন ক'রে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোক-সম্পাতে হিন্দুধর্মকে এভাবে সহজবোধ্য, সম্পূর্ণ যুক্তি-সম্মত ও বিশ্বাসগম্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে এই ধর্মটিকে তিনি এমন এক যুক্তিসম্পদের অধিকারী ক'রে দিয়ে গেছেন, বিচারের তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণেও অটুট থেকে যা সর্ববিধ আধুনিক সমালোচনার সম্মুখে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সেজন্য হিন্দুভারতের এই জ্ঞানোজ্জ্বল আধুনিক দেবদূতের দিব্যভাবময় জীবনের ও উচ্চাঙ্গের যুক্তিপরায়ণ কথার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান যুগের সর্ববিধ যুক্তিবাদের তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি নিয়ে হিন্দুধর্মকে ঘিরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সে প্রভাব। এই জন্যই বর্তমান হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের একজন অবিসম্বাদী পরিত্রাতা ব'লে গ্রহণ করার পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বিতীয় জীবন ও বাণী হিন্দু ভারতের প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পক্ষপাতী উভয় সম্প্রদায়কেই নবজীবন ও নববলে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। হিন্দু-পুনর্জাগরণের এক নব-যুগের সূত্রপাত হয়েছে এভাবে। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খাঁটি কথাই বলেছেন : 'আমি এখানে যাঁর আবাহন করছি, তিনি ত্রিশকোটি মানুষের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিণতি-স্বরূপ। যদিও চল্লিশ বছর হ'য়ে গেল তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে, তবু তাঁর আত্মা বর্তমান ভারতকে উজ্জীবিত ক'রে চলেছে আজও।'

এই পুনরুত্থানের মধ্যে হিন্দুধর্মের শক্তিশালী ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। ভারতকে দেখে এখন আর গৌরবময় মৃত অতীতের সমাধিক্ষেত্র-মাত্র ব'লে মনে হয় না। এখন তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নবপ্রাণ ও নববিশ্বাসের উষ্ণধারা। নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শের প্লাবনে সারা জগৎ ভাসিয়ে দিতে সে এখন উদ্যত। রোমাঁ রোলাঁ যাঁকে 'বাংলার মেসায়া' বলেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তাঁর 'সেণ্ট পল' বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়-কালটিকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে। [প্রথম খণ্ড—ভূমিকাংশ সমাপ্ত]

সংসারের ক্ষণচরে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আমন্ত্রণ লোকে লোকে লভিতেছি চিরকাল ধরি,
কিরণ-পিয়াসী মন ছুটিতেছে আনন্দলহরী—
লয়ে বেদনার সুখে। ধ্যানধূপে বিলায়ে সুরভি
তুমি তো মরমশিখা জ্বালায়েছ,—আমার পূরবী
তোমার ভৈরবী সনে মিশিবারে কেন যে ব্যাকুল,
গোধূলি বেলার গানে কোথা ফোটে প্রভাতের ফুল!

জ্ঞান-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা,
আমার বেদনা কোথা শুধায়ো না; তুমি কহ কিনা
বাঁধিবারে ভালবাসা সবুজ দিনের আশা ল'য়ে
পুষ্প-ঝরা পথে? তুমি কি জানো না বিড়ম্বনা স'য়ে
বস্তু-বিশ্বে সুখী হ'য়ে রহিবার যত আয়োজন,
ব্যর্থ হ'য়ে গেছে সব। দিকে দিকে ধ্বনিছে ক্রন্দন।

এই মায়াবিনী ধরা মরণের ছায়া ফেলে যায়
আচম্বিতে জীবন-উৎসবে। কার ডাকে চমকায়
বিদায়-মুহূর্তগুলি! অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
বেপমান তন্দ্রালসে, ধীরে ধীরে হারায়ে চেতনা,
ফেলে রেখে সাধ অভিলাষ রহস্যের ইন্দ্রজালে—
উড়ে যায় প্রাণপাখী সুদূরের মৌন অন্তরালে।

স্রোতের জলের মতো যাহা যায়, তা কি আসে ফিরে?
আর কেন ঘুরে মরি তার লাগি বাসনার তীরে!
কুসুমের সম ফোটে চিত্তাকাশে স্বপন-গীতিকা,
ভ্রান্ত হৃদয়ের সাথে মিশে গেছে জীবন-বীথিকা।
সংসারের ক্ষণচরে অশ্রু কত হ'য়ে আছে জমা,
ক্লান্ত দুরাশায় তবু বিপ্রকীর্ণ নিত্য পরিক্রমা।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

[রায়রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ]

শ্রীমতী সুধা সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রেমরাজ্যের সীমানায় আসা গেল; অদূরেই সেই প্রেম-দেউল। শ্রবণ কীর্তন সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয় যখন শ্রদ্ধাভক্তি-লাভের যোগ্য হইবে, তখনই সাধক এই প্রেমাভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন; এবং তখনই সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণ হইবে। তখন সাধক দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি নিজ ভাবানুযায়ী ভজনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন এবং ব্রজে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যে কৃষ্ণ-ভজন তথা কৃষ্ণ-সেবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন।

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর,
রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥'

উক্তির সমর্থনে রায় যামুনমুনি-বিরচিত একটি শ্লোক ও ভাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন:

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥

—ভাঃ ৯।৫।১৬

দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধি-নির্মুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে? বাস্তবিক জীবের পক্ষে দাস্যভক্তি হইতে অধিক সুখকর, অধিক আনন্দদায়ক বস্তু আর কি থাকিতে পারে?

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' জীব এই নিত্য-দাসত্বের আনন্দ পায় না বলিয়াই বহির্মুখী হইয়া নানা দিকে আনন্দের সন্ধানে ধাবিত হয়। কাজেই দাস্যভক্তিই জীবের কাম্য।

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর।' প্রভু রায়কে আরও গভীরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। দাস্যভাব জীবের স্বরূপগত ধর্ম হইলেও দাস্যেরও প্রকারভেদ আছে। দ্বারকা-মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি ধামের যাঁহারা পরিকর, তাঁহাদের দাস্য ঐশ্বর্যজ্ঞানজনিত, সঙ্কোচ ও কিছুটা ভীতি-দ্বারা খণ্ডিত, নির্বাধ মমত্বময় দাস্য নয়। ব্রজের দাসত্বে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই যে, সে কিন্তু তাহাও গৌরব-বুদ্ধি ও প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধজ্ঞানে খণ্ডিত। ভৃত্যের সাধ্য নাই যে, সে প্রভুর মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলিয়া দিতে পারে —সখার মতো। তাই প্রভু আরও অগ্রসর হইতে চাহিলেন। রায় বলিলেন, 'সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।' সমর্থক শ্লোক:

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

—ভাঃ ১০।১২।১১

—জ্ঞানমার্গিগণ যাঁহার নির্বিশেষ সত্তামাত্র অনুভব করেন, যাঁহার লীলায় তাঁহারা প্রবেশ

করিতে পারেন না, কর্মযোগীরাও যাঁহার আনন্দচঞ্চল লীলার কোন অনুভূতিই লাভ করিতে সক্ষম হন না, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা তুল্যরূপে ক্রীড়া করেন, আহা! তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য!

রায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধ সখ্যরসের কথা তুলিলেন। ব্রজ-সখাগণের এতটুকু ঐশ্বর্য-বুদ্ধি নাই, তাই নিঃসঙ্কোচে উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহারা কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া ধরেন, তাঁহাকে কাঁধে চড়ান, তাঁহার কাঁধে চড়েন। তাই এই সখাদের সঙ্গ কৃষ্ণের বড় মধুময় মনে হয়।

'আপনারে বড় বলে আমারে সম হীন,
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥'

প্রভু হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এহোত্তম, রায়! এতক্ষণে তুমি আমার কাছে শুদ্ধ মাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলে। এখানে আসিয়া নীরব হইও না, আরও ভিতরে চলো।

রায় বলিলেন, 'বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।'

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্‌ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্‌।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥
ভাঃ ১০।৮।৪৬

—নন্দ মহারাজ এমন কি মহাপুণ্যজনক মঙ্গল-কার্য করিলেন, আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গল-কার্য করিয়াছিলেন যে শ্রীহরি (তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া) যশোদার স্তনপান করিলেন?

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
ভাঃ ১০।৯।২০

মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা লাভ করিলেন, ব্রহ্মা শিব এমন কি তাঁহার নিজের অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ লাভ করেন নাই।

কি সেই প্রসাদ—যাহার প্রভাবে সর্ব-কারণ বিভুতত্ত্বকে পর্যন্ত পালন শাসন তাড়ন করা যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম—ইহাই সেই প্রসাদ, যাহা তাঁহার জন্মদাত্রী দেবকীও লাভ করেন নাই।

প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, বলিলেন, 'রায়, কর্ণ-তৃষ্ণা মিটিতেছে না। ইহার চেয়ে আরও অন্তরের কথা শোনাও।'

রায় বলিলেন, 'কান্তা-প্রেম সর্বসাধ্যসার।'

এই স্থানে ভাগবতের দুইটি ও 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে:

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাম্‌ ॥
ভাঃ ১০।৪৭।৬০

—রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে প্রসাদ কৃষ্ণের (বিষ্ণুর) বাম বক্ষঃস্থলে নিয়ত বর্তমান লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, আর অন্যান্য কামিনীগণের তো কথাই নাই।

এই কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি, বাৎসল্যের মমতাধিক্য তো আছেই, তদুপরি আছে কায়মনপ্রাণ, জাতি-কুলমান সর্বস্ব দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। অন্যান্য সমস্ত প্রেম সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এই একটি মাত্রই প্রেম—যাহা সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না—কোন সীমার বন্ধন মানে না। কান্তা-প্রেমে তথা মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা। কৃষ্ণ রসস্বরূপ; যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ—কৃষ্ণেরও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিম্বের ন্যায়।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, কিন্তু ব্রজে তাঁহাদের পরকীয়া অভিমান। বৈধী কান্তা-প্রেম হইতে পরকীয়া প্রেমে প্রতিবন্ধক অনেক বেশী, তাই মিলনের উৎকণ্ঠাও সেখানে প্রবল, মিলনের আনন্দও অপরিসীম—'গোপন মিলন অমৃত গন্ধ-ঢালা।' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে স্বজন, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, কুলশীলমান, লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেদিন গোপীগণ কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসিলেন, সেদিন গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই অস্ফুট ইঙ্গিতের উজ্জ্বল রূপায়ণ জগতের সম্মুখে প্রকটিত হইল।

গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন: 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

'কিন্তু এই প্রেমের (গোপীপ্রেমের) অনুরূপ
না পারে ভজিতে
অতএব ঋণী হয়, কহে ভাগবতে।'

বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত, ভাগবতের রূপায়ণ শ্রীকৃষ্ণে। রাসমণ্ডলের মধ্যে যত গোপী তত কৃষ্ণ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তিমান্, ব্রহ্ম আর তাঁহার সৎ চিৎ-আনন্দের লীলাবিলাস!

প্রভু অধীর আনন্দে বলিলেন, 'রায়! সাধ্যের অবধি এই পর্যন্তই, কিন্তু তোমার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কি কিছুই নাই? যদি আরও কিছু থাকে তবে বলো।'

রায় বিস্মিত হইলেন, ইহারও পর? কি আর আছে ইহার পরে? এই পৃথিবীতে এমন কথা আর তো কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে নাই!

তবুও বলিলেন, 'গোপীদের মধ্যেও শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা এবং তাঁহার প্রেমই 'সাধ্য শিরোমণি।' প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবত হইতে শ্লোক তুলিয়া রায় দেখাইলেন, শারদীয় রাসমণ্ডলে শত শত গোপীর মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপনে অন্তর্ধান করিলেন, তখন একমাত্র রাধিকাই তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, কাজেই রাধিকা প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা।

প্রভু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসে রাধিকাকে সঙ্গিনী করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি রাধার জন্য অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন নাই; কাজেই যেখানে গোপনতা, সেখানে শ্রেষ্ঠতা কোথায়? রাধিকার মহিমা স্বীকার করিব তখনই, যখন দেখিব রাধার জন্য কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন।

জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ হইতে বসন্তরাস বর্ণনা করিয়া রায় রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। দেখা গেল, একমাত্র রাধিকার অন্তর্ধানেই শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীকে সাক্ষাতে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ন ক্ষুব্ধ মনে রাধিকার অন্বেষণে রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

প্রভু বলিলেন, 'রায় তোমার কাছে আসা আমার সার্থক হইল। আর একটু কৃপা কর। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আমাকে বল। আমি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণ-কথা জানি না, তুমি আমাকে কৃপা কর।'

রায়ের মন বার বার বলিতেছে, না না, ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু প্রভুর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রায় যেন রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছেন না। তবুও বলিলেন:

'আমি নট তুমি সূত্রধার
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥

যাহা হউক, রায় বলিলেন: ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান্, সর্বৈশ্বর্যময়,

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বেদে যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ', শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের ঘনীভূত মূর্তি অখিলরসামৃত-বারিধি। বৃন্দাবনে তিনি অপ্রাকৃত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ-রূপে প্রকাশিত। তাঁহার সেই ঘনীভূত রস-স্বরূপের অপরূপ মাধুর্য পতিব্রতা লক্ষ্মী, বিশ্ব-ভুবনের দেব-গন্ধর্ব স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীর, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্ত পর্যন্ত হরণ করে।

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি প্রধানা শক্তি; সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত, আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ-দায়িনী শক্তি, যিনি কৃষ্ণকে নিজ মাধুর্য-রস আস্বাদন করান। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের পরম সার মহাভাব; শ্রীরাধিকা মহা-ভাব-স্বরূপিণী, লাবণ্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও তারুণ্যামৃত-ধারায় শুচিস্নাতা স্নিগ্ধ কুঙ্কুম-চন্দনে সুরভিতা পবিত্রগাত্রা কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকা; দেহ-মন ইন্দ্রিয়-চিত্ত কেবল কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ—তদ্ভাব-ভাবিতা, তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা।

উল্লসিত আনন্দে প্রভু বলিলেন, 'রায় কৃপা কর—দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া আমাকে অমৃতময় করিয়া তোল।'

রায় স্তম্ভিত হইলেন—নীরব হইলেন, বলিবার তো আর কিছু নাই? সহসা কি যেন মনে পড়িল, বলিলেন, 'আর আমার কিছু বলিবার সাধ্য নাই, তবে একটি প্রেমবিলাস-বিবর্তসূচক সঙ্গীত আছে, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে শোনাইতে পারি, জানি না ইহাতে তোমার সুখ হয় কিনা।'

তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করিয়া গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে রায় এই সঙ্গীতটি গাহিলেন :

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
ন সো রমণ, হাম ন রমণী,
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখী সে সব প্রেম-কাহিনী
কানু ঠাম কহবি বিছুরল জানি।
ন খোঁজলু দূতী, ন খোঁজলু আন,
দুঁহুক মিলন মাঝত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগে তুঁহু ভেলি দূতী
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

প্রভু এই সঙ্গীতের মর্মকথা—'ন সো রমণ, হাম ন রমণী' শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, স্বহস্তে প্রেমের সহিত রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন বলিতে চাহিলেন পরম প্রেমের এই পরমতম গুহ্য তত্ত্বটি প্রকাশ করিও না, অন্তরের ধনকে বাহিরে আনিও না।

এই প্রেমবিলাস বিবর্ত-প্রেমের প্রগাঢ় পরিণতি, ইহাতে কান্ত ও কান্তার পরৈক্য হয়। কে কান্ত আর কে কান্তা, কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি, কে আমি আর কে তুমি-এই ভেদজ্ঞান থাকে না। এইভাব একমাত্র মাদনাখ্য প্রেমেই সম্ভব।

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, অন্য কোন গোপীতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও এই ভাব নাই। মাদনাখ্য প্রেমের অথবা প্রেমবিলাস-বিবর্তের আরও একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পরম গভীরতম মিলনের মধ্যেও ইহা বিরহের জ্ঞান জন্মায়—'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'; আবার বিরহের অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যেও ইহা মিলনের গভীর আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে।

জ্ঞানী বলিয়াছেন : 'নেতি, নেতি', ইহা নয় ইহা নয়, জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টি মিথ্যা—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সাধক

যখন সেই ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে উপাসক নাই, উপাস্য নাই, ধ্যান-ধ্যাতা-ধ্যেয় নাই; আমি নাই, তুমি নাই; আছে এক নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-সত্তা, ইহাই ব্রহ্মবিহার!

আর প্রেম—তথা শ্রীমতী বলিতেছেন, 'ইতি ইতি ওগো শ্যাম! তুমি আছ তাই এই বিশ্ব আছে, তুমি সুন্দর—তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর, সুন্দর তোমার রূপ, সুন্দর তোমার বাঁশীর সুর! তুমি রস, আমি প্রেম; তোমার আশ্রয় আমি, আমার আশ্রয় তুমি।'

রস আর প্রেমের মিলন হইল—অণুতে পরমাণু গলিয়া মিশিয়া গেল, তখন 'না সো রমণ, হাম ন রমণী'—কেই বা প্রকৃতি, কেই বা পুরুষ?

ইহাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিহার! 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' লীলা-রসে জারিত উজ্জ্বলিত হইয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন প্রভু। গভীর আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন, কিন্তু রায়ের চরম পাওয়া এখনও বাকী।

রায় রামানন্দের প্রার্থনায় কয়েকদিন বিদ্যানগরে কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়া এবারে প্রভু বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব-সন্ধ্যা; যথানিয়মিত আসিলেন রায়। দশদিন যাবৎ যে সন্দেহ মনের কোনায় উঁকি দিতেছিল, আজ তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। রায় বিস্মিত হইয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'প্রভু, যাওয়ার আগে আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া যাও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী-রূপে, এখন দেখি তোমার শ্যাম গোপরূপ, তোমার হাতে বাঁশী, চঞ্চল তোমার নয়ন! আর তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চন-প্রতিমা দেখিতেছি, তাঁহার গৌর কান্তিতে তোমার সর্ব অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে।'

প্রভু বলিলেন, 'রায়! তুমি মহাপ্রেমিক, তাই সর্বত্রই তোমার ইষ্টদর্শন হয়।'

রায় বলিলেন, 'প্রভু, আমার চিত্ত শোধন করিতেই যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ, তবে—'এবে কপট কর, ইহা কোন্ ব্যবহার?'

'তুমি ছাড় ভারি ভুরি,
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।'

তখন প্রভু হাসিলেন, রসিকোত্তম পরমভক্ত রামানন্দের কাছে আর স্বরূপ লুকাইতে পারিলেন না;

'তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।'

রায় এই অপূর্ব রূপ দর্শনে আনন্দে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

রায় রাধাকৃষ্ণ-যুগলভাবের উপাসক, ব্রজ-লীলার বিশাখা সখী, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা দর্শন করিয়াছেন, আজও ধ্যানে সমস্ত লীলাই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আজ তিনি কি দর্শন করিলেন, যাহার আনন্দের গভীরতায় একেবারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন?

রায় সুদক্ষ পথিকৃৎ; তিনি মাদনাখ্য মহা-ভাবের দেউলে প্রভুকে লইয়া আসিলেন, কিন্তু জানিতেন না সে মন্দিরে আজ কোন্ রূপ দর্শন করিবেন! সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—রাধা নাই, কৃষ্ণ নাই, কান্ত নাই, কান্তা নাই, আছে শুধু একীভূত, দ্রবীভূত প্রেম আর রস, একের অণুতে পরমাণুতে অপরটি মিশ্রিত, জারিত। বস্তু ও ধর্ম—সৎ ও সত্তা—শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন, অভেদ—অখণ্ডিত।

আবার চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধারস-জারিত-তনুমন।

রাজনারায়ণ বসু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে রাজনারায়ণ মোটামুটি বারোটি সূত্র আলোচনা করেছেন।

(১) "হিন্দুধর্মের নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের নামমূলক নাম নহে।···ইহা দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে, ধর্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে।"

(২) "হিন্দুধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দুধর্মে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমন বলে না যে, অনাদ্যনন্ত নির্বিকার পরব্রহ্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

(৩) "হিন্দুধর্ম কোন মধ্যবর্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে 'Through Jesus Christ, our Lord and Saviour—প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর' বলে, হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না।··· আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; মুক্তিলাভ জন্য কোন মধ্যবর্তীর উপাসনা আবশ্যক করে না।"

(৪) "আর একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই—ঈশ্বরকে হৃদয়-স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কি বাইবেল, কি কোরান, আর কোন ধর্মশাস্ত্রে কোথাও এরূপ উপদেশ পাওয়া যায় না,—এইটি হিন্দুধর্মের প্রধান গৌরবস্থল।"

(৫) "হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে, যোগের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

(৬) "হিন্দুধর্মের আর একটি চমৎকার গুণ এই যে, তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি আছে; হিন্দুধর্মে সকাম, নিষ্কাম—দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে; কিন্তু অন্যান্য ধর্মে আদোবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই।"

(৭) "হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই যে, উহাতে সর্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে, বাইবেল ও কোরানে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়,—হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, সর্বভূতের হিতসাধন করিবে।"

(৮) "পরকাল-সম্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে, যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু-যোনিতে অথবা কীট-যোনিতে অথবা মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এই মত পরকাল-বিষয়ক, হিন্দুধর্মমতের নিকৃষ্ট অংশ; কিন্তু দেখ, ইহাতেও হিন্দুধর্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে, ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা

থাকে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে—যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে,…এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত।”

(৯) “হিন্দুধর্মের ঔদার্যধর্ম সর্বধর্মাপেক্ষা অধিক। খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরা বলে যে, আমার এই ধর্মটি না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে। হিন্দুধর্মের তেমন ভাব নয়। হিন্দুধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্বপ্রকার পালন করিলেই উদ্ধার হইবে।…যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে, নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল

(১০) “হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এই ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।”

(১১) “অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, হিন্দুদিগের সকল কার্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক দুই প্রকার শাস্ত্রবিভাগ আছে, হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ নাই; হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা না করাতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল।”

(১২) “অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম অতিশয় প্রাচীন, মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধধর্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান; ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম ত সেদিনের;…নর্মদা-তীরস্থ ‘কবীর-বটে’র সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা হইতে পারে, ঐ বট-বৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক শাখা অপর এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে, অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধর্ম সেরূপ নহে, উহার স্বীয় নবযৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে, উহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। লোক-সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা বুদ্ধিবৃত্তি-চরিতার্থকারী নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্যধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।”

* * *

এই ভাবে সাধারণ আলোচনা শেষ ক'রে রাজনারায়ণ—“হিন্দুধর্মের সারধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা, যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া আখ্যাত, তাহার শ্রেষ্ঠতা” প্রতিপাদন করেছেন। ‘জ্ঞান-কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মের উপাসনা ঈশ্বর-ধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। …জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয়ে যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বাইবেল ও কোরানে এইরূপ উপদেশ আছে যে, ঈশ্বর জগতের কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান আছেন, কিন্তু হিন্দুদিগের জ্ঞানশাস্ত্রে বলে যে, তিনি ‘বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং’ (তিনি সর্বত্র সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান)।”

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের পেছনে আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বদেশানুরাগ এবং বিশেষ ভাবে রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরববোধ কাজ করেছে। তাই ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ বক্তৃতার শেষাংশে সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের ভাবাবেগ প্রকাশিত :

“ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ

করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ব সাধন হইতে পারে না; ...আমরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্‌ কোট্‌ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দু জাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই; আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা, এমনকি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি—সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে?* মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, 'যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্ধেক পুরুষত্ব হারায়।' যদি আমরা এইরূপে সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে মনের কি বীর্য থাকে? মনের যদি বীর্য গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে? ...আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন:

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible lock; methinks I see as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam.

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দুজাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

রাজনারায়ণের পরবর্তী কালের বক্তৃতা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'য় এই মনোভাবেরই উদ্দীপনায় সাকার- ও নিরাকারবাদী হিন্দুদের সম্মেলনে একটি 'মহাহিন্দু সমিতি'র পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদ অনেক পরিমাণে হিন্দু চিন্তাধারার দ্বারাই প্রভাবিত হলেও সে জাতীয়বাদ সাম্প্রদায়িক নয়। কারণ, অন্য কোন সম্প্রদায়কে অনুন্নত রেখে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা তিনি করেননি।

রামমোহন যেমন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে সব ধর্মমতের মৌলিকত্বে উপনীত হ'তে চেয়েছিলেন, রাজনারায়ণও তেমনি—Hindu Theists' Brotherly Gift to English

* কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহ আইন সম্বন্ধে মনোভাবের উত্তর

Theists নামে একটি বই ছাপিয়েছিলেন, রাজনারায়ণ নিজেকে বরাবর Hindu Theist বলেই মনে করতেন। হিন্দুর নিজস্ব ঐতিহ্যের গৌরব-বোধে ধর্ম-সাধনার যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতাকে তিনি কতখানি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটিই প্রমাণ

প্রতিমাপূজা ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বাংশে গ্রহণীয়। বিশেষভাবে, সন্ন্যাস-ভীতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যথার্থ সন্ন্যাস যে গৃহে থেকেও হ'তে পারে একথা ঠিক, কিন্তু 'চিহ্নধারী সন্ন্যাস' যদি বনে না গিয়ে তপস্যাক্ষেত্র রচনা করেন, তাতেও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। সকলকেই গৃহ-জীবনের ছাঁচে ঢালতে হবে, এমন কোন কথা নেই। রাজনারায়ণের বক্তৃতায় যুক্তির সারবত্তাই বেশী। বস্তুতঃ এই বক্তৃতাটিই পরবর্তী হিন্দুয়ানির পুনরাবির্ভাবের সূচনা। "যে-কালে এদেশের ইংরাজী-নবীশেরা হিন্দুধর্মকে ভ্রম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, নূতন কৃতবিদ্য সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে একজন ইংরাজী-নবীশের পক্ষে একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্য-ভাবে বর্জন করিয়াও অন্যদিকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাতে কতটা সৎসাহস এবং স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"[১]

ডিরোজিও-শিষ্যেরা যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রবাহ এনেছিলেন, রাজনারায়ণ তার সঙ্গে যোগ করলেন স্বজাতিগৌরব। তাই তাঁর 'Grand-father of Nationalism' নামকরণটি সু-সার্থক।[২] সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে রাজ-নারায়ণ জাতিভেদের অবসানের পক্ষপাতী না হলেও বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর আপন এক ভাই ও জ্যেঠতুতো এক ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ তাঁরই উদ্যোগে হয়। শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণের জীবনে হিন্দু-সংস্কার ও ব্রাহ্মসংস্কার মুক্তির দ্বন্দ্ব পুরোপুরি মেটেনি।

জাতীয় গৌরবের পুনরুদ্ধার-কল্পনায় লেখা রাজনারায়ণের 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (The old man's hope) প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তখনকার Indian Mirror (১৮৮৯—৪ঠা আগস্ট) পত্রিকার মন্তব্য স্মরণীয় : Patriotism of the highest type pervades every syllable of old man's thought and utterances.[৩] জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে 'হিন্দুমেলা'র পরিকল্পনা ও 'মহাহিন্দু সমিতি'র প্রস্তাব—দুইটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। হিন্দুমেলার পরি-কল্পনায় নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। রাজনারায়ণের আর একটি কীর্তি 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'—এ সভার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার দ্বারা মনোভাব প্রকাশের যে চেষ্টা দেখি, পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যে তারই সার্থকতার পরিচয়। এই সভার কার্যবিবরণের ভিত্তিতে রচিত 'Prospectus of a Society for the Promotion of National feeling among the Educated Natives of Bengal' —১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের National Paperএ মুদ্রিত হয়। এই লেখাটিই 'হিন্দু-মেলা'র পরিকল্পনা জুগিয়েছে।

আত্মজীবনীতে রাজনারায়ণ অনুরোধ

১ নবযুগের বাংলা—পৃঃ ১৩৪ (বিপিনচন্দ্র পাল)

২ আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু

৩ তদেব

করেছেন, যেন তাঁর সমাধি-মন্দিরে এ-কয়টি কথা লেখা থাকে: "প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়"; "স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃতপান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণকরত সেই ব্যক্তি আনন্দিত থাকেন।"[৪] রাজনারায়ণের চারিত্র পরিচয় এবং জীবনের সার সত্য ওই কয়টি ছত্রে সুন্দর ফুটেছে।

ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় ভক্তি বা অনুরাগের ভাবটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সূচিত হয়েছিল। রাজনারায়ণের চিন্তাধারায় সে ভাবের বিকাশ।

বস্তুতঃ রাজনারায়ণ ছিলেন প্রীতিযোগেরই সাধক। সে প্রীতি যেমন অনন্ত ঈশ্বরের অভিমুখী, তেমনি সর্বশ্রেণীর ও মতের মানুষদের প্রতি প্রসারিত। বৃদ্ধবয়সে তিনি বৈদ্যনাথধাম দেওঘরে বাস করতেন। দেওঘরের অধিবাসীরা এই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। একবার শিবনাথ শাস্ত্রী দেওঘরে রাজনারায়ণ-বাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। "...মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা উপস্থিত—'মশাই কি বৈদ্যনাথ যাবেন?' উত্তর—'হাঁ যাব'। পাণ্ডা হাসিয়া বলিল—'ও তো আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ।"[৫] শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই অপূর্ব ভঙ্গীতে রাজনারায়ণ-চরিত্রের ভক্তি, সরলতা ও উদার মহিমা এক কথায় প্রকাশিত।

রাজনারায়ণের মনীষাপ্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের পত্রাবলী রাজনারায়ণের সমুন্নত সাহিত্যরুচির প্রমাণ। 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রতি পদক্ষেপে রাজনারায়ণের সুচিন্তিত সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।[৬] সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যমুখী বাঙালী মন ও বাংলা সাহিত্যকে নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনারায়ণের আন্তরিক প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য: "...সামান্যত দেখ, ইউরোপখণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের 'অন্ধকাল' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ-ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ...আমাদিগের দেশ-ভাষা যে এমত সুললিত হইবে, ইহা সম্যক্ সম্ভব; কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্বার্থপ্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই। 'More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more

৪ তদেব

৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

৬ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম): রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সমালোচনা

exquisitely refined than either.' —Sir W. Jones' Works.'[৭]

ইংরেজী শিক্ষাসম্বন্ধে রাজনারায়ণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আজও আমাদের স্মরণীয়: "ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনো ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা-প্রিয় হইব।" 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য'-বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ মনে করিয়ে দিয়েছেন, "জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"[৮] রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪) 'বিবিধপ্রবন্ধ' (১ম খণ্ড—১৮৮২), এবং 'আত্মচরিত' (প্রকাশ —১৮৬৯) বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর রচনাবলীতে ধর্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। রাজনারায়ণের ভাষাশৈলীতে এমন একটি ওজস্বী অথচ প্রাঞ্জল সৌন্দর্য রয়েছে, যার জন্য তাঁর গদ্যের অমসৃণতা ততটা ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে স্বভাবসুলভ হাস্যরসের প্রবণতা এসে তাঁর রচনাকে অম্লমধুর ক'রে তুলেছে। যেমন:

"দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এঁচোড়ে-পাকা ছেলে; তত্ত্বসকল যতদূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য কেন?"

"ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি নাচিবে; কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাঁহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।"[৯]

উনিশ শতকের যে কয়জন মনীষী পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবল বন্যার সামনে দাঁড়িয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে আত্মস্থ করার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন, রাজনারায়ণ বসু তাঁদেরই অন্যতম। বিশ শতকের বাঙালীর কাছেও রাজনারায়ণের চিন্তাধারার যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, —একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

---

৭ দ্রষ্টব্য—রাজনারায়ণ বসু: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা

৮ হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬): অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

৯ তাম্বুলোপহার (১৮৮৬)

কালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাস্মৃতি

শ্রীদুর্গাপদ তরফদার

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নাম সাধক-সমাজে সুপরিচিত। 'মন্দিরময়' কালনা বাংলার নবজাগরণের অনেক মধুর স্মৃতি আজও বক্ষে ধারণ করিয়া শত বিভ্রান্তির মধ্যেও আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। নানাস্মৃতি-বিজড়িত কালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার স্মৃতি অনুধ্যান করিবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ।

কালনা প্রধানতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল-রূপে বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত হইলেও কালনায় শক্তিসাধনার প্রভাবও যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। কালনার গঙ্গাতীরবর্তী স্থান—বিশেষতঃ যে স্থানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন এবং যে স্থানে তিনি নিমের দন্তকাষ্ঠ মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে সকলেরই দর্শনীয় তীর্থস্থল। কথিত আছে, ঐ দন্তকাষ্ঠটি হইতে একটি নিমবৃক্ষ উদ্‌গত হইয়া অদ্যাপি বর্তমান আছে। মহাপ্রভু যে স্থানে গঙ্গার তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাকে 'মহাপ্রভু পাড়া' বলা হয়। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ভগবানদাস বাবাজী এখানে আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধন-ভজনসহ বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বৈষ্ণব-সমাজের নিকট কালনা একটি প্রধান তীর্থ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শ্রীভগবান এমন একটি লীলার অভিনয় এই স্থানে করিলেন, যাহা কালনাকে শুধু বৈষ্ণব-সমাজেরই নহে, সমগ্র ঈশ্বরপ্রেমী নরনারীর নিকট তীর্থস্থলে পরিণত করিয়াছে। আমরা সেই ঘটনার স্মৃতিই পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

তাহার পূর্বে মন্দিরময় কালনার কিঞ্চিৎ বিবরণ জানা থাকিলে এই গৌরবময় নগরীর কথা আরও মধুর লাগিবে। ক্ষুদ্র শহর কালনা হাওড়া-নবদ্বীপ রেলপথে অবস্থিত। এখানে একটি পৌরসভাও আছে। কিন্তু কালনার উপর বর্ধমান রাজবংশের প্রভাব, বিশেষতঃ উক্ত রাজবংশের সাংস্কৃতিক প্রভাব সুবিস্তৃত। বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শত শিবের মন্দির নগরীর ধর্মভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ধমানাধিপতি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দিরও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এতদ্ব্যতীত ২০০ বৎসরের প্রাচীন একটি বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বর্তমানে উহা বর্ধমান-মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জনৈক সাধু উহার সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

বৈষ্ণবপ্রধান কালনায় শক্তির প্রভাবও কিছু কম নয়। বস্তুতঃ কালনার অপর নাম নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী অম্বিকাদেবীর নামানুসারে 'অম্বিকা-কালনা' রূপে খ্যাত। মায়ের এই মূর্তি একটি কাষ্ঠখণ্ড হইতে প্রস্তুত। এই জাগ্রতা দেবীর পূজা যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ করিতে সাহসী হন না। দারুময়ী শ্রীশ্রীকালীমাতার এই বিশাল মূর্তি হঠাৎ দর্শনে ভীতির সঞ্চার হইলেও সাধক ও ভক্তের নিকট দেবীর বরাভয়-ভাব

প্রকট হইতে বিলম্ব হয় না। কালনার অপর বৈশিষ্ট্য শ্রীমহিষমর্দিনীর পূজা। বস্তুতঃ প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দেবী মহিষমর্দিনীর চারিদিবসব্যাপী পূজা ও উৎসবকে কালনার অন্যতম জাতীয় উৎসব বলিলে ভুল করা হইবে না। এই পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ষষ্ঠী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত দেবীর পূজার সহিত মেলা ও প্রদর্শনীর যে বিরাট আয়োজন হয়, তাহা সমস্ত কালনাবাসীকে মাতাইয়া তোলে। বস্তুতঃ কালনায় গেলে ভক্ত নরনারীর নিকট এই তীর্থের পবিত্রভাব মনকে দোলা দিবেই। বাংলার দুইটি বিশিষ্ট সাধনার ধারা—বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা—পাশাপাশি থাকিয়া 'যত মত তত পথে'রই জয় ঘোষণা করিতেছে।

এ হেন পীঠস্থানে ৯০ বৎসর পূর্বে—১২৭৭ সালে ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি সিদ্ধবাবা শ্রীভগবানদাস বাবাজীর দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মিলনের স্থল হইল বাবাজীর আশ্রম—যাহা 'শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম' আশ্রম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণের কাহিনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে (গুরুভাব উত্তরার্ধ) তৃতীয় অধ্যায়ে অতি মধুররূপে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতেও ইহার উল্লেখ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না।

এই মিলনের মূলসূত্র হইল, কলিকাতার কলুটোলা হরিসভায় শ্রীভাগবতপাঠ শ্রবণ-মানসে ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের গমন; ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে হরিনাম-কীর্তনে আত্মহারা হইয়া সভাস্থলে রক্ষিত শ্রীচৈতন্যের আসনে 'সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া [তিনি] এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং চৈতন্যদেবের মূর্তি সকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার উর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ দেখিয়া ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।'

উক্ত বিবরণ শ্রবণান্তে ভগবানদাস বাবাজী তদীয় ইষ্টদেবতার আসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাবিষ্ট হইবার ঘটনাটির মর্মার্থ হয়তো তখন ঈশ্বরেচ্ছাতেই গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শুধু তাহাই নহে, শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্যাদিও প্রয়োগ করিয়া—যাহাতে ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয়—সভার উদ্যোক্তাদের প্রতি সেইরূপ নির্দেশ দেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাংলা ১২৭৭ সনের কোন এক দিবসে কালনায় আসিয়া উপস্থিত হইলে যে মধুর নাটকীয় পরিস্থিতির পরিণতি হয়, তাহা ভক্ত ও ভাবুক চিত্তকেই যে শুধু উদ্বুদ্ধ করিবে তাহা নহে, জগতের সম্মুখে লীলাচ্ছলে উহা এই শিক্ষাই জীবন্ত করিয়া রাখিয়া যায় যে, অহংভাবের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হইলে সাধন-ভজনের মূল লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য, উহার প্রধান অন্তরায় 'অহং'। শ্রীশ্রীঠাকুর 'মহাতমোবিনাশন' লীলাচ্ছলে এই সত্যকে আবার প্রকট করিলেন। বৈষ্ণব-প্রধান ভগবানদাস উপলক্ষ্য মাত্র। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' এই কথাই বলিয়াছেন :

বৈষ্ণব-দলের নেতা ভগবান দাস
তাহার খালাসে পায় অপরে খালাস।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ : শ্রীশ্রীঠাকুর যখন এই আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন জনৈক বৈষ্ণব সাধুর অন্যায় কার্যের বিচার চলিতেছিল। ভগবানদাস বাবাজী সাধুর ঐরূপ বিসদৃশ কার্যে বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহার কণ্ঠী (মালা) কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবেন, ইত্যাদি বলিয়া শাসন করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সহিত পরিচয়াদির পর কথাপ্রসঙ্গে হৃদয় বলিলেন, 'আপনি এখনও মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন, আপনার উহা এখন আর রাখিবার প্রয়োজন তো নাই?'

বাবাজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'কার বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর চিরকাল জগন্মাতার উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আসায়, অপর কেহ অহঙ্কারের বশে নিজে কোন কাজ করিতেছে শুনিলে তাঁহার মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। ভগবানদাস বাবাজী সিদ্ধ হইলেও মন হইতে অহঙ্কারের পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারেন নাই—শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহা প্রতিভাত হইবামাত্র তিনি দেখিলেন, বাবাজী একজন ভক্তকে ভুলের জন্য শাস্তি দিবার কথা বলিতেছেন, 'আমি তাড়াইয়া দিব, আমি লোকশিক্ষা দিব, তাই আমি মালা-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই—ইত্যাদি।' সরলস্বভাব ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিক্ষা দিবার কে?'—ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি এই বাক্যবাণ-প্রয়োগ এক লীলাভিনয় মাত্র। উহা জগন্মাতারই ইচ্ছা। এই ঘটনার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে বলা হইয়াছে :

ভাগ্যবান্ ভগবান আশ্রমে যাঁহার
নিজে গিয়া করিলেন চৈতন্য সঞ্চার ॥
মহাবীর ধনুর্ধারী ধনু লয়ে করে
মূর্তিমান মন্ত্র পড়ি বাণ যদি ছাড়ে ॥
দূর-ভেদ্য লক্ষ্য এত বাণ মানে হার
শ্রীপ্রভুর বাক্যবাণে হয় ছারখার ॥
প্রভু-বাক্যে কি শকতি কার সাধ্য বলে।
বিষম মায়ার গড় ভেদ করি চলে ॥
সার্থক জীবন যেবা খাইয়াছে বাণ।
অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যেথায় সন্ধান ॥
বাবাজীর অভিমানে লক্ষ্য গুরুতর।
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন দয়ার সাগর ॥
ভস্মীভূত অভিমান তম আর নাই।
চৈতন্য-দিনেশ সমুদিত তার ঠাঁই ॥
আঁখি করি উন্মীলন প্রভুপানে চায়।
স্বরূপ-দর্শনে পদে বাবাজী লোটায় ॥

এই লীলাভিনয়ের মাধ্যমে বাবাজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের এক অপরূপ শক্তির পরিচয় পাইলেন। তাঁহার মনে প্রতিহিংসার উদয় তো হইলই না, বরং সাধনার রসে দ্রবীভূত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য প্রতিভাত হইলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলেন। 'নাম-ব্রহ্ম' আশ্রমে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অহংকৃত মানব-সমাজের জন্য ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের আবার এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার উহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : 'জগতে

ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই। অহংকৃত মানব যতই কেন ভাবুক না, সে সকল কার্য করিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে অবস্থার দাসমাত্র; যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, ততটুকুমাত্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। সংসারী মানব যাহা করে করুক, ভক্ত সাধকের তিলেকের জন্য ঐ কথা বিস্মৃত হইয়া থাকা উচিত নহে।'

* * *

কিছুদিন পূর্বে কালনা-দর্শনে যাইয়া অন্যান্য স্থান দর্শনান্তে 'শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম' আশ্রমে যাইয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, ভক্তমণ্ডলীর অবগতির জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

বর্তমানে আশ্রমে শ্রীভগবানদাস বাবাজীর সমাধি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। বার্ধক্যে অবিরাম নাম জপ করিতে করিতে তিনি ১২৯০ সালে দেহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ শেষ বয়সে তিনি সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন, তাই সাধারণের মুখে মুখে তাঁহার অপর নাম 'কাঁথারামদাস বাবাজী'-রূপেও প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার সমাধিটিও তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথাদ্বারা আবৃত। ভক্তবৃন্দের নিকট উহা পরম পবিত্র স্থল। আশ্রমটির বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হইল, উহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। পুরাতন বাড়িটির সংস্কার অনেক দিন হয় নাই, মনে হয়। আশ্রমটির পাকা কূপটি দর্শনীয়। উহার এক পাশে বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে কূপের নীচে যাইয়া মিশিয়াছে। প্রবাদ আছে, গঙ্গার প্রবাহে উক্ত কূপেও জোয়ার-ভাটা খেলিত, এবং বাবাজী সমর্থ অবস্থায় উক্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতেন। উক্ত কূপটি অদ্যাপি বর্তমান আছে। তবে সংস্কারাভাবে জীর্ণ।—অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম আশ্রমটির পরিচালনভার ১২ জনের গঠিত একটি ট্রাস্টি-সংস্থার হস্তে ন্যস্ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আশ্রমে আগমনের কোন স্মৃতি আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী উক্ত মিলনের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি চিত্র বাঁধাইয়া উপহার দেন। উহা মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত নাটমন্দিরে ঝুলানো আছে এবং সকলেরই দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছবিটি খুব বড় নহে। ছবিটির নীচে লেখা রহিয়াছে:

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ কর্তৃক ১৯৫৫ খৃঃ ৫ই জুন স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রতিকৃতি প্রদত্ত। ১২৭৭ সালে শ্রীশ্রীসিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাপুরুষকে দর্শন করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

এই লীলা স্মরণ করিয়া জনৈক 'সাধুভক্ত' এ স্থানের একটি বন্দনা রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহা অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণের নিকট বিতরণ করা হয়। ভক্তমণ্ডলীর অবগতির জন্য উহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:

'বৈষ্ণবের শিরোমণি ভগবানদাস।
লভিলেন পরাভক্তি হেথা করি বাস॥
'নাম-ব্রহ্ম' উপাসনা হ'ত এই ধামে।
আশ্রমের খ্যাতি তাই 'নাম-ব্রহ্ম' নামে॥
'খ্যাতি শুনি রামকৃষ্ণ হৃদয়-সহিতে।
একদিন আইলেন তাঁহারে দেখিতে॥
দু-চার কথার পর মহা ভাবাবেশে।
উচ্চ তত্ত্ব বাবাজীরে কন অবশেষে॥
'হেন পুণ্যভুমি আজ দরশন করি।
অতীত লীলার কথা হৃদয়েতে স্মরি॥'

সমাজবিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ

বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মনীষীর জীবন ও বাণীকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল অথবা সংস্কারবাদী ব'লে অভিহিত করা যায়। প্রতিক্রিয়া প্রগতির পরিপন্থী এবং সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের অন্তরায়। যে চিন্তাধারা সমাজকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মঙ্গলময় রূপ পরিগ্রহ করতে দেয় না, সেই চিন্তাধারাই প্রতিক্রিয়াশীল। 'প্রগতি' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য 'প্রতিক্রিয়া' শব্দের বিপরীত। প্রগতির অর্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন নূতন মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ক'রে মঙ্গলের পথে পদার্পণ। এই পরিবর্তন অবশ্যই জাগিয়ে তোলে এক নূতন প্রেরণা, যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে সমাজ ও জীবন হয় প্রকাশমান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রগতির অর্থ অতীতকে অস্বীকার ক'রে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়া নয়, অতীতকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎকে কল্যাণময় করা। কিন্তু বর্তমানে একদল মানুষ চিন্তার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ 'প্রগতি' অর্থে অতীতের অস্বীকৃতিই বুঝে থাকেন। 'সংস্কার' শব্দে আমরা বুঝে থাকি, সমাজে প্রচলিত অথবা অনিষ্টকর সংস্থাগুলিকে ধ্বংস ক'রে সমাজের সেবা। সংস্কারে আমূল পরিবর্তনের অর্থাৎ বিপ্লবের কোন স্থান নেই। এই সকলেরই ভূমিকা ইতিহাস স্বীকার করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণ ত্রিধারায় বিভক্ত :

(১) একদলের মতে তিনি সংস্কারবাদী সন্ন্যাসী; সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ-কল্যাণই ছিল তাঁর জীবন-ব্রত। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, 'জবরদস্তি সমাজ-সংস্কারে আমার আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টাই সঙ্গত।' স্বামীজী সমসাময়িক সংস্কারকদের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, অসবর্ণ-বিবাহ অথবা বিধবা-বিবাহের প্রচলনের দ্বারাই ভারতের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। তিনি সমাজের আমূল সংস্কারে বিশ্বাস করতেন এবং সেই আমূল সংস্কারের মধ্যেই সমাজবাদী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। অতএব প্রচলিত অর্থে স্বামীজী সংস্কারক বা সংস্কারবাদী নন।

(২) অপর একদল মার্কস্‌বাদী পণ্ডিতের মতে স্বামীজী সমাজবাদী ও প্রগতিশীল সন্ন্যাসী। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Swami Vivekananda—Patriot and Prophet-গ্রন্থে লিখেছেন: Swamijee called himself a socialist, and so far as it is known, he was the first Indian to designate himself as such. Yet his socialism is not of the same brand as of today.—অর্থাৎ যতদূর জানা যায়, স্বামীজীই প্রথম ভারতবাসী যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে অভিহিত করেছিলেন। যদিও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ আজকের প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

(৩) উনবিংশ শতকের মার্কসীয় জড়বাদের প্রভাবে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বামীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় 'India's Message' পুস্তকে লিখেছেন: India will not be able to

shake off her political servitude and economic miseries, her social backwardness, her intellectual coma, so long as the educated youth remains drugged by the spiritual message of a Vivekananda, a Dayananda or an Aurobindo or of any other prophet who may preach some such doctrine.—অর্থাৎ যতদিন শিক্ষিত যুবক-সমাজ একজন বিবেকানন্দ, একজন দয়ানন্দ অথবা একজন অরবিন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, ততদিন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অসম্ভব।

মার্কস্ মধ্যযুগে ইওরোপীয় সমাজে ধর্মের ভূমিকা স্মরণ করেই Religion বা ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ধর্মের কল্যাণময় রূপের পরিচয় তিনি পাননি। সেই কারণে তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে ধর্মের কোন স্থান নেই। মূলতঃ ধর্ম ও সমাজবাদ যে একই লক্ষ্যের নির্দেশক, এই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর এ অক্ষমতার জন্য দায়ী বিগত শতাব্দীর জড়বাদ-প্রধান বিজ্ঞান ও মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সমাজে ধর্মের ভূমিকা। এইরূপ মার্কসীয় ভাবাদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে বর্তমানে তথাকথিত সমাজবাদীগণ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নতুন ধর্মবোধের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য না ক'রে মার্কস্‌বাদী চশমা পরে ইতিহাস পাঠে মগ্ন। স্বামীজীর জীবনে ধর্ম ও সমাজ-তন্ত্রবাদের যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই এঁদের। অথচ ভারতের মাটিতে যাঁরা সমাজবাদের বৃক্ষ-রোপণে প্রয়াসী, তাঁদের ধর্ম ও সমাজতন্ত্র-বাদের সমন্বয়-সাধনে বিশেষভাবে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন দেশের অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে কোন ভাবাদর্শ আমদানি করা সম্ভব নয়; এবং ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে ধর্মকেন্দ্রিক।

গভীরভাবে মনন ও বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয় যে, স্বামীজী জীবন ও চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম সমাজতন্ত্রবাদের অনুকূল। ধর্মের স্বরূপের সম্যক্ পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন বলেই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে মনে করতে পারেননি। তাঁর ধর্মে আত্মচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তার কোন বিরোধ নেই। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, তথাপি তিনি বলেছেন: 'Do you feel that the millions and millions of the descendants of gods and sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving for ages?—অর্থাৎ তুমি কি মুনিঋষি ও দেবতাদের লক্ষ লক্ষ বংশধরদের জন্য চিন্তা কর, যারা পশুপ্রায় হয়ে গেছে? তুমি কি অনুভব কর যে, তাঁরা যুগ যুগ ধরে অভুক্ত রয়েছে?

স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শবাদের মূলসূত্র হচ্ছে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবন। এই সূত্রের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে তিনি প্রগতি-শীল। স্বামীজী প্রগতিশীল ছিলেন বলেই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বলে-ছিলেন: I am a socialist, not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no loaf.—অর্থাৎ আমি সমাজতন্ত্রবাদী, কারণ নাই-মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে সেই সময় এদেশে সমাজতন্ত্রবাদ অবলম্বনে চিন্তার 'বিলাস' আরম্ভ হয়নি। অতএব স্বামীজীকে ধর্মের

দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া বিকৃত মনন-শীলতার পরিচয়।

মার্কস্‌বাদে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই। কারণ এই মতবাদে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। আন্ত-র্জাতিকতাবাদ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদ অর্থহীন ও অসম্ভব। কিন্তু স্বামীজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। অতএব তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদী স্বামীজী প্রতিক্রিয়াশীল।

স্বামীজীর চেষ্টায় আধুনিক জগৎ ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করেছে। এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি; এবং জাতীয়তাবাদই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা ও রাজনৈতিক মুক্তির উৎস। রাজনৈতিক মুক্তি ভিন্ন আর্থনীতিক মুক্তি অসম্ভব। এই ভাবে বৈষয়িক বন্ধন-মুক্তিই আত্মিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। স্বামীজী বলেছেন, 'যে কোন বিষয়ে উন্নতি-লাভের প্রধান সহায় স্বাধীনতা।' এইরূপ চিন্তার উপর ভিত্তি করেই তিনি জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেন।

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত জাতি, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সে প্রায় ভুলে গেছে। দীর্ঘকাল পরাধীনতার নাগপাশে ভারতবাসী শিখেছিল যে, ভারত-সংস্কৃতি জগৎসভায় অপাঙ্‌ক্তেয়। স্বামীজীর প্রচারে বিশ্বের দরবার স্বাগত জানালো ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে। এই ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামীজী। তিনি জগৎসভায় ঘোষণা করলেন: 'প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ত্ব শিখিতে চায়, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া উহা শিক্ষা করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জানিতে চাহে, তবে তাহাদিগকেও প্রাচ্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।'—এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হিটলারের রক্ত-কুলীন জাতীয়তাবাদ হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিটলারের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতা, দম্ভ ও আত্মাভিমান। নীট্‌শের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবাদ অপর সকল জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদে আমরা পাই ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু স্বামীজী-প্রচারিত জাতীয়তাবাদে সকল জাতির স্বীকৃতি আছে। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতির নিকট একাধারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। এই উদারনৈতিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই স্বামীজী বলতে পেরে-ছিলেন, 'মানব-জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।'

তবে তিনি ভারতবর্ষকে ভাবী বিশ্বসভ্য-তার কেন্দ্র বলেছেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, বিষয়াসক্তি এবং উহার বিষময় ফলের প্রতিষেধক জড়বাদে নেই। মানব-সমাজ কেবল বৈষয়িক উন্নতির দ্বারাই সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কেবল-মাত্র জড়বাদ—সে বৈজ্ঞানিক হোক বা অ-বৈজ্ঞানিক হোক—সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করে; এই সঙ্কট থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করে আধ্যাত্মিকতাবাদ। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই স্বামীজী বলেছিলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' বর্তমান মানব-সভ্যতার সঙ্কট স্বামীজীর উক্তির সত্যতাই

প্রতিপাদন করে। এই ভারতকেন্দ্রিক চিন্তার উৎস তাঁর ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি,—সঙ্কীর্ণতা নয়। জড়বাদে অনাস্থা ও আধ্যাত্মিকতাবাদে বিশ্বাস-বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সঙ্কীর্ণ দেশপ্রীতি বা গোঁড়া স্বধর্ম-প্রীতি দ্বারা নয়।

এ ছাড়া জাতীয়তাবাদের কার্যকরী শক্তিকে অস্বীকার করা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা। স্টালিনের মতো মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্রনায়কও জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'Those who are not rooted to the soil will wither away.' অর্থাৎ স্বাদেশিকতা ভিন্ন স্থায়ী জীবন অসম্ভব। এই উক্তির মধ্যে আমরা যে জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত পাই, তা নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল নয়।

এইরূপ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই স্বামীজী নিজেকে সমাজ-তন্ত্রবাদী ব'লে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। এই সমাজতন্ত্রবাদে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের মতো শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজের স্থান আছে। অধিকন্তু এই সমাজবাদে—ভাব ও বস্তুতে, জড় ও চেতনে কোন বিরোধ নেই এ ক্ষেত্রে জড়বাদ বা বৈষয়িক উন্নতি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়। উপায়স্বরূপ জড়বাদকে অবলম্বন করেই আদর্শবাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ হলেও ধর্ম অর্থ এবং কামকেও অন্যতর পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বৈষয়িক বন্ধনমুক্তি আত্মিক মুক্তির সন্ধান দেয় বলেই জড়বাদ-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদকে অনায়াসে স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের অঙ্গীভূত করা যেতে পারে। এই হ'ল তাঁর চিন্তার সামগ্রিকতার প্রমাণ। অপরদিকে মার্কস্-প্রচারিত জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ খণ্ড-দৃষ্টিভঙ্গী সহায়ে ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ করে বলেই মানব-জীবনের চরম আদর্শের সন্ধান দেয় না। এইটেই এই চিন্তা-ধারার দুর্বলতা ও অপূর্ণতা।

অতএব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের সঙ্গে স্বামীজী-প্রচারিত অধ্যাত্মবাদী সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধ মার্কস্‌বাদীর নিকট প্রতিভাত হলেও উদার ও মুক্তবুদ্ধি বিবেকানন্দ-বাদীর নিকট প্রতিভাত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই ভারতভূমিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের প্রাক্কালে অদূরদর্শী মার্কস্‌বাদীদের নিকট আবেদন যে, তাঁরা যেন গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার ক'রে সমাজবাদের সার্থক রূপায়ণের জন্য বিবেকানন্দ-বাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ভারতের শোষিত সমাজকে শ্রেণীসংঘর্ষের বাদানুবাদের বিষময় পরিণতি থেকে রক্ষা করেন।

The West wants every bit of spirituality
through social improvement.
The East wants every bit of social power
through spirituality.

—*Vivekananda*

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঃ ভারত-মার্কিন মৈত্রীর সেতু

মিঃ আর্থার সি. বার্টলেট*

আমার দেশে এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, এবং বেশ গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গেই বলা হয়ে থাকে যে, যে কোন একটি মার্কিন বালক উত্তরকালে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে। অবশ্য আজ এই বিশাল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রেও যে কোন একজন সাধারণ ছেলে ভারতের প্রেসিডেণ্ট বা প্রধান-আসন অলঙ্কৃত করতে পারে, অথবা অন্য কোন উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাও লাভ করতে পারে। যখনই দেখি কোন একটি ডাগরচোখ ছেলে বা ছেলের দল খেলাধুলো করছে, বা হয়তো স্কুলের পড়া সাঙ্গ ক'রে বাড়ী ফিরছে, অথবা শ্রান্তক্লান্ত পায়ে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, কিংবা হয়তো রাস্তার ধারে শুধু দাঁড়িয়েই রয়েছে, তখনই ঐ চিন্তা আমার মনের মধ্যে উঁকি মারে। যখন ভাবি, কে জানে হয়তো এই ছেলেটিই অথবা এদেরই একজন একদিন এই সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হয়ে কথা বলবে, এই সমগ্র জাতির যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবে, আর এমন সব গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা ইতিহাস সৃষ্টি করবে, তখন আমার দেহে জাগে রোমাঞ্চ, মনে লাগে বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ।

তবে এ কথা ঠিক যে, প্রেসিডেণ্ট বা প্রধান-মন্ত্রী না হয়েও অন্য নানাভাবে নেতৃত্ব করা যায়, অন্য নানা পথেও ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা যাই থাক না কেন, যুগে যুগে মহান্ নীতিবিদ্ ও ধর্মনেতারা প্রায়ই সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এই সমস্ত ধর্মনেতাদের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই গ্রামেই, আজ থেকে একশ পঁচিশ বছর আগে। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। রাজনৈতিক নেতারা এই মানবজাতি ও তার ইতিহাসকে যতখানি প্রভাবান্বিত করতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন এই মহাপুরুষ।

আমরা শুনেছি, এই গ্রামে শৈশবাবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সব গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, যার ফলে লোকে তাঁকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ ক'রল। বিশেষ ক'রে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মতামতের ওপর সকলেই গুরুত্ব আরোপ ক'রত। তথাপি এ কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, এই যে ছোট্ট ছেলেটি গ্রামের চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে ঘুরছে, গান গাইছে, ছবি আঁকছে, তার প্রিয় ধর্ম-নাটকগুলি অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছে, সেই ছেলেটিই একদিন সর্বযুগের সাধু ও মহাপুরুষদের সঙ্গে একাসনে স্থান লাভ করবে, আর একদিন তাঁরই নামে তাঁর অগণিত ভক্ত পরম্পরাক্রমে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে থাকবে, মানুষের সৌভ্রাত্র সুদৃঢ় ক'রে তুলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ করা আমার মতো একজন আমেরিকানের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে, কারণ কোন রকম বিশেষ ধর্মশিক্ষা আমার আছে—এ দাবি আমি করি না। বাস্তবিকই এ বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি,

* Mr. Arthur C. Bartlett, (Director, United States Information Service, Calcutta) কর্তৃক কামারপুকুরে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ অবলম্বনে।

এ দাবি আমি করতে পারি না; আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ উপলব্ধি এমন এক বস্তু যা আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির অতীত। তবে আমার মনে হয়, আমি আমার সমস্ত হৃদয় ও অন্তর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের সার কথাটুকু উপলব্ধি করতে ও গ্রহণ করতে পারি। সেই সার কথাটি হ'ল: ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন, এবং আমাদের মধ্যে ভগবানকে দেখতে যখন আমরা শিখি, তখনই আমরা উপলব্ধি করতে শিখি যে, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন এবং আরও উপলব্ধি করি যে, আমাদের নিজেদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে সকল মানবজাতির মঙ্গলের মধ্যে।

বর্তমান বাংলার একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিচার-পতি শ্রীপি. বি. মুখার্জী বলেছেন: আধুনিক যুগের মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেছেন, তা হ'ল বিশ্বজনীনতার বাণী। তিনি যিশুখ্রীষ্টকে উপলব্ধি করেছিলেন, হজরত মহম্মদের ভাব উপলব্ধি করেছিলেন, অনাদি-অনন্ত মা কালীর ঐশী শক্তিকে তিনি অনুভব করেছিলেন এবং শিবের দিব্য প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই ঐক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যা স্থান-কালের বাধা, জাতি বর্ণ ধর্ম দেশ ও মহাসাগরের কৃত্রিম বাধা অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে, এবং বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে যবনিকার আড়াল রয়েছে, তা ছিন্ন ক'রে দেয়। তাঁর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জোয়ারে সকল ধর্মের তত্ত্বগত বিরোধ ও সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি ভেঙে গিয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি নিজের অন্তরে আপন অনুভূতির সুরে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু বিভিন্ন পথে সেই এক পরমানুভূতির দিকেই আবর্তিত হয়ে চলেছে—এই সত্যটিই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের প্রধান স্বামী বিবেকানন্দ গত শতাব্দীর শেষমুখে আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি আপনাদের ও আমাদের দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধা ও সৌভ্রাত্রের মনোভাব-সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর আগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমেরিকানই ভারতের জীবন-ধারা ও চিন্তাধারা অবগত ছিলেন ও তা উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এমার্সন ও থোরোর নাম উল্লেখ করা যায়। আবার ভারতীয়দের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই আমেরিকা ও তার জীবনধারা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে এগুলি বিধি নয়, ব্যতিক্রমই। অধিকাংশ সময়ই ভারত ও আমেরিকা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল। একে অপরের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ ক'রত, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অতিরঞ্জিত ছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হলেন, প্রায়শই দেখা যেত, মার্কিন সংবাদপত্র-গুলি তাঁকে 'ভারতীয় রাজা' ব'লে অভিহিত করছে। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে, তখনকার দিনের সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা শুধু ভারতীয় রাজাদেরই আমেরিকায় যেতে দেখেছেন। আবার ভারতে প্রচলিত ধর্মগুলি সম্বন্ধে সে সময় আমাদের দেশে এমন সামান্য জ্ঞান ছিল যে, কোন কোন সময় স্বামী বিবেকানন্দকে অভিহিত করা হ'ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব'লে।

তবুও এ কথা ব'লব, অপরিচিত বস্তু, অজানা অচেনা দেশের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকেরা চিরকালই কৌতূহলী, চিরকালই তাঁরা একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে আসছেন। এজন্যই একেবারে প্রথম দিন থেকেই স্বামীজী বিশেষ আকর্ষণের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুতঃ আমেরিকায় যাবার পর সেখান থেকে তিনি ভারতে যে প্রথম চিঠি পাঠান, তাতে লিখেছিলেন :

আমাকে দেখবার জন্য এদেশে রাস্তায় শত শত লোক এসে ভিড় করছে। তাই আমি চাইছি কালো রংয়ের লংকোট পরতে। বক্তৃতা করবার সময়ের জন্য রেখে দিতে চাইছি আমার গেরুয়া বসন ও উষ্ণীষ।

রাস্তায় চলাফেরার সময় লোকে যে তাঁকে দেখতে চাইত, এতে তিনি হয়তো কিছুটা বিব্রত বোধ করতেন, কিন্তু তা হলেও এটা তাঁর সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের যথার্থ আগ্রহেরই পরিচয় দেয়। শীঘ্রই দেখা গেল, স্বামীজীর সম্পর্কে যাঁরাই জানতে পেরেছেন, তাঁরাই তাঁর সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে নূতন ধারণা গড়ে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

জনৈকা মার্কিন মহিলা তাঁর সম্পর্কে যখন শুনলেন যে, তিনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, যে কোন সুশিক্ষিত লোকের মতোই তাঁর জ্ঞান, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ঐ মহিলাটিই একখানি চিঠিতে এই কথা লেখেন। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন : 'আঠার বছর বয়স থেকেই তিনি সন্ন্যাসী। এঁরা সন্ন্যাস-জীবনের যে দীক্ষা নেন, সেটা ঠিক আমাদের দীক্ষার মতোই, বরং ব'লব, ঠিক একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর দীক্ষার মতোই। শুধু তফাৎ এই যে, তাঁদের দারিদ্র্য সত্যিকারের দারিদ্র্য। তাঁদের কোন মঠ নেই, নেই কোন সম্পত্তি। এমন কি তাঁরা ভিক্ষে করতেও পারেন না। যতক্ষণ কেউ এসে ভিক্ষে না দেয়, ততক্ষণ তাঁরা বসে বসে শুধু অপেক্ষাই করেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে বিবেকানন্দ লোকদের শিক্ষা দেন। দিনের পর দিন শুধু কথা আর আলোচনা। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ তিনি, নিজের বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করেন একেবারে স্পষ্ট ক'রে, চিন্তাধারাকে একেবারে সোজা এনে হাজির করেন তাঁর সিদ্ধান্তে। কেউ তাঁকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিতে পারবে না, তাঁর আগেও কেউ যেতে পারবে না।'

স্বামীজী আমেরিকায় গেলে প্রথম দিকে যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক তাঁকে দেখবার ও তাঁর ভাষণ শুনবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের এই সব মতামত বোঝাপড়ার শুরু মাত্র। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন 'ওয়ার্লড্ পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস্' অর্থাৎ বিশ্ব-ধর্মসভায় যোগ দিতে। এই ধর্মসভা শিকাগোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিরাট বিশ্বমেলার অঙ্গহিসেবে। সেখানেই তিনি, অন্ততঃ খ্যাতির বিচারে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গোটা আমেরিকায় পরিচিত হয়ে ওঠেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ ধর্মসভায় তিনি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার বিবরণের মাধ্যমে।

যদিও এই সভাকে 'বিশ্বধর্মসভা' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, বস্তুতঃপক্ষে, এখানে যে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন হয় আমেরিকার, নয় ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে, অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মেরই নানা শাখার প্রতিনিধি। তবে অন্য

কতিপয় ধর্মের প্রতিনিধিও ছিলেন, যেমন ছিলেন ভারত থেকে ব্রাহ্ম সমাজের দু-জন প্রতিনিধি এবং একজন জৈন ও একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সকলের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ; তার কারণ, বোধ হয় কিছুটা তাঁর উজ্জ্বল গৈরিক বসন ও উষ্ণীষ, এবং কিছুটা, যেটা আরও বেশী, তাঁর বিরাট ও মহান্ ব্যক্তিত্ব। প্রথম দিনে স্বামীজী বলবার আগে অন্যান্য কতিপয় প্রতিনিধি ভাষণ দেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের ভাষণই যখন সমাপ্ত হয়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়ে হর্ষধ্বনি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজী যখন ভাষণ দিতে উঠলেন এবং নমস্কার জানিয়ে,—কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না এমন ভাষায়—সম্বোধন ক'রে বললেন, 'সিস্টারস্ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা' (আমেরিকার ভাই ও বোনেরা), শ্রোতৃমণ্ডলীর সহস্র সহস্র নরনারী যেন একাত্ম হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট ধরে এমন করতালি চলতে থাকল যে, স্বামীজীর প্রারম্ভিক বাক্য উচ্চারণেই দেরি হ'ল। অতি সহজ ও সরল ভাষায় স্বামীজী ভাষণ দিলেন, গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে নিজের ধর্মের কথা বললেন, জানালেন—তিনি সমস্ত ধর্মমতেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন। উপসংহারে, গীতা থেকে তিনি বললেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন কবি হেরিয়েট মনরো। তিনি লিখেছেন: 'তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট, চৌম্বক শক্তির মতো আকর্ষণকারী, তাঁর কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতোই গুরুগম্ভীর, তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতির সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ, আর যে প্রতীচ্যের সম্মুখে তিনি প্রথম এসে দাঁড়িয়েছেন, তার উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীর মাধুর্য—এই সবগুলি এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দান করেছিল প্রগাঢ় আবেগের এক নিখুঁত, সুদুর্লভ মুহূর্ত।'

সেইদিন থেকে যতদিন বিশ্বধর্মসভার অধিবেশন চলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন যে কোন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বক্তা। স্বামীজীর ভাষণ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে, অনেক সময়েই দেখা যেত, কর্তৃপক্ষ তাঁকেই সর্বশেষ বক্তা হিসাবে রেখেছেন, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর আগের অন্যান্য বক্তাদের ভাষণ ধৈর্য ধরে শোনেন। শিকাগোর একটি সংবাদপত্র লিখেছিল: 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিত্তজয়ী আচরণ ও তাঁর অপূর্ব ক্ষমতায় এবং নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নের নির্ভয় আলোচনা ক'রে সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এমনটি আর কেউ পারেননি। এই বিশিষ্ট হিন্দুটি সোৎসাহে প্রতীচ্য জগতের মহত্ত্ব ও তার বৈষয়িক অগ্রগতির প্রশংসা ক'রে থাকেন, স্বদেশীয় জনগণের যা উপকারে আসতে পারে ব'লে তিনি মনে করেন, তাই শিখে নেবার জন্য তাঁর আগ্রহ বিপুল এবং পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের ধর্মই যে পরস্পর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ, এই সত্য ও ন্যায়—তথা পবিত্রতার আদর্শ অনুসারে সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বীকার ক'রে নিতে তাঁর ইচ্ছাও অকপট। কিন্তু আবার, তিনি তাঁর হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে এমন চমৎকার বাগ্মিতায় ও আত্মশক্তির সাহায্যে সমর্থন করেছেন যে, তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং তাঁর শিক্ষা যে ভেবে দেখবার মতো, এই চিন্তা সৃষ্টি করেছে।'

'ক্রিটিক' (সমালোচক)-নামক একটি সাময়িক পত্রিকার সংবাদদাতা বিশ্বধর্মসভার কার্যকলাপের সামগ্রিক বিবরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ-

ভাবে উল্লেখ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা। তিনি লেখেন : 'আমেরিকাবাসীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যটি উদ্‌ঘাটন ক'রে গিয়েছেন যে, প্রাচীন ধর্মাদর্শের পশ্চাতে যে দর্শন নিহিত রয়েছে, তাতে আধুনিকদের চোখেও সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হবার মতো বস্তু রয়েছে এবং একবার এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমাদের আগ্রহও ত্বরিত হয়ে ওঠে, আমরা ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানের সন্ধানে বার হয়ে পড়ি। অন্য কথায় বলা যায়, পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের জ্ঞান এভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং পরস্পরকে উপলব্ধি করতে পারায় পরস্পরের দেশ দর্শন এবং জীবন-প্রণালী জানবার আগ্রহও আমাদের বেড়ে যায়। স্বামীজী নিজেই একবার বলেছিলেন—সম্ভবতঃ কিছুটা রসিকতা ক'রে, কিন্তু কিছুটা গুরুত্ব দিয়েই—তিনি আমেরিকাবাসীদের কাছে এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, হিন্দুরা বর্বর বা অসভ্য নয়।'

* * *

ধর্মসভা আরম্ভ হওয়ার আগে যে সকল আমেরিকান মনে করতেন, ভারতীয়েরা বর্বর—এই ধরনের কিছু লোক ছিল বৈকি—তাঁরা এবং অন্য যে কেউ এই সকল ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন বা যাঁরা সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ পাঠ করেছিলেন, তাঁদের কারুরই আর এ রকম ধারণা রইল না। যে আড়াই সপ্তাহকাল ধর্মসভার অধিবেশন চলেছিল, তার মধ্যে ক্রমেই বেশি-সংখ্যক আমেরিকান প্রকৃত ভারতের রূপ উপলব্ধি করলেন, যা এর আগে আর কখনও সম্ভব হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধর্মসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীজী আরও দু-বছর আমেরিকায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঐ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর মহৎ কার্য সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। ডিট্রয়েটে জনৈক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন ধর্মোপদেশ শিক্ষা দেওয়ার সময় ঐ উপদেশবাণীটির যথাযোগ্য নামকরণ করেছিলেন : 'প্রাচ্য-অভিমুখী দ্বার খুলে যাচ্ছে'। সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে, স্বামীজী স্বয়ং ঐ ধর্মসভায় উপস্থিত থেকে আলোচনাকালে ঘন ঘন অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ছিলেন। খ্রীষ্টীয় যাজক যখন জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মিশনরীরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রাচ্য দেশে যাওয়ার সময়ই হোক বা প্রাচ্যভূমি থেকে পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের সময়ই হোক, এক দেশের উৎকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্য দেশের অপকৃষ্ট বস্তুর তুলনা যেন না করেন, এবং প্রত্যেকটি সভ্যতার মধ্যে ভাল কি আছে, তা তাঁদের অন্বেষণ করতে হবে; আর সেই ভালটুকুকে সাধারণ সম্পত্তি ক'রে তুলতে হবে—নিঃসন্দেহে স্বামীজী তখনও অনুমোদনসূচক মাথা নেড়েছিলেন। তিনি আরও বলেন : প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্যের বাস্তব যুক্তিবাদের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম আমেরিকা সফরের দু-বছরের মধ্যে যেমন প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন, তেমনি সমালোচনার পাত্রও হয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম ব'লে বহু গোঁড়া খৃষ্টানদের যে বিশ্বাস ছিল, রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া বিবেকানন্দের ধর্মমত সেই বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে ব'লে তাঁরা বিবেচনা করলেন। তাঁরা অসংখ্য ধর্মোপদেশ

প্রচার করলেন এবং বিবেকানন্দ মিথ্যা ধর্মের পক্ষে ওকালতি করছেন ব'লে আক্রমণাত্মক চিঠিপত্রাদি সংবাদপত্রে লিখতে লাগলেন।

তবে যেমন তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল, তেমনি তাঁর স্বপক্ষে বলাও হয়েছে অনেক কিছু যে খ্রীষ্টান ভদ্রমহিলার গৃহে স্বামীজী প্রায়ই থাকতেন, তিনি লিখেছেন: স্বামীজী আমেরিকায় এসে আমাদের মনে উচ্চতর জীবনবোধ জাগিয়েছেন। ডিট্রয়েট একটি পুরানো রক্ষণশীল শহর। এখানে সকল ক্লাবে তাঁর প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তা আর কারও প্রতি কখনও করা হয়নি। খ্রীষ্টানদের কাছে অনেক সত্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। ধর্মোপদেষ্টা-রূপে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে একগৃহে বাস করলে এবং তাঁকে জানতে পারলে প্রত্যেকটি মানুষের উন্নতি সাধিত হবে। আমি চাই প্রত্যেকটি আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দকে জানুক এবং এই রকম আরও কেউ যদি ভারতে থাকেন, তাঁদেরও আমেরিকায় প্রেরণ করা উচিত।'

স্বামীজী স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম ও অন্য সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন: 'আমি সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী। আমি মনে করি—আমার ধর্মের মধ্যে সত্য আছে, তোমার ধর্মের মধ্যেও সত্য আছে। সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য বিবিধ পথের মধ্য দিয়ে একই লক্ষ্য অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে।'

ধর্ম তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র ও প্রধান বিষয় হলেও তাঁর প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর একটি বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের যে প্রতিবেশীরা রয়েছে, তারা সকলে—এমন কি দূরতম প্রান্তে অবস্থিত প্রতিবেশীরাও—আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বর্ণ ভাষা রীতিনীতি ও ধর্মের। তাঁর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিশ্বে ভারতের দান'। বহু আমেরিকান যাঁরা এই বক্তৃতা শুনেছিলেন বা পাঠ করেছিলেন, তাঁরা সবিস্ময়ে অবগত হলেন যে, যে-দেশকে তাঁরা এতদিন পৌত্তলিকদের বাসভূমি ব'লে জেনে এসেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশটুকু এসেছিল এই দেশ থেকেই।'

তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা জনৈক মার্কিন গ্রন্থকার লিখেছিলেন, মাত্র বছরখানেক সময়ের মধ্যে স্বামীজী তাঁর দেশের বিরুদ্ধে বহু দশক যাবৎ আমেরিকায় যে একটা বিরুদ্ধ মনোভাবের তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তার গতি স্থায়িভাবে রুদ্ধ ক'রে দেন। প্রচারের কোন কৌশল অবলম্বন না করেই তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন, ভারতের সত্য জীবনের কিছু কিছু বর্ণনা ক'রে এবং তার আন্তর পরিচয় দিয়ে তিনি গোটা হিন্দু সংস্কৃতির মূল চরিত্র ও তাৎপর্য লোকসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করেন।

এমন চমৎকার ফলপ্রদভাবে ভারতের দর্শনকে তিনি পরিবেশন করেছিলেন যে, আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হারভার্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাচ্য দর্শন অধ্যাপনার জন্য প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। তিনি অবশ্য অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমেরিকায় তাঁর কার্যকারিতার বোধ হয় এর চেয়েও বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর ভাষণ এবং শিক্ষাদানের ফলেই সেখানে উত্তরকালে গড়ে ওঠে বেদান্ত

সোসাইটি। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ যে দর্শন শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই শিক্ষানুসারেই একদল একনিষ্ঠ মার্কিন নরনারী এইসব সোসাইটির মধ্যে থেকে নিজেদের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন। আজ আমেরিকায় ১০টি বেদান্ত সেণ্টার আছে, একটি মঠ আছে এবং একটি কনভেণ্ট আছে। এ সবই পরিচালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক-অনুসরণকারী রামকৃষ্ণ-সংঘের স্বামীদের নির্দেশে।

স্বামীজীর আমেরিকা পরিদর্শনের কার্যকারিতার এই বাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু যে পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সদ্‌ভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠবার মধ্য দিয়ে, সেটা তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক। কারণ—তিনিই প্রথম আপনাদের ও আমার দেশের মধ্যে সদ্‌ভাবের সিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, যা আমি আগে একবার ডিট্রয়েটের ধর্মযাজকটির উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছি। এর পর থেকে আরও বহু ব্যক্তি—যাঁদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে—এই সদ্‌ভাব আরও বাড়িয়ে তুলেছেন, আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আরও বেশী জ্ঞান আমার দেশে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমার দেশ সম্বন্ধেও বেশী জ্ঞান এ দেশে নিয়ে এসেছেন। এই সেদিন আমাদের নূতন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঘোষণা করেছেন: 'বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত উৎপত্তির কারণে যতদিন মানুষ একে অপরকে ভয় করবে বা অবিশ্বাস করবে, যতদিন অপরকে বুঝবার মতো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিবর্তে অযৌক্তিক উগ্র অন্ধতা বিরাজ করবে, ততদিন আমাদের রাষ্ট্র পূর্ণ শক্তি ও মহত্ত্বের অধিকারী হ'তে পারবে না।'

* * *

কী অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে এই গ্রামটির উপরে। এই গ্রামেই একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল একটি শিশু, যে এর আকাশে বাতাসে প্রাণস্পন্দন পেয়ে অপরকে বুঝবার মতো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। তাঁরই মহান্ শিষ্যদের একজন আমার দেশে অপরকে বুঝবার সেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এমন এক কর্মপরম্পরার প্রাথমিক উদ্বোধন ক'রে গিয়েছিলেন, যা আজও আপনাদের ও আমার দেশকে সেই সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে তাদের যথাসাধ্য পরিপূর্ণ শক্তি ও মহত্ত্ব অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

Asia produces giants in spirituality, just as the Occident produces giants in politics, giants in science.

—*Vivekananda*

সমালোচনা

মানুষ কি ক'রে মানুষ হ'ল : চণ্ডী লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত, প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩; পৃষ্ঠা ১১২ (ডিমাই); মূল্য দুই টাকা।

মানুষের কাছে সব চেয়ে অজানা হ'ল মানুষ। অনাদিকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত জীব-জগতের পরিবেশে মানুষকে দেখতে না পারলে মানুষের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের হয় না; ইতিহাস পড়েও হয় না, শারীর বিজ্ঞান পড়েও হয় না, শুধু নৃতত্ত্ব পড়েও হয় না। লেখক তাই তাঁর আলোচিত বিষয়বস্তুর নাম দিয়েছেন "মানুষ কি ক'রে মানুষ হ'ল"—এর ব্যাবহারিক নাম 'কালচারাল এনথ্রোপলজি'—মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি ক'রে বিষয়টি গড়ে উঠেছে।

মানুষ হওয়ার মূল মন্ত্র পারস্পরিক সহ-যোগিতা। কিভাবে সেই শিকারের যুগ থেকে গুহাজীবনের মধ্য দিয়ে—রূপকথার রাজ্য অতিক্রম ক'রে মানুষ গৃহ, গ্রাম, নগর, সমাজ, সভ্যতা সৃষ্টি ক'রল—তার একটা প্রামাণ্য চিত্র আঁকবার সার্থক চেষ্টা লেখক করেছেন। ছোটদের লক্ষ্য ক'রে লেখা হলেও বড়-রা এ বই পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করবেন। অধিকাংশ চিত্র প্রামাণ্য, *কয়েকখানি কল্পিত চিত্র বিষয়বস্তু বোঝাতে সাহায্য করে। একটি বিষয়-সূচী ও একটি চিত্রসূচী থাকলে ভাল হ'ত।

The Message of Ramakrishna : Published by President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Office : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-14. Pp. 44 ; price 30 nP.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ঈশ্বরতত্ত্ব, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বাণী সঙ্কলন করিয়া পকেট সাইজ এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত, সর্বদা কাছে রাখিবার মতো বইটি ভক্তগণের নিকট আদরণীয় হইবে। বইটিতে বিষয়-বিভাগের অভাব রহিয়াছে, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তাহা দূরীভূত হইবে।

বিদ্যাপীঠ : ছাত্রদের বার্ষিকী (১৯৫৮-৫৯) —প্রকাশক : স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া। পৃষ্ঠা ৯১।

দেওঘর ও পুরুলিয়া উভয় বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকদের রচনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবারের বার্ষিকী। প্রচ্ছদপটে এবং কয়েকটি লেখায় নূতনত্ব আছে। Swami Vivekananda on internationalism and civilisation প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ। ছাত্রদের লেখার মধ্যে 'ধানু দা', 'কেন পড়তে ভাল লাগে না?', 'স্বামীজী ও স্বদেশপ্রেম', 'পুরুলিয়া ক্যাম্প', 'বিসর্জন', 'আমার কাশ্মীর ভ্রমণ', 'বর্ষার দিনে' আমাদের ভাল লেগেছে। সচিত্র আশ্রম-সংবাদে বিদ্যাপীঠের বিস্তৃতি ও ক্রমোন্নতি ফুটে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ৫ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১২৬ তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে একে একে উপনিষদ্ আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী, সিঞ্চিত হইতে থাকে। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

সকাল হইতে বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ১৬ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১০ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার সাধারণ উৎসব উপলক্ষে মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বারা উৎসব ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন। সারাদিন প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছা-সেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজি পোড়ানো হইলে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। মঠের প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দোকানপাটের মেলা বসে। অগণিত নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

উৎসব

করিমগঞ্জঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬ তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে জন-সভা, কথকতা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি হয়। কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চারিটি আসরে সঙ্গীত-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য কথকতা করেন; সমাগত তিনচারি সহস্র নরনারী প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। এ অঞ্চলে এইরূপ কথকতা-অনুষ্ঠান এই প্রথম।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমেও সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগমে একটি কথকতা-অধিবেশন হয়।

রামবাগান (কলিকাতা)ঃ বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব গত ১০ই

হইতে ১৪ই জানুআরি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ স্বামীজীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যপ্রদান করেন ও প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন। তৎপরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ও কেন্দ্রের কর্মীরা পাড়ার অধিবাসীদের সহিত বস্তি পরিষ্কার করে। বৈকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা 'ডাকঘর' অভিনয় করে।

১১ই সকালে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়, ৫০ জন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহার পর শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বক্তৃতা করেন। রাত্রে সারদামণি নৈশ বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রগণ কর্তৃক 'বঙ্গে বর্গী' অভিনীত হয়।

১২ই সকালে সানাই-প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে শিশুদের পুরস্কার দেওয়া হয়। রাত্রে 'বাঘা যতীন' চলচ্চিত্র দর্শন করিতে প্রচুর লোক-সমাগম হইয়াছিল।

১৩ই রাত্রে 'দেবলাদেবী' অভিনীত হয়। ১৪ই প্রায় ২,০০০ লোক এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পায়। বৈকালে পুতুলনাচ ও রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

ঢাকা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত ৫ই হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিথিপূজা, বৈদিক স্তোত্রাদি পাঠ, হোম, জীবনচরিত পাঠ ও আলোচনা, ভজন, রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব পালন করা হয় এবং শেষ দিবসে (১০ই ফাল্গুন) একটি ধর্মসমন্বয়-সভার অনুষ্ঠান করিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

ধর্মসভার সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ মাহ্‌মুদ হোসেন তাঁহার ভাষণে বলেন যে, এই দুই মহামানব ধর্মজগতে এক নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, এই মিশনের মহৎ কার্য আজ সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রেরণা দান করিতেছে।

বৌদ্ধ কৃষ্টিপ্রচার-সংঘের সভাপতি ভিক্ষু বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীর সামঞ্জস্য দেখাইয়া বলেন, মানুষ সেবা ও কর্মের দ্বারাই বুদ্ধত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীচারু চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন

শিক্ষাপ্রদর্শনী

রহড়া (২৪ পরগনা) **ঃ** রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে একটি শিক্ষা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বালকাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের নানা রকম হাতের কাজ ব্যতীত বাহিরের বহু প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে। ছাত্রদের হাতের কাজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রেলগাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ, বিভিন্ন রকম খেলনা, নানারকম চিত্র ও চার্টের মাধ্যমে ভারতের লোক-গণনা, ভারতের কোথায় কি ফসল পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক কি রকম ঘর-বাড়ীতে কিভাবে বাস

করে এবং আদি-মানুষ কিভাবে ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে ইত্যাদি বিষয় বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা রকম আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা ছিল; পুতুলনাচ, শারীরিক ব্যায়াম, চলচ্চিত্র, যাত্রা, ভজন-সঙ্গীত, কীর্তন, রামায়ণ-গান, মহাভারত, ভাগবত ও গীতাপাঠ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎসবের প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু সাধু ও ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। বিরাট সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের মধ্যে আনন্দানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাত দিন যাবৎ হাজার হাজার নরনারী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই এই প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে। রবিবার দিন সন্ধ্যায় প্রায় ৫০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল; এই দিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বহু নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

নরেন্দ্রপুর ঃ পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গত ১৮ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় দেখানো হয়। মেলায় অনেক দোকানপাট বসে।

আনন্দদায়ক কর্মসূচীর মধ্যে যাত্রা, গাদিখেলা, বাজিপোড়ানো উল্লেখযোগ্য। উৎসবের শেষ দিন কৃষক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কৃষক-প্রতিনিধিগণ আসিয়া কৃষি-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

পুরস্কার-বিতরণোৎসব

বেলুড় বিদ্যামন্দির ঃ গত ২৬শে ফেব্রুআরি রবিবার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহে অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্য অতিথি এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র তাহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

তদনন্তর কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি বলেন, বিদ্যামন্দির বর্তমানে (বি. এ. ও বি. এস-সি) ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই বিদ্যামন্দির সহ আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—যথা শিক্ষণ-মন্দির (বি. টি. কলেজ), শিল্পমন্দির (লাইসেন-সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), সমাজসেবা শিক্ষণ কলেজ (S.E.O.T.C.), তত্ত্বমন্দির (উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র) প্রভৃতি লইয়া প্রস্তাবিত 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভাপতি ডক্টর ত্রিগুণা সেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যয়নানুকূল শান্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষক-গণের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক ছাত্র-গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিদ্যামন্দির শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড: বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা:

আগস্ট: কর্মযোগ; ধর্ম ও বিশ্বাস; ভক্তিযোগ; ঈশ্বরানুভূতির লক্ষণ

সেপ্টেম্বর: আত্মাকে জানিবার উপায়; ধ্যান ও আনন্দ; প্রার্থনা কাহাকে বলে? মুক্তির পথ।

অক্টোবর: ঈশ্বরের মাতৃভাব; তত্ত্বমসি; আধ্যাত্মিক অনুভূতি কি? রাজযোগ; ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে প্রেম।

নভেম্বর: পুরুষকার ও শরণাগতি; মৌনাভ্যাস; সদাচার।

ডিসেম্বর: শ্রীশ্রীমা; যোগ কি সাধ্যায়ত্ত? অবতার-বাদ; খৃষ্ট বলিতে কি বুঝি?

এতদ্ব্যতীত আগস্ট মাস ছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে কঠোপনিষদের ক্লাস হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা:

আগস্ট: গীতার অধ্যাত্ম উপদেশ; দৈবী লীলা; অনন্তের সন্ধানে; শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন।

সেপ্টেম্বর: মনোনিবেশ ও সুখ; বিশ্বাস ও যুক্তি; মুক্তির উপায়; অধ্যাত্ম জীবনে আদর্শ।

অক্টোবর: বিশ্বজননী; বাসনা ও তাহার পরিপূর্তি; তুমিই ব্রহ্ম, ধ্যানের প্রণালী; যোগ-বিজ্ঞান।

নভেম্বর: সেবায় আনন্দ; বিধিলিপি ও ঈশ্বর; নীরবতা।

ডিসেম্বর: আধ্যাত্মিক রূপান্তর; শ্রীশ্রীমা; মানবতা ও ঈশ্বরত্ব; খৃষ্টবাণী।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বারাসত: গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও রামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ও স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী', এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল 'শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বাবুগঞ্জ (হুগলি): হুগলি জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত হুগলি বাবুগঞ্জ-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্কে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিবসে শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, আরতি, মহাভারত পাঠ, রামায়ণগান, কালীকীর্তন, চণ্ডীগান, লীলাকীর্তন, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ই ফেব্রুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করেন। ১৯শে ফেব্রুআরি ৫,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আজমীরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মসভা হয়। ৭ই ফাল্গুন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোহন সিংহ মেহতার সভাপতিত্বে স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। স্বামী শিবরূপানন্দ, পণ্ডিত কিষনলাল ত্রিবেদী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আরও তিন চারি দিন আজমীর, কিষণগড় ও জয়পুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদ আলোচিত হয়।

রৌরকেলাঃ ১৭ই ফেব্রুআরি তিথিপূজা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে ফেব্রুআরি সকাল হইতেই ধর্মমূলক নানা কর্মসূচী পালিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় রৌরকেলা ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসাম্বশিবম্ (S. Sambasivam)-এর পৌরোহিত্যে একটি সভায় কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। সভারম্ভের পর বহু সভ্যের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত সভাতেই নির্দিষ্ট বিষয়ে (আণবিক যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজন অছে কি না ?) স্বামী মহানন্দ এক স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজী ভাষণ দেন। শ্রীভেঙ্গুস্বামী (S. Venguswamy, Finance Officer) শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী ইংরেজীতে আলোচনা করেন। সভাশেষে জেনারেল ম্যানেজার মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাষায় সভার বক্তব্যাদি বিশ্লেষণ করেন। সভায় বহু দক্ষিণ-ভারতবাসী, উৎকলবাসী, শিখ, বাঙালী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাঙালীদের আগ্রহে স্বামী মহানন্দ তাঁহাদের প্রশ্নোত্তরে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব এখানে এই প্রথম।

কৃষ্ণনগরঃ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ ও শঙ্কর মিশনের মহাবীরচৈতন্য 'স্বামীজী' সম্বন্ধে বলেন। দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর বিশেষ পূজা হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্নে সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে বলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর পরেশনাথ ভট্টাচার্য (সভাপতি)। আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রে কালীকর্তন হয়।

কলাইঘাটাঃ গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে কলাই-ঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নানা পবিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বহু ভক্ত নরনারী ও বালকবালিকার সমাগমে উৎসব-প্রাঙ্গণ সারাদিন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে। প্রাতে পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির পর দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ স্থানের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু বিশাল বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া কয়েক সহস্র ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ। উৎসব-প্রাঙ্গণে সরকার কর্তৃক একটি নলকূপ

স্থাপিত হওয়ায় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ধর্মসভায় স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত কিছু বলিবার পর স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বিশদভাবে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের উদ্বোধন

গত ১০ই মার্চ দক্ষিণ দমদমের নয়াপট্টি রোডে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের পরিচালনায় মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আবাসিক কলেজের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। বিদ্যায়তনটির নাম 'বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন' রাখা হইয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে এই আবাসিক বিদ্যায়তনে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইবে।

কলিকাতার কাছেই যশোহর রোডের ধারে মনোরম পল্লী-পরিবেশের মধ্যে ৩৩ বিঘা জমির উপর এই সম্পত্তিটি রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনকে দান করেন দমদমের বদান্য নাগরিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নির্মীয়মাণ বিদ্যায়তনটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়া রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেন যে, এই বিদ্যায়তনটিতে প্রাচীন গুরুকুল প্রথার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য সম্পাদিকা যথাযোগ্য সরকারী আনুকূল্যের আবেদন জানান। প্রধান অতিথি রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় দুর্বলতা, তাহার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন স্থান নাই। স্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শই আজ প্রয়োজন। ডঃ রমা চৌধুরী বলেন যে, এই বিদ্যামঠ যেন একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মূর্ত প্রতীক হইয়া উঠে।

স্বামী মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলেন, রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আইনতঃ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও একেবারে পৃথক্ নয়, আদর্শের দিক দিয়া ইহা রামকৃষ্ণ মিশনেরই পরিপূরক। নারীজাতির সমস্যার সমাধান নারীরাই করিবে—স্বামী বিবেকানন্দের এই ইচ্ছাকে রূপায়িত করিবার জন্য গত বৎসর সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীগণ রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন গঠন করেন। এখানে তাঁহারা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পতাকাতলে ত্যাগ ও সেবাদর্শে নারীজাতি ও শিশুদিগের কল্যাণোদ্দেশ্যে কার্যসূচী অনুসরণ করিবেন। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা যে ঈশ্বরেচ্ছার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার একটি নিদর্শন—এই মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই দমদমের দানশীল অধিবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই সুবিস্তৃত জমি ও বাড়ী মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন।



ত্রিশরণ-মন্ত্র

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।।

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি।
আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করি।
আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করি।

ভিক্ষুরা এই ত্রিশরণ-মন্ত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেন :

আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি; তিনি পূর্ণতা-প্রাপ্ত, পবিত্র ও সর্বপ্রধান। বুদ্ধের নিকট আমরা উপদেশ ও জ্ঞান পাই। তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি সত্তার স্বরূপ জানেন, তিনি ভূমণ্ডলের অধীশ্বর,···তিনি দেব ও মনুষ্যের শিক্ষক, আদর্শ পুরুষ বুদ্ধ। আ সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থা স্থাপন করি।

অ, ম ধর্মের শর লইতেছি; মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সুফল প্রসব করিয়াছে; মনুষ্যের নিকট ইহা প্রকাশিত, ইহা দেশ ও কালের অতীত। ইহা প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা সকলকে আহ্বান করে। ইহা মঙ্গলজনক; জ্ঞানিগণ স্বীয় অন্তরে ইহা উপলব্ধি করেন। আমি সবিশ্বাসে ধর্মে আস্থা স্থাপন করি।

আমি সংঘের শরণ লইতেছি; বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে ন্যায়মার্গ প্রদর্শন করেন। বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হইতে শিক্ষা দেন, বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সত্যপালনে শিক্ষা দেন, ঐ সম্প্রদায় পরোপকারে নিরত। আমি সবিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ে আস্থা স্থাপন করি।

কথাপ্রসঙ্গে

একটি 'আধ্যাত্মিক' ধর্মের সন্ধানে

[প্রস্তাবনা]

পৃথিবীতে যে ধর্মের অভাব আছে, এ কথা কেহ বলিবে না; বরং ধর্মের বাহুল্যই নানাবিধ অশান্তির কারণ, এই কথাই অনেকে বলিয়া থাকেন; অনেকে তাই 'ধর্ম'কে বাতিল করিয়াই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টাশীল।

তবে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন, বর্তমান যুগের সর্ববিধ দুঃখের কারণ ধর্মভাবহীনতা; অর্থাৎ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভাব না থাকিলেও ধর্ম-আচরণের অভাব যথেষ্ট আছে, এবং সর্বত্র মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইতেছে। যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তবে ধর্মের—তথা মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এই উভয়বিধ কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; তথাপি মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃত সত্য কোন্‌টি? গোলমাল শুরু হইয়াছে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ লইয়া। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষ 'ধর্ম' বলিতে ঠিক একই বস্তু বুঝে না, একই দেশে বিভিন্ন সময়ে 'ধর্মে'র অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে। ধর্মের পরিবর্তনশীল রূপের পশ্চাতে তাহার চিরন্তন রূপটি ধরিতে হইবে। সেইটিই ধর্মের 'আধ্যাত্মিক' রূপ; তাহারই সন্ধানে আমরা চলিয়াছি।

তৎপূর্বে ধর্মের বিরোধিতার কারণগুলি অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ মানব কেন ধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

ধর্মের বিরোধিতা একটা নূতন কিছু নয়। ধর্ম যতদিনের, ধর্মের বিরোধিতাও ততদিনের; মানব-প্রকৃতিতেই দেহবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ—দুই বিরোধী ভাব রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। দেহবাদীর ধর্ম জড়বাদ (materialism), অতীন্দ্রিয়বাদীর ধর্ম আধ্যাত্মিকতা বা চৈতন্যবাদ। তবে দ্বিতীয়টিকেই আমরা 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

কখন কখন দেখা যায়—শুধু অসৎ ব্যক্তিরাই ধর্মের বিরোধিতা করিতেছে, সৎ ব্যক্তিরা সেই বিরোধিতা দূরীভূত করিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কোন কোন যুগে দেখা যায় বুদ্ধিমান্ এবং সৎ-রূপে পরিচিত ব্যক্তিরাও ধর্মের বিরোধিতা করিতেছেন—যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। তখনই ব্যাপারটি সমস্যার আকারে দেখা দেয়। বর্তমানে এইরূপই হইয়াছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ—যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের নামাঙ্কিত পতাকা বহন করেন, তাঁহারা সেই সেই ধর্মের প্রচারিত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন না; তাঁহারা ভুলিয়া যান—ধর্ম শুধু প্রচারের জিনিস নয়, আচরণের জিনিসও বটে—'আচারপ্রভবো ধর্মঃ'।

ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধর্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক (mythological) এবং শাস্ত্রীয় (classical) বিশ্বাস—ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট (Inspired) বা ঈশ্বর-প্রকাশিত (Revealed)।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ (anthropologist) মানবমনের ক্রমবিকাশের পথেই ধর্মভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাকালের সাহিত্য এবং আদিম বা তথাকথিত অসভ্য জাতিদের জীবনযাপন-

প্রণালী, সমাজবিন্যাস, পরলোকবিষয়ক ধারণা হইতে তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

পূর্বপুরুষের উপাসনা ও প্রকৃতি-উপাসনাকে তাঁহারা ধর্মের মূল বলিয়া মনে করেন। এই দুই ভাবের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'এই দুই আপাত-বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে একটি তৃতীয় ভাবের ভিত্তিতে; আমার মনে হয়— উহাই ধর্মভাবের বীজ, তাহাকে আমি বলি— ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিবার সংগ্রাম।'

আদিম মানবের নিকট বাঁচিয়া থাকাই ছিল প্রধান সমস্যা। সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা, সামান্য যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রসহায়ে খাদ্যসংগ্রহ, ঝঞ্ঝা বন্যা ও বন্যপশু হইতে জীবনরক্ষা করা বড় সহজ কাজ ছিল না। বহিঃপ্রকৃতির দুর্ধর্ষ শক্তির নিকট প্রণত হইয়া বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক। ক্রমশঃ ঐ সকল শক্তির অধিষ্ঠাতা-দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে উপহার রাখিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা একটি রীতিতে পরিণত হইল। পিতামাতা ও পূর্বপুরুষগণ সন্তানের প্রতি স্নেহশীল, তাহাদের জীবনরক্ষায় তৎপর; মৃত্যুর পর তাঁহারা যেখানেই থাকুন, সন্তানের কল্যাণ করিতে তাঁহারা সর্বদা আগ্রহান্বিত ও শক্তিমান্—এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধা পূর্বক তাঁহাদের স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাও নিয়মিত কর্মের অঙ্গীভূত হইল।

কোন দেশে দ্বিতীয়টি, কোন দেশে প্রথম ভাবটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; উভয়তই উদ্দেশ্য—সীমার সংকীর্ণতাকে জয় করিয়া জীবনের গতিপথ অপ্রতিহত করা। ইহা এক প্রচণ্ড শক্তির সাধনা; দুর্বল কাপুরুষের জন্য সতত-সংগ্রামপূর্ণ এই সাধনা নয়।

বহিঃপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-শক্তির তারতম্য অনুসারে দেবতারও তারতম্য হইতে লাগিল। পরিশেষে একটি দেবতা সর্বপ্রধান হইলেন, তিনি সর্বশক্তিমান্ পিতা প্রভু বা রাজা-রূপে প্রার্থিত ও উপাসিত হইতে লাগিলেন—ইহাই একেশ্বরবাদের (Monotheism) জন্মকাহিনী!

একেশ্বরবাদই ধর্মের একমাত্র রূপ নয়, ইহাকেই ধর্মভাবের শেষ সোপান বা শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করাও ঠিক নয়। এইরূপ মনে করাতেই ধর্মবিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে।

ধর্মকে যাঁহারা একটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, দেশ-কালপাত্র-ভেদে ধর্মের রূপ বিচিত্র, তবে এই বৈচিত্র্যে একটি স্বরূপগত ঐক্য রহিয়াছে, সন্ধান না করিলে সেটি কখনও ধরিতে পারা যায় না।

ভারতে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করিলে ধর্মের সব ভাবগুলি স্তরে স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়: বহুদেবতাবাদ (Polytheism), সর্বদেবতাবাদ (Pantheism), ভক্তিধর্মে একেশ্বরবাদ (Monotheism), বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নিরীশ্বরবাদ, সর্বোপরি—অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ (Monism বা Non-dualism)।

ভারতের বাহিরে: জাপানে শিন্টোধর্মে পূর্বপুরুষ-উপাসনা শেষ পর্যন্ত বহুদেবতাবাদেই থমকিয়া গিয়াছে। জরথুষ্ট্রের পার্শিধর্ম আলোক-অন্ধকারের— ভাল-মন্দের দ্বৈতভাব (Dualism) অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেমিটিক ইহুদী ও ইসলাম একেশ্বরবাদকেই সারসর্বস্ব ভাবিয়াছে। খৃষ্টধর্ম আবার তাহারই অভ্যন্তরে ত্রিত্ববাদের (Trinity) কল্পনা করিয়া গ্রীকো-রোমান জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চীনে তাও ও কংফুছে ধর্ম অতি উচ্চ তত্ত্ব ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বহু বিচিত্র ধর্মের কতকগুলি আজও প্রাগৈতিহাসিক অবস্থায় রহিয়াছে, কতকগুলি

ধর্মগুরু-কর্তৃক আরব্ধ হইয়া, দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কতকগুলি এখনও ক্রমবর্ধমান। প্রচারশীল ও প্রসারশীল ধর্মের মধ্যে খৃষ্টান ও ইসলামই প্রধান।

দেখা যায়, ধর্মমাত্রেই আচরণ অপেক্ষা আচারই বড় কথা, কতগুলি রীতি-নীতি পালন করাই প্রধান; প্রচারশীল ধর্মগুলির মধ্যে আবার বিশ্বাসই প্রথম ও শেষ কথা—একটি ধর্মগুরু ও একটি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস; সেইজন্য এই ধর্মগুলি Faith (বা বিশ্বাস) নামে অভিহিত।

হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ প্রচারশীল নয়। আর্যেরা অবশ্য অপরকে আর্যকৃষ্টিতে দীক্ষিত করিতেন। ইহুদী ধর্ম প্রথমে প্রচারশীল ছিল, পরে ইহা হিন্দুর মতো জন্মগত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারশীল বটে, তবে তাহার পদ্ধতি বুদ্ধির পথে—বোধির পথে, ধীর মন্থর গতিতে। খৃষ্টান- ও ইসলাম-ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী; ইহাদের প্রত্যেকের ধারণা, একদিন সমগ্র পৃথিবী তাহার ধর্মে ধর্মান্তরিত হইবে, তাহাতেই পৃথিবীর শান্তি ও মানুষের কল্যাণ। পরিতাপের বিষয়—এই স্বতোবিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যেই সংঘর্ষ ও অশান্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে, ইহা তাহারা বুঝিয়াও বোঝে না।

পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, শান্তভাবে প্রচারিত বৌদ্ধের সংখ্যা আজও খৃষ্টান অপেক্ষা অধিক। অসিমুখে প্রচারিত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা নিরীহ হিন্দু অপেক্ষা আজও কম। একটা সাম্রাজ্যবাদী জিগীষু মনোভাবই ঐ প্রচারশীল ধর্মগুলিকে পাইয়া বসিয়াছে।

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইয়া বর্জিত হইতেছে, তখন প্রতিযোগিতামূলক ধর্মপ্রচার সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের মনকে প্রভাবিত করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। শুধু বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম আধুনিক যুক্তিবাদী মনের পিপাসা মিটাইতে অক্ষম।

ধর্মে ধর্মে বিরোধই আজ মানুষের মনকে ধর্মবিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের নামে, মানুষের কল্যাণের নামে যাহারা গালাগালি কাটাকাটি রেষারেষি করে, তাহারা ধর্মাচরণ করিতেছে, না অন্য কিছু করিতেছে, আজ এ কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে; এ কথা ভাবিবার অধিকার মানুষ-মাত্রেরই আছে, এবং আছে বলিয়াই আজিকার মানুষ মনে করে—ঐ ধর্ম জিনিসটা বাদ দিলেই ধর্মসংক্রান্ত সকল বিরোধও অন্তর্হিত হইবে।

ধর্মের অপব্যবহার হইতে বা ধর্ম-আচরণে অক্ষমতা হইতে—ধর্মের মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই এই অবস্থার ও মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমরা বুঝিয়াছি, অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করাই ধর্ম। সংকীর্ণ সীমার বন্ধন হইতে অসীম মুক্তভাব অনুভব করাই ধর্ম।

বর্তমান মানবের ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, ধর্মধ্বজীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিদ্বেষ-পূর্ণ ব্যবহারই উহার প্রধান কারণ। যাঁহারা ধর্মের পতাকা বহন করেন, তাঁহাদের কথায় বার্তায় আচরণে উদার ভাব একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা যে-ঈশ্বরের কথা বলেন ও প্রচার করেন, সেই ঈশ্বর যেমন অনন্তভাবময়, তাঁহার বিষয়ে কথাবার্তাও সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ নিজমনের সংকীর্ণতা

স্বার্থপরতা মলিনতা দিয়া ঈশ্বরের যে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া বলে: ঈশ্বর শুধু একটি বিশেষ গণ্ডীর পরিত্রাতা, তিনি একটি বিশেষ বিশ্বাস-সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য, আমরাই তাঁহার সেই চিহ্নিত স্বজন, ঈশ্বরের রহস্য আমাদেরই কাছে উদ্‌ঘাটিত। আজিকার যুক্তিবাদী মন এ কথা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

যে কেহ আমার ধর্মে, ধর্মশাস্ত্রে বা ধর্মগুরুতে বিশ্বাস করিবে না, সে অনন্ত নরকে যাইবে—এ কথা শুনিয়া বিংশ শতাব্দীর একটি বালকও হাসিয়া উঠিবে! ব্যাপার তখনই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়, যখন এই ভ্রান্তনীতির উপর বিশ্বাস করিয়া মানুষ অপরকে ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করে; এবং স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে ও ধর্মান্তর-গ্রহণে যে রাজী হইল না, সে ইহলোকে বাঁচিয়া থাকার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইল। এ যুগের মানবতাবাদী মন এইরূপ হিংসাভিত্তিক বিশ্বাসকে কখনই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাই আজিকার মানুষ প্রচারশীল ধর্মের এই সাম্প্রদায়িক রূপ দেখিয়া ধর্মের উপরই বিরক্ত। তবু দেশে দেশে মনীষী আজ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধানে প্রাচীন এবং লুপ্ত ধর্মগুলিকেও নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, খুঁজিতেছেন, কোন্ ধ্বংসস্তূপে কি মহামূল্য মণিরত্ন অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের উপর অনাস্থার আরও একটি কারণ, ইওরোপের নব-জাগরণের যুগে অপ্রত্যক্ষ ধর্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করিয়াছিল, এবং ধর্ম-নেতাগণ একাধিক বৈজ্ঞানিককে নির্যাতিত করিয়াছে। সৌরজগতের তথ্য-আবিষ্কর্তা ব্রুনোকে তাহারা জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে, গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, কোপার্নিকাসের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। ধর্ম-নেতাদের এই সকল কুকীর্তি পরবর্তীকালের মানুষ ক্ষমা করে নাই। বৈজ্ঞানিক মন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই প্রকৃতির রহস্য-যবনিকা অপসারিত হইয়াছে, ততই মানুষ ধর্মপুস্তকে লিখিত কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি অস্বীকার করিয়া যুক্তি ও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকেই জীবনের নির্ভরযোগ্য নির্দেশ-দাতারূপে গ্রহণ করিয়াছে। জীবন-ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস আজ আর বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বিজ্ঞানের অপ্রতিহত উন্নতির পর মানুষের যুক্তি আজ ক্লান্ত। দিশাহারা জড়বিজ্ঞান নিজেই আজ চরম প্রশ্নের সম্মুখীন: ততঃ কিম্? জড় সত্য, না চৈতন্য সত্য? জীবনের নিয়ামক যুক্তি, না বিশ্বাস?—বিজ্ঞান, না ধর্ম? বিজ্ঞানকে ধর্মে রূপান্তরিত করা কি সম্ভব? না ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ আছে? … এই প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের মানুষের সুখ ও শান্তি।

In every exact science there is a basis which is common to all humanity, so that we can at once see the truth or the fallacy of the conclusions drawn therefrom. Now the question is, has religion any such basis or not?

Introductory Chapter, Raja Yoga—Swami Vivekananda

চলার পথে

'যাত্রী'

তপস্বী বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত ঊষর বুকে, ভারতে আমরা দুটি মরূদ্যান দেখতে পাই; একটি ধর্মের, আর একটি সাহিত্যের। প্রথমটি ভগবান বুদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মের গ্লানিতে জর্জরিত পৃথিবীকে মুক্ত করতে এলেন শ্রীবুদ্ধ—তাঁর আগমনে ঊষর কর্মকাণ্ডে এল জ্ঞান ও প্রেমের সবুজ স্বীকৃতি। লোকে বুঝল, ধর্ম কি, সত্য কি; আর বুঝল, মহানন্দের আস্বাদন ও সেই নির্বাণের আত্মিক আকর্ষণ কি?

বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণধারা যখন মুমূর্ষু, যখন তাতে অসাহিত্যের গ্লানি নানান শৈবালদলের অসংখ্য বাধা দিয়ে সাহিত্যের সহজ প্রবাহটিকে নিরুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তখন বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর আগমনে সাহিত্যের মজানদীতে এল প্লাবন, এল জোয়ার। সাহিত্যের মরা-খাতে জাগলো ভরা-ভাদরের উচ্ছ্বসিত তটপ্লাবী স্রোতসহস্রী। বাংলা সাহিত্যের এই সুরধুনীর নব ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠে আবার আমরা শুনলাম মানুষের মর্ম-বাণী—ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী। বেদান্তের অভীমন্ত্রে—ঋক্-মন্ত্রের মৃত্যুতরণ-তীর্থে স্নান করেই তিনি শোনালেন—'মরণকে তুই পর করেছিস ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই।' ভারতাত্মার মহিমময় রূপটিকেও ঐ সঙ্গে তিনি বাঙ্ময় ক'রে তুললেন, গাইলেন—'আলয় গড়িতে সবে চায়, যবে হায়, প্রাণপণ করে তাহা সমাপন, খেলারি মতন ভেঙে যায়।' কঠোপনিষদের সেই সাবধানী বাণী—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ'—শুনেও মানুষ যুগে যুগে সেই দুর্গম পথেই অধরাকে ধরার জন্য অভিযান চালিয়ে গেছে; সেই মরণজয়ী অভিযানের মূল সুরই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত—'উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে।' আবার বলেছেন—'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।'

কিন্তু এই সন্ধানী আলোর নির্দেশ আমরা মানি কই? আর মানি না বলেই তো সংসারে জড়িয়ে পড়ি। সংসারের 'সং' ও 'সার' এই দুই-এর মাঝে 'সং' সেজেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিই—'সার' আর লাভ করা হয় না। শেষের সেই দিনে তাই অনুশোচনা জাগে। তখন কিন্তু জীবনের সেই অকেজো দিনগুলোকে আবার কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা থাকে না। শুধু এক মর্মন্তুদ হাহাকার মার্লোর 'ডাঃ ফাউস্টস্'-এর মতোই ক্রন্দনাতুর হয়ে বলতে চায়—'...for the vain pleasure of twenty years hath Faustus lost eternal joy and felicity.' জীবনের এই অযথা ফুরিয়ে-যাওয়া, মরচে-পড়ে-যাওয়া জীবনটাকে তখন কেমন যেন বিস্বাদ ও নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হয়; মনে হয়—'How dull it is to pause, to make an end, to rust unvarnished, not to shine in use! As though to breathe were life.'

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিক ভাষায়—'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত? উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা। প্রাক্-পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত, বিগত সবাই, তুমি অসহায়

একা !' জীবনের এই অসহায় 'একা' অবস্থার সৃষ্টিকর্তা আমি নিজেই। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বললেন—'আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন ; মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে, দেখি না এ জগতের প্রকাশ্য জীবন।' সেই প্রকাশ্য জীবন দেখতে হ'লে আমার আমিত্বকে বৃহত্তর জীবন-চৈতন্যে বিছিয়ে দিতে হবে। একটা প্রীতিস্নিগ্ধ সহানুভূতি দিয়ে সকলকে আপন মিত্র বলে কাছে টানতে হবে ; গাইতে হবে যজুর্বেদের ভাষায় : 'দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে, মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।'—হে মহাবীর, জরা-জর্জরিত আমার শরীরকে দৃঢ় কর ; সর্বজীব যেন আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে ; আমিও যেন সর্বভূতকে মিত্রের চোখে দেখি ; সকলে আমার প্রিয় হোক, দ্রোহহীন শান্তিতে আমার জীবন প্রবাহিত হোক—(৩৬।১৮)। এই ভাবে সকলকে আপনার বোধ করবার পূর্বেই আমার সত্যকারের আমিত্বকে চিনতে হবে। দেহসর্বস্ব 'আমি'কে চিনলে হবে না। কারণ দেহটা তো আকাশের রামধনুর মতোই সুন্দর, আবার রামধনুর মতোই একদিন তা মিলিয়ে যাবে। তাই দেহাতীত 'আমাকে' চিনতে হবে। বলতে হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—'I shall not die. Although this body, when the spirit tires, Of its cramped residence, shall feed the fires, My house consumes, not I'.

এই বিশ্বানুভূতির কথা স্মরণ করেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আমায় তুমি ফুলে ফুলে ফুটিয়ে তুলে দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে ; আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে ; আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে নূতন ক'রে পেলে।' এইখানেই সীমিত জগতের সঙ্গে উদার পৃথিবীর সংযোগ। দেহবৃন্তের 'আমির' সঙ্গে অন্তরাত্মার পরিস্ফুটন।

আমাদের অতীতের মধুর স্মৃতির বৃথা রোমন্থনে ডুবে থাকবার অধিকার নেই। আমাদের চলতে হবে—'চরৈবেতি' আমাদের আদর্শ। কবির ভাষায় আমরা ব'লব : 'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে, তাকাস্‌নে ফিরে ; সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি মহাস্রোতে, পশ্চাতের কোলাহল হোতে অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

এই 'অকূল আলোতে'—এই নবজীবনের প্রতিশ্রুতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ আবার শ্রীবুদ্ধের মহাদানকে বহুভাবে স্বীকার করেছেন। তাইতো তাঁর কাব্যে, তাঁর লেখায় বুদ্ধের এত প্রশস্তি, এত জয়গান। তাঁকে স্মরণ ক'রে কত কবিতা—কত কথিকাই না রবীন্দ্র-রচনায় রূপ পেল। বুদ্ধের মহান্ ধর্মের প্রতি কবির একটা গভীর অনুরাগ ছিল ; একটা সত্যশরণ বিশ্বাস-বলেই তিনি আনন্দে অভিষিক্ত নূতন জীবন-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়ে ক্ষমাসুন্দর তথাগতের উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন : 'শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য, করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।'

বৈশাখের কবি-মনের বস্তুরূপ আবার তাই বৈশাখের তথাগতের ভাবরূপের অসামান্য শিল্পায়নে প্রগাঢ় ও প্রসন্ন হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে রেখেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ছেড়ে বিশ্বকেন্দ্রিক জীবনের পথে তাই তারা পাল তুলেছে কি এক আলোক-বার্তার আহ্বানে—সেই মহাজাগৃতির ছন্দোময় সুষমায়, যেখানে বিশ্বাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি-সাধনার নিয়মহীন আত্মস্ফূর্তি স্বচ্ছন্দে বিকশিত হয়ে আছে এক অপূর্ব মৈত্রীতে।

বৈশাখের এই রুক্ষ মূর্তির পরিবেশ থেকে, তোমার স্বপ্নিল মনের ঘুম থেকে উঠে এগিয়ে চল পথিক, সেই যোগ-সাধনার পথে—সেই সহজ মিলনের পথে, যেখানে দূরের ঐ দিগন্তে পৃথিবীর মাটিকে আকাশের নীল আলিঙ্গন ক'রে রেখেছে। মনে রেখ, পৃথিবীর পরিচিত পথ ধরেই তো তোমাকে অপরিচিতের সন্ধানে যেতে হবে। বাইরের সৌন্দর্যের মাঝেও আন্তর সৌন্দর্যের দিব্যদ্যুতিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে অফুরন্ত রহস্য আস্বাদন করতে হবে। তাই বলি, দৃশ্যমান জগতের ছবি ধ'রে অদৃশ্য সত্তার রসাত্মক মাধুর্যে অবগাহন করবে চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বৈশাখে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার বসন্ত এলো বনে বনান্তরে।
পুরাতন ধরণীর নাড়ীর ভিতরে
কল্লোলিয়া আসে নব প্রাণের জোয়ার।
খুলে যায় জীবনের তোরণ-দুয়ার
দিকে দিকে। পুরানোর আবরণ চিরে
জয়ধ্বজা উড়াইয়া আসিল বাহিরে
নবীনের বার্তাবহ পথিকের দল!
জীর্ণপত্র ঝরাইছে বাতাস চঞ্চল।

তোমার কৃপায় বায়ু—বহিবে না সে কি?
আমার অন্তরে মস্ত—মৃত আর মেকী
জড়ো হয়ে আছে আজও, যাবে না ঝরিয়া?
শ্যামল পল্লবে দিলে অরণ্য ভরিয়া;
প্রাণের ঐশ্বর্যে মোরে করিবে না ধনী—
চরণের স্পর্শ দিয়ে হে পরশমণি?

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

'কঠ'-শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন, 'পরাঞ্চি খানি' (২।১।১)—অর্থাৎ মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহির্মুখ। জন্মাবধি মানব ইন্দ্রিয়সহায়ে রূপরসাদি বিষয়ভোগের জন্যই লালায়িত। সুখ মানুষের কাম্য। বিষয়প্রাপ্তি ও তাহার ভোগে মানুষ সুখ অনুভব করে, তাই সকলেই বিষয়কে এত ভালবাসে।

কিন্তু কোন পার্থিব বিষয়ই তো দীর্ঘস্থায়ী নহে। স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-গৃহ, অন্নপানাদি সবই যে কোন্ অদৃশ্য নিয়মের বিধানে কালের করাল কবলে নিমেষে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়! আবার বিষয় হস্তগত থাকিলেও রোগাদি নানা প্রতিবন্ধবশতঃ ভোগসামর্থ্য বিলুপ্ত হইলে মানুষ ব্যর্থতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কারপূর্বক দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। ইহাই মনুষ্যজীবনের যথার্থ চিত্র।

বিষয়ভোগে তাৎকালিক তৃপ্তি হইলেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ—মানুষ তাহাতে কখনই পায় না। জীবনের শত আশা প্রতিহত ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে কোন কোন ভাগ্যবানের চিত্তে তখন এই চিন্তা জাগ্রত হয়: দুঃখবিরহিত যথার্থ সুখ কোথায়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের কী উপায়?

যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিত্য সুখ বলিয়া কিছু না থাকিত, তবে মানুষের প্রাণে উহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে কেন? কই একান্ত 'অসৎ' বন্ধ্যাপুত্রজাতীয় কোন বস্তু লাভের কামনা তো কাহারও হয় না? সুতরাং এমন বস্তু—দুঃখসংস্পর্শবিরহিত শাশ্বত সুখ—নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানব-মনে আকুল আগ্রহ। এই নিত্য সুখ বা অমৃতত্ব লাভের কথাই পূর্বোক্ত শ্রুতি (কঠ ২।১।১) পুনরায় বলিতেছেন:

কশ্চিদ্‌ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

—বিষয়বিমুখ চিত্তে কোন কোন অমৃতত্বাভিলাষী পুরুষ প্রত্যগাত্মজ্ঞান লাভকরত সেই নিত্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। মুমুক্ষুর 'আবৃত্তচক্ষুঃ'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়-বিমুখতা বা বৈরাগ্যই এই আত্মজ্ঞানবিকাশের সর্বপ্রধান সাধন—ইহাই শ্রুতির নিজ-মুখের ঘোষণা। বিনা মূল্যে জগতে কোন বস্তুই লাভ হয় না। কিন্তু এই আত্মবস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি বড়ই কঠিন মূল্য নির্ধারণ করিলেন। যে চিত্ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবমান, তাহাকে বিষয়বিমুখকরত অন্তর্মুখ করিতে হইবে। এ যেন সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইয়া লইবার সুকঠিন প্রয়াস। সুতরাং মুমুক্ষুর বৈরাগ্য-সাধনার জীবন আরামের জীবন নহে।

অন্তরে আনন্দস্বরূপ আত্মদেবের নিত্য অধিষ্ঠান, তাঁহাকে জানিতে হইবে; তবেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি; 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ' (শ্বেঃ ৫।১৩) — আত্মজ্ঞানেই সর্ববন্ধননিবৃত্তি।

'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' (শ্বেঃ ৬।১২)—অদ্বিতীয় আত্মাকে যাঁহারা স্ববুদ্ধিস্বরূপে সাক্ষাৎ অবগত হন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্যের নহে।

এই প্রকার অসংখ্য শ্রুতিবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। আলোক ও অন্ধকারের সহাবস্থানের ন্যায় চিত্তের বাহ্যবিষয়প্রবণতা ও আত্মমুখীনতা একই কালে হওয়া অসম্ভব। বিষয়বিমুখ না হইলে চিত্ত অন্তর্মুখ হইতে পারে না। সুতরাং নিত্য আত্মসুখলাভের পথে বৈরাগ্যই মূলমন্ত্র। ইহাতেই অধ্যাত্মজ্ঞান-সাধনার প্রারম্ভ বা সূত্রপাত এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত সাধকের নিত্য সহচর বা অঙ্গভূষণ।

বৈরাগ্যের স্বরূপ, উহার প্রকারভেদ, তৎসাধনের উপায় এবং উহার স্বাভাবিক পরিণতি সন্ন্যাস—ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈরাগ্য

'রঞ্জ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় প্রয়োগ-দ্বারা 'রাগ' শব্দ নিষ্পন্ন। অর্থ—ঈপ্সিত বস্তুতে রতি বা প্রীতি। বি+রাগ=বিরাগ, অর্থ—বিষয়ে প্রীতিরাহিত্য।

বিরাগ+ষ্ণ্য=বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাসবশতঃ বিতৃষ্ণা।

বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণাই মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান। বৈরাগ্য দুই প্রকার—অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য।

অপর বৈরাগ্য

অপর বৈরাগ্য নামভেদে চারি প্রকার হইয়া থাকে, যথা: (১) যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার।

(১) সংসারে সার বস্তু কি ও অসার বস্তুই বা কি, ইহা গুরু ও শাস্ত্র সহায়ে জানিব—এই প্রকার উদ্যোগের নাম 'যতমান বৈরাগ্য'।

(২) চিত্তগত রাগদ্বেষাদির মধ্যে বিবেক সহায়ে এতগুলি দোষ আমার নিবৃত্ত হইয়াছে এবং এতগুলি এখনও বিদ্যমান, চিকিৎসকের ন্যায় এই প্রকার বিচার-করত বিদ্যমান দোষ-সমূহের নিবৃত্তির জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাকে 'ব্যতিরেক বৈরাগ্য' বলে।

(৩) ঔৎসুক্যবশতঃ মনে বিষয়তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দুঃখাত্মকবোধে সর্ব-ভোগ্যবিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরোধের যে প্রযত্ন, উহা 'একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য' নামে প্রসিদ্ধ।

(ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য পদার্থে তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবেক-তারতম্য-বশতই পূর্বোক্ত 'যতমানা'দি ত্রিবিধ ভেদ)।

(৪) ইহ ও পরলোকের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সর্বথা যে বিতৃষ্ণা, জ্ঞানপ্রসাদরূপ সেই চিত্তবৃত্তির নাম 'বশীকার বৈরাগ্য'।

এই 'বশীকার বৈরাগ্য' সম্বন্ধেই ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৫)। এই বৈরাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। (গীতা, মধুঃ টীকা ৬।৩৫ দ্রঃ)

পূর্বোক্ত চারি প্রকার 'অপর বৈরাগ্যে'র শেষোক্ত 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যও মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা:

(১) স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় পদার্থের নাশে সংসারে তাৎকালিক ধিক্কার বুদ্ধিপূর্বক ঐ বিষয়-সমূহের যে ত্যাগেচ্ছা—তাহা 'মন্দ বৈরাগ্য'।

(২) বর্তমান জন্মে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি আমার অভিলষিত নহে, এই প্রকার স্থির বুদ্ধিপূর্বক বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাকে 'তীব্র বৈরাগ্য' বলে।

(৩) পুনরাবৃত্তিযুক্ত ব্রহ্মলোকপর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ভোগ-ত্যাগেচ্ছা 'তীব্রতর বৈরাগ্য' নামে অভিহিত।

সন্ন্যাস

'মন্দ বৈরাগ্য'-বান্ পুরুষের কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই। শ্রুতি বলিতেছেন :

যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥
(মৈত্রেঃ উপঃ ২।১৯)

—অর্থাৎ সর্ববিষয়ের প্রতি যথার্থ বৈরাগ্য চিত্তে জাগ্রত হইলে তখনই বিবেকী পুরুষ সর্বকর্মসন্ন্যাস করিবেন, বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি ভ্রষ্ট বা পতিত হইবেন।

বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাস চারি প্রকার হইয়া থাকে। যথা : (১) কুটীচক, (২) বহূদক, (৩) হংস ও (৪) পরমহংস।

মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য 'কুটীচক' ও 'বহূদক'—এই দুই প্রকার সন্ন্যাস বিহিত। যে তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থযাত্রাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহার 'কুটীচক' সন্ন্যাসে অধিকার; যাঁহার সেরূপ সামর্থ্য আছে, তিনি 'বহূদক' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'কুটীচক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী ও স্বপুত্রগৃহে ভিক্ষাগ্রহণকারী

'বহূদক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড-, শিক্য- (সিকে), জলপবিত্র- (জল ছাঁকিবার বস্ত্র), কৌপীন- ও কাষায়বেশ-ধারী। ইঁহারা তীর্থাটন, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন ও আত্মোপাসনায় রত থাকেন।

তীব্রতর বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পুরুষ 'হংস' সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'হংস' সন্ন্যাসী একদণ্ডী, শিখারহিত, যজ্ঞোপবীতধারী, শিক্য- ও কমণ্ডলু-হস্ত, গ্রামে একরাত্রিনিবাসী এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-অনুষ্ঠানতৎপর।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধসন্ন্যাস-প্রাপক তীব্র ও তীব্রতর বৈরাগ্যই 'বোধসার'-গ্রন্থে আচার্য নরহরি কর্তৃক 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে কথিত হইয়াছে। যথা :

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ।
যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা ॥

—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ ও পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।

তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি।
বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ ॥

—তীব্র সংসারবৈরাগ্যহেতু পুণ্যবান্ পুরুষের চিত্তে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদিত হয়, 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য'ই উহার কারণ।

এই বৈরাগ্যে বিষয়ত্যাগেচ্ছাই প্রধান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে মাত্র।

পরবৈরাগ্য

এখন পূর্বকথিত 'পরবৈরাগ্য' বর্ণিত হইতেছে। এই 'পরবৈরাগ্য' পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার বৈরাগ্য হইতে উৎকৃষ্ট

ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৬)। —অর্থাৎ প্রত্যগাত্মজ্ঞানলাভে তিন গুণের পরিণামস্বরূপ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যের নাম 'পরবৈরাগ্য'। এই পরবৈরাগ্যই নির্বিকল্প সমাধিনামা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। ইহাও যোগসূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা 'তীব্রবেগানামাসন্নঃ' (১।২১)—অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্

পুরুষ শীঘ্রই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই 'পরবৈরাগ্য'ই 'বোধসার'-গ্রন্থে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তিস্তদস্মাভিঃ কিমর্জ্জিতম্॥
ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ।
জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা॥

—দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, বেদান্তবাক্য শ্রবণদ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিতও করিয়াছি, এখন যদি ব্রহ্মবিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলাম? এই প্রকার নিশ্চয়করত বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায় অকস্মাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের এই বৈরাগ্যকে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' বলে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া তাত তীব্রয়া যো বিধীয়তে।
বিরাগো দৃশ্যভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ॥

—তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাবশতঃ যাবতীয় দৃশ্য-পদার্থে যে বৈরাগ্য হয়, তাহার নাম 'জিজ্ঞাসা-মুখ্যবৈরাগ্য'। এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই মুখ্য, বিষয়ত্যাগেচ্ছা তাহার অনুগামী। এই 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য'যুক্ত অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই 'পরমহংস' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'পরমহংস'-সন্ন্যাস

'পরমহংস'-সন্ন্যাসী একদণ্ডধারী, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীত-রহিত, সর্বকর্মপরি-ত্যাগী ও একমাত্র আত্মচিন্তনপরায়ণ।

পরমহংস-সন্ন্যাস—'বিবিদিষা' ও 'বিদ্বৎ' ভেদে দুই প্রকার। প্রত্যগাত্মাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষ যে সর্বকর্ম সন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তাহা 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। শ্রুতি বলিয়াছেন (বৃঃ ৪।৪।২২) :

'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'

—বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রাপ্য আত্মলোকের অভিলাষী হইয়া অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

'ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (মহাঃ নারাঃ ৮।১৪, কৈবল্যঃ ১।৩)—অর্থাৎ কর্মদ্বারা, তথা পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা অথবা গো-সুবর্ণাদি ধনসহায়ে মোক্ষের চরম সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। চিত্তবিক্ষেপের হেতু হওয়ায় ও 'ত্বম্'-পদার্থ-শোধনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং উচ্চাবচ জন্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত যে কর্ম, তাহা ত্যাগকরতই অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনকরতই জ্ঞানমার্গের অধিকারী বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পথে আরোহণ করেন।

'বিবিদিষা সন্ন্যাস'-আশ্রম বিষয়ক আরও শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা : 'এতদ্ বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩।৫।১)। এই শ্রুতি আপাত-বেদনবিশিষ্ট পুরুষের বিবিদিষা-সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন। পুনঃ

'দণ্ডম্ আচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগৃহেৎ শেষং বিসৃজেৎ' (আরুঃ ১)—অর্থাৎ সন্ন্যাসী দণ্ড, শীতনিবারক কন্থা, পরিধানের কৌপীন ও কমণ্ডলু আদিমাত্র গ্রহণ করিবেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য সর্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। পুনঃ শ্রুতি :

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
(নারঃ পঃ ৩।১৫)

—ব্রহ্মলোকপর্যন্ত সর্ব সংসার অসার জানিয়া সারতত্ত্ব পরমাত্মবস্তুদর্শনমানসে পর-

বৈরাগ্যবান্ পুরুষ বিবাহ না করিয়া 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'কেন'-উপনিষদের ভাষ্য-প্রারম্ভে বলিয়াছেন, 'প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞান-পূর্বকঃ সর্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্তব্যঃ'—ঐ স্থলের টীকাতে টীকাকার শ্রীমদ্ আনন্দগিরি বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানস্যানুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বকঃ সন্ন্যাসঃ কর্তব্যঃ। সিদ্ধে চানুভবাবসানে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে স্বভাবপ্রাপ্তঃ সন্ন্যাস ইতি দ্রষ্টব্যম্।'

—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সর্বৈষণা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিধেয়। অপরোক্ষ অনুভব-সিদ্ধির জন্য ঐ পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস কর্তব্য। ইহাই 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। অন্যাশ্রমীর অপরোক্ষ অনুভবের পর সন্ন্যাস স্বভাবপ্রাপ্ত। তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'মুণ্ডক'-উপনিষদের ভাষ্যপ্রারম্ভে বলিতেছেন, "জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্ম-বিদ্যা মোক্ষসাধনং ন কর্মসহিতেতি 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ' (মুঃ উপঃ ১।২।১১), 'সন্ন্যাসযোগাৎ (মুঃ উপঃ ৩।২।৬) ইতি ব্রুবন্ দর্শয়তি [শ্রুতিঃ]।"—

—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় সর্বাশ্রমিদিগের অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের সাধন, কর্মসহিত ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের সাধন নহে, 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ··· ···ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩।৫।১)—এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিতেছেন, 'আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অয়মহমস্মীতি পরং ব্রহ্ম ··ব্যুত্থায় ·· দারসংগ্রহমকৃত্বা ···ব্যুত্থায় কর্মভ্যঃ কর্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্যঃ পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপদ্য ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।'

—অর্থাৎ আত্মবিষয়ক পরোক্ষ বা অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের অনন্তর মুমুক্ষু যাবতীয় কর্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগপূর্বক পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণকরত ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন। —এই শ্রুতিটি সন্ন্যাস-বিধায়ক। পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর যে সন্ন্যাস স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। তাহাতে বিধি হইতে পারে না, কারণ উহা বিদ্বানের অর্থাৎ জ্ঞানীর স্বভাবপ্রাপ্ত।

বিদ্বৎ-সন্ন্যাস

বিবিদিষা-সন্ন্যাস নিরূপণানন্তর একণে 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' বিষয়ে বলা হইতেছে। পূর্ব-জন্মানুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তিসুখ লাভার্থ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন (অথবা যে সন্ন্যাস তাঁহার স্বতই উপস্থিত হইয়া থাকে), তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। জীবন্মুক্তি-সুখলাভই এই সন্ন্যাসের ফল। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন নাই। তিনি অব্যক্তচিহ্ন, অব্যক্ত-আচার। এই কারণেই শ্রুতি-আদিতে কোথাও তাঁহার দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণাভাব, কোথাও বা দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণের কথা বর্ণিত আছে।

বিহিত কর্মের বিধিপূর্বক ত্যাগদ্বারা 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, ইহা পূর্বে শ্রুতিসহায়ে বলা হইয়াছে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে সন্ন্যাসবিহীন কাহারও এই জন্মে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বুঝিতে

হইবে যে, জন্মান্তরীয় 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই তাঁহার বর্তমান জন্মে আত্মজ্ঞানের হেতু। শ্রীসর্বজ্ঞাত্মমুনি স্বরচিত 'সংক্ষেপ-শারীরক' গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যথা :

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ
সংন্যাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র
তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ ॥ (৩।৩৬১)

—অর্থাৎ যদি অধিকারী পুরুষের জন্মান্তরে সন্ন্যাসপূর্বক শ্রবণাদি সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনি যে-কোন আশ্রমেই বিদ্যমান থাকুন না কেন, সেই জন্মান্তরীয় সাধনের বলেই তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে, ইহা আমরা নিষেধ করি না, অর্থাৎ আমরা ইহা স্বীকার করিয়া থাকি।

এই প্রকারে 'পর' ও 'অপর'-ভেদে দুই প্রকার বৈরাগ্যের বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাসের বিবিধ ভেদ আলোচিত হইল। 'পরবৈরাগ্য'-সহকৃত বিবিদিষা-সন্ন্যাসই আত্মজ্ঞান উৎপাদনপূর্বক মুমুক্ষুর ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের একমাত্র হেতু—ইহা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ)

নারায়ণ-সেবা

শেখ সদরউদ্দীন

পথের দু-ধারে প'ড়ে সারা দিনরাত ধ'রে
ক্ষুধাতুর নয়নের নীরে ;
তাহাদের পিছে ফেলি চলিয়াছ অবহেলি
দেবতার মন্দিরে মন্দিরে !

মন্ত্র-তন্ত্র শোন যত, ব্যর্থতায় পরিণত—
ধরমের কথা বোঝ নাই ;
প্রাণহীন স্তব-গাথা, পাষাণে খুঁড়েছ মাথা.
জানো কোথা দেবতার ঠাঁই ?

চেয়ে দেখ দেবতারে মানুষেরি দ্বারে দ্বারে
কেঁদে ফেরে ভিক্ষা-পাত্র হাতে
বুকে তারে ডেকে নাও, এক মুঠো খেতে দাও,
সেবা করো প্রদোষে প্রভাতে ॥

রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র

শ্রীসংযুক্তা মিত্র

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'! আড়াই হাজারেরও অধিককালের ব্যবধান—দুস্তর পারাবার পার হয়ে কোন্ সুদূর হ'তে গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি বাতাসে বাতাসে আজও যেন ভেসে আসে কানে। কত যুগ! কতদিন আগের সে কথা!! মানব-সভ্যতার ইতিহাসের চরণধ্বনির মহালগ্ন! তবু সে লগ্নেরই প্রভায় আলোকিত হ'ল, কত যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার সাধনায় জ্বলে উঠল কত প্রদীপ! ইতিহাসের খোলা পথে কত জীবন ধন্য হ'ল,—নেমে এল কত উত্তাল হৃদয়ের বেলাভূমির উপর পরম করুণার অভয়স্পর্শ। সে 'মাভৈঃ' বাণীর স্বাক্ষর রইল কত কাব্যে—অশ্বঘোষ হ'তে রবীন্দ্রনাথে।

বুদ্ধজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রকাব্যে তিনটি মহা বিস্ময়কর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। তিনটি অপরূপ সৃষ্টি: বাসবদত্তা, প্রকৃতি ও শ্রীমতী। বিষম ধাতুতে গড়া তিনটি নারী-চরিত্র। কবির প্রতিভালোকের স্ফুরণে পাঠকচিত্তে তিনটি পরমরহস্যময় জিজ্ঞাসা।

'বাসবদত্তা' নটী, রূপোপজীবিনী, দেহের যৌবনই তার অর্ঘ্য। কামনার আগুনে রূপের দাহনে প্রদীপ্তা নারীজীবনের বসন্ত-ক্ষণকেই শাশ্বত মনে ক'রে সে মহাসুখী। যৌবনমদমত্তা জনপদবধূ তাই সুনীল আঁচল উড়িয়ে, নূপুরে রুনুঝুনু ঝঙ্কার তুলে, পথিকচিত্তে দোলা লাগিয়ে—রঙ জাগিয়ে পথ চলে। দুই চোখে তার শুধু স্বপ্নের নয়—মোহের কাজল। সে মায়া-কাজলের দৃষ্টিতে জগৎ বড় সুন্দর—জীবন বড় মধুময়। প্রেম?—সে তো চিরন্তন।

এমনই এক বসন্তদিনে যখন আমের মুকুলের মধুগন্ধে বাতাস মন্থর, যখন 'কোকিল কুহরি ওঠে বারবার'—তখন পথ চলেছে বাসবদত্তা। আর ঠিক তখনই সাক্ষাৎ হ'ল তার জীবনের চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে। যে বাঞ্ছিত তার জীবনে আকস্মিক, অনাহূত। একদিকে নটী, অন্যদিকে সন্ন্যাসী; বাসবদত্তা আর উপগুপ্ত; কামনা আর নিবৃত্তি; রূপ আর অপরূপ! প্রগল্‌ভা বাসবদত্তা সেদিন প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, প্রদীপ তুলে দেখেছে শুধু তার 'নবীন গৌর কান্তি'। দেখেনি যে অমর্ত্য শান্তি ও ক্ষান্তি ঐ কমনীয় রূপের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। তাই তার কামনা-কুঞ্জে তাকে আমন্ত্রণ করতে বোধ করেনি সে কোন বাধা। প্রত্যাখ্যানে ভেবেছে কে এই সুন্দর? বোঝেনি এই সুন্দরই জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে আহ্বান ক'রে নিতে—ভুল হ'তে, মোহ হ'তে। যে চেয়েছে তাকে, সে তো পাবেই। কিন্তু যে চায়নি তাকে? সেও পাবে। নইলে প্রভু বুদ্ধের অভয়বাণীই যে মিথ্যা হয়ে যায়! পঙ্ক হ'তে পঙ্কজিনী আহরণই তো এ ব্রতের প্রধান সাধন।

চরম আঘাতের মধ্যে বাসবদত্তা অন্তরের অন্তরে অনুভব ক'রল এই সত্য। জীবনের বসন্তদিনে ক্ষণিক উৎসবের মোহে মুগ্ধ হয়েছিল সে। উৎসব-শেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতোই তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ ক'রে গেল—তারই স্তাবকের দল।

আবার সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা! আবার সেই কোকিল-ডাকা, জ্যোৎস্নাভরা রাত।

আমের মুকুলের গন্ধভরা মন্থর দিন ফিরে এল। চরম অপমান ও ব্যাধির উৎকট যন্ত্রণার মধ্যে বাসবদত্তা আজ উপলব্ধি করেছে জীবনের ক্ষণিকতা। যে মুহূর্তে তার মূর্ছিত হৃদয় উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে দুটি করুণকোমল পায়ের শব্দ, সেই মুহূর্তে সেই সন্ন্যাসীর কোমল করস্পর্শে বাসবদত্তা জেগে উঠল শুধু চেতনায় নয়, প্রজ্ঞার আশ্বাসে। একটি মহাজীবনের স্পর্শের ব্যাকুলতায় সত্যের কোলে ভ্রান্তির লয় হ'ল। একটি অপূর্ব চরম পরিণতির মাঝেই কবিতাটির সমাপ্তি—'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা।'

একদিন চঞ্চল পদ-তাড়নায় সে যার ঘুম ভাঙিয়েছিল, আজ তারই পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ল একটি ঘুম-ভাঙা প্রাণ।

'প্রকৃতি'র চরিত্র-কল্পনা 'বাসবদত্তা'র সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুজনসেব্যা সে নয়, সে বহুজন্ম অবমানিতা। সমাজের একটি কোণে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাগ্যহত জীবনের বোঝা সে নীরবে বহন করে। প্রতিবাদ নয়, বিদ্রোহ নয়, কুণ্ঠিত দীনতায় দিন কাটে তার। পরিচয় তার নারীরূপে নয়—চণ্ডালকন্যারূপে। সামাজিক গৌরব সে জানে না। সে জানে না যে তার চরম আত্মগুপ্তির অন্তরালে একটি চরম বৈভব আছে সুপ্ত। সেটি তার মহা-সম্পদ্‌ময় অন্তর। সমস্ত অপমান ও দীনতার বহু ঊর্ধ্বে যার বিহার। যে শুধু পাবার অধিকারই রাখে না, রাখে দেবারও স্বাধিকার। তাই যেদিন পথশ্রান্ত ভিক্ষু আনন্দ পিপাসার শান্তি—'একটি গণ্ডুষ জল' প্রার্থনা করলেন তারই কুয়ার পাশে এসে, সেদিন সে মহাবিস্ময়ে প্রথম উপলব্ধি ক'রল যে সে শুধু চণ্ডালকন্যা নয়, সে নারী। পরিপূর্ণ নারীত্বের বঞ্চিত প্রসুপ্ত মহিমা সেদিন তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় জেগে উঠল অন্তরে। এই কাহিনীর আভাস কবির 'জলপাত্র' কবিতাতেও পাই। উদাসিনী কন্যার বিহ্বলতা, কাজ-ভোলা ব্যাকুলতা দর্শনে মায়ের বিস্ময়ের উত্তর দিচ্ছে প্রকৃতি:

'সেদিন রাজবাড়ীতে বাজল বেলা দুপুরের ঘণ্টা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। পীত বসন তাঁর। বললেন—জল দাও।' (চণ্ডালিকা)

ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, 'অপরাধী করিও না মোরে'।
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে,—হে মৃন্ময়ী
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা
সেইমত তুমি
লক্ষ্মীর আসন তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোন জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই। (জলপাত্র)

এতদিন সে একটি বিরাট অপ্রাপ্তির অতল অন্ধকারে ডুবে ছিল, শুধু 'না'-এর কণ্টকে ঘেরা ছিল তার জগৎখানি। সমাজে নয়, সংসারে নয়, সম্মানে নয়, বিনিময়ে নয়; প্রতিদানে তার দেবারও নয় কিছু। কিন্তু সব নিষেধের ক্ষুদ্র সীমানা ঐ ভিক্ষু আনন্দের জল প্রার্থনায় চুরমার হয়ে গেল। প্রকৃতির মনে হ'ল: 'কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে। অগাধ অসীম হ'ল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল, সেই জলে ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।'

নতুন বেদনার মাঝে নবজন্ম হ'ল প্রকৃতির। চিত্তে ঘনিয়ে উঠল প্রাপ্তির দুরন্ত ব্যাকুলতা।

পেতে হবে তাকে, যে ঘটালো তার এই নবরূপ, তার রূপান্তর। পেতে হবে তাকে—দূর থেকে নয়, একান্ত প্রিয়তমরূপে। জানাতে হবে– প্রভু, আমি তোমারি।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রকৃতি, শত অনুনয়ে, অশ্রুর প্লাবনে, মায়ের সহস্র নিষেধ প'ড়ল ভেঙে। সম্মত হ'ল সে বশীকরণ-মন্ত্রের নাগপাশ পরিয়ে টেনে আনতে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠকে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, যখন প্রলয়-মন্ত্রের সম্মোহনে অসহায় আনন্দ দৈন্যের ও অপমানের ধূলার উপর দিয়ে প্রকৃতির দ্বারে আসছেন, তখন বিদ্যুতের ঝলকে ঝলকে প্রকৃতির হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার চরম আঘাতে আঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেন সে বুঝতে চাইছে, বুঝতে পারছে যে এই অপমানিত হতজ্যোতি ভিক্ষু তার কাম্য প্রিয়জন নয়, এ যে তারই মতো ধুলোর মধ্যে মিশে মৃন্ময় রূপ পরিগ্রহ করছে। কোথায় তার সেই দিব্য চিন্ময় প্রভা ?

এই অনুভূতির চরম লগ্নেই প্রকৃত নবজন্ম হ'ল প্রকৃতির। সে বুঝতে পারলো—দৈহিক সান্নিধ্যে একান্ত পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নয়। তার আগমনের রথের ধ্বনি মনের মধ্যে আত্ম-জাগরণের ঊষালগ্নে এসে দাঁড়াবে। তার দিব্যজ্যোতির উজ্জ্বল ছটায় সত্যকার মিলন হবে দু-জনার। জৈব কামনায় নয়, হৃদয়ের মণিকোঠার পদ্মবেদীতে পাততে হবে তাঁর আসন। প্রেয় লীন হবে শ্রেয়ে।

তাই আনন্দ যতই এগিয়ে আসছেন নিকট হ'তে নিকটে, ততই নবভাবে জাগ্রতা প্রকৃতি বলছে তার মায়ের ব্যাকুল আকুতির উত্তরে : 'অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়। আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙলো দরজা, ভাঙলো প্রাচীর, ভাঙলো আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে।...... মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে—তার পরে ? তার পরে কি ? শুধু এই আমি ? আর কিছু না।...... শুধু আমি ? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ, শেষ কোথায় এর ? শুধু এই আসাতে ?'

এই আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মধিক্কারের মধ্যে প্রকৃতির চণ্ডাল-সংস্কারের যত অশুচিতা ও অপবিত্রতা দগ্ধ হয়ে—ভস্ম হয়ে গেল। সেই চিতাভস্মে যে উঠে দাঁড়ালো, সে প্রেমিকা নয়—সেবিকা। জৈবিক প্রয়োজনের ভস্মশেষে মহাজীবনের আশীর্বাদধন্যা কল্যাণী নারী। তাই আনন্দ যখন সত্যি তার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ল সে। একদিন পিপাসার শান্তি—একটি গণ্ডূষ জলমাত্র সে তাঁকে দান করেছিল, আজ তুলে ধ'রল তার ভক্তির অঞ্জলি—তার নব রূপান্তরের কুসুম-অর্ঘ্য। 'প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে। তাই এত দুঃখই পেলে—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর ক'রে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে। নইলে কেমন ক'রে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে। ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে—সার্থক হবে সেই ধুলো লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেব মুছে। জয় হোক, জয় হোক, তোমার জয় হোক।'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্য দুটি বুদ্ধ-ভক্ত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়; তাদের নাম শ্রীমতী ও সুপ্রিয়া। অমলিন তাদের জীবনের শান্ত প্রবাহে প্রকৃতি বা বাসবদত্তার মতো বিপ্লবের আভাস নেই। একটি শান্ত, নম্র

অথচ সুদৃঢ় প্রাণশিখা অকম্পিত দ্যুতিতে বিকীর্ণ করেছে সমাজ সংসার।

দুঃখহরণ শঙ্কাতরণ প্রেমের বীর্যে চির অশঙ্কিতা শ্রীমতী। নীরব আত্মনিবেদনে সত্য ও ধর্মের বেদীমূলে উৎসর্গিত প্রাণ তার। প্রতিবাদে সে মুখর নয়, কলহে বিবাদেও সে প্রখর নয়, তবু তার মৌন অস্বীকার কি অচঞ্চল!—কি বজ্রকঠিন!

যেদিন পিতার আসন অধিকার ক'রে মদমত্ত গর্বিত অজাতশত্রুর সীমাহীন দম্ভ 'শোণিতের স্রোতে' রাজপুরী হ'তে পিতার অহিংসা-ধর্ম নিঃশেষে মুছে দিয়ে 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া' অন্য কোন প্রতীকের উপাসনা মৃত্যুদণ্ডের শাসনে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, সেদিন তাঁর নির্মম আদেশের বিরুদ্ধে একটি কণ্ঠও সোচ্চার হয়নি—হ'তে সাহস করেনি। যেদিন রাজমাতা, রাজবধূ, রাজকন্যা হ'তে প্রতিটি পুরবাসী সভয়ে বারবার শুধু শিহরিত হয়েছে, সেদিন নম্র পদক্ষেপে স্তূপপদমূলে শেষ আরতির শিখা জ্বালিয়ে শেষের প্রণাম-নৃত্যে চরম আত্মনিবেদনে যে এগিয়ে এসেছিল, তারই নাম শ্রীমতী; সত্যসঙ্কল্পিতা, আর তাই নির্ভীকা ও অজেয়া।

সুকঠোর রাজশাসন অবহেলাভরে উপেক্ষা ক'রে সেদিন 'শারদ স্বচ্ছনিশীথে' কে জ্বালায় ঐ স্তূপপদমূলে 'যেন সারে সারে প্রদীপমালার মত?' কার এই দুরন্ত সাহস?

'মুক্ত কৃপাণে পুর-রক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল কে তুই, ওরে দুর্মতি?
মরিবার তরে করিস আরতি?'—

কিন্তু দুঃশাসনের বজ্রমুষ্টি কোন দিন সত্যের কণ্ঠরোধ করতে পেরেছে কি? অন্ততঃ কালজয়ী ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই রকম কোন নজীর পাওয়া যায় না। তাই শাণিত অস্ত্রের নীচে হাসিমুখে মাথা পেতে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে শ্রীমতী ঘোষণা করেছে তার আত্ম-পরিচয়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন স্বরে—

'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।'

মৃত্যু-ভ্রূকুটির মুখে এই চরম ঔদাস্যভরা নির্বিকার আত্মঘোষণা ঘন অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই চমকপ্রদ ও মহা-বিস্ময়কর। মর্মমূলে কোন্ সে জ্যোতির করুণা-ঘন অভয় আশ্বাসে শ্রীমতীর এই আত্মবলিদান?

* * *

অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তী নগরীর ক্ষুধিতের অন্নদানসেবার ভার-গ্রহণের মূলেও এই গৌরবেরই পরিচয়! বিশাল জনতার ক্ষুধা মেটাবার ভারগ্রহণে, যেদিন ভগবান বুদ্ধের জিজ্ঞাসার সামনে, শ্রেষ্ঠীরাও আপন অক্ষমতার দীনতা জানিয়েছে, সেদিন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া' সেই ভার হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল—কোন্ অধিকারে? কিসের সাহসে?

সে কি আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিদানে বিশ্বকে আপন ক'রে পাবার মন্ত্র-গুপ্তিতে নয়?

অপরূপ এই জীবনবেদের উদ্গাতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—রাজনটী বাসবদত্তা আর চণ্ডালিকা প্রকৃতি, দেবদাসী শ্রীমতী আর ভিক্ষুণীসুতা সুপ্রিয়া যাঁর ধ্যান-মানসে অমর্ত্য, অরূপ রূপের প্রভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজস্র দানের উপযুক্ত পরিমাপ আজ প্রয়োজন। কবিতা, গান, ছবি ও নাচের সমারোহে বাংলার চিন্তাজগতের এই অধিনায়ক যতটা রসোদ্বেলরূপে পরিচিত, তাঁর স্থিতধী মনীষার পরিচয়—প্রায় ততটা অবহেলিত। পুনরুক্তি হলেও একথা 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী'তে স্মরণীয়। শোনা যায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পাণিনি-ব্যাকরণ পড়ানোর আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য ছিল, ভাষা ও চিন্তার পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলা। বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চার এই অভাবের দিকটি তাঁর কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধ আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্যগুণান্বিত প্রবন্ধেরও প্রকারভেদ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন যে বিষয়ে লিখেছেন, তাই সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে তাঁর মননশীলতার প্রকাশস্বরূপ প্রবন্ধসাহিত্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বিরাট অংশ। আশ্চর্যের বিষয়, আজ অবধি রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সব চেয়ে কম।

তবু এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, এ বিষয়ে যোগ্য আলোচনাকারী বাংলাদেশে নেই। যে কোন কারণেই হোক, আজকের মনীষীরা তাঁদের একটি প্রধান কর্তব্য ভুলে আছেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' পড়তে গিয়ে উপরি-উক্ত কথাগুলি মনে পড়েছিল।

দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যে—এমন কি বাংলা-সাহিত্যের প্রবন্ধ-বিভাগে—'পঞ্চভূত' আপন স্বকীয়তায় অনন্য। তার কারণ, এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশন-ভঙ্গী। সাধারণ প্রবন্ধের মতো তথ্য ও যুক্তির সমাবেশে সিদ্ধান্তসাধন করার মতো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ লেখেননি। নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁর বেশী লক্ষ্য ছিল পাঠকচিত্তে অনুভূতি ও মননশীলতা জাগিয়ে দেওয়া। তাই রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মিলিত-সম্বন্ধ।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা-সাহিত্যের একদিক' বইটিতে 'প্রবন্ধ' ও 'রচনা'র পার্থক্য বিশ্লেষণ ক'রে ব্যক্তিত্বের স্পর্শসমুজ্জ্বল প্রবন্ধকে 'রচনা' নামে অভিহিত করেছেন।[১] ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস্ ল্যাম্বের 'এসেস্ অব্ ইলিয়া' এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই রচনা সাহিত্যের উদাহরণ।

এই রচনা-সাহিত্যের সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে খুব কম দিনের ইতিহাস। জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য রয়েছে। সে বক্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংযোগ

১ আমরা রচনার ভিতর শুধু কতগুলি 'সর্বজনীন ও সর্বকালীন কথা শুনিতে চাই না,—এখানে আমরা পাইতে চাই একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ মানুষকে। তাঁহাকে যে খুব বড় হইয়াই দেখা দিতে হইবে আমাদের দাবী সেরূপ নয়, আমাদের দাবী তাঁহাকে অকৃত্রিমরূপে দেখা দিতে হইবে—তাঁহাকে তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া আমাদের 'আপনার লোক' হইতে হইবে।

—বাংলা সাহিত্যের একদিক : (৩য় সং—পৃঃ ২২)

থাকাটা জ্ঞানের বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়। অথচ এই ব্যক্তিত্বই তথ্যের সঙ্গে প্রাণের যোগসাধন করে। জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানার যে পার্থক্য—প্রবন্ধ ও রচনার সেই পার্থক্য। অনুভবে জানাই সাহিত্যের মর্মকথা।

সাম্প্রতিক কালে 'রম্যরচনা' নামে যে শ্রেণীর রচনা personal essay বা রচনা-সাহিত্যের স্থান গ্রহণে উদ্যত, তাদের সম্বন্ধে পাঠকের একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই শ্রেণীর রচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষণিকপ্রেরণাজাত, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনেই এদের তৃপ্তি। এই স্ফুলিঙ্গধর্মী রম্যরচনার সঙ্গে রচনা-সাহিত্যের পার্থক্য অনেকখানি। রচনাসাহিত্য অনেকটা ধূপের মতো। ধূপের দহন ও সুবাস যেমন একত্র জড়ানো, তেমনি রচনার মনন ও রসানুভূতি একত্র মেশানো।

'পঞ্চভূত' অবশ্যই রচনা-সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। তবে পঞ্চভূতের গঠনভঙ্গীতে প্রবন্ধ, রচনা ও আলোচনা—এই তিনটি পদ্ধতি এসে মিলেছে। প্রবন্ধের তথ্যসন্নিবেশ, যুক্তিপরম্পরা, সিদ্ধান্তপ্রচেষ্টার সঙ্গে রচনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অনুভূতি-বিস্তার এবং আলোচনার বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—এই সব ক'টি লক্ষণে মিলে 'পঞ্চভূত'-প্রবন্ধমালা গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-পূর্বযুগে বাংলাপ্রবন্ধসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পার্থক্য সহৃদয়তায়। পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই সহমর্মীর মতো আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে কোথাও ভুলতে পারেননি। তিনি যে একাধারে স্রষ্টা ও শিক্ষক, কর্মী ও বিচারক—এই কথাটি তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে সর্বত্র সুস্পষ্ট।

প্রবন্ধের যে বিভাগটিকে আমরা 'রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছি, বিশেষভাবে সেই বিভাগের স্রষ্টাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি গভীর জীবনানুভূতি। এই অনুভূতি-সঞ্জাত দৃষ্টির ফলেই সৃষ্টি-রহস্য মানসলোকে ধরা দেয়। অপরূপ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য শুদ্ধমাত্র জীবনানুভূতির অভাবে ব্যর্থ হয়—বাংলা সাহিত্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই জীবনবোধ বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বিচারবুদ্ধিও অনুভবকে সংযমের সীমা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে আমরা যুক্তি ও বুদ্ধির যে শাণিত প্রখরতা অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার পরিবর্তে রয়েছে গভীর উপলব্ধিময় জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনের পটভূমিতেই তিনি সাহিত্য, সৌন্দর্য, সমাজ, রাজনীতি, অধ্যাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফলে, ব্যক্তিবোধের সীমানা রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যে সহজেই চোখে পড়ে। যেখানে তাঁর অনুভূতি ও কল্পনা বিস্তৃত, সেখানে তিনি নিঃসংশয়ে বিজয়ী। যেখানে অনুভবের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেখানে তাঁর অপূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। বিস্তৃত ও বহুমুখী চিন্তার পারস্পরিক সংঘাত ও সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সাধারণতঃ অনুপস্থিত। এক 'পঞ্চভূতে'ই তিনি আলোচনার বিষয়গুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে গেলে পঞ্চভূতের বিভিন্ন চরিত্র শেষ অবধি রবীন্দ্রসত্তার বিপুল প্রভাবে সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যজনিত সজ্ঘাত অতি অল্পক্ষেত্রেই সুরক্ষিত।

যুক্তিপ্রধান মন স্বভাবতই আলোচনাকে নৈর্ব্যক্তিক ক'রে তোলে। অনুভূতিপ্রধান মন

ব্যক্তিসত্তার প্রবল প্রকাশ। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যেও এই ব্যক্তিসত্তার প্রবল উপস্থিতি দেখা যায়। ফলে, অধিকাংশ প্রবন্ধে ব্যক্তিপ্রকৃতি, মানসভঙ্গী, এমন কি ভাবালুতাও দেখা দেয়। প্রবন্ধ-রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়ন কবিজনোচিত, উপমাপ্রয়োগ কবিকল্পনার উপযোগী। এই কারণেই তাঁর প্রবন্ধে আমরা সাহিত্যগুণ বেশী অনুভব করি।

পঞ্চভূত পাঁচজন বন্ধু, বান্ধবী এবং বন্ধুসভার সভাপতি শ্রীভূতনাথবাবুর মিলিত আলোচনার ডায়েরী বা দিনপঞ্জী। বলা বাহুল্য নাম কয়টি রচনার সুবিধার জন্য দেওয়া। ক্ষিতি, অপ্ (স্রোতস্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ (সমীর), ব্যোম্—এই পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে ক্ষিতি বাস্তবতাবাদী, স্রোতস্বিনী অনুভূতিবাদী, সমীর সৌন্দর্যবাদী, দীপ্তি যুক্তিবাদী এবং ব্যোম্ অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু এদের মতামত সম্বন্ধে এত সহজেই কোন 'ism' বা মতবাদ ব্যবহার না করাই ভালো। স্বাভাবিক মানুষের মতো এদেরও মনোজগতে নানা মতের মিশ্রণ ঘটেছে। কেবল পরিচিতির সুবিধার জন্য মতবাদগুলিকে উল্লেখ করা হ'ল

এই পাঞ্চভৌতিক সভার স্বতোনির্বাচিত সভাপতি ভূতনাথবাবু বন্ধুসভার আলোচনাগুলি একটি দিনপঞ্জীতে সাজিয়ে রাখেন। ভূতনাথবাবু বিভিন্ন মতবাদের সত্য অংশটুকু সংগ্রহ ক'রে একটা সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন। তিনি একই সঙ্গে বিচারক ও স্রষ্টার ভূমিকা নিতে চেয়েছেন। কিন্তু বিচারকের নিরপেক্ষতার চেয়ে কবির অনুরাগই তাঁর দৃষ্টি-নিয়ামক। ফলে বেশ বোঝা যায়, 'স্রোতস্বিনী' কবিরই মানসী কল্পনা। উপমা দিয়ে স্রোতস্বিনী একটি গভীর সত্য প্রকাশ করেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, ভূতনাথবাবু সেই উপমাকে কিছুটা যুক্তি এবং অনেকটা অনুভব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই উপমা ও ব্যাখ্যায় মিলেই ভূতনাথবাবু তথা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এবং প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে উঠেছে।

কিন্তু একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায় নেই, যা 'পঞ্চভূতে' রয়েছে। পঞ্চভূতের গঠনশিল্প শুধু গঠনের অভিনবত্ব নয়, এই গঠনের উপরেই এর প্রাণ-সাফল্য নির্ভর করে। কোন বিষয়-সম্বন্ধেই আমাদের মন একটি মাত্র নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসে ক্ষান্ত হয় না। চিন্তাধর্মী মন প্রত্যেকটি বিষয়কে নানা দিক থেকে বিচার ক'রে একটি সামগ্রিক উপলব্ধিতে এসে পৌঁছাতে চায়। 'পঞ্চভূতে'র পাঁচটি দৃষ্টিকোণ মূলতঃ একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু এই রচনাবলীতে কোথাও স্থির সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টা নেই। ভূতনাথবাবুর ভাষায় এই সভার আলোচনাগুলি সাহিত্যিক স্বাস্থ্যান্বেষণের প্রচেষ্টা। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এই কথাটিই আর একভাবে বলা হয়েছে :

'গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবুও অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দ লাভ করিতে মিলি। সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও চলে।'[২] (ক্রমশঃ)

---

২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে।

বৌদ্ধ কর্মবাদ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

জগতের দিকে আমরা যখনই দৃষ্টি ফিরাই, তখনই আমাদের চোখে পড়ে মানুষের ভেদ-বৈষম্য। যতই বড় বড় বুলি আওড়াই না কেন, এ বৈষম্য মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। জগতে আমরা দেখি—কেউ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেউ নির্বোধ; কেউ স্বাস্থ্যবান্, কেউ স্বাস্থ্যহীন; কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত; কেউ ভাগ্যবান্, কেউ ভাগ্যহত; কেউ ক্ষমতাসম্পন্ন, কেউ ক্ষমতা-হীন। এ ভাবে মানুষের মধ্যে ভেদের অনন্ত রেখা টেনে চলেছে জগৎ। স্বতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—জগতে এত ভেদ, এত বৈষম্য কেন?

এর উত্তরে বৌদ্ধ ধর্ম সহজ কথায় বলে: মানুষের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মই এ ভেদ সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করলে তার ফল হয়, তেমনি কর্ম অনুষ্ঠিত হ'লে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য সু-কর্মের ফল সুখপ্রদ এবং দুষ্কর্মের ফল দুঃখপ্রদ।

কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই—কেউ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়, আবার কেউ সৎ কর্ম সম্পাদন করেও বহু দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে। তখন কর্মের ফল সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—যদি কর্মের ফল থাকে, তবে সৎ ব্যক্তি কষ্ট পায় কেন এবং অসাধু ব্যক্তি সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয় কেন?

এর উত্তরে বলা হয়: সদ্যদুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয় না, তেমনি কৃতকর্মও সঙ্গে সঙ্গে ফল দান করে না। আজ যাকে আমরা সৎ দেখছি, সে যে গত জীবনে কুকর্ম করেনি তা কে বলবে? সেই কুকর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। যে আজ অসৎ কর্মে লিপ্ত, সেও যে অতীত জন্মে সৎ কর্ম করেনি, তা নয়। সেই সৎকর্মের ফল তার লভ্য। ইহ জন্মেই মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি—অসাধু ব্যক্তি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার অসৎসঙ্গে সৎ ব্যক্তিরও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘকালের মধ্যে মানুষের পরিবর্তন বিচিত্র নয়। গত জীবনের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলে মানুষ যেভাবে থাকুক না কেন, ইহ জীবনে তার অনুষ্ঠিত কর্ম বিফল হবে না, যথা সময়ে ফল দান করবেই।

'কর্ম' বলতে বুদ্ধের কথায় 'চেতনা'কেই নির্দেশ করা হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়া কর্মের অনুষ্ঠান হয় না। কাউকে আঘাত করার চেতনা যদি না থাকে অর্থাৎ হঠাৎ কারু গায়ে আঘাত লাগে, তাতে আঘাত-জনিত পাপ আঘাতকারীকে স্পর্শ করে না। তেমনি উপকারের অভিপ্রায় না থাকলে ঘটনাক্রমে পরের উপকার করা হয়ে গেলে তা পরোপকারের পুণ্য বহন করে না। অতএব প্রতিকর্মের মূলে রয়েছে কর্ম-সম্পাদনের চেতনা।

কর্ম প্রধানতঃ তিন প্রকার: যথা—কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম ও অব্যাকৃত বা অনির্ণীত কর্ম। যে কর্মের অনুষ্ঠানে মন হিংসালোভাদিতে আবিল থাকে, সেই কর্মকে বলা হয় অকুশল বা পাপকর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, ইত্যাদি তার অন্তর্গত। যে কর্ম সম্পাদনে মন

ভাবে-ভক্তিতে প্রেমে-পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে, সেই কর্মকে কুশল বা পুণ্যকর্ম বলা হয়। দান, পূজা, শীলাচার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ছাড়া এমন কর্মও আছে, যার অনুষ্ঠানে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তা অব্যাকৃত কর্ম ব'লে পরিগণিত।

ক্রিয়াভেদে কর্ম চারি প্রকার: যথা—জনক, সহায়ক, উপপীড়ক, উপঘাতক। কর্ম যদিও জীবকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে নিয়ে চলে, তবুও সব কর্মের ক্রিয়াই 'জন্মের' কারণ নয়। যে কর্ম জন্মের কারণ তাকে বলা হয় 'জনক-কর্ম'। কিন্তু জন্মদানের ক্রিয়া-সম্পাদনে তার পরিসমাপ্তি নয়। অন্য কর্ম দ্বারা যদি ব্যাহত না হয়, আমরণ তার ফল চলতে থাকে। যে কর্ম তার অনুকূল হয়ে সহায়তা করে, সে কর্মকে 'সহায়ক কর্ম' বলে। শুভজনক কর্মের প্রভাবে মানুষ যখন সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তখন সহায়ক কর্ম তার সুখ-সৌভাগ্যকে বড় ক'রে তোলে। তেমনি তা অশুভজনক কর্মের প্রভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দুঃখ-দুর্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। 'উপপীড়ক কর্ম' জনক কর্মের ফলকে নিপীড়িত ক'রে বাধা দেয়। এর ফলে শুভজনক কর্মের ক্ষেত্রে সুখ-সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়ে দুঃখ-দৈন্যের উৎস খুলে যায়, আবার অশুভজনক কর্মপ্রসূত দুঃখ-দুর্ভাগ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে সৌভাগ্যের জোয়ার আসে। 'উপঘাতক কর্ম' জীবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়; জনক কর্মের ফলকে ছিন্ন ক'রে দেয়, এজন্য একে উপঘাতক কর্ম বলা হয়। এ কর্ম জীবনের উপর আকস্মিক ভাবে যবনিকা পাত করে ব'লে জনক কর্ম আপনার ফলদানের সুযোগ পায় না।

কর্মের যেমন ক্রিয়াভেদ আছে, তেমনি তার ফলভেদও রয়েছে। সকল কর্ম একভাবে ফল দান করে না, তার গুরুত্ব লঘুত্বের উপর ফলদান নির্ভর করে। ফলদান-ভেদেও কর্ম চারি প্রকার: যথা—গুরু, আসন্ন, অভ্যস্ত, কৃত। কর্মসমূহের মধ্যে যার গুরুত্ব অধিক, তাকে 'গুরু কর্ম' বলে। পুণ্যের ক্ষেত্রে ধ্যান সমাপত্তি এবং পাপের ক্ষেত্রে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি মহাপাতক 'গুরু কর্ম' ব'লে অভিহিত। এ কর্মকে অন্য কোন কর্ম ঠেকাতে পারে না। শক্তিশালী পুরুষ যেমন দুর্বল জনগণকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হয়, তেমনি গুরু কর্ম আপনার প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে সকল কর্মকে অভিভূত ক'রে প্রথমেই ফলপ্রসূ হয়। এজন্য তা 'অনন্তর ভবে' বা অব্যবহিত জন্মে ফল দান করে। তাই তাকে 'আনন্তর কর্ম'ও বলা হয়। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে যে কর্ম সম্পন্ন হয়, তাকে 'আসন্ন কর্ম' বলে। এ কর্ম সদ্য অনুষ্ঠিত ব'লে মৃত্যুপথযাত্রীর মনে স্বতই প্রতিফলিত হয়। তাই গুরু কর্ম না থাকলে তা পরবর্তী জন্মেই ফল দান করে। যে কর্ম বার বার করা হয় এবং যার চিন্তা প্রায় মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, তা অভ্যাসগত হওয়ায় 'অভ্যস্ত কর্ম' নামে অভিহিত। গুরু কর্ম ও আসন্ন কর্মের অভাবে তা ফল দান করে।

কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া কেউ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। স্বভাবতই জীব কর্মসম্পাদনে রত হয়। যে কর্ম 'গুরু', 'আসন্ন' বা 'অভ্যস্ত' কর্মের পর্যায়ে পড়ে না, তাকে বলা হয় 'কৃত কর্ম'। অন্য তিনটির তুলনায় এর ফলন শক্তি দুর্বল ব'লে অন্য তিনটি না থাকলে এ কর্ম ফল দান করে।

কর্মের ফলদানের কালও বিভিন্ন। কাল-ভেদে কর্মকে বলা হয়: প্রত্যক্ষ-বেদ্য, উপপদ্য-বেদ্য, অপরাপর্য-বেদ্য ও ভূতপূর্ব। যে কর্ম

আপনার গুরুত্বের জন্য ইহজন্মেই ফল দান করে, তাকে বলে 'প্রত্যক্ষ-বেদ্য' বা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ। যে কর্মের ফল অব্যবহিত পরজন্মে দেখা দেয়, তা 'উপপদ্য-বেদ্য' নামে অভিহিত। জন্মান্তরের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবনে যে কোন সময়ে যে কর্মের ফল উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'অপরাপর্য-বেদ্য কর্ম'। প্রত্যক্ষ-বেদ্য ও উপপদ্য-বেদ্য কর্ম যখন অন্য কর্মের প্রভাবে আপন আপন ফলদানের কাল-সীমা অতিক্রম করে, তখন সেগুলো ফলদানের সুযোগ হারিয়ে 'ভূতপূর্ব কর্ম' হয়ে যায় এবং পরম আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভে জন্ম ক্ষয় হ'লে 'অপরা-পর্যবেদ্য কর্ম'ও ফলদানের সুবিধা না পেয়ে ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়। এক কথায় ফলদানের সুযোগ না পেয়ে যে কর্ম শুধু কর্ম-মাত্রে পর্যবসিত হয়, তাকেই বলে 'ভূতপূর্ব কর্ম', যার ফল ভোগ করতে হয় না।

কর্মবাদের কথা বললেই জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন ওঠে। বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যে সম্বন্ধ—কর্মের সঙ্গে জন্মান্তরের সম্বন্ধও ঠিক তাই। এজন্য কর্মকে 'ভববীজ' বলা হয় জন্মান্তরবাদ জীবের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সূচনা করে। বৌদ্ধধর্মে জীবের অস্তিত্বকে ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে 'ধর্ম' বলতে যা প্রাকৃতিক নিয়মে ধারণ করছে, তাকেই বুঝায় এবং সংস্কার বলতে প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়াকেই নির্দেশ করা হয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণাবাহিত কর্মই এ প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে একে চালিত করে, যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর বা উৎপত্তি-লয়ের তালে তালে কালের অনন্ত বিস্তারে চলে জীবত্বের লীলা-ভিনয়। সাগরের বুকে যেমন একটি ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায় এবং আবার আর একটি ঢেউ ওঠে—এ ভাবে ঢেউএর ওঠা-নামা চলতে থাকে, তেমনি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহে জন্ম-মৃত্যুর ঢেউ বইতে থাকে—জন্মের পর মৃত্যু আসে এবং মৃত্যুর পর আবার জন্মান্তরলাভ হয়। এ ভাবে কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ সংশ্লিষ্ট এবং কর্মের আবর্তনে সংসারে জীবের সুখ-দুঃখের দাবাখেলা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা হয়েছে: কম্মং সত্তে বিভাজতি যদিদং হীন-প্পণীত ভাব।

There is no other way to vindicate the glory and the liberty of the human soul and reconcile the inequalities and the horrors of this world, than by placing the whole burden upon the legitimate cause—our own independent actions or Karma.

—'*Reincarnation*', *Swami Vivekananda*

লঙ্কাদ্বীপ-পরিক্রমা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রানী ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ লঙ্কা-দ্বীপ ; প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেকে সেখানে যাবার বিবরণাদি আমাদের কাছে (মাদ্রাজে) জানতে চান। যদিও ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের ব্যবধান মাত্র ২২ মাইল, এবং এক কালে ভারতের সহিত তার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়, তথাপি এখন এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং তা পরিদর্শনের আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন এখানেও প্রযোজ্য। অনেকে তা জানেন না ব'লে নানা অসুবিধা ও হয়রানির মধ্যে তাঁদের পড়তে হয়।

লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী কলম্বো ; সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের সাদর আহ্বানে শিবরাত্রি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম ও বক্তৃতাদি করবার জন্য এবার কলম্বো গিয়েছিলাম। উৎসবান্তে তাঁর সাথে মোটরে সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ পরিক্রমা করি এবং ঐ দ্বীপের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দ্রষ্টব্যস্থানগুলি পরিদর্শনান্তে কলম্বো হয়ে মাদ্রাজে ফিরি। আমাদের মোট ১,২৩৫ মাইল পথ মোটরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

লঙ্কাভ্রমণের এই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা লঙ্কাদর্শনেচ্ছুদের কিছু সহায়ক হ'তে পারে মনে ক'রে এই প্রবন্ধ লিখছি।

লঙ্কায় যেতে হ'লে প্রথমে ভারত সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট গ্রহণ করতে হয়, ফী পাঁচ টাকা। পাসপোর্ট পাওয়ার পর সিলোন সরকারের ভারত-স্থিত হাই-কমিশনারের কাছে ভিসার (Visa) জন্য দরখাস্ত দিতে হয়। মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই ও ত্রিচিনাপল্লীতে সিলোন হাই-কমিশনারের অফিস আছে এবং এগুলির যে-কোন একটি হ'তে ভিসা পাওয়া যায়, ভিসার ফী দুই টাকা। পাসপোর্ট ও ভিসার জন্য যথাক্রমে তিনখানি ও দুইখানি পাসপোর্ট সাইজের ফটো দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন করা প্রয়োজন। লঙ্কায় প্রবেশের দিন থেকে মাত্র ১৫ দিনের জন্য ভিসা দেওয়া হয়। চেষ্টা করলে এবং বিশেষ প্রয়োজন হ'লে ঐ ভিসার মেয়াদ কলম্বোতে বর্ধিত করা যায়। যাত্রার অন্ততঃ ৭।৮ দিন পূর্বে মিউনিসিপাল অফিস বা সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে কলেরা ইঞ্জেকশন ও বসন্তের টিকার সার্টিফিকেট নিতে হয়। কলম্বো পর্যন্ত টিকিট ছাড়া ভারত সরকার মাত্র ৭৫৲ টাকা প্রত্যেক যাত্রীকে নিতে অনুমতি দেন। এরোপ্লেনে গেলে অবশ্য রিটার্ন টিকিট কেটে যাওয়া যায়। যাঁরা ট্রেনে যান, তাঁদের পক্ষে লঙ্কাদ্বীপের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখে ভারতবর্ষে ফিরে আসা বেশ কষ্টকর। যাঁরা উত্তর ভারত বা পশ্চিম ভারত হ'তে আসবেন এবং ট্রেনে যাবেন, তাঁরা স্বস্থানে ফিরবার জন্য ধনুষ্কোটীতে সরকার-অনুমোদিত আমানত (deposit)-গ্রহণকারীর নিকট টাকা জমা রেখে তাঁর কাছ থেকে রসিদ নিতে পারেন। লঙ্কা দর্শনের পর ধনুষ্কোটীতে ফিরে এসে রসিদ দেখিয়ে ঐ টাকা ফেরত নিতে পারা যায়।

কলম্বোতে যাওয়ার উপায় দুই প্রকার। মাদ্রাজ বা ত্রিচিনাপল্লী থেকে এরোপ্লেনে যাওয়া যায়, ভাড়া যথাক্রমে ১২০৲ টাকা ও ৯০৲ টাকা। মাদ্রাজ থেকে রোজ দুপুরে

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্'এর ভাইকাউন্ট বিমান ছাড়ে এবং ১০০ মিনিটের মধ্যে কলম্বো এরোড্রোমে পৌঁছায়। ত্রিচিনাপল্লী থেকে 'এয়ার সিলোন' সপ্তাহে তিন দিন ছাড়ে এবং সওয়া ঘণ্টা আন্দাজ লাগে, দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় ৩৪০ ও ২৮০ মাইল।

দ্বিতীয় উপায় ট্রেনে যাওয়া। মাদ্রাজ এগমোর স্টেশন থেকে ধনুষ্কোটী বোট মেল সন্ধ্যায় ছাড়ে ও পরদিন বিকাল চারটায় ধনুষ্কোটী পৌঁছায়। ওখান থেকে ষ্টীমারে ২২ মাইল পক্-প্রণালী অতিক্রম ক'রে সিলোনের তালামান্নারে পৌঁছাতে হয়। বিকাল ৫॥ টায় ষ্টীমার ছাড়ে ও সন্ধ্যা ৮ টায় পৌঁছায়। তালামান্নারে সন্ধ্যা ৮॥ টায় সিলোন গভর্নমেণ্ট রেলে উঠে পরদিন সকাল ৭ টায় কলম্বো ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছানো যায়। মাদ্রাজ বা ভারতের যে-কোন বড় স্টেশন থেকে কলম্বো ফোর্ট পর্যন্ত রেলের টিকিট পাওয়া যেতে পারে। তালামান্নার থেকে কলম্বো শহরের দূরত্ব ১৫০ মাইল। মাদ্রাজ থেকে কলম্বো ফোর্টের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া প্রায় ৫৫৲ টাকা এবং থার্ড ক্লাস ভাড়া প্রায় ২৭৲ টাকা। মণ্ডপ ক্যাম্প ও তালামান্নারে উভয় সরকারের কাস্টমস্ অফিসাররা যাত্রীদের পাসপোর্ট, ভিসা ও মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন; প্রথমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীদের। যাত্রী বেশী হ'লে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কোয়ারাণ্টাইনে একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কলম্বোতে পৌঁছিয়ে ঐদিনই সিলোন সরকারের কোয়ারাণ্টাইন অফিসে যাত্রীদের নিজে অতি অবশ্যই উপস্থিত হ'য়ে টিকা ও ইঞ্জেকশন্-এর সার্টিফিকেট-আদি দেখাতে হয়। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হ'লে কলম্বোতে 'কন্‌ট্রোলার অব্ ইমিগ্রেশান' অফিসে গিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেদিন ভিসার মেয়াদ শেষ হবে, ঐদিনই অতি অবশ্য লঙ্কাদ্বীপ ছাড়তে হবে। লঙ্কাদ্বীপ পরিভ্রমণ-কালে পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকার সার্টিফিকেট সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখাই নিরাপদ নতুবা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

এখানে লঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দে রাজা বিজয় সিংহ সাতশত অনুগামী সহ লঙ্কাদ্বীপে অবতরণপূর্বক তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। নানা প্রমাণাদি দেখে মনে হয় বিজয় সিংহ বাংলা দেশ থেকেই লঙ্কায় গিয়েছিলেন। 'সিংহ' থেকে 'সিংহল' হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সিংহলীদের ও বাঙালীদের চেহারার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। সিংহলীরাও খুব মৎস্যপ্রিয় এবং সিংহলী ভাষার অনেক শব্দ হুবহু বাংলা; যথা 'হাত', 'ভাত', 'গাঁ' (গ্রাম) ইত্যাদি। আমি মাত্র কয়েকদিন ছিলাম, কাজেই ওদেশের ভাষার সঙ্গে বেশী পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। সিংহলীরা বাঙালীদের খুব পছন্দ করে। একটি বুদ্ধমন্দিরে যখন দর্শন করছিলাম, তখন আমরা বাঙালী শুনে অনেকে বেশ প্রীতি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করার চেষ্টা করেছিল। খৃঃ পূঃ ৫৪৪ থেকে খৃষ্টাব্দ ১৮১৫ পর্যন্ত ১৮০ জন সিংহলী রাজা এই দ্বীপে রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজা অশোকের পুত্র ও কন্যা—মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা এই দ্বীপে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মপ্রচার এই প্রথম। সিংহলীদের প্রতি ভারতীয়দের প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী করার জন্য বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত ও পবিত্র বোধিদ্রুমের একটি শাখা

সঙ্ঘমিত্রা অনুরাধাপুরে সিংহলী রাজাকে উপহার দেন। ঐ শাখাটি মহাসমারোহে অনুরাধাপুরে রোপণ করা হয় এবং কথিত আছে, উহাই বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বৃক্ষ। বুদ্ধগয়ায় আদি বোধিদ্রুমটির মৃত্যু হ'লে অনুরাধাপুর থেকে ঐ বৃক্ষের একটি চারা এনে তথায় রোপণ করা হয়। কয়েক বৎসরপূর্বে অনুরাধাপুর থেকে ঐ বৃক্ষের আর একটি চারা এনে মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর্মপাল বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে রোপণ করেন। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার প্রচারের ফলে সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সিংহলীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। অনুরাধাপুরই সিংহলের প্রথম রাজধানী।

লঙ্কাদ্বীপের অতীব মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর অমূল্য ধন ও পশুসম্পদ্, সর্বোপরি এই দ্বীপের রত্নপুরীর—মহামূল্য মণিমাণিক্যের—প্রতি ক্রমশঃ প'ড়ল বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি। প্রথমে দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজারা কয়েকবার আক্রমণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত শক্তিশালী রাজা এলালা খৃঃ পূঃ ১৬১ পর্যন্ত অনুরাধাপুর নিজের দখলে রাখেন। পরে চোল ও পাণ্ড্য রাজারাও বৌদ্ধ সিংহলী রাজাকে পরাজিত করেন। সিংহলী রাজারা অনুরাধাপুর হ'তে পোলানারুয়া ও তার পরে সাইগিরিয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। হিন্দু রাজকন্যাদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলী রাজাদের বিবাহাদিও হয়েছিল। পোলানারুয়াতে প্রাসাদের মধ্যে হিন্দু রানীর জন্য শিব, গণেশ ও কার্তিকের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কোন কোন মন্দির এখনও রয়েছে এবং পূজাদিও চলছে। ক্রমশঃ ১৫০৫ খৃঃ পর্তুগীজরা এবং ১৬৪০ খৃঃ ওলন্দাজরা লঙ্কাদ্বীপের উত্তরাংশ আক্রমণ ক'রে কিছু কিছু স্থান অধিকার করে। অতঃপর ১৭৭৬ খৃঃ বৃটিশরা ওলন্দাজদের পরাজিত ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং ১৮১৫ খৃঃ শেষ স্বাধীন বৌদ্ধ সিংহলী নরপতি বিক্রমরাজা সিংহকে তাহাদের শেষ রাজধানী ক্যাণ্ডিতে পরাজিত করেন ও রাজাকে মাদ্রাজের ভেলোরে নির্বাসিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ খৃঃ লঙ্কাদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে এবং এখন সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এই দ্বীপ প্রায় ৩০০ মাইল ও ১৫০ মাইল এবং জনসংখ্যা নব্বই লক্ষ। এই নব্বই লক্ষের মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ সিংহলী, দশ লক্ষ হিন্দু (এদের 'সিলোন তামিল' বলা হয়)। চা, কফি ও রবার বাগানের শ্রমিক দশ লক্ষ, এদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন দক্ষিণভারতীয় হিন্দু এবং বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়। লঙ্কাদ্বীপের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাফনা, ত্রিঙ্কোমালী ও বাটিকালো জেলায় সিলোন-তামিলরা পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে। সম্প্রতি সিংহলীকে সমগ্র দ্বীপের রাষ্ট্রভাষা করায় সিলোন-তামিলদের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধর্মঘট প্রভৃতি চলেছে। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যস্থলে কয়েকটি জেলায় প্রচুর পরিমাণে চা, কফি, কোকো ও রবার উৎপন্ন হয়। এখনও অধিকাংশ বাগানের মালিক ইংরেজ এবং শ্রমিক দক্ষিণভারতীয়। নারিকেল গাছ দ্বীপের মধ্যস্থল ছাড়া সর্বত্র; লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছ এবং ফলনও বেশ ভাল। লঙ্কার কিং-কোকোনাট (King-cocoanut) খুব বিখ্যাত, রং হলদে এবং প্রচুর জল।

এই দ্বীপের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম: কলম্বো শহর, গল বন্দর, কাতারাগামায় বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য-মন্দির, প্রসিদ্ধ শৈলবিহার

নিউরেলিয়া (Newra Eliya), সুবিখ্যাত ও সুন্দর ক্যাণ্ডি (Kandy) শহর, তথায় বুদ্ধের 'টুথ টেম্পল', বোটানিক গার্ডেন ও ইউনিভার্সিটি, ডাম্বোলার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহা-মন্দির, সাইগিরিয়ার মনোহর ফ্রেস্কো পেন্টিং, পোলানারুয়ার বৌদ্ধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, ত্রিঙ্কোমালীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও তথাকার বিখ্যাত কোণেশ্বর শিব এবং অনুরাধাপুরের সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তুপ, বোধিদ্রুম ও বৌদ্ধ রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি

এই দ্বীপের সর্বত্রই পিচের রাস্তা, মধ্যে মধ্যে অতিথিশালা (Guest House) আছে ; তথায় পর্যটকরা খরচ দিয়ে থাকতে পারেন। কাতারাগামা, ডাম্বোলা, সাইগিরিয়া ও পোলানারুয়া ছাড়া সর্বত্র ট্রেনে যাওয়া যায় ; বাসেও যাওয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের সর্বত্র সরকার-পরিচালিত বাস। খাওয়ার খরচ ভারতবর্ষ থেকে কিছু বেশী। কলম্বো শহরে সিলোন গভর্নমেণ্টের 'টুরিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো'তে গেলে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখার ও থাকার সব খবরই পাওয়া যেতে পারে।

শীতের সময় কেবল ক্যাণ্ডি শহরে একটু শীত অনুভূত হয়। অন্য কোন স্থানে শীত নেই, কাজেই শীতবস্ত্র লওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ট্রেনের ভাড়া আমাদের দেশের ট্রেন-ভাড়ার প্রায় সমান। বাসের ভাড়া ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চেয়েও কম ! খুব মিত-ব্যয়িতার সহিত চললে ৭৫৲ টাকায় সমগ্র দ্বীপ মোটামুটি পরিভ্রমণ করা যায়।

কলম্বো শহরটি বেশ সুন্দর, অবশ্য পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশী। এখানকার চিড়িয়াখানা সত্যই দেখবার। রোজ বিকালে সেখানে ৫।৬টি হাতীর—নৃত্য, ঘণ্টা বাজানো, মানুষকে মুখে নিয়ে ঘোরা সত্যই উপভোগ্য। শহরে মোটরগাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষের কোন শহরে এত মোটরগাড়ী দেখিনি।

রামকৃষ্ণ মিশন এই দ্বীপে প্রায় গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য ক'রে আসছেন। কলম্বোর ওয়েলওয়াটা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ রোডের উপর রামকৃষ্ণ মিশন অবস্থিত। সমুদ্র থেকে দূরত্ব মাত্র এক ফার্লং। সমুদ্রের খুব কাছেই প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক কৃষ্টিভবন ও ছাত্রাবাস—বিশেষ ক'রে ভারত সরকারের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হচ্ছে। মিশন একটি পুস্তাকাগার ও পাঠাগার পরিচালনা করেন। এই আশ্রমটিই সমগ্র দ্বীপে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত কার্যাবলীর মুখ্য কেন্দ্র। দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিশন প্রায় ২৬টি স্কুল ও ৪।৫টি ছাত্রাবাস পরিচালনা করছিলেন—নয় হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন ক'রত। গত ডিসেম্বর থেকে সিলোন সরকার দ্বীপের সমস্ত স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন

রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি প্রধান কার্য বিখ্যাত তীর্থ কাতারাগামায় একটি যাত্রী-নিবাস পরিচালনা করা। এতে প্রায় এক হাজার যাত্রীকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটি নির্মিত হয়েছে। সমস্ত বছরই যাত্রী-সমাগম হয় এবং দৈনিক কমপক্ষে যাত্রীর সংখ্যা অন্ততঃ ১০০ জন। সকল যাত্রীকে দুপুরে ও সন্ধ্যায় খাওয়ানো হয় এবং তার জন্য কোন কিছু চাওয়া হয় না। উৎসবাদির সময় দৈনিক ৫।৬ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। ওখানে রোজ যেন উৎসব লেগেই আছে। আধুনিক সুখ-সুবিধা ও ইলেকট্রিক লাইট ও জলের কল-সমন্বিত এই যাত্রী-ভবনটি জাতিধর্ম-

নির্বিশেষে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সেবা করছে। মন্দিরের পাশেই মিশনের যাত্রী-ভবন; নাম 'রামকৃষ্ণ মডম্' (Madam)। একজন সন্ন্যাসী ওখানে সব সময় থাকেন, এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। প্রতি বৎসর আগস্ট মাসে ওখানে বিরাট উৎসব হয় এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। দক্ষিণ ভারত থেকেও বহুলোক প্রতি বছর ওখানে গমন করেন। যদিও হিন্দুমন্দির, কিন্তু শতকরা ৭০ ভাগ যাত্রীই সিংহলী বৌদ্ধ। অনেক খৃষ্টান এবং মুসলমানও ওখানে যান। মন্দির খুব ছোট, কিন্তু মাহাত্ম্য সুদূরপ্রসারী। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মন্দিরের মধ্যে কি আছে তা একমাত্র পুরোহিত ছাড়া আর কেউ জানে না এবং জানার সম্ভাবনাও নেই। হিন্দুমন্দির হলেও পূজারী সিংহলী। গর্ভমন্দিরের দরজা সব সময় ৪৫টি পর্দা দিয়ে বন্ধ থাকে; পর্দার ওপরে ময়ূরের উপর আসীন কার্ত্তিকের ছবি অঙ্কিত। মন্দিরে দেবতাকে না দেখতে পেলেও যাত্রীদের মনে কোন দুঃখ নেই এবং জানবার আগ্রহও নেই। নাটমন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা করলেই তাদের শান্তি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! ভোগাদি সব গর্ভমন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করা হয় এবং পরে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

কলম্বো আশ্রমে আমরা শিবরাত্রিতে শিবের পূজা করলাম। রাত ৯টায় প্রথম প্রহরের পূজা আরম্ভ হয়েছিল এবং ভোর ৬টায় চতুর্থ প্রহরের পূজা ও হোমাদি শেষ হয়। সমস্ত রাত অন্ততঃ ২৫০ ভক্ত পূজাদি দর্শন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভজনও চলেছিল। এর তিন দিন পরে মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬ তম জন্মতিথি-পূজাও ভাব-গাম্ভীর্যের সহিত সুসম্পন্ন হ'ল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পূর্বে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বহু ভক্ত ও বন্ধু এতে যোগদান করেন। ওদেশেও শ্রীরামকৃষ্ণের এত অনুরাগী ভক্ত আছেন দেখে খুব আনন্দ হ'ল। এর প্রধান কারণ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযানের পর প্রথম কলম্বোতে জাহাজ থেকে নামেন এবং কলম্বোতে বক্তৃতাদির পর ক্যাণ্ডি ও অনুরাধাপুর দর্শনপূর্বক সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে জাফনা রওনা হন। অনু-রাধাপুর থেকে জাফনার দূরত্ব ১৮০ মাইল। পথে ঘোড়ার গাড়ী ভেঙে যাওয়ায় স্বামীজীকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। জাফনায় স্বামীজী খুব মূল্যবান্ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে স্বামীজীর নির্দেশে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কলম্বোতে চেটিয়ারদের ধর্মশালায় ৭।৮ মাস থেকে তথায় ধর্মপ্রচার করেন। হারবারের নিকট রিক্লামেশান স্ট্রীটে অবস্থিত এই প্রশস্ত ধর্মশালাটিতে ভারত থেকে আগত হিন্দু যাত্রীদের বিনাখরচে থাকতে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পরদিন দুপুরে একটা মোটরগাড়ীতে রওনা হ'য়ে আমরা ১৮০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক সন্ধ্যা ৭॥ টায় কাতারাগামাতে পৌঁছাই। একেবারে সমুদ্রের কিনারা দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তা। একপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত ভারত মহাসাগর, আর অন্যদিকে সারিবদ্ধ অফুরন্ত অসংখ্য নারিকেল গাছ। দৃশ্য অতীব নয়নাভিরাম। ৭২ মাইল যাওয়ার পর আমরা গল (Gulle) বন্দরে উপস্থিত হলাম। স্বাভাবিক এই বন্দরটির সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

এর পর মাতারা শহর। কলম্বো হ'তে প্রায় ১০০ মাইল দূর মাতারা শহর পর্যন্ত রেল লাইন এসেছে। কাতারাগামাতে সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরের একপাশে গণেশ ও অন্য পাশে তাঁর প্রথমা স্ত্রী দেবযানীর মন্দির এবং কিছু দূরে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বল্লীর মন্দির। গণেশ ও দেবযানীর মন্দির ভারতীয়দের এবং পূজারীও ভারতীয়। সুব্রহ্মণ্য-মন্দির হ'তে দু-ফার্লং দূরে খুব পুরাতন একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ-স্তূপ। সম্প্রতি সিলোন সরকার এই স্তূপটির পুনর্নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেছেন এবং আমরা কাতরাগামা যাওয়ার দুইদিন পরে লঙ্কাদ্বীপের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী শ্রীমা বন্দরনায়ক ঐ নির্মাণকার্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। সুব্রহ্মণ্য-মন্দির এত বিখ্যাত এবং বছরে ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও অতি অপরিষ্কার ও অবহেলিত অবস্থায় মন্দিরটি রাখা হয়েছে। ভোর ৪॥ টায়, পূর্বাহ্ণ ১০॥টায় ও সন্ধ্যা ৬॥টায় পূজা ও আরতি হয় এবং যাত্রীরা দর্শন করতে যান। যাত্রীরা সাধারণতঃ নারিকেল, ফল, বিভূতি ও লাল কাগজের ফুলের মালা দেবতাকে নিবেদন করার জন্য পুরোহিতকে দেন। কমপক্ষে এক টাকা দক্ষিণা না দিলে ঐ পূজা মন্দিরের ভেতরে লওয়া হয় না। ঐ টাকা পূজারীর প্রাপ্য। দৈনিক কমপক্ষে ঐরূপ ১০০ পূজা দেওয়া হয়। আমরা পরদিন প্রাতে মন্দির-সংলগ্ন পবিত্র মাণিক-গঙ্গায় স্নানাদি সমাপন-পূর্বক পূজার দ্রব্যাদি নিয়ে গেলাম। পূজারী সাগ্রহে আমাদের পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ ক'রে নিবেদন করলেন। এই মন্দিরে যাত্রীদের কারও কারও প্রায়ই ভাব হয়। আমরা দুজন মহিলাযাত্রীর ও একজন পুরুষের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম; ওঁরা কিন্তু বৌদ্ধ। তৃতীয় দিনে ভোরে রওনা হয়ে ১১৫ দূরস্থিত লঙ্কাদ্বীপের একমাত্র শৈলাবাস নিউরেলিয়া (Newra Eliya) শহরে উপস্থিত হলাম; সমুদ্রবক্ষ থেকে উচ্চতা ৭,০০০ ফিট। শহরে প্রবেশের দু-মাইল আগে বিখ্যাত 'হাকৃগালা' চূড়ায় একটি বোটানিক গার্ডেন আছে, তাও দেখলাম। এরই এক স্থানে কয়েকটি খুব পুরাতন বৃহদাকার বৃক্ষ রয়েছে—ঐ স্থানটিকে 'অশোকবন' বলা হয়। উহার কিছু দূরে প্রধান রাস্তার পাশে সীতাদেবীর ছোট্ট একটি মন্দির। কেহ কেহ বলেন, সীতাদেবীকে রাবণ-রাজা এখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সমস্ত লঙ্কাদ্বীপ ঘুরেও রাবণ-রাজার বা তাঁর প্রাসাদের কোনও হদিস পেলাম না। নিউরেলিয়া শহরেও সুন্দর বোটানিক গার্ডেন আছে। নানা রকম ফুলের বাহারে বাগানটি সুসজ্জিত। এখানে মধ্যাহ্নভোজন-সমাপনান্তে পাহাড়ের নীচে নামতে আরম্ভ করলাম।

পথের চারদিক কেবল চা, রবার, কোকো, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির গাছ ও লতায় পূর্ণ। পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ লক্ষ দক্ষিণ-ভারতীয় তামিলভাষী শ্রমিক এই সব চা-বাগানে ও রবার-বাগানে কাজ করে। একটি চা-এর ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কি ক'রে চা তৈয়ারী হয়, দেখলাম। এক পাউণ্ড চা করতে প্রায় দেড় টাকা খরচ পড়ে, শুনলাম। ৫০ মাইল পথ গভীর ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যায় সুন্দর ক্যাণ্ডি শহরে এসে পৌঁছুলাম। সমুদ্রবক্ষ হ'তে এর উচ্চতা প্রায় ২,০০০ ফিট। লঙ্কাদ্বীপের বৃহত্তম নদী মহাবলী-গঙ্গা শহরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্যাণ্ডিতেই লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন 'সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ডে'র হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন।

শহর থেকে তিন মাইল দূরে পেরিডেনিয়া নামক স্থানে যে বোটানিকাল গার্ডেন আছে, তা নাকি এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে রুদ্রাক্ষ ও কমণ্ডলুর গাছ দেখে খুব আনন্দ হ'ল; তালগাছের মতো দেখতে—অদ্ভুত জোড়া-নারকেলের গাছ কয়েকটি দেখা গেল। এরই এক পাশে অতি মনোহর ও নীরব পরিবেশের মধ্যে ইউনিভার্সিটি। সমগ্র দ্বীপে একটি মাত্র ইউনিভার্সিটি—এর কলা-বিভাগ এখানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান-বিভাগ কলম্বোতে। এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ১,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। লঙ্কাদ্বীপে সর্বপ্রকার শিক্ষাই অবৈতনিক—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত।

দর্শন-বিভাগের রীডার ডক্টর সরকার, ইনিই একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক। আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। অতি অমায়িক সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উচ্চ-শিক্ষিত। আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পেয়ে ওঁদের খুব আনন্দ হ'ল। ডঃ সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ছয়তলাবিশিষ্ট সুবৃহৎ লাইব্রেরিটি দেখবার মতো। এখানে স্বামীজীর জীবনী, রচনাবলী প্রভৃতি রয়েছে দেখে আনন্দ হ'ল।

সন্ধ্যায় আমরা সুবিখ্যাত 'টুথ টেম্পল' দর্শন করলাম। এখানে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে পূজাদি করেন। বৌদ্ধদের ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান। দাঁত অবশ্য দেখা যায় না। জুলাই-এর শেষে উৎসবের সময় ১০০ সুসজ্জিত হাতীর শোভাযাত্রা হয় এবং ঐ সময় একটি স্বর্ণাধারে দাঁতটিকে রেখে হাতীর পিঠে ক'রে ঘোরানো হয়। আলোকমালায় সজ্জিত ক্যাণ্ডিকে পাহাড়ের উপর থেকে পরীর দেশ ব'লে মনে হয়। এখান থেকে রওনা হয়ে পথে ডাম্বোলায় বিখ্যাত গুহা-মন্দির (Cave temple) দর্শন ক'রে সাইগিরিয়ার ফ্রেস্কো পেন্টিং ও পোনালারুয়ায় বৌদ্ধ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যায় আমরা দ্বীপের পূর্বাংশে বাটি-কালো শহরে রামকৃষ্ণ মিশন শিবানন্দ বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। ডাম্বোলাতে গুহার মধ্যে ৪২' লম্বা শায়িত পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি সত্যই দেখবার মতো। গুহাটি প্রায় ১৫০ ফিট লম্বা ও ৭৫ ফিট চওড়া। গুহার মধ্যে অনেক মূর্তি রয়েছে। প্রায় ৩০০ সিঁড়ি ভেঙে গুহাতে যেতে হয়। সাইগিরিয়াতে মাত্র ৫।৬টি ফ্রেস্কো পেন্টিং আছে—খুব পুরাতন। অজন্তাতে যে সময় গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, এখানেও মনে হয় সেই একই সময়ে একই গোষ্ঠীর শিল্পী এগুলি এঁকেছিলেন।

বাটিকালোতে ও তার নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত অনেকগুলি স্কুল ও অনাথালয় পরিদর্শনান্তে আমরা পরদিন ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে প্রসিদ্ধ বন্দর ত্রিঙ্কোমালীতে পৌঁছাই। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু কলেজে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যক্ষ ও তাঁর স্ত্রী মঠের ভক্ত। গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার বিখ্যাত কোণেশ্বর শিবমন্দির দর্শনান্তে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত গরম জলের সপ্তকুণ্ড দেখা হয়। বহু লোক এখানে প্রত্যহ স্নান করেন। জল স্পর্শ ক'রে দেখলাম অসহ্য গরম নয়। এখানে এক রাত থেকে পরদিন ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে দ্বীপের শেষে উত্তর সীমায় অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর জাফনাতে উপস্থিত হই। জাফনার লোকসংখ্যা প্রায়

এক লক্ষ। শতকরা ৯৫ জন তামিল ভাষা-ভাষী ও শতকরা ৭৫ জন হিন্দু। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন বৈদ্যেশ্বরন্ কলেজেও ছাত্র-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। জাফনার সুবিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য-মন্দির দর্শন করি—মন্দিরের মধ্যে কার্ত্তিকের একটি তীরের পূজা হয়—সোনার নির্মিত ঐ তীর। খালিগায়ে মন্দিরে যেতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধু এখানে আছেন, এখানে একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য বহু লোকে অনুরোধ জানান। স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীটিতে ছিলেন এবং হিন্দু-কলেজের যে হলে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা দর্শন ক'রে খুব আনন্দ লাভ করি। জাফনার উত্তরে ও পূর্বে ৪।৫টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ওগুলিও সিলোন সরকারের শাসনাধীন। পরদিন প্রাতে জাফনা থেকে ১৮০ মাইল দূরে বৌদ্ধদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র অনুরাধাপুরে আসি। এখানে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম, সিংহলী রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বৃহদাকার গগনচুম্বী বৌদ্ধ স্তূপ, সুবৃহৎ জলাশয়সমূহ দর্শনান্তে সন্ধ্যায় কলম্বো আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করি। অনুরাধাপুর থেকে কলম্বো ৭২ মাইল।

আশ্রমে একদিন অবস্থানের পর সিংহলের অতি মধুর স্মৃতি নিয়ে পথে ৺রামেশ্বর দর্শনান্তে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করি। লঙ্কাদ্বীপে মাত্র ১৫ দিন ছিলাম এবং ৮ দিনে ১,২৩৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সমগ্র দ্বীপটি পরিদর্শন করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখেছি তা স্মরণ করলে মুহুর্মুহুঃ আনন্দ হয়।

সূর্য-স্নান

শ্রীতারক ঘোষ

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
পবিত্র রোদের ধারা নেমে আসে
প্রপাতের মতো।
প্রতপ্ত জ্যোতির স্পর্শে জীর্ণ হয় ক্লেদ,-
সব গ্লানি নিষ্কাশিত হয়ে যায়
দেহ থেকে ;
মনের আড়ালে
মুমূর্ষু আবিল আবর্জনা
দগ্ধ হয়ে যায়।

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
বাইরে তাপের দাহ,
রুক্ষ মাটি,
ক্ষুব্ধ কামনার হাহাকার ;
সূর্যতপা ভিতরে ভিতরে
অমৃতের সত্য-তৃষ্ণা
তিল তিল ক'রে
সঞ্চয় করেই চলে।
বাইরে অকালে যদি তৃষ্ণা মেটে,
অন্তরে পিপাসা ঘুচে যাবে।
সূর্য-স্নানে ধৌত হয় আবিল বাসনা-
অন্তর্লীন গূঢ় তৃষ্ণা শুচি হয়ে ওঠে।

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
প্রতীক্ষার সাধনা এ
স্নিগ্ধতম অমৃত-লাভের।
রোদের ছোঁয়ায়
বুকে ফোটে পিপাসার অলক্ষ্য কমল
বাইরে আবিল আবর্জনা
পুড়ে যায়—
উড়ে যায় কালবৈশাখীর ঝড়ে।
তখন অমৃত ঝরে
বর্ষার অঝোর ধারা,
বুক ভরে, তৃপ্ত হয় প্রাণের পিপাসা।

রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদ

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

শাশ্বত ব্রহ্মবাদ

সকল উপাসনা-আরাধনা সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় বেদান্তের বেদিতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'নহিলে সমস্তই কুসংস্কার'। 'উপনিষৎ বা বেদান্ত ব্রহ্মবিদ্যার বনস্পতি'—ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি। বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। উপনিষদেই আছে—চিন্ময় ও অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও অশরীরী ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা উপাসকগণের সাধনার নিমিত্ত। কবির ভাষায়—ব্রহ্মই ভারতের জাগ্রত দেবতা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন কালে মানুষ যে-দেবতারই ভক্ত হউক না কেন, সে জানিয়াছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' —সদ্‌বস্তু এক, বিদ্বান্‌গণ নানা নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন। কিন্তু যে-নাম বা যে-রূপে অর্চনা করা হউক না কেন, সাধকের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা: মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্ অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। —ব্রহ্মকে আমি যেন পরিহার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিহার না করেন। এই অনিরাকরণ বা স্বীকৃতি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে, আমি যেন সতত অনিরাকৃত থাকি। ভারতের আস্তিক প্রাণ যুগে যুগে এই প্রার্থনা করিয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে: যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা এতস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ—সেই অক্ষর অবিনাশী তত্ত্বকে না জানিয়া সংসার হইতে যে বিদায় লয়, সে কৃপণ—কৃপার পাত্র; কারণ মানবজীবনের পরম সার্থকতা ও বিশিষ্টতম অধিকারে সে বঞ্চিত। উপনিষদের উদাত্ত বাণী ইহাই—অল্পে বা ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই আনন্দ। ভূমাই জিজ্ঞাসার বস্তু। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

দর্শনের চরম তত্ত্ব

এ দেশের দার্শনিক চিন্তা তিনটি তত্ত্ব বিচারে স্থির করিয়াছে—পরমাত্মা, জীব ও জগৎ। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি বস্তুতঃ 'সৎ' কি না অর্থাৎ পরমার্থতঃ আছে কি না—ইহা লইয়া নানা মতবাদ, কিন্তু প্রথমটি নির্বিবাদ। জড় ও জীব, চর ও অচর, স্থাবর ও জঙ্গম—ইহারা কি ভাবে বর্তমান, শুধু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক হিসাবে সত্য কিনা, এবং পরম বস্তু বা চরম তত্ত্বের সহিত উহাদের কি সম্বন্ধ—এই বিষয়ে নানা মতবাদ—দ্বৈত, শুদ্ধ ও বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি। এই সকল প্রসিদ্ধ (সাম্প্রদায়িক) সিদ্ধান্ত—দার্শনিক চিন্তায় সম্ভব সকল বিকল্পকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতের মানস-আকাশ অধিকার করিয়া আছে। তত্ত্ববিদ্যার এই গগন-মানচিত্রে রবীন্দ্রনাথের মনন কোন্ তারাপুঞ্জ-খচিত রাশিতে অবস্থিত?—এই প্রশ্ন স্বতই কৌতূহল জাগায়। নিজ ধর্মমতকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বলিলেও এ দেশে পূর্বসূরিগণের চিন্তার ব্যাপক জাল সম্পূর্ণ পরিহার করিতে তিনি পারেন নাই। জ্ঞাতসারে বা যুক্তি-পথের স্বাভাবিক নিয়তি-বশে উহার কোন কোনটির সহিত মিল তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

নিখিলে মানবের স্থান ও স্রষ্টার সহিত তাহার সম্বন্ধ লইয়া চিন্তা নিত্যনূতন ও নিরন্তর

হইলেও—পুরাতনের সাদৃশ্য তাহাতে মুছিয়া যায় না।

ভূমার সীমা

'ব্রহ্ম' শব্দ বলিতে বুঝায়—যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, সীমাতীত বৃহত্ত্বের চরম তিনি ; তাই অনন্ত। বৃহৎ এবং বিশাল, তাই তিনি ব্রহ্ম। 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।' উপনিষদ্ বলেন—'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ। যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।' যাঁহার পর অর্থাৎ যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য কিছু নাই। যাঁহা হইতে অণু বা সূক্ষ্মতর, যাঁহা হইতে বৃহত্তর কেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ব্রহ্মবিদের আনন্দ—এই অসীমকে প্রকাশ করা। এই অনন্তের সুরে মিলিয়ে নেওয়া ব্রহ্মচর্য।' শান্তিনিকেতনের ভাষণে আছে, 'জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা—ইহাই লক্ষ্য।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন : ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণ—অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। ব্রহ্মকে স্বভাবে দেখার অর্থ—সর্বত্র দেখা। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।—সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে ধীর ব্যক্তিরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। 'জীবে জীবে আত্মায় যে ঐক্য, সে পরম ঐক্যকে খোঁজে।' কবির মতে ইহা সম্পূর্ণতার সন্ধান। আবার উপনিষৎ পরমাত্মাকে 'একপ্রত্যয়সারং' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব, আত্মার এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'ইহাই বিশ্ববীণার ঝঙ্কার—ইহাই একতান মহাসঙ্গীত।' পরমাত্মা যে শুধু বিশ্বাতিগ নন, তিনি যে বিশ্বময়—ইহার সমর্থন উপনিষদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে —'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।' ইহাতেই তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী বুঝায়। তথাপি ছোট ক'রে আবার 'য ওষধিষু যো বনস্পতিষু' বলায় তিনি অতি সত্য, নিকট প্রত্যক্ষ, ইহাই বুঝানো হইয়াছে।

এই ভাবেই ঋষিগণ আশ্রমের লতা-পল্লব-পাদপে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন।

কবির প্রতিপাদ্য

উপনিষদের নানা বাক্যের উদ্ধৃতি দ্বারা কবি বলিয়াছেন : 'ব্রহ্ম সেই পরম সত্য—যেখানে সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়।' 'তাঁহাতে ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্য।' 'দুয়ের মধ্যে এককে লাভ আমাদের প্রয়াস।' 'পূর্ণতার অবধি তিনি, সেই জন্য ব্রহ্মের কোন শরিককে মানি না।' এই তাৎপর্যেই বলা হইয়াছে—'একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। কবি বলেন, 'প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক—একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত'—দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে, কর্ণ ও অর্জুনের মতো তাদের পরম শত্রু ক'রে তোলে।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার—দুয়ের সমাধানে আত্মার স্থিতি। এই পূর্ণতার স্বীকার—ওঁ।' কবির উপলব্ধি, 'ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম। নির্জনে ধ্যান, সজনে সেবা—এই দুই লইয়া তাঁহার উপাসনা।'

দুরূহ প্রত্যয়

ব্রহ্ম-পদার্থের এই যে ব্যাপকতর ধারণা—ইহা উপলব্ধি করা, ইহা অঙ্গীকার করা সহজ বা সাধারণ নহে, ইহা বোধ করিয়া কবি লিখিয়াছেন : বিমুখচিত্ত ও বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায় যে, এ 'অনন্ত শুধু তত্ত্বকথা।' কিন্তু ইহা অসাড় চিত্তের পরিচায়ক। 'প্রাণ জাগিয়ে নিয়ে যখন উপলব্ধি করিনে, তখন

তর্ক।' উপনিষদ্ বলেন: প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈ বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতি-বাদী।—এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন এঁকে যিনি জানেন, তিনি এঁকে অতিক্রম ক'রে আর কোন কথা বলেন না। তিনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোন কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

সগুণ ও সবিশেষ

ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ কি? উহা কি সদর্থক (positive) না নঙর্থক (negative)? সবিশেষ বা নির্বিশেষ? সগুণ না নির্গুণ? কবির মতে—'সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনন্তের স্বরূপ—ইহাই পরমার্থ।' কিন্তু তিনি যে মতবাদেরই পরিপোষক হউন না কেন, অন্য মতের মধ্যে যে সারতত্ত্ব—যে মহত্ত্ব, তাহাও তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার ও প্রকাশ করেন। ইহা পূর্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জন্যই বৈষ্ণবতার মর্মকথা ও শাশ্বত ভারতের বাণী অপর্যাপ্তভাবে তাঁহার রচনাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রায়শঃ সগুণ ব্রহ্মই প্রতি-পাদন করিয়াছেন এবং জগতের অস্তিত্ব মায়া-কল্পিত বা ভ্রান্তি-বিলাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সগুণ, কল্যাণ-গুণরাশির তিনি পারাবার, দিব্যমঙ্গল তাঁহার বিগ্রহ; চিৎ ও অচিৎ তাঁহার নিত্য স্বপ্রকাশ; জগৎ সৎ, এবং তাঁহার আধিভৌতিক রূপ, তাঁহার পরমৈশ্বর্যের অভিব্যক্তি—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

কবি লিখিয়াছেন, 'দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করে।' কবি কিন্তু সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বেই অভিভূত। ইহার কারণ—তাঁহার 'শেষ সপ্তকে'—দার্শনিক অনুভবগুলির গদ্যকাব্যরূপে প্রকাশের মাঝে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'সৃষ্টির শাশ্বত বাণী ভালবাসি। ...আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসখা। আমি পৃথিবীর কবি।' রবীন্দ্র সাহিত্যের ইহাই মর্মকথা, প্রাণরহস্য এবং কবির ব্রহ্মবাদের সহিত ইহা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

চরম অদ্বৈতের মহত্ত্ব

কিন্তু শান্তিনিকেতনের একটি ভাষণে ইহাও তিনি বলিয়াছেন, 'মনের মধ্যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে—সে কেবল জানে, একমেবা-দ্বিতীয়ম্।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ—মানুষকে একটা বৃহৎ সম্পদ্ দান করিয়াছে। নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।' 'অদ্বৈতরস-সমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভকে আমি নমস্কার করি। যিনি এখানে উপনীত—আমি তাঁর সঙ্গে কোন কথা নিয়ে বাদ প্রতি-বাদ করতে চাই না।'

মায়ার স্বরূপ

তথাপি নির্বিশেষ ব্রহ্মের যে চরম ঐকান্তিক স্বরূপ অদ্বৈত-শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার মতবাদ বহুলাংশে ভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য হইলে জগৎ মায়িক ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। অদ্বৈত মতে ইহাই উদ্ঘোষিত: ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—সেই এক বস্তুই সৎ, ইহ সংসারে নানা বা পৃথক্ কিছু নাই। তবু যে দৃশ্যমান বিশ্ব নানারূপ, অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রতিভাত হয়, অদ্বৈত মতে তাহা অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়ার কাজ—ভ্রান্তিমাত্র। সে মায়া বা অবিদ্যা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? উহার আশ্রয় কি ব্রহ্ম? তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বে মায়ার স্পর্শ ঘটে। এবং তাহা না

হইলে মায়া ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত সত্তায় দাঁড়ায়। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম ছাড়া কোন শক্তি বাইরে থেকে জোর ক'রে এই মায়াকে আরোপ করেছে, সে ত মনেও করতে পারি না।' তাহা হইলে মায়া কি ব্রহ্মেরই শক্তি?

বৈষ্ণব দর্শনে মায়া সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় আবির্ভূত শক্তিবিশেষ—ইহার দ্বারাই তিনি জগৎপ্রপঞ্চে বিবর্তিত হন। ভাগবতের মতে মায়া ত্রিগুণময়ী। প্রলয় ও সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ত্রিগুণের নিথর সমতা। ইহাতে বিক্ষেপ বা বৈষম্য উদ্ভূত হয় পুরুষোত্তমের ইচ্ছায়। মধ্ব-মতে মহাবিষ্ণুর সৃষ্টিবৈচিত্র্য-রচনার শক্তিই লক্ষ্মী—তিনি তাঁহারই ন্যায় নিত্য, অজড় ও সর্বব্যাপিনী।

বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ

তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের বিচার-বিতর্কে যে ভাবেই উহা উদ্ভূত হউক না কেন, মানুষের প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে প্রভূত মায়ার খেলা রহিয়াছে—ইহা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। 'বিশ্বপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ এই বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তু-স্বরূপ যে প্রকৃতই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ এবং জীবের ইন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে এই সকল গুণ উহাতে অনুভূত হয় এবং উহাতেই নিহিত বলিয়া মনে হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে কবি বলেন, 'মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন?' অন্যত্র তাঁহার উক্তি, 'মায়া—জগৎ বলিয়া জানিতেছ।' 'আত্মবোধ' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন, 'আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগোচ্ছে, ততই বস্তুত্বের কুলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই, স্বরূপতঃ তার একটি বালুকণাও যে কী, তা আমরা ধারণা করতে পারিনে—কিন্তু সম্বন্ধতঃ সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।' প্রাবীণ্যের সীমায় পৌঁছাইয়া তাঁহার মন এই বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে অভিভূত হয়।

সংসার—অক্ষরের বাতায়ন

প্রত্যক্ষের এই প্রহেলিকার মাঝে তত্ত্ব-লাভের আকুলতা সাধনার প্রেরণা জাগায়। কবি বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়গোচর যে কোন বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া, স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে। সাধক তাহার এই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না, যদি এই সমস্ত নামরূপের আবরণ চিরন্তন হইত। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথরোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া, সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধন। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোন মতে উজান পথে চলিতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু চলছে বলেই মিথ্যা—এটা উল্টা কথা। প্রাণময় সত্য কেবল নিজেকে ডিঙিয়ে চলছে। স্থিরত্বই বিনাশ। অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়।' আর এক স্থলে তিনি বলেন, 'ধর্মের বিশেষত্ব আপনার খোঁজ—ভিতরে, বাইরে, নানা বিচ্ছেদ-বিক্ষিপ্ততা মিটাতে আত্মবোধের সাধনা।' এই দুইটি উক্তির তাৎপর্য—নিরন্তর চঞ্চলই নিত্য-

অচঞ্চলের দিকে মনকে লইয়া যায়, ও উহাকে আবৃত না করিয়া প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিতে অধ্রুব বস্তু ধ্রুব বস্তু লাভের অন্তরায় নহে, উহার সহায়।

মায়াতীতে শ্রদ্ধা

ভারতীয় দর্শন—বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদ—কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করে: (১) আমাদের প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গম্য বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে—অর্থাৎ তাহা অনির্বাচ্য, (২) একমাত্র ব্রহ্মই সৎ এবং (৩) জগতের সত্তা অধ্যাস বা আরোপ মাত্র। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারাই হোক বা দার্শনিক অনুমান বা যুক্তিতর্ক-বলেই হোক—মায়ার উচ্ছেদ নাই, উহার জালে জীব বদ্ধ হইয়াই আছে। চিন্তাশীল মানবের নিকট ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু এই মায়ার জাল ছিন্ন করিয়া একমাত্র বস্তুকে যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, চিন্তা ও চর্যায় সেই একান্ত অদ্বৈতীর সঙ্গে কবির বিরোধ নাই। বরং জ্ঞানলোকের এই উত্তুঙ্গ হিমশিখরের প্রতি তাঁহার অন্তরের আকর্ষণ উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে (নৈবেদ্যে):

চিত্ত বাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রি দিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন।
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস।
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

খণ্ডের সহিত অখণ্ডের জ্ঞান

তথাপি নির্বিশেষ—সকল উপাধিমুক্ত ব্রহ্ম-বস্তুর ধারণাই যে একমাত্র বা যথার্থ বা সমগ্র ধারণা, ইহা তাঁহার অভিমত নহে। তিনি বলিয়াছেন: ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া ধারণা করার অর্থ তাঁহাকে ধারণার অতীত করা। তিনি তাহা হইলে অবাঙ্‌মনোগোচর হইয়া রহেন। 'সুতরাং ইহাই দাঁড়ায় অনন্ত তত্ত্ব কথামাত্র। ব্রহ্মের সীমা নাই—সুতরাং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা।' ব্রহ্ম ভূমা বা বৃহত্তম বলিয়াই সাকল্যে বোধের অতীত। ব্যাখ্যা-স্বরূপে তিনি বলেন, 'আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র ক'রে দেখতে পাইনে। ইহাই পরিপ্রেক্ষণ-তত্ত্ব। যুগপৎ সব দেখলে হয় ঝাপসা—খণ্ড লোপ হ'লে হয় শূন্যতা। যখন অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি, তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হয়ে কষ্ট দেয়। আবার সমগ্রকে লক্ষ্য ক'রে মানুষ খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত ক'রে দেখে, তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।'

উপনিষদে দ্বৈতাদ্বৈত

ব্রহ্মের ধারণা রবীন্দ্রনাথের লেখায় চরম সমগ্রতায় পরিণতি। ইহা সকল খণ্ডতা ও অস্বীকারের প্রতিবাদ। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, 'বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মত পুচ্ছের আলোকের বাইরে সব অস্বীকার করে।' তাঁহার উক্তি: 'উপনিষদের বাণীতে কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই!' ইহাকে তিনি সার্বভৌমিক ধর্মবোধ বলিয়াছেন। উপনিষদ্-বাক্যে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয়বিধ স্বরূপ বর্ণিত আছে।

'সামঞ্জস্য' শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি: 'তাঁর স্বরূপে সামঞ্জস্যের লীলা—শান্তং শিবম-দ্বৈতম্।' এষ সেতুর্বিধরণো লোকানাম-সম্ভেদায়—লোকসমূহের ভেদ-নিরাসের জন্য বিধৃতির ইনি সেতু। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দ্বৈতে অদ্বৈতে বিবাদ মত নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।'

পরম পূর্ণতার স্বীকার

দ্বৈতবাদে প্রকৃতি ও পুরুষ। 'শক্তিমান্‌কে শক্তি ও তার ক্রিয়া থেকে সরিয়ে বড় পদ দিয়ে —ব্রহ্ম হন পরাস্ত, ছোট।' মুক্তির মধ্যে সগুণ নির্গুণ দুইই। উপনিষদ্ ও গীতায় পূর্ণতার সাধনা, বৌদ্ধ মতে নির্বাণের সাধনা। উপনিষদের 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' এই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবি বলেন: ব্রহ্মকে হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। তিনি 'ওঁ' অর্থে 'হাঁ'। নঙর্থক নয়, সদর্থক। 'ওঁ' অর্থে পূর্ণতার স্বীকার। উপনিষৎ সত্যের একদিকেই ঝোঁক দিয়ে অন্য দিক নির্মূল ক'রে দেননি। ব্রহ্মর্ষি তাঁকে স্পষ্ট করেই সক্রিয় বলেছেন। যেখানে 'আছেন' সেখানে ক্লীবলিঙ্গ—যেখানে 'করছেন' সেখানে পুংলিঙ্গ। 'স পর্যগাৎ'—ঈশোপনিষদের এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে আছে—নিত্যকাল থেকে তিনি বিধান করছেন। 'আমাদের স্বভাবেও ভাব ও কর্ম—দুই বাচ্য। একটিতে প্রকাশ—আরটিতে ক্রিয়া।' 'সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনন্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাই ব্রহ্মসাধনা'—ব্রহ্মাববোধ। শুধু অসীম ও অব্যক্তের মধ্যে নয়, সীমা এবং ব্যক্তের মধ্যেও। 'নিখিলময় সত্যে প্রকাশের প্রার্থনা। এই ক্রন্দনে পূর্ণ ব'লে অন্তরীক্ষের 'রোদসী' বা 'ক্রন্দসী' এই নাম।' 'আবিরাবীর্ম এধি—হে প্রকাশস্বরূপ আমার সমক্ষে আবির্ভূত হও, ইহাই সেই প্রার্থনা।' কবির ভাষায়: 'সীমা অসীমের প্রকাশ। অব্যক্তের চেয়ে ব্যক্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত হবার চেষ্টা—মুক্তি। পর ব্রহ্ম ও জীব—উভয়ের সম্পর্কে ইহা সত্য। 'তিনি কেবল মুক্ত হ'লে নিষ্ক্রিয় হতেন। প্রকাশ পান বন্ধনের রূপে। এই জন্য দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করে।' উপনিষদ্ বলেন: 'পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।—অর্থাৎ এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। এই বাক্যে ব্রহ্ম যে গুণসমৃদ্ধ-তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কবির দৃষ্টি

ধ্যানমৌন, কর্মশূন্য, আত্মবিলোপী সাধনা কবির বিচিত্র চেতনা ও সর্বতোমুখী অনুভূতির সহিত সঙ্গতিলাভ করিতে পারে না। সেই নিস্তরঙ্গ অস্তিত্ব—যাহাতে প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, রসের আস্বাদ নাই, প্রত্যক্ষের বৈচিত্র্য নাই, হৃদয়ের আবেগ নাই—কবির সৃজনী ক্রিয়ার তাহাতে অবসান। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগের সম্পদ্, অধ্যাত্ম-প্রেরণার উৎস হইতে পারে, কিন্তু পার্থিব সম্বেদনাকে উহা জাগ্রত করে না। অথচ এই সম্বেদনাতেই কবির জগৎ রচিত। উহা প্রকাশের জগৎ, অপ্রকাশের নয়। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম কি অব্যক্ত স্বরূপেই আনন্দিত? প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।' 'সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতে ফুরোতে চাচ্ছে না।' উপনিষৎ বলিয়াছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি-ভাতি। 'সেই প্রকাশকে সর্বত্র, সর্ববৃত্তিতে দেখা, চোখে চরম দেখাগুনা আত্ম-কল্যাণের বাধা নয়।' কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।' নিখিলে এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ—ইহা সেই পুরাণ কবির মহাকাব্য। তিনি বলেন, 'বিশ্বকবির বিরাট কাব্যের চিহ্ন লোপ করতে পারি—মনে করার কোন হেতু নেই। জগৎ বাস্তব এবং জগৎ নিত্য, ইহা 'নাই' বলিলেই লোপ পায় না। সংসারকে অলীক মিথ্যা মরীচিকা

ব'লে ছেড়ে দেওয়া বিজ্ঞতা মাত্র—সংসার তো মিথ্যা নয়।'

এইখানে রবীন্দ্র-দর্শনের মর্মকেন্দ্র, এবং ইহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—গীতে, ছন্দে, রূপকে, জল্পনায়। তিনি বলিতেছেন, 'আমি সেই মূঢ়, যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না।' আরও বলিয়াছেন, 'এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি। সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টি ভূতের আড্ডা নয়। এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।' কিন্তু 'সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে, যা অনুরাগকেই বীর্যবান্ ও বিশুদ্ধ করে। কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।'

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই কবি মুক্তির সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

কর্মে মুক্তি

'কর্ম কখন বন্ধন হয়? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়।' আনন্দোদ্বুদ্ধ কর্মবাদ জীবনের বাণী—ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য। ঈশোপনিষদে আছে: অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ইহার তাৎপর্য কবি এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—'যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত, তারা অন্ধকারে পড়ে। যারা বিদ্যায়* অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত, তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।' 'ব্রহ্মজ্ঞানহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান ততোধিক শূন্যতা, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়।' কবি বলিতেছেন: 'যার ধর্ম যেটা, সেটা তার বন্ধন নয়, আনন্দ।' সুতরাং আত্মার অসীম সম্ভাব্যতার বিকাশ—বাস্তবে পরিণতি, শৃঙ্খল নয়। উত্তরোত্তর স্বভাবের স্ফূর্তি। ইহাতে মুক্তির আনন্দ আছে। দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই অনন্ত আকাশে ওড়া। এদিকে সংসার নীড়ে আছে আশ্বাসের আনন্দ।' 'বড়ো হইবার ইচ্ছা মানবের সত্য ইচ্ছা। ভূমাতে মনের সায়—দুঃখনিবৃত্তিতে নয়।' ইহার দৃষ্টান্ত—ভূমার সন্ধানে মানুষের অশেষ ক্লেশবরণ—নিজেকে অতিক্রম করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুস্বীকার।

জ্ঞানে মুক্তি

আনন্দের দুই দিক্ জ্ঞান ও প্রেম। এ দুয়েই আমাদের অন্তরের বিস্ফার—এই বিস্ফারই কাম্য—ইহাতেই ভূমাত্মতা। নিজেকে জানা ও পাওয়ার অভিযানে শেষ নাই—কারণ 'মানুষ সমাপ্ত নয়, না হওয়াই তার অনন্ত।' শ্রুতিতে যে তাহাকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এই অসীম সম্ভাব্যতাই উহার অর্থ। 'ইহাই তাহার পক্ষে পিতৃসত্য।' এই সম্ভাব্যতা—সত্য হওয়া, বাস্তব হওয়া—ব্রহ্মাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্মকে পাব—এত বড় স্পর্ধার কথা বলতে পারিনে—অসঙ্কোচে ব'লব ব্রহ্ম হব—হয়ে উঠছি।' 'জ্ঞানে ও প্রেমে এই আমিত্বের প্রসার। কত শত জাগার মধ্য দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি। জগৎ জীবনের দ্বারে অহরহ বলে জাগো—অনন্তের মধ্যে জাগরণ, দেহে জাগা, মনুষ্যত্বে জাগা।' আরও বলিয়াছেন, 'আমরা দেখি—সেটা দেখার কুঁড়ি মাত্র। বিরাট জগতে চোখ মেলে চাওয়ার

* আচার্যেরা এখানে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'দেবতাবিষয়ক জ্ঞান'। উঃ সঃ

চরম সুযোগ—চর্ম-চক্ষু দিয়ে চরম দেখা পরিপূর্ণ চৈতন্য-যোগে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা—স্বভাবে দেখা।' 'সমস্তই তাঁর দ্বারা আবৃত দেখবে—ইহাই উপনিষদের উপদেশ। পথও রমণীয়, পদে পদে অনন্ত, তাই সংসার ছাড়তে চাই না নেতি নেতি নয়—অন্তহীন ইতি' —কবির মতে ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

প্রেমে মুক্তি

জ্ঞানে ও প্রেমে আমিত্বের প্রসার—ইহা তাঁহার কথা। এই প্রসারের দুই প্রান্ত। 'বৈরাগ্য'শীর্ষক ভাষণে আছে:' পুত্র মিত্র নানা লোককে আপন ক'রে জেনে ছোটো-আত্মা থাকে না—বড়-আমির কাছে এগোয়--এ সবে মুগ্ধ আসক্তি চলে যায়।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান—ইতিহাসের সকল ধারা তাতে মিলেছে। উদার ঐক্যের দ্বারা ইহার সার্থকতা।' আরও বলিয়াছেন, 'সমাজে প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের স্বার্থ হয়ে উঠছে বৃহৎ আমি—সামাজিক, স্বাদেশিক, মানবিক আমি—বৃহত্তের প্রেমে সমস্ত তুচ্ছ করে।' এই ভাবেই তাঁহার ভাষায় বলা যায়, 'প্রেমের শতদল অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় ক'রে বিশ্বাত্মা পর্যন্ত পাপড়ি খুলে বিকাশ-লীলার সমাধান করে।' এইরূপে মুক্তি ও বিশ্বমানবতা কবির চিন্তায় এক স্থানে আসিয়া মিলিয়াছে।

অহং ও আত্মা

মুক্তির এই ধারণার সহিত অহং এবং আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে বিশ্বকবির উক্তিগুলি স্বতই চিত্ত আকর্ষণ করে। অহং এবং আত্মা নিবিড় বন্ধনে জড়িত এবং সকল দর্শন ও সাধনতত্ত্বে এ দুটি বহু আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কবির ভাষায়: 'অহং আলোক।' 'দ্রষ্টা—ইহাই নিজের নিত্য স্বরূপ 'অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ, কূল যেমন নদীর গতি ও রূপ দেয়।' 'আত্মা ন জায়তে ন ম্রিয়তে—অহং জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে।' 'দেশ-কাল-জাত অহং, কূলের দ্বারাই সে গতির সাহায্য করে।' 'অহং আত্মাকে কেবল বাঁধছে ও ছাড়ছে—এতে আত্মার মুক্ত স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে।' 'যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে, তাকে যখন ছাড়ি তখন মৃত্যু ঘটে। এই ভাবে এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি।' 'আমি'টিকে আর সকল হ'তে স্বতন্ত্র ক'রে অনাদি কাল থেকে (জীব) বহন ক'রে আনছে।' আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "ছোট ছোট জন্ম-মৃত্যুর সীমানায় নানা 'রবীন্দ্র-নাথে'র একখানা মালা।"

এই সকল লেখায় জন্মান্তরবাদ ও জীবদেহের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ—দুয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিবর্তনের আরম্ভ হইতে জীবাণুরূপে আবির্ভাব পর্যন্ত এই পৃথগ্‌ভাব চলিয়া আসিতেছে এবং উহার চরম বিকাশ মানবচেতনায়। ইহাকে 'বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদ' বলা যাইতে পারে। মৃত্যুপরম্পরার ভিতর দিয়া এই যে অমরতার অনুসরণ—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূতির এই যে ধারা—ইহাই অহং-তত্ত্বের সূত্র। সকল পরিবর্তনের ভিতর এই যে অপরিবর্তনের প্রত্যয়, সকল বিকারের ও বিনাশের মধ্যে যে অবিকারী ও অবিনাশী বস্তুর আস্বাদ—ইহা মানবতার বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুর রহস্য ও মহত্ত্বে মানুষ বিমুগ্ধ, ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ে চকিত ও বিভোর। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, উহা সাক্ষী। সুখদুঃখের ভোক্তা নয়--জ্ঞাতা, ইহা বেদান্তের প্রাচীন নির্ণয়। কবি লিখিয়াছেন, 'সুপ্তিতে ও নিদ্রাভিভূত

দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য—ইহা প্রত্যক্ষ হয় শুধু তাহার।' উপনিষদেও সেই প্রশ্ন—জাগ্রৎ স্বপ্নের সকল অনুভূতি বিলীন হইলে, সুষুপ্তির নিস্তরঙ্গ সত্তায় মিলাইলে, কোন্ আলোক থাকে অবশেষ?' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র অতল অন্তর—নিজ নিত্যস্বরূপ নিশ্চয় জেনে।'

মুক্তিতে ভেদ ও অভেদ

মুক্তি-কামনার সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে মানুষের আত্মজ্ঞান বা নিজ-স্বরূপের বোধ। আত্মতত্ত্বের বিবৃতিই উপনিষদের প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আত্মাকে পূর্ণ ক'রে, সত্য ক'রে জানা।' তিনি বলিয়াছেন: 'আধ্যাত্মিকতা আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অন্যথা ভ্রূণের মতো বা ডিমের মধ্যে জন্ম থেকে যায়। জন্মেও অজ্ঞাত থেকে যায় মানুষ।' 'ভ্রূণের মতো জগতের মধ্যে আবদ্ধ, জগৎ দেখতে পাই না।' 'তাই প্রার্থনা—আমাকে এই বিচ্ছেদ—এই অচৈতন্য—ঔদাসীন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে দাও।' দর্শনের বিচারে শুধু নয়, সাধনার পথেও অহংজ্ঞানের বিশিষ্টতা মানুষের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক্ করিয়া দেয়—ইহা ইতিহাসের কথা। অহংটি কল্পনা বা ভ্রান্তি মাত্র—পরমতত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হইলে সূর্যোদয়ে কুহেলিকার মতো ইহা মিলাইয়া যায়—অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এইরূপ। দ্বৈতমতে জীবের স্বাতন্ত্র্য নিত্যসিদ্ধ—ইহা বিলীন হইবার নহে এবং বিলীন হওয়াও আত্মার পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে। কবির লেখায় দুই ভাবেরই প্রকাশ চোখে পড়ে।

বিশ্বহীন নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি
সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ-ধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোন কিছু নেই—
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।

আর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, 'তবে কি আত্মবিলয়ের জন্য মানুষ কাঁদছে? পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়া হয়, তাহা হইলে এপারে দুঃখ, ওপারে ফাঁকি।'

কৈবল্য বা নির্বাণ কবির মুক্তিবাদে স্থান পায় নাই। অহমিকা-বিসর্জনে ভূমার উপলব্ধি ও উহাতে জীবনের পর্যবসান—তাঁহার লেখায় মহনীয় হইয়াছে। দুঃখনিবৃত্তি নয়—ভূমা স্বীকার—ইহাই লক্ষ্য। তিনি লিখিয়াছেন:

আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে।
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
অমৃতের আমি অধিকারী।

ত্যাগে নয়, দানে অমৃতত্ব

অহং-বিলোপ এই অমৃতলাভের সোপান—কিন্তু লক্ষ্য ভূমাত্মতা। কবি লিখিয়াছেন: 'তাঁহারাই মহাত্মা—যাঁহাদের অহং চোখে পড়ে না, আত্মা-কেই দেখি—তাঁহাকে বলি মহাত্মা। আত্মার কামনা ভূমার পরিণতি।' 'বৈরাগ্যস্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় করিয়ে দেয়।' কবি বলিয়াছেন: 'সংসারে কেবল সরা—কিছু পাওয়া নয়।' 'সংসার তো মিথ্যা নয়। সংসার দানের ক্ষেত্র। ত্যাগে নয়, দানে ঐশ্বর্য—অহং

দানের সামগ্রী। অহং উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনে—প্রথমে দানের সামগ্রী আমার ক'রে নেবার জন্য অহং-এর দরকার। অহংটা বিসর্জন শেষে। আত্মা ও পরমাত্মা—নিয়ে নয়, দিয়েই খুশী। ইহাই স্বভাব। ঈশো-উপনিষদে যে 'তেন ত্যক্তেন—' আছে, উহাতে বুঝিতে হইবে—তিনি ত্যাগ করিয়াছেন—তাই জীবনের উৎস চারিদিকে প্রবাহিত।

'সোনার তরী'তে দেখানো হইয়াছে—সংসারের এই চির-যাত্রী নৌকায় সকল সম্পদ বিনা আপত্তিতে বোঝাই হইতে পারে। কেবল অহং-এর স্থান নাই; তখন 'ছোট এ তরী'। ইতিহাসের অরুণোদয় হইতে মানুষের কৃতিত্বে সংসার-তরী নিরন্তর পূর্ণ হইতেছে—সমৃদ্ধ হইতেছে। কিন্তু কৃতীদের অস্তিত্ব—নাম পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। এমনি ভাবে অহমিকা বাদ দিয়া সমাজকে সেবা করা মানবজীবনের পূর্ণতা ও পরিণতি। 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব'—ইহার অর্থ তিনি বলেন—'সমাজসাধনা তপঃ।' তাঁহার কথা: 'দেবার ধর্ম—আনন্দের ধর্ম।' 'মানুষের অহঙ্কার বিসর্জনের জন্য। আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়।' আরও বলিয়াছেন: কে অনন্ত সত্য বন্দী করবে? আমরা বিশ্বযাত্রী—পান্থশালায় আবদ্ধ নহি। অহং-পরিহার ও আমিত্বের অন্তহীন প্রসার—লক্ষ্য ইহাই। 'নমস্তেঽস্তু নম আয়তে নমঃ পরায়তে'—ইহা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন, 'বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি—এই বোধ যাঁদের ছিল—তাঁদের পদধূলিতে ভারত পবিত্র।' 'নৈবেদ্যে' আছে:

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হ'তে প্রিয়
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হ'তে প্রিয়তম, নিখিল ভুবনে
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মবিহার

'এই ভূমায় পরিণতি—অহং যাহাতে মহান্ আত্মায় পরিণত হয়, ইহাই আত্মার কামনা। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব—এই আত্মার আকাঙ্ক্ষা। ইহাই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা।' কবি লিখিয়াছেন: 'বৌদ্ধ ধর্মের চরম নির্বাণ—শূন্য নয়, প্রেমের ভাবে আদান-হীন প্রদানের ভাবে পূর্ণ হওয়া।' 'শীল—মোহমুক্তির জন্য, মৈত্রীভাবনা আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পথ।' 'প্রেমকে জাগান মুক্তি—বুদ্ধ মঙ্গল-সাধনায় মুক্তি বলতেন।' সমাজ-সাধনার পরমোৎকর্ষ—এই আমিত্বের প্রসারে সর্বোচ্চ স্তর, বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় 'ব্রহ্মবিহার'। ইহার প্রথম সূচনা যজুর্বেদের সুপ্রাচীন মন্ত্রে:

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।

এই বিশ্বজনীন মৈত্রীভাবনা ও মৈত্রীপ্রার্থনা রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদের পরিণতি।

অদ্বৈতবাদে সর্বভূতে সমদৃষ্টি প্রকৃষ্ট নীতি। গীতায় সর্বভূতহিতে রতি—মুখ্য উপদেশ। ইহার মূলে সর্বজীবে একত্ববুদ্ধি—সকলই ব্রহ্মময় এই উপলব্ধি। কবি বলিয়াছেন, সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ ব্যক্ত ইচ্ছা—অব্যক্ত ইচ্ছা মঙ্গল ইচ্ছা—ব্রহ্মের ইচ্ছা—দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা। প্রেমের, যোগের, প্রকাশের মুক্তি—ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সূত্র বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহারের মূলে দার্শনিক তত্ত্বরূপে সর্বজীবের ঐক্য না থাকিলেও চিত্তের সরসতায় উহা অভিষিক্ত। কবি বলিয়াছেন, 'জগৎ-প্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ—এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী।' উপনিষদের ব্রহ্মবাদ—বৌদ্ধ 'মেত্তভাবনা'র সহিত মিলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানবতাবাদে নিলীন হইয়াছে,—ফলে সৃষ্ট হইয়াছে এক বিশাল সঙ্গমতীর্থ। অধ্যাত্মচিন্তার ক্রমবিকাশে উহার প্রেরণা অপরিমেয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

"এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নরনারী যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তারই দেহধারণ 'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—অর্থাৎ ধর্মকোষ রক্ষার নিমিত্ত। অতএব আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারকেই সেই মূল উদ্দেশ্যের অনুগামী ক'রে চলতে হবে। * * * এ কথা নিশ্চিত জেনো, যদি আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে তোমরা পাশ্চাত্যের ভোগৈকপরম জড়বাদী সভ্যতার পেছনে ছুটে চলো, তার ফল দাঁড়াবে এই যে, তিন পুরুষ যেতে না যেতেই তোমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে; কারণ আধ্যাত্মিকতার বর্জনে জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙে যাবে, যে ভিত্তির উপরে জাতীয় জীবনের সুবিশাল সৌধ গড়ে উঠেছে, সেই ভিত্তিই বিনষ্ট হবে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—সর্বতোমুখী ধ্বংস।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্মের বিজয়-নিশান ওড়াবার পর স্বামীজী কলম্বো ও জাফনা হয়ে পাম্বানে সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন। ৺রামেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে তাঁর প্রিয় শিষ্য রামনাদের রাজা সেতুপতি ভাস্করের সনির্বন্ধ অনুরোধে—তিনি যান রামনাদে। পাম্বানে জনসাধারণের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, তাতে ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু রামনাদবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় যে বক্তৃতা তিনি করেন (২৫শে জানুআরি, ১৮৯৭), —বস্তুতঃ তাকেই বলা যেতে পারে, সুপ্ত ভারতকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে তাঁর সর্বপ্রথম তূর্যনিনাদ। বক্তৃতার প্রারম্ভেই কি বিপুল আশা ও উৎসাহের বাণী, কি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তিনি আমাদের কানে ঢেলে দিচ্ছেন:

দীর্ঘতম রজনীর যেন অবসান দেখা যাচ্ছে,—সর্বাপেক্ষা বেদনানায়ক যে দুঃখ, অবশেষে তাও যেন দূরীভূত হ'তে চলেছে; এতকাল যা নিষ্প্রাণ শবদেহ ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছিল, তা যেন মহানিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে। একটি কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এসে পৌঁছুচ্ছে; এমন সুদূর অতীত থেকে স্বরটি আসছে যে, সেখানে ইতিহাস দূরের কথা, কিংবদন্তী পর্যন্ত তার ঘনান্ধকার গুহায় কোনরূপ আলোক-সম্পাতে অক্ষম। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূপী বিরাট্ হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই স্বর আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, উহা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট এবং গুরুগম্ভীর, এর ভাষাকে কিছুতেই ভুল বুঝবার জো নেই; দিনের পর দিন সেই স্বর ক্রমশঃ অধিক জোরালো হয়ে উঠছে। আর ঐ তাকিয়ে দেখ, আমাদের জননী জন্মভূমি নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জেগে উঠেছেন! এই জাগরণ হিমালয়াগত মৃদুপবনহিল্লোলের ন্যায় আমাদের মৃতপ্রায় অস্থিপেশীতে জীবন সঞ্চার করছে, আমাদের সমস্ত জড়িমা দূর ক'রে দিচ্ছে। যারা অন্ধ এবং বিকৃতবুদ্ধি, তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না যে,

যুগযুগান্তব্যাপী দীর্ঘনিদ্রার অন্তে মা আমাদের সত্যি জেগে উঠেছেন। আর কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না; আর কখনও তিনি নিদ্রায় অভিভূত হবেন না, বাইরের কোন শক্তিই আর তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না; কারণ, অনন্তশক্তিরূপিণী সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

স্বামীজী বলেছিলেন, বাইরের কোন শক্তিই আর ভারতকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল যে. আমরা নিজেরা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই এবং দ্রুত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে না পারি, তবে ভিতরের গলদ আমাদিগকে দাবিয়ে রাখতে ও আমাদের সর্বনাশ টেনে আনতে পারে। তাই রামনাদের বক্তৃতারই শেষের দিকে একটি সতর্কবাণী খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন। সেই সতর্কবাণীই বর্তমান প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বামীজীর মতে—প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয় ভাব আছে, সেই ভাব জগতের কাজে লাগছে এবং সংসারের স্থিতির জন্য এর বিকাশ অত্যাবশ্যক। জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে ভারতের নিজস্ব কিছু দেবার আছে এবং সেই জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। যদি তা দিতে পারি, তবেই আমাদের বাঁচা সার্থক। আর যদি দেবার চেষ্টাই না করি, তবে আমাদের বাঁচা অর্থহীন, এবং অচিরে আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।

ভারতের স্বকীয় ভাব কি? ভাব—মোক্ষলাভেচ্ছা। সুখদুঃখ দুই-ই বন্ধন; দুয়েরই পারে যেতে হবে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের প্রারম্ভেই স্বামীজী এ কথা তাঁর বিশিষ্ট ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা। ভারতীয় জ্ঞানীদের মতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; পরমাত্মাই জগতের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। আত্মাই শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মজ্ঞানই সত্যিকার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তি। পরমজ্ঞান-লাভের পর আর কিছুই জ্ঞাতব্য বা কোন কর্তব্য থাকে না। জীবন্মুক্ত হবার পর জ্ঞানী ব্যক্তি যেটুকু কর্ম করেন, তা শুধু লোকসংগ্রহের নিমিত্ত।

জ্ঞানলাভের দুটি পথ—এক প্রবৃত্তিমার্গ, অপর নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ স্বল্পসংখ্যক সাত্ত্বিকস্বভাব লোকের নিমিত্ত, আর প্রবৃত্তিমার্গ অপর সকলের নিমিত্ত। একেবারে শেষপ্রান্তে প্রবৃত্তিমার্গ নিবৃত্তিমার্গের সহিত মিলে গিয়েছে, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আলাদা—মহাজনেরা এ-কথাই বলেন। যে নিবৃত্তিমার্গ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী, সেই মার্গকে অধিকারী অনধিকারী বিচার না ক'রে সর্বসাধারণের জন্যে ব্যবস্থা করাতেই বৌদ্ধধর্ম পরিণামে দেশের ও সমাজের সর্বনাশ টেনে এনেছিল। দৈনন্দিন কাজকর্মের ভিতর দিয়ে স্বধর্ম পালনের দ্বারা যদি সমস্ত মনোবৃত্তিকে পরমার্থের অভিমুখী করা যায়, তাতেও পরিণামে মোক্ষলাভই হয়ে থাকে, হিন্দুশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই উপদেশ। হাত-পা গুটিয়ে অন্নবস্ত্রের অভাব ভোগ করা, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতে না পারা, অন্যায় অবিচার নীরবে সহ্য করা—অলস, নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করা,—এ সমস্তই অনার্যোচিত, গর্হিত, নিন্দার্হ। 'স্বধর্মপালন' বলতে কিছু 'করা' বুঝায়, নিষ্ক্রিয়তা বুঝায় না। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে 'করা' উপলক্ষ্য মাত্র, 'হওয়া' হচ্ছে লক্ষ্য। ভাব শুদ্ধ রাখতে পারলে 'করা'র ভিতর দিয়েই

আমরা ক্রমশঃ উন্নত ও পরিশেষে মুক্ত 'হই'। যখন করাটাই চরম হয়ে ওঠে, হওয়ার দিকে আর লক্ষ্য থাকে না, তখন 'করা'টা হয় বন্ধন ও অধঃপতনের কারণ। যারা অতিশয় উগ্রকর্মা, তারা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর অভিশাপ।

অধ্যাত্মবাদ কিংবা জড়বাদ—কোনটাই এক বিশেষ ভূখণ্ডের বা সমাজের একার সম্পত্তি নয়। তবে প্রত্যেক সমাজই কোন একটি বিশেষ আদর্শ অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। সেই আদর্শের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে,—তার সমস্ত অতীত ইতিহাস, তার গতি-প্রকৃতি তাকে সেই দিকেই ঠেলে নিয়ে যায়; আর আদর্শ যদি মন্দ আদর্শ না হয়, তবে তার অনুসরণের দ্বারা সে একদিকে নিজের চরম উৎকর্ষ লাভ করে, এবং অপরদিকে সমস্ত মানবসমাজকে সমৃদ্ধ করে। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ প্রশংসিত; কখনও অল্প, কখনও অধিক-মাত্রায় তা অনুসৃত হয়ে এসেছে। সংসারের অনিত্যতার কথা, ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, ভগবদ্ভক্তির কথা, শরণাগতির কথা, সর্বজীবে প্রেমের কথা—আপামর সাধারণ সকলের মুখেই শোনা যায়। আদর্শ ঠিকভাবে উপলব্ধ কিংবা অনুসৃত না হলেও, অন্ততঃ আদর্শের একটা আবছা-রকমের ধারণা এবং আদর্শের প্রতি একটা শ্রদ্ধালু ভাব এদেশের জনগণের চিত্তে সদা বিরাজমান।

আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রাধান্য বলতে সামাজিক জীবনে পার্থিব অভ্যুদয়ের প্রতি অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা বুঝায় না। প্রাচীন হিন্দুসমাজের জীবন একদিকে যেমন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত, তেমনই অপর-দিকে ছিল জাগতিক সকল বিষয়ে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং তার পর প্রায় এক হাজার বৎসর ক্রমাগত বিদেশীর ও বিধর্মীর আক্রমণ ও শাসনের ফলে হিন্দুসমাজে একটা নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট ভাব এবং চালাকি ও ভণ্ডামির প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করেছে। অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞানকেই অর্থাৎ ঘোর তামসিকতাকেই আমরা সত্ত্বগুণের প্রকাশ ব'লে ভাবতে ও চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়েছি; মর্কট বৈরাগ্যকে আমরা প্রকৃত বৈরাগ্যের আসনে বসিয়েছি। আমাদের এই দুর্দশা—স্বামীজী আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং জড়তা পরিত্যাগপূর্বক কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেশের যুবসমাজকে পুনঃপুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেবে, তারা প্রকৃত কর্মযোগীর ন্যায় কর্ম করবে—এই ছিল তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তা যদি নাও পারে, তথাপি আলস্যের চেয়ে কর্মিষ্ঠতা সর্বদাই প্রশংসনীয়। স্বামীজী বলেছেন, 'সত্ত্বগুণীর যে নৈষ্কর্ম্য, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্ত-ভাব মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মতো হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়।' সেই অবস্থায় না পৌঁছে শুধু ভালমানুষটি সেজে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীজীর কথায়—'অবশ্য কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, ভালমন্দমিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে

চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।'

সাধারণ মানুষের পক্ষে কর্ম ভিন্ন গতি নাই। আর কর্মের পথে পা বাড়ালে ধর্মের কথা আপনি আসে। হিন্দুর জীবনে আছে চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম* সব কিছুর মূলে। স্বামীজীর ভাষায় 'হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।' আগে ধর্মকাম, পরে মুক্তিকাম। ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষলাভ; আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায়—ধর্মপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। তাই স্বামীজী বলেছেন, ধর্মেতেই ভারতের প্রাণপাখী—'এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম।'

হিন্দুর জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন—স্বধর্মপালন। সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য আছে। ভাব শুদ্ধ রেখে যথাযথভাবে সেই কর্তব্যানুষ্ঠানের নাম স্বধর্মপালন। জীবন আহুতি দিয়েও স্বধর্ম পালন করতে হবে,—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'। রাজার প্রজার, অধ্যাপকের ছাত্রের, জমিদারের কৃষকের, মালিকের শ্রমিকের—প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বধর্ম আছে। সর্বাবস্থায় এই স্বধর্ম পালনীয়

সমস্ত সভ্য-সমাজেই স্বধর্মাচরণের আদর্শ কোন না কোন আকারে বিদ্যমান, এবং এর গুণগানের ছড়াছড়ি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাস্কিনের 'Roots of Honour' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে,—পাশ্চাত্যে 'Duty for duty's sake' (অর্থাৎ কোনরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা না ক'রে কর্তব্য-পালন) উচ্চতম আদর্শ ব'লে পরিগণিত; কারণ তদ্দ্বারাই সমাজ বিধৃত ও উন্নত হয়। ভারতীয় চিন্তাধারায়ও স্বধর্মপালনকে ব্যক্তির ও সমাজের অভ্যুদয়ের কারণ ব'লে গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পরমার্থ-লাভের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে। স্বধর্মপালন কর্মের ভিতর দিয়ে হয়, আর শাস্ত্রানুযায়ী সকল নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য 'জ্ঞান',—সাধারণ জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান মোক্ষ-লাভ করায় এ সেই জ্ঞান। 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় জ্ঞানের উদ্দেশ্য শক্তিলাভ, আধিপত্য-লাভ—(Knowledge is power); ভারতীয় চিন্তাধারায় সত্যিকার জ্ঞানের উদ্দেশ্য সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, মোক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগের কথা নানা-ভাবে বুঝিয়েছেন। ভয়বশতঃ কিংবা অপ্রীতি-কর অবস্থা এড়াবার জন্যে স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক মর্কট বৈরাগ্য অবলম্বন—বীরের কাজ নয়, কাপুরুষের কাজ। এতে ঐহিক ও পারত্রিক দু-রকমেরই অকল্যাণ হয়। 'স্বধর্ম' আজকাল জন্মগত নয়; নিজ নিজ বৃত্তি ও সামাজিক কর্তব্য আমরা নিজেরাই বেছে নিই, কিংবা বাইরের অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করি। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এই যে, 'স্বধর্ম' জন্মগতই হউক, কিংবা স্বেচ্ছাবৃতই হউক, স্বধর্মকে যথাযথ ও নিষ্কপটভাবে পালন করতে হবে এবং স্বধর্মপালনের দ্বারাই পরমার্থলাভের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই আদর্শ স্পষ্ট ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, বেদান্তই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূলসূত্র হওয়া চাই—উপনিষদুক্ত

* এখানে 'ধর্ম' অর্থে পাপপুণ্য-বোধ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, এবং তদনুযায়ী কর্তব্যপালন। যেহেতু এই বিচার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে মনুষ্যসমাজ বিধৃত হয় অতএব এর নাম 'ধর্ম'। ধর্ম অর্থে Religion নয়, কিংবা মোক্ষও নয়।

আত্মতত্ত্বে আমাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। তিনি বলেছেন :

বেদ যাঁর দ্বারা নিঃশ্বসিত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'গীতা'তে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য টীকা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত ক'রে রেখেছেন। যার যে প্রকার জীবিকাই হোক না কেন, 'গীতা' প্রত্যেকেরই উপযোগী এবং প্রত্যেকেরই জন্য উপদিষ্ট। বেদান্তের তত্ত্বসমূহ শুধু যে নিভৃত অরণ্যে কিংবা গুহাবাসে সাধনার বস্তু হয়ে থাকবে তা নয়; বাইরের কর্মজগতে তাদের প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। উকীলের সেরেস্তায়, বিচারকের বিচারাসনে, ধর্মপ্রচারকের বক্তৃতামঞ্চে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে,—এমন কি, যেখানে জেলে মাছ ধরছে, ছাত্র পড়া মুখস্থ করছে—সর্বত্র বেদান্তের তত্ত্বসমূহকে কাজে লাগাতে হবে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ, বালক কিংবা বৃদ্ধ—যে যেখানে থাকুক, বেদান্ত সবারই কাজে লাগতে পারে, বেদান্ত সবাইকে সাহায্য করতে সক্ষম। বেদান্তের নামেতেই ভয় পাবার কি আছে! প্রশ্ন উঠবে যে, এমন কি উপায় আছে, যাতে জেলেমালা প্রভৃতি নানা-শ্রেণীর লোক উপনিষদের আদর্শ নিজ নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করতে পারে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ-সম্পর্কে নূতন ক'রে পথ দেখাতে হবে না, পথের নির্দেশ (শাস্ত্রে এবং দৃষ্টান্তে) রয়েছেই। এই পথ এরূপ অনন্তবিস্তার এবং এই (বৈদান্তিক) ধর্ম এতই ব্যাপক যে, এর বাইরে কারও যাবার জো নেই। (বেদান্তের মতে) আন্তরিকতার সহিত, মনমুখ এক ক'রে যা কিছু তুমি কর, তাতেই তোমার কল্যাণ। ক্ষুদ্রতম কাজও যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাতেই অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায়; অতএব প্রত্যেকে যে যতটুকু পারে সে ততটুকুই করুক।—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' একজন জেলের মনে যদি বিশ্বাস জন্মে যে—সে 'আত্মা', তাহলে সে আরও ভাল জেলে হবে; একজন ছাত্রের যদি ধারণা জন্মে যে—সে আত্মা, তবে সে আরও ভাল ছাত্র হবে; একজন উকীল যদি মনে করেন যে—তিনি আত্মা, তবে তিনি আরও ভাল উকীল হবেন।

এই আদর্শই ভারতের চিরন্তন আদর্শ, এই দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। ব্যষ্টির এবং সমষ্টির জীবনে এই আদর্শকে অম্লান রাখা, জগদ্বাসীর নিকট এই আদর্শ প্রচার করাই হচ্ছে মানবসভ্যতার পূর্ণতাসাধনে ভারতবর্ষের বিশেষ দান এবং বিশেষ কর্তব্য, এই আদর্শ ও এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'লে আমরা নিজেরা অধঃপতিত হই, জগদ্বাসীকেও বঞ্চিত করি। এই অধঃপতন মৃত্যুরই সামিল।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজী-ব্যাখ্যাত এই জীবনাদর্শকেই ভারতবর্ষের যথার্থ আদর্শ ব'লে গ্রহণ ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে এবং কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের যে সমস্ত প্রবন্ধ 'The Foundations of Indian Culture'-নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রগঠনে ভারতীয় আদর্শকে অনুসরণ সম্পর্কে বিশদ এবং সুসম্বদ্ধ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই আলোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অলোকসামান্য প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। সমস্ত গ্রন্থখানিকে স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে, তার সম্ভাবনা অনুমান ক'রে তিনিও অনেক আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ

ক'রে গিয়েছেন। তার যৎসামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

The danger is that the pressure of dominant European ideas and motives, the temptations of the political needs of the hour, the velocity of rapid, inevitable change will leave no time for the growth of sound thought and spiritual reflection, and may strain to bursting point the old Indian cultural and social system, and shatter this ancient civilization before India has had time to re-adjust her mental stand and outlook, or to reject, remould or replace the forms that can no longer meet her environmental national necessities, create new characteristic powers and figures, and find a firm basis for a swift evolution in the sense of her own spirit and ideals. In that event a rationalised and westernised India, a brown ape of Europe, might emerge from the chaos, keeping some elements only of her ancient thought to modify but no longer to shape and govern her total existence. Like other countries she would have passed into the mould of occidental modernism ; ancient India would have perished.

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, স্বাধীনতা-লাভের পর যে উৎকট পরানুকরণ ও পরানুচিকীর্ষার মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে, তার ফলে আমাদের পিতৃপিতামহের সাধনা-দিয়ে-গড়া এবং আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষ আজ মহাবিপদের সম্মুখীন। যে ভারতীয় সংবিধানকে আমরা নূতন 'সংহিতা' ব'লে গ্রহণ করেছি, তার পশ্চাতে যে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রেরণা নেই,—তা বিদেশী পর্যবেক্ষকেরও দৃষ্টি এড়ায় না।*

স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ শেষ করা যাক : 'ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে জাতীয় জীবনের মর্মস্থল। আধ্যাত্মিকতাই মূল স্বর—যাকে অবলম্বন ক'রে জাতির সমগ্র জীবনসঙ্গীত মুখরিত। বহু শতাব্দী যাবৎ যে পথে চলে এসেছে— সেই গতিপথ থেকে বিচ্যুত ক'রে যদি কোন জাতি তার প্রাণপ্রবাহকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়, এবং সেই চেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে সেই জাতির মৃত্যু ঘটে। অতএব যদি তোমরা ধর্মকে দূরে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হও, এবং ধর্মের জায়গায় রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা অপর কোন বস্তুকে জাতীয় জীবনের মর্মস্থলে প্রাণকেন্দ্ররূপে স্থাপিত কর, তার ফল হবে এই যে তোমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বজায় থাকবে না।'

* Theodore L. Shay—The Legacy of the Lokamanya.

'ভারত-ভাস্করম্'

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

[রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি-জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা—ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত]

নান্দী

প্রণমামি বিশ্বালোক-ভারত-ভাস্করং
কবীন্দ্রকুলপ্রতিভা-সমুচ্চয়-রূপম্।
বিশ্বশান্তিনীড়-বিশ্বভারতী স্থাপকং
সাধনাবিগ্রহধরং রবীন্দ্রসুন্দরম্॥

যিনি বিশ্বালোক ও ভারত-ভাস্কর স্বরূপ,
যিনি কবিকুল-প্রতিভার সাররূপ,
যিনি বিশ্বশান্তিনীড় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা,
যিনি সাধনার মূর্ত প্রতীক—সেই রবীন্দ্র-সুন্দরকে প্রণাম।

সূত্রধার—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাকে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আদেশ করেছেন, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'ভারত-ভাস্করম্' মঞ্চস্থ করতে। সর্বকর্মনিপুণা নটী এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই এদিকে আসছেন। দেবি! নাটকারম্ভের যা যা প্রয়োজন, তা সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে তো?

নটী—নিশ্চয়। কিন্তু, আর্য! বিশ্বকবির জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে অত্যন্ত ভয় পাচ্ছি। প্রথমতঃ এটিই হ'ল রবীন্দ্র-জীবনী অবলম্বনে সর্বপ্রথম নাটকাভিনয়। দ্বিতীয়তঃ—তাও আবার সংস্কৃতে!

সূত্রধার—দেবি! তাই তো আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ, দুঃসাধ্য বিষয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করতে পারলেই তো চিত্তের শান্তি হয়। ভোজন-শয়নাদির ন্যায় ক্ষুদ্র কর্ম ক্ষুদ্র মানবও অনায়াসে সম্পাদন করতে পারে। পিতৃপিতামহকে পিণ্ডদানে কে না সক্ষম? কিন্তু গৌরীশৃঙ্গারোহণকারী ব্যক্তি অতি বিরল।

পুনরায়—দেবি! রবীন্দ্রনাথের জীবন অবিমিশ্র সুধাক্ষরণকারী, তার সর্বত্রই আনন্দরস প্রবাহিত হচ্ছে। আমার আশা এই যে, তাতেই সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ স্বতই পরিতৃপ্ত হবেন।

নটী—আর্য! তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাদের নাটকটি সংস্কৃত, এবং সংস্কৃত অতি কঠিন।

সূত্রধার—না, না, দেবি! সংস্কৃত ভাষা কঠিন নয়। উপরন্তু এটিই হ'ল নিঃসন্দেহে জগতের পবিত্রতম মধুরতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। পুনরায় ভারত-সভ্যতার শাশ্বত ধারক ও পোষক এই দেবভাষা ঋষি-কবির প্রাণ-স্বরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, নয় বৎসর বয়সে উপনয়নকালে যখন তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তাঁর দুই চক্ষু থেকে অকারণে অজস্র জল নির্গত হয়ে ধরণীতল সিক্ত ক'রে দিয়েছিল। সেই থেকে গায়ত্রী-সাবিত্রীই যেন তাঁর জীবন অধিকার করেছিল, তাঁকে রক্ষা করেছিল। ফলতঃ উপনিষদ্‌ই ছিল তাঁর জীবন।

নটী—আহা! কি সুন্দর এই সব কথা!

সূত্রধার—পুনরায়, শুনুন! জীবনের শেষভাগে বিশ্বকবি একবার শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন: ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, তার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরাজীর ভেতর দিয়ে আমরা নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে। তার মধ্যে আছে একটা গভীর বাণী, বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে

নটী—আহা! কি অপূর্ব এই ঋষি-বাণী!

সূত্রধার—কল্যাণি! সেজন্য কবির জীবনচরিতাবলম্বনে রচিত এই সর্বপ্রথম নাটকটি যে সংস্কৃতেই বিরচিত হয়েছে, তা তো সুষ্ঠুই হয়েছে। আমাদেরও সৌভাগ্য যে, আমরা এতে অংশ গ্রহণ করছি।

নটী—আমি এই বিষয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি। কিন্তু সিদ্ধি তো নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর। আমাদের জন্মভূমি কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, সেই সময়ে তাঁর পরিবার সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন। যাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ, স্বভাবতই তাঁর সৌভাগ্যের অন্ত নেই। অমৃতবৃক্ষের ফল তো রসপূর্ণ হবেই।

সূত্রধার—কিন্তু সুচরিতে! এরূপ পরিবারও যে বিপন্ন হবেন, সে এক অদ্ভুত কথা—লক্ষ্মীদেবীকে সকলেই নির্দয়া ও চঞ্চলা বলেন কি অকারণে? নতুবা মহর্ষিও বিপদ্‌গ্রস্ত হবেন কেন? এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু এই যে পরীক্ষা, তা তো নিজেই গৌরব-বিমণ্ডিত হ'ল, যেহেতু, ক্ষুরধার ন্যায়ের পথ সুধী-রা কোন দিন বর্জন করেন না।

নটী—নিশ্চয়।

সূত্রধার—মঙ্গলময়ি সুব্রতে! দেখুন—সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ প্রবেশ করছেন—

[প্রস্থান]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নারায়ণগঞ্জঃ গত ১০ই হইতে ১৪ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্র-পাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্য পূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। প্রথম দিন বৈকালে স্বামী শর্মানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ করেন এবং ১০ই, ১১ই ও ১৩ই ফাল্গুন সন্ধ্যারাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। প্রথম তিন দিন রাত্রিতে স্থানীয় বীণাপাণি অপেরা পার্টি 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা' গান করেন। ১৩ই রাত্রে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন।

১১ই মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল সাহেবার সভানেত্রীত্বে এক মহিলা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই বৈকালে এড্‌ভোকেট ডক্টর আলীম আল্‌রাজী সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোজাহারউদ্দিন আহাম্মদ 'ইস্‌লাম ধর্ম', ঢাকা হোলি ক্রস্‌ চার্চের ফাদার রেভারেণ্ড পিটার দেশাই ও ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন অব পাকিস্তানের সভাপতি মিঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'খৃষ্টধর্ম', ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রাণেশ সমাদ্দার 'ব্রাহ্মধর্ম', পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 'বৌদ্ধধর্ম' এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয় 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি সাহেব তাঁহার অভিভাষণে আলোচিত ধর্মসমূহের মূলনীতির ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্বমৈত্রীর আহ্বান জানাইয়া পাঁচ সহস্রাধিক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন।

১৩ই ফাল্গুন শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় শ্রীমান্‌ নিখিলচন্দ্র হালদার ও তপনকুমার দে স্বামীজী-রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও 'সন্ন্যাসীর গীতি' আবৃত্তি করে।

১৪ই রবিবার সারাদিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্রনারায়ণের সেবার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

কাটিহারঃ গত ১৭ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শান্ত এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৭ই পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত'পাঠ ও ভজন হয়। রাত্রে সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক 'মাথুর' পালা কীর্তন হয়। ১৮ই পূর্বাহ্ণে রামকৃষ্ণ বিদ্যা-মন্দিরের ছাত্রবৃন্দের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ বাংলায় এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীউপাধ্যায় হিন্দীতে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও স্বামী পরশিবানন্দ। ২২শে হইতে ২৪শে পর্যন্ত কলিকাতার রামায়ণ-গায়ক শ্রীনন্দলাল দে ভক্তিরত্ন কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়। ২৬শে রবিবার প্রায় ২,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন।

শিলচর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত কার্যক্রমানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২রা মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী-পূজা' কথকতা করেন।

৪ঠা মার্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভায় জি. সি. কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরায়, অধ্যাপিকা অপরাজিতা চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান-বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৫ই মার্চ রবিবার পূজা, পাঠ, আলোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি এবং পদাবলী-কীর্তনাদির মাধ্যমে সমস্তদিনব্যাপী আনন্দোৎসবে প্রায় ৮,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

টাকী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১শে হইতে ২৩শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে প্রভাতফেরী, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন প্রভৃতির পর ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী জীবানন্দ।

ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা করেন। রাত্রে ভারতীসংসদ কর্তৃক 'ভিখারী শংকর' যাত্রাভিনয় হয়।

২২শে রাত্রে শ্রীবিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায় কথকতায় রামায়ণের 'লবকুশযুদ্ধ' পালাগান করেন। ২৩শে রাত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রতিদিন 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা' কীর্তন করেন।

মনসাদ্বীপ ঃ গত ৬ই ও ৭ই মার্চ, মনসাদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

৬ই মার্চ মিশন হাই স্কুলের নূতন সুসজ্জিত 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞান-ভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলে পর কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ বসাক এবং শ্রীশ্যামানন্দ সাহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৭ই মার্চ প্রাতে বিশেষ পূজা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের শোভাযাত্রা ও অপরাহ্ণে ধর্ম-সভা অনুষ্ঠিত হয়। দূর গ্রাম হইতেও ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণ যোগদান করেন।

বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ বলেন: ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আলোকপাত ক'রে তাকে সর্ববিধ উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁদের জীবনের বড় শিক্ষা হ'ল, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—আমাদের কাজ করতে হবে, আর জীব-মাত্রকেই শিব-জ্ঞানে সেবা ক'রে সমাজে সুস্থ, সবল, পবিত্র ও সাবলীল গতিছন্দ আনয়ন করতে হবে।

রাত্রে ছাত্রদের দ্বারা 'বিজয় সিংহ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। দুই দিনই সবাক্ ছায়াচিত্র দেখানো হয়।

শেষদিন সভার পর প্রায় ৩,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা 'বন্দীর ছেলে' অভিনীত হয়।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা

গড়বেতা (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ দুইদিনব্যাপী মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার প্রাতে মঙ্গলারতির পর ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা সহকারে নাম সংকীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। বেলা ৮ ঘটিকায় স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও স্বামী শৈলানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ মন্দিরে প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২টায় স্বামী মহেশ্বরানন্দ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ৮,০০০ নরনারায়ণ বসিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও ভজন হয়।

রবিবার অপরাহ্ণে স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি মহতী ধর্ম-সভায় স্বামী মহানন্দ প্রধান বক্তা ছিলেন।

কার্যবিবরণী

সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলিকাতা): রামকৃষ্ণ মিশন 'সেবা-প্রতিষ্ঠানে'র ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯৩২ খৃঃ জুলাই মাসে 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতার ৯৯, শরৎ বসু রোডের পার্শ্বে প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই বিভাগগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে: স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতি-সদন, পরিষেবা ও ধাত্রীবিদ্যা কেন্দ্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক লন্ড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের মোট শয্যাসংখ্যা ২১০ (৭০টি ফ্রি); আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ৫,৭১৮ রোগী ভরতি হয়, তাহার মধ্যে ৪৭% ফ্রি চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮,৭০৪ (নূতন ১৫,৫০৭)। আলোচ্য বর্ষে পরিষেবা (nursing) ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৯১; ১৫ জন ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিযুক্ত হইয়াছে।

আসানসোল: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কর্মধারা প্রধানতঃ শিক্ষাধর্মসংস্কৃতি ও সেবাকে কেন্দ্র করিয়া।

১৯৫৮ ও '৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রম কর্তৃক শিল্প-বিজ্ঞান-কলা-বিভাগ-সমন্বিত একটি বহুমুখী বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ৭৩০ ও ৮৫০। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রতি বর্ষেই প্রশংসনীয়; '৫৮ খৃঃ ১০০% উত্তীর্ণ।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৬জন ছাত্র ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অপর একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে, এখানে ৫ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর ৩৫জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতা-দিবস, নেতাজী-দিবস রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রভৃতিও ছাত্রেরা সভাসমিতির মাধ্যমে মহা উৎসাহে উদ্‌যাপন করে।

১৯৫৯ খৃঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে রিলিফ করা হয়। ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনে সাহায্য দেওয়া হয়। আশ্রম রিলিফ কমিটি ১৫.১২.৫৯ পর্যন্ত ১২৭টি গ্রামে দুঃস্থদিগকে সাহায্য বাবদ ৪৫,৮৬৭ টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং ১১,০০০ টাকার জিনিসপত্র বিতরণ করিয়াছে।

ভুবনেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৭—'৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯১৯ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক এই পুণ্যতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়। তদবধি নিয়মিত পূজা, পাঠ, ধর্মালোচনা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের সেবাকল্পে মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খৃঃ। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষগুলিতে মোট ৬৫,২৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। ১৯৫৯ খৃঃ ফ্রি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫১ জন ছাত্র এবং ৬৪ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৯৫৮ খৃঃ কপিলেশ্বরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭৯ পরিবারকে বস্ত্র, চাল ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা হয়।

ভুবনেশ্বর ওড়িষ্যার নূতন রাজধানী, এখানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। মিশন-কর্তৃপক্ষের এখানে একটি আদর্শ বিদ্যার্থি-ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, যাহাতে স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ অধ্যয়নানুকুল পরিবেশে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারে।

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

গত ৩রা এপ্রিল ৫নং ডিহি ইণ্টালি-স্থিত কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের নবনির্মিত ভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডক্টর ডি. এম. সেন। এই গ্রন্থাগারে সংস্কৃতি-বিষয়ক সুনির্বাচিত গ্রন্থ রাখা হইতেছে।

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন: বিনা চাঁদায় স্থানীয় জনসাধারণ এই পাঠাগারে পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি অধ্যয়নের সুযোগ পাইবেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী: স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং রাজযোগের ক্লাসও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর, '৬০: হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দুইটি প্রধান প্রবাহ; পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায়; শ্রীশ্রীমা; দেবমানব খৃষ্ট।

জানুআরি, '৬১: হিন্দু বলিতে কি বুঝায়? সরল বিশ্বাসই জয়লাভ করে; স্বামী বিবেকানন্দের অনুশীলিত ও প্রচারিত হিন্দুধর্ম; ব্যক্তিগত দোষ কিরূপে দূর করা যায়? ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা; ভগবানের নামের শক্তি; হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ও তাহার অদৃষ্ট; আধ্যাত্মিক জীবনে সময়ের মূল্য; হিন্দুর জীবন-চিত্র।

ফেব্রুআরি: দুঃখেরও ফল আহরণ কর; হিন্দুবিবাহের আদর্শ; ক্ষুদ্র বিষয় ও অধ্যাত্ম জীবন; হিন্দুর ত্যাগাদর্শ; ভগবদ্গীতা; ধ্যানের প্রণালী; শ্রীরামকৃষ্ণ কি শিক্ষা দিয়াছেন?

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

পাণ্ডু ঃ বিগত ১১ই ও ১২ই মার্চ পাণ্ডুতে বিবেকানন্দ পাঠচক্র-প্রাঙ্গণে পাণ্ডু শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-সমিতির উদ্যোগে ডেপুটী চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজনকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। প্রভাতফেরী, মঙ্গলারাত্রিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে উৎসবের শুভারম্ভ হয়। সরল ভাষায় গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। দ্বিপ্রহরে ছাত্রদের প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। বৈকালিক একটি সভার অনুষ্ঠানে শ্রীবি. ডি. গৌর রেলওয়ে অফিসার ও কর্মচারী সমেত প্রায় সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। সভায় ইংরেজীতে স্বামী ভব্যানন্দ, হিন্দীতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ এবং বাংলায় স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিনে স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত সারদা-লীলাগীতি সকলকে মুগ্ধ করে। পালাকীর্তন ও বরগীতে সারাদিন উৎসব আনন্দ-মুখরিত থাকে। প্রায় ১৫,০০০ লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

হীরাকুদ (সম্বলপুর)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতি কর্তৃক ১৯শে ও ২১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানে উৎসব-স্থান মুখরিত থাকে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, রামলীলা-কীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ২,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীপ্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ পুরোহিত ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে বক্তৃতা দিলে পর স্বামী আপ্তকামানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিশেষত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দেন

আরারিয়া (পূর্ণিয়া)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুআরি এবং ১১ই ও ১২ই মার্চ পূজা-পাঠ, কীর্তন-ভজন, নারায়ণসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী পরশিবানন্দ এবং শ্রীহরিলাল ঝা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

ছাপরা (বিহার)ঃ স্থানীয় কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ২৩শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের অধ্যক্ষতায় সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। সভায় বাঙালী বিহারী প্রায় ২০০ শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ভজন গান হয়। গীতা এবং উপনিষদ্ পাঠের পর ডাঃ শ্রীশিবদাস সুর হিন্দীতে ঠাকুরের সারগর্ভ বাণী আলোচনা করেন। বক্তৃতাশেষে ভজন, আরতি ও সর্বশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইছাপুর ঃ হরিসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, পূজা, হোম, কালীকীর্তন ও 'মানুষের ঠাকুর' অভিনয় হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিন অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীবিজয়গোপাল বিশ্বাস।

কদমতলা (হাওড়া)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী সুশান্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর : গত ১০ই হইতে ১২ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ৯৮তম্ শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে তদীয় পুণ্য জন্মস্থান রাজারহাট-বিষ্ণুপুরস্থিত আশ্রমে অষ্টম বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-মাহাত্ম্য' কীর্তন, কালীকীর্তন, ভজন, গীতাপাঠ, সঙ্গীত সহযোগে 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ এবং কলিকাতার বহু ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তত্ত্ব' বিশ্লেষণ করেন।

গ্রন্থাগার-ভবনের উদ্বোধন

বহরকুলি (বর্ধমান) : গত ১২ই ফেব্রুআরি এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী অজজানন্দ। ইহার পর আয়োজিত সভায় বর্ধমান জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও কালনা মহকুমাশাসক শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সময়োচিত ভাষণ প্রদান করেন।

অপরূপ স্থাপত্য শৈলী

সম্প্রতি কর্ণসুবর্ণে একটি অপরূপ স্থাপত্য-কর্মের সন্ধান মিলেছে। চুন দিয়ে প্রস্তুত গুপ্ত-যুগের এক দেবময় মুখমণ্ডল।

কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙামাটি। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে অনেক বৌদ্ধ সংঘ দেখেছিলেন। এমনি একটি বিশিষ্ট সংঘ ছিল লো-তো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকায়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি শুধু রাজা শশাঙ্কের শাসনকেন্দ্র নয়, সমগ্র গৌড়বাসীর অতি প্রিয় নগরী ছিল। এখান থেকেই গুপ্তযুগে সুদূর প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে দুঃসাহসী নাবিকের দল।

আজ কত শত বছর পরে সেই কর্ণসুবর্ণেই স্থাপত্যকর্মের সুন্দর একটি নিদর্শন মিলেছে। লাবণ্যঘন মুখমণ্ডলটির নিম্বপত্রাকৃতি অর্ধ-নিমীলিত আঁখি, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ ও ভূষণময় কর্ণ একদিকে যেমন গুপ্তযুগের শিল্পশৈলীর পরিচয় দেয়, তেমনি বাংলা দেশের কোমলতার ছাপও এতে সুস্পষ্ট।

বিশেষজ্ঞদের মতে অজন্তা গুহা-চিত্রের বোধিসত্ত্বের সহিত এই মুখমণ্ডলের বিশেষ মিল রয়েছে। বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডলে যে স্বর্গীয় প্রশান্তি ও মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়, গুপ্তযুগের এই নবপ্রাপ্ত স্থাপত্যের মধ্যেও তা পূর্ণভাবে প্রকাশিত।

[আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংকলিত]



সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম

নিয়ত শান্তভাব অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, ঈর্ষাপরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য-বিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম। দিবারাত্রি ধর্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্মলাভ হয়। যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে; সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যজনক কার্যের সাধন ও ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক অর্থ উপার্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্মসঞ্চয়, এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্বতোভাবে বিধেয়।

যে ধর্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম কহে। এক রাত্রির অধিককাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা নিবৃত্তি-ধর্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধন-বিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রামে বা এক নদীতীরে অনেকদিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম অপেক্ষা সুখ দুঃখ জরা মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

[মহাভারত অনুশাসন পর্ব, ১৪১তম অধ্যায় হইতে]

একটি 'আধ্যাত্মিক' ধর্ম

ধর্মকে অস্বীকার করিলেও জীবনকে অস্বীকার করিয়া আমরা জীবনযাপন করিতে পারি না। জীবন কি ভাবে যাপন করিব? কেন এ জীবন?—এই সব প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানেই ধর্ম আবার ফিরিয়া আসে এবং জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা বলিয়া থাকি—জীবন গঠন করিতে হইবে, জীবনে উন্নতি করিতে হইবে; তখনই প্রশ্ন ওঠে—জীবন কি? কিভাবে জীবন গঠন করিব, কি করিলে জীবনে প্রকৃত উন্নতি হয়? আধুনিক চিন্তার বিচারে বলা যায়, জীবন একটি শিল্প,—বোধ হয় শ্রেষ্ঠ শিল্প, সূক্ষ্মতম শিল্প।

এখন একটি শিল্পকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে যেমন বাহিরের উপাদান প্রয়োজন, তেমনই সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন শিল্পবিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞান—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক (Theoretical and Practical) জ্ঞান।

জীবন-শিল্পের উপাদান প্রবহমান সময় বা কাল; প্রতিটি মুহূর্ত, দিন, বৎসর—ইহারাই এই সূক্ষ্মতম শিল্পের উপাদান। পরিকল্পনা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ চিন্তার উপর। এই ভবিষ্যৎ লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাই পরিশেষে ধর্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম লইয়া মতভেদ যতই থাকুক, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে বিস্তৃত মানুষের একটি সত্তা সকলেই স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া মানুষ জীবনগঠনের কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করিতে পারে না। ধর্মই সেই বিজ্ঞান, যাহার সহায়ে আমরা জীবন গঠন করি।

ধর্মকে বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার পূর্বে অবশ্যই দেখিতে হইবে, ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না? তৎপূর্বে আরও জানিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলিতেই বা আমরা কি বুঝি।

সাধারণত বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি চিরন্তন নিয়ম আবিষ্কার করে; এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞান-সহায়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছামত প্রকৃতিকে সেই পথে চালিত করিয়া মানুষ নিজের দুঃখদুর্দশার লাঘব করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম আছে বলিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পুনরাবর্তিত হইবে। ধর্ম সম্বন্ধেও এরূপ নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় কি? তাহার উত্তর: ধর্মকে যাঁহারা বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—বহিঃপ্রকৃতির মতো অন্তঃপ্রকৃতিও একই পরিবেশে একই প্রকার ব্যবহার করিবে, তবে এ ক্ষেত্রে একই প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিনতর। এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা ও বিশ্বাসপূর্বক ধর্মাচরণ।

একটি বৃহৎ শিল্প-ব্যাপারে প্রতিটি মজুর বা কেরানি জানে না সেই শিল্পের সূক্ষ্ম দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী, সে জানে—তাহাকে তাহার কর্তব্যটুকু করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতেই তাহার নিজের উন্নতি, এবং সমষ্টিরও উন্নতি। বিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির সার্থকতা এই দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে।

জীবন-পরিকল্পনায় ধর্ম বা কর্তব্য কর্মের স্থান সর্ব প্রথম, এখানে বিশ্বাসই বড় কথা, তবে বিশ্বাসই ধর্মের বা জীবন-বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় কল্যাণময়ী জননী তাহাকে বিধিনিষেধই শিক্ষা দিয়া থাকেন, বলেন: এইরূপ করিও, এই দ্রব্য খাইও, সুখ পাইবে; এইরূপ করিও না, এই দ্রব্য খাইও না, দুঃখ পাইবে! ইহাই ধর্মের আদি পর্ব। শিশুকে যদি প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু বুঝিয়া করিতে হয়, তবে শৈশবেই একদিন তাহার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটিবে।

লৌকিক কত ব্যাপারে আমরা কোন যুক্তিতর্ক না করিয়া শুধু বিশ্বাসবলেই চলিয়াছি, পথিকের কথা শুনিয়াই তো অল্প সময়ে অধিক পথ অতিক্রম করিয়া থাকি, ধর্মের ব্যাপারেই বা অন্যরূপ হইবে কেন? তবে একথা ঠিক নয় যে, ধর্মের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই। শিশু যেমন বড় হইয়া বুঝিতে পারে, কেন তাহার মা তাহাকে কতগুলি কাজ করিতে বলিয়াছেন এবং কতগুলি নিষেধ করিয়াছিলেন, তেমনি মানুষ ধর্মজীবনে অগ্রসর হইয়া বিধিনিষেধের তাৎপর্য বুঝিতে পারে। বিধিনিষেধই ধর্ম নয়, ইহা সুস্থ জীবনের প্রস্তুতিমাত্র।

প্রতি ধর্মেই কতগুলি রীতিনীতির উপর জোর দেওয়া হয়। তাহার সাহায্যে শরীর, মন, পরিবার, সমাজ সুগঠিত হয়। এই রীতিনীতিগুলি আবার পুস্তক-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ একটি ধর্মগ্রন্থকে সকলে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করে। আরও দেখা যায়, সেই ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একটি আদর্শ পুরুষকেও সকলে মান্য করে এবং তাঁহার নির্দেশে জীবনপথে চলিয়া থাকে। সুসংগঠিত সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির ইহাই ভিত্তি।

সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের প্রথম ভাগে এই ধর্মগ্রন্থ ও আদর্শ পুরুষ একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও—এই পুস্তক-কেন্দ্রিক, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা সাম্প্রদায়িক ভাবই ধর্মের শেষ কথা নয়। চারাগাছের জন্যই বেড়া প্রয়োজন, মহীরুহ বেড়া ভাঙিয়া আকাশে বিস্তৃত হয়; 'চার্চের মধ্যে জন্ম অবশ্যই ভাল, কিন্তু তাহার মধ্যে মৃত্যু কখনই কাম্য নয়।' সম্প্রদায়ের স্নেহক্রোড়ই প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, কিন্তু সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পরিণত মনীষাকে বা উন্নত সাধককে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

এইখানেই শুরু হয় ধর্মজীবনের দার্শনিক স্তর। পৃথিবীতে প্রচলিত ও প্রচারিত অধিকাংশ ধর্মই পুস্তক-কেন্দ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। অনুভূতির উষ্ণতা কমিয়া গেলে ক্রমশঃ এগুলি আচারপ্রধান কঠিন আকার ধারণ করে; বিচারপ্রধান মন তখন বাহির হয় ধর্মের আর একটি উর্ধ্বতর বিকাশের সন্ধানে—যেখানে পুস্তক নাই, ব্যক্তি নাই, সম্প্রদায় নাই; আছে এক উদার গভীর অনুভূতি, যাহা বিশ্বজনীন, সার্বকালিক। ভারতের ধর্মসাহিত্যেই পাওয়া যায় এই ক্রমবিকাশের এক যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস!

জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্বর্গ ও চতুরাশ্রমের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, 'ধর্ম'ভিত্তিক 'অর্থ-কাম' ভোগের পর 'মোক্ষে'র লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের জীবনে কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস আপনি আসিত। আজীবন বেদবিধি মানিয়া চলিবার পরই বেদান্ত-সাধকের অধিকার জন্মে বেদবিধি লংঘন করিবার। সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বেদ নিজেই বলিতেছেন, 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি'।

উর্ধ্বস্তরের এই ধর্মকে যে কি বলা সঙ্গত, তাহা আমরা জানি না। সাধারণত ইহাকে

আমরা আধ্যাত্মিকতা (spirituality) বলিয়া বুঝি। শরীর-মনে অধিষ্ঠিত আত্মা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-সহায়ে নিজের স্বরূপ নিজে উপলব্ধি করেন, বেদান্ত এই সাধনারই নির্দেশ দিতেছেন। বেদান্তের এই সাধনা কোন দেশে কালে বা ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্বক এই সাধনায় অগ্রসর হইবে, সাধনার শেষে সেই অনুভব করিবে: আমি একটি শরীরমাত্রে আবদ্ধ নই, একটি মনের চিন্তায় বা কোন মতের মধ্যে বন্দী নই; আমি মুক্ত, আমার আত্মা সকলের মধ্যে বিস্তৃত; অথবা 'নানা' বা 'সকল' বলিয়া কিছু নাই, অদ্বিতীয় এক চৈতন্য সত্তাই নানাভাবে প্রতীয়মান—সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে দেখা যায়।

অদ্বৈত বেদান্তের এই উচ্চতম শিখর হইতেই আমরা ধর্মের বিভিন্ন স্তরকে যথাস্থানে দেখিতে পাই এবং বুঝি মানবজীবনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের গতিপথে প্রত্যেকটিরই মূল্য আছে, তবে মূল্যমাত্রই আপেক্ষিক। অদ্বৈত বেদান্তের এই ব্যাপক দৃষ্টির বলেই আমরা সকল ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারি। বেদান্তই সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্র উপলব্ধি করিয়াছে; এবং যেহেতু বিজ্ঞানের লক্ষ্য ঐক্যানুভূতি, সেদিক দিয়া আমরা বেদান্তকে 'ধর্মের বিজ্ঞান' আখ্যা দিতে পারি। বেদান্তই ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বেদান্তই ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান—মনের এই ত্রিধারা বেদান্ত-প্রয়াগে মিলিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মানবতার সাগর-সঙ্গমে। বেদান্তই ধর্মের শুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপ, যাহা দেশ-কাল ব্যক্তি-পুস্তক—সব কিছু স্বীকার করিয়াও সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।

এই বেদান্তের সাহায্যেই আমরা সকল ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি, বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ কেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন; বুঝি, তাঁহাদের লক্ষ্য এক—সে লক্ষ্য মানুষের বন্ধনমুক্তি—দেহমনের বন্ধনমুক্তি, স্বার্থসীমার বন্ধনমুক্তি! বেদান্ত-সহায়েই আমরা বুঝিতে পারি—'শেষে সব শেয়ালের এক রা'। অনুভূতির চরম শিখরে সকল সাধকই এক কথা বলিয়াছেন, তখন ভাষার বিচিত্রতা থাকিলেও ভাবের বিভিন্নতা নাই।

দেশকাল-নিরপেক্ষ এই বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Eternal Religion) সহসা কোন দিন কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই। ইহা কোন ঐতিহাসিক ধর্ম (Historical religion) নয়, তা বলিয়া ইহা প্রাকৃতিক বা আদিম ধর্মও (Primitive natural religion) নয়, ইহা কঠোর সাধনসাপেক্ষ। প্রতিপদে অন্তর্বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মহাপুরুষের আদেশ ও গ্রন্থের নির্দেশ অবলম্বন করিলেও ইহা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গ্রন্থকেন্দ্রিক ধর্ম (Person- or Book-centred) নয়। এই ধর্ম সংঘবদ্ধ ভাবে প্রচার করিয়া সকলের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা Organized religion নয়, অথচ মানব-মনের ক্রমবিকাশের ফলে সকলকেই শেষে ইহার দেহলী অতিক্রম করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে হইবে।

বেদান্তই সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম (Spiritual Religion) যাহার সন্ধানে আমরা বাহির হইয়াছি। জীবনের বিজ্ঞান ধর্ম, ধর্মের বিজ্ঞান বেদান্ত (Science of religions). বেদান্তের দৃষ্টিতেই আমরা বুঝি—জীবন কি, জীবন কেন; বুঝি—কি ভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে, কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে।

২৫শে বৈশাখ

'চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ' ডাক শুধু শতবর্ষ পূর্বে একটি জীবনারম্ভের ঘোষণা নয়, এ ডাক রবির উদয়-লগ্নে জাগরণের আহ্বান, পতন-অভ্যুদয়ের পথে নবতম উদ্যমের আহ্বান; এ ডাক সীমা হইতে অসীমের অভিযানে, জানা হইতে অজানার সন্ধানে। এ ডাক চিত্তে চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া যায় জাগরণের শিহরণ, নবজীবনের স্পন্দন! এ ডাক 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিয়া যায়, 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ধ্বনিয়া তোলে। এ ডাক দূর-দূরান্তরের মধ্যে, বিচ্ছিন্ন বিভেদের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে। এই ডাকই আজ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উৎসব-আয়োজনে।

উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে আমরা যেন এ ডাকের অন্তর্নিহিত অর্থ ভুলিয়া না যাই। যুগে যুগে দেশে দেশে কত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া সমসাময়িক জীবনের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া আপন প্রাণের একতারায় কত গান গাহিয়া যান, কিছুকাল প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়। দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া অধিকতর গর্ব ও গৌরব করিবার অধিকার বাঙালীর স্বাভাবিক, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্র-ভাবধারার মূলপ্রবাহটি বহন করিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্বও তাহার সমধিক। যে বিশ্বমানবতার উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ, তাহার ভিত্তি রাজনীতিক আন্তর্জাতিকতা নয়, তাহা মানুষের আত্মার আত্মীয়তার বহিঃপ্রকাশ।

আজকাল যখন চারিদিকে মুখে আন্তর্জাতিকতার বক্তৃতা, মনে প্রাদেশিকতার চিন্তা; মুখে স্বদেশীয় ঐতিহ্যের গৌরব-গবেষণা, মনে বিদেশীয় সভ্যতার মোহমদিরা, তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়।

রবীন্দ্র-জীবন অনুধ্যান করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান আবেদন আধ্যাত্মিক, তাহারই আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার জীবন-শতদল। জীবনের কোন কিছুকে অস্বীকার করিয়া নয়, সুখদুঃখ-আনন্দবেদনাময় সমগ্র জীবনকে গ্রহণ করিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে কবির হৃদয়ের গভীর বাণী।

এক আধ্যাত্মিক চেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছে তাঁহার মানবিক বেদনা, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জাতীয় জাগরণের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই তিনি গাহিয়াছেন বিশ্বমানবের জয়গান।

সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ধর্মোপদেশ—রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্তরে স্তরে সজ্জিত; সেগুলিকে অবহেলা করিয়া শুধু নৃত্যনাট্যের মায়াজালে আমরা যেন প্রকৃত কবিকে হারাইয়া না ফেলি। কুসুমকোমল কবি-চিত্তের অভ্যন্তরে যে বজ্রকঠিন ধাতু রহিয়াছে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিপৎকালে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আমরা যেন বিপদ অতিক্রম করিতে সক্ষম হই, রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি যেন আমাদিগকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার প্রেরণা জোগায়।

বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

[জাতির শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণে বেলুড়ে একটি অভিনব পরিকল্পনা]

শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন : অধ্যাত্মশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুইটির নিয়ন্ত্রিত সমবায়েই প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। ভারতের প্রাচীন চিন্তাসম্পদকে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্য তিনি এমন একটি শিক্ষার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহা একদিকে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির অভিনব গুণগুলিকে গ্রহণ করিবে, তেমনি শ্রদ্ধা জ্ঞানানুশীলন ও নীতিধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শগুলিকে সবার উর্ধ্বে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করিবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন : জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে সুসমৃদ্ধ করিতে হইলে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সাফল্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যাকে সংযোজিত করা হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বহু ঈপ্সিত বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া উহারই আংশিক বাস্তব রূপায়ণ হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯৪১ খৃঃ বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষায়তনটি এতদিন অভাবনীয় সফলতার সহিত আবাসিক মাধ্যমিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান কলেজ হিসাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে এবং উহার পরিবিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায় ১৯৬০ জুলাই হইতে ইহাকে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহার কলিকাতা বিশ্বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বি. এ. ও বি. এস-সি. বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকগণের সাহায্যে এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

ইংরেজী	(পাস ও অনার্স)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	(পাস)
বাংলা	(আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক, পাস)	দর্শন	(পাস)
সংস্কৃত	(পাস ও অনার্স)	গণিত	(পাস ও অনার্স)
ইতিহাস	(,,)	পদার্থবিদ্যা	(,,)
অর্থনীতি	(,,)	রসায়নবিদ্যা	(,,)

এই ত্রৈবার্ষিক কলেজটির সহিত একটি সুবৃহৎ পাঠাগার, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, সুন্দর ছাত্রবাস প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও যুক্ত করা হইয়াছে।

আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

[উপরি-উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো প্রস্তাবিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও সফল হইয়া জাতির শিক্ষার প্রগতিকে আরও অগ্রগামী করিবে সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এইরূপ মহতী প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। উঃ সঃ]

চলার পথে

'যাত্রী'

'আঘাতের বদলে আঘাত হানো' ; এ কথা যে ব'লল, সে জীবমাত্র, সে মানুষ নয় ; সে জীব-মানব, সে দেব-মানব নয় ; সে মিথ্যা, সে সত্য নয়। তাই জড়বিজ্ঞান যখন ব'লল : প্রত্যেক কর্ম-প্রচেষ্টারই একটি সম-পরিমাণ ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া আছে (every action has an equal and opposite reaction), অর্থাৎ ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হবে—তখন বুঝতে হবে, আমরা চৈতন্যময় হয়েও জড়বিজ্ঞানের নিষ্প্রাণ আইনে আটকে গেছি। দাঁতের বদলে দাঁত (tooth for a tooth), চোখের বদলে চোখ (eye for an eye)—এ সব কথা ঐ জীব-মানবই বলতে পারে। আর দেব-মানবের কণ্ঠে তখন জাগবে—আসিসীর সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভাষায় : হে ভগবান, আমাকে তোমার শান্তির যন্ত্র ক'রে তোলো। যেখানে ঘৃণা সেখানে তা প্রেমে মুছে দিতে দাও ; যেখানে আঘাত সেখানে আমায় ক্ষমাসুন্দর করো ; যেখানে সন্দেহ সেখানে বিশ্বাস আনতে দাও ; যেখানে হতাশা সেখানে যেন আশার আশ্বাস পৌঁছে দিই ; যেখানে অন্ধকার সেখানে যেন আলোর বারতা আনি ; যেখানে বিমর্ষতা সেখানে যেন আনন্দের আবাহন জাগিয়ে তুলি।

খুব খারাপ অবস্থাতেও খাঁটি মানুষ নীচ হ'তে পারে না—কর্পূরকে জ্বালালে সে কি তার সুবাস ছড়ায় না? ধূপকে পোড়ালে সে কি চৌদিকে গন্ধ ঢেলে দেয় না? দীপকে অগ্নিদগ্ধ করলেও সে কি আলোকের আনন্দে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলে না? তোলে। আর এই তোলে বলেই জড়ত্বের কুণ্ঠিত দীনতার আগল ভেঙে আমার আনন্দঘন প্রাণশিখাটি অবাধ ও অসীম হয়ে ওঠে।

গল্পে আছে : এক সাধু নদীতে স্নান করছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি কাঁকড়াবিছা জলে ভেসে যাচ্ছে। সাধু তাকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন, সে কিন্তু ঐ সাধুর হাতে হুল ফোটালো। সাধুটি যন্ত্রণায় কাতর হলেন। বিছাটা আবার জলে পড়ে গেল, আবার তিনি তাকে তুলে দিলেন। এবারও বিছাটা তাঁকে কামড়ালো। আর একজন লোকও সেই সময়ে নদীতে স্নান করছিলেন। তিনি সাধুকে ঐ ভাবে যন্ত্রণা পেতে দেখে বললেন, 'কেন আপনি ওকে বাঁচাতে গেলেন? ও যে আপনাকে কামড়ে শেষ করছে?' উত্তরে সাধু বললেন, 'ও সামান্য জীব হয়েও ওর স্বভাবমত কাজ করছে, আর আমি বিবেকবান্ মানুষ হয়ে আমার স্বভাব ভুলে যাব?'

আমাদের 'স্বধর্মেই' এই নীতিবোধটিকে কিন্তু আমারা এই জড়বিজ্ঞানের যুগে হারাতে বসেছি, পরিবর্তে কেমন এক বিচার-বিশ্লেষণহীন স্থাবর আনন্দে আমরা বুঁদ হয়ে আছি—এতে ঝিমিয়ে পড়ার মাদকতা আছে, কিন্তু ছুটে চলার উদ্দীপনা নেই। অবশ্য এর কারণও আছে। আগে গ্রীষ্মকালে টানাপাখা দিয়ে যে বাতাস ক'রত—সে ছিল মানুষ। তাই তার প্রতি করুণা দেখিয়ে কখন কখন বলেছি, 'থাক্, তোমার কষ্ট হচ্ছে।' এখন আমাদের

মাথার ওপরে বিজলী-পাখা। সেটা জড়পদার্থ। তাই তাকে করুণা করার কথাই ওঠে না। এমন ক'রে আলো-বাতাস ও অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চারিদিকে যত বেশী জড়ের সমাবেশ বেড়ে উঠছে ততই আমাদের মনেরও পক্ষাঘাত বাড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে থাকলে যতই সাবধান হও, একটু আধটু কালি লাগবেই। তাই জড়ের ঘরে বাস ক'রে জড়ের ছোঁয়া আমরা এড়াব কি ক'রে? আমাদের চারিদিক ঘিরে যদি প্রাণসত্তা স্পন্দিত হ'ত, আমরাও প্রাণবান্ হতাম; সত্যকার 'বিজ্ঞান' আলোচনার অবকাশ পেলে সেই 'বিশেষ' জানার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হতাম। কিন্তু এখন সে সবের অভাবেই কেমন এক নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশায় স্থবির হয়ে আমরা ক্রমেই আনন্দের স্বর্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছি। এই কথা মনে করেই টি. এস্. এলিয়ট্ বলেছেন:

> 'Where is wisdom we have lost in knowledge?
> Where is the knowledge we have lost in information?
> The cycles of heaven in twenty centuries
> Bring us farther from God and nearer to dust.'

আমাদের মাঝে সেই জ্ঞানসত্তা কোথায়? আমরা যে জড়বিজ্ঞানের কথায় ডুবে আছি। আর জড়বিজ্ঞানই বা কি বলছি, আমরা তো কেবলমাত্র সংবাদ-সংগ্রহেই মত্ত। এই বিংশ শতাব্দীর গতিচক্রে আমরা ক্রমে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হয়ে ধূলায় গিয়ে পড়ছি।

সত্যি, এ একটা অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি—যেখানে আমাদের tradition যাচ্ছে হারিয়ে; মনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হচ্ছে। অথচ কেমন এক অমানবীয় সত্তার সংস্পর্শে, এক মিথ্যা জীবন-পিপাসার নেশায় আমরা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব-ভিত্তি থেকে নীচে নেমে যাচ্ছি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়—"this is a generation which knows how to doubt, but not how to admire, much less to believe'—এ যুগে আমরা সন্দেহ করতেই শিখেছি, প্রশংসা করতে শিখিনি, আর বিশ্বাস করা তো অনেক দূরের কথা। তাইতো অন্তরের আনন্দলোক থেকে আমাদের প্রণতি স্বতই উৎসারিত হয় না।

এর কারণ আমরা যথার্থ মনুষ্যধর্ম পালন করছি না। আমরা আজ ভুলতে বসেছি, 'যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'—যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ এই জীবনের উন্নতি হয় এবং পরে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ করি, তাকেই ধর্ম বলে। এই উদার ধর্মের সাধনাই আজকে আমাদের করতে হবে; আমাদের সত্যকার মানুষ হ'তে হবে।

. চল পথিক, এ যুগের জড়ধর্মী আওতা ছেড়ে তোমার 'স্বধর্মের' আলোকে চল। মোহের কাজল মুছে মহাজীবনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্যের পথে চল। চল সত্যকার মানুষ হবার পথে। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিষয়বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যই মুমুক্ষুর পরম সাধন। ইহা ব্যতীত অন্য যাবতীয় সাধন নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজী বলিয়াছেন, 'বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্ম বিচারু'—অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিচারাদি সকলই বৃথা। বৈরাগ্যই সাধুর প্রধান ভূষণ। ইহার অভাবেই দূষিতচিত্ত হইয়া সন্ন্যাসিগণও অতি হীন দশা প্রাপ্ত হন। আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও অতিশয় খেদের সহিত বলিয়াছেন :

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥

বৃহদারণ্যক-বার্তিক—১।৪।১৫৮৪

—দেখা যায়, চিত্তগত বিষয়-ভোগবাসনা-রূপ কলুষতাবশতই বহু সন্ন্যাসী তত্ত্ববিচার-রহিত, বহির্মুখ, খল, পরছিদ্রান্বেষী ও কলহপরায়ণ। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতেই তাহাদের চিত্ত ঐরূপ দূষিত।

বিষয়ে দোষদৃষ্টি ও বিচারসহায়ে বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষ-সাধনই আশু জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়।

বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ট্বা কো নাম ন বিরজ্যতে।
সতামুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে॥

যোগবাশিষ্ঠ—২।১১।২৩

—বীভৎস বিষয়দর্শনে সকলেরই মনে সাময়িক বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্তু বিচারসহায়েই পুরুষের অতি উত্তম বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্মশানমাপদং দৈন্যং দৃষ্ট্বা কো ন বিরজ্যতে।
তদ্বৈরাগ্যং পরং শ্রেয়ঃ স্বতো যদভিজায়তে॥

ঐ—২৮

—শ্মশান, আপদ ও দৈন্য দর্শনে কাহার চিত্তে (সাময়িক) বৈরাগ্যের উদয় না হয়? কিন্তু সেই বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট ও পরমশ্রেয়োহেতু, যাহা (সর্ব ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও) পুরুষের চিত্তে স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়।

অধ্যাত্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে চরম সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত একমাত্র বৈরাগ্যই মুমুক্ষু সাধকের পরম হিতকারী বান্ধব।

বৈরাগ্যসাধনের মুখ্য উপায়: সর্বদা (১) মৃত্যুচিন্তন, (২) বিষয়ে দোষদর্শন, (৩) সাধুসঙ্গ ও (৪) ভগবদনুরক্তি।

মৃত্যুচিন্তন

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল বস্তুই সংসারে মৃত্যু-কবলিত। স্বকীয় অতিপ্রিয় দেহও প্রতি মুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই চিন্তা চিত্তে সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে নশ্বর বিষয়ভোগের আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে।

মস্তকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদয়ং জনঃ।
আহারোঽপি ন রোচেত কিমুতান্যা বিভূতয়ঃ॥

—শিরোপরি আসন্ন মৃত্যু বিদ্যমান, ইহা জানিলে আহারেও রুচি হইতে পারে না, অন্য ভোগৈশ্বর্যাদির তো কথাই নাই। বিষয়াসক্তির মূল স্বদেহে প্রীতি ও তাহাতে

সত্যত্ববুদ্ধি। অতএব নিয়ত দেহের বিনাশিত্ব-চিন্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। তখনই মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই বিনাশী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্য মানুষ সদা ব্যাকুল। বিষয় নিত্য ও পরম রমণীয়, এই বুদ্ধিতেই চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে উহার নশ্বরতা চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হয় ও বিষয়াসক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে।

বিষয়ে দোষদর্শন

যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি
তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা॥

—প্রাতে প্রস্তুত অন্ন সায়ংকালেই বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অন্নরসে পুষ্ট শরীরের নিত্যতা কখনই হইতে পারে না।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বৈরাগ্যকারণং তস্য কিমন্যদ্ উপদিশ্যতে॥

মুক্তিকোপনিষৎ—২।৬৬

—অশুচি গন্ধপরিপূর্ণ স্বদেহে যে ব্যক্তির বিতৃষ্ণা হয় না, তাহাকে বৈরাগ্যজনক আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে?

মাংসাসৃক্পূয়বিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥

নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদ্—৩।৪৮

—মাংস, রুধির, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি-আদি মলিন পদার্থের সমষ্টিরূপ এই দেহে যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, সে মূর্খ নরকেও প্রীতিমান্ হইয়া থাকে।

যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্ বহির্ভবেৎ।
দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥

—এই দেহের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু বিদ্যমান তাহা যদি বহির্দেশে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করা যায়, তবে কুকুর ও কাক প্রভৃতি হইতে ঐ সকল রক্ষা করিবার জন্য পুরুষকে দণ্ডহস্তে সদা সচেষ্ট হইতে হইবে।

সর্বদা পূর্বোক্তরূপে বিচার দেহাদি যাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদক অতএব মুমুক্ষুর পূর্বোক্ত বিচার সদা কর্তব্য।

সাধুসঙ্গ

সৎসঙ্গ বিষয়ে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর সাধনপঞ্চকে বলিয়াছেন, 'সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্।'—মুমুক্ষু সদা সৎসঙ্গ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকারে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে, কারণ—

মহানুভাবসম্পর্কঃ কস্য নোন্নতিকারণম্।
অশুচ্যপি পয়ঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্॥

—মহাপুরুষগণের সঙ্গ কাহার না উন্নতি বিধান করিয়া থাকে? অশুচি জলধারাও গঙ্গায় পতিত হইয়া শুদ্ধরূপতা প্রাপ্ত হয়।

সৎসঙ্গ ও ভগবন্নিষ্ঠা বৈরাগ্যের একান্ত সহায়ক। সৎসঙ্গে চিত্তে সারাসারবস্তুবিবেক সদা জাগ্রত হয়। সজ্জন-সমাগম অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে বিষয়বাসনা ক্ষীণ হয়। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়াছেন:

বিনু সতসঙ্গা বিবেক ন হোই।
রামকিরপা বিনু সুলভ ন সোই॥

—সৎসঙ্গ বিনা চিত্তে বিবেক অর্থাৎ সদসদ্-বিচার জাগ্রত হয় না। ঐ সৎসঙ্গও ভগবৎ-কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। বিবেক হইতে বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখন শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

'বৈরাগ্যের' অর্থ—বিষয়ে বিরক্তি ও শ্রীভগবানে অনুরক্তি। ঈশ্বরানুরাগ না হইলে

কেবল বিষয়ে বিতৃষ্ণা অত্যন্ত শুষ্কতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' (সাংখ্যকারিকা—৪৫) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যাসে 'প্রকৃতিলয়' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহা একটি বদ্ধাবস্থা; দীর্ঘ সুষুপ্তিতুল্য অজ্ঞানাবস্থা।

সৎসঙ্গই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরে প্রীতির প্রেরণা সম্পাদন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত-কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, 'মানুষ যতদিন না সশ্রদ্ধচিত্তে বিষয়ত্যাগী মহানুভবগণের পদ-ধূলিতে পবিত্র হয়, ততদিন অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলেও তাহার বুদ্ধি শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন :

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

(ভাঃ—১০।৪৮।৩১)

—জলময় স্থানবিশেষই একমাত্র তীর্থ নহে, অথবা মৃত্তিকা ও পাষাণনির্মিত মূর্তিবিশেষই একমাত্র দেবতা নহে; দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া তাঁহারা পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সাধু-গণের দর্শন কিন্তু তৎকালেই শুদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্বদর্শী সাধুগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। শাস্ত্রে সাধুদিগকে জঙ্গম তীর্থ ও শ্রীভগবানের চলবিগ্রহ বলা হইয়াছে।

তত্ত্ববেত্তা সাধুগণ সর্বদা উপদেশ না করিলেও তাঁহাদের সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ

সন্তঃ সদৈব গন্তব্যাঃ যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশাঃ ভবন্তি তাঃ॥

—সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ না হইলেও সাধুসঙ্গ সদা কর্তব্য। তাঁহাদের স্বাভাবিক কথা-প্রসঙ্গও মুমুক্ষুর পক্ষে উপদেশরূপই হইয়া থাকে। সমচিত্ত, প্রশান্তাত্মা, রাগদ্বেষাদি-রহিত, সদাচারী সাধুগণের সাধারণ বার্তালাপও এমন অনন্যসুন্দর অনাসক্ত ও মাধুর্যমণ্ডিত যে, তৎশ্রবণে যথার্থ মুমুক্ষুর চিত্ত তাঁহাদের অলৌকিক তত্ত্বানুভূতি সমুজ্জ্বল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ঐ দিব্য জীবনের প্রভাবে সাধকের চিত্তও তখন বিষয়-বিমুখ হইয়া ভগবন্মুখী হয়।

সর্বদা সৎপুরুষ-সঙ্গ না পাইলেও অসৎ-সঙ্গ কখনই করা উচিত নহে, কারণ

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

নিঃসঙ্গতাই সন্ন্যাসিগণের মুক্তি-প্রাপ্তির দ্বার। বিষয়াসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগের নামই যথার্থ নিঃসঙ্গতা। বিষয়াসক্ত পুরুষের সাহচর্যে কামাদি অশেষ দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সঙ্গ বিবেকী পুরুষকেও অধঃপাতিত করিয়া থাকে, সামান্য সাধকের তো কথাই নাই।

সন্ন্যাসীর সাধনা

এইরূপে সদা মৃত্যুচিন্তন, বিষয়ে দোষদর্শন ও সাধুসঙ্গাদিদ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই পুরুষের চিত্তে সর্ববস্তু পরিত্যাগপূর্বক সদ্গুরুর আশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা সমুদিত হয়। সন্ন্যাসী সদা অবহিতচিত্ত না হইলে অর্থাৎ চিত্ত আদর্শনিষ্ঠ করিয়া না রাখিলে কোন্ মুহূর্তে দুর্বলতা—বিষয়-বাসনা তাহাকে কবলিত করিয়া ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসীদিগকে বেদান্ত শ্রবণ-মননাদি সহায়ে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ করেন। 'সংন্যস্য শ্রবণং কুর্যাৎ'—সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর মুমুক্ষু গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিবেন। অখিল বেদান্ত-বাক্যসমূহ 'জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'-প্রতিপাদক, এইরূপ নিশ্চিত অবধারণের নামই 'শ্রবণ'।

ত্বং-পদার্থবিবেকায় সংন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যাভিধীয়তে যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥
(উপদেশসাহস্রী, ১৮।২২২)

—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যগত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থ অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার করিবার জন্যই সর্ব সকাম কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন। অতএব যে সন্ন্যাসী ঐরূপ করেন না, তিনি পতিত অর্থাৎ আদর্শভ্রষ্ট হইবেন।

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥

—প্রতিদিন নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্যন্ত সন্ন্যাসী বেদান্তচিন্তায় কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোষ কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তে জাগ্রত হইবার অবকাশ না পায়।

আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও তদ্‌রচিত 'সম্বন্ধ-বার্তিকে' বলিয়াছেন যে, সর্বসকামকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীরই বেদান্তবিচারে অধিকার। যথা—

ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ।
জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেম্বধিকারিতা॥

—সর্বকর্মপরিত্যাগী, সংসারবন্ধনমূলোচ্ছেদকামী এক আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরই বেদান্ত-শ্রবণাদিতে মুখ্য অধিকার। অতএব বেদান্তোক্ত তত্ত্ব-চিন্তনই সন্ন্যাসের অনুকূল।

দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজনাদিতেও সন্ন্যাসী কি প্রকার আচরণ করিবেন, তাহাও শাস্ত্র অতি সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের সংরক্ষক ও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক। নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদে আছে (৩।৬২—৬৮):

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

—অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মূঢ়—এই ছয় প্রকার মানুষের বাহ্য আচরণ অভ্যাস করিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই ছয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে:

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

—অন্নাদিভোজনকালে যিনি ইহা সুস্বাদু, ইহা স্বাদবিহীন, এইরূপ মনে করিয়া আসক্ত হন না; যিনি সদা হিতকারী, সত্য ও পরিমিতভাষী, তিনি 'অজিহ্ব' বলিয়া কথিত হন।

অদ্য-জাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥

—সদ্যোজাতা বলিকা বা শতবর্ষা স্ত্রী দর্শনে যেরূপ, ষোড়শী নারী দর্শনেও যাঁহার চিত্ত সেই একই রূপ অর্থাৎ নির্বিকার থাকে, তিনি 'ষণ্ডক' নামে অভিহিত হন।

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥

—যিনি কেবল ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগনিমিত্তই আসন ত্যাগ করত অন্যত্র গমন করেন, এবং তদুদ্দেশ্যেও যিনি কখনও এক যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনিই 'পঙ্গু'।

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥

—কোথাও অবস্থান বা ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় সম্মুখে ষোড়শহস্ত পরিমিত স্থান হইতে দূরে নিপতিত হয় না, তিনি 'অন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

হিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকাবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতি যো বধিরঃ স প্রকীর্তিতঃ॥

—যিনি হর্ষোৎপাদক অনুকূল বচন অথবা দুঃখজনক প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিয়াও

হর্ষ-বিষাদরূপ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত হন না, তিনি 'বধির' নামে খ্যাত।

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে॥

—বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যিনি বিষয়সমূহের সান্নিধ্যে সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় নিত্য নির্বিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে 'মুগ্ধ' বলা হয়।

চিন্মাত্র-বাসনার অভ্যাস

পূর্বোক্ত অজিহ্বাদি ধর্মের আচরণ সহ 'চিন্মাত্রবাসনা'র অভ্যাসই সন্ন্যাসীর মুখ্য কর্তব্য। এই নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ—এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চিন্মাত্রস্বরূপে কল্পিত ও স্বতঃ সত্তাস্ফুরণাদি-রহিত; অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তা ও স্ফুরণ দ্বারাই সর্ব জগৎ সত্তা ও প্রকাশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারসহায়ে জগতের নাম ও রূপ—এই উভয় অংশের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্বক উহা উপেক্ষাকরত সর্বত্র পরিপূর্ণ 'অস্তি, ভাতি ও প্রিয়'-রূপ অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আমি—এই প্রকার নিরন্তর ভাবনাকেই 'চিন্মাত্রবাসনা' বলে। নিরন্তর এই চিন্তাদ্বারা সর্ব মলিনবাসনা নিঃশেষে বিলীন হয়, কারণ

জন্মান্তরচিরাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যস্তযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ॥

—ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে রাম! বহু জন্মের দীর্ঘ অভ্যাসপ্রসূত সংস্কার-বলেই এই মিথ্যা সংসার মানবচিত্তে সত্য বলিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ঐ ভ্রান্তি দীর্ঘকালাভ্যস্ত, ব্রহ্মবিচার বিনা বিনাশ হইবার নহে। শুদ্ধচিত্তে বিমল আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক কৃতকৃত্য হন। আর তাঁহার করিবার বা জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না। তিনি পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়া প্রারব্ধচালিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সাক্ষী-রূপে অবলোকন করিতে থাকেন। ইহাই জীবন্মুক্তি-অবস্থা।

জীবন্মুক্তের স্থিতি

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ।
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো
বারাণসী মেদিনী।
সর্বৈব স্থিতিরস্য মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

—পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ সেই পুরুষপ্রবরের নিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্দনকানন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সর্ব বৃক্ষই তাঁহার দৃষ্টিতে কল্পবৃক্ষ, যাবতীয় জলপ্রবাহ তাঁহার নিকট গঙ্গাবারি-তুল্য শুদ্ধ, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত—সকল শব্দই তাঁহার কর্ণে বেদবাণীরূপে ধ্বনিত এবং সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার নিকট বারাণসীতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যেরূপেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তিনি সদা মুক্ত।

প্রারব্ধ-ক্ষয়ান্তে এই দেহাদি জগৎ-প্রতিভাস নিবৃত্তির অনন্তর তিনি চিরতরে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—অর্থাৎ তিনি 'বিদেহ-মুক্ত' হন। তাঁহাকে আর এই সংসারে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তখনই এই সংসার-যাত্রার চিরনিবৃত্তি।

জীবত্বভ্রান্তি ও তন্নিবৃত্তি

জীবভাব অনাদি। কবে কিরূপে এই মিথ্যা জীবত্বের উদয় হইয়াছিল, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু জীব সেই স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার যাত্রার পথে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নানা অভিজ্ঞতা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চয়

করিতে থাকে এবং পুণ্যপুঞ্জ পরিপক্ব হইলে দৈবাৎ কোন জন্মে দেবজনদুর্লভ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে শরণ লইয়া সন্ন্যাস-অবলম্বনে আত্মতত্ত্বানুশীলন সহায়ে পরমাত্ম-জ্ঞানোদয় হইলে ঐ জীবত্বভ্রান্তি সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষার্থের এখানেই পরিসমাপ্তি; সর্বসাধনার এইখানেই শেষ। মানব-জীবনের ইহাই চরম উদ্দেশ্য, ইহাই চরম কাম্য—'জীবাভিন্ন পরমাত্ম-জ্ঞান' সহায়ে অবিদ্যার চিরনিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তি-অবস্থালাভ।

'বোধসার' গ্রন্থে আচার্য নরহরি বলিয়াছেন :

জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্ম লীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥

—জীবন্মুক্তি-সুখলাভার্থই নিত্যমুক্ত আত্মার স্বেচ্ছায় এই ভ্রান্তিসিদ্ধ জীবরূপে জন্ম স্বীকার, সংসারভোগের কামনাবশতঃ নহে।

এক নিত্যমুক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা সদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মায়া-রচিত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসমূহ দ্বারা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান। বিদ্যাসহায়ে ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে তিনিই অনাদিসিদ্ধ নিত্যমুক্তস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলা হইয়া থাকে মাত্র। ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্য, অন্য কোন উপায়ে নহে; কারণ

ভ্রান্ত্যারোপিতঃ সংসারো বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ।
ন রজ্জ্বারোপিতঃ সর্পো ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে॥

—ভ্রান্তি দ্বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, অন্য কোন ক্রিয়াদি দ্বারা নহে; কারণ রজ্জুতে কল্পিত যে সর্প তাহা কখনও ঘণ্টাবাদনাদিরূপ কোন কর্ম দ্বারাই অপসারিত হয় না। একমাত্র অধিষ্ঠান-রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানই কল্পিত সর্প ও তজ্‌জ্ঞানের নিবর্তক

প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরবিরোধী। প্রকাশ যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত করিয়া থাকে, একমাত্র জ্ঞানই তদ্রূপ বিরোধী অজ্ঞানের নিবর্তক। ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'—কেবল জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে—(পঞ্চপাদিকা)।

শুভ নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি—চিত্তশুদ্ধির দ্বারা—ঐ জ্ঞানোৎপত্তির উপ-কারক, এবং বিষয়ে যথার্থ বৈরাগ্যই সাধনার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সাধকের অন্যতম সহায়ক, সুহৃদ্ ও পরিচালক।

এই বৈরাগ্যই 'বৈরাগ্যশতক'-গ্রন্থে বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়তৃষ্ণার অনর্থ-কারিতা, ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগের কঠিনতা, অর্থিত্বের ক্ষুদ্রতা, জাগতিক সর্বপদার্থের অস্থিরতা, সর্বসংহারী কালের বিচিত্র প্রভাব, নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্ তত্ত্বচিন্তননিমগ্ন পুরুষপ্রবরের আচরণাদি কথন-প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল মহিমা রাজর্ষি শ্রীভর্তৃহরি এই গ্রন্থরচনাসহায়ে জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্দীপক।*

* গত বৎসর উদ্বোধনে আষাঢ় হইতে ছয় মাসে প্রকাশিত লেখকের 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

ত্রিশরণ-মহামন্ত্র

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

'ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্র রবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে
মরুপারে শৈলতটে সমুদ্রের কূলে উপকূলে
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে······।'

কবিগুরু যে ত্রিশরণ-মহামন্ত্রের প্রভাব আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। স্বীকার করতেই হবে, বুদ্ধ এ ত্রিশরণ-মন্ত্রের প্রবর্তক নন; তাঁর ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে এর প্রবর্তন হয়। সেই ব্যক্তিত্ব এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তার প্রভাব এড়ানো সহজ ছিল না। এজন্য লোকে ব'লত, 'সমনো গোতমো আবট্টনীমায়ং জানাতি' অর্থাৎ শ্রমণ গৌতম বশীকরণের যাদু মন্ত্র জানেন। এ যাদুমন্ত্র যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তা বলাই বাহুল্য। এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় তপস্সু ও ভাল্লিক নামক দুই বণিকের ওপর।

বুদ্ধত্বলাভের পর মগ্নভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে যে দিন বুদ্ধ আহারের প্রয়োজন অনুভব করেন, সেইদিন এই বণিকদ্বয় পণ্য-সম্ভার নিয়ে তাঁর অদূরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেখানে হঠাৎ তাঁদের অগ্রগামী শকট থেমে যায়। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান অদূরে উপবিষ্ট বুদ্ধকে। অলৌকিক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দর্শনেই তাঁরা অভিভূত হয়ে অন্তরের সহজ ভক্তিতে তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বলেন, 'ভগবন্, তোমার শরণগত হলাম, ধর্মের শরণগত হলাম। এ আত্মনিবেদনের মূলে রয়েছে ঐকান্তিক নির্ভরতা ও পূর্ণ বিশ্বাস। বণিকদ্বয় তাঁকে দেখে সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি করেন—এ মহামানব মানুষের পরম ভরসাস্থল, তাঁরা চরণাশ্রয়ে জীবনে মঙ্গল আসবে। তাই এঁরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই তাঁর শরণাগত হন। এঁরা বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দ্বিবাচিক উপাসক' নামে পরিচিত। তখনও সঙ্ঘের জন্ম হয়নি ব'লে এঁরা ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করেন।

অতঃপর বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) গিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কুণ্ডিণ্য প্রমুখ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে প্রথম ধর্মো-পদেশ দান করেন। তাঁর মুখে আর্যসত্যের অপূর্ব বর্ণনা শুনে কুণ্ডিণ্য নির্মল ধর্মচক্ষু লাভে ধন্য হন। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে আহ্বান ক'রে বলেন, 'এসো ভিক্ষু, ধর্ম সুপ্রকাশিত, সকল দুঃখ-জ্বালার নিরসনের জন্য ব্রহ্মচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হও।' এ বাণী হয় কুণ্ডিণ্যের দীক্ষামন্ত্র। তিনিই সর্বপ্রথম ভিক্ষু হন। পরে অবশিষ্ট চারিজনকেও ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত ক'রে বুদ্ধ প্রথম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

দিন কয়েক পরে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র যশ ও তাঁর বন্ধুগণ বুদ্ধের *'এহি' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি করেন। যশ আসেন ভোগবিলাসের বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে বাড়ী থেকে পালিয়ে। সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে বারাণসীশ্রেষ্ঠী ঘুরতে ঘুরতে মৃগদাবের তপোবনে এসে উপস্থিত হন এবং শান্ত সুন্দর

* সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বুদ্ধ 'এহি' অর্থাৎ এসো ব'লে প্রার্থীকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতেন। তখন সঙ্ঘ-প্রবেশের জন্য কোন মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত না।

মহিমাদীপ্ত বুদ্ধকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে মনে মনে ভাবেন—ইনি মহাপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ এঁর অজ্ঞাত নয় ও ইনি নিশ্চয়ই আমার পলাতক পুত্রের সন্ধান দিতে পারেন। তিনি ভক্তিভরে বুদ্ধকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার পুত্র কোথায়, আপনি বলতে পারেন কি?' উত্তরে প্রেমমধুর বাক্যে বুদ্ধ বলেন, 'হাঁ, আপনি বসুন, এখানেই তাকে দেখতে পাবেন।' শ্রেষ্ঠী উৎফুল্ল হয়ে একান্তে বসেন। বুদ্ধ তাঁকে উপদেশ দান করেন। সেই অভিনব বিচিত্র উপদেশ শুনতে শুনতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং ভাবাবেগে ব'লে ওঠেন, 'কি মধুর কথা! কি সুন্দর ভাব! আপনি সত্যকে আমার কাছে অনাবৃত করেছেন, আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন, আলোকপাতে অন্ধকার দূর করেছেন, আমি আপনার শরণগত হলাম, ধর্মের শরণগত হলাম, সঙ্ঘের শরণগত হলাম, আজ থেকে আমি আপনার উপাসক।' বৌদ্ধ সাহিত্যে এ শ্রেষ্ঠীই 'ত্রৈবাচিক বা ত্রিশরণগত উপাসক' ব'লে অভিহিত।

এর পর থেকে যেখানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে যান, সেখানেই মুগ্ধ জনতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করে। এভাবে অল্পকালের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ত্রিশরণ-মন্ত্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তখন 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি'—এ অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে লোক নতুন প্রেরণা লাভ করে; তাদের অন্তরে নতুন ভাবের উদ্বোধন হয়। উদ্বুদ্ধ জনতার কর্মধারা নানাদিকে প্রসারিত হয়। অসংখ্য মঠ-মন্দির, বিদ্যায়তন, শিল্পক্ষেত্র, আরোগ্য-শালা, অনাথাশ্রম ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ ভাবে জনসেবার এক বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতার স্ফুরণে ত্রিশরণ-মন্ত্র ভারতে এক অপূর্ব জাগরণ বয়ে আনে। সেই জাগরণ যুগযুগান্তর ধরে দেশকে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন করে। তা শুধু ভারতের মধ্যে সীমিত হয়ে না থেকে ভারতের সীমা ডিঙিয়ে দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরি অতিক্রম ক'রে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমে-প্রাণে আলোকে-পুলকে জনতাকে মাতিয়ে তোলে। তার প্রমাণ রয়েছে এশিয়া-ভূখণ্ডের নানা-স্থানের পর্বতগাত্রে গিরিগুহায় পাষাণফলকে ও অসংখ্য স্তূপ-সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষে। আজও ত্রিশরণ-মন্ত্রের নামে অর্ধজগৎ ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির।

মনে প্রশ্ন জাগে, ত্রিশরণের 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ' বলতে কি বোঝায়? এ সম্বন্ধে বুদ্ধ-যুগের যে উক্তি রয়েছে, তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

"ইতিমিসো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো
বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো
পুরিসদম্ম সারথি সত্থা দেবমনুস্সানং
বুদ্ধো ভগবা।"[১]

অর্থাৎ সেই ভগবান বুদ্ধ অর্হৎ (যিনি কাম-ক্রোধাদি অরি বা রিপুদল হনন করেছেন), সম্যক্ সম্বুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যক্‌ভাবে সমগ্র উপলব্ধি করেছেন), বিদ্যাচার-সম্পন্ন (যোগ-বিভূতিসম্পন্ন ও শুভ্রাচারসমন্বিত), সুগত (যিনি সত্যের পথে সম্যক্‌ভাবে গমন করেছেন), তিনি লোকবিদ্, শ্রেষ্ঠ, পুরুষবিনায়ক এবং দেব-মানবের শাস্তা বা অনুশাসক।

"স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্‌ঠিকো
অকালিকো এহি পস্‌সিকো ওপনয়িকো
পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞূহি।"[২]

অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ধর্মকে উত্তমরূপে প্রকাশ

১, ২, বিসুদ্ধিমগ্‌গ।

করেছেন, তা প্রত্যক্ষ ফলদায়ক কালভেদহীন (যার অনুষ্ঠান ও ফলপ্রাপ্তিতে কালবিচার নেই), অনাবিল (অনাবিলতার জন্য 'এসো দ্যাখো' ব'লে সবাইকে আহ্বানের যোগ্য), ঔপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে) এবং বিজ্ঞগণের আত্মবেদ্য (জ্ঞানীদের উপলব্ধি-গোচর)।

"সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি
অট্‌ঠপুরিসপুগ্‌গলা,
এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
আহুনেয্যো পাহুনেয্যো দক্‌খিণেয্যো
অঞ্জলিকরনীয়ো অনুত্তরং
পুঞ্‌ঞক্খেত্তং লোকস্‌স।"[৩]

অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির স্তরভেদে আট রকমের ব্যক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধশিষ্যসঙ্ঘ সুপথগামী অকুটিল পথযাত্রী (ন্যায়পথযাত্রী) নির্বাণযাত্রী সমীচীন-পন্থানুসারী। ভগবানের এ শিষ্যসঙ্ঘ অভ্যর্থনার্হ, সম্মানার্হ, দক্ষিণার্হ, প্রণম্য এবং জগতের উত্তম পুণ্যক্ষেত্র।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধ শরণাগতকে মোক্ষ দেবার ভার গ্রহণ করেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

"তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা পটিপন্না পমোক্‌খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।"[৪]

অর্থাৎ তোমাদের প্রয়াস করতে হবে; তথাগত প্রচারক মাত্র। এ পথ অবলম্বনে ধ্যানরত ব্যক্তিগণই মারবন্ধন হ'তে মুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত উপদেশবাণীও উল্লেখযোগ্য:

"অত্তদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ
অত্তসরণা অনঞ্‌ঞসরণা।
ধম্মদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ
ধম্মসরণা অনঞ্‌ঞসরণা॥"[৫]

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, অনন্যনির্ভর হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভর হও, ধর্মপ্রতিষ্ঠ ধর্ম-নির্ভর হও।

উদ্ধৃত বচনসমূহ পাঠে স্বতই পাঠকের মনে প্রতিভাত হবে—জ্ঞান ও কর্মই বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, তাতে শরণাগতির বা ভক্তিবাদের অবকাশ নেই। শুধু শরণাগতিতে বা ভক্তিতে নির্বাণোপলব্ধি হয়—একথা বৌদ্ধধর্মে স্বীকার করা হয়নি। তবুও ভক্তিকে কি বাদ দেওয়া চলে? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতেই হবে—ধর্মচেতনার উদ্‌গম ভক্তি থেকে। বুদ্ধও বলেছেন, "সদ্ধা বীজং তপো বুট্‌ঠি……"[৬]—অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির ফসল ফলাতে হ'লে 'সদ্ধা' বা ভক্তির বীজ বপন করা চাই। পালি 'সদ্ধা' (শ্রদ্ধা) শব্দ ভক্তিধর্মদ্যোতক। এতে ভক্তিই বুঝায়। এক কথায় বলতে গেলে ভক্তিই মোক্ষসাধনার প্রথম সোপান।

শরণাগতের ভক্তিরসাপ্লুত ভাববিভোল মন ত্রিশরণের উদার স্পর্শে স্নিগ্ধ শান্ত হয়ে এক আলোকময় অনুভূতিতে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলে। যেখানে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ, সেখানেই তো সকল তন্‌হা বা প্রবৃত্তি-নিরোধের পরম আনন্দময় নির্বাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বুদ্ধ নির্বাণনির্দেশক, ধর্ম নির্বাণের পথ, সঙ্ঘ নির্বাণলাভী। সকল দুঃখ-জ্বালার অবসানের জন্য, অনন্ত শান্তির—অনন্ত আনন্দের গভীরে মগ্ন হবার জন্য শরণাগত ভক্তের অন্তরে নির্বাণোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন আলোকোন্মুখ কুসুমকলির মতো তাঁর মন নির্বাণোন্মুখ হয়ে ওঠে। এখানেই ত্রিশরণ-মন্ত্রের চরম পরিণতি।

---

৩ বিসুদ্ধিমগ্‌গ
৪ ধম্মপদ
৫ মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, দীঘনিকায়
৬ সংযুত্তনিকায়

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'পঞ্চভূতে'র রচনাপদ্ধতি-প্রসঙ্গে আমেরিকান সাহিত্যের বিখ্যাত 'The Autocrat of the Breakfast Table' (চায়ের টেবিলের স্বেচ্ছাচারী বক্তা) স্মরণীয়। এই বইটি দ্বারা যে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত এ কথা সত্য। অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্‌ (Oliver Wendell Holmes) এ বইটি লিখতে শুরু করেন তদানীন্তন (১৮৫৭) 'The Atlantic Monthly' মাসিকপত্রে। উনিশ শতকের আমেরিকান সাহিত্যে এই বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁর বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়নে এ বইটি থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। ব্যক্তিগত পেশায় ডাক্তার হোম্‌স্‌ এ বইটিতে যে উদার আদর্শবাদ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি এবং অপরূপ সহানুভূতিময় হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তার তুলনা বিরল। কোন বোর্ডিং-হাউসের চায়ের টেবিলে সমবেত অধিবাসীরা যখন প্রভাতী চা-চক্রে সম্মিলিত হন, তখন একটি স্বেচ্ছাচারী বক্তা অন্যদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে নিজেই নানাপ্রসঙ্গে নানা মন্তব্য ক'রে যান। বলা বাহুল্য সে বক্তাটি লেখক স্বয়ং—কিন্তু সে বক্তব্য কোথাও একঘেঁয়ে অন্তঃসারহীন মোড়লগিরি হয়ে দাঁড়ায় না। জীবন ও জগতের কত অন্তহীন বিস্ময় এই বক্তার দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, সে কথাই পাঠককে অভিভূত করে।

অবশ্য 'পঞ্চভূতে' রবীন্দ্রনাথ ছ-জন বন্ধুর আলোচনাচক্রের খবর দিয়েছেন। তার ফলে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এই স্বাদবৈচিত্র্যই 'পঞ্চভূতে' অপূর্বতা এনে দিয়েছে। তবু আর একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয়, আসলে ওই বিভিন্ন চরিত্রগুলি একেবারে পৃথক নয়—মূল একটি দৃষ্টিভঙ্গীরই নানান্‌ বর্ণবিন্যাস। সমীর, ক্ষিতি, ব্যোম্‌ বা দীপ্তি এরা আসলে সভাপতি ভূতনাথবাবুরই অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের নানা দিক।

এবার 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধাবলীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় উপস্থাপিত করি। 'পরিচয়'-অংশে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরী বা দিনপঞ্জী সম্বন্ধে বক্তব্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডায়েরী রাখার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের (ভূতনাথবাবুর মারফৎ) আপত্তি এই যে, জীবনের সব অংশকেই লেখায় প্রকাশ করতে গেলে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত হয়। জীবন থেকে কিছু রেখে আর কিছু বর্জন করেই সামঞ্জস্য বজায় থাকে। "ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।"[১]

জীবন-সায়াহ্নে এসেও ডায়েরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত বদলায়নি। 'মংপুতে রবান্দ্রনাথ' বইটিতে আছে—"আর দেখো ঐ ডায়েরী; সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হ'ল না; emotionএর একটি

১ পঞ্চভূত (১৩৫৫ সংস্করণ) : পৃঃ ১১

গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।"[২]

তাই ভূতনাথবাবু যে ডায়েরী লিখলেন, সেটি চিন্তাজগতের ডায়েরী। অস্ফুট চিন্তার কোন স্থান এ ডায়েরীতে নেই, ভাবনাকে একটি গতিশীল পূর্ণতা দিয়ে তবে এই অভিনব ডায়েরীতে গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চভূতের আলোচনা-চক্রের দ্বিতীয় বিষয় 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'। আমাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রবাসী আত্মা স্ব-স্বরূপে বিশ্বাত্মারই অংশ। এই আত্মা বহির্জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, সেই সম্পর্ক-সূত্রই সে আমরা সকলেই যখন সেই বিশ্বাত্মারই বিচিত্র প্রকাশ, তখন মিলনই আমাদের স্বধর্ম। সেই কথাটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই উৎসবের আয়োজন।

পুণ্যাহের দিনে প্রজারা নিজে থেকে জমিদারকে নজরানা দিয়ে যায়। তাই এই দিনটিতে উৎসবের বাঁশী বাজে। প্রয়োজনকে মানুষ এমনি করেই সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। "খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোন যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর।"[৩]

ভারতীয় চিন্তাধারায় এই মনোভাবেরই প্রকাশ দেখি—চেতন-অচেতন সব বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থাপনচেষ্টায়। আমরা যে নিখিল পৃথিবীর সঙ্গে এক আত্ম-সূত্রে গাঁথা—এ কথা ভারতবর্ষের অন্তরতম অনুভূতি। এইজন্য আমরা সৌন্দর্য-বিশ্লেষণে পটু নই। সৌন্দর্যকে বাইরে থেকে না দেখলে তার সঙ্গে আমাদের আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয় না। প্রতীচ্য ভাবুকদের—বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির এ গুণটি আছে। তাই ইংরেজী সাহিত্যে প্রকৃতি-কবিতার (Nature-poems) এত সার্থকতা।

আমাদের দেশে অনেক সময় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ভগবানের প্রকাশ হিসাবে ভক্তেরা দেখে থাকেন। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে তৃপ্ত না থেকে প্রকৃতিরূপী ভগবৎ-সত্তার কাছে ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় প্রার্থনা ক'রে বসেন। তাঁরা এ কথা ভুলে যান যে, সেই পরমসুন্দরের সঙ্গে আমাদের ব্যাবহারিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়—আত্মিক আকুলতার সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র আনন্দের, তার কাছে আর কিছু দাবী করা চলে না।

তাই জাহ্নবীতীরে এসে কবি মুক্তি বা পুণ্য কামনা করেননি, বলেছেন, "ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবি, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ, সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি, যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণ শতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহার

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (২য় মুদ্রণ) : পৃঃ ২৫৯

৩ পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, পৃঃ ১৮

করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।"[৪]

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'-বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা রয়েছে। সৌন্দর্যকে ভারতীয় কবি ও শিল্পীরা সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের বিষয়বস্তু ক'রে তুলেছেন। তার ফলে সৌন্দর্যচেতনা অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী। হরিণ, গজেন্দ্র, শতদল, হংস প্রভৃতির উপমা শতলক্ষবার ব্যবহার করেও সংস্কৃত সাহিত্য ক্লান্ত নয়। রূপবৈচিত্র্য ও রূপের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে গ্রীকরা অনেক বেশী সচেতন ছিলেন।

বহির্জগতের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন, অন্তর্জগতের মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা প্রচলিত ধারণাতেই সন্তুষ্ট। স্বামী বা গুরু কেবল পদাধিকারেই আমাদের ভক্তি দাবী করতে পারেন, সেজন্য যোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর। এইভাবে প্রচলিত মতানুবর্তনের দ্বারা আমাদের সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রদ্ধাবোধ দুইই পীড়িত। সৌন্দর্যসম্বন্ধে অতিরিক্ত সন্তোষের ফলে বহির্জগৎ ও মনোজগতের আদর্শগত অবনতি ঘটে, সন্দেহ নেই। আধুনিক মনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যথার্থ আদর্শবোধের অনুসন্ধান করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' বইটিতে। এ বইতে অলস অনুকরণের স্থান নিয়েছে জাগ্রত বিচারবুদ্ধি।[৫]

সাহিত্যসম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা রয়েছে 'পঞ্চভূতে'। সর্বপ্রথম কবিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাযোগ্য। 'গদ্য ও পদ্য' নিয়ে আলোচনায় 'কবিতা'-সম্বন্ধে কৃত্রিমতার চিরকালীন অভিযোগ উঠেছে। কবি-কল্পনা এবং কবিতার ছন্দ—এ দুটি জিনিসকেই অনেকে অবাস্তব ও কৃত্রিম মনে করেন। এর উত্তরে সমীর ও স্রোতস্বিনীর বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে অচেতন বা অর্ধচেতন পদার্থেরা সৃষ্টি করে না, একা মানুষেরই সৃষ্টির অধিকার। যা আছে, তাকে মানুষ আপন মনোমত ক'রে নিয়ে তবে তৃপ্তি পায়। সাধারণ কথাবার্তা একান্ত বাস্তব, কিন্তু এই বাস্তবকে অতিক্রম করেই কবিতার উত্তরণ।[৬]

ভূতনাথবাবু বিষয়টির আরো গভীরে আলোকপাত করেছেন: বিশ্বজগতের স্পন্দিত তরঙ্গমালা আলোরূপে, ধ্বনিরূপে আমাদের দেহমনকে আন্দোলিত করে। এই তরঙ্গমালা আমাদের মানসলোকে একেবারে অবারিত-ভাবে প্রবেশ করে। স্পন্দনেরই এ ক্ষমতা আছে। একটি স্পন্দন আর একটি স্পন্দনকে জাগিয়ে তোলে। সংগীত তেমনি একটি স্পন্দন। সে স্পন্দনের নিবিড় সংঘর্ষে আত্মার জাগরণ ঘটে। কবিতায় সংগীত দেখা দেয় ছন্দরূপে। মৌখিক ভাষার সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সেই ভাষাকে ছন্দের সংগীতেই হৃদয়স্পর্শী ক'রে তোলে। ছন্দ ও ধ্বনিতে মিলে ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে।[৭]

'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে পঞ্চভূতের আলোচনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' (কচ-দেবযানী-সংবাদ) কাব্য-নাটিকাটির তাৎপর্য-বিশ্লেষণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই কাব্যের কত রকমের ব্যাখ্যা হ'তে পারে, তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'সোনার তরী' কবিতাটির ব্যাখ্যা-বহুলতা স্মরণীয়। তত্ত্ববিচারের হাটে সকলেই নিজবুদ্ধির নিকষে কবিতাকে যাচাই করতে

৪ তদেব পৃঃ ২৫
৫ তদেব পৃঃ ১২৭—১৩৪ 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'
৬ তদেব পৃঃ ৮৪—৮৬ 'গদ্য ও পদ্য'
৭ তদেব পৃঃ ৮৯—৯১

চায়। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতা প্রাণের একটি অনুভব-মুহূর্ত—আমাদের নিত্য-পরিচিত হাসিকান্না ভাবনা-বেদনাই তার অসীমসঞ্চারী হিল্লোলে কবিতা হয়ে ওঠে।[৮]

কিন্তু তাৎপর্য-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতাটির কথা বলা যায়। এ কবিতাটির তত্ত্বে ও অনুভবে যে অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটেছে, তাতে কাব্যের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ খুব অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না। কবি স্বয়ং কিন্তু এই তত্ত্ব-বিশ্লেষণকে বিশেষ মূল্য দিতে চাননি।

'কাব্যের তাৎপর্য'-আলোচনার পাশা-পাশি সঙ্গতভাবেই 'প্রাঞ্জলতা'র প্রসঙ্গ এসেছে। সাহিত্যে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা এবং সরলতা—এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই আগে মনোহরণ করে। ভূতনাথবাবুর দৃষ্টিতে—"কলাবিদ্যার সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার।··· এক-আধটি ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনি ভদ্রসাহিত্যেও ম্যানার আছে, কিন্তু 'ম্যানারি-জ্‌ম্' নাই। ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না।"[৯]

প্রাচীন বাংলা ও মৈথিলী সাহিত্য থেকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উদাহরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিচার করা চলে। চণ্ডীদাসের সরলতা অসাধারণ তাৎপর্যময়; কিন্তু বিদ্যাপতিও কি প্রথম শ্রেণীর কবি নন? প্রকাশের বিচিত্র ঐশ্বর্য তো অনুভবের বিশাল বৈচিত্র্যেরই বাণীরূপ হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—"গ্রীক প্রস্তরমূর্তিতে রঙচঙ রকম-সকম নাই—তাহা প্রাঞ্জল এবং সর্বপ্রকার প্রয়াস-বিহীন। কিন্তু তাই বলিয়া সহজ নহে। সে কোন প্রকার তুচ্ছ বাহ্য-কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।"[১০] এই গ্রীকমূর্তির সরলতাই আর্টের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ নয়। শিল্প-সাহিত্য কত বিচিত্র ও জটিল উপায়ে প্রকাশিত হয়েও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়। তবে এ কথাও স্বীকার্য, দুরূহতাই গভীরতা নয়।

'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'—রচনাদুটিতে কৌতুকের মাত্রার তারতম্যে কেমন ক'রে কমেডি ও ট্র্যাজেডির রূপান্তর হয়, সে কথা আলোচিত। কৌতুকের মূল কারণ অসঙ্গতি-বোধ! এই অসঙ্গতি যখন জীবনে অপরিমেয় শূন্যতার সৃষ্টি করে, তখনই ট্র্যাজেডির সূচনা। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'—প্রহসন ও ট্র্যাজেডির দুটি সীমান্ত।

সাহিত্যের বিষয়রূপে 'মনুষ্য' এবং 'নর-নারী'—সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকের চিরন্তন আগ্রহের বস্তু। মানুষের মধ্যে কোন্ 'শ্রেণী' বিশেষভাবে সাহিত্যে প্রকাশযোগ্য এ নিয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা ছিল। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই অনন্ত বিস্ময় রয়েছে। আধুনিক কালে তাই জাতি বা শ্রেণী হিসাবে মানুষের মূল্য দেওয়া হয় না। আধুনিক সাহিত্য সেইজন্যই মনুষ্য-নির্বিশেষে মানবাত্মার সৌন্দর্য অন্বেষণে রত। অজানিত অকথিত সকল অলক্ষ্য ভাবনা-বেদনার সঙ্গে আজ সাহিত্যের সহমর্মিতা।[১১]

৮ তদেব পৃঃ ৯৩—১০৩ 'কাব্যের তাৎপর্য'

৯, ১০ তদেব পৃঃ ১০৮—৯ 'প্রাঞ্জলতা'

১১ তদেব পৃঃ ৫২—৬৩ 'মনুষ্য'

'নর নারী' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের নারীচরিত্রের প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত কাল আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর কর্মপরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। নারী তার গৃহাঙ্গণের পরিধির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এজন্য পরিবারের কেন্দ্র হিসাবে নারী তার সমস্ত মন ও কর্মশক্তি নিয়ে সর্বাপেক্ষা সজীব। জীবনের লাবণ্যসঞ্চারের জন্য এই সজীবতাই পরিবার-সমন্বিত সমাজের আশ্রয়। সাহিত্যে এই সজীবতারই প্রতিফলন।[১২] 'মনসামঙ্গলের' বেহুলা, 'চণ্ডীমঙ্গলের' ফুল্লরা খুল্লনা, বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধা থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে অবধি বাংলা সাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলি এই কারণেই এত প্রাণচঞ্চল।

সাহিত্য ও শিল্পচেতনার গভীরে কোন্ অন্তঃপ্রেরণা সক্রিয়—এ নিয়ে কবি, দার্শনিক ও সমালোচকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। 'অখণ্ডতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই উৎস-সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। ব্যোম্ সাহিত্যিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে এইভাবে—"আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা। যোগের সকল তথ্য জানি না; কিন্তু শুনা যায়, যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা-বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া, পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।" [১৩]

বর্তমান যুগে সাহিত্যপাঠেই পাঠকেরা তুষ্ট নয়। সাহিত্যিকের জীবনের খুঁটিনাটি অন্বেষণ ও সাহিত্যবস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভাবটি উদগ্র হয়ে উঠেছে। এর ফলে সাহিত্যের অঙ্গবিশ্লেষণ অনেকটা শারীরতত্ত্বের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, এ দ্বারা সাহিত্যের অনুভব-জগতের কিছুমাত্র আলোকিত হয় না। 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল'-নামাঙ্কিত রচনাটিতে এই কৌতূহলের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্য করেছেন। মানবমন বা শিল্প-সাহিত্যকে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম-পদ্ধতির শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না—একথা বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় ভুলে যান।[১৪]

'ভদ্রতার আদর্শ' ও 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধ দুটি ঠিক সাহিত্যালোচনার শ্রেণীতে পড়ে না। আমাদের দেশে অনেক সময়ই আলস্য ও অশালীনতা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে দেখা দেয়। যথার্থ বৈরাগ্যের যে মহিমা, তার মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়েই একথা বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় জীবনে বসনে-ভূষণে আচারে-ব্যবহারে নিশ্চেষ্ট তামসিকতার লক্ষণই বেশী। এই জড়ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কর্মে ও জীবনে পরিচ্ছন্ন ভদ্রতার আদর্শ সঞ্চার করা আমাদের কর্তব্য।[১৫]

'প্রাচীন সাহিত্য'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের আলোচনা-প্রসঙ্গে মানবপ্রাণের চিরন্তন বিরহবোধের ভাবসত্যটি প্রকাশ করেছেন
রামায়ণ' রচনাটিতেও রামায়ণকাহিনীর এক নূতন ভাবময় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে—ক্ষিতির মারফৎ। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ব্যাখ্যা সাধারণ অর্থে 'ব্যাখ্যা' নয়। প্রাচীন-কাব্যভাবনাকে অবলম্বন ক'রে নূতন কাব্যসৃষ্টি।

'পল্লীগ্রামে' ও 'মন'—আধুনিক রম্য-রচনার সার্থক উদাহরণ। 'পঞ্চভূতে'র অন্যান্য

১২ তদেব পৃঃ ২৬—৪১ 'নরনারী'
১৩ তদেব পৃঃ ৭৮ 'অখণ্ডতা'
১৪ তদেব পৃঃ ১৪৭—১৫২
১৫ তদেব পৃঃ ১৩৫—১৪১ 'ভদ্রতার আদর্শ'

প্রবন্ধ আলোচনা-সমষ্টি, কিন্তু এ দুটিতে লেখকের একাকী মানস-সঞ্চরণ!

সভ্য পৃথিবীর জনসংঘাত থেকে দূর পল্লী-গ্রামে প্রকৃতির প্রশান্ত ছায়ায় যুগযুগান্ত ধরে মানবজীবন-প্রবাহের একটি অলক্ষ্য ধারা বয়ে চলেছে। এই গ্রামের মানুষদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—এরা সরল। "সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।...সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।...যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ করিয়া দেখে, তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য হইতে সে অনেক তফাত।"[১৬]

কিন্তু এই সরলতার গণ্ডী বড় সঙ্কীর্ণ। গ্রাম্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেনাপাওনার জগতের সঙ্গে নাগরিক জগতের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতের বিশাল ব্যাপকতার তুলনা হয় না। সেই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে যে ঐক্যের বাণী খুঁজে পায়, তার মহত্ত্ব হয়তো আরো বেশী। সেই কথা মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরি-সমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও নির্ভরতা আছে, সন্দেহ নাই—আর যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায়, তাহারা অনেক অশান্তি—অনেক বিঘ্ন-বিপদ সহ্য করে; বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়; কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। এই বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা।"[১৭]

'পঞ্চভূতে'র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানেই শেষ করা যাক। এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি অনুচ্ছেদে কত অসংখ্য চিন্তাসম্পদ ছড়ানো রয়েছে! কিন্তু পাঠকের মনের উপর কোন মতামতই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেই। এই সাহিত্যিক পাদ-চারণায় মনীষী রবীন্দ্রনাথ সব শ্রেণীর পাঠককেই তাঁর সহযাত্রী করেছেন। তাঁর বিশাল প্রবন্ধ-সাহিত্যে মননশীলতার প্রচুর উপাদান রয়েছে, কিন্তু এমন আত্মীয়তার সঙ্গসুধা অন্যত্র দুর্লভ। তাই 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি দিকের একটি অনন্য উদাহরণ।

১৬, ১৭ তদেব—পৃ: ৪৪, ৪৬, ৫১ 'পল্লীগ্রাম'

তুমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

কত কথা দিয়ে বোঝাতে তোমারে চেয়েছে কত না জনে ;
পেরেছে কি কেউ, কেমন যে তুমি—বোঝাতে ? পারেনি কেহ।
কথা দিয়ে দিয়ে বোঝানো কি যায় ? শুধুই কথার মালা
গাঁথা হয় আর পড়ে থাকে পাশে, শুকনো ফুলের বোঝা।

যে বুঝেছে তার মুখে নেই ভাষা, কথা সরে নাক' আর ;
যে দেখেছে চোখ বুজে গেছে তার, কিছু আর দেখে না সে ;
যে শুনেছে কানে ও মধুর ধ্বনি, সব শোনা তার শেষ—
হারিয়ে সে গেছে, ডুবেছে, মজেছে রূপ রস আর গানে।

কথা দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না, দেখানো যায় না চোখে ;
শোনানো যায় না তার বাঁশী যদি কান কভু নাহি শোনে।
সে আছে এধারে, সে আছে ওধারে, সে আছে সকল ঠাঁই—
দেখার মতন চোখ চাই শুধু, আর চাই মন প্রাণ।

সকল কথার আড়াল ভেঙে সে দেখা দেবে হাসিমুখে,
শোনাবে সে গান সমুখে দাঁড়িয়ে অপরূপ রূপ ধরে ;
চোখ কান মন—সব খুশি হবে, বইবে খুশির হাওয়া—
সব চাওয়া শেষ, সব পাওয়া শেষ, শেষ সব আনাগোনা।

দেখতে চাই কি তাকে ? প্রাণ কাঁদে ? সত্যি কি ভালবাসি ?
সবার আগে এ জবাবটি চাই—জবাব চোখের জলে।
বাকী সমাধান সহজ সরল ; সে নয় দূরের কেহ—
কাছে সে রয়েছে, পাশে সে রয়েছে ডাকার অপেক্ষায়।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[দশম অধ্যায়ের অনুবাদের জন্য 'উদ্বোধন' ৬২তম বর্ষ পৃঃ ১৮৫ ও ২৪৯ দ্রষ্টব্য। বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মূল জ্ঞানেশ্বরীর শ্লোকসংখ্যা]

এই একাদশ অধ্যায়ে দুইটি রসের কথা বলা হইয়াছে—এখানে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে; 'শান্ত' রসের ঘরে 'অদ্ভুত' রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর রসগুলিও আসিয়া পঙ্‌ক্তিতে বসিবার সম্মান লাভ করিয়াছে; বর-বধূর মিলনে (বিবাহ-সময়ে) যেমন বরযাত্রী-গণও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়, তেমনি দেশী (মারাঠী) ভাষার সুখাসনে সমস্ত রস আসিয়া সুশোভিত হইয়াছে। পরন্তু (তাহাদের মধ্যে) শান্ত ও অদ্ভুত রস এমন ভাবে শোভা পাইতেছে যে, মনে হয় চক্ষু যেন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, হরিহর যেন প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, অথবা অমাবস্যার দিনে যেমন সূর্য ও চন্দ্রের বিম্ব একত্র মিলিয়া যায়, তেমনি এই অধ্যায়ে শান্ত ও অদ্ভুত রসের ঐক্য হইয়াছে; গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ যেমন একত্র মিশিয়াছে, তেমনি এখানে দুইটি রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এবং তাহাতে সারা জগৎ সুস্নাত (পবিত্র) হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গীতারূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য হে শ্রোতৃবৃন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী সঙ্গমই বলা উচিত।

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, আমার উদার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব (নিবৃত্তিনাথ)-ই শ্রবণ দ্বারা এই তীর্থে প্রবেশ করা সহজ করিয়াছেন। শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহার (গীতার) সংস্কৃত ভাষারূপ গহন তীর ভাঙিয়া মারাঠী শব্দের সোপান প্রস্তুত করিতেছেন। এইজন্য এখানে যে কেহ স্নান করিয়া প্রয়াগে বিরাটস্বরূপ মাধব-দর্শনের ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সংসারের (জন্ম-মরণের) তিলাঞ্জলি দিতে পারে। (১০)

আর অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মূর্তিমান্ হইয়া প্রকট হইয়াছে যে, ইহা যেন শ্রবণসুখের সাম্রাজ্য; এখানে 'শান্ত' ও 'অদ্ভুত' রস প্রকট হইয়াছে, আর অন্য রসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অল্পই বলা হইল ;এখানে মোক্ষ-প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে।

ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাসস্থান; পরন্তু ভাগ্যবান্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর শুধু অর্জুন কেন? যে এখানে আসিতে চায় তাহারই শুভদিন উপস্থিত, কারণ গীতার্থ (মারাঠী) ভাষায় প্রকট হইল; এইজন্য এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সজ্জন আপনারা, এখন এদিকে মনোযোগ দিন।

অহো, যদিও আপনাদের ন্যায় সন্তজনের সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের যোগ্যতা আমার নাই, তথাপি আপনারা আমাকে স্নেহে-প্রেমে সন্তানের মতো মানিয়া লউন। অহো, তোতাকে আপনারা বুলি শিখান, তাহার মুখে ঐ শিখানো বুলি শুনিয়া আপনারা কি মাথা দোলাইতে থাকেন না? কিংবা বালকের কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া দেখিয়া কি মাতা আনন্দিত হন না?

তেমনি আমি যাহা বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন, অতএব হে দেব, আপনারা আপনাদের নিজের কথাই শুনুন। ব্রহ্মবিদ্যার যে মধুর বৃক্ষ (চারা) আপনারা রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইয়া তুলুন।

এই বৃক্ষ রসভার-স্বরূপ ফুলে ও নানা ফলভারে ভরিয়া উঠিয়া আপনাদের প্রসাদে জগতের উপকারী হইবে। (২০) এই কথায় সন্তগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি ভালই করিয়াছ, আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল।

তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন: আমি সাধারণ মনুষ্য, 'কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ' কি বলিতে জানি? পরন্তু আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহো, বনের পত্রভোজী বানরগণ কি লঙ্কেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল? একা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করেন নাই। সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচরে কিনা হয়? আপনারা সন্তজন সহায় হইয়া আমার দ্বারা এই গীতার্থ বলাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতারই ভাবার্থ আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই গীতা-গ্রন্থের কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য! বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের বক্তা—যাহা শ্রীশম্ভুরও ধ্যানের অগম্য, তাহার গৌরব কিরূপে বর্ণনা করিব? এখন মনে মনে তাহার বন্দনা করাই ভাল। বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কিরীটী প্রথমে কি করিবার উপক্রম করিলেন, তাহাই শুনুন; সারা বিশ্বই ঈশ্বরের রূপ—অর্জুনের মনে এই প্রকার যে প্রতীতি (অনুভব)-গত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা বাহিরে নয়নগোচর হউক।

ইহাই তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, পরন্তু ভগবানকে এ সম্বন্ধে কিছু বলাও (অর্জুনের পক্ষে) সঙ্কটজনক, বিশ্বরূপ অতি গূঢ় রহস্য; তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করা যায়? (৩০)

তিনি (মনে মনে) বলিলেন, 'যাহা পূর্বে কখন কোন প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, সহসা কেমন করিয়া বলি, তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন।' অর্জুন ভাবিতে লাগিলেন, 'যদিও আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার (লক্ষ্মীদেবী) হইতেও অধিক অন্তরঙ্গ? তিনিও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয় পান। আমার প্রতি তিনি স্নেহ প্রকাশ করেন, পরন্তু তাহা কি গরুড়ের প্রতি স্নেহের ন্যায়? গরুড়ও একথা বলিতে সমর্থ হয় নাই। আমি কি সনকাদি হইতেও ভগবানের নিকটতর? পরন্তু তাঁহারাও এই প্রকার বাসনা পোষণ করেন নাই। আর আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর?

তাহাদেরও তিনি বালভাব দ্বারা মোহিত করিয়াছেন, ভক্তের জন্য গর্ভবাসও সহ্য করিয়াছেন—পরন্তু বিশ্বরূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই। যে গূঢ় রহস্য ইনি আজ পর্যন্ত আপনার অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে আমি সোজাসুজি কি করিয়া প্রশ্ন করি? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অন্তঃকরণে সুখ হইবে না, তখন আর জীবিত থাকিয়া কি করিব? অতএব এখন অল্প স্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই থাকুক। এই ভাবে পার্থ ভীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু এমন প্রেমের সহিত বলিলেন যে, দু-একটি প্রশ্নোত্তরের পরেই ভগবান আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া

দেখাইলেন, বৎসকে চোখে দেখিয়াই গাভী যেমন প্রেমবশতঃ চট্‌পট্ উঠিয়া দাঁড়ায়, বৎস স্তনে মুখ দিলে কি গাভী দুগ্ধ ধরিয়া রাখে? (৪০) তেমনি পাণ্ডবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে (তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য) দৌড়াইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে অর্জুন প্রশ্ন করিলে তিনি কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তিনি স্বভাবতই স্নেহস্বরূপ, আর অর্জুন স্নেহপিপাসু—এ মিলনে যে ভিন্নতা থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য। অতএব অর্জুন বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবেন—ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনারা শ্রবণ করুন। অর্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

পার্থ ভগবানকে বলিলেন, হে কৃপানিধি, আপনি আমার জন্যই যাহা অবর্ণনীয় তাহাও প্রকট করিয়া বলিয়াছেন। যখন (পঞ্চ) মহাভূত ব্রহ্মে লীন হয় আর জীব ও মহদাদি লয়প্রাপ্ত হয়, তখন পরব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করেন—তাহাই তাঁহার বিশ্রামস্থল; যে স্বরূপ আপনি কৃপণের ন্যায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও গোপন করিয়াছেন, তাহা আপনি আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন; যে অধ্যাত্ম-বস্তুর জন্য শঙ্কর সমস্ত ঐশ্বর্য (আরতি করিয়া) পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বস্তু (জ্ঞান) হে স্বামিন্, আপনি আমাকে দান করিয়াছেন—একথা বলিলে আমি আপনার স্বরূপ দেখিব কিরূপে?

পরন্তু মোহের মহা বন্যায় আমাকে মস্তক পর্যন্ত ডুবিতে দেখিয়া হে শ্রীহরি, আপনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সত্যই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, পরন্তু আমার কর্ম দেখুন—'আমি আমি' এই প্রকার কথাও আমি বলিতেছি। (৫০)

'আমি অর্জুন' এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌরবগণকে আমার স্বজন মনে করিতেছিলাম; শুধু ইহাই নহে, ইহাদের বধ করিয়া 'আমি কি পাপে লিপ্ত হইব?'—এই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম—আপনি আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষ্মীপতি, নিজের নিত্য বসতি ত্যাগ করিয়া আমি অলীক গন্ধর্বনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি মৃগজল পান করিতে ছুটিয়াছিলাম; বস্ত্রনির্মিত (মিথ্যা) সর্পের দংশনে আমি সত্যই বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম —এই বৃথা মরণ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আপনি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি করাইয়াছেন। আপন প্রতিবিম্ব না বুঝিয়া কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে গেলে যেমন অপর কেহ ধরিয়া ফেলে, তেমনি আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; নতুবা শুনুন, আমার এতটা নিশ্চয়তা হইয়াছিল যে, সপ্ত সমুদ্রও যদি একত্র মিলিয়া যায়, যুগক্ষয়ে প্রলয় হইয়া সমস্ত জগতের অন্ত হয়, অথবা আকাশ ভাঙিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজগণের সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। এইরূপ অহংকারের আধিক্যে আমি ডুবিতেছিলাম। ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কে আমাকে উঠাইত?

আমি মিথ্যাই আমার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলাম। আর যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার নাম গোত্র আখ্যা দিয়াছিলাম, এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, পরন্তু আপনিই রক্ষা

করিয়াছেন ; পূর্বে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানির্মিত জতুগৃহ) হইতে বাঁচাইয়াছেন। তাহাতে শুধু দেহেরই ভয় ছিল, এখন এই ভয়রূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে মনের সঙ্কট হইয়াছিল। (৬০)

দুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিরূপ বসুন্ধরাকে কুক্ষিতলে লইয়া মোহরূপ সমুদ্রের তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে আপনারই সামর্থ্যে পুনরায় আমার বুদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, আমার বুদ্ধি-উদ্ধারের জন্য আপনাকে যেন দ্বিতীয়বার বরাহ হইতে হইল, আপনার কৃতিত্ব এমনই অপার যে, একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা করিব? পরন্তু আপনি আমার জন্য আপনার পঞ্চ প্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন, ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না। হে দেব, আপনি আমার মায়ার আদ্যন্ত (সমূল) নিরসন করিয়াছেন। ইহাতে আপনার উত্তম যশঃপ্রাপ্তি হইল।

হে প্রভু, আনন্দ-সরোবরে কমলের ন্যায় আপনার নেত্র! যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার কি আর মোহ উৎপন্ন হয়? ইহা অতি হীন কল্পনা! মৃগজলের বৃষ্টি বড়বানলের কি করিবে? আর আমার কথা ধরিলে হে কৃপানিধি, আমি আপনার কৃপার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরসের আস্বাদন করিতেছি। তাহা দ্বারা যে আমার মোহ চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আপনার চরণস্পর্শে আমার উদ্ধার হইয়া গেল।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হে কমলনেত্র, হে কোটিসূর্যপ্রভ মহেশ্বর, আজ আপনার নিকট শুনিলাম, এই ভূতগ্রাম কোথা হইতে উৎপন্ন হয় এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যায়। হে দেব, সেই প্রকৃতির বর্ণনা আপনি আমার কাছে করিয়াছেন। (৭০) আর প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া সেই পরমপুরুষের মূল স্থান দেখাইয়াছেন, যাঁহার মহিমারূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে; শব্দরাশি (বেদ) যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত আছে অথবা ধর্মরূপ রত্ন প্রসব করিতেছে—ইহা তাঁহারই চরণ সেবা করিতেছে বলিয়া সম্ভব।

এইভাবে যিনি সকল সাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, যাঁহার স্বরূপ শুধু আত্মানুভব দ্বারাই আস্বাদন করা যায়, সেই পরব্রহ্মের অগাধ মাহাত্ম্য আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন; আকাশ মেঘনির্মুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিংবা হস্তদ্বারা শৈবাল সরাইয়া ফেলিলে যেমন জল দেখা যায়, অথবা সর্পের বেষ্টনী দূরীভূত হইলে যেমন চন্দন-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করা যায়, অথবা যক্ষ পলায়ন করিলে যেমন ধনভাণ্ডার হস্তগত হয়—তেমনি প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা দূরে সরাইয়া আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্ত্বের শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। এইজন্য হে দেব, আমার অন্তঃকরণে এ-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। পরন্তু হে দেব, আর একটি ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে ; সঙ্কোচ করিয়া যদি বলি, 'থাক্' (অর্থাৎ জিজ্ঞাসা না করি), তবে আর কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? আপনি ভিন্ন কি আর অন্য কোন আশ্রয় আছে? জলচর যদি জলে আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ করে, বালক যদি স্তনপান করিতে না চায়, তবে তাহার বাঁচিবার আর কি উপায় আছে? সুতরাং সঙ্কোচ করিব না, যাহা ইচ্ছা হয়

আপনাকে প্রশ্ন করিব। তখন ভগবান বলিলেন, 'বেশ, তোমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হয়, বল'।(৮০)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

তখন কিরীটী বলিলেন: আপনি যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে আমার অনুভবের দৃষ্টি শান্ত হইয়াছে; এখন—যাহার সঙ্কল্পে এই লোক-পরম্পরার আরোপ হয়, যাহাকে আপনি স্বয়ং 'আমি' বলিতেছেন, আপনার সেই মূলস্বরূপ, যাহা হইতে আপনি সুরগণের কার্যের নিমিত্ত দ্বিভুজ চতুর্ভুজরূপে বারংবার অবতার-গ্রহণ করিয়া থাকেন, শেষ-শয়ন শ্রীবিষ্ণুর রূপ ঢাকিয়া মৎস্যকূর্মাদিরূপে লীলা সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এই সব সগুণরূপ সংবরণ করিয়া রক্ষা করেন, উপনিষদ্ যাঁহার মহিমা কীর্তন করে, যোগিগণ হৃদয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়া (অন্তর্মুখী হইয়া) যাঁহার দর্শন পান, যাঁহাকে সনকাদি ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ অগাধ যে আপনার বিশ্বরূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য আমার চিত্ত উতলা হইয়াছে। আমার সঙ্কট দূর করিয়া প্রেমবশতঃ যখন আমার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন, তখন বলিলাম, ইহাই আমার মনের বৃহৎ কামনা। আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হউক। মনে এইরূপ এই বৃহৎ আশাই জাগিতেছে।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

পরন্তু আর একটা কথা আছে—আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য আমার যোগ্যতা আছে কিনা, আমি জানি না। রোগী কি রোগের নিদান জানে? (৯০)

আর্তির উৎকণ্ঠা প্রবল হইলে আর্ত আপনার যোগ্যতা ভুলিয়া যায়, যেমন তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি বলে—সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণা মিটিবে না, তেমনি প্রবল আকাঙ্ক্ষার মোহে আমি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছি না। মাতা যেমন শিশুর যোগ্যতা জানেন, তেমনি হে জনার্দন, আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার করুন, আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন; তবে এমনিভাবে কৃপা করুন (কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করান); নতুবা বলুন, তাহা হইবে না; দেখুন, বধিরের সম্মুখে পঞ্চমস্বরের আলাপ বৃথা, তাহা তাহাকে কি করিয়া সুখ দিতে পারে?

এক চাতকের তৃষ্ণা উপলক্ষ করিয়া মেঘ কি সারা জগতের জন্য বর্ষণ করে না? পরন্তু বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহা ব্যর্থ হয়; চকোর চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয়—অপরকে কি শপথ দিয়া উহা পান করিতে নিষেধ করা হয়? পরন্তু চক্ষু বিনা (চন্দ্রের) প্রকাশ বৃথাই যায়।

অতএব আপনি সহসা (অবিলম্বে) বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নূতন (আপনার স্বরূপ অদ্ভুত অলৌকিক), আমি জানি আপনার ঔদার্য স্বতন্ত্র, দিবার সময় আপনি পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কৈবল্যের ন্যায় পবিত্র বস্তু কি আপনি শত্রুকেও দেন নাই? মোক্ষ সত্যই দুষ্প্রাপ্য, পরন্তু তাহাও আপনার চরণ সেবা করে—সেইজন্য আপনি তাহাকে যেখানে প্রেরণ করেন, ভৃত্যের ন্যায় সে

সেখানেই যায়; পূতনা—যে আপনাকে বিষাক্ত স্তন পান করাইতে আসিয়াছিল, তাহাকেও আপনি সাযুজ্য মুক্তি দান করিয়াছেন। (১০০)

রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ত্রিভুবনের সভাসদ্‌গণের সম্মুখে শত দুর্বাক্য দ্বারা যে আপনার অপমান করিয়াছিল, সেই শিশুপালকে কি আপনি আপনার পদ (স্বরূপ) প্রদান করেন নাই? আর উত্তানপাদের পুত্রের কি ধ্রুবপদে আকাঙ্ক্ষা ছিল? সে পিতার অঙ্কে বসিবে বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরন্তু সে আজ সূর্যাদির ন্যায় পূজ্য হইয়াছে। এইভাবে হে প্রিয়, আপনি কত আশ্চর্য দান করিয়া আর্ত ভক্তেরও বশ্য হইয়াছেন! পুত্রকে দেখিতে দেখিতে অজামিল ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে (ভৃগুঋষি) আপনার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল, হে প্রভু, আপনি তাহার (চরণ-) চিহ্ন ধারণ করিতেছেন—এখন পর্যন্ত আপনি আপনার বৈরীর (শঙ্খাসুরের) কলেবর (শঙ্খ) ভুলিতে পারেন নাই। এইভাবে আপনি অপকারীর উপকার করেন, অপাত্রের প্রতিও আপনি উদার; আপনাকে সর্বস্ব দান করিয়াছে বলিয়া আপনি বলি-রাজার দ্বারপাল হইয়াছেন; যে গণিকা কখনও আপনার আরাধনার কথা শ্রবণ করে নাই, সে কৌতুকে শুকপক্ষীকে রাম-নাম উচ্চারণ করাইত বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের সুখভোগের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার নানা অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন,—আমার জন্য কি আপনি অন্য কিছু করিবেন? আপন দুগ্ধের আধিক্যে যে জগতের অভাব দূর করে, সেই কামধেনুর বৎসই কি ক্ষুধার্ত থাকিবে? অতএব হে দেব, আমি যাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা যে আপনি দেখাইবেন না, ইহা হইতেই পারে না—পরন্তু আমার দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন। (১১০) হে গোপাল, আপনার বিশ্বরূপ দেখিতে পাই, এইরূপ করুন; হে দেব, আমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

সুভদ্রাপতি যখন এই প্রকার বারংবার মিনতি করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন ষড়্‌গুণৈশ্বর্যের আধার শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতপূর্ণ সজল মেঘ, আর অর্জুন সমাগত বর্ষাকাল; অথবা শ্রীকৃষ্ণ কোকিল, অর্জুন বসন্ত; এই জন্য পূর্ণচন্দ্রবিম্ব দেখিয়া যেমন ক্ষীর সমুদ্র উছলিয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে দ্বিগুণ উল্লসিত হইলেন, এবং সেই প্রসন্নতার আবেশে কৃপাপরবশ হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'হে পার্থ, দেখ, আমার অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ। অর্জুনের একটি বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিশ্বরূপময় করিলেন। ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্বদা যাচকের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাহার ইচ্ছার সহস্রগুণ স্বেচ্ছায় দান করিয়া থাকেন। অহো, শেষনাগের (সহস্র) চক্ষুও যাহা হইতে বঞ্চিত, যে গুহ্য রহস্য শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও ভগবান গোপন রাখিয়াছেন। পার্থের অশেষ সৌভাগ্য যে, সেই রহস্য অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন বিশ্বরূপ-প্রদর্শনের একটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করিলেন।

জাগ্রত (মানুষ) স্বপ্নাবস্থায় গিয়া যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তুই হইয়া যায়, তেমনি তিনি নিজেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গেলেন। (১২০) সহসা মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের স্থূলদৃষ্টির যবনিকা সরাইয়া দিলেন; কিংবহুনা, আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়া দেখাইলেন;

পরন্তু অর্জুন ইহা দেখিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণেও ছিল না—একেবারে স্নেহাতুর হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'দেখ, দেখ'। শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

হে অর্জুন, তুমি একটি বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহা দেখাইলে কি আর দেখানো হইত? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমার রূপে ভরিয়া গিয়াছে। একটি সূক্ষ্ম একটি স্থূল, একটি হ্রস্ব একটি বিশাল, কোনটি সসীম কোনটি বা অসীম, কোনটি অনিয়ন্ত্রিত, কোনটি প্রাঞ্জল; কেহ সচল কেহ নিশ্চল, কেহ উদাসীন, কেহ প্রেমময়; কেহ বা তীব্র, কেহ বিচলিত; কেহ সুলভ কেহ গম্ভীর; কেহ উদার, কেহ কৃপণ; কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত; কেহ সদা মদোন্মত্ত, কেহ স্তব্ধ; কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জনশীল: কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য; কেহ সকাম, কেহ বিরক্ত; কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত; কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত; কেহ প্রসন্ন, কেহ সুপূজিত; কেহ শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ অসঙ্গ; কেহ স্বতন্ত্র (নিঃশব্দ) কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র; কেহ সমাধিস্থ; কেহ জননলীলা-বিলাসী, কেহ বা স্নেহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহারকর্তা, কেহ বা সাক্ষী ভূত। (১৩০)

এইভাবে নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজ-প্রকাশযুক্ত রূপ আছে—ইহাদের মধ্যে একটি অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নহে। কেহ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোর কপিলবর্ণ, কেহ যেন সিন্দুরমণ্ডিত আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ। কেহ স্বভাবতঃ সুন্দর, যেন রত্নমাণিক্যখচিত ব্রহ্মাণ্ড, কেহ বা অরুণোদয়ের ন্যায় কুসুমবর্ণ, কেহ নির্মল স্ফটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জ্বল, কেহ ইন্দ্রনীলের ন্যায় সুনীলবর্ণ, কেহ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কেহ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্যামল, কেহ সুবর্ণ চম্পকের ন্যায় নির্মল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিদ্বর্ণ, কেহ তপ্ত তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র (নির্মল)—এইরূপ আমার নানা বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, তেমনি প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের—কাহারও এমন সুন্দর রূপ যে কন্দর্পও লজ্জিত হইয়া শরণ লয়। কেহ আকারে লাবণ্যভূষিত, কেহ দেখিতে অতি মনোহর—যেন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। কেহ মাংসল ও পুষ্ট অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অতি করাল, কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকান্তি, কেহ বা বিকট (কুরূপ)। হে সুভদ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই—ইহাদের এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে। (১৪০)

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥৬॥

আমার দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির সৃষ্টি হয়। পুনর্বার নিমীলন হইলেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হয়; (আমার) মুখের বাষ্প (উষ্ণশ্বাস) বাহির হইলেই সমস্ত জ্বালাময় হইয়া যায়, যাহা হইতে পাবকাদি বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়, আর ক্রোধে ভ্রূকুটী করিলেই (ভ্রূর প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই) রুদ্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের) অবতার হয়। সৌম্য ভাব হইতে যুগল অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাণ্ডব, কর্ণ হইতে অনেক বায়ুর উৎপত্তি হয়;

এইভাবে এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের জন্ম হয়—এইরূপ অপার (অসংখ্য) ও বিশাল রূপ দেখ। যাহার বর্ণনা করিতে বেদের বাণী কুণ্ঠিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, যাহার অন্ত স্বয়ং ব্রহ্মাও পান না, দেবত্রয়ও যাহার নাম শুনেন নাই, সেইসব অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য ও কৌতুককর মহাসিদ্ধি উপভোগ কর।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

হে কিরিটি, দেখ এই মূর্তির রোমকূপে সৃষ্টি ভরা রহিয়াছে—পর্বতে বৃক্ষের তলায় তৃণাঙ্কুর যেমন থাকে। আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু উড়িতে দেখা যায়, তেমনি এই মূর্তির (প্রত্যেক) অবয়ব-সন্ধিতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; ইহার একটি অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের অপর পারে কোনও বস্তু দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয় (১৫০)—তবে সে-বিষয়েও কোন সঙ্কট (বাধা) নাই—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার দেহে সুখে দেখিতে পাইবে।

এইভাবে বিশ্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ করুণাভরে কহিলেন, তখনও অর্জুন দেখিতেছেন কিনা, তাহা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অর্জুন কেন স্তব্ধ হইয়া আছেন, জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকাইয়া দেখিলেন, অর্জুন পূর্বের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ (মনে মনে) বলিলেন—ইহার উৎকণ্ঠা কমে নাই, এখন পর্যন্ত (আত্ম) সুখের স্বরূপ প্রাপ্তি হয় নাই—আমি যে (বিশ্বরূপ) দেখাইলাম, তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই। এইভাবে বলিয়া ভগবান সহাস্যে সম্মুখস্থ অর্জুনকে বলিলেন, 'আমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম, তুমি তাহা দেখিলে না?' ইহা শুনিয়া বিচক্ষণ অর্জুন বলিলেন, 'প্রভু, ইহা কাহার দোষ? আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অহো, আপনি দর্পণ মার্জন করিয়া অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে হৃষীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন। হে শার্ঙ্গধর, আপনি ভেকের সম্মুখে মকরন্দরেণুর খাদ্য পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, যাহা কেবল জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই অনুভব করা যায়, তাহা আপনি চর্মচক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমি কি করিয়া দেখি? পরন্তু আপনার ত্রুটি না ধরিয়া চুপচাপ সহ্য করাই ভাল।'

ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন : বৎস, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। ইহা ঠিকই যে বিশ্বরূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবার সামর্থ্য দিতে হইবে (১৬০)— পরন্তু তোমাকে বলিতে গিয়া প্রেমভাবে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, ভূমি চাষ না করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি হইয়াছে—এখন তোমাকে এমন দৃষ্টি দান করিব, যাহা দ্বারা তুমি আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। হে পাণ্ডব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত ঐশ্বর্য-যোগ দেখিয়া

আত্মানুভবের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইভাবে বেদান্তবেদ্য, সকল লোকের আদিকারণ জগতের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় কহিলেন : হে কৌরবকুল-চক্রবর্তি, আমার বারংবার ইহাই বিস্ময় বোধ হইয়াছে যে, ত্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে অধিকতর ভাগ্য আর কাহার আছে? অথবা জগতে তত্ত্বকথা-বর্ণনায় শ্রুতি (বেদ) হইতে কি কেহ বেশী শক্তি দেখাইয়াছে? কিংবা সেবাশক্তির কথা ধরিলে তাহা এক শেষনাগের অঙ্গেই আছে; অহো, ভগবৎ-সেবার উৎকট ইচ্ছায়—যোগীর ন্যায় অষ্টপ্রহর একাগ্রমনে সেবা করিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে?

পরন্তু ইহাদের সকলকেই একধারে সরাইয়া পঞ্চপাণ্ডব যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই সম্প্রতি কৃষ্ণসুখ একস্থানেই আছে; এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনের অধীন হইয়াছেন, পুরুষ যেমন মনোরমা নারীর অধীন হইয়া যায়; পড়ানো পাখীও এরূপ বলে না, ক্রীড়ামৃগও এরূপ ছন্দে চলে না (আজ্ঞামত ক্রীড়া করে না),—জানি না কি করিয়া অর্জুনের ভাগ্য এমন অনুকূল হইল! (১৭০)

এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল পরব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) দর্শন-সুখ ভোগ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কেমন ইঁহার প্রত্যেকটি বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন; ইনি কোপ করিলে চুপ করিয়া সহ্য করেন, রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুঝাইতে যান;— কি আশ্চর্য, শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি পার্থের জন্য পাগল হইয়াছেন; (মাতৃগর্ভে) বিষয়-বাসনা জয় করিয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের ন্যায় সমর্থ মহাত্মাগণ যাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া ভাটের ন্যায় স্তুতি করিয়াছেন, সেই যোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের অধীন হইয়াছেন—হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে।

ইহা বলিয়া সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন : হে কৌরবপতি, ইহাতে বিস্ময়েরই বা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়া লন, তাহার আপনা হইতেই এরূপ ভাগ্যোদয় হয়।

তখন শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন, তোমাকে এখন দিব্য দৃষ্টি দিতেছি—যাহা দ্বারা তুমি সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই (অক্ষর) বাক্য সম্পূর্ণভাবে বাহির হইতে না হইতেই (অর্জুনের) অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল।

তাঁহার দিব্য চক্ষু প্রকট হইল, তাহা দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য দেখাইলেন; অবতারসমূহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্ব-রূপ মৃগজল যাঁহার কিরণে ভাসমান হয়, যাঁহার (সঙ্কল্পরূপ) অনাদি ভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অর্জুনকে দেখাইলেন। (১৮০)

পূর্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাতা যশোদা ক্রোধে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন, ভীত হইয়া মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের ভিতরে চতুর্দশ ভুবন দেখাইয়াছিলেন, অথবা মধুবনে ধ্রুবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া ভগবান্ এমন করিলেন যে, সে যে-সব (তত্ত্ব) কথা বলিতে লাগিল, সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ

করে না ; হে রাজন্, ধনঞ্জয়ের প্রতি শ্রীহরি তেমনি অনুগ্রহ করিলেন, যাহাতে 'মায়া' কোথায় গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না।

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য দেখিতে পাইয়া অর্জুনের চিত্ত বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। মহাপ্রলয়ের জলে (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) সব ডুবিয়া গেলেও যেমন মার্কণ্ড ঋষি একাকী ভাসিয়া ছিলেন, পার্থও তেমনি বিশ্বরূপের মহোৎসবে ভাসমান হইয়া বলিতে লাগিলেন: এখানে যে এত বড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়া গেল? চরাচর মহাভূতের কি হইল? দিক্‌সমূহের চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে, আকাশ-পাতালের কি হইল কে জানে? জাগৃতির পর স্বপ্ন-লয়ের ন্যায় সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা সূর্যের তেজে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়, তেমনি বিশ্বরূপ সারা প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে; তখন অর্জুনের মনে মনোধর্মের স্ফুরণ বন্ধ হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে বরণ করিতে পারিল না, ইন্দ্রিয়ের রশ্মি (বৃত্তি)-গুলি ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল (১৯০), তখন (তটস্থ লক্ষণ) স্তব্ধ হইল, একাগ্রতাও একাগ্র হইল— যেন সকল বিচার-বুদ্ধির উপর কেহ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বিস্মিত আগ্রহে অর্জুন দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুর্ভুজ মূর্তি ছিল, তাহা নানা রূপ গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। বর্ষাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিংবা মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি ঐ মূর্তি ভিন্ন কোথাও আর অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। (ক্রমশঃ)

অল্প ও ভূমা

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

'নাল্পে সুখমস্তি'

অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার নাহিক' সন্তোষ,
প্রাপ্তির আহুতি পড়ে লোভাগ্নি শিখায়,
জ্বালা বাড়ে, শান্তি নাই, নাহি পরিতোষ,
বুভুক্ষা-বিক্ষুব্ধ প্রাণ সুষমা হারায়।

চাওয়ার বিরাম কই? নিত্য বাড়িতেছে,
যত পায়, তত চায়, অতৃপ্তি অশেষ,
সঞ্চিত বস্তুর পিণ্ড—বোঝা জমিতেছে,
সুখের বোঝার ভারে, বাড়ে ব্যথা-ক্লেশ।

আরাম আয়াসলাভে সতত প্রয়াস,
আত্মসুখপরায়ণ যাহা কিছু পায়,
প্রাসাদ প্রমোদ-সুখ উদ্‌ভ্রান্ত বিলাস,
অল্প সব, তুচ্ছ সব, কামনা না যায়।

বৃহতের সাধনায় ক্ষুদ্র ভুলে যাও,
অমৃতের পুত্ররূপে পরিচয় দাও।

'ভূমৈব সুখম্'

অনন্তের আস্বাদনে অমৃতের স্বাদ,
পড়ে না ঘটের জলে পূর্ণ প্রতিরূপ,
সীমার গণ্ডীর মাঝে নিয়ত বিবাদ,
ক্ষুদ্রতায় অপ্রকাশ বিরাট-স্বরূপ।

বিশ্বরূপে অখণ্ডতা উপলব্ধি এলে
লভে জ্ঞান নিত্যশুদ্ধ, সত্য অনুভূতি,
সবারে বাসিয়া ভালো সদা শান্তি মেলে,
লাভের বিচারে লভে আনন্দ-বিভূতি।

ভূমার সাধনা যাঁর ভূমিতে বসিয়া,
তুচ্ছ লোভ, ক্ষুদ্র লাভে উপেক্ষিয়া চলে,
অসীম সন্ধানে যায় সীমারে লঙ্ঘিয়া,
পূর্ণ প্রেমে লভে শান্তি, আনন্দ অতলে।

খণ্ড স্থূল জীর্ণ ক্ষুদ্র, ভূমাতেই সুখ,
আরামপ্রয়াসী সদা আনন্দ-বিমুখ।

মাতৃতীর্থ জয়রামবাটী

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

অনেকের মতো আমারও মনে হয়, শ্রীশ্রীমা সারদামণি এখনও যেন জয়রামবাটীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজের জন্মস্থান জয়রামবাটীকে বলিতেন, 'শিবপুরী'। প্রতি বৎসর মনে হয়, মাকে তাঁহার বাটীতে দেখিয়া আসি। শহরবাসী কোন কর্মী ছেলে অবকাশ-কালে কাছাকাছি নির্জন গ্রামে তাহার মাকে দেখিতে যাওয়ার সময় যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, জয়রামবাটীর পথে যাইতে যাইতে মনে সেইরূপ আনন্দ হয়।

এবারেও বাবা তারকনাথকে দর্শন করিয়া মোটরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্ম-গৌরবে মহিমান্বিত বাঙলার অতি প্রিয় তীর্থ কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পথে অগ্রসর হইলাম, মনে সেইরূপ আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। অবিরাম গতিস্রোতে ব্যাপ্ত কোলাহলমুখর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এই উদার আকাশতলে পরিচ্ছন্ন শ্যামলিমার মধ্যে প্রকৃতির অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া মন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

মনে হইল, এই পথ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে করিতে হাঁটিয়া যাই। এই পথেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার, মাতাঠাকুরানীও কয়েকবার হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। এ পথ এখন অনেক সুগম। নদী ও নালা-গুলির উপর সেতু হইয়াছে, তরণী সাহায্যে গাড়ীসহ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েক স্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বিপৎসঙ্কুল সেতুসমূহ পার হওয়া আবশ্যক হয়, তৎসত্ত্বেও মাকে দেখিতে যাওয়ার আগ্রহে এ সব বাধা-বিপত্তির কথা আর মনে হয় না।

চাঁপাডাঙ্গা, পুরসুরা, হরিণখোলা, শ্যামপুর, আরামবাগ—নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আবার পশ্চাতে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল। দুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বে কয়েকবার যাওয়া পথের দুধারে আবার নূতন করিয়া যেন সব কিছু দেখিতেছি।

এই পথে কোন্‌খানে সেই চটির অর্ধভগ্ন মৃন্ময় গৃহ ছিল?—পিতার সহিত প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে সারদা-দেবী জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কোথায় সেই গৃহ, যেখানে সেই অপরূপ শ্যামবর্ণা তরুণী গভীর রাত্রে মায়ের উত্তপ্ত মাথায় তাঁহার স্নিগ্ধ শীতল হস্ত বুলাইয়া দিয়াছিলেন? পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং পিতার উদ্বেগ নিরসন করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের পথে পুনরায় অগ্রসর হইলেন।

তেলো-ভেলোর মাঠের কোন্ স্থানে মাতাঠাকুরানীর সেই ডাকাতবাবার সহিত দেখা হইয়াছিল, কোন্ কুটিরে সে পত্নীসহ নিজ কন্যার ন্যায় সারদাকে সারারাত্র পাহারা দিয়া জাগিয়াছিল? কোথায় সেই ক্ষেত্র এবং কে সেই ভাগ্যবান্ কৃষক, যাহার ক্ষেত্র হইতে ডাকাতপত্নী মুঠি করিয়া মটরশুঁটি তুলিয়া বিদায়কালে নবলব্ধ কন্যাকে খাইতে দিয়াছিল?

কত পুণ্যবান্ কত ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী এই পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছেন। কত বিপৎসঙ্কুল

ও দুর্গম পথে তাঁহারা কত কষ্টই না করিয়াছেন। মনে মনে তাঁহাদের প্রণাম জানাইলাম।

কামারপুকুর আসিয়া গেল। এক উচ্ছ্বসিত আনন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ ও তাঁহাদের বাড়ীর খড়ের চাল দেখিতে পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, রঘুবীরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য লীলাস্থল দেখিয়া ও প্রণাম জানাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের দেশ জয়রামবাটী যাত্রা করিলাম।

জয়রামবাটী যতই নিকটস্থ হইতেছে, মনের আবেগ ততই যেন বর্ধিত হইতেছে। ইহাই কি মায়ের টান? ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল মনের সত্য অভিব্যক্তি 'বাপের চেয়ে মা দয়াল'। শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত ভক্ত, যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন ও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—তাঁহারা অনেকে বলিয়াছেন যে, মায়ের কাছে একবার আসিলেই হইল; হউক সে পরিচিত অথবা অপরিচিত। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইত। যে ভাবের যে স্তরের লোক হউক, সকলের প্রতি সমভাব, সকলের তৃপ্তির জন্য অকুণ্ঠ মনোযোগ। তাঁহার সেই অতুলনীয় মাতৃভাব, অপরিমেয় স্নেহ, ও সকলকে তাঁহাদের নিজ গর্ভধারিণী মাতা হইতে অধিক অভিভূত করিয়া ফেলিত। বিদায়কালে স্নেহময়ী মায়ের সেই করুণায় ভরা আঁখি যে একবার দেখিয়াছে, শ্রীশ্রীমাকে সে আর ভুলিতে পারে নাই।

এইবার মায়ের গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ধুলিচ্ছন্ন তথাপি পরিচ্ছন্ন মেঠো পথ। প্রায় সমস্ত মাটির ঘর—উপরে খড়ের চাল। প্রায় সমস্ত গৃহেই গোলাভরা ধান। শুনিলাম এবার পর্যাপ্ত ফসল ফলিয়াছে। নদীর অবিরাম জলধারার জন্য এখানকার কৃষিক্ষেত্র স্বভাবতই উর্বর। মায়ের গ্রামের পুরুষ ও নারী কেমন যেন আপনার জন বলিয়া বোধ হয়। তাহারা জানে, যে কেহ এখানে আসে, সেই মায়ের সন্তান। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'আমার দেশের লোকেরা বাপু, বড় ভাল। অন্ধ যুবতীর দিকেও কেউ ফিরে তাকায় না।' মায়ের গ্রামবাসীরা যেন মায়ের অন্ততঃ একটি ভাব লইয়া আছে, সেটি তাহাদের আন্তরিকতা। গ্রামের লোক সাধারণতঃ বড় আপনার হয়। তাহাদের অতিথি-বাৎসল্যের কথাও নূতন নয়। কিন্তু এখানে যেন আন্তরিকতা বড় অন্তরের বলিয়া মনে হয়। এ বস্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু অনুধাবন করিতে আনন্দ হয়। একান্ত আপনার জন হইয়া কাছে বসা, পাখা লইয়া পরিশ্রান্তকে শান্ত করিবার প্রচেষ্টা, রৌদ্রতাপ হইতে আসিবার পর অনতিবিলম্বে জলপান করার জন্য সস্নেহে অনুরোধ করা, সামান্য বিষয় হইলেও আত্মার সংযোগ দৃঢ় করে। এই যে কোনরূপ প্রতিদান বা নিজের কোনরূপ স্বার্থ না রাখিয়া একান্ত আপনার জন হইয়া সব রকমে সুখ ও সুবিধা দেওয়ার প্রয়াস, এই ধারা যেন মায়ের সময় হইতে একরূপে চলিয়া আসিতেছে। মাতৃমন্দিরে সাধুরা অবশ্যই শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাব অনুসরণ করেন, মায়ের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর মনেও এই ভাবধারা প্রবহমান।

প্রথমে সিংহবাহিনী দর্শন করিলাম। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত সাধারণ গৃহ। উপরে টিনের চাল। পূর্বের স্থান হইতে বিগ্রহ কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মায়ের ধাতুনির্মিত কলস-মূর্তি। দুই পার্শ্বে মহামায়া ও চণ্ডী। ঘরের একপার্শ্বে মা-মনসার মূর্তিও আছে। আজ শনিবার, মায়ের বিশেষ পূজা।

কোনরূপ জাঁকজমক-বর্জিত মন্দিরগৃহ; কিন্তু নিকটস্থ অথবা দূরস্থ বহু গ্রামবাসী মা সিংহবাহিনীকে আজও জাগ্রত দেবী বলিয়া পূজা দিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে নূতন কিছু উৎপন্ন হইলে মাকে নিবেদন করিতে বহু দূর হইতে গ্রামবাসীরা এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমাই সিংহবাহিনীকে জাগ্রত দেবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মৃত্তিকা-গৃহ এবং যে গৃহে তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম। দাওয়া ও তৎসংলগ্ন একটি বাঁশের খুঁটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। ছবিতে দেখিয়াছি মা দাওয়ায় ঐ স্থানে বসিয়া আছেন। হাতদুটি ক্রোড়ে নিবদ্ধ, পদদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন; মুখমণ্ডলে স্নেহ, করুণা ও অনির্বচনীয় মৃদু হাস্যের বরাভয়-অভিব্যক্তি। অতিশয় উদ্দীপনা হইল। এই স্থানে মস্তক অবনত করা মাত্র চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। মনে হইল, মা যেন বলিতেছেন, এস বাবা, বস।

এক বৃদ্ধা আমাদের দেখিতেছিলেন। তিনি আসিয়া বসিলেন। তিনি মায়ের পিত্রালয়ের এক আত্মীয়া। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন মায়ের একান্ত সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। একান্ত আপনার জনের ন্যায় তিনি বলিতে লাগিলেন: সে একদিনের কথা আর পাঁচজনের নিকট শুনিয়া শুনিয়া 'শ্রীশ্রীমা কে?' তাহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। মা আমল না দিয়া অন্য কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই, মাকে বলিলাম, যদি না বলেন আপনি সত্য সত্য কে, তবে আমরা অন্নগ্রহণ করিব না। কেহ না খাইলে অথবা কাহাকেও আহার করাইতে না পারিলে মায়ের কষ্ট হইত। মা ছিলেন অন্নপূর্ণা, সকলকে আহার করানোর মধ্যে ছিল তাঁহার সবার চেয়ে বেশী তৃপ্তি। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, এই কথায় মায়ের মুখ যেন চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'তোরা শুনিসনি আমি যখন হলুম, তার আগে আমার মা দেখেছিলেন, এক লাল কাপড়-পরা সুন্দর একটি মেয়ে আমার মায়ের গলা জড়িয়ে বলছে, আমি এলুম। আমার মা বলতেন, সে জগদ্ধাত্রী।'

বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, 'সেই থেকে বাপু আমার বাবা বলায় রোজ একটি ক'রে ফুল সব কাজের আগে তাঁর পায়ে টপ ক'রে ফেলে পালিয়ে যেতুম। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি মা পূজা করতেন। আমার একদিন মনে হ'ল ঠাকুর যদি ভগবান, আমাদের মাও ভগবতী। আমি মায়ের একটি ছবি নিয়ে তাড়াতাড়ি একদিন ঠাকুরের ছবির পাশে জুড়ে দিলুম। পরে অন্য মেয়েরা এই দেখে হাসাহাসি করতে লাগলো। তারা ব'লল, তুই কি বোকা! মা তো ঠাকুরের স্ত্রী, তাঁকে ডান পাশে বসাতে আছে? মা সব দেখে বললেন, ও করেছে। ঠাকুর আমায় 'মা' ব'লে পূজা করেছিলেন। ও আমার ছবি ডান পাশে রেখেছে তো কি হয়েছে?' বৃদ্ধার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি যেন অনুভব করিতে লাগিলেন, মা কাছেই রহিয়াছেন, এবং এইমাত্র যেন তাঁহাকে তিনি ঐ কথা বলিলেন।

আবার মায়ের সম্বন্ধে জানা অজানা কত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন। আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে করিতে মায়ের ঐ সমস্ত জানা কথাগুলি পুনরায় শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের লজ্জাশীলতার কত কথা বলিতে লাগিলেন: গৌরীমা খুব রাশভারী ছিলেন। তিনি জমিদারবাবুকে নিয়ে মায়ের বাড়ী এলেন। জমিদারবাবু মাকে প্রণাম জানালেন। মায়ের তো এক-গলা ঘোমটা। গৌরীমা বললেন, 'আজ তুমি ধন্য হ'লে। তুমি সত্যই ভাগ্যবান্ যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মা তোমার প্রজা। কিছু প্রসাদ পাও।' মা এদিকে গৌরীমাকে ক্রমাগত ইসারা-ইঙ্গিতে থামাতে চাইছেন চাপা গলায়। তিনি বললেন, 'ও গৌরীদাসী এ রাজা যে।' গৌরীমা বললেন, 'ওসব রাজা খাজা বুঝি না, যা সত্যি তাই বললুম।' মা লজ্জায় আরো জড়োসড়ো হ'য়ে বসে রইলেন।

কয়েকবার দেখা জয়রামবাটী আবার নূতন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত গ্রামই শ্রীশ্রীমার পাদস্পর্শে ধন্য। মায়ের বাড়ী, মায়ের মন্দির, মায়ের পুকুর, মায়ের দীঘি, মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিয়া বেড়াইলাম। মাতৃমন্দিরে মায়ের সর্বত্যাগী সন্তানগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, তাঁহার জীবনচরিত্র, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী অসামান্য ও অপূর্ব বোধ হয়। জীবশিক্ষার জন্য আমাদের জগদ্ধাত্রী মা সংসারের যাবতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সংসারী ব্যক্তি বহু সমস্যার মধ্যে থাকিয়াও অপূর্ব আনন্দ ও অনির্বচনীয় সুখে বসবাস করিতে পারে। সে পথ সকলকে ভালবাসা, কোন কিছুতে বিরক্ত না হওয়া। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে এই কথাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা কত অসুবিধার মধ্যে নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকিতেন। নিজ আত্মীয় পরিজনের কত সমস্যা, হাজার হাজার সন্তানের কত অসহনীয় অনুযোগ ও বিরক্তিকর ব্যবহার কোন কিছুই মায়ের চরিত্রের এই অপূর্ব মাধুর্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার সর্বশেষ উপদেশ—'দোষ দেখবে নিজের; জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ।'

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির ও মায়ের বাড়ী হইতে যখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলাম, তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল যদি আরও কিছুক্ষণ থাকিতে পারিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইতে লাগিল, মা সেইরূপ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন এবং বলিতেছেন 'আবার এস'। যাইতে যাইতে এই অনুভূতি বশতঃ ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমাকে ঐরূপ দেখিবার আমার সুকৃতি কোথায়? কিন্তু তবু আর সকলের মতো মনে হয়, শ্রীশ্রীমা যেন সেখানে সেই অপরিসীম স্নেহ, সেই করুণা ও সন্তানের প্রতি একান্ত ভালবাসা লইয়া সর্ব সময় বিরাজমানা। মনে হইল, যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন মায়ের কাছে বার বার আসার আশায় দিন গণিতে থাকিব।

ত্যাগমূর্তি মা

মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

'আরো দাও, আরো দাও, আরো দাও' বলি
নিত্য কাঁদে যে ধরণী,
তাহারি কোলেতে জন্ম নিলে তুমি
কিছু না চাহিলে জুড়ি পাণি।
মাথা করি নীচু তোমার যা ছিল কিছু
ক'রে গেলে দান।
ক্ষণেকের তরে নাহি মনে পড়ে
ঐশ্বর্যের মান।
তোমার তৃষ্ণার কূলে, এ সংসার হয়ে গেল মিছে,
শুধু তার লাগি প্রতীক্ষা-আসন, হৃদয়ে যতনে পাতা আছে,
তারি সৃষ্ট এ ধরণী তারি সৃষ্ট মানব-হৃদয়
সে-হৃদয় প্রেমের আধার।
যাহার করিয়া সেবা প্রেম প্রীতি হয় লাভ
আকাঙ্ক্ষা করেছ তুমি সেই অধরার।
ত্যাগের তটিনী-কূলে ক্ষণতরে কভু ভুলে
পড়েনিকো মনে
বসুধার শত সুখ, শুধু তার দাহ-দুখ
পড়েছে নয়নে।
ধরারে অনিত্য জানি তার যত সুখের সম্ভার
অক্লেশে করিয়া বিসর্জন,
যে জন সবার ঊর্ধ্বে যে জন প্রেমের মূর্তি
তাঁহারেই করেছ বরণ।
ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই, ছোট বড় সমান সবাই;
সবারে ডেকেছ অনুরাগে,
মাতৃমন্ত্র জপি চুপে তুমিই জননী-রূপে
সর্বদা রয়েছ পুরোভাগে॥

---

* নারায়ণগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মহিলা-সভায় পঠিত।

আমি

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ

এই জগতে 'আমি ও আমার'—এই বোধই যত অনর্থের মূল কারণ। যতদিন 'আমি' আছে, ততদিন দুঃখ অশান্তির অন্ত নেই। 'আমি' কে? কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী গুণী কত ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একে চেনা-জানা বড় কঠিন ব্যাপার। 'আমি'কে জানাই সাধনার প্রধান কথা—'আত্মানং বিদ্ধি' নিজেকে জানো। কিন্তু সহজে কি একে চেনা যায়? জানার আর শেষ হয় না, কবি তাই বলেছেন: 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'

আবার জেনেও শেষ করা যায় না, কারণ কে এর ইতি করবে? শেষ যে নেই—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: দুটি 'আমি' আছে—একটি 'কাঁচা আমি', আর একটি 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি'কে সরিয়ে 'পাকা আমি'কে জানতে হবে। তারপর সেই 'পাকা আমি'কেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু মজা এমনি যে 'কাঁচা আমি' আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ দুর্গ রচনা ক'রে বসে থাকে যে, সহজে তাকে পরাস্ত করা যায় না। কখনো মনে হয়—শত্রু বুঝি পালিয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, কোন্ সময় সুযোগ বুঝে আবার এসে বেশ কায়েমী হয়েই বসে আছে। কেবলই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমি'-শত্রুকে জব্দ করার উপায় বলেছেন, 'থাক শালা, দাস আমি হয়ে।' এই 'দাস আমি' আর নিজেকে জাহির করতে চায় না। সে তখন বলে: 'তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি।' এখানে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। যা কিছু ঘটছে, সবই শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সম্পাদিত হচ্ছে। ভক্ত তখন বলেন:

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তাঁর ইচ্ছায় অসাধ্য সাধনও সম্ভব। মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। সবই আশ্চর্য! 'পাকা আমি' যখন আত্মস্বরূপে মিলিত হয়, তখন সবই হয়ে পড়ে রহস্যময়। কে এই রহস্যভেদ করবে?

ভক্ত বলেন, রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন কি? যাঁর ইচ্ছায় ত্রিভুবন পরিচালিত হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন যখন মানুষের একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, তখন সেই ইচ্ছা-স্রোতেই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সহজ পথ। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হ'তে পারলে জীবনে কোন লোকসানই আসবে না। সকল কলঙ্কও তখন অলঙ্কার হয়ে উঠবে।

যে 'আমি'কে নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার, তার কোন ক্ষমতাই নেই। 'পাকা আমি'র সন্ধান পেলে, যা সত্য সনাতন শাশ্বত ধ্রুব, তারই সঙ্গে আমরা যুক্ত হ'তে পারি। অনন্ত শক্তির সঙ্গে তখন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির মিলন ঘটে। আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার মধ্যে তখন ঐশী শক্তি বিরাজিত। মন বিশুদ্ধ, নির্মল হ'লে তবে সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের আবির্ভাব ঘটলে মানুষের অনায়ত্ত, অসাধ্য কিছুই থাকে না।

এই অবস্থায় জীব ক্ষুদ্র নয়, শিবত্বলাভ ক'রে সে অমৃতের অধিকারী হয়। যে 'আমি' জীবনের চরম দুঃখের কারণ হয়, সেই 'আমি'রই রূপান্তর ঘটলে ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[প্রথম বারের বিবরণ)]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য পাদস্পর্শে যে সকল স্থান ধন্য হয়েছে, সিঁথি তাদের অন্যতম। সিঁথি কলকাতার তিনি মাইল উত্তরে, পাইকপাড়ার নিকট। এই পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের অতি মনোরম উদ্যানবাটী ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ (বুড়ো গোপাল), ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র পাল (কবিরাজ) প্রভৃতিও এই পল্লীতে বাস করতেন। এঁদের কল্যাণে সিঁথি পল্লী বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত পদরেণু লাভে ধন্য হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, 'লীলা-প্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার কয়েকটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়।

ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যানবাটীতে বৎসরে দুইবার—একবার শরৎকালে ও একবার বসন্ত-কালে—ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হ'ত। ঐ উপলক্ষে তিনি তথায় বিশেষ সমারোহে মহোৎসব করতেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রাহ্মভক্তগণকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরা তাঁদের সমাজের উৎসব-অধিবেশনাদিতে তাঁকে অত্যন্ত ভক্তিভরে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনিও ঐ সকল উপলক্ষে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম আহ্লাদিত হতেন।

বেণীপালের উদ্যানবাটীটি অতি নিভৃত এবং ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। সেখানে একটি সুন্দর উপাসনাগৃহও ছিল। গৃহটি অতিশয় জীর্ণদীর্ণ অবস্থায় এখনও বর্তমান, অবলুপ্তির করালগ্রাসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। যা হোক, পাল মহাশয় উৎসবাদি উপলক্ষে অতীব ভক্তিসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ ক'রে তথায় আনয়ন করতেন। 'কথামৃতে' তথাকার ঐরূপ মাত্র তিনটি উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য লীলা-বিবরণী প্রকাশিত দেখা যায়। আমরা এখন প্রথম বিবরণীটি সংক্ষেপে অনুধ্যান ক'রব। এই প্রসঙ্গটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'বেণী পাল ভাগ্যবান্ জনগণে খ্যাত নাম
পল্লীগ্রাম সিঁতিতে বসতি।
সুন্দর আবাস-গৃহ ব্রাহ্মদল-ভুক্ত তেঁহ
প্রভুপদে বড়ই পিরীতি॥
বর্ষে বর্ষে দুইবার ব্রাহ্মোৎসব ঘরে তাঁর
বহু ভক্ত করে নিমন্ত্রণ।
আজি উৎসবের দিনে সমাগত বহু জনে
পরিপূর্ণ উদ্যান-ভবন॥'—(পুঁথি)

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ শনিবার। বেণী পালের উদ্যানবাটীতে আজ ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক মহোৎসব। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। ভক্ত-সমাগমে উদ্যান-বাটী পরিপূর্ণ। মহোৎসবের আনন্দে চারিদিক মুখরিত।

শ্রীম-লিখিত বর্ণনা: শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানের

লতা-গুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে। 'আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে।'

অপরাহ্ন প্রায় তিন চারিটা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হ'তে শুভাগমন করলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে ও পরম ভক্তিভরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ঘোড়াগাড়ি হ'তে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বহু ভক্ত তাঁকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করলেন। মহাপুরুষের দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব, তাঁর কথামৃত শ্রবণের জন্য প্রত্যেকেই উৎকর্ণ।

'শকট হইতে নামি দেখা দিলা গুণমণি
বিশ্বস্বামী প্রভু গুণধাম।
নয়ন-আনন্দকর কি মূরতি মনোহর
হেরিলে হরয়ে মন-প্রাণ ॥'—(পুঁথি)

ফুল ও ফলের গাছে ঢাকা রাঙা পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণসহ ধীরে ধীরে প্রার্থনা-গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সমাজ-গৃহের দালানে তাঁর জন্য বিশেষ আসন পাতা হয়েছে। তথায় উপনীত হয়ে তিনি সহাস্যবদনে ঐ আসন অলঙ্কৃত করলেন।

সকলেই নির্ণিমেষ নয়নে সদানন্দময় মহাপুরুষকে দর্শন করছেন। অদ্ভুত প্রিয়দর্শন প্রেমঘন মূর্তি। পুনঃ পুনঃ ঐ শ্রীমূর্তি দর্শন করেও তাঁদের নয়নের তৃষ্ণা যেন মিটছে না। সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। তিনিও সুমধুর হাস্যমুখে চারিদিকে ভক্তগণের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

'প্রভুর মহিমাভরে আনন্দে উথলি পড়ে
আনন্দ-আধার তনুখানি।
মৃদুহাস্য-সহকারে আসন গ্রহণ পরে
করিলেন অখিলের স্বামী ॥
রূপের ঠাকুরে দেখি যেখানে যতেক আঁখি
একবারে হয় বিমোহন।
নিরখে শ্রীপ্রভুরায় বিভোর চকোর-ন্যায়
নিশিনাথে করি দরশন ॥'—(পুঁথি)

শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত; তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 'দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব—আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারি খুশী হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।'

তাঁর সরস উপমা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই মৃদু হাস্য করছেন। তিনি ভক্তগণকে লক্ষ্য ক'রে প্রসঙ্গতঃ কত তত্ত্বকথাই না বলছেন। ভক্তির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের অবস্থা তিনি চমৎকার উপমাসহায়ে বিশ্লেষণ করছেন। ভক্তির তমঃ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সে-রূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো'—এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।"

তিনি এ-প্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট হয়ে সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন—

'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥'

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গাইছেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী ॥'

প্রসঙ্গতঃ তিনি বলছেন, 'তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক।'

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বর নিরাকার না সাকার?'

তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তদের জন্য সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।'

এ-প্রসঙ্গে তিনি অতি সহজ-সরল অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন: ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়! তা তোমরা বুঝবে কেমন ক'রে?'

'কি উপায়ে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হ'তে পারে?' —এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে?'

আবার প্রশ্ন—'ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা মত কেন?' —এর উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন-রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন ক'রে?'

এ-প্রসঙ্গে তিনি 'বহুরূপী'র গল্পটি অবতারণা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ।'

ভক্তদের উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, 'ভক্তি-পথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ-জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।'

শিবনাথ প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি বললেন, 'তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন?...ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি!'

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গান ধরলেন:

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥"

গান-শেষে উপমাসহ আবার কত প্রসঙ্গ করলেন। তারপর শিবনাথকে বললেন, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।'

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'আপনি জন্মান্তর মানেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।'

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'ল। আজ আশ্বিনের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। তাই সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ড পরেই রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হ'ল। শরতের চন্দ্রের অমল ধবল কিরণমালায় চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্যানের সরোবর, বৃক্ষ-গুল্ম, লতা-পুষ্প প্রভৃতি প্রতিভাসিত হ'ল।

'ঊর্ধ্বগতি দেখি রাতি প্রহরেক প্রায়।
আজিকার কথা সাঙ্গ কৈলা প্রভুরায়॥
সমাজভবনে হৈল ভজনার কাল।
বাজিয়া উঠিল বাদ্য খোল-করতাল॥'(পুঁথি)

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। ব্রাহ্মভক্তগণ যথারীতি সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করলেন।

সমাজগৃহে মধুর সংকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরপ্রেমে সদাই মাতোয়ারা। তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য করছেন। ব্রাহ্মভক্তগণ খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যসহ তাঁকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। ভাবে সবাই বিভোর। হরি-সংকীর্তনের রোল ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারিদিক হরিনামে মুখরিত। মধুর হরিনাম শ্রবণে সন্নিকটস্থ অধিবাসীরাও মহানন্দে ছুটে এলেন, তাঁরাও অদ্ভুত প্রেমময় মহাপুরুষকে দর্শন ক'রে ধন্য হলেন।

'লইয়া শ্রীপ্রভুদেবে বেড়িয়া আদরে।
আনন্দে হইয়া মত্ত সংকীর্তন করে॥
হরিবোল উঠে রোল ভেদিয়া ভবন।
বড় খুশী প্রতিবাসী গ্রামবাসী জন॥' (পুঁথি)

সংকীর্তন শেষ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম!'

ভক্ত বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন করেছেন। তিনি পরিতোষসহকারে সমাগত সকলকে ভোজন করালেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তগণসহ মহানন্দে প্রসাদ ধারণের পর ঘোড়াগাড়ি ক'রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাত্রা করলেন।

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়*

১৯০৯-১০ খৃঃ কথা। উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ তখন প্রায়ই সন্ধ্যারতির পর তানপুরা লইয়া ভজন গান করিতেন। আমিও তানপুরা লইয়া দু-একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতাম। একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইলেন, "বলো, উহার গান আমার ভাল লাগিতেছে, আরও কয়েকখানি গাহিয়া শুনাক।" যে কয়দিন শ্রীশ্রীমা ওখানে থাকিতেন, বাটীটি এক অপূর্ব এবং দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। সে বিমল আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল বৃদ্ধ-বনিতা মেয়ে-পুরুষ নিত্য আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া যাইত, সে এক অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি, যাহা বর্ণনাতীত।

মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইবার পর তিনমাসকাল কলেজের ছুটি থাকিত, সেই সময়ে আমি নিজ বাটীতে দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন মায়ের বাটীতেই থাকিতাম। জনৈক সাধু এবং আমি এক বয়সের ছিলাম, তিনিও পূর্বাশ্রমে শান্তিপুর-নিবাসী ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'উদ্বোধনে'র অনেক কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। সন্ধ্যার সময় দু-জনে গঙ্গার ধারে যাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নানা ধর্মপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কাম-ক্রোধ যদি বা যায় শেষ পর্যন্ত, 'আমি সাধু' এই অভিমানটা মন থেকে যেতে চায় না।" এত সহজভাবে এ

* পরলোকগত ভক্ত

কথাটি বলিয়াছিলেন যে, এখনও সে কথাগুলি আমার মনে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের চরণাশ্রিত সাধুরা গৃহী অপেক্ষা যে কত বড়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সেই সময়ে শ্রীযুত কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) একদিন আমায় বলিলেন, "শ্যামাপদ, আগামী কাল অক্ষয়তৃতীয়া, খিদিরপুর থেকে একটি ছেলে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিতে আসবে, তুমিও অতি অবশ্য দীক্ষাটি নিয়ে নাও, আমি সকল কথা শ্রীশ্রীমাকে জানিয়ে রাখব। এখানকার দীক্ষায় কোন হাঙ্গামা নেই। গঙ্গাস্নান ক'রে চলে এস।"

তদনুযায়ী আমি পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাটীতে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা সারিয়া, সেই ছেলেটিকে দীক্ষা দিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসনের সম্মুখে শ্রীশ্রীমা বসিয়াছিলেন এবং আসনের কাছেই একখানি আসনে আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা শাক্ত, না বৈষ্ণব?" জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিলেন। তখন আমি যেন নিজের সম্বিত হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী' হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম অভিমুখে সরু গলিটি ধরিয়া রেলের লাইনগুলি পার হইয়া ঠিক সম্মুখেই গঙ্গার পূর্ব পাড়ে একটি জলনিকাশের পাইপের উপর সিমেণ্টে বাঁধানো চতুষ্কোণ একটি চাতালের উপরে গিয়া বসিলাম। একটি বকুল গাছ সেই চাতালটিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, তাই ঐ জায়গাটিতে মোটে রৌদ্র আসিতেছিল না। সেইখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটি উচ্চারণ করিবামাত্র অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন আনন্দে ও প্রীতিতে এতটা ভরপুর হইয়াছিলাম যে, আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাটী হইতে কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, এ কথা মোটেই স্মরণ হইতেছিল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকিবার পর আমার সম্বিত ফিরিয়া আসিল, এবং আমাকে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে সকলে খুঁজিতেছেন—এরূপ মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র শ্রীযুত শরৎ মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' শ্রীশ্রীমা আমায় প্রসাদ দিবেন বলিয়া আমার খোঁজ লইতেছেন। আমি শরৎ মহারাজকে সকল কথা জানাইলাম এবং তিনি তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

একবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসবে মঠে যাইয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, এবং গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুত শরৎ মহারাজকে আমার ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুত মহারাজ বলিলেন, "শ্যামাপদ, তোমার যে ভাব, তাহাতে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ গা ঢালিয়া দিয়া থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলিতেন, ঝড়ের আগে উচ্ছিষ্ট পাতার মতো সংসারে থাকিবে, ঝড় যেদিকে লইয়া যায় সেইদিকে পাতা উড়িয়া যায়।" তাঁহার ঐ কথাগুলি শুনিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম এবং সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া গেল।

১৯১০ হইতে ১৯১১ খৃঃ মধ্যে শ্রীযুত শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মাদ্রাজ

হইতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে দ্বিতলে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডানদিকের ঘরটিতে তাঁহাকে রাখা হইল। বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। Anatomy-র dissection প্রথম বৎসর আমার তখন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য পিঠের উপরকার মাংসপেশীগুলির কথা আমার জানা ছিল। সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশীগুলির উপরে vibratory massage করিয়া (টিপিয়া) দিতাম। উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন, এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, শ্যামাপদ ডিসেক্‌শন করেছে, সেইজন্য ও মাংসপেশীগুলি টিপে দিলে বড় আরাম পাই। অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এই মহাপুরুষের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ও সেবার সুখ্যাতি শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম।

তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু যখন হাসিতেন তখন মনে হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপা ব্যতীত ঐ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত না। বাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তাঁহার জন্য একটি পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়া লম্বালম্বি চারভাগের একভাগ আমাকে খাইতে দিয়াছিলেন। আমি উহার পূর্বে ও-রকম সুস্বাদু পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন

শ্রীশ্রীমায়ের বাটির বৈঠকখানাতে একদিন দেখি, শ্রীযুত বড় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বসিয়া আছেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতা—ঠাকুরের অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গেরা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন; শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), শরৎ মহারাজ, এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী শিবানন্দ) ঐরূপভাবে প্রণাম করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা ভক্তির আতিশয্য। তখনকার দিনে ঐরূপ অনেক ভুল ধারণা আমার মনে ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত শরৎ মহারাজের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, শ্রীযুত গিরীশবাবু শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে প্রবেশ-দ্বারের ডাহিনে অর্থাৎ বৈঠকখানা-ঘরের সংশ্লিষ্ট রোয়াকটির উপর উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এবং তাঁহার মন যেন অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজন; কায়স্থ সন্তান এবং গৃহী গিরীশবাবুকে তিনি ঐরূপভাবে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও যে ভক্তির আতিশয্য ছাড়া আর কিছু, তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

সপ্তসতী : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ ; পৃষ্ঠা ১৮৪ (ডিমাই) ; মূল্য চার টাকা।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে ক্রমেই আমাদের দৃষ্টি ফিরিতেছে। আমরা আমাদের দেশকে চিনিতে তথা আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছি—ইহা সত্যই সুলক্ষণ। ভারতের প্রাচীন কথা ও গাথার মধ্যে বহু রত্ন আজও সঞ্চিত রহিয়াছে—যাহাদের প্রকাশ ও ব্যবহার আমাদের দেশকে সত্যসত্যই উন্নতি ও শান্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। আলোচ্য পুস্তকটি এই আদর্শের পতাকাবাহী।

পুস্তকটিতে সতী (পার্বতী), সাবিত্রী, অরুন্ধতী, অনসূয়া, সীতা, দময়ন্তী ও বেহুলা—এই সাতজন বহুজন-স্বীকৃত সতীর জীবনী-সংগ্রহ। লেখক সকল চরিতকথাগুলি একই রচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয়টি পদ্যে, চতুর্থটি নাটিকারূপে এবং অবশিষ্টগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গাথাগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কোন কোন স্থানে উপমার ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ আমাদের ভাল লাগিয়াছে যেমন :

যেন নব সূর্যমুখী
বনের গহন কোণে থাকি
আভাসে পেয়েছে রবিকরের সন্ধান। (পৃঃ ৬)
প্রাণের বিনাশ নাই, আছে শুধু উদয়াস্ত তার।
স্রষ্টার লীলার তরে কালবক্ষে বহে অহরহ
অনন্ত মৃত্যুর কোলে অনন্ত জীবন। (পৃঃ ১৭)
ধীরে ধীরে মূলাধার হ'তে কুণ্ডলিনী
ষট্চক্র ভেদ করি উঠি সহস্রারে
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সনে
চিরতরে হইল বিলীন ;
বিন্দু গেল সিন্ধুতে মিশিয়া, (পৃঃ ৩৬)

গভীর চিন্তায় যেন শীর্ণ বর্তমান
হারায়ে গিয়াছে ভবিষ্যতে। (পৃঃ ৩৮)

পার্বতী বুঝিলেন যে শুধু রূপে ও পরিচর্যায় দয়িতের প্রেম আকর্ষণ করা যায় না। সংযম চাই, ধ্যান চাই, আত্মত্যাগ চাই,—অর্থাৎ আপনাকে ভুলে গিয়ে পতির সঙ্গে এক সুরে একাত্মজ্ঞানে মিশে যাওয়া চাই। (পৃঃ ৪৫)

কমল জানে কেবল রবিকর। (৫৯)
শব্দহারা আসল ভালবাসা,
ভাল কভু বাসে নাই সে
যে দেয় তারে ভাষা। (পৃঃ ৬৪)

পুস্তকটির কোন কোন স্থানে পদ্যাংশ অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যেমন দক্ষের মস্তক ঘুরে যেত। (পৃঃ ১)

ইহা ব্যতীত কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও চোখে পড়িল। যাহা হউক সব মিলাইয়া পুস্তকটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আশা করি বাংলার মায়েরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া গৃহে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন এবং নিজ নিজ কন্যাদিগকেও পাশ্চাত্য আদর্শের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া ভারতের পবিত্র প্রেমের নিরিখ দেখাইতে পারিবেন। এই প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—মহানন্দ

শুকদেবী : ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, প্রকাশক : শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী, ৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। পৃঃ ৩৬; দাম—৩৭ নঃ পঃ।

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সাধিকা শুকদেবীর পুণ্যজীবনচিত্রটি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত ক'রে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় আছে, গভীর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি তার সন্ধান পায়। শুকদেবীর জীবনকাহিনী লোক-লোচনের অন্তরালে ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব-সাধনার নীরব রূপায়ণ।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহের বালবিধবা সহজাত অধ্যাত্মসংস্কারের বশে কেমন ক'রে অন্তরে-বাহিরে ভগবৎপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই পরমা শান্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে সংসারের সকল কর্ম ও সম্বন্ধকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন—তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ছোট্ট বইটি পড়ে তৃপ্তি হয় না—এই সাধিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্য পাঠকচিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে।

সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে শুকদেবীর অন্তরানুভব : "এখন আর আমার কোন শোক নাই, অনুতাপ নাই, জীবন সার্থক বলিয়া মনে হয়। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। সকলের হৃদয়ে সেই এক অন্তর্যামী ঈশ্বর দ্রষ্টৃরূপে, পরিচালকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।"

কলরবমুখর বর্তমান শতাব্দীর নেপথ্যে ভারতবর্ষের অন্তর-তপোবনে এমন কত ভাবকুসুম নিঃশব্দে পরম সত্যের উদ্দেশে জীবনাঞ্জলি দিয়ে চলেছে। 'শুকদেবী'র জীবনকাহিনী সেই কথাই আর একবার মনে করিয়ে দিল। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : রায়চৌধুরী এণ্ড কোং. ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১১২; মূল্য দেড় টাকা।

গীতা শাস্ত্র—কি ত্যাগী, কি গৃহী সকলেরই পথপ্রদর্শক। গীতার মূল কথা ত্যাগ, সংসারে যাহারা অসহায় এবং অশেষ কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত, তাহাদেরও জীবনে কিরূপে এই ত্যাগের ভাব আসিতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। সংসারের রূপ, কর্মযোগ ও চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান বড় না কর্ম বড়, বিহিত কর্ম, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ, বিশ্বরূপ, শ্রীভগবানের সর্বময় ভাব, উপনিষদের লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

গীতা-মূর্তি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই ভাবটি পরিস্ফুট থাকিলে পুস্তকের নামকরণ সার্থক হইত। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে এবং একটি সূচীপত্রের অভাবও রহিয়াছে।

ভারতী (১৯৬০-৬১) ১ম সংখ্যা—রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থানে পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারা বছরের লেখাগুলি হইতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্প নির্বাচন করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের লেখা, অন্যান্য শ্রেণীর রচনাও স্থান পাইলে ভাল হইত। প্রথম পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটি ছাত্রদিগের আনন্দ বর্ধন করিবে সন্দেহ নাই, আগামী বৎসর যাহাতে 'ভারতী' সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগকে অবহিত থাকিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী আগমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪-১০ মিঃ স্বামী আগমানন্দ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কালাডি হইতে তিন মাইল দূরে রায়নপুরম্‌ নার্সিং-হোমে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ ত্রিবান্দ্রম বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয়। দুই সহস্র লোকের একটি শোভাযাত্রা শবানুগমন করে।

স্বামী আগমানন্দ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খৃঃ তিনি তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা গত ৪০ বৎসরে কেরালায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৩ খৃঃ আচার্য শঙ্করের জন্মস্থান পুণ্যভূমি কালাডিতে তিনি শ্রীশঙ্কর মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আশ্রম কর্তৃক ব্রহ্মানন্দোদয় উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস সহ অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। সুবক্তা স্বামী আগমানন্দ সংস্কৃত ভাষাতেও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনি 'প্রবুদ্ধ কেরলম্‌' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং মালয়ালম্‌ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক অনুবাদ করেন।

এই বহু গুণালঙ্কৃত সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

জলপাইগুড়িঃ গত ১৫ই বৈশাখ প্রভাতে জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ।

এতদুপলক্ষে পূর্বদিন প্রত্যুষে আধমাইল ব্যাপী একটি শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বৃহৎ প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রমা করে; সন্ধ্যায় মন্দিরে মূর্তির শুভ অধিবাস সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠা-দিবসের প্রভাতে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ বহু সাধু ও ভক্তের শোভাযাত্রা নবনির্মিত মন্দির প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ সহ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ঐ প্রতিকৃতিগুলি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর শুরু হয় মন্দিরে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং যজ্ঞমণ্ডপে বাস্তুযাগ।

সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভায় স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ দেখিয়া, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন —শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল তাঁহার দক্ষিণ ভারতে কাটিয়াছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ঠাকুরের মহিমা দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেন: ধর্ম অনুভূতির বিষয়; দুধ কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে।···সাধারণ মানুষ দেহাভিমানী, কিন্তু আত্মাই যে দেহ ধারণ করেছে, এইটি বুঝতে হবে। বিভিন্ন যোগ তার উপায়; মত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামীজী প্রচার করেন, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় মন্দির-নির্মাণে সকলের সহযোগিতার কথা বলিয়া প্রার্থনা করেন : এই মন্দির আমাদের দ্বেষ, দ্বন্দ্ব দূরীভূত করিয়া সেবায় ও প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক।

অতঃপর স্বামী নিরাময়ানন্দ ও অপূর্বানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের 'ষোড়শী পূজা' সম্বন্ধে কথকতা করেন। রাত্রে মন্দিরে ৺কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন (১৬ই) মঙ্গলারতি ও বিশেষ পূজার পর সপ্তশতীহোম বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বৈকালে কথকতার পর সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় আলোচনা করেন স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও অপূর্বানন্দ। সভান্তে রামায়ণ কীর্তন ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব। এই দিন যজ্ঞমণ্ডপে রুদ্রযাগের পর মধ্যাহ্ন হইতে প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। আশ্রম-সংলগ্ন মাঠে একটি মেলা বসে। 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। সান্ধ্যসভায় আশ্রম-সম্পাদক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পাঠ করেন। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামীজী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে সকলকে আহ্বান জানান।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহর এক নূতন ভাবের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। কয়দিনে আশ্রমে প্রায় দেড় লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

আসানসোল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের সূচনা হইলে উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীহরলাল মাহতো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে ভাষণ দেন।

পরদিন অপরাহ্ণে জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং ভাষণ দেন স্বামী গম্ভীরানন্দ ও নিরাময়ানন্দ।

শেষ দিবস প্রাতে লীলাকীর্তন গীত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে স্বামী গম্ভীরানন্দের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে এবং অধ্যাপক হরলাল মাহতো স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ)ঃ গত ২৪শে মার্চ অন্নপূর্ণা-পূজা-দিবসে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দুর্ভিক্ষে সেবাব্রত আরম্ভের স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষপূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি সহ সারাদিন আনন্দোৎসব হইয়াছিল। পূর্বাহ্ণে কথামৃত পাঠ করেন অধ্যাপক

শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং পূজনীয় অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবনী পাঠ করেন স্বামী জীবানন্দ। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানন্দ পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের সেবাধর্ম বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। প্রায় ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহরমপুর ঃ গত ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৫শে মার্চ অধ্যাপক রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে যুগোপযোগী আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানন্দ। ২৬শে মার্চ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদিতে সারাদিন উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল। পূর্বাহ্নে স্বামী জীবানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামীজী-সম্বন্ধে এবং শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ স্বামীজী-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া জনসাধারণের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করেন। প্রায় ২,০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উভয় দিনই ধর্মাসভার পরে কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল।

বাগের হাট ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হইয়াছিল। ৪,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীভুবনমোহন দেব (সভাপতি), শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা ও শ্রীবিনোদবিহারী সেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও উপদেশ আলোচনা করেন।

রাত্রে বহুলোকের সমাবেশে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হয়।

কাঁথি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ, হরিসমাজ দল কর্তৃক হরিনাম-সংকীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীসুবোধরঞ্জন ভৌমিক, শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, হুগলি মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা করেন। তিন দিনে প্রায় সাত হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্মসভায় ও কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গীতের আসরে বহুজনসমাগম হইয়াছিল।

তমলুক ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই হইতে ১৯শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে মহকুমা-শাসক শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী জীবানন্দ। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। উৎসবের দুই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীত-

শিল্পিগণের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং তিন দিন শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের কথকতা শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

কার্যবিবরণী

টাকী: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অনগ্রসর অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ১৯৩৮ খৃঃ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার্থী-সংখ্যা: (১) উচ্চ বিদ্যালয়—৩১৩, (২) বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়—১৬৬, (৩) বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়—৫০। ছাত্রাবাসে ৪৫ জন ছাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে ১০ জন বিনাব্যয়ে থাকিয়া বিদ্যার্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাবিধানে উদ্‌যাপিত হয়।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট ১১,২১৮ রোগীকে চিকিৎসা করা হয়।

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেন্দ্র: (১৭, নন্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯।১, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬) স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থী দ্বারা রামবাগান বস্তিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খৃঃ। বর্তমানে ইহা নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-রূপে পরিচালিত হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা:

(১) বিবেকানন্দ নার্সারি স্কুল (৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদিগের জন্য): ছাত্রসংখ্যা ৪২।

(২) বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল: ছাত্রসংখ্যা ১৫০।

(৩) ছাত্রাবাস: ১৫ জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র এখানে সম্পূর্ণ বিনা খরচায় থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে।

(৪) বয়স্কদের জন্য দুইটি নৈশ বিদ্যালয়।

(৫) সমাজশিক্ষার ক্লাস: চলচ্চিত্র, কথকতা, বক্তৃতা, থিয়েটার, প্রদর্শনী ও দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করা হয়।

(৬) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: গ্রন্থাগারে ১,০০০ বই আছে। পাঠাগারের দৈনিক পাঠকসংখ্যা ১৫।

(৭) দাতব্য চিকিৎসালয়: ১২,৭০১ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, প্রতিদিন ২২৫ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়:

ডিসেম্বর '৬০: প্রথমে প্রত্যক্ষ দেবতার উপাসনা কর; অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অজ্ঞাত ধাপসমূহ; আধ্যাত্মিক অনুভূতি-বিজ্ঞান; স্বামী শিবানন্দকে যেরূপ জানিয়াছি; ঈশ্বর কখন মানুষ হন এবং মানুষ কখন ঈশ্বর হয়? আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান, যীশুখৃষ্টের প্রধান উপদেশাবলী।

জানুআরি '৬১: মৃত্যুরহস্য ও জন্মান্তর; শান্তি, না যুদ্ধের আস্ফালন? আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবালুতা; স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই জগতের একমাত্র আশা-ভরসা; বর্তমান

ভারতের মহান্ সন্ন্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ; আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, মরিবও না ; ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ ; অনাসক্তি কিরূপে অভ্যাস করিতে হয়।

ফেব্রুআরি : ইহা কি প্রমাণ করা যায় যে, মানুষের আত্মা আছে? আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি? আধ্যাত্মিকতায় ভাবালুতার স্থান ; যে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সর্বদর্শন অন্তর্ভুক্ত, যে ধর্মের মধ্যে সমস্ত ধর্ম নিহিত ; কিরূপে ভয় জয় করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাঁহার শিষ্যদের দিয়াছিলেন ; দৈনন্দিন জীবনে অতীন্দ্রিয়তা ; 'আমাকে অনুসরণ কর, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক'।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

স্বামী মাধবানন্দ

হিতৈষী বন্ধুগণের পরামর্শে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানকার চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কে একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। গত ২৬শে এপ্রিল 'নিউ ইয়র্ক হস্পিটালে' সেই অস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী মাধবানন্দ ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬২ ; মূল্য এক টাকা।

অনেকেই বিধিমত শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিতে চান, কিন্তু সাধারণতঃ উপযুক্ত পূজাপদ্ধতির অভাব থাকায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সাধারণ পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা-পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হোমপ্রণালী, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচার দানমন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি স্তোত্র এবং শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে শিবরাত্রি ও মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে, সেজন্য সংক্ষেপে মহাবীরের পূজা ও শিবরাত্রিতে শিবপূজাবিধিও ইহাতে সংযোজিত। পরিশিষ্টে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের অনুষ্ঠিত পূজাপ্রণালী এবং 'ভাবের পূজা'র কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর): গত ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এবং স্বামী পরশিবানন্দ বক্তৃতা দেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় দিন স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইহার পূর্বে ১৭ই ফেব্রুআরি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ও হোম হয়।

পূর্ণিয়া: রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি বহুলোকের সমাবেশে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার-উপদেশ' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

২২শে হইতে ২৫শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গে বাসন্তী দুর্গাপূজা এবং রামনবমীর দিন নর-নারায়ণ-সেবা হইয়াছিল। ২৩শে মার্চ প্রবীণ উকিল শ্রীহরলাল মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়।

অশোকনগর (২৪ পরগনা): শ্রীসারদা সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৯শে মার্চ অপরাহ্নে স্বামী ঈশানানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন: গত ৩১ মার্চ, ১লা ও ২রা এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী, গীতা ও 'কথামৃত' পাঠ হয়। তিন দিনই অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং সভান্তে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন।

রাঁচি: শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষে গত ১২ই মার্চ হইতে ৫ দিন রাঁচি শহরের দুর্গাবাড়ীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে, হীনু ক্লাবে, মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ও আনন্দময়ী আশ্রমে কলিকাতার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সঙ্গীত-সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কথকতা করিয়াছেন।

নাটশাল (মেদিনীপুর): গত ২৩শে এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বৈকাল স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ এক ধর্ম-সভায় ভাষণ দেন। পরে ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন দেখানো হয়। সর্বশেষে নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথকতা করেন।

নূতন পুকুর (২৪ পরগনা) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজন দ্বারা উৎসব আরম্ভ হইলে একে একে বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম, ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রসাদ-গ্রহণ ও কালী-কীর্তনাদিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। বৈকালে চারিগ্রাম আশ্রম-পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসবে দেড় হাজার গ্রাম্য নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী জীবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশামৃত সহজ গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন। সভান্তে স্থানীয় কীর্তন-সম্প্রদায় কর্তৃক লীলাকীর্তন গীত হয়।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি) : গত ২৬শে মার্চ স্থানীয় সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী অজ্জানন্দ 'সেবাধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারতির পর হরিনাম-সংকীর্তন হয়।

মাকুম জংশন (আপার আসাম) : স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবা-সংঘের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল বিকালে মাকুম রেলওয়ে স্কুল-হলে এক জনসভায় স্বামী শিবরামানন্দ এবং পুরুষোত্তমানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে স্বরচিত এক ভাবগর্ভ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়। পরে কলিকাতা হইতে আগত বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'সারদা-রামকৃষ্ণ-মিলন' বিষয়ে কথকতা করেন। সভান্তে প্রসাদ বিতরিত হয়। প্রায় পাঁচশত নরনারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৮ই এপ্রিল বিশেষ পূজা ও নাম-সংকীর্তন হয়।

সিঁথি (কলিকাতা) : রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ২৯শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ছয়-দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব ডি. গুপ্ত লেনে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী মহানন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা, রামায়ণ-গান, কীর্তন-ভজন, 'শ্রীশ্রীমা'-লীলাভিনয়, দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সংশুদ্ধানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন এবং পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের একদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। একদিন নগর-পরিক্রমা করা হয়, তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত অনুগমন করেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৮।৯ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইত।

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা

বারাসত : গত ২০শে এপ্রিল প্রাতে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতে রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ; যথারীতি মাঙ্গলিক কার্য ও স্তবপাঠের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের প্রতিকৃতি চারখানি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল

পর্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা, সপ্তশতী হোম, বাস্তুযাগ, উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র-পাঠ, ভজন, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, রামনাম-কীর্তন, কথকতা, কালীপূজা, যাত্রাভিনয়, শোভাযাত্রা, জনসভায় বক্তৃতা, সাধুসেবা ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব চলিতে থাকে।

উৎসবের প্রথম দিন বারাসত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রগণের নিকট ছাত্রজীবনের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক মহতী জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

উৎসবের শেষ দিন কয়েক শত ভক্ত নরনারীর একটি শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারিখানি প্রতিকৃতি সহ ভজন ও কীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। প্রায় ১০,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী কৈলাসানন্দজীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক শ্রীআশু দে আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪৮ ৪৯ খৃষ্টাব্দের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে :

বৎসর	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	ব্যক্তিগত আয়
১৯৫৯-৬০	১১,৭৬০	২৯১·৬ টাকা
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	২৯২·৬ „
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৭৩·৬ „

[কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থা হইতে প্রকাশিত তথ্য অবলম্বনে] P.T.I.

একজন যাত্রীর এরোপ্লেন

লণ্ডনে বিমান-বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রগণ একটি ছোট বিমান নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র ৯০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন পাইলট মিঃ রবার্টসন ইহার পরিকল্পনা করেন। গত ২৪শে এপ্রিল ইংলণ্ডে রেডহিল বিমান-ঘাঁটিতে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই ছোট বিমান (Skimmer) একজন যাত্রীর জন্যই নির্মিত, তবে ৫ জনকে উঠাইবার শক্তি ইহার আছে। বিমানটির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, ওজন ১৫০ পাউণ্ড এবং অশ্বশক্তি ৪০ ; মিঃ রবার্টসন মনে করেন, এই জাতীয় ছোট বিমান ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ, বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে।

[রয়টার হইতে সংকলিত]

ভ্রম-সংশোধন

১৪৪ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ ৯ পঙ্‌ক্তি— 'গ্রহণীয়' স্থলে পড়িবেন 'গ্রহণীয় নয়'
„ „ „ „ ১২ „ — 'সন্ন্যাস' „ „ 'সন্ন্যাসী'
১৪৫ „ ১ম „ ৩০ „ — 'হাঁ যাব' এর পরে পড়িবেন :
প্রশ্ন—আপনার পাণ্ডা কে? উত্তর—রাজনারায়ণ বসু।



গুরু, শিষ্য ও জ্ঞান

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

[মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২, ১৩]

যেমন প্রজ্বলিত দীপশিখা হইতে একই প্রকার আলোকপ্রদানে সক্ষম শত শত দীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে যাঁহার জীবন উদ্ভাসিত, তাঁহার নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ করা যায়। জিজ্ঞাসু শিষ্য কিভাবে ও কখন সদ্‌গুরুসমীপে উপনীত হন, এই গুরুই বা কিরূপ শিষ্যের হৃদয় আলোকিত করেন সে সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন:

অনিত্য ক্ষয়শীল কর্ম দ্বারা অক্ষয় নিত্যবস্তু মোক্ষ বা জ্ঞানলাভ করা যায় না—এইরূপে বিচার করিয়া কর্মনিষ্পন্ন ফলসমূহকে অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। নিত্যবস্তুকে জানিবার জন্য সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হইয়া (যজ্ঞকাষ্ঠ প্রভৃতি উপহার দ্রব্য হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মৈকপরায়ণ গুরুর সকাশেই গমন করিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুও যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা ও সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে যথাযথরূপে সেই ব্রহ্মবিদ্যাটি অবশ্যই উপদেশ করিবেন, যে বিদ্যাসহায়ে পরমার্থ নিত্যবস্তু—ক্ষয়হীন অক্ষর পুরুষকে—সেই সর্বব্যাপী সকলের অন্তর্যামীকে অন্তরের অন্তরে নিজের আত্মারূপে আবার পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে

বেদান্তের শিক্ষা

'বেদান্ত' সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন, অথবা বেদান্তের প্রসঙ্গ যাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যদি তাহাদের মতামত গ্রহণ করা যায় তো দেখা যাইবে, কাহারও মতে বেদান্ত অতি সহজ এবং সরল একটি দার্শনিক মত—যাহা 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার যাঁহারা বেদান্তের ভাষ্যটীকার অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন : না হে, অত সহজ নয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ভাষ্যটীকা পড়িয়া দেখিও, বুঝিবে 'অথ', 'অতো' তারপর 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'; ব্রহ্মজ্ঞান তো বহুদূর! 'তত্ত্বমসি' বলিলেই তাহার উপলব্ধি হয় না ; তৎ-পদার্থ ত্বং-পদার্থ জানিয়া তারপর 'অসি'র অর্থ বুঝিতে হয়। সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ত্বং-পদার্থ শোধন করিয়া বোধে বোধ করেন—'আমি স্বরূপত ব্রহ্ম'।

যে বুঝিয়াছে সে তো ভালই আছে, যে না বুঝিয়াছে সেও বেশ আছে, মাঝখান হইতে আধবুঝুনির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ; তাহারা জানিতে ও বুঝিতে চায়, তাহাদেরই জন্য নানাভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

বর্তমানে অনেকেই বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন, পুস্তকও রচনা করেন, কিছু অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত, আবার অনেকগুলি স্বকপোল-কল্পিত। বিশেষত দুর্নীতির সমর্থনে দুর্বৃত্ত যখন বলে—'জগৎই যদি মিথ্যা, তবে তদন্তর্গত দুর্নীতিটাই কি সত্য?', তখন চিন্তার কারণ ঘটে। আজকাল আবার রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের পর বেদান্ত প্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ সান্ত্বনা দেন : জন্মমৃত্যু দুইই মিথ্যা—অতএব গীতার কথা স্মরণ করিয়া শোক করিও না। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাইবে, বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষায় গীতা ও বেদান্ত আবশ্যিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে আমাদের জানা উচিত বেদান্ত কি, ও কি নয়!

বেদের শেষভাগকেই 'বেদান্ত' বলা হয়। বেদের প্রথমাংশে—স্তব-স্তুতি যাগ-যজ্ঞে দেবতা-তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার পর বাহিরের সন্ধান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মানুষের মন অন্তর্মুখী হইয়া পরমতত্ত্বকে গভীর ধ্যান চিন্তা ও বিচারসহায়ে প্রথমে নিজেরই মধ্যে অনুসন্ধান করিল, পরে সেই তত্ত্বকে সর্বত্র ওতপ্রোত অনুভব করিয়া যে গভীর বাণী ঘোষণা করিল, তাহাই উপনিষদ বা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদে প্রকাশিত বেদান্ত-তত্ত্বকে 'শ্রুতি'ও বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-মুখে গীতায় বিঘোষিত বেদান্তসত্য 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ। ব্যাসকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' বেদান্তের 'যুক্তি-প্রস্থান' বলিয়া অভিহিত।

অনেকে 'বেদান্ত' বলিতেই অদ্বৈত বেদান্ত বুঝিয়া থাকেন। বিভিন্ন আচার্যের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। আচার্য শংকরাদি প্রস্থানত্রয়ে অদ্বৈততত্ত্বই উপলব্ধি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতভাব পোষণ করেন, আবার মধ্বাদি আচার্যগণ পূর্বোক্ত মতসকল খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ আবার সূক্ষ্ম বিচারসহায়ে দ্বৈতাদি মত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাই ভারতের দার্শনিক জগতের সহস্র বৎসরের ইতিহাস।

যুগ যুগ ধরিয়া বেদান্ত ভারতের ধর্ম কর্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য—সর্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; বর্তমান যুগে ভারতের বাহিরেও বেদান্ত প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছে।

অধুনা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে দৃশ্যমান শক্তিই অদৃশ্য দেবতাশক্তির স্থান অধিকার করিতেছে। যখন পুরাতন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক সকল ধর্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তখন কিভাবে বেদান্ত ধর্মের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জড়বিজ্ঞানজাত নাস্তিক্যবাদের সম্মুখীন হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনীয়।

বেদান্তের ভাবধারা ভারতে চিরপ্রবাহিত, কখন প্রবল প্রবাহে, কখন স্তিমিত ধারায়, কখনও বা ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা। বর্তমান যুগে বেদান্ত-ভাবধারার নব ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

অদ্বৈত বেদান্তের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিলেও, উহাকে মানব-মনের উচ্চতম সীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াও অপর দুই মতকে তিনি ভ্রান্ত বা বর্জনীয় বলেন নাই। সাধকের মনের অবস্থা-বিশেষে সকল মতই সত্য। নিরপেক্ষ সত্য এক কিন্তু আপেক্ষিক সত্য বহু। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত সোপানবৎ সত্য! প্রথম অবস্থায় অবশ্যই মনে হয়, জীব জগৎ হইতে ঈশ্বর পৃথক্ (extra-cosmic God); মধ্যাবস্থায় উপলব্ধি হয়—জীব জগৎ ঈশ্বরের অংশ; শেষের অনুভূতি—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' —জীব জগৎ সকলই ব্রহ্ম: ইহার অর্থ—ব্রহ্মই সত্য, জীব জগৎ তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ —তাহাদের পৃথক্ কোন সত্তা নাই।

কেহ বলিবেন, এ অতি দুঃসাহসিক উক্তি; আমরা বলিব, ইহাই নির্ভীক সত্যানুভূতি। ইহারই সুদৃঢ় এবং বিশাল ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে আগামী যুগের বৈজ্ঞানিক ধর্ম।

স্বামীজী বলিতেছেন: Real religion, the highest, rises above mythology, it cannot rest upon that. Modern science has really made the foundation of religion strong.…What the metaphysicians call 'being', the physicists call 'matter'. Though an atom is invisible, unthinkable, yet in it are the whole power and potency of the universe. That is exactly what the Vedantist says of Atman. (*Inspired Talks.*)

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত: জড় জগতের সমস্ত শক্তি অদৃশ্য অচিন্তনীয় পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত; বেদান্ত সিদ্ধান্ত: সমস্ত শক্তি আত্মায় নিহিত।

আত্মবিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং বিশ্বাসের বলেই মানুষ শক্তি অর্জন করিতে পারে যদি কেহ অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাসী হয়, এবং যদি তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে মুহূর্তে তাহার সকল বিশ্বাস টলিয়া যায়, সে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। আর একজন হয়তো কোন দেবতার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আত্মশক্তির উপর একান্ত বিশ্বাসী; বেদান্ত তাহাকে নাস্তিক বলে না।

যে নিজের উপর বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এবং নিজের চেষ্টায় সে উন্নতির পথ করিয়া লয়। বেদান্তের অনুশীলন করিলে আত্মবিশ্বাস সহায়ে একজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক হইবে, ছাত্র ভাল ছাত্র হইবে, উকীল ভাল উকীল হইবে, মুচি ভাল মুচি হইবে, চাষী ভাল চাষী হইবে।

যিনি বিশ্বাস করেন, আমার অন্তরে অনন্ত শক্তিমান্ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন, অপরের ভিতরেও সেই আত্মা

রহিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সকলের ভিতর আত্মাকে অনুভব করেন, কাহাকেও ঘৃণা বা হিংসা করিতে পারেন না, পরন্তু তিনি নিজের ও অপরের দুঃখ দূর করার জন্য, উন্নতির জন্য সমান চেষ্টাশীল, 'সর্বভূতে আত্মবৎ' এই দৃষ্টিই বৈদান্তিক সমাজ-নীতির ভিত্তি।

অনেকে মনে করেন, বেদান্তার্থ বুঝিতে গেলে 'বিবেক-বৈরাগ্যের' যে সাধনা করিতে হয়, তাহাতে 'জগৎ মিথ্যা, জীবন অনিত্য' এই প্রকার আত্মঘাতী চিন্তা করিতে হয়, —ইহা দ্বারা জগতের বা জীবনের কোন প্রকার কল্যাণ সম্ভব নয়। তাহার উত্তরে স্বামীজী কি অপূর্ব ভাষায় বেদান্তোক্ত বৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন :

Vedanta does not in reality denounce the world. The ideal of renunciation nowhere attains such a height as in the teachings of the Vedanta. But at the same time, dry suicidal advice is not intended, it really means deification of the world—giving up the world as we think of it, as we know of it, as it appears to us, and to know what it really is. (*Jnana Yoga*)

বৈরাগ্যের অর্থ জগৎকে অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়া নয়। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন, প্রকৃতরূপে দর্শন। প্রাচীনতম উপনিষদেই পাওয়া যায় : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—সংসারে সমাজে সর্বত্র ঈশ্বরশক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে ; ইহা অনুভব করিতে হইবে। ঈশ্বরই নানারূপে নানাভাবে খেলা করিতেছেন। জগৎকে জড়রূপে না দেখিয়া চৈতন্যরূপে দেখিতে হইবে ; জীবকে জীবরূপে না দেখিয়া শিবরূপে দেখিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে। বেদান্তের এই মহত্তম শিক্ষাই এ যুগে বিবেকানন্দ-কণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে।

মানবজাতির—তথা মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে নূতন নূতন অনেক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, যেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী বিশ্বভাবের। সমস্যাগুলির মধ্যে (১) প্রথম ও প্রধান পুরাতন ধর্মগুলিতে ক্রমক্ষীয়মাণ বিশ্বাস, (২) ধর্মমাত্রকেই অস্বীকার করিবার মনোবৃত্তি, (৩) বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাবাদর্শের মধ্যে পরস্পর বিরোধ। আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান পাই এক বেদান্তের মধ্যেই।

বেদান্ত শুধু ভারতের ষড়্‌দর্শনের একটি দর্শনমাত্র নয়। বেদান্ত সকল মতের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, সকল ধর্মেরও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। ধর্মগুলির গায়ে জড়ানো নামাবলী খুলিয়া ফেলিলে দেখা যায়, সকল ধর্ম—সকল মত এক অনন্ত সত্যকে লাভ করিবার এক একটি পথ। বেদান্তের বিচ্ছুরিত আলোকেই অবিরোধের ও সমন্বয়ের এই মহান্ সত্য আমাদের চক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়। বেদান্তসহায়েই একজন হিন্দু ভাল হিন্দু, খৃষ্টান ভাল খৃষ্টান, মুসলমান ভাল মুসলমান হইতে পারে। যে বেদান্ত নিজেকে ও নিজের মতকে শ্রদ্ধা করিতে শেখায়—সেই বেদান্ত অবশ্যই অপরকে ও অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিতে বলে। বেদান্ত কাহাকেও নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে বলে না, অপর ধর্মকে ভ্রান্ত বলিয়া কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, পরন্তু সকল ধর্মেই শক্তি সঞ্চার করে।

পারস্পরিক এই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিতে পারে সমষ্টি-কল্যাণের সৌধ। যতই আমরা বেদান্তের এই শিক্ষা গ্রহণ করিব, ততই মতবিরোধ, মতবিভেদ প্রভৃতি অশুভ শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত জাতিগতভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ও মানুষ সুসংহত এক মানবজাতিতে পরিণত হইবে, যেখানে হিংসামূলক প্রতিযোগিতা থাকিবে না, থাকিবে প্রীতি-মূলক সেবা ও সহযোগিতা।

জাতীয় সংহতি

স্বাধীনতা-লাভের ১৪ বৎসর পরে আজ জাতীয় সংহতির (national integration) সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা শুরু হইয়াছে। নানা অশুভ ঘটনার মধ্যে এই চিন্তা যে শুরু হইয়াছে—ইহাই শুভ লক্ষণ। চিন্তা যেন মধ্যপথে থামিয়া না যায়, চিন্তা যেন বিপথে চলিয়া না যায়। সরল যুক্তির প্রশস্ত রাজপথে চলিলে জাতীয় সংহতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা রাজনীতিক স্বার্থের অলিগলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে 'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে' কত জাতি যে মাথা তুলিয়া মহাজাতির গতিরোধ করিবে, তাহা বলা কঠিন। দেশের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা নিশ্চয় এই আসন্ন বিপদ লক্ষ্য করিয়াই জাতীয় সংহতির জন্য আজ সমধিক সচেষ্ট।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে—ভারতে কখনও জাতীয়তা বলিয়া কিছু ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ফলেই এক প্রকার শাসন, এক প্রকার সরকারী ভাষা, এক প্রকার উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতির ফলে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে এই জাতীয়তার ভাব দানা বাঁধিতেছিল। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেই) ব্রিটিশ সযত্নে সেই জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছে—প্রথমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পত্তন করিয়া। ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগের পর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ঢেউ আজ জাতীয় জীবনের উভয় কূল ভাঙিতেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য বলেন, জাতীয়তাবোধের ধারণাটি উনবিংশ শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছে ইওরোপে। সেখান হইতেই ভারতে আসিয়াছে, আফ্রিকাতেও যাইতেছে ইওরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে।

জাতীয়তাবোধের মূল যে কি, এ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে গত শতাব্দীতে ইওরোপে প্রসূত এই জাতীয়তাবোধ প্রধানত ভাষাভিত্তিক! তথাপি সেখানে কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও একাধিক ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত: যথা সুইটজারলণ্ডে তিনটি, বেলজিয়মে দুইটি। 'মুসলিম জাহানে' বলা হইয়া থাকে ধর্মই জাতীয়তা—যাহাদের ধর্ম এক, তাহাদের জাতিও এক। এক ধর্ম, এক কৃষ্টি সত্ত্বেও ইওরোপ ভাষাভিত্তিতে বহু জাতিতে বিভক্ত। মরক্কো হইতে মালয় পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত থাকিলেও ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা নিজেদের একজাতি বলিয়া মনে করে না।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মমত চিরদিন ধরিয়াই রহিয়াছে, ভাষারও অন্ত নাই। ধর্মমত ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের একটি অতি সূক্ষ্ম জাতীয়তা আছে। অদৃশ্য সূত্র যেমন মণিগণের মধ্য দিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে, ভারতের জাতীয়তাবোধের সূত্রটি সেইরূপ অদৃশ্য, তাহারই উপর সযত্নে গাঁথা রহিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষার মণি-মালা। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তবেই ভারতের জাতীয়তাবোধের রহস্য বোঝা যাইবে; নতুবা কখন ভৌগোলিক ঐক্য, কখন রাজনীতিক একতা, কখন আর্থনীতিক সমস্বার্থ—নানা দিকে মাথা ঠুকিয়া মরিব, কোথাও পাইব না—ভারতের সেই ঐক্যসূত্রের সন্ধান। অথচ সে রহিয়াছে অতি নিকটে—প্রতিটি মণির অভ্যন্তরে। ভারতের জাতীয় সংহতির সূত্র রহিয়াছে—তাহার ধর্মে দর্শনে সাধনায়, তাহার ভাষায় সাহিত্যে, কাব্যে সঙ্গীতে ভজনে, কৃষ্টিতে ঐতিহ্যে। অবিরত আপাত

বৈষম্যগুলির উপর জোর না দিয়া অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যগুলির তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে জাতীয় সংহতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে —পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই মনে করেন, দলীয় রাজনীতিই দেশসেবার প্রশস্ত পথ। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব কোন একটি দল-বিশেষের নহে। যদি সত্যই আমরা বুঝিয়া থাকি, জাতীয়তাবোধে ভাঙন ধরিয়াছে, (ধর্ম ও ভাষা লইয়া যে এই ভাঙন ধরিয়াছে, ইহা আজ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই)—তবে এ ভাঙন প্রতিরোধ করিতে হইবে দৃঢ় হস্তে। দলের রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া আজ দেশপ্রেমিক কল্যাণকর্মীকে অগ্রসর হইতে হইবে রাজনীতি-বর্জিত শুদ্ধ দেশসেবার বিরাট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া।

জাতীয় সংহতি গড়িয়া তুলিতে হইবে উপর হইতে নয়—নীচে হইতে, শহর হইতে নয়— গ্রাম হইতে, কেন্দ্র হইতে নয়—পরিধি হইতে, ভারী শিল্প-মাধ্যমে নয়—কুটির শিল্পের মাধ্যমে, শুধুমাত্র ভোটাধিকার দ্বারা নয়—তৎসহ ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার দ্বারা; ধর্ম ও ভাষার সংখ্যালঘুকে সংবিধানসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নয়—সেগুলি যতশীঘ্র সম্ভব কার্যকর করিয়া।

সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয় জীবনের ক্ষয়-রোগের মতো জানিয়া কৃষ্টিরক্ষার অজুহাতে সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিলে কি করিয়া জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে? জাতিভেদই আমাদের সর্বনাশের কারণ, বারংবার এ কথা বলিয়াও তপশীলী জাতি, উপজাতি প্রভৃতি বিভাগগুলি দীর্ঘস্থায়ী করিলে কখনই জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সমানাধিকার দিলে তবেই সুস্থ জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ অনুভব করিবে—আমি জাতির অঙ্গ, সারা ভারত আমার দেশ—ভারতের উন্নতি আমার উন্নতি। নতুবা লেখায় ও বক্তৃতায় উদার জাতীয়তার জয় গাহিয়া কার্যক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিই, তবে প্রাদেশিকতাই বাড়িবে; ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার (linguistic nationalism) গতিরোধ করিতে কেহই পারিবে না।

সেক্ষেত্রে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে নিজেকে বিদেশী বোধ করিবে, সমগ্র ভারতকে কেহই নিজের দেশ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। যদি প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীরা মনে করে, এই অঞ্চল আমাদেরই দেশ—অপরের নহে, বাংলা শুধু বাঙ্গালীর, বিহার বিহারীর, ওড়িষ্যা ওড়িয়ার, আসাম অসমীয়াভাষীর, তাহা হইলে ভারত কাহার দেশ?

গত বৎসর হইতে আসামে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে কল্পনার অতীত। প্রায় একই প্রকার অপরাধের জন্য সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমাদের কর্তব্য নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে যে অন্যায় অবিচার বারংবার হইতেছে, তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা। তবেই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে জাতীয় সংহতি। এজন্য বক্তৃতা, প্রস্তাব ও পরিকল্পনার পূর্বে আজ একান্ত প্রয়োজন শক্ত সবল সাহসী ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব।

চলার পথে

'যাত্রী'

'না, হ'ল না'– এ কথা বলেই তোমার চেষ্টা ছাড়ছ কেন, পথিক? তুমি কি ভুলে গেলে, তোমার ধৈর্য, তোমার স্থৈর্যের কথা—বাল্যকালেও যা তোমার হৃদায়ত্ত ছিল! তখন তো তুমি কতবার পড়েছ—এ ধরার পিঠে, তবুও সোজা হয়ে দাঁড়াবার অদমনীয় ইচ্ছা তোমাকে সেই সব ক্ষুদ্র পরাভবকে স্বীকার করতে দেয়নি। আর দেয়নি বলেই আজ তুমি দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছ, ছুটতে শিখেছ। কিন্তু এখন তোমার এই যৌবনের শক্তিমত্ততা, বিবেকবুদ্ধির পরিপক্কতা পেয়েও পরাজয় মানতে চাইছ? তা কি হয়; চেষ্টা কর; বিফলতায় দমে যেও না; মনে বল রাখো, দেখবে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতেছ। উদ্যম না থাকলে, ক্ষুধিত সিংহের মুখেও অন্ন এসে জোটে না—এ কথা কি ভুলে গেলে?

আর ভয়? কিসের ভয়? মৃত্যুর? —সে তো আছেই, তাকে এড়াবে কি ক'রে? মহাভারতের শান্তিপর্ব খোলো (২৮।৫০) দেখবে—মৃত্যুর পথ অতি বিরাট; জগতে আর কিছুরই কি হবে তা জানা নেই। কিন্তু মৃত্যু ধ্রুব, সুনিশ্চিত—এ পথে না চলেও মানুষের উপায় নেই—সকলকেই যে এ পথে চলতে হবে। এর হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন সম্ভাবনা নেই, তখন সেই মৃত্যুর স্বপ্নে-দেখা হাতছানির পথ ধরে বৃথা আশার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি আছে! ঋগ্বেদের ঋষির উদাত্ত উপাসনার সুরের মাঝেও সেই একই বাণীস্পন্দন (১।১১৩।১১): পূর্বে যাঁরা উজ্জ্বল উষাকে দেখেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায় চলে গেছেন; এখন আমরা যারা উষাকে দেখছি এবং আমাদের পরেও যাঁরা দেখবেন, তাঁদের সকলকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। তাইতো বলছি, আমরা হচ্ছি এক যাত্রীর দল। সকলেই একই সঙ্গে চলেছি; চলেছি সেই মৃত্যুর অভিযানে। এতে কেউ আছে এগিয়ে, কেউ আছে পেছিয়ে, তাই আগে কেউ পৌঁছচ্ছে, কেউ বা পরে; এতে আর দুঃখের কি আছে?

তাইতো বলি, ভয় পেও না। বরং আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। কারণ বহুবার বহুযোনিতে ভ্রমণ ক'রে জীব পুরুষার্থ-সাধক মনুষ্যজন্ম পায়। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যে পর্যন্ত না অবসান ঘটে, সেই পর্যন্ত বিবেকী পুরুষ নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য যত্ন করেন, কারণ বিষয়ভোগ তো নিকৃষ্ট প্রাণী শরীরেও সম্ভব, কিন্তু পরমার্থ লাভ করতে হ'লে নরদেহ পেতেই হবে।—এই কথা আমরা পাই ভাগবতে (১১।৯।২৯)।

সেই নরদেহ পেয়েও তুমি কেবল বন্ধ্যা প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে পথিক? তুমি তোমার এই জীবনের মূল্য, তার মান নির্ণয় না করেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে? সে কি হয়? তোমার ঐ মান, ঐ মূল্য সম্বন্ধে যথার্থ 'হুঁশ' হলেই তো তুমি মান-হুঁশ অর্থাৎ মানুষ হবে। তাই তোমার সুমুখে অহরহ যে কল্যাণপ্রদ 'শ্রেয়স্' ও আপাতমধুর 'প্রেয়স্' রয়েছে, তার মধ্যে শ্রেয়স্কেই লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও। কেননা 'প্রেয়স্'-কে তো নিকৃষ্ট প্রাণীরাও সঙ্গী ক'রে নিয়েছে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে যদি শ্রেয়স্কে না ধর, তাহলে ঐ অদৃষ্টকে বা মৃত্যুকে 'হাস্যমুখে পরিহাস' ক'রে যেতে পারবে কি ক'রে। তাছাড়া প্রেয়স্কে ধরে তুমি কিছুতেই

তোমার জৈবসত্তা বা জড়ত্বের উর্ধ্বে উঠতে পারবে না। তাইতো তোমাকে প্রেয়সের পিপাসাকে ছাড়তে বলি, কারণ 'অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ'—পিপাসার শেষ নাই।

জানতো, মানুষ অভ্যাসের অধীন। সে যে যে বিষয় ভাবে, তাতেই তার মন আসক্ত হয়। তাই বলি কল্যাণের বিষয়ে ভাবো, ক্রমে তাই তোমার ভাল লাগবে। জেনো, এই ভাল লাগার বীজ তোমার মধ্যেই রয়েছে—আবাদ করো, সোনা ফলবে। মোট কথা, এই শ্রেয়সের জন্য কিছু করতে হবে। চুপ ক'রে থাকলে হবে না। চলতে হবে; তবেই এগোতে পারবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে: 'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি'—যিনি বিচরণ করেন তিনিই মধু আহরণ করতে পারেন। ঘরে ব'সে কেহ স্বাদু ফল সংগ্রহ করতে পারে না। সূর্যের যে গৌরব তা কেবল তিনি কখনও বিচরণ করতে করতে থামেন না ব'লে। সত্যের এই আলোক-দিশারীকে তুমি আদর্শ কর, পথিক।

বলবে—শ্রেয়সের পথে চলতে গিয়ে যদি এই জীবনে শ্রেয়স্ না পাই? তাতেই বা কি? তোমার মনকে যে তুমি শ্রেয়সের পথে বাঁধতে পেরেছ, এইটেই যথেষ্ট। কারণ, 'অল্পংহি সারভূয়িষ্ঠং যৎ কর্মোদারমেব তৎ' (মহাঃ শান্তিঃ—৭৫।২৯) অর্থাৎ অল্প হলেও সারবান্ কর্মই প্রশংসনীয়। তাছাড়া, মরণ কখন যে এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে, তার যখন কোন ঠিক ঠিকানা নেই, তখন কালকের কাজ আজই শেষ ক'রে ফেল; অপরাহ্ণের কাজ পূর্বাহ্ণেই শেষ ক'রে রাখো। যা শ্রেয়স্কর আজই তা ক'রে ফেল, কাল হয়তো আর সময় পাবে না। কারণ, আমরা সবাই মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত এবং জরাদ্বারা পরিবেষ্টিত—এক একটি দিন আসছে, আর আয়ু কমছে। এর মাঝেই আমাদের শ্রেয়সের জন্য চেষ্টা ক'রে যেতে হবে কারণ, যা দুস্তর দুর্গম দুষ্কর—তা চেষ্টা করতে করতেই অধিগত হয়; চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

জীবন শেষ হবার আগেই জীবনকে চিনতে চেষ্টা কর। কেন এলে এই পৃথিবীতে, কেনই বা চলে যেতে হচ্ছে, তার একবার হিসাবনিকেশ করবে না? সামান্য অর্থেরও একটা জমা-খরচ রাখো, আর এই মহামূল্য জীবনের দেনাপাওনা বুঝে নেবে না? এই বুঝে নিতে গেলেই দেখবে, তোমার অতল অবচেতনার ভাষায় ফুটে উঠেছে সেই চিরন্তন বাণী—যা উদার, যার দ্বারা আত্মপ্রসার হয়, তাই ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে বৃহৎকে অবলম্বন করায়, আর ক্ষুদ্রতার ক্লিষ্ট নির্মোকটিকে খসিয়ে ফেলায়। এই আদর্শ পালন কর। দেখবে—তোমার হৃদয়ের কুয়াশা সরে গিয়ে এক উদারতার মহান্ আলোয় তোমার চিত্তের হাসি ফুটেছে, সেই সাথে অনুভূতির অন্তরতম প্রদেশেও অপ্রত্যাশিত মোক্ষলাভও প্রায় করায়ত্ত। কারণ 'ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে। মোক্ষ হি চেতসো ধর্মঃ চেতস্যেব স তিষ্ঠতি' (যোগবাশিষ্ঠ ৫।৭৩।৭৫)—অর্থাৎ মোক্ষের আবাস স্বর্গে, পাতালে বা ভূতলে নয়, মোক্ষ আমাদের চিত্তেরই একটা অবস্থাবিশেষ এবং তা চিত্তেই বাস করে। এ হচ্ছে আমাদের সোনার কণ্ঠহার, যা হারিয়ে গেছে মনে ক'রে আমরা অযথা ছুটোছুটি করছি। এ কেউ আমাদের এনে দেবে না, কেবল 'তা যে হারায় নি, আমাদের কাছেই আছে' এই জ্ঞানটুকু পেলেই যথেষ্ট।

তাই বলি, চল পথিক, তোমার সেই জ্ঞান আহরণের পথে, সেই শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিভার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ লাভের পথে, সেই 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা'য় যেখানে 'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। চল চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব

স্বামী পবিত্রানন্দ

বলা হয় যে, ধর্মজগতে সহজ বুদ্ধির মতো দুর্লভ আর কিছুই নেই। বাস্তবিকই এটা আশ্চর্যের বিষয়। বিভিন্ন ধর্ম অতি-প্রাকৃত অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, বহু ক্ষেত্রেই লোকে ধর্মজীবন যাপন করতে গিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে যখন কতগুলি লোক হঠাৎ ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন দেখা যায়, তারা সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায়—দিনে তিনবার ক'রে স্নান আরম্ভ করেছে,—অবশ্য ভারতবর্ষ গরম দেশ! তাদের আহারের অনেক নিয়মকানুন; নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করবে, তার মধ্যেও অনেক বিধিনিষেধ। মাসে কয়েকদিন উপবাস করা চাই। তারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে তারা অপরের বহু অসুবিধা ঘটায় এবং নিজেদেরও বিপন্ন ক'রে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে তারা মন-মরা হয়ে পড়ে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যও নষ্ট ক'রে ফেলে। স্বীকার করি, তারা অকপটে চেষ্টা করছে, কিন্তু এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ বা সহজ বুদ্ধির অভাবের জন্য যদি তারা স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তবে এই দুর্বল ভিত্তির ওপর তারা কিরূপে আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলবে? অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই অবস্থা! নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত খাদ্যগ্রহণ—কি কি খেতে হবে, কতবার স্নান করলে পবিত্র হওয়া যাবে—এই হয়ে পড়ে ধার্মিকতার মানদণ্ড।

যীশুখৃষ্টের কি বিচক্ষণ উক্তি: 'তুমি কি খাচ্ছ, বাইরে থেকে কি আসছে, তাতে কিছু এসে যায় না, ভিতর থেকে বাইরে কি যাচ্ছে (কি বলছ) সেইটি বিচার্য।' পবিত্রতা বাইরে থেকে হয় না, ভিতর থেকেই হয়। ভারতের এক শ্রেণীর লোকের কাছে—কিভাবে এবং কি কি খেতে হবে, এই বিচারের সঙ্গে ধর্ম এক হয়ে গেছে। আমিষ ভোজন করেও যে ধর্মজীবন যাপন করা যায়—এ কথা অনেকে বিশ্বাসই করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন: তোমাদের ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে; হাজার বছর ধরে তোমরা এই বিচারই করেছ, কি খাবে আর কি খাবে না।

এই হচ্ছে জীবনের একটি দিক। সব ধর্মেই অপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে মিশে গেছে; অনেকেই এই ফাঁদে পড়েছেন। ভারতে বৈদিক যুগের উষাকাল থেকে ধর্মের আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য রয়েছে, এবং এক সময় আচার-অনুষ্ঠান এত বেড়ে যায় যে, লোকে ধর্মের উদ্দেশ্যই ভুলে গেল; তখন হয় তীক্ষ্ণধী মহাপ্রাণ বুদ্ধের আবির্ভাব। বুদ্ধের ধর্ম সূক্ষ্মবুদ্ধির ধর্ম, তার মানে এ নয় যে, আমরা বুদ্ধির দ্বারাই সত্য লাভ ক'রব; কিন্তু আমরা যুক্তিবিচার দ্বারা বুঝি যে, কোন্‌টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি তত

---

* নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে ৭.৪.৫৭ তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা 'Healthy-mindedness in Religion' হইতে স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

প্রয়োজনীয় নয়। বুদ্ধ যেন পরিত্রাতা-রূপেই এসেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে সংশোধনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বৌদ্ধ-ধর্মেরও খুব উন্নতি হ'ল। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসই ধ্বংসশীল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষয় পেতে লাগলো। বৌদ্ধেরা ভয়ঙ্কর আচার-অনুষ্ঠান শুরু ক'রল। এই সময়ই ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে চরম অবনতির সময়। তখন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধের প্রধান উপদেশগুলি সকলে ভুলে গেল। এই সময়ে এলেন শঙ্করাচার্য; তিনি ভারতের ধর্মকে অবনতি থেকে রক্ষা করলেন।

আমরা ভুলে গেছি যে, প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নয়। যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তবে আমরা অস্বাভাবিকই হয়ে প'ড়ব। আমাদের মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মনের স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়? যখন আমরা স্বাভাবিক ভাবে কাজ করি না, কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে কাজ করি, তখনই আসে মানসিক অসুস্থতা। প্রত্যেক প্রাণীর দেহে তাপ আছে, যখন সেই তাপ খুব বেশী বা কম হয়, তখনই বুঝতে হবে রোগ হয়েছে। একে সুস্থ অবস্থা বলা যায় না। এইভাবে আমাদের জীবনে যখন আমরা অতি-মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করি, যখন আমরা দুঃখকষ্টগুলিকেই বড় ক'রে দেখি, তখনও আমাদের সুস্থ অবস্থা নয়। জীবনে বাধাবিপত্তি আসবেই, কিন্তু যদি কেউ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জীবনকে দেখে, আগামী কাল বা পরশু বা তারপরে কি বিপদ আসবে, যদি কেউ কেবল তাই বলতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এটা সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। এ হ'ল দুঃখবাদী মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, তখন হতাশার ভাবে জীবনকে চিন্তা করা হয়।

সুখবাদ জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই দেখে, অবশ্য এও অসুস্থ অবস্থা হ'তে পারে। যখন আমরা মনে করি, সবই ঠিক আছে, যখন অন্তরের প্রকৃত শক্তি লাভ না করেই আমরা ভাবি, আমরা সেই শক্তি লাভ করেছি, তখন আমাদের মধ্যে দেখা দেয় গর্ব ও আত্মম্ভরিতা। এও এক অসুস্থ অবস্থা। দেহের তাপ বেশিও ভাল নয়, কমও ভাল নয়। দেহের সাধারণ তাপই স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

ছোট নদী বয়ে আসতে আসতে মাঝে হয়তো বালুকাস্তরের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, আর যেতে পারে না, তখন সে বালুকার নীচে দিয়ে বইতে থাকে। এই রকম মানুষের জীবন-গতিও কখন কখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অগ্রসর হ'তে না পেরে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, আর তখন তার থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। এ একটা অসুস্থ অবস্থা।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য, বিশেষ ক'রে ধর্মজীবনে; অতএব আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। ধর্মজীবনে এটি অধিকতর সত্য, কারণ এখানেই আমরা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি, পূর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা করি। যখন আমরা পূর্ণতালাভের ইচ্ছা করি, তখন স্বভাবতই আমাদের অপূর্ণতাগুলি বেশী ক'রে চোখে পড়ে। যে কোন আদর্শ অনুসরণ করে না, সে বিচার করতে পারে না—কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ। একদিক থেকে তাকে ভাগ্যবান্ বলা যেতে পারে। একজন খৃষ্টান—বোধ হয় 'Pilgrim's Progress' গ্রন্থের রচয়িতা জন্ বানিয়ন জীবনের এক সময়ে এমন দুঃখবাদী হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি

ভাবতেন—জন্তুজানোয়ার, গাছপালা, পাখী সবাই তাঁর চেয়ে ভাল, কারণ তিনি মহাপাপী, আর তাঁর জীবনে নানা অপূর্ণতা রয়েছে। তিনি ভাবতেন, তিনি যে মানুষ হয়ে জন্মেছেন, এর থেকে দুঃখের আর কি আছে? অন্য প্রাণীরা তাঁর থেকে অনেক সুখী! আর একজনের কথা জানি, তিনিও পাপের সম্বন্ধে এত বেশী ভাবতেন যে, ঘরের বাইরে বেরুতেই ভয় পেতেন। তিনি অনুভব করতেন, গাছপালাও যেন তাঁর জীবনের অন্ধকার দিকটি জেনে ফেলেছে। এখানে 'তাপ' খুব নীচুর দিকে; একে স্বাভাবিক 'তাপ' বলতে পারা যায় না।

আমরা যে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি, তার মধ্যে রয়েছে পুরুষকার। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন আমরা অপূর্ণতার কথা এত ক'রে ভাববো? বার বার বললে যে কোন বিষয়ই অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। যদি কারও উপর আমাদের বিরক্তির ভাব থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বলতে থাকি, তবে অসন্তোষ ক্রমশঃ বেড়েই চলবে; অবস্থা এমন হয়ে উঠবে যে, আমরা টুকরো টুকরো হয়ে যাব! এইভাবে আমরা নিজেদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার বিষয় অনবরত চিন্তা করতে আরম্ভ করি, এও এক রকম রোগ! এইরূপ বিবেকের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতনতাও রোগবিশেষ। অনেকে অপরের কাছে নিজেদের দুর্বলতা উদ্ঘাটন করতে ভালবাসে। এ যেন এক রকমের বাহাদুরি দেখানো। এই ধরনের লোক এত সরল যে, নিজেদের দুর্বলতা দোষত্রুটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে। এর দ্বারা তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে! যদি আমাদের দুর্বলতা থাকে, আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রব, তা জয় করবার জন্য। কতগুলি ধর্মে পাপের দিকটাই বেশী চিন্তা করা হয়। কিন্তু কেন আমরা জীবনের অন্ধকার দিকটি নিয়েই চিন্তা ক'রব? শেষ পর্যন্ত, কে বেশী শক্তিমান্—ঈশ্বর, না শয়তান?

জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কি? গতি হচ্ছে জীবনে স্বাভাবিক জিনিস। রাস্তার উপর থেমে যাওয়া অস্বাভাবিকতা, এ তো বিচ্যুতি। পূর্ণতালাভের প্রচেষ্টা, তার দিকে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিকতা। অপূর্ণতার দিকে যাওয়া হচ্ছে বিপথে গমন, ভুল। প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ পড়ে যাবে; কিন্তু পড়ে গিয়ে যদি আমরা কাঁদতে থাকি এবং পতনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি, তাহলে আর অগ্রসর হ'তে পারব না। আমরা মানুষ, মানুষের দুর্বলতা আছে। কিন্তু কেন দুর্বলতার দিক থেকেই জীবনকে চিন্তা ক'রব? দুর্বলতার ভাব ঝেড়ে ফেলে জীবনের পথে অগ্রসর হও। এ খুবই স্বাভাবিক যে, জীবনে চলার পথে কখন কখন আমরা পড়ে যাব, আমাদের হয়তো শত শত বার পড়তে হবে। কিন্তু সেই পতনের দ্বারাই নির্মিত হ'তে পারে উন্নতির স্তম্ভ—অন্ততঃ ধর্মজীবনে। বাস্তবিক ধর্ম-জীবনের অর্থ বিফলতার সঙ্গে যুদ্ধ; সর্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মজীবনে আমরা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি ব'লে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে এবং সেগুলি অপরেরও দৃষ্টিগোচর হয়। সাদা কাপড়েই কালো দাগ চোখে পড়ে! এ হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা; কিন্তু এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, যখন আমরা কালো দাগগুলির দিক থেকেই কাপড়টিকে চিন্তা করি।

পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই পূর্ণতা-লাভের সম্ভাবনা। দোষত্রুটিগুলিকে বেশী

ক'রে দেখলে বা লুকিয়ে রাখলেই সেগুলি চলে যায় না; তাতে শুধু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করাই হয়, শক্তিলাভ হয় না। প্রকৃত শক্তিলাভের জন্য ইতিবাচক (positive) কিছু অবলম্বনীয়; সমস্ত শক্তির উৎসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে আমাদের সকল শক্তি বৃথা ব্যয়িত হবে, বিশেষ কিছু ফল হবে না। কতকগুলি খৃষ্টান সাধুর জীবনে দেখা যায়, তাঁরা জীবনের অন্ধকার দিকটির উপর বড় বেশী জোর দেন। অবশ্য সব ধর্মেই এই ধরনের মানুষ আছে। তারা প্রকৃত পথ খুঁজে পায় না, তাদের দৃষ্টিও ঠিক নয়, আর এই জন্যই তাদের অধিকাংশ শক্তি ঐদিকে বৃথা ব্যয়িত হয় এবং জীবন বিফল হয়।

ধর্মজীবনে সত্যি খুবই সংগ্রাম আছে; কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ঐ সাধুদের জীবনে এত দুঃখকষ্ট ভোগের পর এসেছিল সিদ্ধি ও সফলতা। এইটিই হ'ল সব চেয়ে বড় জিনিস। আমরা তাঁদের সমগ্র জীবন-ইতিহাস জানতে পারি না, তাঁদের আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি ঘটনা মাত্র জেনে থাকি। আমাদের সৌভাগ্য যে—আমরা এ রকম আত্মজীবনী পেয়েছি, যার সাহায্যে সামান্যভাবে বুঝতে পারি, তাদের সংগ্রাম ও সাধনা; এ তাঁদের সমগ্র জীবনের চিত্র নয়, এ শুধু একটি দিকের কথা।

কি সেই শক্তি, যা তাঁদের ঠিকভাবে ধরে রেখেছিল এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও? সেইটি খুঁজে বার করতে হবে। সংগ্রাম যতই কঠোর হোক, অন্ততঃ কয়েকজন তো জয়ী হয়েছেন।

সাধকের ব্যক্তিগত অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সংগ্রামের তারতম্য হয়। বেদান্তে বলা হয়, আমরা আমাদের অতীত কর্ম আমাদের সঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে চলি, যদি কেউ পূর্বজীবনে অনেক অসৎ কর্ম ক'রে থাকে, তবে এই জীবনে তাকে তার মূল্য দিতেই হবে এবং সংগ্রামও হবে তীব্রতর। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীবন ব্যর্থ বা বিফল। যতই আমরা অপবিত্র হই না কেন, ঠিকভাবে চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ ক'রব—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকব। আমাদের যতই দোষত্রুটি থাক, সেগুলি দূর করতে সমর্থ হব। মহাপুরুষগণের সংগ্রামমুখর জীবন থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। কখন কখন তাঁরা এমন কঠোর সংগ্রাম করেছেন, যার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না।

কতকগুলি সত্যি নিরর্থক। দারুণ শীতে যখন বরফ পড়ছে, তখন অনেক খৃষ্টীয় সাধু ঘরের বাইরে এসে প্রার্থনা করেছেন, উদ্দেশ্য খালি গায়ে ভীষণ শীত সহ্য করা। কখন কখন তাঁরা মনকে সংযত করার জন্যই এরূপ করেন; শরীরের প্রভাব কিছু পরিমাণে মনের উপর থাকলেও শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করলেই মন সংযত হয় না—এ কথা তাঁরা ভুলে যান। শরীর যখন খুব দুর্বল অসুস্থ, মন তখন চিন্তা করতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, মন সংযত হয়ে গেছে, সেই অবস্থায় মন চিন্তা করতে পারছে না মাত্র। কেউ কেউ মনকে বশে আনবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ও মন দুইই ভেঙে পড়ে। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যেন শিখতে পারি, সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা বলতে শুধু শরীরকে সংযত করাই বোঝায় না।

ভারতেও এইরূপ একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাঁরা সাধনার কঠোরতার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে বিভিন্ন ভঙ্গীর কঠিন কঠিন আসন অভ্যাস করেন, কেউ কেউ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকেন। এ কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবন নয়; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এগুলি গ্রাহ্যই করেন না।

এখানে আসার আগে ভারতে আমি এক ধর্মমেলায় গিয়েছিলাম। শুনলাম, সেখানে একজন ১৪ বছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৪ বছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? ধর্মজীবনের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি? এগুলি দ্বারা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করা যায়, ভারতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এগুলি চেয়েও দেখেন না, হেসে উড়িয়ে দেন। যা হোক পাশ্চাত্যে কিন্তু এগুলি সংবাদপত্রে রোমাঞ্চকর ঘটনার খোরাক জোগায়। আগেই বলেছি, সব ধর্মেই এ ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মের ব্যাপার মনের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে নয়। অবশ্য শরীরের কিছুটা যত্ন নিতে হবে বইকি, কিন্তু শরীরকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা বস্তু ভাবলে চলবে না। সব কিছুই নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। ধর্মের লক্ষ্য কি? ঈশ্বর,—না শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশ্বরের স্বরূপ কি? এটি নির্ভর করছে—কিভাবে ঈশ্বরকে তুমি দেখছ তার উপর। ঈশ্বর তো ক্রোধের ঈশ্বর নন। এক সময়ে লোকে ভাবত—তিনি ক্রোধের ঈশ্বর, শাস্তিদাতা ঈশ্বর, ফৌজদারী আদালতের বিচারক ঈশ্বর—প্রত্যেকের পাপগুলিই দেখছেন! কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রেমের ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা কেন এত ভয় পাব? সিদ্ধির জন্যই বা জীবনে বীভৎস সংগ্রাম কেন? তাঁর উপর নির্ভর করতে পার, তাঁর প্রেমের উপর,—তাঁর দয়া, তাঁর সহানুভূতির উপর।

বেদান্তে ঈশ্বরকে একটি ভাবরূপ বলা হয়ে থাকে। বেদান্তে চরম তত্ত্ব—সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। উপনিষদে চরম সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি, চরম সত্তা-রূপেই তা বলা হয়েছে। একহার্টও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরত্ব শাশ্বত সত্তা। যখন সৃষ্টি ছিল না, তখন এক সত্তা বর্তমান ছিল। একহার্ট বলেন, সেই সত্তাই ঈশ্বরভাব। যখন সৃষ্টির প্রকাশ হ'ল, সে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরত্ব থেকেই শক্তির আবির্ভাব, যখন বিশ্বজগৎ প্রকাশিত হ'ল, তখন বলা হয়—ঈশ্বরই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। উপনিষদেও এই একই ভাব বিবৃত। একহার্ট খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মানুষ, আর উপনিষদের জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হয় খৃষ্ট-আবির্ভাবের প্রায় ২,০০০ বছর আগে। কিন্তু ভাবের কী মিল!

শাশ্বত সত্তার লক্ষণ কি? উপনিষদ্ বলেন, আনন্দ। একটি উপনিষদে জিজ্ঞাসিত হয়েছে: শাশ্বত সত্তার স্বরূপ কি? উত্তর: যাঁর থেকে বিশ্বজগৎ জাত, যাঁতে অবস্থিত এবং পরিশেষে যাঁতে বিলীন হয়। শিষ্য প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্ম কি? কি তাঁর প্রকৃতি? গুরু বললেন, 'যাও, তপস্যা কর, তাহলেই জানবে'। শিষ্য তপস্যা ক'রে ফিরে এলেন, কিন্তু ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। প্রথমে তিনি বললেন, 'অন্নই ব্রহ্ম', তারপর বললেন, 'মন ব্রহ্ম', তারপরে 'প্রাণ ব্রহ্ম' ইত্যাদি। প্রতিবারই গুরু তাঁকে কঠোরতর তপস্যায় পাঠিয়ে দেন। বারংবার বিফলতা সত্ত্বেও তিনি তপস্যা ক'রে চললেন, অবশেষে গুরুর কাছে এসে বললেন, 'আনন্দই ব্রহ্ম; কারণ আনন্দ থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারাই বর্ধিত হয় এবং শেষে আনন্দের অবস্থাতেই ফিরে যায়'।

উপনিষদ্ বলেন, যদি আমাদের মূল সত্তা আনন্দ না হ'ত, তবে কিভাবে জীবন থাকত? অন্তরে যদি আনন্দ না থাকত, তবে বিশ্বের অবস্থান অসম্ভব হ'ত? এ সাধারণ সুখ নয়, শাশ্বত আনন্দ—যা মন বুদ্ধির অতীত। যদিও উপনিষদ্ বলছেন—জগৎ মিথ্যা, আবার একথাও বলছেন, জগতের উৎস হচ্ছে আনন্দ,

এবং সেই আনন্দই একমাত্র কাম্য। চরম সত্তা আনন্দময়তা,—জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

এখন যদি আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে, তাহলে সাধনা সহজ হয়। যখন আমরা আনন্দলাভের চেষ্টা করি বা আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছাতে চাই, তখন প্রকৃতির অশুভ শক্তিগুলির কথা ভুলে যাই, মনের হতাশা সংশয়ের মৃদু স্পন্দনগুলির কথা ভুলে যাই যখন আমরা কোন কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করি, তখন যদি জানি যে সেটি কাছেই আছে, নাগালের বাইরে নয়, তাহলে আর কোন প্রকার দুঃখকষ্টই বেশী ব'লে মনে হয় না, তখন আমরা কাঁদি না বা বিলাপ করি না। আমরা জানি, জীবনপথে দুঃখকষ্ট আসবেই। আমাদের সমস্ত চিন্তা আদর্শ উপলব্ধির জন্যই নিয়োজিত হয়। সমগ্র মন যখন সেই উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়, তখন কোন প্রকার দুঃখকষ্ট, কঠিন সংগ্রাম আমাদের ভয় দেখাতে পারে না; অন্ততঃ সাধনা অব্যাহত থাকে। এই হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা। ধর্মজীবনে এই হচ্ছে স্বাভাবিক মনোভাব।

হ্যাঁ, জীবনে প্রতিক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ভাব এরূপই হওয়া উচিত। সাংসারিক জীবনে যাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন, তাঁদেরও দেখা যায়—এই প্রকার মনোভাব; প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনেও এইরূপ। জীবনের অস্তিবাচক দিকটিই তাঁরা দেখেন। জীবনে আদর্শকে উপলব্ধি করার দিক থেকে তাঁরা চিন্তা করেন ব'লে তাঁদের সংগ্রাম ও তপস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে না। এ হ'ল একটা গতিশীলতা, সাধক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন! কখন কখন সংগ্রামের জন্যই জীবন বেশ উপভোগ্য হয়। হৃদয়ে যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, জীবন সম্বন্ধে যদি সুস্থ মনোভাব থাকে—আর যদি জানি লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে, তবে আমরা বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই ক'রে যেতে পারি। স্বভাবতই আমাদের দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যে—এ বিশ্বাস যদি না থাকে। কিন্তু লক্ষ্য তো নাগালের মধ্যে, সেখানে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব। আদর্শের আকর্ষণ, লক্ষ্যের মহিমা আমাদের ধরে রেখেছে। লক্ষ্যের মহিমা সর্বদা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে, তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কঠোর সংগ্রামকে আর সংগ্রাম ব'লে মনে হয় না, সেগুলি আর তত ভয়ঙ্কর বা দুঃখদায়ক ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু যখন আদর্শ সম্বন্ধেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা থাকে না, যখন জানি না কিসের জন্য আমাদের এত সাধনা, তখন জীবনের মরুপথে থেমে যাই এবং জীবন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। ধর্মজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাদের ধারণা অস্পষ্ট, ঈশ্বর বা চরম সত্তা সম্বন্ধেও যাদের সঠিক ধারণা নেই, তারা কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করলেও, তাদের সাধনা ভুল পথে চলেছে। সেইজন্য একটা অনিশ্চয় হতাশার পরিবেশে তাদের জীবন কাটতে থাকে।

আগেই বলেছি, পূর্বজন্মের অসৎ কর্মের ফল যাঁদের এই জীবনে ভোগ করতে হয়, তাঁদের ধর্মজীবন গঠনের জন্য কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন। 'অসৎ কর্ম' বলা উচিত নয়; বলা উচিত, পূর্বজন্মে অজ্ঞানের আধিক্য বশতঃ আধ্যাত্মিক জাগরণ তাদের একেবারেই হয়নি। যাঁরা পূর্বজন্মে সাধনা করেছেন, তাঁদের সংগ্রাম ক্রমশঃ কমে যায়। অজ্ঞানের আবরণ যদি খুব ঘন হয়, পূর্বজন্মে কিছুমাত্র সাধনাও যদি না করা থাকে, তাতেও কিছুই এসে যায় না; যদি আমরা সরল ও ব্যাকুল হই,

তবে এই জন্মেই শত জন্মের সাধনা ক'রে ফেলতে পারি। ধর্মজীবনে সাধনার ফল পরিমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় না, হয় গুণের দ্বারা। গত জন্মের যদি কিছুও না জমা থাকে, তবু একাগ্রতা দ্বারা আমরা অনেকখানি অর্জন করতে পারি। ঐকান্তিকতা ও আগ্রহের উপর এটি নির্ভর করে।

এখন আর একটি বিষয়ও বলা দরকার। যদি ভাগ্যবলে কোন সাধক জ্ঞানী পুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়, তবে তার সাধনা সহজ হয়ে যায়। বহু লোকের ধর্ম-জীবনে খুব পরিশ্রম করতে হয়, অথচ তাদের প্রচেষ্টা ঠিক দিকে পরিচালিত না হওয়ায় সার্থক হয়ে ওঠে না, কারণ তারা কোন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেনি। যদি তারা মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়, তবে ধর্মজীবনে কি করতে হবে এবং কিভাবে চলতে হবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়।

গীতায় একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা হয়েছে: 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কিভাবে কাজ করেন, কিভাবে চলেন, কিরূপ কথা বলেন?' যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেছেন, সাধনায় অনেক এগিয়ে গেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা অন্ততঃ এই শিক্ষা পেতে পারি, কিভাবে শক্তির অপচয় বন্ধ করা যায়, শক্তি অযথা ক্ষয় না ক'রে কিভাবে তাকে শুভকর্মের দিকে পরিচালিত করা যায়। বহু সাধুসন্তের জীবনে দেখা যায় সাধনার অতিশয় তীব্রতা! এর একটি কারণ এই যে, তাঁরা এমন কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি, যিনি সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন। তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মাত্র সম্বল করেই তাঁদের একাকী সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু যখন সাধক ঠিক পথের সন্ধান পান, তাঁর তপস্যা সহজ হয়ে যায় এবং বিপথে আবর্তিত হয় না।

তাই ভারতে গুরুর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি সত্য জেনেছেন। যাঁর এইরূপ গুরু লাভ হয়, তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। উপনিষদের যুগ থেকেই গুরুর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আলো থেকেই আলো জ্বলে, আধ্যাত্মিক জীবনেও একথা সমভাবে সত্য। এ কথা ঠিক যে প্রকৃত গুরু সচরাচর মেলে না। একজন সদ্‌গুরুর আশে পাশে বহু ভণ্ড গুরুর আবির্ভাব হয়। তাই প্রকৃত গুরুর সন্ধানের ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে।

যে সব সাধন-পদ্ধতিতে সাধককে একা একা সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে সাধনার তীব্রতা যখন বাড়ে, তখন একটা কিছু ভাবের ওপর সাধককে নির্ভর করতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বৌদ্ধধর্মে—যেখানে ঈশ্বরের কথা বিশেষ নেই, যেখানে সাধকের পুরুষকারের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, সেখানে সাধক বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা ক'রে থাকেন। অদ্বৈত বেদান্তে ভাবস্বরূপ চরম সত্যে উপনীত হবার জন্য সাধককে বুদ্ধি এবং দর্শনের ভাষায় চিন্তা করতে হয়। ভাবমূলক সাধনাই তীব্রতর হয়। এইরূপে যাঁরা পুরুষকারের উপর নির্ভর ক'রে চলেন, তাঁদের সাধনজীবন সত্যই কঠোর। যাঁরা এইভাবে সাধনা করেন, তাঁরা কিভাবে তাঁদের মন উচ্চে তুলে রাখেন? ত্যাগের দেবতা শিবকে তাঁরা ঈশ্বররূপে চিন্তা করেন, তাঁরই কাছে তাঁরা প্রার্থনা করেন। সাধনার এ এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

এই প্রকার সদ্‌গুরু লাভ না হ'লে সাধক কি করবে? পূর্বেই বলেছি যে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তির সাক্ষাৎ দুর্লভ, যিনি তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। এর অভাবে পরবর্তী প্রকৃষ্ট উপায়—শাস্ত্র থেকে সাধন-নির্দেশ নেওয়া; ঐকান্তিকতা ও সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে শাস্ত্র থেকে ঠিক ঠিক নির্দেশ পাওয়া যায়। ধর্মজীবন-গঠনে ঐকান্তিকতা ও অকপটতা থাকলেই শাস্ত্রের মর্মার্থ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং সাধনার প্রকৃত পথ পাওয়া যায়। অন্যথা শাস্ত্রচর্চা শুধু দার্শনিক বিচার ও বুদ্ধির দুর্বোধ্য কচকচিতে পরিণত হয়। কিন্তু ধর্মজীবন কয়েকটি সরল নিয়ম মেনে চলার উপরেই নির্ভর করে। সেইজন্য বলা হয়, বিশ্বাসের বলেই আমরা বেঁচে আছি। বেদান্তে এবং ভারতের অন্যান্য লোকপ্রিয় ধর্মেও বিশ্বাসের ওপরই জোর দেওয়া হয়। আমার

মনে হয়, সকল ধর্মই বিশ্বাসের ওপর খুব জোর দেয়। বিশ্বাস কিরূপে আমাদের ধরে থাকে? যখন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন শাস্ত্রপাঠের বা মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনার সময় আমরা উদ্দীপনা লাভ করি।

কখন কখন সরল বিশ্বাসের উপরই সমগ্র ধর্মজীবনটিই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন আমরা অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই এবং সাধনা কঠিনতর হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? সঙ্গে সঙ্গে সবাই ব'লে উঠবে, 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান্।'—ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্র রয়েছেন, তিনি সব কিছু জানেন, এবং সমস্ত শক্তির আধার তিনি। ঈশ্বর যদি সর্বত্র আছেন এবং সব কিছু জানেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের সংগ্রামের কথাও জানতে পারছেন; আর ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্ হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শয়তানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তবে আমরা ভয় পাব কেন? আমরা বার বার উচ্চারণ করি, 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী'। ছোট ছেলেরাও ঈশ্বর সম্বন্ধে রচনায় এগুলি লিখে থাকে। কথাগুলি খাঁটি সত্য—সাধুসন্তের অনুভূতি। আর এ যদি সত্যই হয়, তবে জীবনে এর অর্থ কি? কেন আমরা জীবন-সংগ্রামে ভীত হব? জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে? জীবন হবে সুস্থ, আনন্দময়।

সাধুসন্তদের জীবন থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? খৃষ্ট বলেন, 'আমার বোঝা হাল্কা, এ বোঝা বহন করা সহজ।' এর মানে কি? এর মানে—যদি আমাদের ব্যাকুলতা ও সরলতা থাকে, তবে সাধন সহজ হয় এবং তাতে আনন্দই পাওয়া যায়; ভার হাল্কা হয় এবং বহন করা সহজ। একহার্ট বলেছেন, 'ঈশ্বরের কাছে যেতে তোমার যা আগ্রহ, তার থেকে সহস্রগুণ বেশী আগ্রহ তাঁর তোমাকে ধরা দিতে। তুমিই তাঁর থেকে দূরে চলে যাচ্ছ।' বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষ-বাণী উদ্ধৃত ক'রে দেখালাম, একই সারবস্তু সর্বত্র। সাধনা যদি ঠিক পথে স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয়, তবে আধ্যাত্মিক জীবন তত কঠিন নয়।

গীতায়ও একই ধরনের চিন্তাধারা দেখা যায়। হতাশ অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতেই গীতার আরম্ভ। আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ধর্মজীবনে এই রকম হতাশ হয়ে পড়ি। মনে করি, এ জীবন কঠিন সংগ্রাম অথবা সুদীর্ঘ পথে যাত্রা! কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফল চাই, পাই না; আমরাও এক একজন অর্জুন, অন্ততঃ হতাশার দিক দিয়ে। গীতার প্রথম শিক্ষা: ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!—যুধ্যস্ব, যুদ্ধ কর। উপসংহারে গীতার শিক্ষা: প্রত্যেক কর্মের ভাল মন্দ দুটি দিক আছে। যা কিছু সব আমাকে সমর্পণ কর। আমার ওপর নির্ভর কর, আমি তোমার সকল ভার বহন ক'রব। গীতার মধ্যভাগে একটি শ্লোকে পাই। যদি অনন্যা ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তাঁকে পাওয়া সহজ হবে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, 'আমার এত দোষত্রুটি, আমি কিরূপে আশা করতে পারি যে, আমি একদিন সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারব?' সাধনাকালে দোষত্রুটি অপূর্ণতাগুলি চোখের সামনে ফুটে উঠবে, এ তো স্বাভাবিক। গীতায় এর উত্তর পাই: অত্যন্ত দুরাচারী মহাপাপীও যদি ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে, তবে তার সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তে দূর হবে। বলা হয়ে থাকে, যদি হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালো তো সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বর আমার কাছে আনন্দময়ী মা। দেখ, আমরা সর্বদা ভাবি, মায়ের ভালবাসার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। শান্তিময়ী মা আনন্দস্বরূপিণী। হতাশার ভাব নিয়ে যখন কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত, তিনি বলতেন: তিনি তোমার আপন মা। শিশুর যেমন সব অবস্থাতেই মায়ের ভালবাসার উপর দাবি আছে, আমাদেরও তেমনি আনন্দময়ী জগজ্জননীর ভালবাসার উপর দাবি আছে, তবে কেন উদ্বিগ্নবোধ করবে?—এই (নিরুদ্বেগ ভাব) হচ্ছে ধর্ম-জীবনের ঠিক ঠিক ভাব, স্বাভাবিক ভাব। একেই বলা হয়—ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপ-দর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

তখন অর্জুন সেখানে অনেক (সুন্দর) মুখ দেখিলেন—যাহা রমণীয় রাজভবনের ন্যায় (উজ্জ্বল) অথবা যেন লাবণ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে, কিংবা যেন আনন্দের বন শোভা পাইতেছে—যেন সৌন্দর্যের সাম্রাজ্যলাভ হইয়াছে, এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন দেখিলেন ; তাহারই মধ্যে কোন কোন মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর, মনে হয় যেন কালরাত্রির সৈন্য চড়াও করিয়াছে, কিংবা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ভয়ের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বীর অর্জুন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন, সেখানে অন্য সাধারণ আকারের মুখও ছিল, অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অন্ত পাওয়া গেল না, তখন কৌতুকে নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; নানা বর্ণের কমলবন যেন বিকশিত হইয়া আছে, অর্জুন এইরূপ সূর্যের পঙ্‌ক্তির ন্যায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন। ২০০

কল্পান্তের সময় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি ভ্রূর নীচে অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের আশ্চর্য বস্তু দেখিয়া দর্শনের অনেকতা সম্বন্ধে অর্জুনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল। তখন তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, ইঁহার চরণ কোথায় ? মুকুট কোন্ দিকে, বাহুই বা কোথায় ? এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীরভাবে বাড়িতে লাগিল ; ভাগ্যবান্ পার্থ, তাঁহার মনোরথ কি বিফল হইবে ? পিনাকপাণি শঙ্করের তূণে কি নিষ্ফল বাণ থাকিতে পারে ? অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষর থাকে ? সুতরাং এই অপার স্বরূপের আদ্যন্ত অর্জুন দেখিলেন ; বেদ যাঁহার অন্ত পায় না, তাঁহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব) অর্জুনের দুটি নয়ন একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল ; চরণ হইতে মুকুট পর্যন্ত তিনি নানা রত্ন অলঙ্কারে সুশোভিত এই বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য দেখিতে লাগিলেন ; আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য পরব্রহ্ম স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হইয়া আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়া বর্ণনা করিব ? যাঁহার প্রভার ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রাদিত্যমণ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, যে মহাতেজ বিশ্ব প্রকট করে, সেই মহাতেজের যাহা জীবন—সেই দিব্যতেজরূপ শোভা কাহার বুদ্ধিগোচর হয় ? দেবতা নিজেই আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া আছেন,—বীর অর্জুন তাহাই দেখিলেন। ২১০

পুনরায় যখন জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সবল করপল্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাহাদের এমন শস্ত্রে সজ্জিত দেখিলেন, যাহা কল্পান্তের জ্বালা (অগ্নি) নিবাইতে পারে; যাহার কিরণের তীব্রতায় নক্ষত্রগুলি ভাজা ছোলার ন্যায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়া অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করে, যেন কালকূটের তরঙ্গে লিপ্ত অথবা যাহাতে মহা বিদ্যুতের অরণ্যের উদ্ভব হইয়াছে—এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত, শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১॥

যেন ভীত হইয়া সেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কিরীটী কণ্ঠ ও মুকুট দেখিতে লাগিলেন, যেখান হইতে (মনে হয়) কল্পতরুর সৃষ্টি হইয়াছে; যে মহাসিদ্ধির মূলপীঠে কমলা শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে যান, তেমনি অত্যন্ত নির্মল ও সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ (কণ্ঠ ও মস্তকে) ধারণ করিয়া আছেন,—দেখিলেন মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পূজোপচার বাঁধা, কণ্ঠে সুন্দর দিব্য পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে, যেন সূর্যতেজ স্বর্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে; যেন মেরুপর্বতকে স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে, পরিহিত পীতাম্বর তেমনি ঝল্‌কাইতেছে; যেন কর্পূর দ্বারা (গৌরবর্ণ) শ্রীমহাদেবের গাত্র মার্জনা করা হইয়াছে, কিংবা কৈলাসকে (ধবলগিরিকে) পারদ দ্বারা লেপন করা হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে দুগ্ধ-শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা হইয়াছে; কিংবা যেন চন্দ্রমার ভাঁজ খুলিয়া গগনের উপর ওড়্‌না পরানো হইয়াছে—তাঁহার সর্বাঙ্গ তেমনিভাবে চন্দনচর্চিত দেখিলেন; যাহা (যাহার সুগন্ধ) প্রকাশের কান্তি বৃদ্ধি করে, ব্রহ্মানন্দের তেজ শান্ত করে—যাহার সুরভিতে পৃথ্বী জীবন প্রাপ্ত হয়। ২২০

যাহার লেপনে নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম যাহা সর্বাঙ্গে ধারণ করেন—তাহার (সেই চন্দনের) সুগন্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে? এইভাবে এক একটি শোভা দেখিতে দেখিতে অর্জুন এমন হতবুদ্ধি হইলেন যে, ভগবান বসিয়া আছেন, কি দাঁড়াইয়া আছেন, কি শয়ন করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই মূর্তিময় দেখিতে পান, আর না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও অন্তরে তাহাই দেখেন; সম্মুখে বিশাল রূপ দেখিয়া, ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও শ্রীমুখ কর ও চরণ তেমনিভাবে দেখিতে পান; অহো, চক্ষু মেলিয়া দেখিলে সব কিছুই দেখা যায়। ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? পরন্তু না দেখিলেও দেখা যায়, ইহা শুনিতেও আশ্চর্য! চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ভগবান কেমন অনুগ্রহ করিলেন,—পার্থের দেখা না দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন; অর্জুন সর্বসময়েই নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। সুতরাং এক আশ্চর্যের বন্যায় পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আসিতেই অন্য এক চমৎকারের মহার্ণবে গিয়া পড়িলেন। এইভাবে অনন্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অসাধারণ দর্শন-কৌশলে অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তো স্বভাবতই বিশ্বতোমুখ। আর ইহা দেখাইবার জন্যই অর্জুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বময় হইয়া গেলেন। আর শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি অর্জুনকে যে (দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহা এমন নহে যে দীপ বা সূর্যের প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, না থাকিলে দেখা বন্ধ হইবে। ২৩০

অতএব কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়া বা মুদ্রিত করিয়া) দেখিতে পাইয়াছিলেন, জানিবেন।—ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, আরও বলিলেন, 'অধিক কি বলিব? শুনুন, কি ভাবে পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।'

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

ঐ অঙ্গপ্রভার অসাধারণ তেজ কাহার সমান বলিয়া বর্ণনা করা যায়? কল্পান্তে দ্বাদশ সূর্য যেমন একত্রে মিলিয়া যায়, সেইরূপ সহস্র সূর্য যদি এক সময়ে আকাশে উদিত হয়, তাহার তেজ এই (অঙ্গপ্রভার) তেজের মহিমার সহিত উপমার যোগ্য। সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র করা যায়, আর প্রলয়াগ্নির সমস্ত উপাদান যদি একত্র মিলিত করা হয়, এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ মিশ্রিত করা হয়, তথাপি ঐ অঙ্গপ্রভার সহিত তুলনায় সেই তেজও স্বল্পই হইবে, আর অন্য কোন তেজই উহার ন্যায় নির্মল হইবে না। এমনই শ্রীহরির স্বাভাবিক মাহাত্ম্য, তাঁহার সর্বাঙ্গের তেজ যাহা সর্বত্র বিকশিত হইয়াছিল, তাহা (ব্যাস) মুনির কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

আর এই বিশ্বরূপের একদিকে সারা জগতের বিস্তার—সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল; কিংবা আকাশে গন্ধর্বনগরের ন্যায়, অথবা ভূতলে পিপীলিকার নির্মিত ঘরের ন্যায়, অথবা মেরুপর্বতের উপর পতিত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায়; সেইরূপ দেবচক্রবর্তীর শরীরে অর্জুন সেই সময় সারা জগৎ দেখিতে পাইলেন। ২৪০

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

তখন বিশ্ব এক আর আমি এক—এই যে সামান্য দ্বৈতভাব ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সহসা দ্রবীভূত হইল, অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। বর্ষাকালের প্রারম্ভে জলধারায় পর্বতের সর্বাঙ্গে যেমন কোমল অঙ্কুর বাহির হয়, তেমনি তাঁহার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইল। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে যেমন সোমকান্ত মণি দ্রবীভূত হয়, তেমনি তাঁহার শরীরে স্বেদবিন্দু নির্গত হইল; কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহা জলের উপর আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি শ্বাসোর্মির বেগে কাঁপিতে লাগিলেন। কর্পূরকদলীর বহিরাবরণ ফাটিয়া গেলে যেমন ভিতরে ভরা কর্পূরের কণা বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলে তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের রাজ্য লাভ হইল। চন্দ্রের উদয়ে ভরা সমুদ্রও যেমন ভরিয়া উঠে, তেমনি তিনি (আনন্দের) তরঙ্গে বারংবার উচ্ছলিত হইতে

লাগিলেন। ঐরূপ সুখানুভবের পরেও অর্জুনের দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব থাকিল এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তদনন্তর যেদিকে ভগবান বসিয়াছিলেন, সেইদিকে মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন। (২৫০) অর্জুন উবাচ :

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুন তখন বলিলেন : হে স্বামিন্, আপনার জয়-জয়কার করিতেছি, আপনি আশ্চর্য কৃপা করিয়াছেন, যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্য) মানুষ বিশ্বরূপ দেখিলাম ; পরন্তু হে প্রভু, আপনি সত্যই ভাল করিয়াছেন, আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে, আপনিই যে এই সৃষ্টির আশ্রয় তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। হে দেব, মন্দর-পর্বতের অঙ্গে স্থানে স্থানে যেমন শ্বাপদসমূহ থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভুবন (ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মাদি লোক) দেখিতেছি। অহো, আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখা যায়, অথবা মহাবৃক্ষের উপরে যেমন অগণিত পক্ষীর বাসা থাকে, তেমনি হে শ্রীহরি, আপনার এই বিশ্বাত্মক শরীরে সুরগণপূর্ণ স্বর্গলোক দেখা যাইতেছে ; হে প্রভু, এখানে আমি পঞ্চমহাভূতের এবং ভূতগ্রামের জন্ম দেখিতেছি। হে প্রভো, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,—দেখিলে কি চতুরানন সেখানে নাই ? আর একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাসও এখানে আছে ; আপনার এক অংশে ভবানীসহ শ্রীমহাদেবকে দেখা যাইতেছে, আর হে হৃষীকেশ, আপনার (বিশ্বরূপের) মধ্যে আপনাকেই দেখিতেছি। কশ্যপাদি ঋষিকুল, এবং নাগকুলসহ পাতালও আপনার স্বরূপে দেখা যাইতেছে। অধিক আর কি বলিব ? হে কৈবল্যপতি, আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুর্দশ ভুবন সমাবিষ্ট হইয়া আছে, দেখিতেছি। (২৬০) আর ঐ ভুবনের যে যে লোক আছে, তাহাদেরও অনেক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—এইভাবে আপনার অলৌকিক গাম্ভীর্য দেখা যাইতেছে।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, আকাশে যেন অনেক বাহুদণ্ড অঙ্কুরের ন্যায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটি বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত ব্যাপার করিয়া যাইতেছে। মহাশূন্যের বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার রচনা করা হইয়াছে, আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে ; সহস্রশীর্ষের ফণা যেন একই সময়ে কোটীসংখ্যক দেখাইতেছে ; কিংবা যেন পরব্রহ্মরূপ বৃক্ষ বিবিধ বদনরূপ অসংখ্য ফলভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে ; হে বিশ্বমূর্তি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি। তদনুযায়ী অনেক নেত্রপঙ্‌ক্তিও দেখা যাইতেছে। আর অধিক কি বলা যায় ? স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দিক্‌সকল, আকাশ প্রভৃতি ভেদ ঘুচিয়া গিয়া সকলই মূর্তিময় দেখাইতেছে। কোন দিকে কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম অবকাশও দেখা যাইতেছে না, আপনি এমনি সর্বব্যাপক হইয়া আছেন। নানাবিধ ও অগণিত মিলিত মহাভূতের সমষ্টি হে অনন্ত, সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,

দেখিতেছি। আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান, আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড় ? ২৭০

আপনার রূপ, অবয়ব কি প্রকার, আপনার ওপারে আর কি আছে, আপনি কিসের উপর অবস্থিত, আপনার আধার কি ?—এই সব কথা বিচার করিয়া দেখিলাম, হে দেব, আপনিই এই সারা বিশ্বময় হইয়া আছেন, আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিদ্ধ ; আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হ্রস্বও নহেন। হে বৈকুণ্ঠ, উপরে নীচে—শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই ন্যায়, আপনিই আপনার পরিমাণ, হে পরেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই। কিং বহুনা, হে অনন্ত, আপনিই আপনার সব কিছু—ইহা আমি বারংবার দেখিয়াছি ; পরন্তু হে প্রভু, আপনার রূপের মধ্যে যে একটি ন্যূনতা দেখিলাম ; তাহা এই যে, ইহাতে আদি, মধ্য ও অন্ত—এ তিনটিই নাই। সর্বত্র খুঁজিয়া কোথাও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই। এই ভাবে হে আদিমধ্যান্তরহিত, হে অনন্ত (অপরিমিত) বিশ্বেশ্বর, আমি তত্ত্বতঃ আপনার বিশ্বরূপ দেখিলাম ; আপনার মহামূর্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মূর্তি প্রকট হইয়াছে ; মনে হইতেছে যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন। হে দেব, মনে হয় যেন আপনি একটি মহাসমুদ্র, যাহার উপর মূর্তিরূপ তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, কিংবা আপনি একটি সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে নানা মূর্তিরূপ ফল ফলিয়াছে। ২৮০

হে প্রভো, পৃথ্বীতল যেন ভূতগণে ভরিয়া আছে, গগন যেমন নক্ষত্রে ছাইয়া আছে, তেমনি আপনার রূপ মূর্তিময় দেখাইতেছে। অহো, এক একটি মূর্তির অঙ্গপ্রান্তে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে—এইরূপে বৃহৎ মূর্তিসকল আপনার অঙ্গের রোমকূপে প্রকট হইতেছে ; এইরূপ বিশ্বের চিন্তার রচনাকারী আপনি কে এবং কোথাকার—ইহা জানিতে চাহিলে দেখিতেছি, আপনি আমারই সারথি ; হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মূর্তি ধারণ করেন ; এই চতুর্ভুজ শ্যামল মূর্তি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্দ্র হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে দুই বাহুর মধ্যেই ধরা যায় ; হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও কি এমন সুন্দর মূর্তি ধারণ করেন—কি আমাদের স্বল্প দৃষ্টিই আপনাকে ছোট করিয়া দেখে ? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়া গিয়াছে, আপনি সহজে দিব্য জ্ঞানের প্রসাদ দান করিয়াছেন। এইজন্য আপনার রূপের মহিমা দেখিতে পাইলাম ; পরন্তু আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, (রথের) মকরাকার মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আপনিই এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

হে শ্রীহরি, আপনার মস্তকে যে মুকুট ধারণ করিয়া আছেন, তাহা কি সেই পূর্বের মুকুটই নহে ? পরন্তু ইহার তেজ ও বিশালতা অতিশয় আশ্চর্য মনে হইতেছে। হে বিশ্বমূর্তি, আপনার উপরের হস্তে যথারীতি ঘূর্ণায়মান চক্র সম্বরণ করিয়া আছেন,—ইহার চিহ্ন প্রকট। (২৯০) অন্য

দিকে কি উহা গদা নহে? আর হে গোবিন্দ, নীচের দুই নিরস্ত্র বাহু অশ্ব-বল্‌গা একত্র করিয়া ধরিয়া প্রসারিত হইয়া আছে। হে বিশ্বেশ, আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্যই আপনি সহসা একেবারে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন—ইহা আমি জানি; পরন্তু আমার বিস্ময় উৎপাদন করাইবার কি অভিনব এই ব্যাপার! আমার চিত্ত এই আশ্চর্যে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। ইহা এখানে আছে কি নাই, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না; অঙ্গপ্রভার এমন অভিনব শোভা যে, চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। ইহাতে অগ্নির দৃষ্টি ঝলসাইয়া গিয়াছে, অগণিত (কোটী কোটী) সূর্য নিষ্প্রভ হইয়াছে—এই তেজের এমন অদ্ভুত তীব্রতা! অহো, যেন প্রকাশের মহার্ণবে সমস্ত সৃষ্টি ডুবিয়া গেল, কিংবা প্রলয়কালের বিদ্যুতের আবরণে যেন সারা গগন ঢাকিয়া গেল; অথবা সংহার-তেজের জ্বালা (অগ্নি) ভাঙিয়া তাহা দ্বারা যেন আকাশে একটি মঞ্চ বাঁধা হইয়াছে, এখন দিব্য জ্ঞানের দৃষ্টি দ্বারাও দেখা যাইতেছে না। ইহার তীব্রপ্রভা অতিশয় বাড়িতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি অত্যন্ত দহন করিতেছে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দিব্য চক্ষুরও ত্রাস হইতেছে; অথবা এই মহাতেজের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যাহা কালাগ্নি রুদ্রের তৃতীয় নেত্রে গুপ্ত থাকে, তাহা যেন ঐ নেত্রের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই তেজের দাহিকা ও প্রকাশ শক্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ায় পঞ্চাগ্নির জ্বালা সারা ব্রহ্মাণ্ডকে অঙ্গারে পরিণত করিয়াছে; (৩০০) এমন অদ্ভুত আশ্চর্য তেজোরাশি আমি এই প্রথম দেখিলাম। হে প্রভু, আপনার ব্যাপ্তি কিরূপে পার হওয়া যায়, জানি না।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

হে দেব, আপনি অক্ষর (অবিনাশী), আপনি (ওঁকারের) সার্ধ ত্রিমাত্রার অতীত, শ্রুতি যাহার স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, যাহা সর্ব আকারের মূলঘর, যাহা সারা বিশ্বকে একত্রে রাখিবার নিধান (মূলাধার), আপনি অব্যক্ত, গহন, অবিনাশী; আপনি ধর্মের স্নেহাংশ (জীবন), অনাদিসিদ্ধ, নিত্য নব, (ছত্রিশতত্ত্বের বাহিরে) সপ্তত্রিংশতত্ত্ব, আপনি নিশ্চিত পুরাণ (সনাতন) পুরুষ,—ইহা আমি জানিয়াছি।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

আপনি আদিমধ্যান্ত-রহিত, স্বসামর্থ্যে আপনি অনন্ত, আপনি বিশ্ববাহু, বিশ্বচরণ, আপনি অপরিমেয়; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, আপনি কোপ ও প্রসাদের লীলা প্রদর্শন করিতেছেন; হে গোপাল, প্রথমটির দ্বারা আপনি শাসন করিতেছেন, অপরটির দ্বারা সর্বভূত পালন করিতেছেন। হে প্রভো, এইভাবে আমি আপনার যথার্থ রূপ দেখিতেছি, আপনার এই মুখ প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির তেজের ন্যায়। পর্বতে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে যেমন সমস্ত জ্বালাইয়া অগ্নির শিখা বাহির হয়, তেমনি আপনার লোল জিহ্বা আপনারই দংষ্ট্রাদন্ত চাটিতেছে; এই বদনের প্রদাহে ও সর্বাঙ্গকান্তির প্রভায় সারা বিশ্ব উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, আকাশ, চারিদিক ও চারি কোণ—আগ্নেয়, নৈঋর্ত্য, বায়ব্য ও ঈশান—উপদিশা সহ সমস্ত দিক্‌চক্র (৩১০) এ সমস্ত এক আপনার মধ্যেই ভরিয়া আছে—আমি কৌতুকে দেখিতেছি, পরন্ত সমস্ত গগন যেন আপনার ভয়ানক স্বরূপে ডুবিয়া গিয়াছে। অথবা (আপনার) অদ্ভুত রসের তরঙ্গে যেন চতুর্দশ ভুবনই বেষ্টিত হইয়াছে, এমনই আশ্চর্য এই রূপ—ইহাকে আমি বুঝিব কিরূপে? অহো, এই অসাধারণ ব্যাপ্তির কোন সীমা নাই। এই তেজের উগ্রতা সহ্য করা যায় না; সুখ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণ ধারণ করিবে কিরূপে?

অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্‌ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

হে দেব, জানি না কেমন ভাবে আপনার এই রূপ দেখিয়া ভয়ের বন্যা আসিয়াছে—এখন ত্রিভুবন দুঃখের তরঙ্গে দুলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনে ভয় ও দুঃখের সংযোগ হইবে—ইহা হইতেই পারে না; যে জন্য হয় না, তাহা আমার জানা আছে। যতক্ষণ আপনার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক সুখদুঃখ, ভালমন্দ; এখন আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে বিষয়বাসনা মিটিয়া গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার এই রূপ দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন করা যায়? আর যদি আলিঙ্গন নাই করা যায়, তবে এই সঙ্কটে থাকিব কিরূপে? পশ্চাতে সরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার (দুঃসহ) স্বরূপ, যাহা সহ্য করা যায় না; এইভাবে, দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ত্রৈলোক্য অগ্নিদগ্ধ হইতেছে,—এই অগ্নির জ্বালা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি; যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বালা মিটাইবার জন্য কেহ সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়া অধিকতর ভীত হয়। (৩২০)

এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার রূপ দেখিয়া টল্‌মল্ করিতেছে। ইহারই মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগণের সম্মেলন দেখিতেছি। আপনার অঙ্গের তেজে ইঁহারা সর্ব কর্মের বীজ জ্বালাইয়া, স্বতঃ সদ্‌ভাবপ্রণোদিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হইতেছেন। আর কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভয়ভীত হইয়া, সর্বভাবে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে দেব, আমরা প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়-জালে আবদ্ধ হইয়াছি, স্বর্গ ও সংসার এই দুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি। এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের উদ্ধার করিবে? হে দেব, আমরা সর্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম'—আর দেখিতেছি মহর্ষি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিদ্যাধরসমূহ আপনার স্বস্তিবাদ করিয়া স্তুতি করিতেছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্রাদিত্যসমূহ, (অষ্ট) বসু, সাধ্যদেব (ধর্ম ও সাধ্যার পুত্রগণ) বিশ্বদেব (ধর্ম ঋষি ও বিশ্বার দশ পুত্র), অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুৎ-আদি সমস্ত দেবগণ, অগ্নি ও গন্ধর্বগণ, ওদিকে সর্ব রাক্ষসগণ, মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাসমূহ ও সিদ্ধাদি—ইঁহারা সকলেই আপন আপন লোক হইতে আপনার সৌম্যাঙ্গ (প্রশান্ত) দৈব মহামূর্তি (বিশ্বরূপ) দেখিতেছেন। এইভাবে

আপনাকে দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অন্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটমণ্ডিত মস্তক নত করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন। (৩৩০) তাঁহারা কলরব করিয়া আপনার জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত হইতেছে,—তাঁহারা করজোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইতেছেন; বিনয়রূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্ত্বিক ভাবের বসন্ত ঋতু সুশোভিত হইতেছে,—এইজন্য ইঁহাদের করসম্পুটরূপ পল্লবে আপনিই ফল হইয়া আছেন; হে প্রভু, আমার নয়নের ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের সুদিনের প্রভাত হইল,—কারণ আপনার এই অগাধ বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল। এই লোকব্যাপক রূপ দেখিয়া দেবগণও ভীত হইয়াছেন– যেদিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, এই রূপের সম্মুখ ভাগই দেখা যাইতেছে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥ ২৩ ॥

মূর্তি একটিই, পরন্তু ইহার বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ। বহুলোচন ও সশস্ত্র অনন্ত বাহু, অসংখ্য চরণ, বহু উদর ও নানাবর্ণ; প্রত্যেক মুখে কেমন আবেশের মত্ততা দেখা যায়; অহো, যেন মহাকল্পের অন্তে যেখানে সেখানে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। যেন অগ্নিকুণ্ডের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে; অথবা যেন ত্রিপুরারি শঙ্করের সংহার করিবার শস্ত্রাস্ত্র, কিংবা প্রলয়-ভৈরবের ক্ষেত্র (স্থান), অথবা যুগান্তচক্রের পাত্র—যাহাতে পঞ্চভূতের খেচরান্ন পরিবেশন করা হয়; এইভাবে যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে; গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ বাহির হইলে যেমন দেখায়, তেমনি আপনার উগ্রদশনরাজি (মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া) ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে; কালরাত্রির আঁধারে—যেমন সংহারে উদ্ধত পিশাচগণ অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি আপনার মুখাভ্যন্তরে দন্তপঙ্‌ক্তি প্রলয়-রুধিরে রঞ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে। ৩৪০

আর অধিক কি বলা যায়? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সমস্ত সংহার করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে, তেমনি আপনার বদনের অতি ভয়ঙ্কর ভাব; এই বেচারী ভূত-সৃষ্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাকে দুঃখ-কালিন্দীর তটে (বিষদগ্ধ) বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে; আপনার এই মহামৃত্যুর সাগরে এখন এই ত্রিলোক শোকদুঃখের লহরীতে আন্দোলিত হইতেছে; হে বৈকুণ্ঠ, ইহাতে যদি আপনি ক্রোধ করিয়া কদাচিৎ বলেন, 'অন্য লোকের চিন্তায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি ধ্যান কর ও বিশ্বরূপদর্শন-সুখ ভোগ কর', তবে বৃথাই সাধারণ লোকের কথা-রূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, আমারই প্রাণ কাঁপিতেছে। আমাকে রুদ্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায়; সেই আমি থরথর করিয়া কাঁপিতেছি, এরূপ কখনও হয় নাই। পরন্তু হে হরি, ইহা এক আশ্চর্য মহামারী স্বরূপ। এই বিশ্বরূপের নামে ইহা ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এমনি আপনার কোন ক্রুদ্ধ মুখ এত বিস্তৃত যে, স্বর্গও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে পারে না, ত্রিভুবনের বায়ুও ইহাকে বেষ্টন করিতে পারে না, এই (মুখনিঃসৃত) বাষ্পের জ্বালা চরাচরকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে একটি অন্য একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও প্রভেদ আছে। অহো! প্রলয়কালের বহ্নি ইহাদেরই সাহায্য লয়। ৩৫০

ইহার অঙ্গের তেজ এত অধিক যে, ত্রৈলোক্য ভস্মীভূত করিতে পারে; ইহার অতি বিশাল মুখ এবং মুখের মধ্যে দন্ত ও দংষ্ট্রা; (মনে হইতেছে) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রে মহাবন্যা আসিয়াছে, অথবা যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদ্গার করিতে উদ্যত হইয়াছে। হলাহল বিষ যেন অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তেমনি এই বদনে সংহার-তেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। পরন্তু, ইহা কত বিশাল! যেন অন্তরাল ভাঙিয়া পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে। কিংবা বসুন্ধরাকে কুক্ষিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শঙ্কর (পাতালের মহাদেব) যেমন পাতালের গুহা খুলিয়া প্রকট করিয়াছিলেন, তেমনি আপনার বক্ত্রের বিকাশ, মধ্যস্থলে জিহ্বার ক্ষোভ—সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না, ঐ মুখে কোন গ্রাস ভরিতেছেন না; আর যেমন পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জ্বালা উঠিয়া আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করে, তেমনি এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া আছে, দেখা যাইতেছে প্রলয়কালের বিদ্যুৎসমূহ যেমন বাহির হইয়া গগনের (মেঘনির্মিত) দুর্গ-প্রাকার রঞ্জিত করে, তেমনি ওষ্ঠের বাহিরে বক্র দংষ্ট্রাগুলি (ভীষণ) দেখাইতেছে; ললাট-পটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় দেখাইতেছে, অথবা মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া আছে; এইরূপ মহাভীতিপ্রদ আপনার ঐশ্বর্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য করিতেছেন জানি না, পরন্তু আমার প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল। ৩৬০

হে দেব, আমি যে বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে; হে প্রভু, আমার নয়ন সেই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে। অহো, এই পার্থিব দেহ যদি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের দুঃখ? পরন্তু, এখন আমার চেতনা যাইতে বসিয়াছে। সাধারণতঃ ভয়ে শরীর কাঁপিতে পারে, কিছু কালের জন্য মনও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে পারে, অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে। পরন্তু ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহা কেবল আনন্দস্বরূপ, সেই নিশ্চল অন্তরাত্মাও শিহরিয়া উঠিয়াছে। হে তাত, সাক্ষাৎ দর্শনের কি প্রভাব! জ্ঞান দেশছাড়া হইয়াছে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধও টিকিবে কিনা সন্দেহ; হে দেব, আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে সম্বরণ করিবার জন্য আমি নিজেকে ধৈর্যের আচ্ছাদনে ঢাকিতেছি। তাহাতে আমার ধৈর্যই লয়প্রাপ্ত হইতেছে, যেন তাহারও বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে! আর অধিক কি বলিব? পরন্তু আমার খুব ভাল শিক্ষা হইল। বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে, পরন্তু কোন দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না; বিশ্বরূপ এই চরাচর জগতের ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছেন, হে মহাবিষ্ণু, ইহা না বলিয়াই বা কি করি?　　[ক্রমশঃ]

মনের রহস্য

স্বামী সুন্দরানন্দ

মানুষের মনই আসল মানুষ; স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর আবরণমাত্র। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় 'রাজযোগে' বলিয়াছেন, "মনোনামধেয় আন্তরিক সূক্ষ্ম শক্তি বাহির হইতে স্থূল ভূত লইয়া শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে।" মন ভিন্ন স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর কিছুই করিতে পারে না। চেতনা-অচেতনা, জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, চিন্তা-অচিন্তা, ভক্তি-অভক্তি, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, বন্ধুতা-বৈরিতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ যে মনেরই এক একটি রূপ, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইরূপ অসংখ্য ভাবের একসঙ্গে সমাবেশ মনের বৈশিষ্ট্য এবং কল্পনাতীত শক্তির পরিচায়ক। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রায় সকল ক্রিয়াই মনদ্বারা সম্পন্ন হয়। মন সংযুক্ত না হইলে কোন মানুষেরই দেহ-সম্পর্কিত অধিকাংশ ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। এইজন্য 'সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহে'র সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়: "অন্তর্বহিশ্চার্থমনেন বেত্তি। শৃণোতি জিঘ্রত্য-মুনৈব চেক্ষতে বক্তি স্পৃশত্যত্তি করোতি সর্বম্॥" মনদ্বারাই মানুষ আন্তর ও বাহ্য বস্তু অবগত হয়, সকল শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে এবং সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই কারণে 'যোগ-বাশিষ্ঠ' প্রচার করেন: "মনোমাত্রমতো বিশ্বম্"—এ জগৎ মনোমাত্র এবং ইহা সমর্থন করিয়া 'বিবেকচূড়ামণি' বলেন, "ভোক্তাদি-বিশ্বং মন এব সর্বম্"—ভোক্তা ভোগ্য সবই মন। এই ভাবসমূহ পরিস্ফুট করিয়া 'পঞ্চদশী' ঘোষণা করেন, "যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যঃ"—মন যেরূপ প্রাণী সেইরূপ। সুতরাং "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ (জীব) মনোময় বা মনপ্রধান, এই শ্রুতিবাক্য সর্বাংশে সত্য। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের অত্যন্ত প্রাধান্যের জন্য গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"—ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন। এই কারণে মানুষের সূক্ষ্ম শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতজাত অতিসূক্ষ্ম পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়—এই সপ্তদশ অবয়বে গঠিত হইলেও 'কারিকোপেত-মাণ্ডূক্যোপনিষৎ' অতি উচ্চকণ্ঠে উহাকে মন মাত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আচার্য শংকর উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "লিঙ্গং মনঃ"—মন অর্থ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহ। ইহা আত্মারই উপাধি বলিয়া ইহাকেও আত্মা বলা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা মনে মানুষের জন্মজন্মান্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মের ফল সমবেত এবং পূর্ব পূর্ব ও ইহজন্মের সর্ববিধ মানসিক ক্রিয়ার ফল পুঞ্জীভূত সংস্কার-আকারে লুক্কায়িত। এই কারণে "বন্ধশ্চ মোক্ষো মনসৈব পুংসাং"—মনের দ্বারাই মানুষের বন্ধন ও মুক্তি হয়। বিশুদ্ধ (রজ-স্তমোগুণবিহীন) সত্ত্বগুণপ্রধান মনদ্বারা মোক্ষ এবং অশুদ্ধ মলিন (রজঃ ও তমোগুণযুক্ত) মনদ্বারা বন্ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য জগতে মনের তুল্য অমিত শক্তিশালী রাহস্যিক সত্তা আর কিছু দেখা যায় না। মনের প্রাগুক্ত

সংস্কারই মানুষের ইহ ও পরজন্মের একমাত্র কারণ। মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম শরীর সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী বারংবার স্থূল শরীর ধারণ করে। মন শুদ্ধ হইলে উহার সংকল্প একেবারে চলিয়া যায়; তখন আর মন থাকে না, ইহা শুদ্ধ চৈতন্যে পরিণত হইয়া মুক্ত হয়। এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সোজা ভাষায় বলিয়াছেন: "তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।"

মনসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রসমূহের এই অভিমতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত-গণের মতবাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল্ লিখিয়াছেন, "মন জীবনের সার। ইহা শরীরের সকল অংশেই দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহার কেন্দ্র হৃদয়।"[১] পণ্ডিত সক্রেটিস বলিয়াছেন, "আত্মাই মন বা মনের উৎস।"[২] দর্শনবিদ্ লিব্‌নিজ্ ঘোষণা করিয়াছেন, "জড়পদার্থরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃত পক্ষে মন।"[৩] দার্শনিক মূরের মতে "মন শরীরের উপর আত্মার শক্তি।"[৪] সুপণ্ডিত লক প্রচার করিয়াছেন, "আমরা যাহাকে মন বলি, উহা এরূপ একখণ্ড কাগজ-সদৃশ, যাহার উপর আবেগসমূহ উহাদের ইচ্ছামত অঙ্কন করিতে পারে।"[৫] দর্শনবিদ্ হিউম্ লিখিয়াছেন, "মন আবেগের সমষ্টি।"[৬] পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, "মন এরূপ রাহস্যিক কিছু, যাহা অনুভব ও চিন্তা করে।"[৭]

এক শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানীদের লেখায়ও মন সম্বন্ধে উল্লিখিত অভিমত-সমূহের সমর্থন দেখা যায়:

একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থে 'জীবন—অমীমাংসিত সমস্যা' প্রবন্ধে জনৈক বিজ্ঞানী লিখিয়াছেন, "মানুষের সমগ্র জীবনের অভ্যন্তর দিয়া তাহার জীবন ও মন এক বলিয়া অভিব্যক্ত।"[৮] ঐ পুস্তকের 'গ্ল্যাণ্ড—আভ্যন্তর রাসায়নিক কারখানা' নিবন্ধে আছে: "মন ও জীবন যে এক, ইহা সত্য এবং এই ভাবে উভয়ের এক সঙ্গে আবির্ভাব হইয়াছে। * * চরম বিশ্লেষণে জীবন ও মন অধ্যয়ন একই।"[৯]

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে—মন জীবন চেতনা চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারমাত্রই জড়েরই এক এক প্রকার ক্রিয়া। কিন্তু এই অভিমত পৃথিবীর কোন দেশে যুক্তি-বিচারের দিক দিয়াও অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং জনসাধারণকর্তৃক এ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

১ Mind is essence of life. It is found in every part of the body, but its centre is heart. —Aristotle

২ Soul is mind, or source of mind. —Socrates

৩ All that appears as matter is really mind. —Liebnitz

৪ Mind is a power of soul over body. —Moore

৫ All that we call the mind amounts to a piece of paper upon which sensations inscribe what they will. —Locke

৬ Mind is a bundle of sensations —Hume

৭ Mind is a mysterious something which feels and thinks. —Mill

৮ Life and mind are one throughout the whole scale of being. 'Life—Unsolved Problem of the Universe'—Book of Popular Science.

৯ The truth that mind and life are one and have thus evolved together. * * The study of life is, in the final analysis, the study of mind.—'Glands—Internal Laboratories'—Book of Popular Science.

অন্তর্মুখে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তেষাং সুখং শাশ্বতং

কী ভুল করেছি, প্রভু, এতকাল ধ'রে
ধ্রুবেরে খুঁজিতে গিয়ে ছায়ার ভিতরে !
কামনা এনেছে মৃত্যু। এই মৃত্যু হ'তে
ভাসাও আমারে তব মাধুর্যের স্রোতে—
যার আস্বাদনে ধন-জীবন-যৌবন,
একচ্ছত্র সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন
তুচ্ছ বলে মনে হয়, সর্ব দুঃখ যায়।
'মিশ্রী পেলে এ সংসারে গুড় কেবা চায় !'

জায়া পুত্র রূপ আর খ্যাতির গুমোর—
রাতের স্বপন যেন। কোথায় সে জোর
কাহারেও ধ'রে রাখি ? তুমি নিত্য ধন।
তোমার চরণে মোর শান্তি চিরন্তন।
বেসুরো বাঁশরি—পঙ্কে প'ড়ে আছি হায় !
অসীম, তোমার সুরে বাজাও আমায়।

মূকং করোতি বাচালং

রাজাধিরাজের পুত্র ভয় কি আমার ?
তুমি আছ পিতা মোর। জগৎ সংসার
সকলই তোমার সৃষ্টি সর্বশক্তিমান্।
কেন ভুলে যাই,—আমি তোমারই সন্তান ?
তব আজ্ঞা নতশিরে করিয়া ধারণ
জলধারা ঢালে মেঘ ; বহে সমীরণ ;
আলো দেয় চন্দ্রসূর্য। কেন ভয় পাই ?
যতক্ষণ একা আমি, ততক্ষণ নাই
কণামাত্র শক্তি মোর। তুমি বল দিলে
সর্বজয়ী আমি, পিতঃ, অনন্ত নিখিলে।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ভুলেছিনু, হায়,
মূকও বাচাল হয় তোমার কৃপায় ;
চলচ্ছক্তিহীন করে গিরি অতিক্রম।
দয়া করো, গেছে, প্রভু, দৃষ্টির বিভ্রম।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অনেকেই সংস্কৃতকে কঠিন মনে করিয়া ভয় পাই অথবা 'মৃত ভাষা' ভাবিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু আমরা নিয়তই অজ্ঞাতসারে সাধুবাংলার মধ্যে বহু সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিতেছি। শত শত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত অবস্থায় আমাদের মাতৃভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অর্থের বা রূপের কোন পরিবর্তন না ঘটাইয়া বাংলা হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি এই-জাতীয় শব্দসমষ্টির সহিত পরিচিত হইবার কৌশল আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে বহু সংস্কৃত পদ আপনা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় সহজ সরল হইয়া যাইবে এবং তাহার সাহায্যে কিছু কিছু সংস্কৃত কথা লিখিতে ও বলিতে পারিব। মাতৃভাষায় সংস্কৃত কথাগুলিকে জানিয়া পরে সংস্কৃত শিক্ষা করিলে তাহা সহজ ও সরল মনে হইবে।

'হে মাতঃ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এই বাক্যটির 'বিবিধ রতন' শব্দ-দুটি বাদ দিলে দেখা যায়, অবশিষ্ট অংশটি সংস্কৃত ভাষা। এখানে 'বিবিধ রতন' স্থলে 'বহুরত্নমালা' বসাইলেই সম্পূর্ণ বাক্যটি সংস্কৃত হইয়া যাইবে; কিন্তু উহা বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাংলা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আমাদের সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতের বহু অংশ সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু আমরা বাংলা বলিয়াই জানি। প্রথম চরণে 'হে জনগণমনোঽধিনায়ক' সম্বোধন পদ, 'ভারতভাগ্যবিধাতা' ত্বং এই উহ্য কর্তার বিশেষণ এবং 'জয়'—জি ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচন। আমরা বাংলায় 'বালক বিদ্যালয়ে চল' বলিয়া থাকি, উহা শুদ্ধ সংস্কৃত। বালক-শব্দে সম্বোধনের একবচনে 'বালক'। বিদ্যালয়-শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'বিদ্যালয়ে' চল্-ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে 'চল' হইয়াছে।

এইভাবে আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বহু সংস্কৃত কথাকে বাংলা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বিশুদ্ধ বাংলার মধ্যে এই-জাতীয় উভয় ভাষায় প্রচলিত শব্দসংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। ইহাদের প্রভাবও বাংলার উপর অত্যধিক। এমন কি যাহাদিগকে বাংলা ভাষার উপাদান বলা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী প্রভৃতি) তাহাদিগের সাহায্য না লইয়াও এই শ্রেণীর বিভক্তিযুক্ত শব্দসমূহ দ্বারা বাংলা ও সংস্কৃত দুইই যুগপৎ লিখিতে ও বলিতে পারা যায়।

একাধিক ভাষায় প্রচলিত শব্দ বা বাক্য-সমূহকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'ভাষাসম' নামে অভিহিত করা হয়। আমিও এই-জাতীয় বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রচলিত পদগুলিকে 'ভাষাসম' নামে চিহ্নিত করিব। তাহাতে বাংলার মধ্য হইতে উহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে জানিবার সুবিধা হইবে এবং আমরা বুঝিতে পারিব ভাষাজননীর (সংস্কৃত ভাষার) অপূর্ব রূপমাধুর্য আজিও অবিকৃত অবস্থায় তাহার সন্তানের দেহে রূপায়িত হইয়া বাংলার সৌন্দর্য সমৃদ্ধি ও গৌরব বর্ধিত করিতেছে।

বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিতে হইলে শব্দ ও পদের ন্যায় তৎসম ও ভাষাসম সংস্কৃতের

পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী'—এই বাক্যটিতে রাবণ, শ্বশুর ও মেঘনাদ তৎসম শব্দ, কিন্তু মম ও স্বামী ভাষাসম সংস্কৃত। কারণ ঐ বাক্যটিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে 'রাবণঃ শ্বশুরঃ মম মেঘনাদঃ স্বামী' হইবে। এখানে লক্ষ্য করুন—পাঁচটি শব্দের মধ্যে তিনটি বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অপর দুইটি অর্থাৎ মম ও স্বামী পূর্ব অবস্থাতেই রহিয়াছে। উহারা সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত অবস্থাতেই সগৌরবে বাংলার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া অনুবাদের সময় আর বিভক্তির প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত যে সকল পদ সংস্কৃত ও বাংলায় একার্থবোধক তাহারাই ভাষাসম, অন্যগুলি নহে। তৎসম ও ভাষাসম সংস্কৃতের এই পার্থক্যটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

অনুস্বার-বিসর্গ-বিহীন এই জাতীয় ভাষাসম সংস্কৃত আমাদের অনেকের নিকট বাংলা বলিয়া মনে হইলেও মূলে যে তাহারা সংস্কৃত, এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই সংস্কৃত-ভীতি চলিয়া যাইবে এবং উহাকে মৃত ভাষা ভাবিতেও কুণ্ঠা দেখা দিবে।

"যাচে তব কৃপাকণা ভবদুঃখভাগী
ধর্মক্ষেত্রে সংসারেতে ধর্মকর্মত্যাগী।"

—এই বাক্যটির কর্তা অহং বা আমি উহ্য আছে। অন্যপদগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত। 'কৃপাকণা'য় সংস্কৃত বিভক্তিটি নাই, 'সংসারেতে' বাংলা বিভক্তি।

নিম্নলিখিত বাক্যটিকে বাংলা বা সংস্কৃত যা ইচ্ছা বলিতে পারেন। "গৃহে গৃহে তব পূজা তব আরাধনা"—এই বাক্যে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদটি উহ্য রহিয়াছে। বাক্যটি সংস্কৃতে ও বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত, সুতরাং ভাষাসম সংস্কৃত।

বাংলাভাষার তৎসম শব্দগুলি কিরূপ অবস্থায় ভাষাসম সংস্কৃতে পরিণত হয়, তাহার একটি সাঙ্কেতিক তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা করা যাইতেছে :

(১) যাবতীয় অকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সপ্তমী 'এ' বিভক্তিতে ও সম্বোধনের এক বচনে ভাষাসম সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃত-বাংলা এক।

বাংলায় অকারান্ত তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই একটিমাত্র সাঙ্কেতিক সূত্রের সাহায্যেই আমরা শত শত ভাষাসম সংস্কৃত পদের সহিত পরিচিত হইতে পারি। যে কোন অকারান্ত শব্দের শেষে একটি 'এ' বসাইলে (৭মী) অথবা (কিছু না বসাইলে) সম্বোধন বুঝাইলেই তাহা সংস্কৃত হইয়া যাইবে।

সংস্কৃতপদের উদাহরণ যথা : গৃহে, বিদ্যালয়ে, হে ছাত্র, হে মহাশয় ইত্যাদি।

সংস্কৃত বাক্যের উদাহরণ যথা :

অনলে অনিলে সাগরে পর্বতে উত্তমে অধমে
স্থাবরে জঙ্গমে
সর্বত্র অনন্তকরুণা তব হে জগদীশ
হে করুণাসাগর।

(২) আকারান্ত ও ঈকারান্ত সমুদয় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। (আকারান্ত শব্দ সম্বোধনে সর্বস্থানে ভাষাসম হয় না)। উদাহরণ যথা : দয়া, মায়া, কামিনী, রজনী; হে বালিকে, হে জননি ইত্যাদি। বাক্য যথা : নিরাশ্রয়া কন্যা তব হে জননি, ক্রোড়ে তব আশ্রয়প্রার্থিনী।

(৩) সখি শব্দ প্রথমা ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম, যথা : সখা, সখে; বাক্য যথা : সখে, সখা তব অভিমানী অতি।

(৪) উকারান্ত শব্দ সম্বোধনে বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত বাংলা এক, অর্থাৎ ভাষাসম। যথা: হে গুরো, হে প্রভো ইত্যাদি।

বাক্য: হে গুরো চরণে তব অপরাধী দাস।

(৫) ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। পদ যথা: দাতা, বিধাতা, হে ভ্রাতঃ, হে মাতঃ প্রভৃতি। বাক্য যথা:

মাতা মম জগন্মাতা পিতা বিশ্বপিতা
তথাপি কেন হে ভ্রাতঃ হৃদয়ে ভীরুতা।

সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ হেতু-অর্থে তৃতীয়ার একবচনে 'কেন' বাংলায় বিকৃত উচ্চারণে 'ক্যানো' হইয়াছে।

(৬) ইকারান্ত ও উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম। পদ যথা: দধি, মধু ইত্যাদি। বাক্য যথা:

শরীরপোষণে তথা জীবনরক্ষণে
স্বাদু শুচি দধি মধু আহর সর্বদা।

(৭) সংস্কৃত 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর 'তব' ও 'মম' বাংলা পদ্যে বহু প্রচলিত, সুতরাং উহাকে ভাষাসম বলিতে পারা যায়।

বাক্য যথা: মধুময়ী তব কথা মম মনোহরা।

(৮) অন্‌ভাগান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ প্রথমার বহুবচন ভাষাসম, অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলা এক। যথা:-দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি।

(৯) বণিজ্, ঋত্বিজ্, ভিষজ্, সম্রাজ্ প্রভৃতি জকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। পদ যথা: বণিক্, সম্রাট্ ইত্যাদি। বাক্য যথা:

ভিষক্ বণিক্, নহে ব্যাধিহারী সদা।

(১০) তকারান্ত দকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ভাষাসম। সম্পৎ, সুহৃৎ ইত্যাদি।

বাক্য যথা: সম্রাট্ বার্ধক্যে তব সর্বতাপহৃৎ
উপনিষৎ সর্বথা সম্পদ্ সুহৃৎ।

(১১) মৎ বৎ প্রত্যয়ান্ত এবং অন্, ইন্ ভাগান্ত যাবতীয় পুংলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম।

পদ যথা: বুদ্ধিমান্, শ্রীমান্, ভগবান্, মন্ত্রা, হস্তী প্রভৃতি। বাক্য যথা:

ধনী মানী গুণী জ্ঞানী মহাত্মা মহান্
কর্মযোগী পিতা মম যশস্বী ধীমান্
সত্যবাদী সেবাব্রতী দীনে দয়াবান্
তেজস্বী মনস্বী তথা বিশ্বে মহীয়ান্॥

(১২) চকারান্ত শকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ভাষাসম। যথা: বাক্, ত্বক্, দিক্, প্রভৃতি।

(১৩) মন্ ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম। পদ যথা: জন্ম, কর্ম, চর্ম ইত্যাদি। বাক্য যথা:

উচ্চবংশে জন্ম তব ধাম বারাণসী
সর্ব জীবে প্রেম তব নাম মুক্তকেশী।

(১৪) বহু সংস্কৃত অব্যয় ভাষাসম। ইহাদিগকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সুতরাং যথাসম্ভব তালিকা দেওয়া হইল। যথা:

অথবা, অতীব, অধুনা, অন্যত্র, অয়ি, অরে, অহো, আঃ, ইদানীং, ঈষৎ, উপরি, একত্র, একদা, কদাচিৎ, ক্রমশঃ, কদাপি, কিংবা, বা, কিন্তু, তথাপি, দিবা, ধিক্, নচেৎ, নানা, নাম, পরশ্বঃ, পশ্চাৎ, পুনঃপুনঃ, পৃথক্, মিথ্যা, যথা, তথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, সহসা, সাক্ষাৎ, হে, হা, স্বয়ং, বিনা, যুগপৎ, ভূমিসাৎ, আত্মসাৎ, বৃথা, সম্প্রতি, সর্বত্র, সর্বদা, সদা, সুতরাং, পিতৃবৎ, মাতৃবৎ ইত্যাদি অব্যয়গুলি সংস্কৃত বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রচলিত আছে। অতএব ভাষাসম। বাক্য যথা:

ধিক্ মূর্খ! বৃথা তব বীরত্ব-কল্পনা।

(১৫) কোন কোন ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধাতুর মধ্যম পুরুষের একবচন ভাষাসম। যথা :

ধর, চল, থর, সংহর, উদ্ধর, ইত্যাদি।

বাক্য : ধর ধর গলে মালা,

সংহর সকল জ্বালা।

(১৬) কোন কোন আত্মনেপদী ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন কবিতায় ভাষাসম রূপে ব্যবহৃত হয় যথা : যাচে, সহে প্রভৃতি। বাক্য যথা :

সহে না সহে না সদা দারুণ যন্ত্রণা, দয়াময়ি !

(১৭) সমাসবদ্ধ বহু সংস্কৃত কথা বাংলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজনক্ষেত্রে অনেকগুলি পদ একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া ভাষাসম পর্যায়ে আনা যাইতে পারে। যেমন, 'গুরুজন-চরণকমলে অশেষপ্রণতি-পূর্ব্বক প্রার্থনা' ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বাংলার জ্ঞান থাকিলেই উপরিউক্ত সামান্য কয়েকটি নিয়মের সাহায্যে মাতৃভাষার অস্থিমজ্জায় জড়িত বাংলার একটি বিরাট অংশকে ভাষাসম সংস্কৃত-রূপে চিনিতে পারি এবং সংস্কৃত না শিখিয়াই আমরা অনেকখানি সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারি। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সামান্য কথা নহে। মাতৃভাষার সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার এই প্রচেষ্টা যদি কাহারও সামান্য উপকার-সাধনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বারান্তরে ভাষাসম পদের সাহায্যে সংস্কৃত বাক্য-গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এইবার ভাষাসম পদের সাহায্যে একটি অনুবাদের নমুনা এবং একটি সংস্কৃত মাতৃবন্দনা দিয়া বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

চলিত বাংলা : এখন বাবা অফিসে, মা মন্দিরে পূজা করছেন, দিদি মামার বাড়ীতে, একা স্ত্রী রোগগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে ; সুতরাং ভিক্ষুক তোমার কোন আশা নাই।

সংস্কৃতে অনুবাদ যথা : অধুনা পিতা কর্ম্মস্থলে, মাতা মন্দিরে পূজারতা, অগ্রজা মাতুলালয়ে, গৃহিণী একাকিনী রুগ্না শয্যা-শায়িনী, সুতরাং হে ভিক্ষুক, তব আশা বৃথা।

মাতৃবন্দনা

স্নেহময়ী শান্তিময়ী সন্তাপহারিণী
সেবাপরায়ণা সদা কল্যাণ-কারিণী।
স্বধর্ম্মচারিণী তথা পরোপকারিণী
পূজনীয়া মাতা মম দেবীস্বরূপিণী ॥

দয়াময়ী হাস্যময়ী মধুর-ভাষিণী
দানধর্ম্মরতা সদা দেশ-হিতৈষিণী
পুণ্যবতী ভক্তিমতী স্বসুখ-ত্যাগিনী
পূজনীয়া মাতা মম দেবীস্বরূপিণী ॥

আন্দামানে কয়েকদিন

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

কিছু দিন আগেও আন্দামান বলিলে যাবজ্জীবন দণ্ডিত অপরাধীর কথাই লোকের মনে হইত ; তাহাদিগকেই আন্দামানে প্রেরণ করা হইত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ঐরূপ অপরাধী প্রেরণ করা বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধ চলিবার সময়ে ১৯৪২ খৃঃ হইতে তিন বৎসর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে আসে। হিরোশিমাতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরেও আন্দামানস্থ জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষেরা আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, টোকিও হইতে প্রেরিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যাইয়া তাঁহাদের বুঝান যে, জাপানীরা সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে জাপানের নিস্তার নাই, আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সমগ্র জাপানই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন এবং সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ভারত ও বর্মাস্থিত তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে।

পূর্বে যখন একই ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ও বর্মার উপর প্রভুত্ব করিতেন, তখন সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একই ইংরেজ সরকারের অধীনে ছিল। পরে ১৯৩৫ খৃঃ যখন ভারতবর্ষ ও বর্মা পৃথক্ করা হয় তখন বর্মা সরকার উত্তর দিকের তিনটি দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারত সরকারের অধীনে থাকে। জাপানী আমলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে থাকে, জাপানীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং বর্মা হইতে চলিয়া গেলে, ঐ সকল দেশ ইংরেজদের অধিকারে ফিরিয়া আসে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও বর্মাকে স্বাধীনতা দিবার সময়ে বর্মা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জই দাবি করে, কিন্তু পূর্বে যে তিনটি দ্বীপ বর্মাস্থিত ইংরেজ সরকারের অধীনে ছিল, তাহাই বর্মাকে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারতকে দেওয়া হয়।

জাপানীরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কোন সুনাম রাখিয়া যায় নাই, বরং জাপানীদের নৃশংসতার কথাই আন্দামানে গেলে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে জাপানীরা যাইয়া জেলখানা হইতে সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দেয়। কয়েদীরা সকলেই রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত ছিল না; বেশীর ভাগই জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত, তাহারা ছাড়া পাইয়া পুনরায় অসদাচরণ করায় তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। জাপানীরা যখন বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় যতই হারিতে থাকে, তাহাদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা ততই বাড়িতে থাকে। মিত্রপক্ষের বিমান দেখিতে পাইলেই জাপানীরা মনে করিত, নিশ্চয় ভারতীয়েরা ইংরেজদিগকে গোপনে সংবাদ দেয় এবং রাত্রিবেলায় আলোর সঙ্কেত দেখায়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া জাপানীরা যাহাকে সন্দেহ করিত, তাহার উপর নানা অমানুষিক অত্যাচার করিত ; অনেক লোককে বন্দী করিয়া, স্টীমারে মধ্য সমুদ্রে লইয়া গিয়া হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইত। যুদ্ধের শেষের দিকে খাদ্য-সরবরাহও কমিয়া গিয়াছিল, তখন গরু মহিষ যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই মারিয়া খাওয়া হইত, রেফ্রিজিরেটার না থাকায় মাংস যাহাতে

না পচিয়া যায়, সে জন্য পশুটিকে একবারে হত্যা করা হইত না, আজ হয় তো একটি পা কাটিয়া লওয়া হইল, পরের দিন অন্য একটি পা, এইরূপে চলিত।

যুদ্ধ চলিবার কালে নেতাজী চার পাঁচ দিনের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে সব দেখিতে দেওয়া হয় নাই, অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সফর (conducted tour) হইয়াছিল, তবুও তিনি অনেক কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেগুলি জাপানে উচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করায় নৃশংসতা ও বর্বরতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পায়।

আন্দামানে এখন আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিরও সংশোধন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্তে বিশ বৎসর কারাবাস করা হইয়াছে।

দ্বীপপুঞ্জের শাসন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, কেবল বিচারবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বে,—কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে। রেভিনিউ এসিস্ট্যান্ট কমিশনার সব-জজের কাজ করেন। চীফ কমিশনার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের এবং ডেপুটী চীফ কমিশনার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কাজ করেন, এবং তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। হাইকোর্ট বৎসরে একবার দুইজন বিচারপতিকে দিয়া সার্কিট কোর্ট (Circuit Court) গঠন করিয়া পোর্টব্লেয়ারে পাঠান। এই বৎসর এই কোর্টের সহিত আন্দামান যাইবার সুযোগ লাভ করি।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, কিন্তু তথায় যাতায়াত করা সহজসাধ্য নহে। দুইটি জাহাজ এম. ভি. আন্দামান (M. V. Andaman) এবং এম. ভি. নিকোবর কলিকাতা, পোর্ট ব্লেয়ার, কার-নিকোবর এবং মাদ্রাজ যথাক্রমে যাতায়াত করে। 'আন্দামান' জাহাজটি বিশাখাপত্তমে ভারতীয়দের দ্বারা প্রস্তুত। দুইটি জাহাজই পেট্রোলে চলে এবং সে জন্য 'মোটর ভেসল্' (Motor Vessel) বলা হয়। জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইলে চীফ কমিশনারের সেক্রেটারিকে লিখিতে হয়। ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় খিদিরপুর ডক হইতে 'এম. ভি. আন্দামানে' আমরা যাত্রা করিলাম।

গঙ্গার উভয় পার্শ্বের দৃশ্য খুব সুন্দর, তবে বড় জাহাজকে গঙ্গার উপর দিয়া যাইবার সময় জোয়ারের উপর নির্ভর করিতে হয়। পলিমাটি পড়িয়া এইরূপ হইয়াছে যে, ভাটার সময়ে নোঙর ফেলিয়া পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। বঙ্গোপসাগরের পূর্বেই সাগরদ্বীপ পড়ে, সেখানে পৌষসংক্রান্তির সময় পুণ্যার্থীরা স্নান করিতে যান। সাগরদ্বীপের কিছু দক্ষিণে 'স্যাণ্ডহেড' (Sand Head) বলিয়া একটি জায়গায় পাইলট ভেসল্ (Pilot Vessel) অপেক্ষমাণ। খিদিরপুর হইতে স্যাণ্ডহেড পর্যন্ত প্রায় একশত মাইল জাহাজ পাইলট লইয়া যাইয়া মোটর লঞ্চে পাইলট ফিরিয়া যান, এবং স্যাণ্ডহেড হইতে পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজ ক্যাপ্টেন লইয়া যান।

'আন্দামান' জাহাজ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় খিদিরপুর ডক ছাড়িয়া গার্ডেন রীচে পৌঁছিয়া রাত্রি আট ঘটিকা অবধি রহিল, পরে আবার চলিতে আরম্ভ করে। ২৮শে এপ্রিল ভোর বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি জাহাজ নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট ছোট

নৌকা করিয়া ডাব বিক্রি করিতে আসিয়াছে, প্রতিটির দাম পঁচিশ নয়া পয়সা। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জাহাজটি উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসিয়াছে। সমস্ত রাত্রিতে এই সামান্য পথ আসায় মনে নৈরাশ্য আসিলেও মা ভাগীরথীর মৃদুমন্দ পবনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। সকালে আট ঘটিকার সময়ে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুপুর প্রায় ১টার সময় পুনরায় জাহাজ নোঙর ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পাশ দিয়া এম. ভি. নিকোবর কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রায় আটটার সময়ে জাহাজ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে। রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে জাহাজের দোলানিতে ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, জাহাজ স্যাণ্ডহেড-এ পৌঁছিয়া গিয়াছে, পাইলট নামিয়া গিয়াছেন এবং ক্যাপটেন জাহাজের ভার লইয়াছেন। তিন চারিটি জাহাজ দেখিলাম দাঁড়াইয়া আছে, পাইলট তাহাদিগকে কলিকাতা অভিমুখে লইয়া যাইবেন।

২৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় অনেককে বমির জন্য কাতর দেখিলাম। জাহাজের ডাক্তার—ডাঃ ভাদুড়ী বমির প্রতিষেধক হিসাবে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে একটি করিয়া ট্যাবলেট (Avomine Tablet) দিতেছেন এবং সকলকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বমির ভাব শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। দুপুর বেলা অবধি খুব দোলানি ছিল, পরে কমিয়া যায় এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন। ৩০শে এপ্রিল সমুদ্র একেবারে শান্ত, মনে হয় যেন পুকুর—পুকুরের মধ্য দিয়া জাহাজ চলিতেছে।

১লা মে সকাল বেলা হইতে ছোট বড় দ্বীপ দেখা গেল। তাহাদের পাশ দিয়া জাহাজ চলিতেছে। নারিকেল ও সুপারি গাছ দেখা যাইতেছে, কিন্তু কোন জনপ্রাণী দেখা যাইতেছে না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামান। পোর্ট ব্লেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে। আন্দামানে পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, উত্তর আন্দামানে 'ঝারোয়া' বলিয়া এক হিংস্র জাতি বাস করে। তাহারা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং লোক দেখিলেই তীক্ষ্ণ লোহার শর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহাদের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। কেহ কেহ সাহস করিয়া দূর হইতে ফল বা খাদ্যদ্রব্য দেখাইয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কাছে আসে নাই, বরং তীরের নাগালের মধ্যে পাইলে মারিয়া ফেলিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদেরা (Anthropologists) ইহাদের সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ঝারোয়াদের লোকগণনার (Census) আওতায় আনা যায় নাই বলিয়া শুনিলাম।

আমাদের সঙ্গে কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার যাত্রা করেন। খিদিরপুর ডকেই প্রতি পরিবারকে বড় পিতলের কলসী, বালতি, কোদাল, লাঙল প্রভৃতি দেওয়া হয়, নগদ টাকাও দেওয়া হয়। ১লা মে দশ ঘটিকার সময়ে মধ্য আন্দামানে পোর্ট এলফিনস্টোন-এ তাহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইল। এখান হইতে তাহাদিগকে মায়া বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য একটি ছোট জাহাজ আসিয়াছিল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলিয়া কেহ থাকিতে পারিল না। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার জন্য কি মূল্যই না এই মানুষগুলিকে দিতে হইল? আরও

মূল্য দিতে হইবে কিনা ভগবান জানেন। উদ্বাস্তু পরিবারের একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, মায়া বন্দরে প্রতি পরিবার ত্রিশ বিঘা জমি, বাড়ী করিবার জন্য তিন শত টাকা এবং ছয় মাসের ভাতা সরকার হইতে পাইবে এবং কৃষিকর্মের জন্য বীজাদিও পাইবে। সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারের ছোট জাহাজে উঠিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিল।

পরে প্রায় তিন ঘটিকার সময় আমাদের যাত্রার পঞ্চম দিনে জাহাজ পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিয়া চেথাম জেটীতে নোঙর ফেলিল। তথা হইতে মোটরযোগে বিচারপতিদ্বয় সহ আমরা সরকারী গেস্ট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম! বিচারপতিদ্বয় সহ আমরা যতদিন ছিলাম, গেস্ট হাউসে আর কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। আমরা রবিবার ৭ই মে পুনরায় 'আন্দামান' জাহাজে উঠি কলিকাতা ফিরিবার জন্য।

পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি খুব সুন্দর। পাহাড়ের মধ্য দিয়া উঁচু নীচু রাস্তা, অনেকটা দার্জিলিং শহরের মতো। চারিপাশে গাছপালা; তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। বাড়ীগুলি কাষ্ঠনির্মিত। পুরাতন ইষ্টকনির্মিত 'সেলুলার জেল'—যেখানে বীর সাভারকার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিককে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ভগ্নপ্রায় সেলুলার জেলের সাতটি বাড়ীর মধ্যে তিনটিকে জাপানীরা বোমা ফেলিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, সেই স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। বাকী চারিটি বাড়ীও শীঘ্রই ভাঙিয়া ফেলা হইবে শুনিলাম। বীর সাভারকার যে ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা দেখিলাম, সেখানে তাঁহার একটি ছবি আছে। তথায় এক রক্ষীর সহিত আলাপ হইল, তিনি জাপানীদের অধিকার-কালেও তথায় কাজ করিতেন এবং তাঁহারই কাছে জাপানীদের অত্যাচারের কথা শুনি এবং তিনিও জাপানীদের সন্দেহভাজন হইয়া তাহাদের হস্তে নিগৃহীত হন।

পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম দুইটি বৃষ্টিহীন দিন পাইয়াছিলাম। শেষের তিন দিন প্রবল বৃষ্টি হইয়াছিল, সাইক্লোনের কবলে ছিলাম, এই সাইক্লোনই পরে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সেজন্য বেশী বেড়ানো সম্ভব হয় নাই। শহরের মধ্যে একটি শিশু গাছপালার নার্সারির মতো আছে। নারিকেল গাছের চারা পাওয়া যায়। শহরে অনেক আমগাছ আছে; আম বেশ মিষ্ট। পেঁপে খুব বড় পাওয়া যায়, খাইতেও খুব মিষ্ট। সুমিষ্ট আনারসও পাইয়াছিলাম। সরকার নারিকেল কণ্ট্রোল করিয়াছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারের সন্নিকটে রস দ্বীপ (Ross Island) ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র ছিল। জাপানীরা উহার উপরে বোমা ফেলে। দ্বীপটি এখন ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাইতেছে এবং সেজন্য কেহ ওখানে থাকে না।

পোর্ট ব্লেয়ারে চেথাম জেটীর পাশেই Chatham Saw Mill, ইহা সরকার-পরিচালিত কাঠ কাটিবার একটি বিরাট কারখানা। শুনিলাম সমগ্র এশিয়াতে ইহা বৃহত্তম কারখানা। বিদ্যুতের সাহায্যে বিরাট বিরাট যন্ত্র চলিতেছে শহর হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে খুব বড় এক জঙ্গলে গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ আছে। তাহাদের মধ্যে বৃহৎ গর্জন বৃক্ষও দেখিলাম। এই গাছে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে

তেল বাহির হইয়া থাকে, ইহাকে গর্জন তেল বলা হয়। বাল্যকালে শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রতিমায় রং দেওয়া হইলে প্রতিমার উপর গর্জন-তেল লাগাইতে দেখিতাম, তাহাতে প্রতিমা যেন সজীব হইয়া উঠিতেন। জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় গাছের গোড়া কাটা হইয়া গেলে হাতীর সাহায্যে তাহা সংগ্রহ-স্থলে লইয়া যাইতে দেখিলাম। সেই স্থান হইতে মোটর গাড়ী করিয়া উহা করাত-কারখানায় নীত হয় এবং বিভিন্ন করাত-বসানো যন্ত্রের সাহায্যে বড় কাঠগুলি প্রথমে অর্ধেক এবং পরে যথাক্রমে পরিমাপ-মত টুকরা করা হয়। যন্ত্রের করাতগুলি এত ধারাল এবং জোরাল যে, মাখনের মধ্যে ছুরিকার মতো অতি সহজেই চলিয়া যায়। কাটা হইয়া গেলে কাঠ যন্ত্রের সাহায্যে গুদামে নীত হয়।

পোর্ট ব্লেয়ারের চতুর্দিকেই সমুদ্র। Corbyn's Cove নামে সমুদ্রতীরে স্নানের একটি জায়গা আছে। শহরের মধ্যে খোলা মাঠে এরোপ্লেন ওঠানামা করে। বর্তমানে বর্ষাকাল ব্যতীত সকালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ কর্পোরেশনের এরোপ্লেন কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন হইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে যায় এবং শনিবার পোর্ট ব্লেয়ার হইতে রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসে। আমরা আন্দামানে থাকিতে ৫ই মে আন্দামানের চীফ কমিশনার আন্দামানে আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে প্লেনে রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু প্লেন রেঙ্গুন হইতে আন্দামান আসিতে পারে নাই সাইক্লোনের জন্য, পরে কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বর্ষার প্রাবল্যে এরোপ্লেন চলাচল কিরূপ ব্যাহত হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। কার নিকোবরে (Car Nicobar-এ) ভাল বিমান-ঘাঁটি আছে।

কাঠের তৈরী জিনিস—যেমন থালা, লাঠি, টেবল-ল্যাম্প—করাত-কারখানা দ্বারা পরিচালিত কুটিরশিল্পের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। জিনিসগুলি সুন্দর এবং সস্তা।

মাউণ্ট হ্যারিয়েট (Mount Harriet) একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এককালে উচ্চ রাজকর্মচারীরা এখানে থাকিতেন। তথায় এক কয়েদী ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মেয়ো (Lord Mayo)-কে হত্যা করে। তাই ভূতের ভয়ে সেখানে এখন আর কেহ থাকে না শুনিলাম।

যাহা হউক আন্দামানে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ (Anthropologist) গবেষণা করিবার অনেক জিনিস পাইবেন। মাত্র পাঁচ দিন থাকিয়া আন্দামানে যাহা শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, তাহা পাঠকসমাজে উপস্থিত করিলাম। আন্দামানে যাতায়াতের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকিলে অনেক টুরিস্ট সেখানে যাইতে পারেন।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

বঙ্গোপসাগরে ৫০০ মাইল জুড়িয়া ২২৩টি দ্বীপের সমবেত নাম 'আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ'। ইহাদের প্রধান শহর ও বন্দর পোর্টব্লেয়ার কলিকাতা হইতে ৭৮০ মাইল, মাদ্রাজ হইতে ৭৪০ মা., রেঙ্গুন হইতে ৪৫০ মা. দূরে অবস্থিত।

	দ্বীপসংখ্যা	আয়তন	লোকসংখ্যা (১৯৫১ খৃঃ গণনা)
আন্দামান	২০৪	২,৫৮০ বর্গ মা.	৩৮,০০০ (তন্মধ্যে ৩০০০ উদ্বাস্তু পরিবার)
নিকোবর	১৯	৬৩৫ "	১২,০০০ (আদিম অধিবাসী)

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

যখন মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ রক্তআমাশয়ে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছিলেন, সে সময় তিনি বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন। আমি বৈকালে কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিয়া নিত্য তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। প্রত্যহ দেখিতাম, তিনি সকলের সহিত বেশ হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যহই আমার মনে হইত, আজ বোধহয় মহারাজ ভাল আছেন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কেমন আছেন?" তিনি বলিতেন, "ভাল নাই, তুমি তো ডাক্তারি পড়িতেছ; রক্তআমাশয় রোগে কত যন্ত্রণা হয়, তাহা তো তুমি জান।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কতবার পায়খানা যাইতে হইয়াছে?" তিনি সেই হাসিমুখেই এবং অবিকৃত মুখমণ্ডলে উত্তর দিতেন, "সকাল হইতে তিরিশ চল্লিশ বার।" সে কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম; এই কঠিন রক্তআমাশয় পীড়ায় এতদিন ধরিয়া কষ্ট পাইলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে, তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে যাইয়া অবিশ্রান্তভাবে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিশ্রাম না লইয়া প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, সেখান হইতে দারুণ অসুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ বলরাম-মন্দিরে ছিলেন তাঁহাকে কালাজ্বর আক্রমণ করিয়াছিল।

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজ তন্ময় হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তথায় দাঁড়াইয়া আছেন, এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুরাম মহারাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গের ভাব, গৌরাঙ্গের ভাব"।

অসুখের সময় বাবুরাম মহারাজের সেই অপূর্ব গৌরবর্ণ ম্লান হইয়া গিয়া একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। একদিন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখি যে, খলে মাড়িয়া একটি কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতেছেন এবং কিছুমাত্র মুখ বিকৃত না করিয়া হাসিমুখে আমায় বলিতেছেন, "ঔষধটি ঠিক যেন বিষ্ঠার গন্ধ; কি করিব, কবিরাজ বলিয়াছেন, অতএব সেবন করিতেই হইবে।" দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ ঐরূপ অবিকৃত হাসিমুখে সেবন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মতো এইরূপ ভাব আর কোথাও দেখি নাই। এই অবিশ্বাসের যুগে যে-সব কীর্তি ও লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, সে সবই অপূর্ব; যত দিন যাইবে ততই আমরা অবাক্ এবং আশ্চর্যান্বিত হইব।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে দ্বিতলের ঠাকুর-ঘরের পূর্বে অবস্থিত পূঃ শরৎ মহারাজের ঘরে পূঃ হরি মহারাজকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) খুব অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন যাবৎ রাখা

হইয়াছিল। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষ করিয়া সংযোগস্থলগুলি পাকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম এরূপ ঘটে যখন তিনি পুরীধামে। সেখানে তখন কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক (Dr. S. B. Mitra) পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনের পাস করা ডাক্তার ছিলেন, এবং এখন যেখানে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটী, সেইখানে তাঁহার দ্বিতল বাটী ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া M.B. পরীক্ষায় Zoology-র পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এবং সে সময় তাঁহার হাতে ছয়-সাতটি ছাত্রের বেশী কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই কঠোরহৃদয় ব্যক্তি হরি মহারাজের প্রথম অস্ত্রোপচার (operation) করিয়াছিলেন। পূঃ মহারাজ ক্লোরোফর্ম (chloroform) না লইয়া, বিন্দুমাত্র অস্থির না হইয়া, অবিকৃত মুখে অপারেশান করাইয়াছিলেন দেখিয়া ডাক্তার মিত্র অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে তাঁহার ভাবের আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল, এবং তাহার পর হইতে হরি মহারাজের নিকট হইতে ফী বাবদ আর কিছু লন নাই। হরি মহারাজ কলিকাতায় আসিলে তিনি ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে ট্যাক্সি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে মহারাজকে দেখিতে আসিলেন, ভাড়া দিতে গেলে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ট্যাক্সিভাড়া দিলে আমার এখানে আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ আমার এত বয়স হইয়াছে, এ রকম মানুষ এই প্রথম দেখিলাম, কাজেই তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি।"

একখানি উঁচু খাটের উপর তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকিতেন। সমস্ত জয়েণ্ট-গুলি বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর একটি মাছি বসিলে হাত নাড়িয়া সেটিকে তাড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখ-মণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, তিনি ভাল আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, অসহ্য যন্ত্রণা রহিয়াছে।

বলরাম-মন্দিরে নীচের ঘরে (বাটীতে প্রবেশ করিয়াই রাস্তার ধারের ডানদিকের ঘরটিতে) থাকা কালে তাঁহার পায়ের একটি জয়েণ্ট পাকিয়া পুঁজ হইলে পর ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য (তখনকার দিনের প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক) মহাশয় আমার উপস্থিতিতে তাঁহার অপারেশান করিয়াছিলেন। একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া ক্লোরোফর্ম না করিয়া অস্ত্রোপচার করাইলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য ছুরি দিয়া ফালা করিয়া আঙুল দিয়া ভিতরটা ঘাঁটিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই, কিংবা কোন কষ্টসূচক শব্দ করেন নাই। ডাক্তার সুরেশবাবু তাঁহার এই বিস্ময়কর অপার সহ্যগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কি কাশী সেবাশ্রমের নিকট একখানি বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি প্রায়ই হরি মহারাজকে দেখিতে যাইতে পারেন এবং যথাসম্ভব তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পান। সেই কাশীতেই একটি পিঠজোড়া প্রকাণ্ড দুষ্টব্রণ (Carbuncle) সজ্ঞানে তিনি বসিয়া কাটাইয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম মঠে (বেলুড়) খুব ঘন ঘন যাইতাম। পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের প্রতি আমার বেশি আকর্ষণ থাকায় সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই প্রণাম করিতে যাইতাম (অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম

করিবার পর)। প্রত্যেকেই আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন যে, রাজা-মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম কি না। আমি 'না' বলিলে প্রত্যেকেই আমাকে আগে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি আমার আকর্ষণ কম ছিল, তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিতেন। এখন মনে হয়—সেইজন্যই আমার এই অপূর্ণতা দূর করিয়া আমার কল্যাণার্থে তাঁহারা ঐরূপ আদেশ করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের একটি পিতলের গড়গড়া ছিল। সেবকরা সেটিকে নিত্য ধুইয়া মাজিয়া রাখিতেন, এবং দেখিলে মনে হইত যে, সোনার গড়গড়া। তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিতাম, সেই গড়গড়াতে তিনি তামাক সেবন করিতেছেন কিংবা কাহারও সহিত ফষ্টি-নাষ্টি করিতেছেন। কেহবা তাঁহার গা-হাত-পা টিপিয়া দিতেছেন। এই সব দেখিয়া প্রথম প্রথম ভয়ভক্তিবশতঃ কোন প্রকারে তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম।

একবার পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ অসুস্থ হইয়া সারগাছি হইতে আসিয়া চিকিৎসার জন্য বলরাম মন্দিরে রহিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে দিনে পাছে না ঘুমাইয়া পড়েন, তাই তাঁহাকে লইয়া তাসখেলা হইত। পূজ্যপাদ মহারাজেরই বেশি উৎসাহ। খেলায় গোল-মাল হইত। মহারাজ তাস বলিয়া দিতেন, হারিয়া গেলে ঠাট্টা করিতেন। আমার এসব ভাল লাগিত না।

একে তো পূর্ব হইতে আকর্ষণ ছিল না, তাহার উপর প্রত্যহ ওরূপ ছেলেমানুষের মতো খেলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণ আরও কমিয়া গিয়াছিল।

একদিন যখন মনে এরূপ ভাব উঠিয়াছে যে, আর এরূপ খেলিতে আসিব না, তখন মহামহিমান্বিত অপার দয়ার সিন্ধু অন্তর্যামী মহারাজ আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ শ্যামাপদ, এক ব্রহ্ম সত্য, এবং এ জগৎ মিথ্যা'। এ সকল কথা সদ্গ্রন্থে অনেকবার পাঠ করিয়াছি এবং বহুবার লোকমুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল বাণী যেন মনে অমৃত ঢালিয়া দিতে লাগিল। সাপুড়ে যেমন মন্ত্রের দ্বারা সাপকে অভিভূত করিয়া নিশ্চল করিয়া দেয়, মহারাজ আমার মনোভাব সেইরূপ একেবারে বদলাইয়া দিয়া আমাকে একেবারে বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান্ করিয়া দিলেন; সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ জন্মিল। সেইদিন হইতে মহারাজকে দিনান্তে একবারও না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না, এবং অপর সকল (ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ) সাধুবৃন্দের প্রতি যতটা আকর্ষণ ছিল, সবগুলি একত্র করিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণটি অনেক প্রবল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম, এবং সেইদিন হইতে মনে হইত, মহারাজ যেন তাঁহার বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সংঘ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের তাঁহার সেই পক্ষদ্বয়ের নীচে আশ্রয় দিয়া সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন! তাহার পর হইতে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মহারাজকে ক্রমশঃ আরও বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

স্বামীজীর 'ভাববার কথা'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর সময়সীমা স্বল্পপরিসর। প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশ-উপলক্ষেই তাঁর বাংলা লেখার সূত্রপাত। তার আগে তিনি যে-সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির সাহিত্যমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ; তবু ওরা ঠিক সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি নয়। উদ্বোধনে প্রকাশিত 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাববার কথা'র প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ।

'ভাববার কথা'-র প্রবন্ধসমষ্টি বাংলাপ্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'শিবের ভূত' এবং 'ঈশা-অনুসরণ' নামে অসমাপ্ত রচনা-দুটি এবং 'পারি-প্রদর্শনী'র বিবরণী বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রত্যেকটি প্রবন্ধ গভীর চিন্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টি, এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর গুণে যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ

'বাংলা ভাষা' নামে স্বামীজীর যে বহুখ্যাত রচনাটি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার নির্দেশকরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন-সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের বিষয় বা ভাবের বিষয়—দুয়েরই প্রকাশক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজীর মতে—"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক—কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না?"

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে বাংলা গদ্যে সংস্কৃতরীতির গুরুভার আমদানির বিপক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের সমুন্নতি যে সংস্কৃতশব্দৈশ্বর্যের দ্বারাই সম্ভব, তার প্রমাণ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বা 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধ-দুটিতে মেলে। স্বামীজী নিজেও সব সময় চলতি ভাষায় লেখেননি। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি আদ্যন্ত সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যে রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য আপনিই দেখা দেয়—এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ" অবধি জগতের মহত্তম চিন্তানায়কদের যে উদাহরণ স্বামীজী দিয়েছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখের কথার মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তো স্পষ্টই লিখেছেন—"আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।...যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নুতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়,

ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। "ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"—বাংলা গদ্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ উদ্ধৃতির মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য-রীতির সাধু ও চলতি—দুই রূপেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা দীপ্যমান। চলতি ভাষায় তিনি প্রাণময় বৈদ্যুতিকগতিসম্পন্ন; সাধু ভাষায় সংহত শাঙ্কর ভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন। বিবেকানন্দের গদ্যরীতির দ্বৈতরূপে তাঁর ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ। ওয়াল্টার পেটারের 'Style is the man' কথাটি এক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য।

তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত ছিল চলতি ভাষার প্রতি। তাঁর সমকালীন সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের আভাস তিনি পেয়েছিলেন। তাই লিখেছেন—"এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"

ক্রান্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক বাংলা গদ্যরীতিতে। এই পত্রাংশটি উদ্বোধনে ছাপা হবার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে চলতি ভাষা। কিন্তু স্বামীজীর গদ্যে যে প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চলতি গদ্য অনাধুনিক সাধু গদ্যের চেয়ে কৃত্রিম শোনায়। স্বামীজী বলেছিলেন—"ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।" সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে সজীব ক'রে তোলা যায় না।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা : লোকাচার-বিষয়ক

'ভাববার কথা' নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং তারই তলায় লোকাচারের যুক্তিহীন শৃঙ্খলপাশের দৈন্য—এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে কতদূর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ গল্পের মতো ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে সুচতুর হাস্যপরিহাস-নিপুণ বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি :

"বলি রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি?" রামচরণ—'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।" কী শান্ত সংযত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

লক্ষ্ণৌ শহরে নবাগত দু-জন রাজপুত মহরমের জাঁকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে। "কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই

যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টো সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাবা অজিদ্, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক রোবত।'—(ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের কি আজও কাঁদছে !!)"

এই গল্পটির পরেই স্বামীজী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে, আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী ভগবান অবধি পৌঁছয় না।

'ভাববার কথা' গল্পসমষ্টিতে 'কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে' ভগবানের মন ভিজানোর চেষ্টারত ভক্তটি, 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী, অথবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে তোলাই স্বামীজীর লক্ষ্য। তাই তাঁর হাস্যরসে বিদ্রূপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। স্বামীজীর চিন্তাধারায় বেদান্ত ও মানবপ্রেমের অনায়াস-মিলনের মতো তাঁর রচনায়ও গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের মিলন ঘটেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : সংঘাত ও সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্যা, জ্ঞানার্জন, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি—প্রবন্ধ-চতুষ্টয় সাধুভাষায় লেখা। 'বর্তমান সমস্যা' উদ্বোধন-পত্রিকার প্রস্তাবনা; প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত উনিশ শতকের চিন্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী তার সামঞ্জস্যের উপায় চিন্তা করেছেন। তথা-কথিত 'ইতিহাস' হয়তো ভারতবাসীর ছিল না। কিন্তু সে ইতিহাস তো "রাজা-রাজড়ার কথা।" ভারতবাসীর অন্তরের চিন্তা ও চেষ্টার কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভাল-ভাবে লেখা রয়েছে—"ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী"তে। তাই—"প্রকৃতির সহিত যুগ-যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।"

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা—আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, যার জন্মভূমি গ্রীস। "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।"

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ

যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একবার মিলন হয়—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে—"...আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীসের যোগ্য উত্তরাধিকারী—আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্যই অবশিষ্ট। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—"চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

অবশ্য ভারতবাসীর আদর্শ—পারমার্থিক মুক্তি। কিন্তু ক-জন এ সংসারে যথার্থ মুক্তির অভিলাষী? "সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। —আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নর-নারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে? এ পেষণেরই বা কি ফল? দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।" বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ভেদী ছিল, ভারতীয় মানসের এই বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ —"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?" সেই সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তাঁর বাণী—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।"

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনিশ শতকের মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, স্বামীজীর চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে।

'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট হলেও ছোট্ট মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বামীজী জ্ঞানার্জনের পন্থা নির্দেশ করেছেন; বেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে পারমার্থিক জ্ঞান অবধি সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক—"...কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ...।" প্রাচীনপন্থীরা অনেক সময় এই ভেবে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন যে, সব জ্ঞানই তাঁদের পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু "পরবর্তীদের নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।" সুতরাং জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ সাধনা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন ছিল—তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই শ্রেণীগত সুবিধাবাদের দিন গতপ্রায়। সর্বশ্রেণীর

লোকই এখন বিদ্যাচর্চার অধিকারী হয়ে উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে "পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা" আজকাল অচল। জ্ঞানার্জনের দুটি পথ—এক পূর্বপুরুষ বা গুরুপরম্পরা ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক পূর্বনির্দিষ্ট কোন পন্থার উপর নির্ভর না ক'রে নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। তার ফলে—"…প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্যস্মরণেই কালাতিপাত করে…।" অন্য দিকে আধুনিক বিদ্যাও গুরুনির্দেশ ছাড়া চলতে পারে না। তা যদি হ'ত, তবে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু, কাফ্রী প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আসল কথা এই যে, সব রকম জ্ঞানের জন্যই সাধনা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্যা, জাগতিক জ্ঞানের জন্য নিয়ত চর্চা, নূতন অনুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক ব'লে মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরন্তর কঠিন সাধনার ইতিহাস। তাই স্বামীজীর মন্তব্য—"অলৌকিকত্ব-রূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'—প্রবন্ধ-দুটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্মচেতনাকে উনিশ শতকের প্রথম যুগে বিদেশীরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতেরা লোকাচার ও সংস্কারের বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শাখাটিকেই বড় ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দুসাধনার মূল সত্য বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মীয় রীতি-নীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার চেষ্টাই তাদের মধ্যে বেশী ছিল। পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝবার চেষ্টা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[১] বক্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বক্তৃতাটি অনেকটা পাশ্চাত্যধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র করেনি।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের কারণ—"‥আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তর-

১ লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'উদ্বোধন' ৬৩তম বর্ষ চৈত্রসংখ্যা, পৃষ্ঠা, ১৪১।

ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যে আস্থাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের নব-জাগরণের নিশ্চিত সূচনা।

উনিশ শতকের বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়—ইংলণ্ড ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। ম্যাক্সমূলার জানতেন, "অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া"। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে সেকালের (এবং অনেকাংশে একালেরও) ইউরোপীয় সমাজ মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক যাদুবিদ্যাই মনে করতেন। এই মনোভাবের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধার্মিকদের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার 'প্রকৃত মহাত্মা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটিই বর্ধিতাকারে 'The Life and sayings of Ramakrishna' (রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের The Face of Silence এবং রোমাঁ রোলাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তাজগতে রামকৃষ্ণ-দেবের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর মধ্যে এমন একটি বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, যার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিন্তাজগতেই তিনি সমাদৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধটি নিয়ে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীরা তীব্র বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী জানতেন: সত্যমেব জয়তে। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী: "মুখে—বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি, বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।"

অনির্বাণ

শ্রীমতী বিভা সরকার

হে মরমী! তুমি জ্বেলে দিলে শিখা
চিত্তে মোর সদা জ্যোতিষ্মান্
সে অগ্নিশিখায় দহি, ক্ষয়হীন
লয়হীন আমি অনির্বাণ!

অক্ষয় করিলে মোরে মঙ্গল পরশে
পূর্ণকাম উতরিনু অমৃতের পার;
আমার জীবন-নায় সাজিলে কাণ্ডারী,
নির্ভয়, আসিলে যদি ভয় কি আবার!

অনাহত পথপাশে কি জানি কিসের আশে—
ছিল জাগি ভীরু দীপখানি;
তুমি আপনার ক'রে নিলে তুলে স্নেহ ভরে
হে সুন্দর! তাই ধন্য মানি।

তুচ্ছ সে মহৎ হ'ল, হ'ল মহীয়ান্;
বিন্দু সে মিলায়ে গেল অসীম সিন্ধুতে।
অতলান্ত সে আমার শুনি জয়ধ্বনি,
অনন্ত উঠিল জাগি একটি বিন্দুতে!

রবীন্দ্রজীবনে পদ্মা

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সবুজ শ্যামল মাঠ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাঁকে যেন অহরহ ডাক দিত। কর্মময় জীবনের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, তখনই প্রকৃতির স্নেহশীতল কোলে ধরা দিয়েছেন। শিশুকাল থেকেই জলের সঙ্গে কবির যেন একটা আন্তরিক টান ছিল। ভৃত্যরাজতন্ত্রে তাঁর জীবন যখন বন্দী-দশায় কেটেছে, তখন দেখা যায় জোড়া-সাঁকোর ঘরে জানলার ধারে তিনি পুকুরের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। অবশ্য শুধু পুকুরের জলই তাঁর লক্ষণীয় বিষয় ছিল না; সেই ঘাট, পুকুর, লোকজন, গাছপালা সবই বালক কবিকে কোন্ এক অজানা রাজ্যে নিয়ে যেত। নদীর সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ সখ্য ছিল। একবার এক চিঠিতে কবি লিখেছেন: "অনেকদিন পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে ফিরে পেয়েছি।"

কবির জীবনে ও কাব্যে নদীর প্রতি প্রীতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে তিনি পদ্মাকে দেখেছিলেন অত্যন্ত নিবিড় গভীর অন্তরঙ্গরূপে।

সাধারণের কাছে পদ্মা ভয়ঙ্করী, ভীষণা রাক্ষসী, তার মতিগতির স্থিরতা নেই, ধ্বংস-লীলার প্রলয়-নাচনেই তার গভীর আনন্দ। দয়া নেই, মায়া নেই, কোন বিচার নেই; যাকে সে আশে-পাশে পায়, তাকেই সমূলে বিনাশ ক'রে সে আনন্দ পায়। কোথাও এতটুকু বাধা নেই, সঙ্কোচ নেই, এক ফোঁটা ভয় নেই। প্রলয়-নাচন নাচতে নাচতে সে সদর্পে এগিয়ে চলে। কেউ কাছে যেতে ভরসা পায় না। নাম শুনলে প্রাণে চমক লাগে। কি বেশে যে সে মানুষকে অভ্যর্থনা করবে, তা কেউ জানে না। যারা কাছাকাছি থাকে, তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। যাকে কাছাকাছি আসতে হয়, সেও ভয়ে ভয়ে আসে।

কিন্তু কবি সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁর দৃষ্টি সূক্ষ্ম। সাধারণ মানুষ যেখানে ভীষণ, ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে, কবি তার মধ্যেও সুন্দরের সন্ধান পান। রুদ্ররূপের মধ্যেও অভিনব সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি আবিষ্কার করেন। তাই পদ্মার সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই কবি দেখতে পেলেন প্রেমের স্পর্শ, সৌন্দর্যের সুষমা। শিলাইদহে যখনই তিনি কাজের ডাকে গেছেন, তখনই তিনি ঠাঁই নিয়েছেন ভীষণার বুকে। এই পদ্মার তীরেই তাঁর 'সুদীর্ঘকাল পড়ে থাকার ইচ্ছা' প্রবল ছিল; কিন্তু বাইরের জগতের হিসাব-নিকাশও মেটাতে হবে, তাই তাঁকে কেবলই বঞ্চিত হ'তে হয়েছে পদ্মার সান্নিধ্য থেকে।

কবি-জীবনের 'সোনার তরী'-পর্বে পদ্মার প্রভাব সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। 'চৈতালী' কাব্যেও পদ্মার প্রভাব পড়েছে। শুধু মাত্র পদ্মা নয়, বাংলা দেশের নদ-নদী তাঁর কাব্য-জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। বাংলাদেশের অপরাপর নদীর চেয়ে পদ্মা একটু পৃথক্ ধরনের, সে একটু খাপছাড়া। অত্যন্ত খামখেয়ালী তার মেজাজ, নিজের

খুশীমত সে ছুটে চলে। এই ছুটে চলা, এই গতিবেগ রবীন্দ্রকাব্যের মূল লক্ষণ। পদ্মার কাছ থেকেই যেন কবি অন্তরে এই গতিবেগ লাভ করেছিলেন।

'সোনার তরী' রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ পরিণতরূপ, এই কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতা রচিত হয়েছিল কবির পদ্মাবাস-কালে। কাব্য-জীবনের চরম পরিণতি লাভই কবির পদ্মা-বাসের একমাত্র লাভ নয়; পদ্মার ভেতর দিয়েই কবি দেখতে পেয়েছেন, অন্তরে উপলব্ধি করেছেন বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য।

'ছিন্ন পত্রের' পত্রগুলির মধ্যেও অনেক জায়গায় কবি পদ্মার নানা রূপ, নানা ভাব প্রকাশ করেছেন।

কবি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেসে চলেছেন, আর এই চলার গতিবেগ অন্তরে অনুভব ক'রে কাব্যে তাকে প্রকাশ করেছেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে কবি এই গতিধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন: "আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকে বাণী পেয়েছি, মনে হয়, সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না।" শুধুমাত্র তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বা কাব্যেই গতিবেগকে অনুভব বা স্বীকার করেননি। তিনি সর্বত্রই গতির ধর্মকে লক্ষ্য করেছিলেন। কবি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালক পড়ুয়ার মধ্যে গতিধারাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর একটি পত্রে পাওয়া যায়: "তুমি মনে কোরো না, এখানে কোন স্রোত নেই, এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলছে, তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, তার বাণীর অন্ত নেই। এই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেছে, দূর থেকে আমরা তার আভাস পাই মাত্র।"

পদ্মা যে কেবল কবির জীবনে একটি গতিবেগের সঞ্চার করেছে, তা নয়। পদ্মা কবির একান্ত আপনার। তার সঙ্গে তাঁর জীবনের একটি নিবিড়, গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। কত সময় চলেছে দুজনের মধ্যে কত মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের কান্না-হাসি। কর্মের তাড়নায় যখন তিনি পদ্মাকে ছেড়ে চলে গেছেন, মনে হয়েছে পদ্মা যেন অভিমান ক'রে তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। প্রীতির গভীরতা না থাকলে এমনটি হয় না। কবি আবার ফিরে এসেছেন—পদ্মা যেন ইচ্ছে ক'রে তাঁকে চিনতে পারছে না। কবি দূর থেকে পদ্মাকে দেখে বলেন: "সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্প-লেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি এ আমার সেই পদ্মা।"

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর উপর একটি বিশেষ টান ছিল, পৃথিবীকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি স্বর্গ কামনা করেননি; এই 'সুন্দর ভুবনে' তিনি চিরদিন থাকতে চেয়েছেন। বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের সরল অনাড়ম্বর, সহজভাব তাঁকে গভীর ডাকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে তিনি বিশেষ ধরনের বৈরাগ্যের সুর শুনতে পেয়েছেন। এই ভাবগুলিই তাঁর সমস্ত কাব্যের মূল উপাদান বলা যেতে পারে। এইগুলি কবি লাভ করেছিলেন পদ্মার কাছ থেকেই।

পদ্মাকে কবি প্রেমের চোখে দেখেছেন। কত কথা দুজনে যে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার এ সম্বন্ধ যেন শুধু এ জন্মেরই নয়, বহু যুগ ধরে যেন তিনি তাঁর সঙ্গে যুক্ত—

"হে পদ্মা, তোমায় আমায় দেখা শত শত বার…………"। পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি কল্পনা করতে ব্যথা পান, কিন্তু কালের কঠোর শাসনে হয়তো একদিন দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, কিন্তু তিনি কামনা করেন আবার যেন জন্মান্তরে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হন। যদি পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাহলে যেন পদ্মাতীরেই আবার তাঁদের দেখা হয়।

পরমহংস

মোঃ ইকবাল হোসেন

মহৎ যাঁহারা, যাঁহারা সাধক, তাঁরা সবে এক জাতি,
নাই তাঁহাদের কোন ভেদ নাই, জাতির নাহিক' পাঁতি।
বিপুল এ ধরায় অযুত সমাজে যেখানেই তাঁরা যান,
সকল কলুষ তাঁদের পরশে হয় জানি অবসান।

শস্ত্রের মতো শাস্ত্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মন
ধর্মদ্বন্দ্বে শতধা ভিন্ন মোদের প্রাণ যখন,
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তখন শান্ত স্বরে
বাঁচালেন আসি, বাঁধিলেন সবে নূতন প্রীতির ডোরে।

শুনালো সে মুনি—অনুষ্ঠানের আলোড়ন মাঝে কভু
প্রাণের ঠাকুর সাড়া দেয় নাকো, জাগে না জীবন-প্রভু।
বিভেদ-বিচারে মানুষের মনে আঘাত হানিল যারা,
দেবতা তো নয়, দানব তাহারা—শান্তি-শত্রু তারা।

মানব-প্রেমের হে মহাপূজারী, বিপুল জ্যোতির অংশ,
সালাম তোমারে হে সাধু তাপস, সাধক পরমহংস।

* নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পঠিত।

সমালোচনা

What Vedanta means to me : A symposium. Edited by John Yale. Copyright : The Vedanta Society of Southern California (U. S. A.).

Published in America by Doubleday & Company Inc. Garden City, New York, (1960). Pp. 215. Price $ 3·95.

Published in England by Rider & Company, 178-202 Great Portland Street. London W-I. (1961) Pp. 176. Price 21s.

পাশ্চাত্য পাঠকের জন্য পাশ্চাত্য প্রথায় পরিবেশিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সারমর্ম—'What Vedanta means to me' (বেদান্ত বলিতে কি বুঝি)। 'বেদান্ত' বলিতে একদিকে যেমন বুঝায় হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, তেমনি ইহা আবার সকল ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সেদিক দিয়া বেদান্ত বিশ্বজনীন। বর্তমান সংকলনে সেই দিকটির উপর জোর দিয়া দেখানো হইয়াছে। সাধারণভাবে যাঁহারা প্রচলিত ধর্মগুলির উপর আস্থা হারাইয়াছেন, বেদান্ত কিভাবে তাঁহাদিগের অশান্ত উদ্‌বাস্ত মনকে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পুনর্বাসিত করিয়াছে, তাহারাই কয়েকটি অকপট বিবরণ এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। মনে হয়, এই দিক দিয়াই বর্তমান জগতে বেদান্তের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা।

গ্রন্থখানিতে বেদান্তের সূত্র-অনুযায়ী ধর্ম বা দর্শনের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, মনে করিলে পাঠক হতাশ হইবেন; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানসিক স্তরের মানুষের মনে বেদান্ত-চিন্তা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরিশেষে কিভাবে একটা শান্ত সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেয়, তাহারই সুন্দর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিবরণী এখানে পাওয়া যাইবে।

এলডুস হাক্সলি, ক্রিষ্টোফার ঈশারউড, জিরাল্ড হার্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকের মনে বেদান্ত কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছে; স্বামী অতুলানন্দ, জন ইয়েল, প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা প্রভৃতি পাশ্চাত্য নরনারীকে বেদান্ত কিভাবে ত্যাগের ও সাধনার জীবনে আকর্ষণ করিয়াছে—তাহা তাঁহাদের নিজের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও বেদান্তের শক্তিতে কিভাবে মানুষ স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার চিত্রগুলি মনোমুগ্ধকর।

লেখকেরা সকলেই পাশ্চাত্যে বেদান্ত-আন্দোলনের সহিত জড়িত, এবং প্রবন্ধগুলি ১৯৫১ খৃঃ পর হইতে বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি-পরিচালিত 'Vedanta and the West' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকশেষে লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তাঁহাদের বক্তব্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই জাতীয় আরও দুইখানি গ্রন্থ দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে: Vedanta and the Western World (1945), Vedanta for Modern Man (1951). পুস্তকগুলির মাধ্যমে আমরা বুঝিতে পারি—বেদান্ত কিভাবে পাশ্চাত্য মনীষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ভগবান রমন মহর্ষি—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১১৬; মূল্য টাকা ৩·২৫।

অরুণাচলের রমন মহর্ষির নাম আজ কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সাধক-সমাজে সুবিদিত। বাল্যেই সহসা দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির আভাস পাইয়া, কৈশোরে গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষকার-সহায়ে কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিকতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। সাধনার ও সিদ্ধাবস্থার যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু সাধকের জীবন-পথ আলোকিত করিতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই মহাপুরুষের জন্ম, সাধনা, সিদ্ধি, মহাসমাধি—সকল কথা সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণিত। একটি পরিচ্ছেদে মহর্ষির প্রধান উপদেশগুলি সঙ্কলিত। মহর্ষির দুইখানি ছবি এবং অরুণাচল মন্দির ও রমনাশ্রমের ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পাতায় পাতায় বানান ভুল বড় চোখে লাগে। যাই হোক—আজিকার অবিশ্বাসের যুগে এরূপ মহাপুরুষের জীবনকাহিনীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কল্যাণ (সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক)—হিন্দী পত্রিকা, ৩৫তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০; মূল্য টাকা ৭·৫০।

কল্যাণ-পত্রিকার এই 'সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক' প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের সংক্ষিপ্তসার। সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে একই তত্ত্বকে নানা সুন্দর কাহিনী ও অনুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম, নির্বাণ—এই প্রকরণগুলিতে যোগ, যোগসাধন, সদাচার, শাস্ত্রবিধিপালন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উন্নত বিচার-প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। পুরুষকার ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস চরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়—ইহাই যোগবাশিষ্ঠ বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়।

আলোচ্য বিশেষাঙ্কে ৭০০ পৃষ্ঠায় যোগবাশিষ্ঠের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সবই পাওয়া যাইবে। বহুরঙের ১৬টি এবং রেখা-চিত্র ১৩৬টি এবং অন্যান্য চিত্র দ্বারা ইহাকে আকর্ষণীয় করা হইয়াছে। হিন্দী ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা রচনাগুলি সুলিখিত। ছাপা উত্তম।

যুগশঙ্খ: মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, ১৩৬৬—ছাত্রসম্পাদক: শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে। বিদ্যামন্দির পত্রিকা পরিচালন-সমিতির পক্ষে শ্রীরাখালরাজ তরফদার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৩।

ছাত্রদের এই বার্ষিকীতে ৫টি প্রবন্ধ, ১৫টি কবিতা, ৫টি গল্প এবং ৩টি ভ্রমণকাহিনী স্থান পাইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে এই লেখাগুলিতে তরুণ মনের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে নিবেদিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতপ্রীতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের দান' ও 'উপহার' লেখা-দুইটির রচনাশৈলী ভাল। 'বিদ্যামন্দির-সংবাদ-পরিক্রমা' প্রবন্ধে জানিতে পারা গেল যে, ছাত্রেরা শ্রেণীহিসাবে সারা বছরে 'চিহ্ন', 'কুঁড়ি' 'শিক্ষা', 'স্বাক্ষর', 'অনামিকা', 'আবোল-তাবোল' প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে—ইহা তাহাদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজঃ (১) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের ১৯৬০-৬১ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খৃঃ। ৭ জন বিদ্যার্থী লইয়া স্টুডেন্টস্ হোমের কাজ আরম্ভ হয়, বর্তমানে ৩০০ জন বিদ্যার্থী বিনা খরচে থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার সর্ববিধ সুযোগ পাইতেছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ: উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ বিভাগ, শিল্প-বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সম্পূর্ণ আবাসিক। কলেজ-ছাত্রাবাসে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র থাকে। এতদ্ব্যতীত স্টুডেন্টস্ হোম কর্তৃক দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য। হরিজন বালকগণের জন্য একটি ফ্রি ছাত্রাবাসও পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য কার্য: টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের L.M.E. কোর্সের জন্য নূতন ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে, ল্যাবরেটরিও নির্মিত হইয়াছে। মাদ্রাজের গভর্নর শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী ১৩. ৩. ৬০ তারিখে এই ভবনের উদ্বোধন করেন।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি, '৬০ —মার্চ, '৬১) পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯২৫ খৃঃ চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৯৭০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৯৮,৬১৩ ('৫৯ খৃঃ ১,৫৪,১৭৫); এক্স-রে বিভাগে পাঁচ শতাধিক, চক্ষুবিভাগে ১৯ হাজারের অধিক, E.N.T. বিভাগে ১৬ হাজারের অধিক এবং দন্তবিভাগে ১১ হাজারের অধিক রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি করা হয়। রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ১০,০৯৭ শিশু চিকিৎসিত হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ১,৯৮৮। ১,৩৫,৮৫০ জনকে দুধ দেওয়া হয়।

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোন্নতির মুখ্য কারণ।

মাঙ্গালোরঃ কেন্দ্রের ১৯৬০-৬১ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৭ খৃঃ এবং মিশনের শাখা ১৯৫১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে স্কুলের ৩২ এবং কলেজের ১০ জন বিদ্যার্থী ছিল; মোট ৩৫ জন ছাত্র ফ্রি থাকার সুযোগ লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ে মোট ৪৫,৯৮৭ রোগী (নূতন ৮,২৫৪) চিকিৎসিত হয়।

আশ্রমে দৈনিক পূজা ভজন, সাময়িক উৎসব এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা হইয়া থাকে।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
জানুআরি :	
যিশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ	,, নিরাময়ানন্দ
,, ব্রহ্মানন্দ	,, জীবানন্দ
,, ত্রিগুণাতীতানন্দ	,, দেবানন্দ
ফেব্রুআরি : মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ	,, তেজসানন্দ
মার্চ : স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা	,, জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
আমার 'আমি'	স্বামী অজজানন্দ
মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
এপ্রিল : গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা	,, জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	,, সুশান্তানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শক্তিপূজা	,, জ্ঞানাত্মানন্দ
জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ	,, সম্বুদ্ধানন্দ
মে : শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত সোসাইটি : কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা :

জানুআরি, '৬১ : দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত; স্বামী বিবেকানন্দ; সাধুত্ব; শ্রীশ্রীমহারাজ; মনের শক্তি।

ফেব্রুআরি : নৈর্ব্যক্তিক জীবন; আত্ম-জ্ঞান; ভক্তি; ঈশ্বর এবং ঈশ্বরসদৃশ মানুষ।

মার্চ : শ্রীরামকৃষ্ণ; বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ; ভাল-মন্দের সমস্যা; নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে কঠোপনিষদের ক্লাস হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে :

জানুআরি : বিশ্বাস; আধুনিক মানুষের জন্য যোগ; স্বামী বিবেকানন্দ; সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন; স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ফেব্রুআরি : মনের পবিত্রতা; নৈর্ব্যক্তিক জীবন; বহুত্বে একত্ব; ভক্তি।

মার্চ : প্রার্থনা ও ধ্যান; শ্রীরামকৃষ্ণ; ভক্তের জীবন; ভাল-মন্দের সমস্যা।

রবিবারে বক্তৃতা ও মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত জানুআরি হইতে মার্চ পর্যন্ত শিলং, গৌহাটী, পাণ্ডু, আমিনগাঁও, কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ, রানীর হাট, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার জংশন, দমনপুর, নরেন্দ্রপুর, জগদ্দল, হরিনাভি, জয়নগর, বাটানগর, বাণীপুর ট্রেনিং কলেজ ও কলিকাতা লেক রোড ইত্যাদি স্থানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' এবং 'ভারতীয় নারী সম্বন্ধে জাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী' বিষয়ে মোট ৩৪টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৩০টি ছায়াচিত্র-যোগে প্রদত্ত।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ডিগবয় (আসাম) ঃ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৩০শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে দুইটি সাধারণ সভা, চারিটি কথকতা অধিবেশন, উপনিষদ্ ও কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ ও সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম সভায় (ইণ্ডিয়া ক্লাবে) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলায় এবং স্বামী ভব্যানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় সভায় (সেবাশ্রমস্থ সভাগৃহে) বক্তৃতা করেন স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী ভব্যানন্দ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও স্বামী পুরুষাত্মানন্দ।

এই উপলক্ষে স্থানীয় সারদাসঙ্ঘের উদ্যোগে ২রা এপ্রিল সূচী-শিল্প ও হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৫ই এপ্রিল সকালে উক্ত সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথা আলোচিত হয়।

৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সেবাশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

৪ঠা, ৫ই ও ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাক্রমে **মার্গারেটা, ডিনসুকিয়া** ও **মাকুমে** বক্তৃতা করেন স্বামী শিবরামানন্দ এবং সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা কথকতা করিয়া শুনান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

রগড়া (মেদিনীপুর) ঃ ৯ই এপ্রিল হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত রগড়া পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, নামসংকীর্তন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীতসহ কথকতা করেন। দুইটি অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা এবং একটি অধিবেশনে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কথকতা হয়।

কল্যাচক (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় এক জনসভায় স্বামী গোপেশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরা প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

১৮ই মে সকালে শিক্ষক-ছাত্র সম্মেলনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষা'-বিষয়ে আলোচনা হয়।

চেতলা (কলিকাতা) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে গত ৩১শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২রা এপ্রিল স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট বক্তাগণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

চাকদহ (নদীয়া) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রভাতফেরী, চণ্ডীপাঠ, পূজা ও হোম, কীর্তন-ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত

হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

উত্তরবঙ্গেঃ গত ৫ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন থানায় শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের নবনির্মিত সর্বজনীন উপাসনা-গৃহের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রায় তিন সহস্র নরনারীর মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরিত হয়। ছায়াচিত্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল।

৭ই ও ৮ই বৈশাখ গঙ্গারামপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যার পর সারদা-লীলা-গীতির অনুষ্ঠান করেন মালদহের সারদা-সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ। পরদিন ছায়াচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সঙ্গীতসহ বক্তৃতা হয়।

৩১শে বৈশাখ হইতে ৫ দিনব্যাপী ইটাহার থানার মারনাই গ্রামে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ ও পরে একদিন ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন-রচিত সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় যাত্রা এবং কীর্তনের ব্যবস্থাও ছিল। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রত্যহই প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইত।

উপরে উক্ত তিন স্থানেই মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরশিবানন্দ, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ উপস্থিত থাকিয়া গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করেন।

সানমুড়া (মেদিনীপুর)ঃ ২৮শে মে স্থানীয় অধিবাসিগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডী, গীতা ও কথামৃত পাঠ, ভক্তসেবা, ধর্মসভা প্রভৃতি কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল। সভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক শক্তিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বলেন। বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সভ্যগণ ‘বাংলার বিবেক’ অভিনয় করেন। পরদিবস সন্ধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত :

আগরতলা, চক-কাশীপুর (২৪ পরগনা), দোমড়া (বর্ধমান), খেপুত (মেদিনীপুর), শান্তিপুর, কুমিল্লা।

জনসংখ্যা : আয়ব্যয় : হ্রাসবৃদ্ধি

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ৪·৫ হইতে ৫·৫ কোটি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চলতি বৎসরের কোন সময়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৩,০০ কোটি দাঁড়াইতে পারে।

U. N. Bureau of Social Affairs-এর ৩৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণীতে বলা হইয়াছে: কম্যুনিস্ট চীন, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ভেনেজুয়েলায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। কৃষির উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে এবং রপ্তানী মূল্যের পরিবর্তন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কমিয়া গিয়াছে।

১৯৫৪-৫৮ খৃঃ মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, মিসর, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে

৫% হারে শ্রমিকের 'প্রকৃত বেতন' বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যাণ্ডে এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০% ও ৪০% হইতেও বেশি। ১৯৫৯ খৃঃ পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে এই বৃদ্ধি ৩% বা ততোধিক এবং পূর্ব-ইওরোপে ৪% হইতে ৫%।

সাপ্তাহিক নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টা স্থলে পশ্চিম জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজের সময় সাধারণতঃ ৪১ ঘণ্টা হইতে ৪৬ ঘণ্টার মধ্যে করা হইয়াছে এবং বৃটেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহা অপেক্ষাও কম।

ইওরোপীয় নারীগণের মধ্যে টিনে-ভরা, জমানো এবং তৈরী খাদ্যের ক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভ্রমণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, টেলিভিশন (T. V. Sets) এবং মোটরগাড়ীর ক্রেতার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুর্ঘটনা-জনিত মৃত ও আহত ব্যক্তির সংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে।

১৯৫৫-৫৯ খৃঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দুই বা অধিক মোটরগাড়ীর মালিকের সংখ্যা ১১% হইতে ১৫% তে উঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নে টেলিভিশন সেট, রেফ্রিজারেটার, ধোলাই-যন্ত্র প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়াছে; উৎপাদনের তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও রেডিওর চাহিদা কম, ঐগুলি দোকানে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ঘানা, মরক্কো, নাইজিরিয়া, মিসর এবং লঙ্কাদ্বীপে ১৯৫৩-৫৮ খৃঃ রেডিও ব্যবহার দ্বিগুণ হইয়াছে। [সংকলিত]

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

I. N. S. কর্তৃক প্রদত্ত এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০০। ইহার মধ্যে ৬৭% ম্যাট্রিক, ২১% ইণ্টারমিডিয়েট এবং ১২% গ্র্যাজুয়েট। এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩০ জনের কারিগরি ও বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে এবং শতকরা ২০ জনের কোন চাকরির অভিজ্ঞতা নেই।

(সংকলিত)

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৬শে মে স্বামী কৃষ্ণপ্রেমানন্দ (অখিল মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৪ মাস যাবৎ তিনি পাকস্থলীর রোগে (chronic gastritis) শয্যাগত ছিলেন।

১৯১৮ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট হইতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!



সন্ধান ও প্রাপ্তি *

স্বামী বিবেকানন্দ

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায় মন্দিরে মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ;
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ—
ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন রাত্রি মাস বর্ষ কেটে যায়,
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জন-কলরবে;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমায় পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।

কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত—মনে হয় যুগ যেন,
তখন—একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমায় আমারি নাম ধরে।

মৃদু মধু আশ্বাসের মতো এক স্বর—
'পুত্র! আমার পুত্র! পুত্র মোর!'
সে কণ্ঠ বাজলো হৃদয়ে একটি সুরে—
আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে।

---

* ১৮৯৩, ৩০শে অগস্ট—তারিখে বস্টনের অধ্যাপক (J. H. Wright) রাইটকে লিখিত পত্রের শেষে সংযোজিত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু।

উঠে দাঁড়াই। কোথায় সেই স্বর
যা ডাকছে আমায়—এমন ক'রে?
খুঁজে ফিরি এখানে, ওখানে—সেখানে,
বারে বারে—পথে ও প্রান্তে।
ঐ ঐ আবার সেই দৈবী স্বর!
ঐ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান!
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয়
ডুবে গেল পরমা শান্তিতে।

জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ!
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে—আমারি হৃদয়ে?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল—
রাজার গৌরবে!

সেইদিন থেকে যখনি যেখানে যাই
বুঝেছি হৃদয়ে, তুমি আছ পাশে পাশে
পর্বতে—উপত্যকায়—শিখরে—সানুতে—
দূরে বহু দূরে, ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে।

চাঁদের কোমল আলো, তারকার দ্যুতি,
দিবসের মহান্ উদ্ভাস—
সবার অন্তর-জ্যোতি রূপে প্রকাশিত,
তাঁরি শক্তি সকল আলোর প্রাণ।
মহিমার ঊষা তিনি, সন্ধ্যা বিগলিত,
অনন্ত—অশান্ত তিনি সমুদ্র,
প্রকৃতির সুষমায়, পাখীর সঙ্গীতে
শুধু তিনি, একমাত্র তিনি।

ঘোর দুর্বিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি,
অবসন্ন প্রাণ—ক্লান্ত ও কাতর,
যখন প্রকৃতি আমাকে চূর্ণ করে
ক্ষমাহীন তার নিয়মে—
তখনি তোমারি স্বর শুনেছি তো প্রিয়!
বলেছ গোপন মৃদুভাষে—'আমি এসেছি';
জেগেছি সেই স্বরে; তোমার সঙ্গে
সহস্র মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়।

তুমি আছ মায়ের গানে, যা শুনে
কোলের শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে,
তুমি আছ শিশুর হাসিতে ও খেলায়,
দাঁড়িয়ে থাকো তাদের মাঝে আলো ক'রে।

পবিত্রহৃদয় বন্ধুরা যখন মিলিত হয়
তাদেরও মাঝে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।
সুধা ঢেলে দাও তুমি মায়ের চুমোয়,
তুমি সুর দাও শিশুর মা-মা ডাকে।
প্রাচীন ঋষির তুমি ভগবান,
সকল মতের তুমি চিরন্তন উৎস,
বেদ বাইবেল আর কোরান গাইছে
তোমারি নাম উচ্চকণ্ঠে—সমস্বরে।

আছ, আছ, তুমি আছ;
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ[১]—আমার ঈশ্বর তুমি,
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি।

১ 'তৎ সৎ': সেই সৎস্বরূপ।
[স্বামীজীর টীকা: 'Tat Sat' means That only Real Existence]

ভাষাসমস্যা—সমাধানের পথে ?

ঘনকালো মেঘের কিনারায় রূপালী আলোর রেখা প্রমাণ করে—মেঘের পিছনে সূর্য রহিয়াছে। ভাষা লইয়া দেশে যে তাণ্ডব শুরু হইয়াছে, যে অনাচার অত্যাচারের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে মানুষের মন স্বভাবতই হতাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহারই মধ্য হইতে আশার আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যদি মনোযোগ সহকারে শান্তভাবে এবং মুক্ত মন লইয়া আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করি, দেখিব—ভারতের ভাষাসমস্যা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নহে। তবে কেন ইহা এত দুরূহ বলিয়া মনে হইতেছে? কেনই বা ভাষার জন্য এত দাঙ্গা মারামারি হইতেছে?

ভাষাসমস্যার দুইটি রূপ আছে, একটি প্রকৃত, অপরটি বিকৃত। প্রকৃত রূপ এই যে—প্রত্যেকে তাহার মাতৃভাষাকে ভালবাসে, অতএব সেই ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে, কর্মজীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যবহার করিতে চায়, ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। এই চিন্তার সূত্র লইয়াই একদিন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী উঠিয়াছিল। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ঐ প্রদেশের সংখ্যাগুরু অধিবাসিগণ নিজ ভাষাকে প্রদেশের প্রধান ভাষা করিতে চাহিবে, ইহাও প্রথমত ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু প্রদেশ হইতে যখন আমরা দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই দিশাহারা হইয়া যাই! ভারতবাসী—কোন্ ভাষায় কথা কহিবে, কোন্ ভাষায় পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া দেশের সমগ্রতা রক্ষা করিবে?

তখনই প্রশ্ন ওঠে- সারা ভারতের জন্য কোন একটি ভাষা চালু করা সম্ভব কিনা? যেহেতু ইংরেজ-শাসনের উত্তরাধিকার-রূপে আমরা ভারতের শাসনাধিকার পাইয়াছি, এবং যেহেতু ইংরেজ-শাসনাধীনে একটি ভাষা সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, সেহেতু আমরা মনে করিয়াছিলাম—ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর সহজেই একটি ভারতীয় ভাষা তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে। স্বাধীনতালাভের উদ্যোগপর্বে হিন্দীকেই ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টা মাননীয় নেতৃবর্গ করিয়াছিলেন, মোটামুটি তখনকার সংগ্রামের দিনে সকলে উহা মানিয়া লইয়াছিল; এবং ভারতের ভাষাগত ঐক্য সাধনের জন্য অনেকে ঐ ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর দুই দিক দিয়া ব্যাপারটি দাঁড়াইয়াছে অন্য রকম।

হিন্দীভাষা-ভাষীদের ধারণা—যেহেতু অন্যান্য ভাষার তুলনায় সংখ্যার দিক দিয়া হিন্দী একক গরিষ্ঠ (যদিও শতকরা চল্লিশেরও কম, তথাপি উহাই সর্বাধিক লোকের ভাষা), সেহেতু হিন্দীই ভারতের সাধারণ ভাষা—তথা সরকারী ভাষা হইবে। সংবিধানেও অতি সন্তর্পণে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, যতদিন না সমগ্র দেশবাসী নিজে হইতে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে পারে, ততদিন উহা কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, ততদিন ইংরেজীও চালু থাকিবে; তবে ক্রমশঃ ইংরেজীর ব্যবহার কমাইয়া দিতে হইবে। এতদর্থে মাঝে মাঝে ভাষা কমিশন ও পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিগণ

ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন। কিন্তু হিন্দীভাষিগণ একটু অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা যথাশীঘ্র সর্বব্যাপারে হিন্দী চালু করিতে চান। তাঁহাদের এই আবেগ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে। অন্যান্য ভাষাভাষীরাও তাঁহাদের ভাষার প্রাধান্যলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু এই অশোভন আবেগ ভাষাপ্রেমের লক্ষণ নয়, তাহার বহু প্রমাণই জনজীবনে আজ প্রকট হইয়াছে। সরকারী ব্যাপারে, সর্বভারতীয় চাকুরীর পরীক্ষাব্যাপারে যাঁহারা হিন্দীকে প্রাধান্য দেন, তাঁহারাই আবার বেসরকারী ব্যাপারে, চিঠিপত্রে, ব্যবসাবাণিজ্যে, সভা-সমিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও ইংরেজী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা জানেন—ইহাই উচ্চশিক্ষিতস্তরে সর্বজনবোধ্য ভাষা। সর্বাধিক দুঃখের বিষয়, জাতির নেতাগণ দেশবাসীর উন্নতির জন্য হিন্দীমাধ্যম বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার করেন, কিন্তু নিজ নিজ পুত্র-কন্যাগণকে ইংরেজীমাধ্যম মিশনরী স্কুলে প্রেরণ করেন। তাই বলিতেছিলাম—কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, কি প্রদেশে, ভাষা আন্দোলনের মূল কারণ ভাষাপ্রেম নয়, রাজনীতিক অধিকার লাভ—অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীকে বঞ্চিত করিয়া, এবং অনেকক্ষেত্রে সংবিধানকে লঙ্ঘন করিয়া।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি কিভাবে এ সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে? মধ্যযুগে ল্যাটিনের মাধ্যমে ইওরোপের ধর্মীয়-রাজনীতিক ঐক্য বজায় রাখা হইয়াছিল, রেনেসাঁর পর ভাষাভিত্তিক ছোট ছোট রাজ্যে ইওরোপ ভাঙিয়া যায় এবং ক্রমশঃ ফরাসীই সেখানে সাধারণ ভাষা রূপে চালু থাকে, এখন ইংরেজী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী! আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাসমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ ইংরেজ নারীই অধিক সংখ্যায় সে দেশে গিয়াছিল—তাহারাই জাতিকে ইংরেজী ভাষা দিয়াছে। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী দুইই চালু আছে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় ল্যাটিনজাত ভাষাগুলি প্রবল।

এখন দেখা যাক, রাশিয়া কিভাবে তাহার বিরাট রাষ্ট্রের ভাষাসমস্যার সমাধান করিয়াছে। সেখানে ৫০টি জাতির ৭০টি ভাষা! 'ভাষার জন্য কেহ সুবিধা পাইবে না, ভাষার জন্য কেহ নির্যাতিত হইবে না',—ইহাই সেখানকার নীতি। বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সেখানে অনুভূত হয় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাই অবশ্য মাধ্যম; উচ্চতর শিক্ষায় ক্রমশঃ সমৃদ্ধ রাশিয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ভাষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এটি কোন ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ লইয়া খেলা করা চলে না। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভারতের জন্য একটি ভারতীয় সাধারণ ভাষা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কি জোর করিয়া সম্ভব? না ধীরে ধীরে ক্রম-বিকাশের পথে উহা আসিবে? যতদিন তা না আসে ততদিন 'স্থিতাবস্থা' রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই প্রকার পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিয়া, এবং পারস্পরিক সাহিত্য অনুবাদ করিয়া জাতীয় ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আসামের ব্যাপার দেশের সকলকে চিন্তিত করিয়াছে; কিন্তু রাজনীতিকগণ যে ভাবে উহার সমাধান করিতে চাহিতেছেন, তাহা নিতান্ত

সাময়িক, স্থানীয় প্রলেপের মতো। সমস্যার গুরুতর দিকটি—তাঁহারা হয় দেখিতে পাইতেছেন না, নয় উপেক্ষা করিতেছেন।

আসামের প্রকৃত ব্যাপার ভারতের অন্যত্র অনেকেই ঠিক জানেন না। অধিকাংশ ব্যক্তিরই ধারণা বঙ্গভাষীরা সকলেই সেখানে প্রবাসী ও বহিরাগত। কিন্তু যাঁহারা গত ৫০।৬০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—আসাম একটি বহুভাষী অঞ্চল, অন্যান্য প্রদেশের মতো ওখানে একটি ভাষাকে প্রধান করিয়া ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করা ঠিক হয় না। একদিক দিয়া বলা যায়, বহুভাষী আসামের পরীক্ষা-পাত্রে (test-tube) সারা ভারতের ভাষাসমস্যা আজ সমাধানের উপায় খুঁজিতেছে।

অশীতিপর প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ (statesman) ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ভারতের দুঃখ-দায়ক ভাষাসমস্যার সমাধানের যে সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য, এবং জাতির নেতৃবর্গের বিশেষভাবে বিবেচনীয়। যদি এই সূত্র যথোপযুক্ত আলোচনার পর বিধানে পরিণত হয়, তবে বহু অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধ হইবে; আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নষ্ট না করিয়াও ভাষাজনিত প্রাদেশিক বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে। মনোভাবের দিক দিয়া খণ্ডবিখণ্ড না হইয়া শান্তিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভারত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমরা ডক্টর রায়ের প্রস্তাবের মূল সূত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি :

(১) যতশীঘ্র সম্ভব ঘোষণা করা উচিত—ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যই বহুভাষী। প্রয়োজন হইলে এই ঘোষণার পূর্বে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঐরূপ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হইতে পারে। কোন রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া সেখানে একাধিক সরকারী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

(২) ভারত সরকারের ১৯৫৬ খৃঃ 'স্মারক-লিপি' পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে প্রতিটি রাষ্ট্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুগণের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে কিনা।

(৩) ভাষাগত সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানের ৩৪৭ ধারার ভাষা পরিবর্তন করিয়া এমন করিতে হইবে—যেন রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে সংবিধানের রচয়িতাগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিতে পারেন।

সমাধানের সূত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। দলীয় রাজনীতির বহু ঊর্ধ্বে দূরদৃষ্টিপ্রসূত এই নীতিগুলিকে সমর্থন করিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫শে জুন Amrita Bazar Patrikaয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিও আমরা দেশবাসীর ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাই ভারতের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষা করিতে পারে। সুদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরাও এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি :

'The two languages, English and Sanskrit, can be complimentary to each other, for maintaining the intellectual, administrative and political as well as the spiritual and cultural unity of India during these troubled times, these crucial decades, through which we shall have to act with justice, with caution, with tact, with a sense of the realities, and with imagination and circumspection.'

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা করে! সবে মাত্র সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার নিয়মতান্ত্রিক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে গিয়াছে; ধর্ম-ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ঘোষিত হইয়াছে; পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মনে একটা নিরাপত্তার ভাব আসিয়াছে, যাহা ভারতে সহস্রাধিক বৎসর ছিল না। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারতের সুপ্ত প্রতিভা দিকে দিকে বিকশিত হইতে লাগিল। এই দশকেই এমন সব মহামনীষী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের গর্ব ও গৌরব। বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বাধীন ভারতে জাতীয় মর্যাদা সহকারে তাঁহাদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি।

১৮৬৩ হইতে ১৯০২; মাত্র ৩৯ বৎসর! ইহারই মধ্যে স্বামীজী তিনটি মহাদেশে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পরে—তাহা অবধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার বহুমুখী ব্যক্তিত্ব এক এক জনের কাছে, এক এক দেশে এক এক ভাবে প্রতিভাত! আবার দেখা যাইতেছে কালভেদেও তাঁহার বাণীর নূতন নূতন অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে। সনাতন ভারত তাঁহার মধ্যে পাইয়াছে প্রাচীনতম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। নূতন ভারত তাঁহার মধ্যে পাইয়াছে নবতম জীবনের উদ্‌গাতা—জাতীয় জাগরণের প্রথম হোতা! পাশ্চাত্য তাঁহার মধ্যে এক যোদ্ধার সহিত সম্মুখীন হইয়া পরে বরণ করিয়া লইয়াছে আগামীযুগের ধর্মগুরুকে—নবমানবতার মন্ত্রদাতাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠভাবগুলির সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মানবের বিশ্বব্যাপী যে নূতন কৃষ্টি গড়িয়া উঠিবে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনায়—বাণী ও রচনায় তাহারই ইঙ্গিত!

মূর্খ তাহারা, যাহারা স্বামীজীর উদার বেদান্ত প্রচারের মধ্যে 'সেকেলে' সাম্প্রদায়িকতা দেখিয়া থাকে; বিকৃতমস্তিষ্ক তাহারা, যাহারা তাঁহার দেশপ্রেমে রাজনীতির গন্ধ পায়; কৃপার পাত্র তাহারা, যাহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে কেবল ইহবিমুখ মোক্ষমার্গই সন্ধান করে।

স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্ম অতি ব্যাপক, মানব-জীবনের ও সমাজের সকল দিকেই তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টি, সকল সমস্যার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাই আমাদেরই নিজেদের জীবন-সমীক্ষা। তাঁহার শতবার্ষিকী কেন্দ্র করিয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া তাঁহার চিন্তাসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে অমৃতশক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য।

স্বামীজী কোন বিশেষ দেশের নয়, বিশেষ জাতিরও নয়। সকল দেশ সকল জাতি তাঁহার যুগোপযোগী শিক্ষা হইতে নিজ নিজ উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে ও পাইবে, —এই বিশ্বাসেই আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতেছি তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকীর উৎসবের আয়োজনে যোগ দিতে।*

---

* এ বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ দ্রষ্টব্য এই সংখ্যার ৩৮০ পৃষ্ঠায়।

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল 'সভ্যতা'। তাই সভ্যতার মানদণ্ডে আমরা সকল ব্যক্তি বা জাতকেই মেপে নিতে চাই। ঐ একটি জিনিষের অভাবেই কি মানুষ, কি জাত অনেক নীচে পড়ে যায়। তার কাছ থেকে তখন আমাদের আর কিছুই শিখবার নেই, বরং তাকে আবার 'সভ্য' ক'রে তোলবার চেষ্টা জাগে! কিন্তু এই সভ্যতা কি? প্রকৃত সভ্যই বা কারা?

ওদেশে বলে—সেই জাতই সভ্য যে জাত বেশী সাবান ও কাগজ ব্যবহার করে। কেবলমাত্র এই দিক দিয়ে বিচার করলে অনেকেই কিন্তু আপত্তি তুলবেন। কেউ বলেন—সভ্যতার মানদণ্ড হচ্ছে ভাল কাপড়চোপড়, মোটরগাড়ী, টাকা। কিন্তু যে-কোন বড়লোকের ছোট্ট ছেলেটির বা পাগল ছেলেটারও তো ঐ সব থাকতে পারে। তাই বলেই কি তারা সভ্য? কেউ বলবেন—সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে যন্ত্রপাতির আধিক্য—রেলগাড়ী, বেতারবার্তা, ছায়াচিত্র প্রভৃতি—কিন্তু এসবও যে-জাতের বেশী আছে তাকেও সব সময় 'সভ্য' ব'লে মেনে নিতে রাজী নই। আবার কারো কারো মতে তারাই সভ্য যাদের মধ্যে শেক্সপিয়রের নাটক, রাফাএলের ছবি এবং বিঠোফেনের গান বেশী চালু; তাহলেও দেখা যাবে—ঐ সব নিয়ে যারা ব্যস্ত, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; এবং সেই কারণে বাকী সকলকে অসভ্য বললে—সভ্য ব'লে আর কিছুই থাকে না। ভাল 'খানাপিনা'কেও সভ্যতার মাপকাঠি ধরা যায় না। এদের অনেককেই আমরা সভ্য বলতে রাজী নই, অথচ স্বল্পাহারী উলঙ্গ সাধুকেও সভ্য বলতে বাধে না। কেউ যদি বলেন, সভ্যতার মানদণ্ডে তারাই বড়, যারা নিছক দানবীয় শক্তিতে অপর জাতিকে অধীনস্থ ক'রে সাম্রাজ্য গড়েছে—এতেও আপত্তি তুলব। কেউ হয়তো বলবেন—যে জাত বেশী দিন বেঁচে আছে, তাদেরই সভ্য বলা চলে। এ বিচারে মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারদেরই বেশী সভ্য বলতে হয়। তা ছাড়া মানুষের মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন জাত ছিল বা আছে, যারা এই পৃথিবী থেকে প্রায় মুছে গিয়েও দু-চার-দশজনের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ পরমায়ু-বিচারে তাদের আজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মুকুট পরিয়ে দিতেও অনেকের বাধবে। তবে যদি কেউ বলেন, সেই জাতই সভ্য যে জাত নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্কার এবং সুন্দর সামাজিক আইনকানুন প্রভৃতি নিয়ে চলেছে—তাহলে অবশ্য তাকে অস্বীকার করা শক্ত। তথাকথিত লেখাপড়ার অনুপাত একদেশে বেশী হলেই যে, সে দেশ সভ্যতায় আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গেল, এ কথাও মানতে পারি না।

আমাদের দেশেও সভ্যতার একটা সংজ্ঞা আছে। 'সভ্যতা' কথাটি 'সভা' শব্দ থেকে এসেছে। ঋগ্‌বেদের যুগের শেষের দিকে আমরা 'সভা' বলতে বিচার-সভা বুঝতাম এবং তার বিচারকদের 'সভ্য' ব'লে জানতাম। অথর্ববেদে দেখি—যে ঘরে অগ্নিকে রক্ষা করা হয়েছে তাকে সভা বলা হ'ত, এবং ঐ অগ্নিকে 'সভ্য' বলা হ'ত। শুক্ল যজুর্বেদের পুরুষমেধ-অংশে 'সভা' বলতে বিচারসভাকে বুঝি। পরবর্তী যুগেও পারস্কর গৃহ্য-সূত্রে 'সভা' বলতেই যে বিচার-সভা, তার সম্যক বর্ণনা তাতেই রয়েছে। বৌদ্ধ জাতকেও 'সভা'র উল্লেখ রয়েছে—

এবং এই সভ্যেরা (এখানে সভ্য বলতে অগ্নি নয়, মানুষ) যদি যথার্থ ন্যায়নিষ্ঠ বা ধর্মানুগ না হতেন তা হ'লে তাঁদের সমাবেশকে সভা বলা হ'ত না। এই সভায় গুণবিচারে তাঁরাই সভ্য, যাঁরা নিঃস্বার্থ, নির্ভীক এবং সদ্‌বিচারশীল। নারদীয় গৃহ্য-সূত্রে দেখি সভার সভ্যরাই বিচারকদের নির্বাচন করছেন।

বেশ বুঝছি, আমাদের দেশের সভ্যতার সংজ্ঞায় একটা আন্তর দৃষ্টি আছে—ওদেশের মতো তার সবটাই বাইরের বিচার নয়। এই প্রভেদেরও কারণ আছে। ওদেশের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'করা' আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'হওয়া'। আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব আন্তরিক কিছু হওয়ায়, বাইরের কিছু পাওয়ায় নয়। একজন লিখেছেন—'হনুমান রামচন্দ্রের জন্য এত করলেন অথচ তাঁকে কোন পদবী দিলেন না তিনি রাজা হয়েও।' নিজেকে হনুমানের মতো পরার্থে বিলিয়ে দিয়ে পরিবর্তে কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না রাখার মনোবৃত্তিই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশী। গানে গানে গেয়ে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি।" এই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করি বলেই সভ্য।

আমাদের সভ্যতা জড়ত্বকে ধরে বসে নেই, চৈতন্যকে ধরে দাঁড়িয়েছে। ওদেশও আজকাল একথা বুঝছে, তাই Powel এক জায়গায় বলেছেন : Materialism like influenza is endemic amongst us—ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো জড়বাদ আমাদের মধ্যে সব সময়েই ছড়িয়ে রয়েছে। তার ফলে আজ আর প্রচার-ক্ষুধায় জর্জরিত বড়দের জন্য আমাদের আত্মাহুতি নেই, তাঁদের ফটো তুলবার জন্য হঠাৎ-জলা বাতিগুলোই প্রাণ দেয় মাত্র। এই প্রচারমুখী সভ্যতার যুগে আদর্শ চরিত্র দেখে অনুকরণ করবার সুযোগও শিশুদের নেই। আমরা ভুলে গেছি এই সভ্যতা প্রসঙ্গে দীপশিখার উদাহরণ, অথচ এই দীপশিখা জ্বালিয়েই আমাদের সকল পূজা-পার্বণ চলে। এই দীপশিখাই আমাদের সভ্যতার, আমাদের আন্তর চরিত্রের প্রতীক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দীপশিখা নিজে যে পরিমাণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে।" এই অন্যের দৃষ্টিকে তথা দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের চরিত্র, আমাদের সভ্যতা। দধীচি তাই আমাদের সভ্যতার আদর্শ। আজ সেই আদর্শচ্যুত হয়েছি বলেই—পাখীর মতো মানুষ আকাশে উড়তে শিখেছে; মাছের মতো জলের নীচে সাঁতরাতে শিখেছে, কিন্তু মানুষের মতো ডাঙায় বাস করতে শিখল না। এই শিখল না বলেই আজকে অনেক মানুষকে সভ্য বলতে বাধে।

সভ্য হ'তে গেলে বাইরের ঐ ভোগের পথে ছুটলে চলবে না, ত্যাগের প্রেরণায় এগোতে হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে : যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—মানুষের মধ্যে কাম ও বাসনা যখন সমূলে ধ্বংস হয়, তখনই মানুষ অমৃত হয় এবং তখন এই পার্থিব দেহেই ব্রহ্মলাভ করে।

সভ্যতার আদর্শ এই 'অমৃত' হওয়ায়। তাই চল পথিক ঐ অমৃতলাভের পথে—সেই বৈদিক প্রতীক অগ্নিশিখার 'সভ্য' দীপ্তিকে স্মরণ ক'রে সভ্যতার পথে। চল ত্যাগের পথে, চল নির্ভীকভাবে—চল সব বিলিয়ে, সভ্য হয়ে 'আপন'-ভাবে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীম-সমীপে

স্বামী ধর্মেশানন্দ

প্রথম দর্শন

১৯২০-২১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত ভাই ভূপতি মহাশয়ের শিষ্য আমার বন্ধুপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ স্কুল-বাড়ীর চার-তলার ছাদে অনেক ভক্ত মধ্যে সমাসীন প্রশান্ত গম্ভীর 'শ্রীম' অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়কে আমি প্রথম দর্শন করি। তখন উত্তর কলিকাতায় দর্জিপাড়ায় থাকি ও সিটি কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার বয়স তখন ২১।২২ হইবে। ছিদাম মুদীর লেনে সুরেনবাবুর সহিত শ্রীশ্রীভূপতিনাথের নিকট প্রায় যাইতাম। সুরেনবাবুর নিকট হইতে একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত চতুর্থ ভাগ পাইয়া খুব তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সুরেনবাবু বলিলেন, লেখক 'শ্রীম' অর্থাৎ পূজনীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। আপনার যখন 'কথামৃত' ভাল লাগিয়াছে, তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত সরাসরি শুনিলে অপূর্ব ভাব-সম্পদ্ লাভ হইবে, তাহাতে মনের ক্ষুধা দূর হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

এই কথার পর একদিন বৈকালে দুইজনে মিলিয়া শ্রীম-সমীপে উপস্থিত হইলাম। অল্পবয়স্ক হইলেও আমাদিগকে তিনি সমাদর করিয়া বসাইলেন। শ্রীম চেয়ারে আসীন, আমরা অনেকে বেঞ্চে বসিয়া আছি। বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীম আমাদের হাতে হাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ (শুষ্কপ্রসাদী তণ্ডুলকণা) দিলেন ও ৺মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন, 'এই মহাপ্রসাদ ধারণ করলে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয়।' আমি তখন ব্রাহ্মসমাজে যাই, তদুপরি ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করাটা কুসংস্কার মনে করি, তবে মনের শক্তি মানি। কলিকাতায় দু-তিন বৎসর বাস করিয়া চটপট কথা বলিতে শিখিয়াছি, বলিয়া ফেলিলাম, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস ক'রে খেলে ভক্তিলাভ হ'তে পারে।'

শ্রীম—না, বস্তুধর্ম আছে, যেমন ক'রে খাও, মন পবিত্র হবে, ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি লাভ হবে।

আমি—তা, কেমন ক'রে হবে, মনই তো সব, মনে অবিশ্বাস থাকলে কেমন ক'রে হবে?

শ্রীম—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, যেমন ক'রে খাও ভক্তিলাভ হবে।

আমি—তা কি ক'রে মানি?

এই কথা শুনিয়া শ্রীম গম্ভীর হইয়া গেলেন, চেয়ারটি একটু ঘুরাইয়া অন্য দিকে ভক্তমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া বাঁ হাতের তর্জনী আমার দিকে ঘুরাইয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন: ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্তি হবে', আর ইনি ঠাকুরের কথা নিচ্ছেন না। সকলে নিস্তব্ধ, সুরেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি হতবাক্ হইয়া অধোমুখ হইয়া রহিলাম। ভাবিতেছি, আমার এত স্পর্দ্ধা ভাল নহে। কাহার সঙ্গে

কথা কহিতেছি, ইনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত লোক!

শ্রীম তখন সস্নেহে বলিলেন: শোন, একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বললেন, 'রথযাত্রা হয়ে গেল, এই সময় শ্রীক্ষেত্র থেকে রথযাত্রীরা ফিরছে, তুমি স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে আমার জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসো, আমি ঐ প্রসাদ গ্রহণ ক'রব। প্রসাদ ধারণ করলে অন্তরে ভক্তিলাভ হয়।' আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে প্লাটফর্মে যাত্রীদের নামতে দেখে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে বলতে লাগলাম, 'একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন?' ভদ্র-বেশধারী আমাকে ঐরূপে ভিক্ষা করতে দেখে কেউ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল, কেউ বা দ্রুত-বেগে চলে গেল, কোন কোন মহাজন আমার অন্তরের ভাব বুঝে আট্‌কে খুলে সযত্নে বা অযত্নে আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ নিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কত খুশী! তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আমি কৃতার্থ হলাম। ঠাকুর এর দু-একটি দানা রোজ খেতেন, আমাকেও রোজ সকালে খেতে বলেছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস কর। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—আর অন্য উপায় নেই।

আমি দু-এক কণা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব ও অপরোক্ষ বিশ্বাসের এক প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পরে ১৯২৪ খৃঃ হইতে ক্রমাগত শ্রীম-সমীপে যাইতে যাইতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

উৎসাহদান

১৯২৪ খৃঃ কোন সময়ে বিবেকানন্দ সোসাইটির ব্রহ্মচারী তারকের সঙ্গে একদিন শ্রীম-র নিকট যাই। বোধ হয় এই দ্বিতীয় দর্শন। তখন আমি 5th year-এ পড়ি। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিয়া পড়াশুনা করি। সোসাইটির কিছু কাজও করি। তন্মধ্যে ঠাকুরপূজা, লাইব্রেরী দেখা, এবং সাময়িক সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা। তারক ইতিপূর্বে দু-একবার গেলেও বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমরা একরূপ নবাগত। শ্রীম আমাদের সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মনে আছে, চারতলার একটি বারান্দায়—ছাদের সম্মুখে।

শ্রীম—(তারককে) তুমি ওখানে কি কর?

তারক—আমি বিবেকানন্দ সোসাইটির চাঁদা সংগ্রহ করি এবং সোসাইটির সম্পাদক মহাশয়কে কার্যে সাহায্য করি। প্রতি মাসে কোন ভক্ত সদস্যের বাড়ীতে সোসাইটির তরফ থেকে একটি সভায় ধর্মবিষয়ে আলোচনা এবং ভজনাদির ব্যবস্থা করি। সোসাইটির গৃহে রামনাম-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সপ্তাহে দুটি ক'রে ঠাকুর-স্বামীজীর বইয়ের ক্লাসও হয়।

শ্রীম—বাঃ চমৎকার, এই তো ঠিক কর্মযোগ—স্বামীজী যা ব'লে গেছেন। নিষ্কামভাবে করতে পারলে, এতেই জ্ঞানভক্তি লাভ হয়।

শ্রীম-র এই উৎসাহ পাইয়া তারক অতিশয় হৃষ্ট হইল। কারণ সংসারে তাহার নিকট আত্মীয় কেহ নাই। সে সোসাইটির কার্যে ধীরে ধীরে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছিল। শ্রীম-র উৎসাহ পাইয়া সে রাত্রে সোসাইটিতেই থাকিতে আরম্ভ করিল। আমার দিকে তাকাইয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কর?

আমি—ওখানে ঠাকুরঘরে নিত্যপূজা ও আরতি করি।

শ্রীম—উৎকৃষ্ট কাজ পেয়েছ। চমৎকার, এ কাজে তোমার ভক্তিলাভ হবে। দেখ, ফুলের কি পবিত্র মনোহর গন্ধ। তুমি সেই ফুল

নিয়ে পরম পবিত্র শ্রীভগবানকে নিবেদন ক'রছ। চন্দন ঘষার সময় ওর সুগন্ধ চিত্ত হরণ করে। আবার সেই চন্দন তুমি ভগবানকে অর্পণ ক'রছ। তাঁকেই হৃদয়ে ধ্যান ক'রছ। এ কাজটি তুমি ছেড় না। পূজার দ্বারা অতি শীঘ্রই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। পবিত্রভাবে একাগ্র মনে পূজা ক'রে শেষে প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করবে। আর আরতির ভজন শুনলে মন আপনিই একাগ্র হয়, চেষ্টা ক'রে ধ্যান করতে হয় না। বেশ, বেশ!

অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দু-জনের পৃথক্ পৃথক্ কাজের গুণকীর্তন করিয়া শ্রীম যেন আমাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন।

১৯২৪ খৃঃ আমার এক দাদা একবার কলিকাতা হইতে বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাশী গিয়া সেবাশ্রমে কিছুদিন থাকেন এবং সেখানে সাধুসঙ্গে প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। কাশী যাইবার প্রাক্কালে আমার সহিত তিনি শ্রীম-কে দর্শন করিতে যান। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীম জানিতে পারেন যে, আমি সংসারী হইতে চাই না। দাদার ইচ্ছা ছিল, আমি সংসারী হই, চাকরি করি। আমার একটি চাকরিও জুটিয়াছিল, কিন্তু আমি গ্রহণ করি নাই। এ সকল কথা শুনিয়া শ্রীম দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—যে বংশে ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে একজন সাধু হয়, সে বংশ ক্রমশঃ পবিত্র হয়ে যায়। মা, ভাই—সবাই সেই সাধুকে চিন্তা করে কিনা, তাই তারা অন্তরে সাধু হয়ে যায়। যে যার চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কর?'

দাদা—ব্যবসা করি।

শ্রীম—উত্তম, চাকরির অপেক্ষা ব্যবসা ভাল। স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা ধর্মলাভে সাহায্য করে।

আমরা উভয়ে শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

সাধু সাবধান

নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে শ্রীম কাম-কাঞ্চন হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিতেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী, শ্রীম-র নিকট গিয়াছি; ঠাকুরবাড়ীতে, সকালের দিকে শ্রীম তখন একাকী ছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'আজকাল দেখি, নবাগত ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থের বাড়ীতে চাঁদা সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে।'

আর একদিন এক ভক্তের নিকট কাঞ্চনের আশায় উপস্থিত এক ব্রহ্মচারীকে সুকৌশলে ।ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহাতে সাধু ভক্তের মুখাপেক্ষী না হয়, বরং ভক্তই যেন সাধুর নিকট শ্রদ্ধাপূর্বক আসে। সাধু একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভরশীল হইবে। ধনী ভক্তের অপেক্ষা রাখিবে না। এইভাবে শ্রীম শিক্ষা দিতেন। আর বলিতেন, 'আজকাল, দেখি নূতন ব্রহ্মচারীরা গুরুর নিকটে বাস, গুরুসেবা, ঠাকুর-সেবা, শাস্ত্রপাঠ ছেড়ে অর্থান্বেষণে বেরোয়, অল্প-বয়সী গৃহস্থদের সঙ্গে মেশে। আরও শুনছি বয়স্ক সাধুরাও ভক্তের খরচায় তীর্থে গিয়ে তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পোঁটলা-পুঁটলি সামলায়।

জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বলিলেন, 'পূর্বে গুরু মুখ হ'তে উপদেশ পেয়ে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ ক'রত। আজকাল অনেকে শুধু lecture (বক্তৃতা) শুনতে চায়। গৃহস্থ বক্তার বক্তৃতার মূল্য আর কত? তারা তো সেইভাবে জীবনযাপন করে না, কেবল

বক্তৃতাই দেয়। ওর মূল্য চার আনা। ধর্ম-জীবন যাপন করা, ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা, সাধনাদি—এ সব individual problem (ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু), গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু শিষ্যের অন্তর জানেন, কখন কোন্ উপদেশটি দরকার—তিনি জানেন। একি আর সভা-সমিতিতে ধর্মোপদেশ শুনে হয়?' এইরূপে শ্রীম ব্যক্তিগতভাবেই নূতন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সুপথে চালিত করিতেন।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রীম-র ভক্তি অনির্বচনায়। মাকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের লক্ষ্মীরূপে দেখিতেন। বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে মাতৃদর্শনে যাইতেন, সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া ফিরিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের বহু পরে ১৯৩১ খৃঃ একবার শ্রীম-র সহিত মায়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। শ্রীম বড় এক চ্যাঙারি সন্দেশ ঠাকুরের ভোগের জন্য লইলেন। আমরাও ৪।৫ জন তাঁহার সহিত সকাল ৮টা আন্দাজ শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে উপস্থিত হইলাম। যে ঘরে মা মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে এখন ঠাকুরের পূজা হয়। মায়ের খাট পালঙ্ক শয্যা এখনও সেই ঘরে সেইভাবে আছে। শ্রীম মায়ের খাটের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল। আমরা সকলে ফিরিলাম।

একবার একটি ভক্তকে তিনি মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরের সম্বন্ধে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। মা তখন উদ্বোধনে বাস করিতেছেন। শরীর খুব সুস্থ নয়। মা উপরের ঘরে কুলবধূর মতো সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, কেবল শ্রীচরণ দুইটি দেখা যাইতেছে। ভক্ত মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। মা কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং ভক্তটি অল্পবয়স্ক বলিয়া করুণা-পূর্বক কোন একটি কাজেও পাঠাইলেন। ভক্তটি এইরূপে সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইল, কিন্তু মনে বড় দুঃখ রহিল, কারণ তিনি মায়ের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পান নাই। তখন মা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন।

ভক্তটি শ্রীম-র নিকট ফিরিয়া গিয়া একটু বিমর্ষ হইয়া বলিল, 'মা আমায় দেখেছেন বটে, কিন্তু আমি মায়ের মুখ দেখতে পাইনি।' শ্রীম বলিলেন, 'তুমি তাঁর চরণ স্পর্শ করলে, তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করলেন—আর কি বাকি রইল? তুমি আজ থেকে অভয়ার আশ্রয় পেলে, নির্ভয় হ'লে। মা লক্ষ্মী তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন।'

শ্রীম-র অন্তর্নিহিত ভক্তি ফল্গুধারার মতো শ্রীশ্রীমায়ের চরণাভিমুখে সতত প্রবাহিত হইত। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতি মাসে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় টাকা পাঠাইতেন। জয়রামবাটী হইতে একজন সামান্য লোক আসিলেও শ্রীম-র নিকট সম্মান ও সমাদর লাভ করিত।

কুম্ভমেলা

১৯৩০ খৃঃ জানুআরি মাস, আমি তখন বেলুড় মঠে আছি। শ্রীম-র কাছে মাঝে মাঝে যাই। কুম্ভমেলার কথা শুনি। এই মাঘ মাসে প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে। বেলুড় মঠ হইতে অনেক সাধু একখানি Reserved গাড়ীতে প্রয়াগে যাইতেছেন শুনিয়া আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কুম্ভমেলার সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। একদিন শ্রীম বলিতে লাগিলেন, 'ধীরেন, তুমি কুম্ভমেলায় যাও। বেশ হবে, দেখিবে সাধুদের একটি সমাজ আছে। সংসারের প্রতি ঘনিষ্ঠতা

কমে যাবে। ওখানে নানা সম্প্রদায়ের সাধুর সমাগম হয়। প্রতিদিন মাসাধিককাল তথায় ঐ সব সাধুর সমাজে ভগবদ্গুণগান, শাস্ত্রচর্চা, ভাণ্ডারা, শোভাযাত্রা দেখলে আনন্দ পাবে ও অনেক অভিজ্ঞতা হবে।'

শ্রীম-র কথায় কতকটা উৎসাহিত হইলাম বটে, তখনও মনে হইতেছিল—মঠে থাকিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করি। মহাপুরুষ মহারাজের সেবকদের মধ্যে দু-এক জন কুম্ভমেলা দেখিতে যাইবেন, শুনিলাম। একজন সেবকও আমায় বলিলেন, 'এই সময় যদি তুমি মঠে থাক, তোমার সেবার সুযোগ মিলবে।' শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলিয়া ফেলিলাম, 'আপনার সেবা ক'রব।' তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তোর যে রোগা শরীর, তোর সেবা করে কে?'

যাহা হউক অনেক বাধা সত্ত্বেও কুম্ভমেলায় যাওয়া ঠিক হইল। যাইবার সময় শ্রীম বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি কুম্ভ-মেলার বর্ণনা করিয়া আমায় একটি চিঠি লিখো।' কুম্ভমেলায় গিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের কাছে ক্যাম্পে রহিলাম। সেই দু-তিন ক্রোশব্যাপী মেলায় বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বরকে দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একদিন মুঠিগঞ্জ আশ্রমে গিয়া তথা হইতে দু-এক জন সাধুর সহিত যমুনায় এক নৌকা করিয়া সঙ্গমের দিকে যাইতে যাইতে যমুনার উভয় তীরে শ্যামলক্ষেত্র ও যমুনার কালো জল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইয়াছিল, সেই ভাবে ভরপুর হইয়া শ্রীম-কে এক পত্র লিখিলাম। উহার মধ্যে নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া বিভিন্ন সাধুমণ্ডলীর যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাও লিখিলাম। একসঙ্গে লক্ষাধিক সাধুর স্নান করিবার দৃশ্য ও সমাগত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদের সাধুগণ-সমীপে আগমন, মনে সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

এক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় শ্রীম-র কাছে যাই, শ্রীম আমাকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিলেন, 'আহা তোমার কুম্ভমেলার কি বর্ণনা! আর সর্ব প্রথমেই তোমার চিঠি পাই। তোমায় ধন্যবাদ।'

ঐ বৎসর (১৯৩০) গ্রীষ্মকালে আলমোড়া আশ্রমের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এক কুটিরে—নির্জনে যেভাবে কাটাইতে-ছিলাম, তাহাও তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলাম। শ্রীম তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন: এই নির্জন হিমালয়ে অনন্যশরণ হইয়া তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তায় কাল কাটাইতেছ। কি সুন্দর পরিবেশ, ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ কুটিরে থাকিয়া তপস্যা করি। 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম'। কিন্তু একাকী বাসকালে 'সাধু সাবধান!' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ করিবে।

নির্জনে শ্রীম-সঙ্গে

১৯৩১ খৃঃ একদিন দুপুর ১॥-২টার সময় বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্কুলবাড়ীর চারতলার ছাদে গিয়া উপস্থিত। এরূপ অসময়ে প্রায় যাই না। মায়ের বাড়ী হইতে প্রায় রোজই সন্ধ্যার কিছু আগে ঐখানে শ্রীম-র কাছে যাই এবং তাঁহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে তৃপ্তি-লাভ করি। তিনি বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া সানন্দে ঠাকুরের কথা বলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই ঐ চারতলার ছাদের উপর যেখানে তিনি বেশ একটি সুন্দর তুলসী-কানন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। আমরাও তাঁহার চারিপাশে বসিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান

করিবার চেষ্টা করিতাম। আসন না থাকিলে শ্রীম নিজেই আসন দিতেন। ঐ জন্য আমি নিজে একখানা আসন লইয়া যাইতাম। আসন-খানি একদিন ভুলক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছি। তখন কপর্দকশূন্য অবস্থা, আসনখানি অপহৃত হইলে কাহার কাছে আবার আসন চাহিব, এই ভাবনায় ছাদের উপর হইতে এই অসময়ে আসনখানি আনিতে গিয়াছি। কিন্তু শ্রীম আমায় দেখিয়া ফেলিলেন।

শ্রীম তখন ছাদের উপর একটি ছোট্ট টিনের চালাঘরে একাকী দুপুরে বিশ্রাম লইতেন, তাহা আমি জানিতাম না। তিনি নির্জনতা ভালবাসেন; নির্জন না হইলে ঈশ্বরচিন্তা হয় না, অধিকন্তু ঝঞ্ঝাট বাড়ে, তাই ওখানে একান্তে থাকেন। আর ছাদের উপর চারিধারে এত উঁচু আল্‌সে দেওয়া আছে যে, নীচের ঘর-বাড়ী জন-মানব দেখা যাইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তরাত্মা। ভক্ত পাইলে ঠাকুরের কথা কহিতে খুব ভাল বাসিতেন। আমাকে দেখিয়া 'এই যে, এস এস' বলিয়া সাদরে কাছে ডাকিলেন। আমি তাঁহার সমীপে গেলে আমার হাত ধরিয়া তাঁহার পাশে খাটের উপর বসাইলেন এবং কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমাকে এখনই ফিরতে হবে। মায়ের বাড়ীতে তিনটার সময় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ক্লাস হবে, সেখানে আমায় উপস্থিত থাকতে হবে। আসনখানি ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি।' এই কথার উত্তরে শ্রীম বলিলেন, 'আরে! বস, বস।' কিন্তু আমি উঠিয়া পড়িলাম এবং হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন বলিলেন, 'ধীরেন, বেদ-বেদান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলেই পড়ে আছে। সেই চরণ ধ্যান করলে সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়।'

আমি কিন্তু মূঢ়ের মতো তখন তাঁহার কথার গভীর মর্ম ধারণা করিতে না পারিয়া আসন লইয়া উদ্বোধনে ফিরিলাম। এখন মনে হয়, তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ এবং নির্জনে তাঁহার সঙ্গ কত সুদুর্লভ! হয়তো সেদিন তিনি আমাকে তাঁহার অমৃতময় স্পর্শে আমার অন্তরে উচ্চ অধ্যাত্মভাব সঞ্চার করিয়া দিতেন! কারণ পরে আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, একদিন শ্রীম তাহাকে ঐরূপে নির্জনে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে চোখে চোখে চাহিয়া হৃদয়ে এরূপ উচ্চভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ সে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন কি ভক্তসঙ্গের এত মাহাত্ম্য বুঝিতাম! এখন হায় হায় করি এবং দুরদৃষ্টের কথা ভাবি।

শতবার্ষিকী-প্রসঙ্গে

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব হইতে একটি শতবার্ষিকী গ্রন্থ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। উহাতে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে অনুভূতি ও ধারণা লিপিবদ্ধ থাকিবে। শতবার্ষিকীর প্রধান উদ্যোক্তা স্বামী অবিনাশানন্দজী জনৈক সাধুর সহিত ঐ গ্রন্থে প্রবন্ধসকল কিভাবে সঙ্কলিত হইবে তদ্‌বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। শ্রীম বলিলেন, 'ধর্মের প্রাণ তপস্যা। ঠাকুর সেই তপোমূর্তি ছিলেন, যদি তোমরা ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী তপস্বীদের অভিজ্ঞতার লিপি সংগ্রহ করতে পারো, তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ হবে। স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যগণের তপস্যার উপরই এই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত।'

মাস্টার মহাশয়ের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

অমাবস্যা ৺কালীপূজা দিবস
1, Jhamapukur Lane,
6th Nov. 1904

শ্রী—,

আপনার পত্রপাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ঠাকুর পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, স্মরণ করিবেন। ভক্ত হইলে যে সুখদুঃখ হইবে না, তাহা নহে। পাণ্ডবরাও সুখদুঃখের পার ছিলেন না—দেহধারণ করিলেই সব আছে। শ্রীশ্রীমার চরিতামৃতেও তাহা দেখা যায়।

আর ঠাকুর কি বলেন নাই, 'সবই রামের ইচ্ছা।' রামই আপনাকে হৃষীকেশ লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই মহাপুরুষের মুখ দিয়া আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, আবার তিনিই বলছেন, 'হাঁ বটে, তবে তুমি তো তোমার মার কথা তখন বল নাই।' তিনি আপনাকে দেখাইয়া দিলেন যে, কর্ম বাকি থাকিলে সন্ন্যাস হয় না।

মনে করলে কি তিনি আপনাকে কর্মযোগ করাতে পারেন না? তিনি সর্বশক্তিমান্! কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসীর অভাব নাই। এই লীলাক্ষেত্রে তিনি সব রকম খেলা খেলিতে চান। তিনি আমড়া গাছে ন্যাঙড়া ফলাতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে ন্যাঙড়ার বাগানের অভাব নাই! 'Nevertheless not my will, but Thine be done.' ইতিমধ্যে আপনি তাঁর নিকট সর্বদা দরখাস্ত করুন; ঠাকুর বলেছেন, আকুল হয়ে বললে তিনি সুবিধা করিবেন। নিশ্চয়ই করিবেন!

আপনি সাধুসঙ্গ করেছেন, হৃষীকেশে নির্জনে ঠাকুরকে ডেকেছেন, এখন যদিও ক্ষণকাল যোগভ্রষ্ট হন, এ সাধন বিফল হইবার নহে। 'ন হি কল্যাণকৃৎ etc.'। ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক হ'লে সংসারেও যোগী হওয়া যায়। তবে বড় কঠিন।

অহল্যা বলেছিলেন (ঠাকুর সর্বদা বলতেন), হে রাম, যদি শূকর-যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা অমলা অহেতুকী ভক্তি হয়। অতএব ঠাকুর সর্বদা বলছেন, তাঁকে ডাকো নিশিদিন, যেন তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। তা যদি হয়, সব সহ্য হবে। এ সংসারে মানুষ আর কয়দিন?

অধরকে কি তিনি বলেন নাই, সম্মুখে কলি! যে যেমন অবস্থায় থাক না কেন, তাঁকে ভুলো না!!! তাঁকে কর্মত্যাগের কথা না ব'লে, ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে ভক্তি প্রার্থনা করতে বলতেন। আর তিনি যদি করান, করাবেন! আপনার মা আছেন, সংসার আছে, এখন বোধ হয় কিছু কর্মকাজ করিয়া শ্রীযুক্ত ··· বাবুর ন্যায় তাঁদের ভরণ-পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরকে ডাকাই তাঁর ইচ্ছা। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।··· Yours sincerely M. N. Gupta

P. S. আহা তাঁর কি দয়া! গৃহস্থকেও অভয় দিয়েছেন! তবে পরিবারের সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কহিতে বলিতেন—ও ঈশ্বরের পূজা ও সাধুভক্তের পূজা সর্বদা করিতে বলিতেন ও নির্জনে চিন্তা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। 'কথামৃতে' দেখিবেন।

P. S. ······ঠাকুর খুব বিশ্বাস করতে বলতেন, তিনি পর নন, আপনার মা। আপনি মার ছেলে ভুলবেন না। হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করতে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা Mihijam, E. I. R.
21st December, 1922

শ্রী—,

আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবেন। শীত পড়াতে শরীর একটু ভাল বোধ হইতেছে। এখানে আর কিছুদিন থাকিব, এরূপ ইচ্ছা আছে। আপনি যখন যখন মঠ বা ৺দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া বিবরণ সংক্ষেপে লিখিবেন ও তৎসঙ্গে আপনার কুশল সংবাদ দিবেন। মঠের বিবরণে সাধুদের কথাবার্তা ও তাঁরা কি করিতেছেন ইত্যাদি লিখিবেন—'কিমাসীত, ব্রজেত কিম্, কিং প্রভাষেত etc.' (গীতা)।

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, ঠাকুর বলিতেন, আমাদের একমাত্র উপায়। ভাইটিকেও এই কথা বলিবেন & give him my love.

Affectionately শ্রীম

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা Mihijam, E. I. R.
1st March, 1923

শ্রী—,

তোমার স্নেহলিপি আজ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমরা মহোৎসবে গিয়াছিলে ও বোধ হয় ৺তিথিপূজার দিনও গিয়াছিলে। আর, অবসর হইলেই মঠে যাওয়া উচিত—সাধুসঙ্গ বিনা উপায় নাই, সর্বদা প্রয়োজন—ঠাকুর বলিতেন।

আর গুরুদত্ত ধন লইয়া (বীজ) ডুব মারা—যেমন শামুক স্বাতী নক্ষত্রের জল লইয়া মুক্তা প্রস্তুত করে।···

শ্রী—,

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভজন্ম anniversary উপলক্ষে আমাদের love & namaskar জানিবেন।

Affectionately শ্রীম

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা Mihijam,
5th July, 1923

Dear—,

Many thanks for your kind notes. Did you visit Bhubaneswar Math at the time of ৺ প্রতিষ্ঠা? If you have not done so, you should do it next time you get leave. For the spirit of শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ still possesses that Holy spot. Trust your health is now better, কারণ সাধুসঙ্গ।···শ্রীগুরুদেব কেবল সাধুসঙ্গ করিতে বলিতেন, তবেই শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রের মূল্য বুঝা যায় ও চৈতন্য হইবে। With best wishes···

Ever yours in the Lord. M.

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপদর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

মহাভয়ের ভাণ্ড ফুটিয়া যেন নিরন্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, তেমনি আপনার প্রচণ্ড বদনসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দন্ত ও দংষ্ট্রারাজি ওষ্ঠাধর ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছে (দুই ওষ্ঠ কিছুই আচ্ছাদন করিতে পারিতেছে না)—চতুর্দিকে যেন প্রলয়ের অস্ত্রসমূহের বেষ্টনী লাগানো হইয়াছে। যেন নূতন বিষে ভরিয়াছে, কিংবা কালরাত্রি মুখব্যাদান করিয়াছে। কিংবা বজ্রাগ্নি (প্রলয়াগ্নি) যেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করিতেছে; তেমনি আপনার প্রচণ্ড বক্ত্র হইতে ক্ষোভ উছলিয়া বাহির হইতেছে, যেন আমাদের উপর মরণরূপী জলের বন্যা আসিয়াছে; প্রলয়কালের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত আর কল্পান্তের প্রলয়ানল— যদি এ দুটি একসঙ্গে মিলিত হয়, তবে কি না জ্বালাইতে পারে, আপনার সংহারের মুখ দেখিয়া কি আমার ধৈর্য নষ্ট হইবে না? এখন ভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি, আর নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি না। স্বল্প পরিমাণে বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল, আর সুখেরও অন্ত হইল, এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সংবরণ করুন, এই অবস্থায় আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে কি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিতাম? এখন এমন হইয়াছে যে একবার প্রাণ বাঁচিলে হয়!

হে অনন্ত, যদি আপনি সত্যই আমার প্রভু হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সঙ্কোচ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। আপনি সকল দেবগণের পরম দেবতা, আপনার চৈতন্যেই এই বিশ্বের জীবন, ইহা ভুলিয়া আপনি উল্টা করিতেছেন, অতএব হে প্রভু, আপনি শীঘ্র প্রসন্ন হউন, আপনার মায়া সংবরণ করিয়া আমাকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। (৩৮০)

এ পর্যন্ত বারংবার যে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনাকে মিনতি করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আপনার বিশ্বমূর্তি দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। ইন্দ্রের অমরাবতীর উপর যখন শত্রুর আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহাদের পরাভূত করিয়াছি,— কালের সম্মুখেও দাঁড়াইতে আমি ভয় পাই না, পরন্তু হে দেব, ইহা তেমন নহে; এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি এখনই গ্রাস করিবেন, ইহারই সূচনা দেখা যাইতেছে; প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার পূর্বেই আপনি কালেরও কাল হইয়া আসিয়াছেন; বেচারী ত্রিভুবন অল্পায়ু হইল! অহো, বিপরীত ভাগ্য! শান্তি কামনা করিতে গিয়া বিঘ্ন দেখা দিল। হায়, হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, আপনি ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি কি বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, না আপনি চতুর্দিকে মুখব্যাদান করিয়া এই সমস্ত সৈন্যদল গ্রাস করিতেছেন?

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

ইহারা কি কৌরবকুলের অঙ্কুর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে? এই বদন ইহাদের সপরিবারে গ্রাস করিল; আর যে নানা দেশের নৃপতিগণ ইহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছে, তাহাদের কথা বলা যায় না, এমনিভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন; মদমত্ত হস্তীর দল আপনি ঘটঘট করিয়া (জলের ন্যায়) পান করিতেছেন, রণক্ষেত্রে যাহা কিছু সজ্জিত হইয়া আছে, সমস্তই আপনি গ্রাস করিতেছেন; যন্ত্রাদি মারণাস্ত্র, মুদ্গরসহ পদাতিক সৈন্যদল, এ সমুদয় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে। (৩৯০)

কৃতান্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটী কোটী শস্ত্র, যাহাদের এক একটি বিশ্বকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহাদের সকলগুলি আপনি গ্রাস করিতেছেন; চতুরঙ্গ সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথসমূহ আপনার দন্ত স্পর্শ না করিয়াই মুখবিবরে যাইতেছে। হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সন্তোষ হইতেছে? ভীষ্ম জ্ঞানী, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও শৌর্যে যিনি নিপুণ, তাঁহাকেও দ্রোণের সহিত একসঙ্গে গ্রাস করিলেন; অহো, সহস্রকিরণ সূর্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন! আর আমাদের পক্ষের সকলকেও জঞ্জালের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল? ইঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বেচারী জগতের মরণ ডাকিয়া আনিলাম।

পূর্বে অল্পবিস্তর যুক্তির সহিত উত্তমভাবে ইঁহার বিভূতির কথা বলিয়াছেন—তাহাতে হইল না, আমি বারংবার প্রশ্ন করিয়া মরিতে বসিলাম। অতএব ইহাই ঠিক যে, কপালের ভোগ কিছুতেই খণ্ডানো যায় না, আর যাহা হইবেই তদনুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়—লোকে আমাকেই দোষী করিবে, ইহা কিরূপে বন্ধ করা যাইবে? পূর্বে সমুদ্রমন্থনে অমৃত হস্তগত হইলেও দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন না,—ফলে কালকূট বিষ উঠিল। পরন্তু তাহাও এক হিসাবে তত ভয়ানক হয় নাই, কারণ তাহার প্রতিকার সম্ভব ছিল, আর ঐ সময় শম্ভু ঐ সঙ্কটে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এখন এই জলন্ত বায়ু ঘিরিয়াছে, কে এই বিষে ভরা গগনকে গ্রাস করিবে? মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি করা সম্ভব? (৪০০)

এইভাবে অর্জুন দুঃখে ব্যাকুল হইয়া অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরন্তু এই প্রসঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আমি বধকর্তা ও কৌরব বধ্য, এইরূপ যে ভ্রান্তি (মোহ) অর্জুনকে গ্রাস করিয়াছিল—তাহাই দূর করিবার জন্য শ্রীঅনন্ত নিজ স্বরূপ (বিশ্বরূপ) দেখাইয়াছেন; আর কেহই কাহাকেও বধ করে না, আমিই সকলের সংহারকর্তা—বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার ছলে শ্রীহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইরূপ মনোভাব পাণ্ডুসুত অর্জুন বুঝিতে পারিলেন না, এবং নিরর্থক তাঁহার কম্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার পর অর্জুন বলিলেন, দুই পক্ষের সৈন্যদল গগনে মেঘপুঞ্জের ন্যায় একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিংবা কল্পান্তে কৃতান্ত যখন সৃষ্টির উপর রুষ্ট

হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি স্বর্গই একসঙ্গে নাশ করে, অথবা দৈব প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত বৈভব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা-আপনিই ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল সব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরন্তু কেহই মুখ হইতে বাহির হইতেছে না, কর্মের দুর্বার গতি দেখুন ; অশোকের নব পল্লব যেমন উষ্ট্রের মুখে চর্বিত হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার মুখের মধ্যে নাশপ্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু মুকুটসহ মস্তকগুলি কেমন আপনার দংষ্ট্রার সাঁড়াশীর মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইতে দেখা যাইতেছে। (৪১০) ঐ মুকুটের রত্ন কতক আপনার দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন রহিয়াছে, কতক চূর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়া আছে, কতক চূর্ণ হইয়া দংষ্ট্রার অগ্রভাগে লাগিয়া রহিয়াছে ; অহো, এই মহাকাল বিশ্বরূপ লোকের রক্তমাংসের শরীর গ্রাস করিয়াছে, পরন্তু দেহের মস্তকটি আলাদা একধারে রাখিয়া দিয়াছে। মস্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমাঙ্গ, এইজন্য ইহাই শেষ পর্যন্ত মহাকালের মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

অর্জুন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে প্রভু, জন্মগ্রহণ করিলে কি আর অন্য কোনও গতি নাই ? সমস্ত জগৎ স্বতই এই মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে ; এ সমস্ত সৃষ্টি এই মুখের দিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহাদের কবলিত করিতেছেন ; ব্রহ্মাদি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য সাধারণ লোকসমূহ এধারের মুখের মধ্যে যাইতেছে ; অন্য সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে, সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কেহই এই মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি সারা জগৎ চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে ; প্রাণিগণ আয়ুপথে রাত্রি-দিবসের সিঁড়ি নির্মাণ করিয়া বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা করিতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন জ্বলন্ত পর্বতের গাত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি দেখুন, সমগ্র লোকসমূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে ; (৪২০) পরন্তু উত্তপ্ত লৌহের উপর পড়িলে জল যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি যতকিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, আর তাহাদের নাম-রূপ ব্যবহার মুছিয়া যাইতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

এত অধিক আহার করিয়াও ইঁহার ক্ষুধা কমে নাই, ইঁহার কি অসাধারণ জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে ; রোগী জ্বর হইতে উঠিলে যেমন হয়, ভিখারী অকাল (দুর্ভিক্ষ) পড়িলে

যেমন করে, তেমনি ইঁহার জিহ্বাও আশ্চর্যভাবে ওষ্ঠ চাটিতেছে দেখিতেছি; আহারের নামে আর কিছুই এই মুখ হইতে বাঁচিল না, এই আশ্চর্য ক্ষুধা কেমন অপূর্ব দেখাইতেছে; সমুদ্রই কি গণ্ডূষ করিবে, না পর্বত গ্রাস করিবে, কিংবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কি মুখের (দংষ্ট্রার) মধ্যে ফেলিয়া দিবে? দিক্‌সমূহ কি গিলিয়া খাইবে? কিংবা নক্ষত্রগুলি চাটিয়া ফেলিবে?

হে প্রভু, এমনি আপনার লোলুপতা দেখা যাইতেছে, ভোগে যেমন কামনার বৃদ্ধি হয়, ইন্ধন দ্বারা অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিত হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার খাইবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে; একটি মুখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইহার জিহ্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে, —বড়বানলের মধ্যে যেন একটি কপিত্থ ফেলা হইয়াছে; এইরূপ বদনের সংখ্যা অপার, কিন্তু এত ত্রিভুবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহার্য না জুটে, তবে এত অধিক পরিমাণে মুখের সংখ্যা বাড়াইলেন কেন? দাবাগ্নি যেমন বনের মৃগগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি বেচারী লোকসমূহ আপনার বদনের অগ্নির মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০)

অহো, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে, জগতের কর্মফলেই এই দেবতার আবির্ভাব, যেন মহাকাল জগদ্রূপী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছেন; এখন এই অঙ্গ-প্রভার ফাঁদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্ পথে বাহির হইবে? ইহা তো আপনার বক্ত্র নয়, ইহা জগতের পক্ষে একটি জ্বলন্ত চিতা, অগ্নি নিজের দাহিকা শক্তি দ্বারা কোন কিছু পোড়াইবে কি না তাহা জানে না, পরন্তু যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, সে প্রাণে বাঁচে না; শস্ত্র কি জানে তাহার তীক্ষ্ণতায় মৃত্যু কি করিয়া হয়? কিংবা বিষ যেমন নিজের মারকশক্তি জানে না, তেমনি আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে আপনার কোন অনুমানই নাই, পরন্তু এদিকে সারা জগৎ নষ্ট হইতে চলিল!

হে প্রভু, আপনি তো বিশ্বব্যাপক, সকলের আত্মস্বরূপ এক আত্মা, তবে আমাদের কালসদৃশ হইয়াছেন কেন? আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ না করিয়া আপনার মনে যাহা আছে, তাহা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন; এই উগ্ররূপ আর কত বাড়াইবেন? হে তাত, আপনার কল্যাণময় ভগবৎরূপ স্মরণ করুন, নতুবা অন্ততঃ আমার উপর কৃপাদৃষ্টি পাত করুন।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

হে বেদবেদ্য, হে ত্রিভুবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্দ্য, আপনি একবার আমার বিনতি শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া অর্জুন তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, হে সর্বেশ্বর, শুনুন! (৪৪০)

আমি শান্তির জন্য বিশ্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর আপনি মহাকালের রূপ দেখাইয়া ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত। আপনি কে? এত ভীতিপ্রদ মুখগুলি কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই বা শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কেন? ক্রোধে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া আপনি গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষুগুলি ত্রাসদায়ক করিয়া আমাদের

ভয় দেখাইতেছেন। হে দেব, আপনি কৃতান্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন? আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত বলিলেন, আমি কে, এবং কেন এইরূপ করিতেছি, (আমার) হালচালই বা কিরূপ, এই প্রশ্ন করিতেছ?

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্যই বর্ধিত হইতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দিকে মুখ বিস্তার করিয়াছি। ইহাতে অর্জুন বলিলেন, হায় হায়, পূর্বের সঙ্কটে ত্রাসিত হইয়া ইঁহার কাছে প্রার্থনা করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত হইল। এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া অর্জুন নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ হইবে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, হে কিরীটী, পরন্তু আর একটি কথা আছে; তাহা এই যে, তুমি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে, ইহা শুনিয়া ধনুর্ধর অর্জুন মরিতে মরিতে প্রাণে বাঁচিলেন; তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়াছিলেন, এখন পুনরায় সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মনোযোগপূর্বক শুনিতে লাগিলেন। (৪৫০)

তখন ভগবান বলিতে লাগিলেন, হে অর্জুন, জানিও তুমি আমারই, অন্য সমস্ত বিশ্ব আমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তেমনি আমার মুখের মধ্যে সারা জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ।

পরন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই যে সৈন্যদল উপরে-উপরে আস্ফালন করিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; ইহারা সব একত্র জমায়েত হইয়া আপনাদের শৌর্য ও পরাক্রমের অহঙ্কারে ফুলিতেছে, এবং নিজেদের সৈন্যদলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিতেছে; বলিতেছে—সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া মৃত্যুকে বধ করিব, আর এখন এই জগৎকে এক গণ্ডূষে পান করিব, সমগ্র পৃথিবী গিলিয়া খাইব, আকাশকে জ্বালাইয়া দিব, বায়ুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব; এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত স্পর্ধা করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ; ইহাদের বচন অস্ত্র হইতেও তীক্ষ্ণ, ইহারা অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিকা শক্তিবিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, ইহারা কালকুট বিষকেও হার মানাইয়াছে।

এই বীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, জলশূন্য বন্যার ন্যায়, কিংবা চন্দ্রের প্রতিবিম্বসদৃশ; যেন মৃগজলের বন্যা আসিয়াছে; ইহারা তো সৈন্যদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয়ারী সাপ, যেন প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী সুসজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী দাঁড়াইয়া আছে। (৪৬০)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তিদ্বারা উহারা চালিত হইতেছে, সে সমস্ত আমি পূর্বেই হরণ করিয়াছি, এখন কুম্ভকারনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায় ইহারা নির্জীব হইয়া আছে; পুতুল নাচের

সূত্র ছিঁড়িয়া গেলে যেমন মঞ্চের উপরিস্থিত রজ্জু-চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকা ঠেলা মারিলেই উল্‌টাইয়া পড়ে, তেমনি এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে না, অতএব এখন শীঘ্র সচেতন হইয়া উঠ।

তুমি গো-হরণের সময় একবার কৌরব সৈন্যদের উপর মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে এবং মহাভীরু বিরাটপুত্র উত্তরের দ্বারা শত্রুর বস্ত্র হরণ করাইয়াছিলে; এখন সেই সৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পূর্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছে, ইহাদের সংহার কর এবং একাই শত্রু জয় করার যশের অধিকারী হও; আর শুধু শুষ্ক যশই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইবে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণকে গ্রাহ্য করিও না, ভীষ্মকে ভয় করিও না, কর্ণের উপর কি করিয়া শস্ত্র চালনা করিব, তাহাও ভাবিও না। জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব, তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিও না—অন্যান্য যে সব সুপ্রসিদ্ধ বীর আছে, তাহাদের সব এক-একটিকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের ন্যায় মনে করিবে, যাহাদের ভিজা হাতেই মুছিয়া ফেলা যায়। হে পাণ্ডব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত সৈন্যদল কিরূপ? ইহারা সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্বেই মুখের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছি। (৪৭০)

যখনই তুমি ইহাদের আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে, এখন ইহারা শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িয়া আছে; অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের মারিয়াছি তাহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোক-সঙ্কটে পড়িও না; স্বয়ং লক্ষ্য (নিশানা) খাড়া করিয়া যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছলে বাণদ্বারা বিদ্ধ করা হয়, তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্রই; যে সব অমঙ্গল প্রকট হইয়াছিল, তাহা সব শেষ হইয়াছে, এখন অর্জিত রাজ্যের সহিত যশ উপভোগ কর; আত্মীয়গণ যখন অহঙ্কারে স্ফীত (উন্মত্ত) হইয়া পরাক্রমে দুর্মদ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই শৌর্যশালী রিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি; হে কিরীটী, এই কথা বিশ্বের পটের উপর লিখিয়া রাখিয়া বিজয়ী হও। সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানদেব বলিতেছেন: এইভাবে পূর্ণমনোরথ সঞ্জয় কৌরবনাথ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিলেন; স্বর্গলোক হইতে গঙ্গার প্রবাহ বাহির হইয়া যেমন প্রচণ্ড খল খল শব্দ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরুগম্ভীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, অথবা মহামেঘসমূহ যেমন একসঙ্গে গর্জন করিতে থাকে, কিংবা ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মন্থনে গুমগুম শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল, ঐ প্রকার গম্ভীর মহানাদের সহিত তখন বিশ্বের আদিকারণ অনন্তরূপ, শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিলেন। (৪৮০)

অর্জুন তাহার সামান্যই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার সুখ কি ভয় দ্বিগুণ হইল তাহা বলিতে পারি না, পরন্তু তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; সঙ্কুচিতভাবে কিঞ্চিৎ নত হইয়া, করজোড় করিয়া বারংবার তাঁহার ললাট শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন। তখন কিছু বলিতে গেলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল, ইহা সুখ কি ভয় তাহা আপনারাই বিচার করুন। পরন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুনের এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল, ইহা আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই বুঝিয়াছি। তখন এইভাবে ভীত হইয়া পুনরায় চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন : অর্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

আপনি নিজেই বলিয়াছেন, 'আমিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রাস করা আমার খেলা'—আপনার এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়া মানিয়াছি ; পরন্তু হে প্রভু, আপনি কাল হইয়া আজ স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার) করিতেছেন, ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছে না ; অঙ্গের তারুণ্য সরাইয়া কি করিয়া বৃদ্ধাবস্থা আনা যায় ? এইজন্য আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা প্রায় অসম্ভব। হে অনন্ত, দিবসের চারি প্রহর পূর্ণ না হইতে সূর্য মধ্যাহ্নেই অস্ত যায় না। দেখুন, আপনি যে অখণ্ডিত কাল, তাহার তিনটি অবস্থা আছে, আর সে তিনটিই নিজ নিজ সময়ে প্রবল। (৪৯০)

যখন 'উৎপত্তি' হয়, তখন 'স্থিতি' ও 'প্রলয়' লুপ্ত থাকে, আর স্থিতির সময় 'উৎপত্তি' ও 'প্রলয়'কে দেখা যায় না ; আর পরে 'প্রলয়ে'র সময় 'উৎপত্তি' ও 'স্থিতি' লুপ্ত হয়—এই অনাদি রীতির কোন কারণেই ব্যতিক্রম হয় না ; সম্প্রতি জগতে পূর্ণ ভোগের স্থিতি চলিতেছে, এখন যে আপনি ইহাকে গ্রাস করিতেছেন, ইহা আমার মনে লাগিতেছে না।

তখন ভগবান সঙ্কেতে বলিলেন, এই দুই সৈন্যদলেরই পোষণকার্য শেষ হইয়াছে (আয়ু ফুরাইয়াছে), তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম, অন্য লোকের মরণ যথাকালেই হইবে—জানিবে ; শ্রীঅনন্ত ভগবান সঙ্কেতে এই কথা বলিতেই অর্জুন পুনরায় সমস্ত বিশ্বের পূর্ববৎ স্থিতি দেখিলেন ; তখন অর্জুন বলিলেন, হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার সূত্রধার, এই জগৎ পুনরায় পূর্বস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; পরন্তু হে শ্রীহরি, দুঃখসাগরে পড়িলে যেমন ভাবে আপনি উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীর্তি আমি স্মরণ করিতেছি ; আপনার কীর্তি বারংবার স্মরণ করিয়া আমি মহাসুখ উপভোগ করিতেছি, এবং হর্ষামৃত-তরঙ্গের উপর গড়াইতেছি।

হে দেব, জীবিত থাকিবার জন্য এই জগৎ আপনার প্রতি অনুরাগ পোষণ করে, আর দুষ্ট লোকগণ নাশপ্রাপ্ত হয় ; হে হৃষীকেশ, ত্রিভুবনের রাক্ষসগণের আপনি মহাভয়স্বরূপ,—এইজন্য তাহারা দিগন্তের ওধারে পলায়ন করিতেছে ; (৫০০) এতদ্ভিন্ন অন্য সুরসিদ্ধ কিন্নরগণ, এমন কি সারা চরাচর আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

হে নারায়ণ, রাক্ষসগণ আপনার চরণে প্রণত না হইয়া পলায়ন করিল, ইহার কারণ কি? আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন করিতেছি, ইহা তো আমাদের জানাই আছে, সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে? আপনি স্বপ্রকাশের উৎপত্তিস্থান, আজ আপনাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য অন্য সব জঞ্জাল সহজে দূর হইয়াছে।

হে শ্রীরাম, এতদিন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গম্ভীর মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি; যাহা হইতে নানা সৃষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রসার হয়, সেই (বিশ্ববীজ) মহদ্‌ব্রহ্ম আপনার ইচ্ছা (মহাসঙ্কল্প) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; হে দেব, আপনি নিঃসীম ও অনন্তগুণসম্পন্ন, আপনি নিঃসীম ও সদা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, আপনি নিঃসীম সাম্যের অখণ্ডিত অবস্থা, আপনি দেবাদিদেব; প্রভু আপনি ত্রিভুবনের জীবন, অক্ষর সদাশিব (নিত্য মঙ্গলস্বরূপ)—হে দেব, আপনি সৎ ও অসৎ, তাহার অতীত যে বস্তু, তাহাও আপনি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ মহত্তত্ত্বের সীমা, স্বয়ংসিদ্ধ, পুরাতন, অনাদি; আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান কেবল আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১০)

হে ভেদরহিত প্রভু, শ্রুতির নেত্রে যে স্বরূপ-সুখ অনুভূত হয়, তাহা আপনিই; ত্রিভুবনের আধারের আপনিই আধার; এই জন্যই আপনাকে পরম ধাম বলে, কল্পান্তে মহদ্‌ব্রহ্ম আপনার মধ্যেই প্রবেশ করে। অধিক আর কি বলিব? হে দেব, আপনি সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া আছেন, অনন্তরূপ আপনার বর্ণনা কে করিতে পারে?

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

প্রভু, আপনি কোন এক বস্তু নন্, আর কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি; হে অনন্ত, আপনিই বায়ু, আপনিই নিয়ন্তা যম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিও আপনি, আপনি বরুণ, সোম, স্রষ্টা ব্রহ্মাও আপনি, পিতামহের পরম আদিজনকও আপনি; আর অন্য যে সব সাকার বা নিরাকার ভাব আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব রূপকেও প্রণাম করিতেছি।

এইভাবে পাণ্ডুসুত অর্জুন সানুরাগচিত্তে স্তুতি করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রভো, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। তাহার পর ঐ শ্রীমূর্তির আদ্যন্ত (মস্তক হইতে চরণ

পর্যন্ত) দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো আপনাকে নমস্কার, নমস্কার! এই চরাচর বিশ্বের সমস্ত প্রাণিগণকে অখণ্ডিতভাবে ঐ মূর্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো, নমো, নমস্তে। (৫২০)

এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চর্য হইতেছি, অর্জুন দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, প্রভো নমো, নমস্তে; অন্য কোনও স্তুতি স্মরণে আসিল না, চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও জানিতে পারিলেন না; কিংবহুনা, এইভাবে সহস্রবার প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি; দেবতার সম্মুখ, পশ্চাদ্‌ভাগ আছে কি নাই—তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? তথাপি হে স্বামিন্, আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি; হে দেব, আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্য আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাত্মক রূপকে নমস্কার করিতেছি; হে অনন্তপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রম, আপনি সর্বকালে সমান, আপনি সর্বদেশব্যাপক—আপনাকে নমস্কার; সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্বস্বরূপ হইয়া সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন; কিংবহুনা, এই সারা বিশ্বই কেবল আপনার শুদ্ধ স্বরূপ, ক্ষীরসমুদ্রে যেমন শুধু দুগ্ধের তরঙ্গ; অতএব হে দেব, আপনি সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস, আপনিই সর্বস্বরূপ। [ক্রমশঃ]

তোমার চাওয়া একটুখানি

শ্রীশান্তশীল দাশ

জেনেছি হে প্রিয় তুমি চাও না কিছু আর;
তোমার চাওয়া একটুখানি, শুধু নয়নধার।
অনেক দিয়ে যারা তোমায়
ডাকে, সে-ডাক শোন না হায়;
চোখের জলের মাল্যখানি দেয় যে উপহার,
মধুর হেসে সেই মালাটি নাও যে তুলে তার।

এতকাল যা ঘুরে ঘুরে করেছি সঞ্চয়,
জেনেছি তা তোমায় দেবার যোগ্য কিছুই নয়।
তুমি যে চাও অমূল্য ধন,
অশ্রুভরা দুইটি নয়ন;
তাইতো যাচি, হে প্রিয় মোর, নামাও সকল ভার,
নয়নভরে দাও আঁখিজল অনেক বেদনার।

ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

'ধর্ম' শব্দটি এই দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট এতই সুপরিচিত যে, ইহার অর্থ জানিবার জন্য প্রায় কাহারও অন্তরে অণুমাত্র আগ্রহও জন্মিতে দেখা যায় না। দেশের অধিকাংশ লোক ধর্মের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে, কেহ যখন ধর্মের নামে খারাপ কিছুও প্রচার করিতে থাকে, তখন তাঁহারা এইরূপ খারাপ বিষয়কেও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ধর্মের স্বরূপ, বিভাগ, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অন্তরে কোন সুদৃঢ় ধারণা না থাকায় এক শ্রেণীর ধর্মবিরোধী লোক সম্প্রতি ধর্মের স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অপব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ মানুষকে অধর্মের পথেই আকর্ষণ করিতেছে।

যে পুণ্যভূমি ভারতে চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা-ভাষণ প্রভৃতি নাই দেখিয়া গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে ভারতের অপরিমিত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে তালা ও চাবির বাচক কোন শব্দ নাই দেখিয়া আজও বিশ্বের জ্ঞানিগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং প্রাচীন ভারতে মানুষের সততার ফলেই ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক হইত না বুঝিয়া তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ও ধর্মবিরোধী প্রচারের ফলে আজ জনসঙ্ঘের এক বিপুল অংশ বিবিধ পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া চিরশান্তির আকর ভারতভূমিকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করিতেছে। এই অনর্থ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন।

ধর্মের স্বরূপ

যে কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রেও ধর্মের স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে জানিতে না পারিলে তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া প্রথমেই আমরা ধর্মের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

'ধারণা করা' অর্থবোধক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম শব্দটি সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—শৃঙ্খলাসমূহের ধারণ বা নিয়মানুবর্তিতা। শাস্ত্র বলেন :

ধারণার্থো ধৃঞিত্যেষ ধাতুঃ শাব্দৈঃ প্রকীর্তিতঃ।
দুর্গতি-প্রপতৎ-প্রাণিধারণাদ্ ধর্ম উচ্যতে ॥

—শাব্দিকগণ বলেন, ধৃঞ্ ধাতুটি ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহার ফলে মানুষ দুর্গতি ও পতন হইতে রক্ষা পায়, তাহারই নাম ধর্ম।

অন্যত্র আবার অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম, এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান —এই পাঁচটি নিয়ম, মোট দশটির পালনই ধর্ম নামে কথিত হইয়াছে। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা এই সকল তথ্য জানিতে পারি।

মীমাংসাদর্শনের মতে, বেদাদিশাস্ত্রে বিহিত ধর্মসমূহের অনুষ্ঠানই ধর্ম (চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ)। বৈশেষিক দর্শনের মতে, যাহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহারই নাম ধর্ম (যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ)। মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে ধর্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন :

অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা।
আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণম্ ॥

—অনুশাসনপর্ব, ২২।১৯

—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, দম (ইন্দ্রিয়সংযম) এবং সরলতাই ধর্মের নিশ্চিত লক্ষণ (পরিচায়ক)।

যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় জন্মিল : তিনি রাজা, গুরুতর অপরাধ করিলে প্রজাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেই হইবে ; সুতরাং রাজাদের পক্ষে স্থল-বিশেষে নৃশংস না হইয়া উপায় নাই। রাজা যদি আনৃশংস্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া অপরাধী-দিগকে দণ্ডদানে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে দেশে পাপের প্রাবল্য ঘটিবে। তিনি আরও চিন্তা করিলেন—সকল মানুষই যদি কঠোর-ভাবে দম বা ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তো পৃথিবীতে আর নূতন প্রজার সৃষ্টিই হইবে না। তাহা ছাড়া আর্জব বা সরলতাও রাজধর্মের বিরোধী। রাজা সরল-প্রকৃতির হইলে কুটিল শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিবে ; প্রজাদের মধ্যেও অনেকে কুটিলতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবে। সুতরাং যুধিষ্ঠির বুঝিলেন, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ ; দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয়তো ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। নিঃসংশয় হইবার জন্য পুনরায় তিনি মহামনীষী পিতামহকে অনুরোধ করিলেন, 'পিতামহ! আমি কিরূপ ধর্মের আচরণ করিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।' ইহার উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন :

অহিংসা সত্যমক্রোধো দানমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
অজাতশত্রো! সেবস্ব ধর্ম এষ সনাতনঃ ॥

—ঐ ১৬২।২৩

—হে অজাতশত্রো! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটির সেবা (অনুশীলন) কর ; এইগুলিই সনাতন (চিরস্থায়ী) ধর্ম।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার প্রিয়পুত্র শুকদেবকে ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—ব্যাসের মতে ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি বলিতেছেন :

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য যত্নতঃ।
সর্বতো নিপতিষ্ণূনি পিতা বালানিবাত্মজান্ ॥
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চাপ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে ॥

—শান্তিপর্ব, ২৫৯।৩-৪

—ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদক এবং ইহারা নিজ নিজ বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পিতা যেমন বালক পুত্রগণকে সংযত করিয়া রাখেন, তদ্রূপ জ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা সম্পাদনই পরম তপস্যা। ইহা সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই পরধর্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম) নামে অভিহিত হয়।

ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ East and West in Religion (P. 19) গ্রন্থে লিখিয়াছেন : Religion is a movement, growth ; and in all true growth the new rests on the old.—ধর্ম বলিতে গতি বিশেষ বা উন্নতি বুঝায়। আবার যথার্থ উন্নতির ক্ষেত্রে দেখা

যায়, সর্বত্রই পুরাতনের উপর নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উল্লিখিত গতি বা উন্নতি বলিতে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যে সংযম বা নিয়মানুবর্তিতাকে বুঝিয়াছেন, পরবর্তীকালে তাঁহার লিখিত Religion and Society নামক গ্রন্থের একটি উক্তি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। ঐ গ্রন্থে (P. 42) তিনি লিখিয়াছেন :

Religion is the discipline, which touches the conscience and helps us to struggle with evil and sordidness, saves us from greed, lust and hatred, releases moral power, and imparts courage in the enterprise of saving the world.

ধর্ম বলিতে নিয়মানুবর্তিতা-বিশেষকে বুঝায়। এই নিয়মানুবর্তিতা আমাদের বিবেককে প্রভাবিত করিয়া সর্ববিধ অন্যায় ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণা দেয় ; লোভ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এবং ঘৃণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে ; আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে এমন সাহস দান করে যে, তাহার ফলে বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য আমরা আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

পশ্চিম দেশের মনীষীরাও ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে টাইলোর (E. B. Tylor) এবং ফ্রেজার (I. G. Frazer) মহোদয়দ্বয়ের মত দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। টাইলোর তাঁহার Primitive culture (Part I ; P. 424) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাঁহার মতে ধর্ম (religion) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থ 'আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাস' ('the belief in spiritual beings')। ফ্রেজার সাহেব তাঁহার The Golden Bough গ্রন্থে (P. 222) লিখিয়াছেন : 'a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and a human life.' —যে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি এবং মানবজীবন পরিচালিত হয়, তাহার তুষ্টিসাধনের নামই ধর্ম।

Encyclopaedia Britannica নামক অভিধানে Religion বা ধর্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—(১) প্রাথমিক (primitive) এবং (২) উচ্চস্তরের (higher)। উপরে যে দুইজন পাশ্চাত্য মনীষীর মতের উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত অভিধানে তাহাদের দুইটিকেই প্রাথমিক ধর্মরূপে গণ্য করা হইয়াছে। উচ্চস্তরের ধর্মের কোন লক্ষণ উক্ত অভিধানে দেওয়া হয় নাই। উহার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আবার ধর্মাচরণের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার হইতে শীতপ্রধান দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার অনেকটা ভিন্ন ধরনের। স্বগৃহে স্বাধীনভাবে থাকিবার সময় যে সকল আচার-অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয়, বিদেশে বা রাস্তায় থাকিলে তাহাদের সবগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য নহে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ দিয়াছেন। সুস্থ বলবান্ ব্যক্তির জন্য যে সকল ধর্মীয় আচার অবশ্য পালনীয়, রুগ্ণ বা দুর্বলের পক্ষে তাহাদের সবগুলি পালন করার প্রয়োজন হয় না।

সম্প্রদায়ভেদেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ,

খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। হিন্দুর কাছে তাহার বিমাতা মাতৃবৎ পূজনীয়া; কিন্তু কোন কোন সমাজে বিমাতাকে বিবাহ করা চলে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামীর চিন্তাও মহাপাপ; কিন্তু তিব্বত প্রভৃতি কোন কোন দেশে ধর্মশাস্ত্রের বিধান-অনুসারেই একজন নারীর একই সঙ্গে চার পাঁচজন স্বামী থাকিতে পারে। গোমাংস হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য; কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট ইহা বৈধ খাদ্য।

একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রদেশভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ অনেকক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না; কিন্তু মধ্য বা দক্ষিণ-ভারতের ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ করিলে তাঁহার জাতিনাশ ঘটে। উত্তর ভারতের হিন্দুদের নিকট মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করার চিন্তাও মহাপাপ; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত।

কন্যকাং মাতুলানাস্তু দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, অধ্যায়, ১০৫

বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণ-সম্বন্ধে নানা মত এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণ দেখিয়া যাহাতে আর্যসন্তানগণ ধর্মসম্বন্ধে বিভ্রান্ত না হন, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ মনু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন– বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বৈধ আচরণ, এই সব কয়টিকেই ধর্মের মূল বলিয়া জানিবে।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥

—মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়

বলা বাহুল্য, রাজর্ষি মনু আর্যসন্তানদের জন্যই এই ধর্মের বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ সর্বোচ্চ প্রমাণ। যে বিষয়ে বেদে কোনরূপ উল্লেখ নাই, সেই বিষয়ের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। যে বিষয়ে বেদ এবং স্মৃতি কোনটিতেই কোন উল্লেখ নাই, সেই বিষয়ে সজ্জনগণের আচরণই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। কোন কোন বিষয়ে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নির্দেশই সমান আদরণীয় বটে, তবে আচরণকারীর স্বাস্থ্য এবং রুচির সঙ্গে মিলাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে—ইহাই ভগবান্ মনুর অভিপ্রায়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বেদাদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজের তথা জগতের হিতার্থে নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়া কর্ম করার নামই ধর্ম। বেদাদি শাস্ত্র বলিতে 'আদি' শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুগণের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলাই ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন: 'আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।'

অবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের ধর্মমত যদি মানব-সভ্যতার প্রতিকূল না হয়, অপরের ধর্মমত সহ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ না করে, নিরীহ মানব-গণের পবিত্র রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচনা না দেয়, অপর ধর্মাবলম্বীদিগকে বলপূর্বক স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি না করে, জাতি-

ধর্ম-নির্বিশেষে মাতৃজাতির প্রতি মাতৃবৎ সম্মান-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ না হয়, এবং মানবমাত্রেরই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করে, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ পালন করিয়াই ধর্মজগতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। ঐ সকল ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই অংশমাত্র—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ

ভারতীয় মনীষিগণ সাধ্যধর্ম ও সাধনধর্ম-ভেদে ধর্মকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। যম, নিয়ম প্রভৃতি সাধনধর্ম; ঐগুলি দ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যধর্ম।

ধর্ম পদার্থটিকে আবার (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ধর্ম কেবলমাত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিধায়ক, তাহা দ্বারা প্রধানতঃ আত্মোন্নতিমাত্র সাধিত হয় বলিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক ধর্ম বলা যায়। ব্যক্তিগত মুমুক্ষা এবং আত্মোন্নতির সহায়ক বিবিধ সাধন-প্রণালী ইহার অন্তর্গত।

আত্মোৎকর্ষ, নিজের মুক্তি প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইয়াও যে ধর্মবলে মানব সর্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হয়, তাহাই আধিভৌতিক ধর্ম। বিশ্ববিখ্যাত বহু ধর্মপ্রচারক এই ধর্ম সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবলমাত্র মানবজাতির মঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন, আর কেহ কেহ আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া জীবমাত্রেরই কল্যাণসাধনের জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। রাজধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতি আধিভৌতিক ধর্মেরই অন্তর্গত। ভূত শব্দের অর্থ 'প্রাণী' (তুলনীয় :—সর্বভূতহিতে রতঃ)। তাহাদের কল্যাণ-সাধক ধর্মই আধিভৌতিক ধর্ম।

যে ধর্মের সাহায্যে মানুষ এক বা একাধিক দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের সাধনা বা পূজার ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে অন্যান্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের সম্মুখে একটি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গৌণতঃ তাহাদেরও আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহাই আধিদৈবিক ধর্ম। হিন্দুদের বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চনা এই ধর্মেরই অন্তর্গত।

আপাততঃ ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান, কিন্তু বস্তুতঃ ধর্মবিরোধী অনেক আচার-আচরণকেও আজকাল অনেকে ধর্মনামে চালাইয়া দেন এবং এইরূপ অধর্ম প্রচারের দ্বারা ধর্মের বিপর্যয় ঘটাইতে চাহেন। সাধারণ মানুষ মনে করে, এইগুলিও ধর্ম; সুতরাং তাহারা ধর্মভ্রমে অধর্মকেই আঁকড়াইয়া ধরে। অতএব এই প্রসঙ্গে অধর্মের স্বরূপ এবং বিভাগ সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বেদাদিশাস্ত্রসম্মত যে নিয়মানুবর্তিতা জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতির সহায়ক হয়, তাহাই ধর্মপদবাচ্য। বিপরীতক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বেদাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বিশ্বশান্তির প্রতিকূল, জনসাধারণের নৈতিক অবনতির সহায়ক যে নিয়মানুবর্তিতা বিভিন্ন স্থলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বস্তুতঃ অধর্ম।

এখানে সংশয় জন্মিতে পারে—কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া সুশৃঙ্খল যে কোন ধর্মকে ধর্ম নামে অভিহিত করিলে দোষ কি? নিয়মানুবর্তিতাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে দুর্দান্ত দলপতির অধীনে থাকিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে চুরি ডাকাতি অথবা

নরহত্যাদি কার্য করিলে তাহাই বা ধর্মপদবাচ্য হইবে না কেন? দুর্বৃত্ত নরপশু কীচক-কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া যখন তেজস্বিনী পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী বিরাটরাজের সভায় বিচারপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন এবং রাজা বিরাট কীচকের বলবীর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার শাস্তি-বিধানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সেই বীরজায়া রাজা বিরাটকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,

'দস্যূনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে।'

—হে রাজন্! তোমার এই দস্যুসুলভ ধর্ম (অর্থাৎ আচরণ) রাজসভায় শোভা পায় না। এই স্থলে দ্রৌপদী কর্তৃক দস্যুর আচরণও ধর্মনামে অভিহিত হইয়া নিন্দিত হইয়াছে।

মারীচের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের সময়ে মারীচ ও শ্রীরাম উভয়েই রাক্ষস কর্তৃক কৃত নরঘাতন প্রভৃতি কর্মকে রাক্ষসোচিত-ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন :

'ধর্মো হ্যয়ং দাশরথে নিজো নঃ।'

'ধর্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ম্॥'

—ভট্টিকাব্য

উক্ত সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিব যে, অনেক ক্ষেত্রে যেমন প্রাণঘাতিনী বিমাতাও মাতা বলিয়া কথিত হন, উল্লিখিত স্থলসমূহে তেমনি অধর্মও ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল অধর্ম বা নিন্দিত কর্ম ধর্মার্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য বর্জনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-নামক মহাগ্রন্থে অধর্মের পরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে তাহার পাঁচটি বিভিন্ন শাখার উল্লেখক্রমে ইহাদের প্রত্যেকটি বর্জন করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চাপ্যাভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেতে ধর্মজ্ঞোঽধর্মবত্ত্যজেৎ॥

—৭ম স্কন্ধ, ১৫।১২

—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, ধর্মোপমা এবং ধর্মচ্ছল এই পাঁচটি অধর্মের শাখা। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ অধর্মের ন্যায় এইগুলিকেও পরিত্যাগ করিবেন।

উল্লিখিত বিধর্ম প্রভৃতির লক্ষণও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—

ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুম্ভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্॥

—ঐ ১৫।১১

—যাহা ধর্মের বিপরীত তাহাই বিধর্ম। অধার্মিক ব্যক্তিগণকর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে পরধর্ম বলা হয়। নাস্তিকগণ ধর্ম নামে যাহা প্রচার করে, তাহা এবং অহঙ্কার উপধর্ম বা ধর্মোপমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দের নানার্থতার সুযোগ লইয়া ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ-সমূহকে ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ করার নাম ধর্মচ্ছল এবং আশ্রমধর্ম পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারী মানবগণ নিজেদের কল্পিত যে সকল বিধান ধর্মনামে পালন করে, তাহাই ধর্মাভাস।

ধর্ম এবং অধর্মের উল্লিখিত প্রকার, স্বরূপ এবং বিভাগ অবগত হওয়া ধর্মার্থী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য। [ক্রমশঃ]

অনামিকা

[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজন হইতে অনূদিত]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কী বলিব সখী—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায় !
প্রেমঝটিকায় ঝরা পাতা যায় সেথাই—সে ল'য়ে যায় যেথায়।

কেহ বলে—আমি রানী, কেহ বলে—প্রেমপাগলিনী, সন্ন্যাসিনী,
কেহ বলে—উদাসিনী, কেহ বলে—কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী।
প্রেমসিন্ধুর একটি বিন্দু—নামধাম তার কে বা শুধায় ?
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায় !

প্রাণকান্তের নন্দনে আমি আধফোটা ফুল প্রেমশাখায় ;
কখনো সে গাঁথে আমারে মালায়, কখনো বা ফেলে দেয় ধূলায়।
তুচ্ছ ফুলের কী আছে কাহিনী ? ফোটে, হাসে, পরে ঝরিয়া যায়।
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে ? কিছু জানি না হায় !

বৃন্দাবনের বালা আমি, চিরদাসী সখী রাঙা পায় তারি,
যুগে যুগে তার সাধিতে লো প্রেম গাই তার নাম ঝংকারি'।
মীরা সখী, প্রেমকাঙালিনী—শুধু প্রেমলীলা তরে আসে ধরায়।
কী বলিব বল্—কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি না হায় !

দ্বৈতাতীত স্তরে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যে রহস্য মধুরিমা দ্বৈতাতীত একতা ভূমিতে
ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়, তারি কথা কহিবার ছিল সাধ
অন্তরে আমার। নিরন্তর বেদনায় অবনীতে
বাধাবিঘ্ন লয়ে কেন লভিলাম মায়ার সংঘাত !
ভাব মোর পেলনাক' ভাষা সে আনন্দ বর্ণিবারে ;
দ্বন্দ্ব বিপর্যয় আর সংশয়ের ঘন ছায়াপাত,
চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা—এ বেদনা কহিব কাহারে ?

বিশ্বপ্রকৃতির সাথে অনন্তের সান্নিধ্য লভিতে
আশা-আবেগের সেতু রচিলাম নিজ ভাবনারে
উপলক্ষ্য করি ; মানবিক পরিণতি দূরে রাখি
এ চিত্তের কেন্দ্র হ'তে বিশ্ব-পরিধিরে রসে ঢাকি,
অসীমের অভিমুখে চিদ্‌ঘন স্তরে মোর মন
ছুটে যেতে যায় অনুক্ষণ ব্রহ্ম-বিহারের তরে।
ঐশ্বর্য মাধুর্য তত্ত্ব তথ্যে এসে হ'ল বিস্মরণ,
হৃদয়-অরণ্যে মোর আলোকের দিব্যধারা ঝরে।
উৎস হ'তে নদী সম বাহিরিয়া আত্মনিবেদন
লাগি মহাসিন্ধু অভিমুখে অগ্রযাত্রা চলে মোর,
বোধির অতীতলোকে ধ্যানেরহি আনন্দে বিভোর।

সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বিবরণ

১৮৮৩ খৃঃ, রবিবার, ২২শে এপ্রিল। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের সিঁথির উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্ম সমাজের ষাণ্মাসিক মহোৎসব ও বসন্তকালীন অধিবেশন। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত ব্রাহ্মভক্তগণের সমাগমে উদ্যান-বাটী পরিপূর্ণ। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম এসেছেন। প্রত্যূষ হ'তে বিবিধ ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিদিকে মহোৎসবের নির্মল আনন্দধারা প্রবাহিত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণী পালের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে ও ব্রাহ্মভক্তগণের আন্তরিক টানে তিনি আজ এখানে আসবেন। তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় সকলে উৎসুক। এই সদানন্দময় সরল সুন্দর পুরুষকে যাঁরা পূর্বে দর্শন করেছেন, তাঁরা পুনরায় তাঁর পুণ্য দর্শন ও দিব্য সান্নিধ্য লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব। যাঁরা ইতঃপূর্বে তাঁকে দর্শন করেননি, তাঁরাও তাঁর দর্শনলাভে কৃতার্থ হবেন, এই আশায় উন্মুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকজন ভক্ত সেবকসহ দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপরাহ্ণে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সকলেই তাঁর শুভাগমনে অতিশয় আহ্লাদিত। তাঁরা পরম ভক্তিভরে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে সমাজগৃহে নিয়ে এলেন। ঐ গৃহের দক্ষিণের দালানে পূর্ব হতেই তাঁর জন্য বিশেষ আসন পাতা রয়েছে। ভক্তেরা ঐ আসনে তাঁকে সসম্মানে বসালেন এবং নিজেরা তাঁকে ঘিরে চারিদিকে বসলেন। সকলেই মহাপুরুষের সহজ সরল উপমাপূর্ণ দিব্য বাণী শ্রবণের জন্য আগ্রহাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে তাঁদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে রত হলেন। ভক্তগণ নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর 'কথামৃত' পান করতে লাগলেন।

ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন। তিনি চমৎকার উপমা সহায়ে অতি সহজ সরল কথায় সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর কথাগুলি সাধারণ পণ্ডিতগণের পুঁথিগত উক্তির মতো নয়; সমস্তই তাঁর দিব্য জীবন-বেদ হ'তে উদ্‌গীত এবং অপরোক্ষানুভূতিপ্রসূত। তাই তাঁর অমিয় বাণীর মর্ম সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করছেন। তাঁর কথামৃত পানে সমবেত প্রত্যেকেই বিমোহিত। উক্ত প্রসঙ্গের কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করা যাক—

প্রশ্ন: মহাশয়, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ: উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা, আর প্রার্থনা।

প্রশ্ন: অনুরাগ, না প্রার্থনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ: অনুরাগ আগে, প্রার্থনা পরে।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গদ্‌গদকণ্ঠে পরম অনুরাগ ভরে গান ধরলেন-

'ডাক দেখি মন ডাকার মতো,
কেমন শ্যামা থাকতে পারে,
কেমন কালী থাকতে পারে॥'

আবার প্রশ্ন: সংসারত্যাগ কি ভাল?

সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের সংসারত্যাগ নয়।

প্রশ্ন: বৈরাগ্য কি ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ: ভোগের শান্তি না হ'লে বৈরাগ্য হয় না।

প্রশ্ন: গুরু না হ'লে কি জ্ঞান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দই গুরু। যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হ'লে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। সন্ধ্যার পর আচার্য বেচারাম ব্রহ্মোপাসনা পরিচালনা করলেন। উপাসনাকালে মাঝে মাঝে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হ'তে লাগলো। উপনিষদ্ থেকে নির্বাচিত অংশসমূহ সমস্বরে উচ্চারিত হ'ল। উপাসনা-শেষে শ্রীযুক্ত বেচারাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপবিষ্ট হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে?'......'লবণ-পুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না।'......'তাঁকে দর্শন হ'লে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। খবর কে দেবে? বোঝাবে কে?'... 'মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের ঐশ্বর্যের অধিকারী, তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।'......'দয়া, ধর্ম, ভক্তি—এসব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি সহজ-সরল অথচ নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ উক্তিগুলি শ্রবণে উপস্থিত সকলে বিমোহিত হলেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম অন্তরের আকুল আবেগ সংবরণ করতে না পেরে, মহা উল্লাস ভরে ব'লে উঠলেন, 'বেশ সব কথা হ'ল!'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'ভক্তের স্বভাব কি জানো? আমি বলি, তুমি শুন; তুমি বল, আমি শুনি। তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেডিঙ্গি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি অতিশয় বিনয়পূর্ণ, নিরভিমানতার আন্তরিক প্রকাশ, অথচ অতি সরস। তাই সমবেত সকলেই ঐ কথা শ্রবণে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন

তৃতীয় বিবরণ

১৮৮৪ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর। ব্রাহ্মভক্তগণ সিঁথির সেই উদ্যানবাটীতে শরৎকালীন অধিবেশনে সম্মিলিত হয়েছেন। আচার্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য সান্যাল, ত্রৈলোক্যের বন্ধু সদরওয়ালা (সবজজ) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। উদ্যানবাটী ভক্তসমাগমে পরিপূর্ণ। সমগ্র পরিবেশ মহোৎসবের বিমল আনন্দে মুখরিত। সমাজ-গৃহটি পত্র, পুষ্প ও পতাকাদি দ্বারা অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত। ঐ গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠে সুন্দর উপাসনাবেদী রচিত হয়েছে।

বৈকাল সাড়ে চারিটা। শ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে এলেন। ভক্তগণ শশব্যস্ত হয়ে তাঁর গাড়ির নিকট উপস্থিত হয়ে ভক্তিনম্র মূর্তিতে তাঁর গাড়ি বেষ্টন ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নামলে সকলে তাঁকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করলেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সমাজগৃহে এসে ঐ গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ দালানে তাঁর জন্য রক্ষিত বিশেষ আসন অলঙ্কৃত করলেন। ভক্তগণ তাঁকে চারিধারে ঘিরে বসলেন। সকলেই তাঁর কথামৃত পানের জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে উপাসনা-বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আনত শিরে প্রণত হলেন। উপাসনার স্থান দেখে তাঁর অন্তরে শ্রীভগবানের উদ্দীপনা হয়েছে। তাই বেদীকে পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য অতিশয় ভক্তিমান্ ও সুগায়ক এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাঁর মধুর কণ্ঠের ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হন, ঈশ্বরীয় ভাবে নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হন। তিনি ত্রৈলোক্যের সঙ্গীত খুব ভালবাসেন এবং তাঁকে সাতিশয় স্নেহ করেন।

ত্রৈলোক্য গান ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'দে মা পাগল ক'রে'—গানটি গাইতে বললেন। তাঁর অনুরোধে ত্রৈলোক্য গাইছেন :

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী),
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥

গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ক্রমে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সমাধিস্থ। তাঁর দেহ নিঃস্পন্দ, নিথর। কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সমস্তই যেন বিলুপ্ত হয়েছে। চিত্রার্পিতের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট, সহাস্যবদন, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন—অদ্ভুত প্রিয়দর্শন মূর্তি! এই অপরূপ সমাধি-চিত্র দর্শনে উপস্থিত সকলেই আত্মহারা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হলেন। ঐ অবস্থায় তিনি ভাব-গদ্গদ স্বরে উপদেশ দিতে লাগলেন। কণ্ঠস্বর বিজড়িত, কথা অস্ফুট—মাতালের ন্যায় অস্পষ্ট। ঈশ্বর-প্রেমের সুরাপানে তিনি বিভোর, মাতোয়ারা।

তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না, তারে বাড়া আছে।......... এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী, তা বেশ। ......একটাতে দৃঢ় হও; হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির রুটি সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও মিষ্ট লাগবে। (সকলের হাস্য)......কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে।..... একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।'

তাঁর ভাবাবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হ'ল। তিনি সহজাবস্থা লাভ ক'রে নিজেই সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে
পাবি রে প্রেম-রত্নধন ॥

আবার বলছেন, 'ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ! তাঁর প্রেমে মগ্ন হও।... ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়,

তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়। যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।—এ কথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে!……বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।……তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।'

সদরওয়ালা প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়! তাঁর কৃপা কারুর উপর বেশী, কারুর উপর কম কেন? তা হ'লে কি ঈশ্বরে বৈষম্য-দোষ রয়েছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন: সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা। তুমি যা বলছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। বলেছিল, 'মহাশয়, তিনি কি কাঁরুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কি কম শক্তি দিয়েছেন?' আমি বললাম, 'বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন— আমার ভিতর যেমনি, পিঁপড়েটির ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তি বিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে। তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম।' দেখ না, এমন লোক আছে, একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তি বিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মানতো কেন?

আবার প্রশ্ন: মহাশয়, আমাদের কি সংসার ত্যাগ করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ: না তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে? সংসার থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জনে থাকতে হয়। নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। বাড়ির কাছে এমনি একটি আড্ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার।……কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই।

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ। হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।……জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।'

ঈশ্বরে যাতে অনুরাগ ভালবাসা হয়, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে বললেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য এ-প্রসঙ্গে বললেন, 'মহাশয়, এঁদের সময় কই; ইংরাজের কর্ম করতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন: আচ্ছা তাঁকে আমমোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যা কাজ করতে দিচ্ছেন, তাই করো। বিড়ালছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই, 'মা মা' করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে, সেইখানেই

পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। 'মা মা' করে।

'সংসারের প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য কত দিন?'—সদরওয়ালার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না; তখন কালকের জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছি সেই নাবালকের ভার লয়। এ-সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব উক্তি শ্রবণে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মুগ্ধ হয়ে বললেন. 'আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন! নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে। আহা, কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয়, তারা কি ভাগ্যবান্!'

ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ক'রে অবশেষে বললেন, 'কি এলোমেলো বকলুম! তবে আমার ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরনী, আমি গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমনি চলি, যেমন করান তেমনি করি।'

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য আবার গান ধরলেন। সঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাজছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য করছেন। সঙ্কীর্তনানন্দে মুহুর্মুহুঃ ভাবস্থ হচ্ছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় নিথর নিঃস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান। সহাস্যবদন, অপলক নেত্র। জনৈক ভক্তের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন। পুনরায় তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে ত্রৈলোক্যের গানের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর আখর দিচ্ছেন—

'নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে নাচাও গো মা;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী, সেই ভুবনমোহন-রূপে॥'

ব্রাহ্মভক্তগণ তাঁকে ঘিরে তালে তালে নৃত্য করছেন। সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা, ব্রহ্মগুণগানে বিভোর। অনেকে 'মা মা' ব'লে কাঁদছেন, সঙ্কীর্তন সাঙ্গ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ উপবেশন করলেন। ভক্তগণও তাঁকে বেষ্টন ক'রে উপবিষ্ট হলেন। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। সমাজের সান্ধ্য উপাসনা এখনও হয়নি। আত্মভোলা মহাপুরুষের দিব্য সাহচর্যে সবাই আত্মহারা। কীর্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম-বিধি ভেসে গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনিই সমাজের উপাসনা পরিচালনা করবেন। গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী এসেছেন। আরও অনেক মহিলা-ভক্ত উপস্থিত। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বের একটি ঘরে গিয়ে মহিলাদের দর্শন দিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে দু-একটি কথাও বললেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে সসম্ভ্রমে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে ধন্য হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বেদীতে উপবিষ্ট হয়ে যথারীতি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। বিজয় 'মা মা' ব'লে ব্রহ্মের আরাধনা করছেন। উপাসনা শেষ হ'ল।

এবার ভক্তসেবা। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে একান্তে ব'সে আলাপন করছেন; শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত গোস্বামীকে বললেন, 'তিনি (ঈশ্বর) অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও; সব পাবে।'

রাত্রি দশটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে দু-একজন সেবক-ভক্ত। গাড়ি গাছতলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণী পাল কিছু লুচি ও মিষ্টান্নাদি গাড়িতে তুলে দিতে এলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সবিনয়ে বললেন, 'মহাশয়! রামলাল আসতে পারেননি, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিতে পারলেন না।

বেণী পাল তখন বললেন, 'যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বেণী পালের প্রতি)—'আজ খুব আনন্দ হ'ল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি, এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে!'

বেণী পাল পরম শ্রদ্ধাভরে চরণধূলি নিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক ভক্তগণসহ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাত্রা করলেন।

ওয়েল্‌সে একটি স্মরণীয় দিন

শ্রীমতী রেণুকা সেন

তখন ছিল গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি; আমরা ক-জন মিলে বেড়াতে গেছি পর্বতমালা-শোভিত সমুদ্রমেখলা-সজ্জিত ওয়েল্‌সে। সত্যি অপূর্ব এই ওয়েল্‌স্ দেশটি, এখানকার মতো চমৎকার আরণ্যক দৃশ্যাবলী ইংলণ্ডে কোথাও দেখিনি। শহরের কোন আবিলতা আড়ম্বর নেই, সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকাল থেকে লালিত পালিত এখানকার মানুষগুলিও ঠিক যেন তপোবন-দুহিতা 'শকুন্তলা'র মতোই অনাড়ম্বর, সহজ ও স্বাভাবিক। আরও এক কারণে এই উপমাটি মনে এসেছিল। ইংলণ্ডে দেখে এলাম সাম্রাজ্যবাদের চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ, অফুরন্ত জাঁকজমক এবং অভিজাত্যের অহমিকা—সব কিছু এক জায়গায় দানা বেঁধেছে, আর তারই অদূরে যেন আরণ্যক আশ্রম—এই ওয়েল্‌স্।

প্রথমে গিয়ে পৌঁছলাম উত্তর ওয়েল্‌সের রাজধানী ব্যাঙ্গর (Bangor)। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। আমাদের ওয়েল্‌স্ ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল এই শহরটি। এখান থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি আমরা একের পর এক দেখে আসতে লাগলাম। স্নোডন (Snowdon), বেট্‌স্-ই-কোএড (Bettws-y-coed), এ্যাঙ্গলসি (Anglesey), হলিহেড (Holyhead), কন্‌ওয়ে (Conway), লান্‌ডাডনু (Llandudno), বেথেস্‌ডা (Bethesda) প্রভৃতি স্থান সত্যি খুব সুন্দর লেগেছিল। এই বেথেস্‌ডাতেই আমাদের এক অদ্ভুতপূর্ব

অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা কোন দিন ভুলতে পারব না।

বেথেস্‌ডা ছোট শহর, স্লেটের খনির জন্যই বিখ্যাত; খনির থেকে এই স্লেট কেটে নিয়ে এসে এরা গ্রেট্‌ব্রিটেন—তথা পৃথিবীর চারিদিকে চালান দেয়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যে স্লেটে হাতে খড়ি দেওয়া হয়, এগুলি ঠিক সেই স্লেট নয়, এই স্লেট ও-দেশের লোকেরা বাড়ীর ছাদে টালির মতো ব্যবহার করে। একদিন সকালবেলা সকলে মিলে এই স্লেটের খনি দেখতে বার হলাম বাসে ক'রে, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। খনির কাছেই এক হোটেলে আমরা ঢুকে পড়লাম। ওপরের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে আমরা খাবার টেবিলে বসলাম; সেই টেবিলে ওয়েল্‌স্‌-দেশীয় এক ভদ্রলোক—বছর ৫০।৫৫ বয়স, বেশ হোমরাচোমরা গোছের চেহারার—আগে থেকেই বসেছিলেন। আমরা তাঁর পাশে গিয়ে বসতে তিনি নিজে থেকেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আলাপ শুরু ক'রে দিলেন, 'আপনারা কোন্‌ দেশের লোক? কোথায় উঠেছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?' ইত্যাদি।

তাঁর পরিচয় জানলাম, তিনি হলেন সেই স্লেটের খনির একজন ম্যানেজার। ইতিমধ্যে আমাদের খাবার এসে গেল, আমরাও গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলাম, মিনিট পাঁচেক বাদে সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় যে, খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? তোমরা কি সরকারী কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে পারছ আজকাল?'

আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 'তার মানে? আপনি কি ভাবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই ১৯৪৭ খৃঃ ভারতবর্ষ ছেড়ে না দিলে আরও কয়েক বছর সেখানে টিকতে পারত? তা কিন্তু মোটেই নয়। ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলেই যে তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, এ কথা কি আপনি জানেন না?'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি ইদানীং কিছু কিছু গোলমাল হয়েছিল। সে যাই হোক, তোমাদের দেশের এমন কিছু উন্নতি করতে পেরেছ কি? শুনেছি, ইংরেজ চলে আসার পর তোমাদের সভ্যতা আবার সেই আগেকার মতো অবস্থায় ফিরে গেছে।'

আমরা তখন ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে তাজ্জব ব'নে গেছি। মুখে খাবার, না গিলতে পারছি, না ফেলতে পারছি—যাই হোক কোন রকমে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি কোন দিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি। ছোটবেলায় আমরা বিদ্যালয়ে পড়েছি যে, ভারতবর্ষের লোকেরা নিগ্রোদের মতোই অসভ্য ও বর্বর ছিল, পরে ব্রিটিশ রাজত্বে তারা আস্তে আস্তে সভ্য হয়ে উঠেছে। তবে তোমাদের দেশের কাছাকাছি চীনদেশ সম্বন্ধে পড়েছি যে, সেখানকার সভ্যতা বহু প্রাচীন, প্রায় দু-হাজার বছরের পুরানো।'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ভগবান বুদ্ধের নাম কখনো শুনেছেন কি?'

তিনি একটু ভেবে বললেন, 'বুঢা! বুঢা! হ্যাঁ, আমি শুনেছি যে, চীনদেশের লোকেরা এই বুঢার পূজা করে এবং লর্ড বুঢা যীশুখৃষ্টের মতো একজন ধর্মগুরু ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি জানেন কি যে, লর্ড বুদ্ধের জন্ম ভারতবর্ষেই এবং তাঁর দেহত্যাগের

পরে তাঁর ধর্মমত চীনদেশে চালু হয়; আর আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লর্ড বুদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ?'

'কই না, সে কথা তো শুনিনি কখনও।'

'ইতিহাস কিন্তু সেই কথাই বলছে, হয়তো আপনি তা জানবার সুযোগ পাননি; সুতরাং বুঝতে পারছেন যে, আমাদের দেশের সভ্যতা চীনদেশের সভ্যতারই সমসাময়িক। তবে সে-কথা আপনারা কখনও পড়েননি, তার কারণ আপনাদের ইতিহাস বোধহয় রচনা করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক! তিনি যদি স্বেচ্ছায় ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী তাঁর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন, তবে অনেক বছর আগেই হয়তো ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ ক'রত; এটাই আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ডে আসার পর এই কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব অনুভব করছি। কারণ বুঝেছি যে, এখানকার সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ রেখেই সাম্রাজ্যবাদীরা অপর দেশগুলির উপর শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

তিনি অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন ক'রে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'এতদিন বাদে একটা মোটা কালো পর্দা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আপনারা ঠিকই বলেছেন, ইংরেজরা ইচ্ছা করেই এতদিন বাইরের উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে সত্য কাহিনী কিছুই আমাদের জানতে দেয়নি; উপরন্তু তারা সেই কাহিনী কালিমামণ্ডিত ক'রে আমাদের শিশুকাল থেকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এ সবই তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছাকৃত রচনা। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি ওয়েল্‌স্‌কে নিয়েও তারা ছিনিমিনি খেলে চলেছে বহুদিন ধরে। কোন বিষয়েই তারা আমাদের মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে দেয় না। সব সময়েই আমরা তাদের অধীনে থেকে তাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করি, এই তারা চায়। আমাদের তারা ঘৃণা করে, এবং মনে করে, আমরা তাদের অনেক পিছনে পড়ে আছি। কিন্তু এই ধরনের অত্যাচার বেশী দিন চালাবার সুযোগ তাদের আর হবে না আমরাও স্বায়ত্তশাসন (Home rule) প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। ভারতবাসী এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক জাতিগুলি বিশেষ ক'রে যারা এতদিন ইংরেজদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানাই।' কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল।

তারপর তিনি আমাদের অতি যত্ন সহকারে শ্লেটের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন, সমস্ত ব্যাপার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং আসার সময় আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু শ্লেট উপহার দিলেন স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। আমরাও সকলে তাঁর স্বাক্ষর (autograph) সংগ্রহ ক'রে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যাঙ্গরে ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের জন্য একটি শ্রদ্ধার আসন চিরদিন অক্ষয় হয়ে রইল আমাদের মনের কোণে।

'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'

শুভ গুপ্ত

আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন—সব শোভন পেলব নম্র সৌন্দর্যের অন্তরালে এক ঋজু কঠোর নির্ভীক মানবাত্মার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথ—সব স্বপ্নচারণের অন্তরালে যাঁর অমোঘ সত্যদৃষ্টি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—'যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' যারা স্বাধীন মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী, মহৎ আদর্শের প্রতি নির্লজ্জ স্বার্থপরতার বিদ্রূপে মুখর, তাদের বিরুদ্ধে যাঁর ক্ষমাহীন-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব,
ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥'
('জন্মদিন'—সেঁজুতি)

মৃত্যু-দেহলি-প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই কবিরই উপলব্ধি:

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।
('রূপ-নারানের কূলে'—শেষলেখা)

কিন্তু এ কবিকে আমাদের মনে পড়ে না। আমরা যারা জীবনের অর্ধসত্যে মুগ্ধ, যারা জীবন থেকে মৃত্যুকে, প্রাপ্তি থেকে সংগ্রামকে, আনন্দ থেকে বেদনাকে ভুলে থাকতে চাই—তারা পুরো রবীন্দ্রনাথকে চাই না। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'ললিত-লবঙ্গ-লতা' সংস্কৃতি-চর্চার প্রধান পরিপোষক ব'লে আমরা মনে করি, তার উদ্দেশ্যেই কবির স্বপক্ষ ও বিপক্ষদলের বক্তব্য নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ আমাদের কাছে প্রায় অবহেলিত।

তাই এই শ্রাবণের মেঘলোকে বিশবৎসর আগেকার কবির মৃত্যুদিনটিকে অবলম্বন ক'রে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার কথাই বারংবার মনে জাগছে। মৃত্যু তো কেবল দেহেরই নয়; প্রাণহীন, সত্যহীন, বিবেকহীনের মৃত্যু আসল মরণের বহু আগেই ঘটে যায়। বহুকল্পদুর্লভ ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায়—'এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ'—রবীন্দ্রনাথ সেই অমরাত্মাদেরই অন্যতম।

সাহিত্য চলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরতিমগ্ন হ'লে যে বিপদ দেখা দেয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। বছর দশেক আগেকার কাস্তে-হাতুড়ি ট্রেড-মার্কের কবিতার জায়গায় এখন বেশীর ভাগ কবির কাজ 'অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়' কতকগুলি নির্জীব ভাব-রোমন্থন; চিত্রকল্প (image)-ধর্মী কবিতার নাম ক'রে বিচ্ছিন্ন উপমার চিত্রসমষ্টির দ্বারা বক্তব্যকে

বিভ্রান্ত করা, জীবনে যেখানে প্রতিপদে নির্মম হতাশা ও লাঞ্ছনার গ্লানি—কবিতায় সেখানে কৃত্রিম রোমান্টিকতার মরীচিকায় বাস্তবকে ভুলে থাকা।

অথচ এই শতাব্দীর কবিগুরু (বাংলা-সাহিত্যের কথাই বলছি) সূক্ষ্মতম রসবিলাস থেকে মহত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা অবধি জীবনের সর্বস্তরের অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। জাতীয় চিত্তসঙ্কটে তাঁর বাণী ও লেখনা কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। হিন্দুমেলার যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে বক্সা দুর্গের বন্দীদের প্রতি অভিনন্দন-বাণী, 'আফ্রিকা'-র উদ্দেশ্যে মানবতার বেদনাগাথা-রচনা থেকে 'সভ্যতার সংকটে' ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উন্মোচন অবধি রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যে অন্যায়ের নির্ভীক প্রতিবাদ-কাহিনী আমাদের জাতীয় আদর্শের চির-উজ্জ্বল নিদর্শন।

এর পাশাপাশি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের দিকে চেয়ে কি মনে হয় না যে, আমরা কবির বাণীকে কেবল উপযুক্ত সময়ে উদ্ধৃতির জন্যই রেখে দিয়েছি?

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য ব্যক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গসম।
('ন্যায়দণ্ড'—নৈবেদ্য)

ওই ন্যায়দণ্ড যার হাতে নেই, তারই ললাট-লিপি—

এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
('ত্রাণ'—নৈবেদ্য)

রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবাত্মার এই অসম্মানের বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী।

সে-সাহিত্যের একদিকে যেমন:

'রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!'
('আমি চঞ্চল হে'—উৎসর্গ)

আর একদিকে তেমনি:

হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়ডমরু বাজাব;
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
...
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
...
তিমিররাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।
('সুপ্রভাত')

এই অভীর মন্ত্র রয়েছে রবীন্দ্রজীবন-সাধনায়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যা-সাগরের যোগ্য উত্তরাধিকারী এই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিহিত ছিল অপরাজেয় পৌরুষের

অনির্বাণ হোমানল। এই সুদৃঢ় চরিত্র-ভিত্তিকে ভুলে গিয়ে নিছক সৌন্দর্য-সাধনায় মগ্ন থাকাটা রবীন্দ্র-ভক্তির লক্ষণ নয়, সে-কথা আমরা যত বেশী মনে রাখব, ততই সাহিত্যে ও জীবনে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের, কল্যাণের সঙ্গে রসবোধের এবং চারিত্রশক্তির সঙ্গে হৃদয়াবেগের সার্থক সম্মিলন ঘটবে।

সত্যনিষ্ঠ পৌরুষের একটি বড়ো লক্ষণ লোকৈষণার অভাব। সুদুর্জয় মনুষ্যত্বের দুর্গম পথযাত্রীর 'ক্ষুরস্য ধারা' যাত্রাপথে সিদ্ধিলাভের আগে অবধি সেই একাকী যাত্রার ইতিহাস। এই একাকিত্বেই যথার্থ বীরত্বের প্রকাশ। ইবসেনের 'An Enemy of the People'—নাটকের নায়ক একদিন আবিষ্কার করেছিল যে, 'মানুষ যখন সবচেয়ে একা, তখনই সে সবচেয়ে শক্তিশালী'। তেমন একটা নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র-চরিত্রে কোথাও ছিল, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন,

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে'—

ওই একাকিত্ব কোন অসহায় ব্যথাতুরের বেদনাসঞ্জাত নয়—পরম নির্ভীক জীবন-পথিকের নিঃসঙ্গ যাত্রা। দেশবিদেশের জয়মাল্যলাভে, আত্মীয়বন্ধুভক্তজনের অজস্র স্নেহপ্রীতির আলিঙ্গনে অথবা ঈর্ষাবিদ্বেষমূঢ় সমালোচনার কশাঘাতে—কোন কারণেই কবিচিত্তের এই পরম-নিঃসঙ্গতা-বোধ বিনষ্ট হয়নি। তাই কোন করতালির চাটুকারিতায় রবীন্দ্রহৃদয়ের বীরধর্ম বিচলিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে তাঁর দেহত্যাগের বৎসর ১৩৪৮ সালের নববর্ষের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' স্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের দোর্দণ্ড রাজপ্রতাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে?—কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা ক'রে থাকব। সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রব। ......এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি এই বিশ্বাস বীরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেরই আর একটি দিক ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনামূলক গানের ভাষায়। মানুষ তার মনুষ্যত্বের দ্বারাই নিজেকে নিজে ত্রাণ করবে—এই

অপরাজেয় মনুষ্যত্বই ভগবানের কাছে কবির প্রার্থনীয়—

'তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি'—
'বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়'—
'ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে,
নূতন জনম দাও হে॥'

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বলিষ্ঠ প্রাণদ ভাবাদর্শের চর্চাই আজকের দুর্যোগাচ্ছন্ন জাতীয় চিত্তের পক্ষে বিশেষভাবে করণীয়। একদা জীবনের সহজ প্রশান্ত আনন্দলোকে মগ্ন থেকেই কবি তৃপ্ত হ'তে চেয়েছিলেন,—এমন সময় তাঁর কাছে জীবনের, জগতের, কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছুল—সে আহ্বানের পিছনে ছিল জগৎপিতার সংগ্রামের আহ্বান—সব জড়তা, সব কলুষ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘাতের আহ্বান—অন্তরের অন্তরে সেই শঙ্খবাণী কবি অনুভব করেছিলেন. আজীবন সেই শঙ্খনিনাদ তাঁর কাব্যে ঘোষিত হয়েছে—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥
('শঙ্খ'—বলাকা)

বর্তমান বাংলাসাহিত্যে এই বাণী নূতন ক'রে ধ্বনিত হোক।

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

—রবীন্দ্রনাথ

'জীবন-দেবতা'র কবির প্রতি

'বৈভব'

আবার ফিরিয়া এল শ্রাবণ-পূর্ণিমা,
ঝুলনের সিক্ত মধুরিমা
মাখা আজ সজল আকাশে—
ব্যাকুল বাতাসে বাজে তারি সংবেদনা !
হে কবি, এমন রাতে তুমি আসিবে না
তোমার প্রাণের প্রিয়া পৃথিবীর ঘরে ?
স্বর্গের অমৃত বুঝি নিল চুরি ক'রে
মরতের অমর কবিরে ?
কবি, তুমি আসিবে না ফিরে ?
এই তব প্রতিশ্রুতি ? এই তব মিথ্যা অভিজ্ঞান :
'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' !

না জানি কোথায় কোন্ লোকে লোকান্তরে
চলিয়াছে তব অভিযান !
কে তোমারে বাঁধিবারে পারে ?—
সারা বিশ্বে গগনে গগনে আছে তব ঠাঁই !
নীহারিকা তারায় তারায় চলেছে তোমার নিমন্ত্রণ !
তবু এ ধূলির ধরা
সাগর-সুনীলাম্বরা
ধরেছিল তোমারি কিরণ !
উজলি উঠিয়াছিল নয়ন যুগল,
চঞ্চলি উড়িয়াছিল শ্যামল অঞ্চল
তোমারি তো উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
তোমারি জীবনময় সঙ্গীতে ও গানে
মুখরি উঠিয়াছিল এ ধরণীতল !

আজ তুমি কোথা কবি, হে চির ভাস্বর !
সারা পৃথ্বী হেরি আজ অন্ধকার—বড় ভয়ঙ্কর,
চারিদিকে শুনি শুধু 'শৃগালকুকুরদের কাড়াকাড়িগীতি'
এতটুকু আলো নাই, আশা নাই—মহামৃত্যুভীতি !

*

অতীতের উদয় উষায়
ওই দেখা যায়
কী অপূর্ব প্রথম বিকাশ।
জীবনের দেবতার ছন্দোময় লীলার বিলাস।
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ তরঙ্গিয়া ওঠে বারংবার
কী জানি তাহার ভাষা—কী বা ভাব তার।
শুধু শুনি—অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কলরোলে পরিণত হয়,
আকাশে সাগরে মেঘে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিময়।
সন্ধ্যা ও প্রভাতবেলা অনন্ত সঙ্গীতে
হৃদয়-সমুদ্র যেন লাগে তরঙ্গিতে
নির্ঝরের ভাঙে স্বপ্ন—সে গুরু আহ্বানে,
ভাঙিয়া পাষাণ কারা—আকুল পাগলপারা
ডুবায়ে সকল দেশ—বহি চলে মহাসাগরের পানে।

সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব সাধনা
তারি উপাসনা,
সারাটি জীবন ভরি তাহারি ব্যঞ্জনা
বাজিয়াছে কত ছন্দে মহানন্দে—
সপ্তস্বরগ্রাম ভেদি তাহারি মূর্ছনা
শেষ হয়ে রেশ রেখে যায়
শত শত গীতি-কবিতায়।

সুন্দর—সে ধরা দিল ছন্দের বাঁধনে
কতভাবে কতরূপে আনন্দ-সাধনে—
'এল গন্ধে বরণে এল গানে
নব নব রূপে এল প্রাণে'—
কভু চুপে চুপে লুকায়ে চলিয়া গেছে
'নয়ন-ভুলানো' তব জীবনদেবতা,
সকালে ডাকিয়া ধীরে—সারাদিন কহেনি সে কথা।
তাহারি লাগিয়া রচিয়াছ কত গান—
কত না রজনী জাগি কত মান অভিমান,
তবু সে অন্তরযামী আসে নাই, দেয় নাই সাড়া—
তোমার জীবন ল'য়ে করিয়াছে খেলা
নদীতীরে—নির্জনমন্দিরে, সারাদিন—সারা সন্ধ্যাবেলা।

জীবন-দেবতা তব এসেছিল সুরের খেলায়—
জীবনের ভোরের বেলায়—
তার পর এসেছে কত না রূপে
অতি চুপে চুপে
তোমার নিভৃতবক্ষে মানসী মূর্তিতে
জাগ্রত সে যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে আনন্দস্ফূর্তিতে
এসেছে কত না বার—
আবরিয়া স্বরূপ তাহার।
জীবনদেবতা তব জাগে
নিতি নিতি নব অনুরাগে।
সে দেবতা কভু
পিতা মাতা সখা প্রভু—
কখন শ্রেয়সীরূপে দেখা দিয়া
প্রেয়সীরূপেও তব মোহিয়াছে হিয়া!
অন্তরে বাহিরে তব পুরুষ-প্রকৃতি যেন গিয়াছে মিশিয়া;
তাই বাজে বজ্র-কণ্ঠ সুকঠিন উদাত্ত সঙ্গীতে
কখন ছন্দের তাল ধরা দেয় সুকোমল নৃত্যের ভঙ্গীতে!
তোমার অন্তরে সকল ভাবের মেলা—
সর্বভাব করে সেথা খেলা
কবিচিত্ত—মাতৃবক্ষ যেন!
তাই, গ্রহণ করেছ সব, হে আনন্দময়!
বর্জন করিয়া মুক্তি সে তোমার নয়।

কখন বা দেখি, তুমি সাগর গভীর,
অনন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথই অথির,
তথাপি বেলার সীমা করে না লঙ্ঘন,—
সে কোন্ বেদনা-ভরা অসীম ক্রন্দন?
অথবা আকাশ সম অতীব উদার—
আনন্দ-উজ্জ্বল, যার নাহি পারাপার;
খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি খেলিছে আনন্দে—
যেথা ঋতুচক্র নাচে অপরূপ ছন্দে।
হিমালয়রূপে তুমি দেখা দাও শেষে;
উন্নত প্রশান্ত শুভ্র ধ্যানময় ঋষিদের বেশে,
কণ্ঠে ল'য়ে তাঁহাদেরি মৃত্যুহীন বাণী—
ভরিয়া দিয়াছ তাহে ধরণীর স্বর্ণতরীখানি,
রচিয়া গিয়াছ তব 'শান্তিনিকেতন'—
বিশ্বমহামিলনের নব আয়োজন।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী—প্রস্তুতি

বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পৃথিবীর সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতেছে। এইজন্য কয়েকটি কমিটি—বিশেষভাবে একটি সাধারণ কমিটি গঠনের আয়োজন করা হইতেছে, এই উপলক্ষে শীঘ্রই কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐ সভায় এই বিষয়ে বিভিন্ন কার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের নাম ঘোষণা করা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সাধারণ কমিটির অধ্যক্ষ (President) হইবেন এবং বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সহকারী অধ্যক্ষ (Vice-Presidents) হইবেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল দেশের লোকই সাধারণ কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্য হইবার চাঁদা এককালীন মাত্র ২০৲ টাকা। একই পরিবারের দুই ব্যক্তি সভ্য হইলে ৩০৲ টাকা দিলেই চলিবে। ছাত্র ও স্কুল-শিক্ষকগণকে মাত্র ১০৲ টাকা দিতে হইবে। আমরা আশা করি, দলে দলে লোকে এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করিবেন এবং এই শুভ কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিবেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
সম্পাদক, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি
প্রধান কার্যালয়, বেলুড় মঠ পোঃ (হাওড়া)

৪ঠা জুলাই, ১৯৬১

স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-প্রকাশন

১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্যন্ত আমরা সংবাদ পাইয়াছি বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু ও মলয়ালম্ ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের সাহায্য ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তামিল ও তেলুগু মাদ্রাজ মঠ হইতে, মারাঠী নাগপুর আশ্রম হইতে, গুজরাতী রাজকোট হইতে, হিন্দী মায়াবতী হইতে, মলয়ালম্ ত্রিচুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাংলায় এই গ্রন্থ-সংগ্রহ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামে ১০ খণ্ডে উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা, পত্রাবলী (বাংলা ও ইংরেজীর অনুবাদ), বক্তৃতা (অধিকাংশই অনুবাদ), কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, কবিতা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের ২য় পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নাগরিক সভা ও কমিটি-গঠন

আগামী ১৯৬৩ খৃঃ সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী কিভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য গত ৯ই জুলাই বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার (গোল পার্ক)-এ কলিকাতার নাগরিকগণ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভায় মিলিত হন।

সভার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তাহা আলোচনা করিয়া বলেন, গত ৬০ বৎসর ধরিয়া স্বামীজীর চিন্তাধারা ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণকে প্রভাবিত করিতেছে এবং এখনও বহু দিন করিবে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাতির সর্বস্তরে কল্যাণশক্তি সঞ্চারিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

অতঃপর ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শুধু জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলেই চলিবে না, ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করিয়া আন্তর্জাতিক দিক দিয়াও তিনি ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'চিরন্তন হিন্দুধর্ম' বলিতে কি বুঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় তাহা শুনাইয়া গিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাঁহার বাণী সার্থকভাবে প্রচার করিতে পারে।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব পালনের গুরুদায়িত্ব শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নহে, এই দায়িত্ব সকল ভারতবাসী—তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক ছিলেন না, তিনি বিশ্বমানবতা-মন্ত্রেরও উদ্‌গাতা। তিনিই এ যুগে বিশ্বের সহিত ভারতের সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জনতাকে আহ্বান করিয়া বলেন, তাঁহারা যেন অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া এই বিরাট প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এতদর্থে দেশবাসীর নিকট তিনি ৩০ লক্ষ টাকার আবেদন জানান।

সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি সহায়ে স্বামীজীকে একটি বহুমুখী হীরকের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, স্বামীজীকে এক এক জন এক এক ভাবে দেখে, তিনি সবগুলিরই সমষ্টি। কেহ তাঁহার ধর্মজগতের সাধনা ও সিদ্ধির দিকটাই দেখে, কেহ জাতীয় জাগরণের দিকটাই দেখে, আবার কেহ দেখে ভারতের পরাধীনতার যুগেও তিনি কিভাবে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের পর স্বামীজীর পরিকল্পিত যে কাজ শুরু হইয়াছে, তাহা আরও কঠিন। আজ আমাদের মানুষ গঠন করিতে হইবে। স্বামীজীর ধর্ম মানুষ-গড়ার ধর্ম। এই আয়োজন সার্থক হউক। স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের আপন জন, তবু তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসব আয়োজনে কলিকাতাবাসীর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে, কারণ এই শহরেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ এবং তাঁহার বাণী অনুধাবনের দ্বারাই এই 'ঋষিঋণ' পরিশোধ করা যাইতে পারে।

সভার শেষাংশে শতবার্ষিকী উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তিনটি কমিটি গঠিত হয়।

সাধারণ কমিটি

পৃষ্ঠপোষকগণ : ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীরাজগোপালাচারী, এবং কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও গোয়ালিয়রের মহারাজা।

সাধারণ কমিটির সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ এবং সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও দেশবিদেশের বহু মনীষী।

সম্পাদক : স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
সহকারী সম্পাদক : স্বামী শাশ্বতানন্দ
শ্রীকালীপদ সেন
কোষাধ্যক্ষ : শ্রী বি. কে. দত্ত

সাধারণ সভ্যের তালিকায় দেশবিদেশের বহু মনীষী, সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিকের নাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষগণের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইয়া এই মহা উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হইয়াছে। যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি এই কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

ডক্টর কালিদাস নাগ উল্লিখিত সাধারণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনয়ন করেন, শ্রী সেন উহা সমর্থন করিলে উপস্থিত সকলে সহর্ষে উহা অনুমোদন করেন।

এইভাবে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসমিতি (Working Committee) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি *

সভাপতি : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন
সহ-সভাপতি : স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
সহকারী সম্পাদক : স্বামী বিমুক্তানন্দ

সর্বশেষে ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান (Mayor) শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কার্যনির্বাহক (Executive Committee) সমিতির নাম প্রস্তাব করেন এবং বর্তমান মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

কার্যনির্বাহক কমিটি *

সভাপতি : বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি : ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবি. কে. দত্ত

কমিটিগুলিতে প্রয়োজনমত সদস্য নির্বাচন করা চলিবে।

* স্থানাভাব বশতঃ কমিটিগুলির সাধারণ সদস্যদের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না।

সমালোচনা

শ্রীপত্মাবলী—শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত এবং তৎসমাহৃত। প্রকাশক—শ্রীরাঘবচৈতন্য দাস, গিরিধারী কুঞ্জ, ১৮ গোপীনাথ বাগ, বৃন্দাবন (মথুরা), উত্তরপ্রদেশ। পৃষ্ঠা ২৪৩। মূল্য টাকা ২.২৫।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী কেবল মহাভক্ত ছিলেন না, তাঁহার অসামান্য বৈদগ্ধ্য তৎকৃত ১৮টি গ্রন্থে অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' রসিকসমাজে একটি উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারগ্রন্থ-রূপে সমাদৃত। শ্রীরূপ গোস্বামী একাধারে কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক।

আলোচ্য 'পত্মাবলী' তাঁহারই একটি সংগ্রহগ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সংস্কৃত কবির ভক্তিরসামৃতপূর্ণ শ্লোক সন্নিবিষ্ট। শ্রীরূপ গোস্বামীর স্বকৃত কতকগুলি শ্লোকও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা', 'ভজনমাহাত্ম্যম্', 'ভক্তবাৎসল্যম্', 'শ্রীমথুরামহিমা', 'শ্রীবৃন্দাটবীবন্দনম্', 'গোপীনাং প্রেমোৎকর্ষঃ', 'শ্রীরাধায়াঃ পূর্বরাগঃ', 'শ্রীকৃষ্ণবিরহঃ' প্রভৃতি বিষয়ক শতাধিক কবিতা ইহাতে আছে। প্রকাশক শ্রীরাঘব চৈতন্যদাস এই বইখানি প্রকাশ করিয়া রসিক ভক্তসমাজের সত্যই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পত্মাবলীর হিন্দী টীকা রচনা করিয়াছেন শ্রীবনমালিদাস শাস্ত্রী। খুবই সহজ সুললিত হিন্দী। গ্রন্থারম্ভে শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ৩০টি ছন্দে ১২৫ জন কবির কবিতা ইহাতে সংগৃহীত। নিজের কবিতার নীচে লিখিয়াছেন 'সমাহর্তুঃ' —অর্থাৎ ইহার সংগ্রহীতা শ্রীরূপের।

প্রত্যেক শ্লোকের নীচে এক একটি অন্বয় দিলে শ্লোকগুলি আরও সুগম হইত। একটি শ্লোক উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :

পত্মাবলী-সমাহর্তা শ্রীরূপের কবিতা—
কদা বৃন্দারণ্যে মিহিরদুহিতুঃ সঙ্গমহিতে
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতেঃ।
লপন্নুচ্চৈরুচ্চৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং
করিষ্যে সোৎকণ্ঠো নিবিড়মুপসেকং বিটপিনাম্॥

সমালোচনার সীমিত পরিধিতে আর উদ্ধৃতি-প্রদানের অবকাশ নাই। সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত এই ভক্তিমঞ্জুষা পরম আদরের বস্তু

—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

সন্ধ্যামালতী—লেখক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী কর্তৃক ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৯ ; মূল্য দুই টাকা

গ্রন্থখানি তিনটি রচনার সমষ্টি। প্রথমটির নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে। এই রচনাটিতে নাটকীয় ভাব ও ভাষার মাধ্যমে দুরূহ ভক্তি-তত্ত্ব সরস ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় রচনা 'উলট পুরাণে' চিরনিন্দিত কৈকেয়ী চরিত্রকে নিপুণ তুলিকার দ্বারা এমনভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, তিনি এখন নিন্দিতা না হইয়া বন্দিতা হইয়াছেন। তৃতীয় 'দ্বন্দ্বসনে দ্বন্দ্ব ক'রে যাও দ্বন্দ্বাতীত পারে' শীর্ষক প্রবন্ধে আপাতদৃষ্টিতে জগতের যে বৈষম্য প্রতি-নিয়তই চিন্তাশীল মানবকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহার একটি সুচিন্তিত মীমাংসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিষয়বস্তুর আলোচনার নৈপুণ্যে ও ভাষার পারিপাট্যে প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে নয়, সর্বসাধারণেরও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

—শিবপ্রসাদ আগরওয়ালা

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—শান্তশীল দাশ। প্রকাশক: গোপালচন্দ্র রায়, সাহিত্য সদন, এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য টাকা ১'২৫।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের কবিতাবলীর ২৫টির সমাবেশ আলোচ্য পুস্তকে। বইটির নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিখ্যাত গানের কলি দিয়ে। প্রত্যেকটি কবিতায় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একটি উদাহরণ:

সীমা দিয়ে যারা এ পৃথিবী গড়ে কারাগার,
আর সেই সীমা-ঘেরা ক্ষুদ্র রুদ্ধ গণ্ডীর ভিতর
বাস করে, কাঁদে হাসে, ভালবাসে,
করে হাহাকার,
শোনে নাকো অসীমের ডাক যেথা ওঠে নিরন্তর।
সে-অসীম-স্পর্শচ্যুত সীমা-খিন্ন অসংখ্য জীবন;
তাদের বেদনা তুমি শুনেছিলে, সে মূক ক্রন্দন,
তোমাকে দিয়েছে তাদের সে অক্ষম পরাজয়;
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকীর শুভলগ্নে প্রকাশিত বইটি আশা করি প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে।

লহ প্রণাম—বিভা সরকার। প্রকাশক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪১; মূল্য টাকা ১'২৫।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রণামাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে আলোচ্য বইটির 'পঁচিশে বৈশাখ', 'নবারুণ', 'শেষ ব্রাহ্মণ', 'একটি নমস্কার', 'হিমাদ্রি-প্রাণ', 'মহা নেমে', 'বাইশে শ্রাবণ', মৃত্যুহীন' প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ কবিতার মাধ্যমে। বইটিতে একটি সূচীপত্রের অভাব অনুভূত হয়।

শ্রীময়ী (নূতন মাসিক পত্রিকা) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; রবীন্দ্রশত-জন্ম-বার্ষিকী—বৈশাখ, ১৩৬৮। সম্পাদনায় অঞ্জলি বসু ও নির্মল ভাই। পি ৬০৫, ব্লক 'ও' নিউ আলিপুর, কলিকাতা ৩৩ হইতে নির্মল বসু কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ নয়া পয়সা, বার্ষিক মূল্য (ডাক মাশুল সহ) ৬৲।

মোট ২৩টি গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'শ্রীময়ী' মাসিক পত্রিকা। বাংলা দেশের উর্বর ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে বহু পত্র-পত্রিকা গজিয়ে ওঠে। আমরা আশা করি 'শ্রীময়ী' নতুন বলিষ্ঠ ভাব পরিবেশন ক'রে বাংলা দেশ ও সাহিত্যকে যথার্থ শ্রীমণ্ডিত করতে পারবে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখার বিষয়বস্তু ভাব ও ভাষায় তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা: রবীন্দ্র-প্রণতি—জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), জোড়াসাঁকোর ধারা সুরাজচন্দ্র দাশ, শ্রীশ্রীমা ও আধুনিক নারীসমাজ—উষাদেবী সরস্বতী।

উদয়াচল (১৩৬৭): প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৭৯+২৫।

বিভিন্ন বিষয়ের ২৫টি বাংলা এবং ৯টি ইংরেজী লেখা স্থান পেয়েছে এবারের 'উদয়াচল' পত্রিকায়। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। 'আমাদের বর্তমান সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শ' এবং 'Swami Vivekananda: His plan to build up a new India প্রবন্ধে স্বামীজীর ভাবাদর্শ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'The Ashrama: Its growth and development' প্রবন্ধে আশ্রমের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী হরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৮শে জুন অপরাহ্ণ ৪টায় স্বামী হরানন্দ (তারানাথ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৫ মাস যাবৎ তিনি আন্ত্রিক পক্ষাঘাতে (intestinal paralysis) শয্যাগত ছিলেন।

১৯১৩ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার দেহ-নির্মুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী সেবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই জুলাই বেলা ১১টার সময় স্বামী সেবানন্দ (গণেশ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৫৮ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল ধরিয়া তিনি হাঁপানিতে (cardiac asthma) ভুগিতেছিলেন। স্বামী সেবানন্দ অন্ধ ছিলেন।

১৯২৫ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গত ৩৬ বৎসর যাবৎ স্বামী সেবানন্দ সেবাশ্রমে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভজন-সঙ্গীত এবং ২০শে প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও অপরাহ্ণে নগরকীর্তন হইয়াছিল। ২১শে জ্যৈষ্ঠ উষা-কীর্তন এবং পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজন হয়। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়; প্রায় দুই সহস্র ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয় এবং অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। তৎপরে শ্রীহরলাল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক একদিন যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

মালদহ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পাঁচ দিবসব্যাপী বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তিন দিন বর্ধমানের শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুরের চণ্ডী-কীর্তন হয়। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে দুইদিন দুইটি বক্তৃতা দেন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, ভজন এবং পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ হয়। ঐ দিন বিকালে রামায়ণ কীর্তন ও সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা কীর্তন হয়। এই উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর, পূর্ণিয়া জেলা এবং মালদহের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্ত ও সাধুদের সমাগম হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

রাঁচি: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশ্রমটি মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর পরিবেশে

অবস্থিত। ১৯৩০ খৃঃ হইতে ইহা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জনসেবায় রত।

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,৫২৬। দরিদ্র ২,৪১৮ জন রোগীকে ঔষধসহ পথ্যও দেওয়া হয়। বায়োকেমিক ও বিশেষ প্রয়োজনীয় এলোপ্যাথিক ঔষধও চিকিৎসালয়ে রাখা হইয়াছে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী ১৪টি গ্রামের ১,৬২০ জনকে পনর দিন অন্তর জনপ্রতি ১½ পাঃ হিসাবে ৫ মাস যাবৎ গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। দরিদ্র বালক-বালিকাদের মধ্যে ১০০ নূতন জামা প্যাণ্ট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

গ্রন্থাগারে ইংরেজী হিন্দী বাংলা ও সংস্কৃতে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের সুনির্বাচিত ১,৫৪৭ বই আছে। পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ৬৫ খানি হিন্দী ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্র রাখা হয়। পাঠাগারে দৈনিক গড়ে ২৫ জন পাঠক পড়াশুনা করেন। গ্রন্থাগার হইতে ৫১২ পুস্তক গ্রাহকদের পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ১৩টি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ২০৮টি আশ্রমে এবং ২৮টি আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ে ক্লাস করা হইয়াছিল। লাইব্রেরী-হলে সুধী বক্তাগণ সমাজ ও কৃষ্টি বিষয়ে ১৩টি ভাষণ দেন। শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠন দেখানো হয় এবং ৩৩টি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

কানপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যধারা তিন ভাগে বিভক্ত (১) ধর্ম ও সংস্কৃতি (২) শিক্ষা (৩) চিকিৎসা।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজন এবং রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা হইয়া থাকে। আশ্রমের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৭৮। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৫,৩৫০; ৫,০২১ পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নূতন ৩২,৫৯২ এবং পুরাতন ১,২৪,৮৫৭ রোগী চিকিৎসিত হয়। সার্জিক্যাল ঃ নূতন ৩,১৮৩ এবং পুরাতন ১১,৬০১। অস্ত্রোপচার ঃ সাধারণ —১.৩১৪, বিশেষ—৫৮; ইঞ্জেকৃশন—৭,১৮৪; ইলেক্ট্রোথেরাপি—৫০; ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনা—২২৫। গড়ে দৈনিক ৩৭৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে একটি এক্স্-রে প্ল্যাণ্ট ক্রয় করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

কেন্দ্রাধ্যক্ষ ঃ স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী ঃ স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং রাজযোগ ও গীতার ক্লাসও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল ঃ অমরত্ব; হিন্দুনীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব; আভ্যন্তরিক স্থৈর্য লাভের উপায়; হিন্দু-ধর্মে কর্ম ও পুনর্জন্ম; বর্তমান জগতের জন্য বুদ্ধের বাণী।

মে ঃ চরম একত্ব; ক্ষুদ্র অহং হইতে বৃহৎ অহং; ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; দৈনন্দিন জীবন কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় ভরিয়া তোলা যায়?

ইওরোপে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জার্মান গবর্নমেণ্টের অতিথিরূপে গত জুন মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম জার্মানি পরিভ্রমণ করেন। বন্, মার্বুর্গ, গটিন্‌গেন্, হামবুর্গ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তিনি ঐ সব স্থানে ভারত-তত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বর্তমান ভারতে নব জাগরণ'। বন্-স্থিত ভারতীয় দূতাবাসে তিনি 'বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। [H. S.]

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ইম্ফল: গত ১০ই ও ১১ই জুন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন অপরাহ্নে মণিপুর ও ত্রিপুরার কমিশনারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় স্তোত্রপাঠ ও ভজনের পর বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন এবং 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী' বিষয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা বিবৃত করিয়া সকলকে মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন।

দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্নে পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন ও ভজন হয়। ৫৫০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরতি ও ভজনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

বাঁখাটী (মেদিনীপুর): গত ১৪ই ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, নাম-সংকীর্তন, 'কথামৃত'-পাঠ, কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির ও কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ যোগদান করেন।

কার্যবিবরণী

হাওড়া: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের (৪, নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া) কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৫৪—মার্চ '৫৯) আমরা পাইয়াছি।

১৯১৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে নিয়মিত পূজা, ভজনাদি এবং বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা ও জন্মোৎসবাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা হইয়া থাকে।

গ্রন্থাগারে ৩,৯০০ বই আছে, পাঠাগারে ৩টি দৈনিক এবং ১০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০। আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন বর্তমানে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য (কলা)—তিনটি বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থার অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।

আশ্রম কর্তৃক রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে ৪৪,০৯১ (নূতন ২৪,৩৩২) রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং দরিদ্রদিগকে বস্ত্র, কম্বল ও জামা দেওয়া হয়।

লুপ্ত নগরী

আদি সপ্তগ্রামে গ্রীকোরোম্যান (Greco-Roman) সংস্পর্শের কয়েকটি নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলি একটি লুপ্ত নগরীর উপর নূতন আলোক সম্পাত করিতেছে। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীতীরে এই নগরীটি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এক সময়ে সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান ত্রিবেণীর দুই মাইলের মধ্যে এই মধ্যযুগীয় নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া এতদিন অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল। কিন্তু এই নূতন আবিষ্কারের ফলে আদি সপ্তগ্রামও 'গঙ্গাহৃদির' (Ganga-ridea) একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহা ছাড়া এই নগরীটি গঙ্গানদীর

মোহানায় অন্যান্য বন্দরের ন্যায় বিদেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে যুক্ত ছিল বলিয়া দাবি করিতে পারে।

গত মে মাসে গ্রীকো-রোম্যান যুগের জুয়া-খেলার পাত্র (rouletted dishes) ও সুঙ্গ-কুশান যুগের চকচকে কালো মৃন্ময় পাত্রসহ ২,০০০ বছরের পুরাতন টুকরা টুকরা বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও কতকগুলি আকর্ষণীয় সুন্দর ধরনের বাসন-কোসনে এককেন্দ্রিক বৃত্তসকল অঙ্কিত থাকায় বোঝা যাইতেছে যে, তাম্রলিপ্ত হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ের মতো এই স্থানেও ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর অঞ্চলের নাবিকদিগের যাতায়াত ছিল। (সঙ্কলিত)

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা

হুগলি জেলার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর জন্মস্থানে মন্দির-নির্মাণ কমিটির আহ্বানে গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলা ১১ টা ৪৫ মিনিটের সময় সংকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর যথারীতি স্থাপন করেন। ঐ সময়ে কলিকাতার ও স্থানীয় বহু ভক্ত এবং বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের বহু সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। ভিত্তিস্থাপনের পূর্বে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম সম্পন্ন হয়। সমবেত সাধু ও ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত চরণস্পর্শে পবিত্র আঁটপুর গ্রামের মাহাত্ম্যাদি কীর্তন করেন।

পরলোকে ডাঃ অঘোরচন্দ্র ঘোষ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ডাক্তার অঘোরচন্দ্র ঘোষ গত ১লা জুলাই তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং পরম ভক্তিমান্ ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল সার্জেন হইয়াছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা পরম শান্তি লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বর্ণপ্রভা গুপ্তার ৺কাশীপ্রাপ্তি

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১০ই জুন রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ সময়ে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের পরিচালিকা (superintendent) স্বর্ণপ্রভা গুপ্তা (ছোট মা) ৮০ বৎসর বয়সে ৺কাশী লাভ করিয়াছেন। ক্যান্সার (cancer) রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাস তিনি শয্যাগতা ছিলেন। গত ৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের কাজ অতি দক্ষতার সহিত চালাইয়া আন্তরিক সেবা ও পরিচর্যার জন্য 'ছোট মা' নাম অর্জন করিয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রভা পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অপূর্ব ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল সাধনভজনে কাটাইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি সজ্ঞানে ইষ্টনাম শুনিতে শুনিতে তাঁহারই পাদপদ্মে মিলিতা হইয়াছেন

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ভাদ্রমাস হইতে 'উদ্বোধন'-গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন



নবধা ভক্তি

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

শ্রীভগবানকে লাভ করিতে গেলে ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। এই ভক্তির বিভিন্ন রূপ। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাব প্রসিদ্ধ। নবধা ভক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়, নবধা ভক্তি—যথা: শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভাব, সখ্যভাব, আত্মনিবেদন।

কোন ভক্তের মুখ্য সাধনা শুধু ভগবৎকথা শ্রবণ করা। কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত আজীবন ভগবৎকথা কীর্তন করিবার সুযোগ লাভ করেন। আবার কোন মহাত্মা ভক্ত সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করার সাধনা করিয়াই তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। কচিৎ কেহ সাক্ষাৎভাবে তাঁহার শ্রীচরণসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীভগবানের অর্চনা করা, বন্দনা করা, দাসভাবে বা সখাভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া—নবধা ভক্তির স্তরে স্তরে রহিয়াছে, আত্মনিবেদন সাধনার শেষ, ভগবানকে বাঁধিবার প্রেমরজ্জু।

প্রত্যেকটি ভাবের এক একটি আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ভাগবতাদি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোন ভক্ত কবি সেগুলি আহরণ করিয়া ভাবগর্ভ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন:

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু-অভিশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানকে লাভ করেন। শ্রীভগবানের কথা কীর্তন করিবার শ্রেষ্ঠ আচার্য অকামহত শ্রীশুকদেব! সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের পদসেবার অধিকারিণী শ্রীস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবী! শ্রীভগবানের পূজা করিয়া নিজের ও সকলের কল্যাণসাধন করিয়াছেন পৃথুরাজা। বন্দনার আদর্শ অক্রুর, দাস্যভাবের দৃষ্টান্ত হনুমান্, সখ্যভাবের অর্জুন। সর্বতোভাবে আত্মনিবেদনের সাধনা করিয়া বলি ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধকশ্রেষ্ঠগণ এক এক প্রকার ভক্তির যথার্থ অনুষ্ঠান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

'মামনুস্মর যুধ্য চ'

শ্রীকৃষ্ণের দুইটি রূপের সহিত আমরা পরিচিত—একটি প্রেমের, অন্যটি কর্মের; একটি বৃন্দাবনের, অন্যটি কুরুক্ষেত্রের—মহাভারতের; একটি ভাগবতের, অন্যটি গীতার। এ দুইটির মধ্যে কোনটিকে বরণ করিব, কোনটিকে বর্জন করিব—তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। ভারত-বাসীর গ্রহণশীল মনে শ্রীকৃষ্ণের এই দুই মূর্তিই রহিয়াছে পরিপূরকরূপে। প্রেমরূপের আবার শান্ত-দাস্যাদি কত ভাব! ভারতের আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবের একটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রীতিরস আস্বাদ করিতে চায়; কেহ তাঁহাকে শিশু-সন্তানরূপে, কেহ সখারূপে, কেহ বা প্রেমিক হৃদয়দেবতারূপে তাঁহাকে আরাধনা করেন! শ্রীমদ্‌ভাগবত এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণমননের প্রধান সহায়ক!

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত দেশীয় গবেষকগণ এই পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণের কোন মিল খুঁজিয়া পান না; অথচ শ্রীকৃষ্ণের মতো একটি বিরাট ব্যক্তি বা অভিব্যক্তিকে বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাস ধর্ম সাহিত্য কাব্য—কিছুই রচনা করা সম্ভব নহে, এক দিক দিয়া বলা যায় শ্রীকৃষ্ণই ভারতের আত্মা!

শ্রুতি যাঁহাকে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' বলিয়াছেন, তিনিই যেন চক্ষুকর্ণের গোচর হইয়া ভারতের মৃত্তিকায় বিচরণ করিয়া ইহাকে 'মহাভারতে' পরিণত করিয়াছেন। পুরাণকার যেন স্বচক্ষে দেখিয়া বলিতেছেন, বৃন্দারণ্যে সেই 'বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি'; শ্রীকৃষ্ণ সেই বেদান্তের সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্ম! নিজে তিনি গীতামুখে বলিতেছেন, 'বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্'—শ্রীরামকৃষ্ণমুখে এই দুরূহ তত্ত্বের সরল সমাধান পাই: বেদে যাকে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, পুরাণে তাঁকেই 'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ' বলেছে! প্রথমটি জ্ঞানের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রেমের মূর্তি—সর্বভাবসমন্বয়ের বিগ্রহ।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের আর এক রূপ! মহাভারতকে আমরা ঠিক পুরাণ বলিতে পারি না, আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহা ইতিহাস বলিতেও দ্বিধা বোধ করিবেন, আবার ইহা রামায়ণের মতো কাব্য বা মহাকাব্যও নহে! বোধহয় ইহাকে 'ভারতকৃষ্টির মহাকোষ' বলা চলে। সে যাহাই হউক, মহাভারত মহান্ ভারতের যথার্থ রূপ ব্যক্ত করিয়াছে—অনেকগুলি মহৎ চরিত্রের মাধ্যমে, তন্মধ্যে মহত্তম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ; কেহ তাঁহাকে মহামানব বলিবে, কেহ দেবমানব বা অবতার বলিবে। ভক্ত তাঁহাকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা বলিয়া পূজা করিবে, দুর্বৃত্ত তাঁহাকে দেখিয়া কৃতান্ত মনে করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। ভাগবতকার নানা অবতারলীলা বর্ণনা করিয়া তাই শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

বেদান্তকে বলা হয় শ্রুতিশির, তেমনি গীতাকে বলা যাইতে পারে মহাভারতের মুকুটমণি! যে বেদান্তে বা উপনিষদ্-মধ্যেই বেদের সার কথা রহিয়াছে, সেই উপনিষদের সার কথা আবার গীতামুখে নিনাদিত! ঋষিদের অনুভূতি ভগবদ্‌মুখে উচ্চারিত হইয়া দ্বিগুণবলে বলীয়ান্ হইয়াছে, তাই গীতা মান্য—সর্বকালে সর্বদেশে! গীতার মধ্যে রহিয়াছে শাশ্বত মানুষের জীবনসমস্যা ও তাহার

সমাধান! অর্জুন প্রতীকমাত্র, পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি ; সংসারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুল-ভ্রান্তি-ভয়ে ভরা একটি মানুষ—তাহার মনের সকল সংশয়, সকল সমস্যা লইয়া—শ্রেষ্ঠ গুরুর সম্মুখে উপস্থিত! শ্রীকৃষ্ণ সম্পদ্‌কালে অর্জুনের সখা, বিপদ্‌কালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রথের সারথি, সংশয়কালে তাহার জ্ঞানদাতা গুরু, সর্বকালে তাহার অন্তর্যামী ইষ্ট! অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন!

গীতার শিক্ষাই আমাদিগকে ভাগবত জীবনের উপযোগী করিবে। গীতার কর্মযোগই আমাদের প্রস্তুত করিবে ভাগবতের প্রেম-যোগের প্রকৃত রহস্য বুঝিবার জন্য। নিষ্কাম প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে গেলে আগে নিষ্কাম কর্ম করিতে হইবে! শ্রীকৃষ্ণ এই দুই তত্ত্বের একটি পূর্ণ রূপ। বৃন্দাবনে তাঁহার নিষ্কাম প্রেমের লীলা, কুরুক্ষেত্রে তিনিই নিষ্কাম কর্মের কর্ণধার! প্রেমে ও কর্মে অনাসক্তিই জীবন-সমস্যা সমাধানের শুধু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়—বোধ হয় একমাত্র উপায়। যতক্ষণ মানুষের আসক্তি, ততক্ষণ তাহার বন্ধন—দুঃখ ও ক্রন্দন! অনাসক্তি মানুষকে মুক্ত করে, মহান্ করে! আসক্তি মানুষকে ক্ষুণ্ণ করে, ক্ষুদ্র করে ; কর্মে আসক্তি কর্মফলের প্রতি মানুষকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে বলে—কর্মের ফল মনোমত হইলে সুখ, মনোমত না হইলে দুঃখ। অনাসক্ত কর্মযোগী সমদর্শী বিশ্বকর্মা—ঈশ্বর-ধর্মী। অনাসক্ত প্রেমিকের চাওয়া নাই, পাওয়া নাই। সে এক বন্ধনহীন প্রেম—যাহার অপর নাম 'আনন্দং ব্রহ্ম'। এই অনাসক্তির শিক্ষাই মনের বন্ধনভাব—জীবনের নিরানন্দভাব দূর করিতে পারে, ইহাই গীতার শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষারই জীবন্ত মূর্তি।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের বিষম সংকটমুহূর্তে—জয়-পরাজয়ের আশা-আশঙ্কায় মনেরদোদুল্যমান অবস্থায় স্বজন-গুরুজনের আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় কাতর—সর্বোপরি কুল-ধ্বংসের ভয়াল সম্ভাবনায় বিষণ্ণ অর্জুনের চিত্র গীতার পটভূমিকায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমনই করুণ তেমনই বাস্তব! মহাবীর অর্জুন বাস্তব জীবনপ্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্যের কত কথাই বলিতেছেন!

শ্রীভগবান্ আদর্শ গুরুর মতো তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। অন্তর্যামী তিনি—অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ, তিনি জানেন—অর্জুনের এই আলস্য-ভয়জনিত কর্মবিরতির ইচ্ছা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ, কর্ম হইতে পলায়নের চেষ্টা। সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া প্রচণ্ড তমোগুণ দেখা দিতেছে। অহিংসার আবরণে ঘোর কাপুরুষতা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

অর্জুনের অন্তর্নিহিত মহাবীর্যকে জাগ্রত করিবার জন্য মহাবীরকে তিনি 'ক্লীব' বলিয়া কটূক্তি করিলেন। তাহার যুক্তির অসারতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব—অমৃতত্ব উপদেশ দিলেন। আত্মতত্ত্ব শুদ্ধচিত্তেই প্রতিভাত হয় ; সকাম কর্মে মলিন চিত্ত উহা ধারণা করিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কর্মযোগ উপদেশ দিতেছেন, কর্ম কর, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না ; ইহা শুনিতে সহজ, কিন্তু জীবনে রূপায়িত করা কত সাধন-সাপেক্ষ, তাহা গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে।

মানুষকে কাজ করিতে হইবেই, স্বার্থ লইয়া কাজ করিলে সংঘাত ও দুঃখ অনিবার্য, তাই শ্রীভগবানের শিক্ষা প্রথমতঃ কর্তব্যবুদ্ধিতে কাজ কর। এ সংসার কর্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র, এ জীবন এক অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতেই হইবে -শুধু ক্ষত্রিয় অর্জুনকে নয়, প্রত্যেকটি মানুষকে—শত্রু শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও! কিভাবে আমরা অন্তরে বাহিরের এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তাহারই ইঙ্গিত শ্রীভগবানের মহাবাণীর মধ্যে 'মামনুস্মর যুধ্য চ'—আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর, জয় অবশ্যম্ভাবী। এতদিন কাজ করিয়াছ স্বার্থে—এখন কর ঈশ্বরার্থে ; এতদিন ভাল-বাসিয়াছ ক্ষুদ্র জীবভাবকে, এখন ভালবাস বিরাট ঈশ্বরভাবকে। এই বৃহৎ ভাবনার সহিত বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টা সংযুক্ত কর, জয় তোমার সুনিশ্চয়।

আচার্য

গ্রীক পুরাণে শোনা যায়, প্রথমে শক্তিশালী উন্নততর টাইটানরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, তারপর ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের আবির্ভাব হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীতে জাত ভারতীয় মনীষীদের টাইটান বলিয়াই মনে হয়! শরীরের দিক দিয়া নয়, মনের দিক দিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিশ্চয় একজন টাইটান ছিলেন। আজ তাঁহার জন্মের শতবর্ষ-পূর্তিকালে আমরা তাঁহার অগণিত গুণাবলী স্মরণ করি।

প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষাই বড় কথা নয়, মনীষা ও প্রতিভা আরও বড় বড় দেখা গিয়াছে, কিন্তু মানুষ ও মনীষার এরূপ অপরূপ সমন্বয় পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন কালে বিরল। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় মনীষা মানুষকে ছাপাইয়া রহিয়াছে—কোথাও বা মানুষটিই মহৎ হইয়া দেখা দেয়, মনীষা চাপা থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রে মানুষ ও মনীষা—জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমান তালে চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের শিক্ষক বা গবেষকের অভাব আজ হয়তো আর ততটা নাই। কিন্তু অভাব আছে দরদী আচার্যের, যিনি তাঁহার প্রচারিত আদর্শ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন, ছাত্রদিগকে যিনি পুত্র বলিয়া মনে করিয়া গর্ব অনুভব করিবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রসায়নের একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার লইয়া, এমন কিছু চমকপ্রদ নহে; কিন্তু কেহ যখন তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিত—তিনি সগৌরবে তাঁহার কৃতী ছাত্রদের দেখাইয়া দিতেন। গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী ভারতীয় রসায়ন-গগনের প্রথম শ্রেণীর তারকাগুলি প্রায় সব প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার!

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে কি করিয়া প্রাচীন আদর্শের এই ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন গড়িয়া উঠিল—ইহাই এক পরম বিস্ময়! প্রফুল্লচন্দ্রে মিলন ঘটিয়াছে প্রাচীনের সহিত নবীনের, বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সহিত আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের। পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতির সহিত প্রাচ্য সাধনা-পদ্ধতির! বিজ্ঞানের গবেষণাগারেই তাঁহার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের আর একটি দিক। History of Hindu Chemistry (ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস) এবং Autobiography (আত্মজীবনী) তাঁহার মনের আর একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত করে। নাগার্জুন ও বার্থেলোর মধ্যে তিনি সেতু রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—বিশেষ রসায়ন-গবেষণায় এ সাধনার মূল্য অপরিসীম।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলিত সাধনাতেও প্রফুল্লচন্দ্রের সকল শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহার আর এক অপূর্ব সৃষ্টি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'; এই আধুনিক শিল্প-প্রচেষ্টায় তিনি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মক্ষমতাকে একটি ঘনীভূত রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি গুণসম্পদ্—তাঁহার সরল অনাড়ম্বর দেশপ্রেম; রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নয়, দরিদ্র গ্রামবাসীদের কুটিরে কুটিরে আর্ত মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিতেন। আজিকার দেশবাসী—বিশেষত আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি যদি এই শতবার্ষিক স্মরণের শুভক্ষণে, আচার্যের গুণাবলী স্মরণ করিয়া সেগুলির দু-একটিকেও জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় বর্তমানের হতাশার ভাব কাটিয়া যাইবে—জাতি এক সবল সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

[প্রস্তাবিত কর্মসূচী]

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত কর্মসূচীর খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে :

সময় : ১৯৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে স্বামীজীর জন্মতিথির দিন বেলুড় মঠে এই শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হইবে এবং বর্ষব্যাপী উৎসব ১৯৬৪ খৃঃ জানুআরিতে সমাপ্ত হইবে।

স্থান : (১) এই বৎসর ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) এই কেন্দ্রগুলি স্থানীয় কমিটি ও ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ও সহযোগিতায় যত বেশী স্থানে সম্ভব উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে এবং জনসাধারণকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় যথাযোগ্যভাবে এই উৎসবের আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

উদ্বোধন : শতবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের সর্বজনীন প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচারিত হইবে। বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায় ও প্রচার-পত্র সাহায্যে ইহা ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইবে। ভারতে ও অন্যান্য দেশে বেতারের মাধ্যমেও প্রচারের চেষ্টা করা হইবে।

বাণী-প্রচার : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতির সহযোগিতায় ভারতে ও ভারতের বাহিরে স্বামীজীর শিক্ষা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আলোচনা ও সভার ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রকাশন : (১) একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইবে। 'বিশ্ব-চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে এই পুস্তকের ভূমিকায় থাকিবে 'পৃথিবীর কৃষ্টি ও চিন্তাধারায় যুগে যুগে ভারতের প্রভাব' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ।

(২) স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলী (বাণী ও রচনা) যতগুলি বেশী সম্ভব ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করা হইবে।*

(৩) স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনার নির্বাচিত একটি সঙ্কলন যত অধিকসংখ্যক ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় পারা যায়, প্রকাশ করা হইবে।

(৪) স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হইবে এবং ইহার মূল্য ৫০ নয়া পয়সা করা হইবে।

(৫) স্বামীজীর একটি আলেখ্য-সংগ্রহ (Album) প্রকাশ করা হইবে।

* ইংরেজী ৮ খণ্ডে ইহা প্রকাশিত, ভারতের ৮টি প্রধান ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

(৬) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইবে যে, প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেন তাঁহাদের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকে স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে কিছু কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৭) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত লোকের জন্য উপযোগী করিয়া স্বামীজীর জীবনী ও বাণী বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

স্থায়ী স্মৃতি : (১) স্বামীজীর পৈতৃক বসতবাটী ও জন্মস্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ঐ স্থানটিকে একটি উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দিরে রূপায়িত করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষজয়ন্তী ভাষণমালা প্রদানের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে, বক্তৃতার বিষয় :

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী (খ) যে কোন সংস্কৃতিমূলক বিষয়।

সভা ও সম্মেলন : (১) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগের একটি সম্মেলন হইবে।

(২) বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং মিশনের গৃহী ভক্ত ও সদস্যদিগের এক সভা হইবে, ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং মিশনের অনুরাগী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে।

(৩) সমন্বয় ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারাণসী, প্রয়াগ বা কনখলে (হরিদ্বার) সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটি সম্মেলন হইবে।

(৪) বেলুড়ে বা কলিকাতায় 'ধর্মমহাসভা' অথবা মানবজাতির সম্মেলন হইবে।

(৪) কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে মহিলা-ভক্তবৃন্দের একটি সম্মেলন হইবে।

সঙ্গীত-সম্মেলন : অখিল ভারত ভজনসঙ্গীত-সম্মেলন হইবে।

প্রদর্শনী : স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারার উপর বিশেষ জোর দিয়া একটি সংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইবে।

তীর্থভ্রমণ ও শোভাযাত্রা : (১) স্বামীজীর পূতস্মৃতি-বিজড়িত কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) এতদুপলক্ষে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিবিধ : (১) বিশেষ ধরনের স্মৃতি-পদক প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন সরকারকে (Government) স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক ডাক-টিকিট বাহির করিতে অনুরোধ করা হইবে।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র (Documentary film) প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) জনসাধারণের জন্য যাত্রা তরজা কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রচার করার আয়োজন করিতে হইবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

এ পৃথিবীতে এসে তুমি বিচার চাও কেন বন্ধু! কিসের বিচার? কার কাছে বিচার?—মানুষের কাছে! সে তো 'খাদ' দিয়েই গড়া, সে তো সম্পূর্ণ নয়; সে তো তোমারই মতো এই সদাপরিবর্তনশীল পৃথিবীর চঞ্চল পটভূমিতে অস্থির-অশান্ত মন ও প্রাণ নিয়ে সদাই ব্যস্ত! সে তো স্থির নয়, ধ্রুব নয়; শুচিতার শুভ্রশিরে সে তো তার অভিযান এখনও শেষ না ক'রে এগিয়ে চলেছে মাত্র। মায়ার অন্ধকারে তার জীবন এখন তো মুগ্ধ—অরুণালোকের অপরূপতায় আজও তা ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। সে হয়তো জানে যে, সে অমৃতের পুত্রদের একজন। কিন্তু সে জানা আজও তাকে ধূলামাটির চিহ্ন মুছিয়ে দিয়ে প্রেম-গাথার চিরন্তন ছন্দে, কিংবা ভূমার মহাস্পন্দনে নন্দিত ক'রে তোলেনি। তাই বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না, বরং মানুষের উপরে নিজেকে তুলে ধরে বিচারোত্তর অবস্থায় পৌঁছতে চেষ্টা কর।

নিজেকে তুলে ধর; নিজেকে ফুটিয়ে তোলো। শুচিতার জাহ্নবীধারায় নিজেকে অবগাহন করাও। নিয়ে যাও নিজেকে সেই জ্যোতিস্ময়তার চিরসমাহিত ধ্যান-লোকে। চল, মানস-লোকের সেই অপার্থিবতায় যেখানে বিচার নেই—যেখানে বিচার চাইবার ইচ্ছাও নেই; চল সেই অপ্রমত্ত মানবিকতায় যেখানে বুদ্ধ শঙ্কর, চৈতন্য রামকৃষ্ণ তাঁদের জ্যোতিরুত্তম কল্যাণের ডালি নিয়ে নিত্যপ্রেমে সবাইকে আলিঙ্গন করতে দাঁড়িয়ে আছেন।

আবার বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না। আর যদি একান্তই বিচার চাও তো নিজেকে বিচার কর। মজ্জাগত ক্লেদকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে জানো। নিজেকে চেনার তপশ্চর্যায় নিজেকেই নিয়োজিত কর। দেখবে, তোমার মনে—তোমার অন্তরাত্মার নিভৃত নিলয়ে এক পরম জ্যোতির দ্বার খুলে গেছে, আর সেই দ্বারের ভেতরে প্রবেশ করবার সময় তোমার মন স্বতই গেয়ে উঠেছে—

নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্ত
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া
উছল আনন আজিকে নহেক' ক্লান্ত
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

এই ভাবে নিজেকে সুধায় ভরিয়ে তোলো। আত্মপ্রবঞ্চনার মায়াজালে জড়িয়ে আছ—তা কেটে বেরিয়ে এস। আর তা যদি না পারো তো অসম্পূর্ণ মানুষের কাছে বিচার চাইতে গিয়ে ভুল ক'রো না। আর যদি তা না ক'রে মোহান্ধ হয়ে পথের যথার্থ নিশানা ভুলে বিপথে চল, তাহলে সব কিছুই তোমাকে ভুল পথ দেখাবে, মনে রেখো। সব কিছুই তখন তোমাকে শব্দারণ্যের আপাতমধুর জড়িমার আর্তপ্রবাহে টেনে নিয়ে আসবে। ফলে, তখন যে শুধু নিজেকেই হারাবে তা নয়, পরমপ্রাপ্তির ঐ লক্ষ্য যে ভগবান—তাঁকেও ভুল বুঝবে, তাঁকেও সন্দেহ করতে শিখে বলবে—'ভগবান তুমি নাই,
চোর করিতেছে চুরির বিচার তুমি দেখিতেছ তাই।'

তাই বলি, এই মায়ার পৃথিবীতে, এই সংসারের কুহকে, এই গরলে-ভরা আত্মীয়তার কুচক্রে প'ড়ে মানুষের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ো না। তার চেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতার আনন্দ-লোকে নিজেকে টেনে এনে যোগাসনে বসিয়ে অমৃতত্বের সাধনা কর। তোমার দেশ, তোমার ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধ'রে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। যে তা শুনেছে, যে তা মেনেছে সে 'মনু' হয়ে গেছে, আর যে তা মানেনি সে আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে—সে আজও শত প্রলোভনের বীভৎসতার মাঝে মাণবকই থেকে গেল।

ভারতের মানুষ হয়েও তুমি কি ক'রে যে তোমার মৌলিক তত্ত্বসন্ধানের উৎসুকতাকে হারিয়ে ফেললে, তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে! আনুষঙ্গিকের বিকল্প জ্ঞান নিয়ে তুমি এতই মেতে রয়ে গেলে যে তোমার মধ্যকার সত্যানুভূতির নিজস্ব সম্পদটিকেও তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না। আকাশকুসুমের গন্ধ পাবার লোভে ছোটা যে ভুল—এটা কি একবারও ভেবে দেখবার অবসর হবে না তোমার জীবনে? আর, তা যদি এখনি—এই মুহূর্তেই না হয় তো আর হবে কবে? মহাকাল তো আর তোমাকে স্নেহে জড়িয়ে বসে নেই! সে যে তোমাকে প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি নিজেকে 'অভীঃ' জেনেও গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নিজের মূল্যবান্ জীবনটাকে বৃথায় ফুরিয়ে ফেলছ! ছিঃ, তা কি হয়? অমৃতের পুত্র তুমি, তোমার কি সাজে এই মূঢ়তা—এই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়া?

বুঝেছি, দিশাহারা তুমি। বুঝেছি, তোমার সুমুখে সত্যকার আদর্শের বর্তিকা নিয়ে কেউ পথ দেখায় না—তাই তুমি অন্ধকারে পথ চলো, হোঁচট খাও। কিন্তু একটু ধৈর্য ধর, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও; একটু ভাবতে চেষ্টা কর; একটু 'তদেকশরণ' হয়ে আলোর সাধনা কর। দেখবে জীবনের এই অমানিশায় পথ-চলার ফাঁকেও কে যেন তোমায় আলো দেখিয়ে দেবে। ভাবছ—কোথা থেকে আসবে এই আলো; কেমন ক'রে এ আলো এসে পথ দেখাবে তোমায়! আত্মসম্বিৎ না হারিয়ে বিচার কর—সমাধান পাবে। দেখবে তুমি এতটুকু নও, এত সামান্য নও। তোমার মাঝে যে বীর্যবত্তা, যে অকুতোভয়তা রয়েছে, সেই আজ তোমাকে আলো দেখাচ্ছে। তোমার মাঝে এই শুভকে, এই কল্যাণকে, এই আলোককে ভগবান বলো, ব্রহ্ম বলো বা আত্মা বলো—তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এ যে একান্ত তোমারই—এ যে তোমারই মনের রূপসাগরের অরূপ-রতন, তা কিন্তু তখন বুঝতে পারবে। তাই বলি, মানুষের কাছে বিচার চেও না; বন্ধু, নিজের ভেতরে বিচার খোঁজ। আর এইভাবে খোঁজাই হচ্ছে সাধন, ভজন, তপস্যা, ভগবানলাভ, ব্রহ্মানুভূতি, আত্মদর্শন—সব কিছু।

তাই বলি, চল পথিক, যথার্থ বিচারের পথে। চল 'নিজেকে' সম্বল ক'রে, অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সরিয়ে পরা-প্রাপ্তির অফুরন্ত রহস্যের পথে। মনে রেখো, তোমারই মনোগহনে তোমার শ্রেষ্ঠরত্ন লুকানো আছে। তুমি এতদিন সুপ্তির বিস্মরণে খোঁজনি, তাই পাওনি। সমুদ্রের লবণটুকু দিয়েই সমুদ্রের বিচার করেছ, তার তলায় ডুব দাওনি, তাই রত্নেরও সন্ধান পাওনি। এখন একবার ডুব দিয়ে দেখ, বুঝবে—সমুদ্র কেবল লোনা নয়, সে রত্নাকরও বটে। এই যে ডুব দেওয়া, এই যে বিচার করা, এই হচ্ছে যথার্থ পথ। চল, শীঘ্র চল এই পথে, এই রাজপথে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদঃ বিশ্বরূপ-দর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

পরন্তু হে স্বামিন্, আপনাকে এই ভাবে আমি কখন জানিতাম না, তাই আপনার সহিত আত্মীয় সম্বন্ধীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। (৫৩০)

অহো, ঘোর অন্যায় হইয়াছে, অমৃত দ্বারা আমি আঙিনা সম্মার্জন করিয়াছি, কামধেনুর বদলে বৃষভ (ষাঁড়) লইয়াছি, পরশমণি চিনিতে না পারিয়া তাহার দ্বারা গৃহের ভিত্তি তৈয়ার করিয়াছি, কল্পতরু দ্বারা ক্ষেতের বেড়া দিয়াছি। চিন্তামণির খনি চিনিতে না পারিয়া অনাদর করিলে যেমন হয়, তেমনি আপনার সান্নিধ্যের সুযোগ আত্মীয়তার জন্য হেলায় হারাইয়াছি। আজিকার প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি? এবং ইহার মূল্য কতটুকু? ইহাতে আমি আপনাকে সারথি করিতেছি! কৌরবের ঘরে মধ্যস্থতা করিতে আপনাকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছি! হে জাগ্রত ঈশ্বর, এই ভাবে আমাদের সুবিধার জন্য আপনাকে হেয় করিয়াছি। আপনি যোগিগণের সমাধি-সুখ-স্বরূপ, আমি মূর্খ, তাই তাহা জানিতে পারি নাই, হে দেব, আপনার সম্মুখে কত বিরোধ করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

আপনি এই বিশ্বের আদি কারণ, সভামধ্যে আপনাকে আত্মীয়তাসুলভ কত পরিহাসবাক্য বলিয়াছি। আপনার প্রাসাদে আপনার নিকট যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছি, সম্মানিত না হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শার্ঙ্গপাণি, আমি অনেক অন্যায় কার্য করিয়াছি, যাহার জন্য চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত; আত্মীয়সুলভ স্নেহবশে আমি উল্টা বুঝিয়াছি, এই ভাবে হে বৈকুণ্ঠ, আমি ভুলই করিয়াছি। (৫৪০)

হে দেব, আমি আপনার সহিত ডাণ্ডাগুলি খেলিয়াছি, মল্লক্রীড়া করিয়াছি, পাশা খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি; উত্তম বস্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া বসিয়াছি। আপনাকে পরামর্শ দিয়াছি, কখন বলিয়াছি, 'আমি তোমার কে?' এমন অপরাধ করিয়াছি যে, ত্রিভুবনেও আমার স্থান হইবে না, পরন্তু হে প্রভু, ইহা স্বীকার করিতেছি, আমি না জানিয়া করিয়াছি। হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্নেহের সহিত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, পরন্তু আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। হে দেব, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়াছি, শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে শয়ন

করিয়াছি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিয়াছি! আপনাকে সাধারণ যাদব বলিয়া মনে করিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার সময় আপনার নামে শপথ দিয়াছি।

আপনার সঙ্গে একাসনে বসা কিংবা আপনার কথা না মানা—ইহা প্রীতির আধিক্যে বহুবার ঘটিয়াছে, অতএব হে অনন্ত, এখন আর কী করিব? আমি অপরাধের রাশিস্বরূপ হইয়াছি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহা কিছু আচরণ করিয়াছি হে প্রভু, আপনি মাতার ন্যায় তাহা ক্ষমা করুন। হে প্রভু, নদী কোন সময়ে কর্দমময় জল লইয়া আসিলে সমুদ্র তাহা গ্রহণ করিয়া কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০)

আমি প্রণয়ে বা প্রমাদ-বশতঃ আপনার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, হে মুকুন্দ, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্যই পৃথ্বী এই ভুতগ্রামের আধার হইয়া আছে। সুতরাং হে পুরুষোত্তম, আমি আর কি বলিব? তথাপি হে অপ্রমেয়, আমি এখন আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা যথার্থভাবে জানিয়াছি, হে দেব, আপনিই চরাচরের আদি। হে দেব, আপনি হরিহরাদির উপাস্য, বেদেরও গুরু। আপনি গম্ভীর (সুগভীর), আপনি সর্বভুতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণসমৃদ্ধ, অপ্রতিম, অদ্বিতীয়। আপনার সমান কিছুই নাই—ইহা কি করিয়া প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া আছেন, যাহা জগৎকে ধরিয়া আছে। আপনার সমান দ্বিতীয় কোন বস্তু আছে, ইহা বলিতেও লজ্জা হয়, আপনা হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়া হয়? অতএব ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয়, আপনার সমান কিংবা আপনার বড় কেহই নাই, আপনার মহিমা অলৌকিক, ইহা বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

এইভাবে বলিয়া অর্জুন পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইয়া (৫৬০) সগদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রভু প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের সুহৃৎ, ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই, আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর আপনার কাছে ঐশ্বর্য বর্ণনা করিয়াছি। আপনি স্তুতির যোগ্য, পরন্তু সভায় স্নেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিঃশব্দে তাহা শুনিয়াছি; আমার অপরাধের সীমা নাই, অতএব কৃপা করিয়া এই অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভু, এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্যতাও আমার নাই, পরন্তু পুত্র যেমন পিতার সহিত কথা বলে, অথবা প্রাণের প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে অন্তরের অনুভূত অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্কটের কথা নিবেদন করিতে যেমন কোন সঙ্কোচ হয় না, কিংবা যে প্রাণের সহিত আপনার সর্বস্ব নিজ পতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, সেই পতির সহিত মিলন হইলে

সে যেমন হৃদয় উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমনিভাবে, হে স্বামিন্, আমি আপনাকে বিনতি করিয়াছি, পরন্তু এই কথা বলিবার ইহা ভিন্ন অন্য একটি কারণও আছে।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে আমি বিশ্বরূপ-দর্শনের যে আবদার করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাপিতার ন্যায় স্নেহভরে পূর্ণ করিয়াছেন। গৃহের অঙ্গনে কল্পতরুর ঝাড় লাগাইয়া দিন, খেলিবার জন্য কামধেনুর বৎস আনিয়া দিন, পাশাখেলার জন্য নক্ষত্রগুলি পাড়িয়া দিন, বল খেলিবার জন্য আমার চাঁদ চাই—এইরূপ সমস্ত আবদার মাতার ন্যায় পূর্ণ করিয়াছেন! যে অমৃতের কণার জন্য এত কষ্ট করিতে হয়, আপনি তাহা বর্ষণ করিয়াছেন, তৈয়ারী ভূমিতে চিন্তামণিরূপ বীজ বপন করিয়াছেন। (৫৭০)

হে স্বামিন্, এই ভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আমার বহু বালসুলভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আপনার যে স্বরূপের কথা শঙ্কর বা ব্রহ্মা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে দেখাইয়াছেন; উপনিষদ্‌ও যাহার সাক্ষাৎ পায় নাই, সেই গূঢ় মর্ম-গ্রন্থিও আপনি আমার জন্য খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

হে প্রভু, কল্পের আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে, সেই সমস্ত জন্মে যদি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে এইরূপ দেখিবার বা শুনিবার কথা পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কখনই ইহার নিকট পৌঁছাইতে পারে না, অন্তঃকরণ ইহার কল্পনাও করিতে পারে না, তাহা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহা অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। হে প্রভু, সেই বিশ্বরূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন, হে দেব, তাহাতে আমার মন হৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু এখন এই ইচ্ছা অন্তঃকরণে হইয়াছে যে, আপনার সহিত আলাপ করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ করিব। (৫৮০)

এই বিশ্বরূপের সহিত কি তাহা করা যায়? কোন্ মুখের সহিতই বা কথা বলিব? আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার রূপের অন্ত নাই—অসংখ্য রূপ! বায়ুর সঙ্গে দৌড়ানো বা গগনকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব, সমুদ্রের সহিত কি জলকেলি করা যায়? হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে, এখন ইহা সংবরণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। সমস্ত চরাচর-কৌতুক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা যায়, তেমনি আপনার চতুর্ভুজ মূর্তি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক।

আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস করিয়া এই রূপেরই অনুভূতি লাভ করি, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই স্বরূপেরই সিদ্ধান্ত হয়, সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই জন্য সকল তীর্থে ভ্রমণ, অন্য যাহা কিছু দান পুণ্য কর্ম করা যায়, তাহার ফলও আপনার এই চতুর্ভুজরূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভু, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম, এই জন্য তাহা দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছি, এখন শীঘ্র এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। হে জীবের মর্মজ্ঞ, সকল বিশ্বের আশ্রয়, পূজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥৪৬॥

আপনার অঙ্গকান্তি নীলোৎপলকেও রঞ্জিত করে, আকাশে রং ঢালিয়া দেয়, ইন্দ্রনীলমণিরও দীপ্তি প্রকাশ করে, মনে হয় যেন পঞ্চরত্ন সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, কিংবা আনন্দের দুইটি হস্ত বাহির হইয়াছে, মদনের শোভা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫৯০) যাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভা শৃঙ্গারকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে; আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনুর সীমার মধ্যে যেমন মেঘকে রঞ্জিত দেখা যায়, তেমনি হে শার্ঙ্গপাণি, বৈজয়ন্তীমালা আপনার অঙ্গ আবরণ করিয়া আছে; আপনার উদার গদা কেমন অসুরগণকেও কৈবল্যের প্রাচুর্য দান করে, হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কেমন সৌম্য দেখাইতেছে! অধিক কি বলিব? হে স্বামিন্, আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র সেই রূপ ধারণ করুন।

বিশ্বরূপ-দর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়া তৃপ্ত আমার নয়ন এখন কৃষ্ণমূর্তি দর্শনের জন্য তৃষিত হইয়াছে, আমার চক্ষু সাকার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে চায় না, আর তাহা না দেখিলে এই বিশ্বরূপকে তুচ্ছ মনে করে; আমাদের ভোগ ও মোক্ষ দিবার জন্য আপনার শ্রীমূর্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই বিরাট মূর্তি সংবরণ করিয়া সসীম সাকার মূর্তি ধারণ করুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অর্জুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় হইল, এবং তিনি বলিলেন, এরূপ অবিবেচক কাহাকেও তো দেখি নাই, তুমি কি অলৌকিক বস্তু লাভ করিয়াছ, তাহাতেও তোমার সন্তোষ হইল না, তুমি ভীত হইয়া অনমনীয় ব্যক্তির ন্যায় কেন কথা বলিতেছ? (৬০০)

আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে নিজের সব কিছু ভক্তকে প্রদান করি, নতুবা অন্তরের গূঢ় রহস্য কাহাকে বলা যায়? আজ আমি তোমারি ইচ্ছায় অন্তঃকরণের সমস্ত গূঢ় রহস্য একত্র করিয়া এই বিশ্বরূপ রচনা করিয়াছি; তোমার প্রেম আমার এতখানি প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছে যে, আমার পরম গুহ্য রহস্যের বিজয়নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (স্বরূপ প্রকট করিয়াছি)।

দেখ, ইহাই আমার অপার পরাৎপর স্বরূপ, যাহা হইতে কৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই জ্ঞানতেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্মক, অনন্ত, অটল, আদিকারণ। হে অর্জুন, ইহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই, কারণ ইহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

এই স্বরূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ মৌনাবলম্বন করিয়াছে, যজ্ঞ (যজ্ঞকর্তা) যথার্থই স্বর্গ পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সাধকগণ আয়াসসাধ্য দেখিয়া যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) করিয়াছে, আর (শাস্ত্র) অধ্যয়নেও ইহা সুলভ নহে (অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই)। সর্বাঙ্গসুন্দর সৎকর্ম, স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে

এবং স্বর্গ দেখিতে পারে ; আর যাহা দেখিলে তপস্যা ও সাধনা স্তব্ধ হইয়া উগ্রতা ত্যাগ করে, এইরূপ সাধনা দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ, সেই বিশ্বরূপ তুমি অনায়াসে দেখিয়াছ, ইহা মনুষ্যলোকে কেহই দেখিতে পায় না। জগতে আজ তুমিই ইহা দেখিলে। এই পরমভাগ্য—বিরিঞ্চিরও হয় নাই। (৬১০)

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্‌।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

এই বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য আপনাকে ধন্য মনে কর, ইহা দেখিয়া কদাচ ভয় পাইও না, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উত্তম বস্তু আছে, তাহা মনেও করিও না। অকস্মাৎ অমৃতে পূর্ণ সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয়া যাইবার ভয়ে তাহা ত্যাগ করে ? অথবা 'সোনার পর্বত এত বড়, ইহা দ্বারা কি করা যায় ?' বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) করে ? দৈবযোগে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গে ধারণ করিলে ভারী বোঝা হইবে বলিয়া কি কেহ তাহা ত্যাগ করে ? কামধেনুকে পালন করা কঠিন বলিয়া কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দেয় ?

ঘরের মধ্যে চন্দ্রালোক আসিলে কি কেহ বলে, 'বাহির হইয়া যাও, তুমি দুঃখদায়ক' ? কিংবা সূর্যকে কি কেহ বলে, 'ওধারে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া কষ্টকর' ? তেমনি এই মহাতেজরূপ ঐশ্বর্য তুমি দেখিয়াছ, পরন্তু তুমি বৃথা বিচলিত হইতেছ কেন ? পরন্তু হে ধনঞ্জয়, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্বোধ তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি হইবে ? অঙ্গ ছাড়িয়া তুমি ছায়াকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন ? যাহা আমার সত্য স্বরূপ তাহা দেখিয়া মনে ভীত হইয়া ভাবিতেছ ইহা আমার যথার্থ রূপ নহে ; ধারণ করা কৃত্রিম রূপ দেখিতে চাহিতেছ। (৬২০)

হে পার্থ, এখন হইতে এই চতুর্ভুজের প্রতি প্রীতি পরিত্যাগ কর, বিশ্বরূপের প্রতি আস্থা হারাইও না। ভয়ঙ্কর, বিশাল ও বিকৃত রূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। কৃপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া শুধু দেহের ব্যাপারগুলি করিয়া যায়, কিংবা নিজেই কোটরের মধ্যে অজাতপক্ষ শাবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়া পক্ষিণী আকাশে উড়িয়া যায়, অথবা গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়া বেড়ায়, পরন্তু তাহার চিত্ত ঘরে বৎসের উপর লাগিয়া থাকে, তেমনি হে পার্থ, তুমি এই বিশ্বরূপের উপর আপন প্রেম নিবদ্ধ কর।

বাহ্য সখ্যসুখ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য আনন্দিত চিত্তে এই চতুর্ভুজ শ্রীমূর্তির ধ্যান কর, পরন্তু হে পাণ্ডব, বারংবার বলিতেছি, আমার একটি কথাও বিস্মৃত হইও না। এই বিশ্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও হারাইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই বলিয়া তোমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ কর, এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র করিয়া ইহাকে (বিশ্বরূপকে) দাও।

অনন্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এখন তোমার ইচ্ছানুসারে পূর্বের রূপই তোমাকে দেখাইতেছি, সুখে দর্শন কর। সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

এই কথা বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন, কি আশ্চর্য তাঁহার

প্রেম ! শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্য-স্বরূপ বিশ্বরূপের ন্যায় তাঁহার সর্বস্ব অর্জুনের হস্তে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু অর্জুনের তাহা ভাল লাগিল না। ক্ষুদ্র অশ্ব হস্তীকে বাধা দিলে যেমন হয়, অথবা ভাল রত্নের দোষ ধরিলে, বা কন্যা দেখিতে গিয়া 'মনে ধরিল না' (পছন্দ হইল না) বলিলে যেমন হয়, অর্জুনেরও তেমনি হইল ! (৬৩০)

বিশ্বরূপের এই প্রকার দশা করিলেও অর্জুনের উপর তাঁহার প্রেম কেমন করিয়া বাড়িয়া গেল, ভগবান কিরীটীকে সর্বোত্তম উপদেশ দিলেন। স্বর্ণখণ্ড ভাঙিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার গড়াইয়া যদি তাহা মনে ভাল না লাগে, তবে যেমন পুনরায় গলাইয়া ফেলা যায়, তেমনি শিষ্যের প্রত্যয়ের জন্য কৃষ্ণত্ব ঘুচাইয়া ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন, তাহা যখন অর্জুনের মনোমত হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণরূপ হইলেন। এই প্রকার শিষ্যের আবদার-সহনশীল গুরু আর কোথায় আছে ? পরন্তু সঞ্জয় কহিলেন, 'এ কেমন প্রেম জানি না !'

বিশ্ব ব্যাপিয়া চতুর্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান যে কৃষ্ণরূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সংবরণ করিলেন। 'ত্বম্'-পদ (সমগ্র জীবদশা) যেমন 'তৎ'-পদে (ব্রহ্ম-স্বরূপে) লীন হয়, অথবা বৃক্ষের রূপ যেমন বীজ-কণিকায় সমাহিত হয়, অথবা জাগ্রতের অনুভূতি যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থা গিলিয়া খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যোগ সংবরণ করিলেন ; হে রাজন্, সূর্যের প্রভা যেমন বিম্বে লীন হয়, কিংবা মেঘপুঞ্জ যেমন আকাশে মিলাইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। (৬৪০)

অহো, কৃষ্ণাকৃতি হইতে যে বিশ্বরূপের ভাঁজ করা বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা অর্জুনের প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। বস্ত্রের পরিমাণ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি উত্তম দেখিয়া গ্রাহকের (অর্জুনের) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্য অধিকাধিক দেখাইলেন। এইভাবে যে বিশ্বরূপ বিস্তৃত হইয়া বহুরূপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল (ব্যাপিয়াছিল), তাহা মনোরম সৌম্য আকার ধারণ করিল।

অধিক কি বলা যায় ? শ্রীঅনন্ত পুনরায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলে যেমন হয়, কিরীটীর বিস্ময় তেমনি হইল ; অথবা গুরুর কৃপা হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চ-জাত বস্তুর অন্ত হয় এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, অর্জুনেরও তেমনি হইল।

তাহার মনে হইল, যে বিশ্বরূপের যবনিকা, যাহা শ্রীমূর্তিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছে, ইহা ভালই হইল ; কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিংবা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, অথবা যেন আপন বাহুর সামর্থ্যেই সপ্ত সিন্ধু পার হইলাম ; বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখিয়া পাণ্ডুসুত অর্জুনের চিত্তে এমনি অপার সন্তোষ হইল ; সূর্য অস্ত যাইবার পর যেমন গগনে তারা দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি উভয় পক্ষের সৈন্যদল অর্জুন দেখিতে লাগিলেন। (৬৫০)

তখন কুরুক্ষেত্রও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলেন দুই পক্ষে সমবেত স্বগোত্র যোদ্ধাগণ সৈন্যনিচয়ের উপর অস্ত্রশস্ত্র-বর্ষণে উদ্যত, সেই যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি রথাগ্রে উপবিষ্ট এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান। অর্জুন উবাচ—

দৃষ্টে্বদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

তখন অর্জুন যাহা চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন, প্রভু, এখন মন শান্ত হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত মন দেশছাড়া হইয়াছিল; ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের স্বাভাবিক গুণধর্ম ভুলিয়াছিল, বাক্ প্রাণহীন হইয়া মৌন হইয়াছিল, এইভাবে এই শরীর দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল: ইহারা সব পুনরায় নিজ নিজ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমূর্তি-দর্শনে আমি যেন জীবন ফিরিয়া পাইলাম।

এইভাবে সুখানুভব করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আপনার মনুষ্যরূপ দেখিলাম। হে ভগবান, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন, ইহা যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্য মাতৃস্তন্য পান করাইলেন। হে প্রভু, আমি বিশ্বরূপের সমুদ্রে হস্ত দ্বারা তরঙ্গ মাপিতেছিলাম। এখন আপনার এই শ্রীমূর্তির তীরে আসিয়া উঠিয়াছি।

হে দ্বারকাপুরপতি সুহৃদ্, ইহা তো শুধু আপনার মূর্তি দর্শন নহে। ইহা যেন আমার ন্যায় শুষ্কতরুর উপর মেঘের বর্ষণ হইল। (৬৬০) স্বাভাবিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এ যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমার প্রাণে বাঁচিবার ভরসা হইল। আমার হৃদয়-অঙ্গনে হর্ষ-লতার উদ্গম হইল। আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম। শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবান কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বরূপের প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ করা উচিত। আর এই সাকার সগুণ মূর্তিকে নিঃসঙ্গভাবে সেবা করিবে। হে সুভদ্রাপতি, আমার উপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছ? হে অর্জুন, মেরু পর্বত হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ, এমনই মনের দুঃস্বপ্নভাব (ভ্রম); তোমার সম্মুখে আমি যে বিশ্বাত্মক রূপ প্রকাশ করিলাম, তাহা তপস্যা করিয়াও শঙ্করের ভাগ্যে জোটে না।

হে কিরীটী, যোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সাধনের ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ করিতে পান না, সেই বিশ্বরূপের সামান্য পরিমাণও কি করিয়া দেখা যায়, এই চিন্তা করিতে করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন (অত্যন্ত আশা করিয়া) আকাশের দিকে (মেঘের প্রতীক্ষায়) তাকাইয়া থাকে, তেমনি উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ যাহার দর্শন পাইবার জন্য অষ্ট প্রহর লালায়িত, পরন্তু সেই বিশ্বরূপের সমান বস্তু কেহ স্বপ্নেও দেখিতে পায় না, সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছ। (৬৭০)

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

হে বীর অর্জুন, ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্য কোন উপায় (সাধন-পন্থা) নাই, সাহায্য করিতে গিয়া বেদও এখানে পশ্চাৎপদ হইয়াছে। হে ধনুর্ধর, যত তপস্যাই করা হউক না কেন,

তাহা দ্বারা আমার বিশ্বরূপের নাগাল পাওয়া যায় না। আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, তুমি যাহা সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তুমি যেমনভাবে আমাকে দেখিয়াছ, তেমনিভাবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় আছে—শুন, যদি ভক্তি আসিয়া চিত্তকে বরণ করে, তবেই আমাকে লাভ করা যায়।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

সে ভক্তি কিরূপ? যেমন বর্ষার মেঘ ধারাবর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না, কিংবা গঙ্গা যেমন সকল জলসম্পত্তি লইয়া সমুদ্রকে অন্বেষণ করে এবং অনন্যগতি হইয়া উহাতেই মিলিত হয়, তেমনি আমার ভক্ত সর্ব ভাবসম্পদ্ লইয়া একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়া মদ্রূপ হইয়া আমারই মধ্যে মিলিত হয়; আর ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, ঐ ভক্তের পক্ষে আমিও সেইরূপ; আমা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত—কিংবহুনা, এই চরাচরে ভজনের জন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু যাহার থাকে না (যে অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু ভ্রমেও ভজনা করে না), যে মুহূর্তে ভক্তের এইরূপ দৃষ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানলাভ হইলে সহজে দর্শনও হয়। (৬৮০)

অগ্নিসংযোগে ইন্ধন যেমন তাহার ইন্ধনত্ব হারায়, এবং মূর্তিমান্ অগ্নিই হইয়া যায়; কিংবা তেজস্কর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়া থাকে, আর সূর্যোদয় হইলে একেবারে প্রকাশময় হয়; তেমনি আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কারের নাশ হয় এবং অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈত ভাব চলিয়া যায়, জানিবে। আমি, সে (ভক্ত) ও সমগ্র বিশ্ব স্বভাবতঃ এক 'আমি' হইয়া থাকে, কিংবহুনা, সেই ভক্ত আমার সহিত সমরস হইয়া যায়।

মৎকর্মকৃন্ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

যে শুধু আমারই জন্য সমস্ত কর্মানুষ্ঠান করে, আমা ভিন্ন জগতে যাহার অন্য কোন উত্তম বস্তু নাই, যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহলোক ও পরলোক) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই জীবনের ফলস্বরূপ মানিয়া লয়, প্রাণিমাত্রের নামরূপ (ভেদজ্ঞান) ভুলিয়া যাহার দৃষ্টি শুধু আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্য যে নির্বৈর হইয়া সর্বত্র (সর্বভূতে আমাকে দেখিয়া) ভজনা করে, যে আমার এমন ভক্ত, হে পাণ্ডব, তাহার এই ত্রিধাতু-নির্মিত শরীর মদ্রূপ হইয়া থাকে।

সঞ্জয় বলিলেন, যাঁহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে বলিলেন। (৬৯০) ইহার পর পাণ্ডুকুমার অর্জুন আনন্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইলেন এবং তিনিই জগতে একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর (কৃষ্ণচরণে ভক্তি করিতে সুচতুর); তিনি চিত্তসংযোগ করিয়া ভগবানের উভয় মূর্তিই উত্তমরূপে দেখিয়া, বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণমূর্তিই অধিক লাভজনক মনে করিয়াছিলেন; পরন্তু ভগবান তাঁহার এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিলেন না। কারণ ব্যাপক স্বরূপ অপেক্ষা একদেশী মূর্তি বড় নহে। আর ইহা সমর্থন করিতে দু-একটি উত্তম যুক্তিও শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিলেন। তাহা শুনিয়া অর্জুন মনে মনে বলিলেন, এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি বড় তাহা পরে প্রশ্ন করিব। এইভাবে মনে আলোচনা করিয়া উত্তম রীতিতে (অর্জুন) যে প্রশ্ন করিবেন, সে কথা পরের অধ্যায়ে শুনিবেন।

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, সেই সমস্ত কথা আমি নিবৃত্তিপাদ-প্রসাদে, প্রেম সহকারে, প্রাঞ্জল 'ওবী' ছন্দে বলিব। আমি সদ্ভাবের (প্রেমের) অঞ্জলি ভরিয়া প্রস্ফুটিত 'ওবী' ফুলের অর্ঘ্য বিশ্বরূপের চরণযুগলে অর্পণ করিতেছি। [১১শ অধ্যায় সমাপ্ত]

স্বামীজীর শতবার্ষিকী*

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব-আয়োজনের এই প্রস্তুতি-সভায় দীর্ঘ অভিভাষণ দিয়ে এবং স্বামীজীর জীবনকথা ও বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। স্বামীজীর তিরোধানের পর দীর্ঘ ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী নানা ভাষায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তকাবলীর মাধ্যমে, স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু শাখাকেন্দ্রের বহুমুখী সেবাকার্য দ্বারা স্বামীজী-প্রবর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণের নবযুগ-ধর্মের প্রভাব আজ ছড়িয়ে পড়েছে—দেশে বিদেশে অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে; আজ আর দেশের, জাতির ও বিশ্বের কল্যাণে স্বামীজীর অবদান কি—এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, এবং এই সভার মৌলিক উদ্দেশ্যও তা নয়। আমার সামান্য ধারণায় এই সভার এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সমিতির মূল উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা হবে—অনাগত ভবিষ্যতে শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে আমরা কি কি নব নব কার্যক্রম গ্রহণ ক'রে তা রূপায়িত করতে পারি, যা দ্বারা স্বাধীন ভারতের তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে স্বামীজীরই ঈপ্সিত এবং অসম্পূর্ণ কার্যাবলীকে অবলম্বন ক'রে এবং স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম বিশ্ববাসীর নিকট আরও ব্যাপক-ভাবে প্রচার ক'রে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে—বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হ'লে শুধু স্বামীজীকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ব'লে গ্রহণ করলে চলবে না। তিনি রামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ এই ত্রিমূর্তির জ্যোতির্ময় প্রকাশ। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের পরিপূরক লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন, তেমনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরিপূরক প্রকাশক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ ও পরিচয়ে শ্রীশ্রীমাকেও বাদ দেওয়া যায় না। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক উৎসব সমারোহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উৎসব শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত পালন করেছি। স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব হবে অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এই ত্রিধারা সংযোজনে নবযুগধর্মের ব্যাপক প্রচার। যা কিছু কর্মপ্রণালীই গ্রহণ করি না কেন, যা কিছু পুস্তক প্রকাশ করি না কেন, যা কিছু অনুষ্ঠান পালন করি না কেন, যা কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি না কেন, তার প্রাণকেন্দ্র হবে—স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম। সে ধর্ম সংকীর্ণ স্থিতিশীল একটি গ্রন্থে বা বিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে ধর্ম আচার- বা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব নয়।—সে ধর্ম মানবের বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ রূপায়িত গতিশীল প্রেম ও সেবার ধর্ম। সে ধর্ম পালনের জন্য বিজন অরণ্যে বা নির্জন প্রান্তরে, লোকা-

* গত ৯ই জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব কালচারে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্দেশ্যে আহূত কলিকাতা নাগরিকগণের প্রথম প্রস্তুতি-সভার বক্তৃতা অবলম্বনে।

লয়ের বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। সে ধর্ম—মানুষের মধ্যে সংসারের সর্ব অবস্থায় কর্মব্যস্ত জীবনেও পালন করার ধর্ম। সে ধর্ম জাতির বা দেশের বা ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে ধর্ম ভেদাভেদ ভুলিয়ে মানুষকে মহান্ ক'রে তোলে, মানুষকে ভগবানের সত্তা ব'লে মনে করায়—সে ধর্ম ভারতের বাহিরে সুদূর পাশ্চাত্যে জড়বাদী মানবসমাজের মধ্যেও বেদান্তের বাণী প্রচার করে, মানুষের অন্তরের মহৎ শক্তিতে—অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হ'তে শেখায়—যদি ভবিষ্যতে সেই ধর্মের বহুল প্রচারে সহায়তা করতে ও উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে শতবার্ষিক উৎসব পালন সার্থক হবে।

সেই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে মনুষ্যচরিত্র গঠনের জন্য স্বামীজী রেখে গেছেন তাঁর শিক্ষানীতি। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টিতে পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্বে যা ধরা পড়েছিল, ওজস্বিনী ভাষায় তা তিনি ঘোষণা ক'রে গেছেন: 'নিদ্রিত ভারত জাগিতেছে—বিশ্বের কোন শক্তি নেই—সে জাগরণের পথ রোধ করিতে পারে।' তাই ভারতের অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। বিশ্বসভ্যতায় স্বাধীন ভারতের অবদানের কথাও বহু বক্তৃতায় ব'লে গেছেন। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার অপূর্ব সমন্বয়ে নূতন মানব-সমাজ ও বিশ্বকল্যাণের রূপ তিনি দিয়ে গেছেন। এই সমন্বয় রূপায়িত করতে শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর ধর্মকে ভিত্তি ক'রে মানুষ তৈরীর শিক্ষা-প্রণালী (Man-making Education) আজ প্রয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্র উত্তীর্ণ হবে—তারা মুষ্টিমেয় হলেও স্বাধীন ভারতে নূতন জীবন-গঠনে সহায়ক হবে বলেই আশা করা যায়। সকল দেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—জনসাধারণকে সব সময় জাতির কল্যাণে ও আদর্শে পরিচালিত করে মুষ্টিমেয় মেধাবী, দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী মানব। সেইরূপ মানব-প্রস্তুতির কার্যভার 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়'কে গ্রহণ করতে হবে। এখানকার ছাত্রেরা ভারতের অতীত ঐতিহ্যে স্থির বিশ্বাস রেখে ভারতের অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে জড়বাদী পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে জাতির ও বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে।

স্বাধীন ভারত—'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র, তার মানে ভারতবর্ষ ধর্মহীন রাষ্ট্র নয়, সকল ধর্মকেই স্বাধীন ভারত শ্রদ্ধা করে। সকল ধর্ম পালনের ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতার দ্বারা 'যত মত তত পথ'-সমন্বয়রূপ নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধর্মের প্রকাশ প্রচার ও গ্রহণে যদি আমরা স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবে প্রেরণা জাগাতে পারি—শুধু ভারতে নয়—ভারতের বাহিরে সর্বদেশে, যেখানে রামকৃষ্ণ-ভাবের কেন্দ্র আছে, তাহলে শতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে

আজ ত্রয়োদশ বর্ষ ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত। কিন্তু স্বাধীন জাতির আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছতে কি আমরা পেরেছি এখনও? স্বামীজীর স্বপ্ন—সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য দূর ক'রে সুস্থ সবল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের পথে তাদের কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি? জানি—সে পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ; কিন্তু আজ পথের প্রধান কণ্টক জাতীয় চরিত্রের অধোগতি, ভেদবুদ্ধির ও বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্যস্থাপনে অকৃতকার্যতা। তাই আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মানুষের শুভ বুদ্ধির অভ্যুদয়। তা একমাত্র সম্ভব ধর্মের ভিত্তিতে এবং সে ধর্ম পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম নয়। সে ধর্ম উদার মানবপ্রেম ও জীবসেবার ধর্ম।

ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা, স্বামীজীর শত-বার্ষিক বৎসর যেন জাতিকে সেই ধর্ম-পালনে ও মানুষ গঠনের শিক্ষায় ব্রতী করে। আজ নানা মত, আদর্শ ও ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই বিশ্বে শান্তি ও চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ জগতে শান্তি আনতে পারেনি। আজও পাশ্চাত্য জগৎ আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতির প্রতি জাতির অবিশ্বাস, ভয় ও ঘৃণা মানব-সমাজকে জর্জরিত ক'রে রেখেছে। রাষ্ট্র-সংঘের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বারা বিশ্বশান্তির স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। বিশ্ববাসী আজ এমন একটা কিছু চায়, যেখানে মানুষ যুদ্ধ-বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তিতে তার জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যদি ভারতের শিক্ষিত সমাজ এই শতবার্ষিক উৎসবে কিছু প্রেরণা লাভ করতে পারে, তাহলেই স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে।

ঝড়

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

দেখছ কি লোভ হিংসা কামনার ঝড়?
যে ঝড়ে উপাড়ি' ফেলে জীবনের জড়
উন্মত্ত তাণ্ডবে! পরস্পরে হানাহানি
দংষ্ট্রাঘাতে নখর-প্রহারে। ফেলে টানি'
সভ্যতার হৃৎপিণ্ড। যা-কিছু মহান্
যা-কিছু সুন্দর শ্রেষ্ঠ—সভ্যতার দান
খাণ্ডব-দাহনে সব পুড়ে হয় ছাই,
আপন সৃষ্টিরে নাশি' করে সে বড়াই।
জাগে যবে লোভ হিংসা কামনার ঝড়
নাহি মানে ন্যায় নীতি, না মানে ঈশ্বর।
রক্তের বন্যায় ভাসে কবন্ধ-কঙ্কাল,
যেন কোন সর্বধ্বংসী ক্ষ্যাপা মহাকাল
ভাঙনের উন্মত্ত-উল্লাসে,
অট্ট অট্ট হাসে।

এ কী পরিহাস!
সর্বনাশা প্রমত্ত বিনাশ!
এ কী লজ্জা নিদারুণ—
—লোভ হিংসা ক্ষুধার বিকার
তোমার সৃষ্টিরে নিত্য দিতেছে ধিক্কার
হে বিধাতা!—এ দুরন্ত ঝড়
বহিতে রহিবে নিরন্তর!
এই ক্রুর হানাহানি, এই রক্তস্নান—
এর কি হবে না অবসান—
কোন দিন প্রভাতের বিমল আলোকে?
মানুষ পাবে না খুঁজে এই মরলোকে
আপনার অমর মহিমা? হে ঈশ্বর,
এ প্রশ্নের কে দেবে উত্তর?

ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্ম চিরস্থায়ী কি না ?

স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষই সাধারণভাবে নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন বা চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করিত। সম্প্রতি নাস্তিকতার বহুল প্রসারের ফলে রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র হইতে আনুষ্ঠানিক ধর্মের আচরণ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া ধর্মের নিত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিতেছে।

ভারতবর্ষেও আজ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই বহুক্ষেত্রে ক্ষমতা অধিকার করিয়া ধর্মের—বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা করিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে যাহা 'সনাতন ধর্ম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, নাস্তিকতারূপ সর্বগ্রাসিনী রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া সেই মহান্ হিন্দুধর্মের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার বিনাশ ঘটে, তাহাকে সনাতন বলা যায় না। হিন্দুত্ব-বিদ্বেষীরা ভাবিতেছেন, আর কয়দিন পরে হিন্দুধর্ম ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া সর্বদা প্রচার করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু নাস্তিকতার প্রচণ্ড আঘাত আজ তাঁহাদের ধর্মগুলির স্থায়িত্বও সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া চলিয়াছে আজ ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম, অর্থাৎ দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ। পুরাণে বর্ণিত দেবাসুর যুদ্ধে প্রায়ই দেখা যায়, প্রথমে অসুরদেরই জয় হয়, দেবতারা পরাজিত হন ; কিন্তু তাঁহাদের ধ্বংস হয় না। সুদূর নির্জনে অজ্ঞাতবাস করিয়া তাঁহারা দানবনিধনের জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সময় আসিলে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুল ধ্বংস করত নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া থাকেন। আজকালকার এই ধর্ম ও নাস্তিকতার যুদ্ধ দেখিয়াও মনে হইতেছে, নাস্তিকতারূপ দানবই যেন আপাততঃ জয়যুক্ত হইবে। কিন্তু এই দানব ধর্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না ; এবং যখন নাস্তিকতা তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া সমগ্র জগৎকে নৃশংসভাবে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে, তখনই জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে নূতন চেতনা, আর তাহারই ফলে ঘটিবে ধর্মের পুনরভ্যুদয়। এই অনুমান সত্য হইলে ধর্মের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাময়িক হ্রাসকে ধর্মের লোপ বলা চলে না।

পূর্বে আমরা মহাভারতের যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটিতে ধর্মবিশেষকে (হিন্দুধর্মকে) সনাতন বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অনুরূপ বহু উক্তি দেখা যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থেও তাঁহাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তবে হিন্দুধর্মই গ্রন্থ এবং অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে ধর্মের স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রই বলেন :

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥

—ধর্মই একমাত্র যথার্থ সুহৃৎ; কারণ সে মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। অন্যান্য সব কিছুই শরীরের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কেবল শাস্ত্রগ্রন্থেই নহে, বহু মনীষীর উক্তিতেও ধর্মের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

সনাতন সত্যসমূহ মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না; অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থাতেই ঐগুলি ধর্ম।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের একটি উক্তি দেখিয়া মনে হয়, ধর্মের অনাদিত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। The East and West in Religion নামক গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১৯) তিনি লিখিয়াছেন: কোন ধর্মই পূর্ণাঙ্গ বা চূড়ান্তরূপে স্বীকার্য নহে—'Comparative religion tells us that, all religions have had a history and that none is final or perfect.'

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব হইতে মহামতি ভীষ্মের যে উক্তিটি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ এবং দান—এই চারিটিকে 'সনাতন ধর্ম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'সনা' শব্দের অর্থ 'নিত্য', তাহার উত্তর 'তনট্' প্রত্যয় করিয়া সনাতন-শব্দটি সাধিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ নিত্য-বিদ্যমান এবং অপরিবর্তনীয়।

মহামতি ভীষ্ম হিন্দুধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ অহিংসা প্রভৃতি যে চারিটিকে সনাতন বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ইহারা সনাতনই বটে। সর্বদেশে, সর্বকালে ইহারা এক ভাবেই থাকে। কোন যুগের কোন ধর্মপ্রচারকই এইগুলির পরিবর্তন-সাধনে যত্নবান্ হন না, এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতে পারেন না। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ধর্ম বলিতে সম্ভবতঃ উপাসনাপদ্ধতি ও আচার প্রভৃতিকে বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এইগুলি ধর্মের খোলসমাত্র। এই খোলসের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন হয় না। পুরাতন জামাকাপড় পরিত্যাগ করিয়া যখন কোন ব্যক্তি নূতন জামাকাপড় পরিধান করে, তখন যেমন তাহার নাম পরিবর্তিত হইয়া যায় না, ঠিক তেমনি উপাসনাপদ্ধতি বা আচারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন হয় না।

ধর্মগ্রন্থসমূহের একটি শব্দও পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ধর্ম পরিবর্তনশীল হইলে ঐ সকল গ্রন্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। স্মরণাতীত কাল হইতে যে সনাতন হিন্দুধর্ম চলিয়া আসিতেছে, সহস্র আঘাতেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে (২৫ পৃঃ) হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:

Several militant creeds tried to suppress it, yet it is still there. Many critics ancient and modern killed it, certified its death and carried out the funeral obsequies, and yet it is there.

—বহু সামরিক শক্তিসম্পন্ন মতবাদ ইহাকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছে; কিন্তু পারে নাই। প্রাচীন এবং আধুনিক অসংখ্য সমালোচক ইহার বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন, ইহার বিনাশ ঘোষণা করিয়া তাঁহারা ইহার শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু আজও ইহা বিদ্যমান।

নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন সনাতন ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের নূতন শাখা সদৃশ। কোন বিশাল বৃক্ষে একটি নূতন শাখা গজাইলে যেমন মূল বৃক্ষটির বিনাশ বা পরিবর্তন ঘটে না, নূতন কোন ধর্মমতও তেমনি সনাতন সত্য ধর্মের বিলোপ সাধন করিতে পারে না।

ধর্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া এবং ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া আজকাল এক শ্রেণীর লোক ধর্মসম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সরলমতি জনসাধারণের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার করিয়া তাহাদিগকেও অধার্মিক করিয়া তুলিতেছেন। একদল লোক বলিয়া বেড়ান, ধর্ম অজ্ঞতাসম্ভূত। তাঁহাদের মতে—জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধর্ম হইতে দূরে থাকেন।

অন্য একদলের মতে, ধর্ম বঞ্চনাকারীদের ষড়যন্ত্রবিশেষ। ইঁহারা মনে করেন, যাঁহারা আগামীকল্যের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করা প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সেই বিষয়বিরাগী ঋষিগণ মানুষকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্বত্যাগী বুদ্ধ, জীবহিতার্থে জীবনদাতা যীশু, মহাত্মা মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকগণ ইঁহাদের দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক। অবশ্য ইঁহারা পুরোহিত-প্রচারিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করেন।

আর একদল মনে করেন—পূজা, পার্বণ, যাগযজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতিই ধর্ম। এই সকল কার্য প্রায়ই আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল হইয়া থাকে; সুতরাং আয়াস ও ব্যয়ের ভয়ে স্বার্থ-সর্বস্ব লোকেরা উল্লিখিত কার্যগুলির সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম-শব্দটির প্রতিই বিরূপ হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ পূজা, পার্বণ প্রভৃতি যে ধর্মের খোলসমাত্র, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাদের ধর্মগুরুর নির্দেশিত পথে চলে না, সেই অধার্মিক। অধিকাংশ মুসলমানেরই ধারণা—যে মুসলমান নয়, সেই অবিশ্বাসী। খ্রীষ্টানেরাও অখ্রীষ্টানকে অধার্মিক মনে করেন। বস্তুতঃ ইঁহারা প্রত্যেকেই পরস্পরকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করিতেছেন। যে কোন মানুষ যে কোন পথে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে পারে, এবং তাহার তাদৃশ চেষ্টা ধর্মেরই অঙ্গরূপে বিবেচনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ অন্যের বাধা উৎপাদন না করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সেই চেষ্টাকে ধর্ম বলিতে হইবে। সে মন্দিরে, মসজিদে বা গীর্জায় যেখানেই যাক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন:

ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর প্রয়োজন। তবে ভেদ আছে বলিয়াই বিরোধের প্রয়োজন নাই।

বর্তমান নাস্তিকতার যুগে সাধারণভাবে সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার চলিয়াছে বটে, কিন্তু সনাতন সর্বসহিষ্ণু হিন্দুধর্মের বিলোপ-সাধনের উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক বিষ উদ্গীরিত হইতেছে। হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজকাল এক শ্রেণীর উন্মার্গগামী লোক প্রকাশ্য সভায় বলিয়া বেড়াইতেছেন—দেবতাদের কাছে মাথা নত করা কুসংস্কার, যজ্ঞে আহুতি দান অপব্যয়। এই ধরনের আরও নানাবিধ অপপ্রচার এই শ্রেণীর লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। বস্তুতঃ ধর্মজ্ঞানবর্জিত এই সকল অদূরদর্শী মানুষের উল্লিখিত উক্তি-গুলিকে প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উল্লিখিত নাস্তিকেরা দেবতাদের নিকট মস্তক নত করে না বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসুর-প্রকৃতি মানুষের নিকট বা চরিত্রভ্রষ্টা নারীর নিকট সর্বদাই নতি স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা পরোপকাররূপ যজ্ঞে অর্থের অপব্যয় করে না সত্য, কিন্তু বিলাস-ব্যসনে এবং সুরাপানে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দেয়। এবং এতদুদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য কোনপ্রকার কুকার্যসাধনে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে। ইহারা যজ্ঞে পশুবধ করে না, কিন্তু কসাইএর দোকানের জবাই-করা যে কোন মাংস পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকে। ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত লোকেরা এইরূপ কুকর্ম-পরায়ণ হওয়ায় সমগ্র দেশ পাপের পথে উৎসাহ পাইতেছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে :

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
—প্রধান ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোকেরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায়, এই শ্রেণীর নাস্তিকেরা প্রায় সকল যুগেই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান এবং ইহারা 'চার্বাক' নামে অভিহিত হইত। আর্য ঋষিদের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সম্মুখে চার্বাকেরা চিরদিনই হতপ্রভ হইয়াছে; কিন্তু সুযোগ পাইলেই একটা না একটা অনর্থ-সাধনের চেষ্টা সকল যুগেই তাহারা করিয়া আসিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে দেখি, একজন চার্বাক শ্রীরামচন্দ্রকে সত্যভ্রষ্ট করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মহাভারতে দেখি, যুধিষ্ঠিরকে বিপথগামী করিবার জন্য তাঁহারই রাজসভায় দাঁড়াইয়া আর একজন চার্বাকের অপপ্রচারের প্রয়াস। মহাভারতের উল্লিখিত স্থলে চার্বাককে 'রাক্ষস' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের বহু গ্রন্থেও চার্বাকদের অবস্থিতি ও মতবাদের অজস্র উল্লেখ দেখা যায়।

চার্বাক-শ্রেণীর উল্লিখিত নাস্তিকেরা আপাতরম্য কুযুক্তিসমূহ দ্বারা সরলমতি মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। শিশুরা যেমন কোন নূতন কথা শুনিলেই তাহা সত্য মনে করে, সরলমতি জনসাধারণও তেমনি চার্বাকদের কুযুক্তিগুলিকেও ঠিক যুক্তি মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজবিরোধী আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ধর্মসাধনের উপযোগিতা

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক সকলেই স্বীকার করেন যে, আদিম যুগে মানুষ ও পশু একই ভাবে অরণ্যে বাস করিত। পশুদের মধ্যে যেমন ধর্মের জ্ঞান নাই, ঐ যুগের মানুষের মধ্যেও তেমনি ধর্মজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ফলে পশু হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও পরিলক্ষিত হইত না, ক্রমশঃ মানবের মনে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তিরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ধর্মাচরণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন; এবং সেই সময় হইতেই মানব-ধর্মের বীজ উপ্ত হইল। অতঃপর মানবের মনন-শীলতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মবীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ক্রমশঃ বৈদিক ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের উদ্ভব হইল। ইহার পরও বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন পথে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকে সাফল্য-মণ্ডিতও হইয়াছেন।

মনুষ্য-মাত্রেরই জীবনে ধর্মাচরণ একান্ত আবশ্যক। যে মানব ধর্মাচরণ করে না, তাহাতে আর পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মিথুনভাব এই চারিটি মানুষ ও পশু—উভয়ের মধ্যেই আছে। ধর্মনামক অতিরিক্ত একটি গুণ মানুষের মধ্যে আছে বলিয়া মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। যে সকল মানুষ ধর্মাচরণ করে না, তাহারা পশুর তুল্য।

ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ, শিক্ষা দেয় পরোপকার এবং সরলতা। বর্তমান যুগের মানুষ যে ভোগী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থ-সর্বস্ব ও কুটিলমতি হইয়া পাপের পঙ্কিল আবর্তে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা হইতে একমাত্র ধর্মই তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার করিতে পারে। রাষ্ট্র এবং সমাজের সকল স্তরের লোকেরই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; ফলে পররাজ্য-গ্রাস করিবার জন্য কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হইবেন না। সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস জন্মিলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। ব্যবসায়ীরা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে খাদ্যে ভেজাল মিশানো-রূপ মহাপাপ দেশ হইতে দূরীভূত হইবে এবং খাঁটি খাদ্য খাওয়ার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ও আয়ু উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে; অধিকন্তু অনর্থক চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন হইতেও তাঁহারা অব্যাহতি পাইবেন। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মে বিশ্বাসী হইলে অপপ্রচারের সাহায্যে মানুষের অন্তরের রিপুরূপ দানবগুলিকে জাগ্রত করিয়া এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে খেপাইয়া দিয়া ভোট-যুদ্ধের নামে দেশব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন না, এবং ফলে মানুষ পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে, অযথা নূতন করের মাধ্যমে তাঁহারা দরিদ্র জনগণের রক্ত শোষণ করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার নামে তাহার বিপুল অপব্যয় করিবেন না; ফলে জনসাধারণ তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করিয়া অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভে সমর্থ হইবে

The end of religions is the realising God in the soul. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world, and that is the realisation of God within yourself.

Swami Vivekananda

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিন্তাধারা

ডক্টর অণিমা সেনগুপ্তা

ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ভারতের জাতীয় ইতিহাসে সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বহির্ভারতের ধর্মভাব, অনুভূতি ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও ভগবান বুদ্ধের দান—তার অনুপম বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ সারগর্ভতা নিয়ে আজও উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।

ভারতবর্ষে সত্যসিন্ধুর অমৃত-মন্থনের যে অভিনব তপস্যা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যুগে আরম্ভ হয়েছিল, তারই এক গভীর ও মহৎ পরিণতি আমরা দেখতে পাই উপনিষদের বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যানুভূতির মধ্যে। বৈদিক ঋষির অন্তরের জিজ্ঞাসা 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' ঋষি উদ্দালক যেন তারই উত্তর দিলেন, 'য এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' জীব-শরীরে নিয়ামক-রূপে বর্তমান আত্মাই যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব—এই সত্য উদ্ঘাটন করেই উপনিষদের ঋষিগণ এ দেশের ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক জগতের আলোর বর্তিকা অধিকতর উজ্জ্বল শিখায় জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। হিরণ্ময় পাত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল জগতের সর্বোত্তম গূঢ় সত্য।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

—জগতে যা কিছু আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করবে। আসক্তি ত্যাগ ক'রে ভোগ কর, ধনের আকাঙ্ক্ষা ক'রো না। এই মহান্ সত্যের আবরণ উন্মোচন ক'রে তার প্রতিষ্ঠা দ্বারা উপনিষদের ঋষিগণ বৈদিক ধর্মের আধারশিলার উপরে উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব, চিন্তা ও কল্পনার যে বিচিত্র স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তার ভগ্নাবশেষও আজ আমাদের নিকট কোন দুর্লভ দেবতার রূপায়িত ধ্যান বলেই মনে হয়।

বেদ ও উপনিষদ্

উপনিষদের ঋষিগণ যে সংহিতার ঋষিদিগেরই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে কিছুকাল পূর্বেও বিদ্বৎসমাজে বিশেষ মতভেদ ছিল। বহু পাশ্চাত্য মনীষী এবং ভারতীয় দার্শনিক উপনিষদের আবির্ভাবকে ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন চিন্তাধারার আবির্ভাব ব'লে মনে করেছেন।

পশ্চিমের মনীষী ডয়সনের মতে 'উপনিষদের আত্মবাদের সঙ্গে বৈদিক দেবতার বর্ণনা ও উপাসনা এবং যাগযজ্ঞ-বিধির মূলগত পার্থক্য রয়েছে'। ম্যাকডোনেল তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' বলেছেন: 'যদিও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেরই একটি অংশরূপে গৃহীত হয়, তথাপি উপনিষদের যে নূতন ধর্মভাবনা পরিলক্ষিত হয়, তা বৈদিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত'। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অভিমতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুরূপ। তিনি মনে করেন: উপনিষদ্ বেদ হ'তে ভিন্ন, কারণ উপনিষদ্ জ্ঞানমার্গী, কিন্তু বেদ কর্মকাণ্ড-প্রধান। আবার অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করেন: বেদ ও উপনিষদের মধ্যে এরূপ মূলগত ভেদ বা বিরোধ কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

মধ্যযুগে শংকর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণও বেদ ও উপনিষদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ স্বীকার করেননি। উপনিষদ্ বেদের বিরোধী নয়, বরং তার উন্নততর অভিব্যক্তি। বৈদিক কর্মকাণ্ডও মানবের অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছে। বেদোক্ত বহুদেবতাবাদ এবং উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বিরোধী চিন্তাধারা নয়। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি বৈদিক দেবতা জগতের বহু বিচিত্র শক্তির বিভিন্ন প্রতীক-মাত্র। এই সকল শক্তির আধাররূপে যে এক পরম শক্তি বিরাজিত, তার আভাস আমরা সংহিতায়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই। যথা 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বমেকং'। 'যো দেবানাং নামধা এক এব' ইত্যাদি।

পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের স্থূল দৃষ্টির তৃষ্ণা প্রতি মুহূর্তে তৃপ্ত করছে, তা যে সত্যের পরিপূর্ণ রূপ নয়—এ অনুভূতি ঋগ্বেদের যুগেও ঋষিহৃদয়ে স্পষ্টরূপেই জাগ্রত হয়েছিল। অতএব এ কথা বলা একেবারেই উচিত নয় যে, বেদবর্ণিত অর্ধ-দেবতাদের মৃত্যুর পরেই উপনিষদে পূর্ণাঙ্গ দেবতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। অধিদৈবত শক্তি ও অধ্যাত্মশক্তিরূপে ঋগ্বেদের দেবতাগণ উপনিষদেও আদৃত হয়েছেন। উপনিষদ্ বেদেরই স্ফুটতর ব্যাখ্যা ব'লে উপনিষদের ঋষিগণ আপন আপন মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বৈদিক ঋষিদের উল্লেখ করেছেন বারংবার; যেমন 'তদুক্তম্ ঋষিণা', 'তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব ও তৎকালীন বৈদিক ধর্ম

বেদ ও উপনিষদ্-প্রচারিত সত্যে যেমন মূলগত কোন প্রভেদ নেই, সেইরূপ বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম বেদবিরোধী ব'লে সাধারণতঃ বর্ণিত হলেও উপনিষদ্-প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে তার কোন বাস্তবিক বিরোধ নেই। উপনিষদের পরবর্তী যুগ কল্পসূত্রের যুগ। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে আরম্ভ ক'রে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগ বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণ-যুগের মতো এ-যুগেও জ্ঞানযজ্ঞের পরিবর্তে দ্রব্যযজ্ঞের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সত্য বিস্মৃত হয়ে লোভবশতঃ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ তার বহিরঙ্গের উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। লোভের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, অজ্ঞান ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দেশের সামাজিক ও ধার্মিক জীবনে অত্যন্ত বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি হয়। মন্দবুদ্ধি বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবসায়ের পর্যায়ে অবনমিত হয়। উপনিষদ্-প্রচারিত মানবের শাশ্বত মহিমা বর্ণভেদের লৌহ-নিগড়ে নিষ্পেষিত হ'তে থাকে।

ভারতের ধর্মাকাশে যখন দুর্দিনের এই কৃষ্ণমেঘ তার সর্বনাশা মূর্তিতে আবির্ভূত, সেই সময়েই ভারতের পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হন ভগবান বুদ্ধ তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে তৎকালীন ধর্মের মলিন আবরণ ধ্বংস হ'য়ে যায় এবং শাশ্বত আদর্শ ও মুক্তির অনির্বাণ আলো ভারতের দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত ক'রে জ্বলে ওঠে। রুদ্রদেবের মতোই বুদ্ধদেব এক পদক্ষেপে জীর্ণসংস্কার ধ্বংস ক'রে অন্য পদক্ষেপে চিরন্তন সত্যের পুনরুদ্ধার করেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্যই ছিল উপনিষদ্-প্রবর্তিত চিন্তাধারার সংস্কার সাধন ক'রে বিশুদ্ধরূপে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা।

সুত্তনিপাতের কতিপয় গাথা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—বুদ্ধদেব সত্যাশ্রয়ী শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধাই পোষণ করতেন না। তাঁর অভিযোগ ছিল অর্থলোভী সংকীর্ণচিত্ত পুরোহিত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে, যাঁরা সেই যুগে সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন থেকে বর্ণভেদের কঠোরতা সমাজে প্রবর্তিত করেছেন।

চুল্ল বগ্‌গে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন: প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের যিনি অধিকারী, তিনি সর্বদা সংযত জীবন যাপন করেন; পঞ্চকামগুণ তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ব্যবহারে অভ্যস্ত হন; তাঁর কোন রকম বিত্ত বা ধন থাকে না; তিনি অজেয়, কারণ তাঁর বিশুদ্ধ ধর্মাচরণ লৌহবর্মের মতোই তাঁকে সর্বদা পাপ থেকে রক্ষা করে। এরূপ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে কোন গৃহের দ্বার কখনও রুদ্ধ থাকতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ Rhys-Davids স্পষ্টই বলেছেন: বুদ্ধদেব জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুই ছিলেন' গৌতমের সকল শিক্ষা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে এবং তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যে ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও সংযম উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণত্বের অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য-রূপেই পরিগণিত হ'ত।

এইভাবে কল্পসূত্রের যুগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধার্মিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন ও আলোচনা করলে উপনিষদের ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম যে মূলগতভাবে অভেদ, তা অনায়াসেই আলোচকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। অবশ্য সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্মের অনেক পৃষ্ঠপোষকই এ সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হবেন, কিন্তু সমন্বয়ের উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য বোধ হয় কোন আলোচকই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাস ও উপনিষদীয় ধর্মভাবনার তুলনামূলক অধ্যয়নে যে সাদৃশ্যগুলি চোখে পড়ে সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে:

(১) কর্মবাদ

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। কর্মদ্বারাই বন্ধন বা দুঃখভোগ এবং কর্মক্ষয়ে দুঃখনিবৃত্তি। দ্বাদশ নিদানের একটি নিদান 'ভব' কর্মের অর্থেও বৌদ্ধদর্শনে প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় যে বৈচিত্র্য জগতে অবিরাম পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই বিচিত্রতাও প্রধানতঃ কর্মকৃত। বৌদ্ধমতে কর্মান্তে প্রত্যেক মনুষ্যকেই অবশ্য কর্মফল ভোগ করতে হবে।

'কম্মাস্‌সকা সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোনী
কম্মবন্ধু কম্মপতিসরনা।' (মঝ্‌ঝিমনিকায়)

—অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই স্বকর্মের উত্তরাধিকারী, কর্ম মনুষ্যের একান্ত আপন, কর্ম তার জন্মের কারণ এবং কর্মই তার একমাত্র আশ্রয়।

কর্মদ্বারা জীবের বন্ধন ও মুক্তি বৈদিক ধর্মেরও মূল কথা এবং দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তি হলেও তা যে মুক্তির উপযোগী নয়, একথা উপনিষদ্ এবং উপনিষদাশ্রিত সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও স্বীকার করেছে। যেমন ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে:

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

কর্মের ব্যাখ্যা বুদ্ধদেব উপনিষদ্ এবং বেদান্ত অনুযায়ীই করেছেন। বেদান্ত যেমন কর্ম-শব্দ কেবল যাজ্ঞিক কর্মার্থে প্রয়োগ করেনি, কিন্তু কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্মের

অর্থেও প্রয়োগ করেছে, বুদ্ধদেবও তাঁর দর্শনে 'মানসম্ কম্ম' বা চেতনা ও চিন্তার্থে কর্ম-শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'চেতনাহম্ ভিক্খবে কম্মম্ বদামি; চেতয়িত্বা কম্মম্ করোতি কায়েন বাচয়া মনসা।' কর্মশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সত্যজ্ঞানোপলব্ধি বৌদ্ধদর্শন ও বৈদিক দর্শন উভয়েরই গ্রাহ্য। গীতাতে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

অর্থাৎ ফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগ ক'রে যখন কোন সাধক কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তখনই তার অন্তঃকরণ নির্মল ও পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং সত্যের সম্যক্ উপলব্ধিও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। কিন্তু আসক্তিপূর্বক বা কামদ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে যে-কর্ম করা হয়, তা কেবল দুঃখের বিবিধ রূপ ধারণ ক'রে মনুষ্য-জীবনকে ক্রমাগত পীড়িত ও লাঞ্ছিত করতে থাকে

(২) তৃষ্ণা

বৌদ্ধধর্মে 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা) 'কাম' বা 'মার'—সকল বন্ধনোপযোগী কর্মের মূলগত দোষ ব'লে বর্ণিত হয়েছে। জাগতিক সুখ-ভোগের জন্য যে প্রবল আসক্তি মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিমুহূর্তে জাগ্রত হচ্ছে, তাকেই বৌদ্ধদর্শনে তৃষ্ণারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'তন্‌হা-সংযোজন' বা 'তৃষ্ণাসংযোগে'র জন্যই বিচিত্র অনুভূতিপূর্ণ জগতের ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে মানুষ সহজে আপনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় না। ভবচক্র বা প্রতীত্যসমুৎপাদ সংসারের ভিত্তিমূলে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমাগত আবর্তিত হ'তে থাকে।

তৃষ্ণা বা কামসম্বন্ধীয় ধারণাও বৌদ্ধধর্মের নূতন বৈশিষ্ট্য নয়। ঋগ্বেদের সময় থেকেই ভারতবর্ষে কামকে সংসার-সৃষ্টির মূল কারণ ব'লে গণ্য করা হচ্ছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে:

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে:

সমুদ্র ইব হি কামঃ; ন হি কামস্যান্তোঽস্তি।

—সমুদ্রের মতোই কামরাশি অতল ও অপরিমিত। কামের অন্ত পরিলক্ষিত হয় না।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি'—উপভোগ দ্বারা কামনারাশি শান্ত বা বিলুপ্ত হয় না।

গীতাতেও কামকে প্রজ্ঞাবিরোধী ও দুঃখোৎপাদকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কামজয়ী পুরুষই কেবল শান্তির অধিকারী হ'তে পারে। কামুকের শান্তি-লাভ কখনই সম্ভবপর নয়। 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥'

বৌদ্ধমতে জাগতিক সুখভোগের তৃষ্ণা মনুষ্যমাত্রকে চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে অচেতন ক'রে রাখে ব'লে দুঃখ উৎপাদনের জন্য তৃষ্ণা ও অবিদ্যার এক স্বাভাবিক সহযোগ ঘটে। চারি আর্য সত্য হ'ল—দুঃখ, দুঃখসমুদায়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধমার্গ। জগৎ দুঃখপূর্ণ, অতএব হেয়,—এই জ্ঞান যখন সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনই সে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার বিনাশের পথ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। যতক্ষণ তৃষ্ণা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জগতের দুঃখপূর্ণ রূপ কারও দৃষ্টির সম্মুখেই প্রকাশিত হয় না। তৃষ্ণাতুর জীবন সেজন্য অবিদ্যাকবলিত বলেই পরিগণিত হয়। অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা যখন চতুর্থ আর্যসত্যের পরিপালন-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই জ্ঞানী

ব্যক্তি বা বুদ্ধচিত্ত নির্বাণলাভে সক্ষম হয়ে থাকে।

(৩) অবিদ্যা

অবিদ্যার কল্পনাতেও বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সংসারভোগের মূলে যে কোন রকম ভ্রমাত্মক জ্ঞান বা অজ্ঞান অনাদি-প্রবাহে বর্তমান—এ সত্য চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার ক'রে থাকে। অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বিশেষ রূপ-বর্ণনায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হলেও সাধারণভাবে সর্বত্র অবিদ্যা অতাত্ত্বিক দৃষ্টিরূপেই গৃহীত হয়েছে।

(৪) আত্মতত্ত্ব

অবশ্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করা হয়, তখন বৌদ্ধ ও উপনিষদ্-প্রচারিত ধর্মের কিছু বৈষম্য ক্ষণকালের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলেই দেখা যায় যে, তত্ত্বের বা সত্যের স্বরূপ-বর্ণনায় বা বৌদ্ধধর্মের ভাবধারার সঙ্গে উপনিষদের সমন্বয় সাধন করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়।

উপনিষদে এক বিভু আত্মার অমর অস্তিত্বের বাণী প্রচারিত হয়েছে। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী; তার ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, মৃত্যু নেই, পরিবর্তন নেই। এক অরূপ, অসীম, স্থির এবং বিরাট চিৎ-সত্তা সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই অভিব্যক্তির ফলে আত্মাতে কোন হ্রাস বা ন্যূনতা কখনই ঘটে না। বিরাট বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত চৈতন্য সর্বদাই পূর্ণ ও অখণ্ড।

বৌদ্ধদর্শনে কিন্তু এরূপ নিত্য আত্মার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই না। বৌদ্ধদর্শন বিভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং আত্মাকে সেই সকল প্রবৃত্তির সংঘাত বা সমূহরূপে বর্ণনা করে। আত্মা প্রত্যক্ষগোচর মানসপ্রবৃত্তির কেবল একটি পুঞ্জ বা সংঘাত। সংঘাতাতিরিক্ত নিত্য আত্মার উল্লেখ বুদ্ধদেব করেননি।

বুদ্ধদেব যে সংঘাতকে আত্মা-রূপে বর্ণনা করেছেন এবং যার অস্থির ও চঞ্চল স্বভাবকে মেনে নিয়ে আত্মাকেও ক্ষণ-পরিবর্তনশীল পদার্থের পর্যায়ভুক্ত করেছেন, সেই অস্থির প্রবৃত্তিপুঞ্জাত্মক পদার্থ উপনিষদে ও বৈদিক দর্শনে অহং-ভাবাপন্ন বুদ্ধি বা চিত্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্ এবং অন্যান্য বৈদিক দর্শন এই পরিবর্তনশীল বুদ্ধি বা চিত্তকে জড় এবং 'পরপ্রকাশ'রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে চিত্তের ধারক বা পোষকরূপে অন্য কোন স্থির চৈতন্যের উল্লেখের অভাবে চিত্তকেই 'স্বপ্রকাশ'রূপে গণ্য করা হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানও চিত্ত বা বুদ্ধি পর্যন্তই স্বীকার করে। কিন্তু উপনিষদ্ ও অন্যান্য বৈদিক দর্শন চিত্ত বা বুদ্ধির পরিণাম-শীলতা ও জড়ত্ব উপলব্ধি ক'রে সকল মানস প্রবৃত্তির একীকরণের উদ্দেশ্যে চিত্তের বা বুদ্ধির পশ্চাতে এক সূক্ষ্ম স্থির চৈতন্যকে স্বীকার করেছে,—যে চৈতন্য একটি ঐক্য-সূত্রের মতো বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে অবিরাম এক অখণ্ড আত্মভাবের অঙ্গীভূত করছে। বৌদ্ধদর্শনে স্থির আত্মার উল্লেখ নেই বলেই এই দর্শনকে নৈরাত্মবাদী দর্শন ব'লে বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং এই নৈরাত্মবাদী সিদ্ধান্ত দ্বারা উপনিষদের মূলগত চিন্তা হ'তে বৌদ্ধভাবনার মৌলিক ভেদ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যদি বৌদ্ধদর্শনকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমরা পরিদর্শন করি, তবে বুদ্ধদেবের নৈরাত্মদর্শন প্রচারের

একটি সঙ্গত কারণ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বৌদ্ধযুগে বৈদিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ নিত্য ও শাশ্বত আত্মার বাণী প্রচার ক'রে এবং তার পারলৌকিক সুখোৎপাদনের জন্য যজমানদের উৎসাহিত ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন এবং নিত্য আত্মার উল্লেখ ক'রে নানারকম দুষ্কর্মও তখন সমাজে অহরহ অনুষ্ঠিত হ'ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ও সর্বনাশের গ্রাস হ'তে ধর্ম, সমাজ ও দর্শনকে রক্ষা করার জন্যই বুদ্ধদেব নিত্য আত্মার আলোচনা সর্বদাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে বুদ্ধদেব সর্বদাই মৌনভাব অবলম্বন করতেন। বুদ্ধদেবের এই মৌনভাব উপনিষদ্-বর্ণিত ভাব ঋষির মৌনভাবের সঙ্গেই তুলনীয়। বাস্কলী যখন ভাবের নিকট উপস্থিত হয়ে পরম তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন প্রত্যুত্তরে ভাব মৌন হয়েই রইলেন। কারণ বাক্য ও মনের অগোচর যে তত্ত্ব, তার বর্ণনার উপযোগী ভাষা জগতে আজও সৃষ্ট হয়নি। উপনিষদের 'নেতিবাদ'ও পরম তত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনায় মৌন থাকারই ইঙ্গিত করে।

বুদ্ধদেবের মৌনতা সম্বন্ধে আমরাও অনুমান করতে পারি যে, তিনিও চিত্তের অতীত সূক্ষ্ম আত্মার বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব জেনে উপনিষদের ঋষির মতোই মৌনতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক দর্শনের অধ্যয়ন ও প্রচার সুদীর্ঘ কাল ধ'রে ভারতবর্ষে হয়ে এসেছে ব'লে এদেশের দর্শনাচার্যগণ উপনিষদের মৌনতাকেও ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিল ব'লে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রধানতঃ বিদেশী দার্শনিক দ্বারাই সাধিত হয়েছে। বিদেশী দর্শনে সাধারণতঃ মন বা চিত্তকেই অধ্যাত্ম-প্রকাশকের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। বুদ্ধি বা চিত্তের আধার-রূপে বুদ্ধির অতীত আর কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান বিদেশী দর্শনে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধদর্শনেও বোধ হয় আমরা এই কারণেই চিত্তকেই স্বপ্রকাশরূপে পেয়ে থাকি। ভারতের ভূমিতে বৈদিক দর্শনের মতো বৌদ্ধদর্শনেরও প্রভূত অনুশীলন হ'লে নৈরাত্মবাদের ব্যাখ্যা কতখানি নৈরাত্মবাদী থাকত তা বিচার-সাপেক্ষ।*

(৫) সর্ববস্তুর ক্ষণিকত্ব

বৌদ্ধধর্মের 'সব্বং ক্ষনিকং' মন্ত্রও সর্ববস্তুর উপনিষদ্-বর্ণিত স্বরূপের বিরোধী নয়। উপনিষদ্ও তথাকথিত জড়বস্তু হ'তে আরম্ভ ক'রে জড়প্রকাশবুদ্ধি পর্যন্ত সকল পদার্থকেই পরিবর্তনশীল ব'লে বর্ণনা করেছে। অনুভবে সর্বদাই আমরা নূতন বস্তুকে কিছুকাল পরে জীর্ণ ও পুরাতনরূপে পরিবর্তিত হ'তে দেখি। কিন্তু এই জীবতত্ত্ব ও প্রাচীনত্ব এক মুহূর্তে বস্তুদেহে সঞ্চারিত হয় না। প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলেই এক সময় সেই বস্তু প্রাচীন ব'লে পরিগণিত হয়। এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বস্তুবাদী ন্যায়দর্শন দ্রব্যাংশের স্থিরতা মেনে নিয়ে কেবল গুণাংশের অবিরাম পরিবর্তন ঘোষণা করেছে এবং সাংখ্য ও বেদান্ত গুণ-গুণীতে ভেদ মানে না ব'লে বস্তুকেই পরিবর্তনশীল বলেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি প্রতিক্ষণপরিণামিনী। বৌদ্ধধর্মে গুণ-গুণী,

* ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায়, প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিক এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন; নাগার্জুন ও আচার্য শংকরের নাম এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উঃ সঃ

অবস্থা-অবস্থাবান্ ইত্যাদির কোন ভেদই মানা হয়নি। প্রত্যেক বস্তু সলক্ষণ ব'লে প্রতিটি সলক্ষণ বস্তুই ক্ষণিক ব'লে গৃহীত হয়েছে

(৬) দুঃখবাদ

বৌদ্ধধর্মের অপর মূলমন্ত্র 'সব্বং দুখ্খং'ও সকল বৈদিক দর্শনেই ঘোষিত হয়েছে। সাংখ্যকার তো ত্রিবিধ দুঃখের ব্যাখ্যা শাস্ত্রের প্রারম্ভেই করেছেন। বৈশেষিক মতেও সকল আধ্যাত্মিক ভাবনাই দুঃখ এবং বাহ্যজগৎ অনবরত আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ব'লে বাহ্যজগৎও দুঃখপূর্ণ। জগতের দুঃখ-পূর্ণ রূপ উপনিষদের যুগ থেকে স্বীকৃত হয়ে এসেছে বলেই চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন 'মোক্ষশাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়েছে।

(৭) অহিংসা

যে অহিংসা বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্ররূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে এবং যার অনুশীলন প্রত্যেক বুদ্ধ-শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য ব'লে নির্ধারিত, তার মূল অনুসন্ধান করলেও আমরা বৈদিক ধর্মের বিস্তৃত ও উদার পরিমণ্ডলের মধ্যেই প্রবেশ করি। 'মা হিংসীঃ সর্বভূতানি'—এই মহাবাক্য আবহমান কাল থেকে ভারতের উন্মুক্ত আকাশে ধ্বনিত হয়ে ভারতবাসীকে মুক্তির পথ ও মনুষ্যত্বলাভের পথের সন্ধান দিয়ে আসছে। অমৃতের সন্তান হয়েও অজ্ঞানপ্রসূত বাসনার বশবর্তী হয়ে মানুষ সত্যপথ হ'তে অনবরতই ভ্রষ্ট হচ্ছে, এবং লোভ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নানা কলুষ তার অন্তরস্থিত নিত্য আত্মার উপলব্ধিতে নিরন্তর বাধা দিচ্ছে। মানুষ যে দুর্বল নয়, হীন নয়, তার মধ্যে যে এক মহান্ চিরন্তন সত্তার সম্ভাবনা রয়েছে—সে সত্য মানুষ বিস্মৃত হয় বলেই লোভের পথে, উদগ্র কামনার পথে নিজেকে পরিচালিত ক'রে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সেজন্য যদিও পূর্বমীমাংসা যাজ্ঞিক হিংসার সমর্থন করেছে, তথাপি অন্যান্য সমস্ত বৈদিক দর্শনই সর্বথা অহিংসাকে মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক ব'লে বর্ণনা করেছে। যাজ্ঞিক হিংসাও যে মোক্ষের বিরোধী তা সাংখ্যদর্শনে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হয়েছে এবং যোগদর্শন অহিংসাকে 'সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানাম্ অনভিদ্রোহঃ' রূপে বর্ণনা করেছে।

বাস্তবিক পক্ষে অহিংসা একটি বিশেষ ধর্ম নয়; মনুষ্যত্বের প্রকাশক সাধারণ ধর্মই হ'ল অহিংসা। অহিংসা দ্বারা কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিই হয় না, মানবতার গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্যও অহিংসার আচরণ একান্ত আবশ্যক। কায় মন ও বাক্যে যিনি অহিংসভাব পোষণ করতে সক্ষম হন, তাঁর হৃদয়ই মৈত্রী করুণা ও প্রেমের মধুর রসে সিক্ত বা পূত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও পশুবলি এবং যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক অত্যাচারে ভারতে মানবতা লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত হচ্ছিল। মহামানব বুদ্ধদেব সেই বিস্মৃতপ্রায় অহিংসার বাণী পুনরায় কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা ক'রে মানবতার বিস্মৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বৈদিক ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেও অহিংসা নির্বাণ-প্রাপ্তির এবং মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তির সহায়করূপেই স্বীকৃত হয়েছে।

*　*　*

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধধর্মের বিচার করলে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে তার মিলন-সূত্র আবিষ্কার করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না। ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে একই দার্শনিক ও ধার্মিক ভাবধারা আমাদের দেশে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন যুগে বিবিধ লোকোত্তর

প্রতিভার সংস্পর্শে সেই ভাবরাশির ভাণ্ডারে অবশ্য নব নব ঐশ্বর্য ও সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতের বৈদিক সাধনার কেন্দ্রীভূত ঐক্য নব সম্পদের ভারে কোন যুগেই বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। বেদ, উপনিষদ্ ও বৌদ্ধধর্মের [বুদ্ধসাধনার] ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে নূতন প্রেমধর্ম ভারতে একদা জন্মলাভ ক'রে দুর্গত মানবের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই ক্লেদশূন্য গ্লানিহীন শুভ্র নির্মল ও উদার কারুণ্যের পুনরভ্যুদয় অপেক্ষা ক'রে রয়েছে বর্তমান ভারত—যেখানে আজ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক উচ্চ নীচের বিচার ও নৈতিক অধঃপতন এক ধূলিময় আবর্তের সৃষ্টি ক'রে দেশবাসীর সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। সেজন্য আজ এই শুভ দিবসে* 'শিক্ষা সমুচ্চয়ে'র প্রার্থনা অনুসরণ ক'রে বলতে চাই—

'হে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি সর্বপ্রকারে মানবসেবার অধিকারী কর। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবকে যেন আমি জ্ঞানালোকের সন্ধান প্রদান করতে পারি, আর্তের যেন আমি শরণস্থল হই। মানবতার চরম দুর্দিনে যেন মানবজাতিকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথে পরিচালিত করতে পারি।'

'জয় হউক মহামানবের, চিরঞ্জীবিতের,
মহামৃত্যুঞ্জয়ের জয় হউক।'

* পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বুদ্ধ-উৎসব উপলক্ষে পঠিত।

শরণাগতি

(ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শোন্ সখী, আজ বলি তোরে আমি কেমনে লভিনু মোহনে :
যোগী ঋষি যার পিয়াসী তাহারে তুষিল অবলা কেমনে ॥

জানিতাম শুধু একটি তন্ত্র, একটি মন্ত্র সাধনার :
গুণী জ্ঞানী যারে বলে ভগবান্—(তারে) আমি জানিতাম আপনার
এলো সে আমার ঘরে তাই—যারে খোঁজে মুনি গিরি-কাননে ॥

বেদ-বেদান্ত পড়িনি, ছিল না তপ-সাধনায় মতি লো!
মঙ্গলময় মানি' তারে—তার চাহিনু শরণাগতি লো!
অন্ত পায় না ধ্যানী যার – এল সে আমার মনোগহনে ॥

হরির লীলার কী বা জানি বল্? সে আকাশ, পাখী আমি যে।
পড়িতে চরণে দিল ঠাঁই গণি' আপন আমায়—স্বামী সে।
শিশুস্বরে কেঁদে ডাকিলে—অমনি আসে সে ত্বরিত চরণে ॥

রাগভক্তি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন

'প্রেম' শব্দটি মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও আলোচনা করা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে প্রেম অবিভাজ্য—তার ভগ্নাংশ হয় না। মানুষের ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্ত এবং খণ্ডিত, তাই এই অপূর্ণ প্রেমে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। যে প্রীতি বিষয়ীর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, ভক্তের বিরহ মিটাবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়? আর নিশ্চয়ই এই আংশিক প্রেমে ভগবানেরও তুষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই!

সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভক্ত ভালবাসার বিশেষ কোন মূল্য নেই। চিত্তের একাগ্রতাই ভাগবত অনুভূতি-লাভের প্রধান উপায়। বিষয়াসক্তি কিংবা 'মায়ার টান' মনকে করে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ভালবাসা একলক্ষ্য না হ'লে দিব্য চেতনা লাভ করা অসম্ভব।

'চাতক চায় কেবল ফটিক জল! উঁচু হয়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।' নদীতে জল আছে, সংসারেও রস আছে; কিন্তু নদীর জল পান করলে চাতকের 'চাতকত্ব' থাকে না; সে স্বধর্মভ্রষ্ট হয় —তার নিজের প্রকৃতি ত্যাগ করতে হয়। তেমনি পৃথিবীর রস সম্ভোগ করলে সাধকের সাধকত্ব থাকে না; ভক্তের 'রাগভক্তি' অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

রাগভক্তি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, শুভ্র; সংসারের কোন আবিলতা তাকে স্পর্শ করে না। পবিত্রতার স্পৃহা 'প্রেমাভক্তির' মধ্যেই নিহিত। 'বৈষয়িক প্রেমাভক্তি' স্ববিরোধী উক্তি। চাতক উঁচু হয়ে জল পান করে, নীচু হয়ে নয়। ভক্তের প্রীতি মনের ঊর্ধ্বমুখী বৃত্তি। এ অনুরাগ অন্তরের নিম্নমুখী কামনা নয়। অসীম আকাশের বুকে যে জল আছে, সেই জল চায় চাতক; উদার অনন্তের বুকে যে রস আছে, সেই রসের পিয়াসী ভক্ত। এ ভাগবত-রস-পিপাসা কোন সীমিত প্রীতি নয়।

মায়া একটি সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সে আবদ্ধ। বৃহতের কিংবা ভূমার আনন্দ তার কাছে অপরিচিত। তাই আত্মীয়-স্বজনের প্রেমে সে মুগ্ধ। রাগভক্তি এই ক্ষুদ্রপ্রীতির বন্ধন হ'তে মুক্ত। উদার বিশ্বে সে মেলে তার পাখা। সে মায়াহীন, কিন্তু মমতায় ভরা; তার দয়ার সীমা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'দয়া অর্থ সর্বজীবে ভালবাসা।' মা নিজের সন্তানকে ভালবাসেন। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, প্রতিবেশিনীর সন্তান তাঁর ছেলের তুলনায় ভাল হ'লে তিনি বোধ করেন এক গভীর অস্বস্তি, হয়তো গোপন ঈর্ষা। সত্যকার প্রেম থেকে অপ্রেম জন্মায় না; আলো থেকে অন্ধকারের উদ্ভব হয় না। রাগভক্তি সত্য বলেই তার অন্তরের দয়া সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, সে মায়ার মতো স্বার্থপর নয়, পরার্থপর। মায়ার মতো সে দুর্বলও নয়, কারণ তার হারাবার কোন ভয় নেই।

সাধকমাত্রই জানেন যে, রাগভক্তির ফলে মন স্বভাবতই হয় অন্তর্মুখীন। কিন্তু এই ভক্তি নিছক ভাববিলাস নয়, কিংবা নৈষ্কর্ম্যও নয়।

এ নিষ্কাম কর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এই অনুরাগের ফলে 'সংসার বিদেশ বোধ হয়, কর্মভূমি-মাত্র। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি। কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয় কর্ম করবার জন্য।' কেরানির কর্মে প্রীতি থাকে না, রসবোধও হয় না। তার কর্মে প্রেরণা যোগায় তার দেশের প্রীতি, পারিবারিক ভালবাসা। নিজের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের জন্যেই সে এক নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। ঠিক তেমনি ভগবৎপ্রীতির জন্য এই সংসার-বিদেশে কাজ করে ভক্ত। সংসারে সে রস পায় না; তার সমস্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মূলে থাকে এক দিব্য আনন্দের প্রেরণা। এই রস-চেতনাই, এই দিব্য প্রীতিই নিষ্কাম কর্মের মর্মকথা। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন কিংবা প্রেরণাশূন্য কর্ম কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান তাঁর বন্ধু অর্জুনকে বলেছিলেন :

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

পরম পুরুষকে সর্বকর্ম দান করা প্রেমেরই ধর্ম। সেই ধর্ম, সেই নিষ্কাম কর্মই 'প্রেমাভক্তি' হয়ে ফুটে উঠেছে কথামৃতের আলোতে।

প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ নীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'বাঘ যেমন কপ্ কপ্ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, অনুরাগ-বাঘ তেমনি কাম-ক্রোধাদি রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে অনুরাগ হ'লে কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না।' 'যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়…… ইন্দ্রিয়-সংযম আর কষ্ট ক'রে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়……যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন কি সে আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে?…… যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেচালে পা পড়ে না।'

চেষ্টা কিংবা চর্চা ক'রে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক জীবন কিংবা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা কঠিন। অধ্যবসায়ের মূল্য আছে; তবু কিন্তু ইটের উপর ইট সাজিয়ে যেমন প্রাসাদ তৈরী হয়, একটি গুণের সাথে আর একটি গুণ যোগ দিয়ে তেমনি ক'রে একটি আদর্শ চরিত্র গঠন করা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিভিন্ন সদ্‌ভাবের একটি নিছক সমষ্টিমাত্র নয়, তার একটি স্বকীয় সমগ্র রূপ আছে। সে নিজেই একটি পূর্ণ বস্তু। তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে লাভ করা যায় না। সেই সমগ্র সত্তার প্রকাশ হয় রাগানুগা ভক্তিতে। আদর্শ চরিত্র রাগভক্তিরই একটি রূপ। তাইতো ভক্তের চরিত্রে হয় সমস্ত সদ্‌গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ। বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই চিন্তা-সঙ্কট দেখা দেয়। কোন্‌টি নীতি, কোন্‌টি দুর্নীতি, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য—বিচার ক'রে সব সময় তার সন্তোষ-জনক উত্তর পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রেমিকের জীবনে এই চিন্তা-সঙ্কটের কোন স্থান নেই, কারণ তাকে হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ করতে হয় না…যে কর্ম সে করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। প্রেম ও কাম, ভক্তি ও রিপু পরস্পর-বিরোধী বস্তু; তাই একটির আবির্ভাবে অপরটির হয় তিরোধান। 'অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।' এত ঐশ্বর্যের অধিকারী বলেই রাগভক্তি পার্থিব আনন্দে কিংবা ইন্দ্রিয়সুখে বীতস্পৃহ।

অনুরাগ ভক্তের প্রাণের তীব্র আকুতি, তাই সে প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর। তার 'পলক অদর্শনে শতযুগ মনে হয়।' দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীর, ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এপারে

সবুজ ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন—'মা, আমার একটা দিন চলে গেল, তবু তো দেখা দিলিনে।' প্রেমাভক্তি এই বিরহের রক্তে রাঙা। নীলাচলে মহাপ্রভু গাইছেন :

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ওগো দীনদয়াল প্রভু, হে মথুরার অধীশ্বর, কবে আমি তোমায় দেখব? তোমাকে না দেখে আমার সমস্ত মন যে ব্যথায় ভরে উঠেছে। সে মন নিয়ে আমি কি ক'রব, ব'লে দাও!

এই বিরহ-বেদনা শ্রীরামকৃষ্ণ জলে ডুবিয়ে-ধরা মানুষের অনুভূতির সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায় জলে ডুবিয়ে ধরলে প্রাণ যেমন 'আটুবাটু' করে, সেইরূপ ভগবানের জন্য যদি প্রাণ আটুবাটু করে, তবেই তাঁকে লাভ করবে।

বিরহ-কাতর ভক্তের ইষ্ট প্রেমময় ঈশ্বর—সগুণ ব্রহ্ম। রাগভক্তির ফলে যে সমাধি হয়, তাকে 'কথামৃতে' বলা হয়েছে 'চেতন সমাধি'। এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে—রস-রসিকের 'আমি' থাকে—আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক, ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক……'চিনি হবো না, চিনি খেতে ভালবাসি।' ভক্তির অনুভূতিতে দ্বৈত ভাব প্রবল। সাধকের সাথে তার উপাস্যের রস-সম্বন্ধই প্রেমাভক্তির স্বরূপ।

সে প্রেমের পাত্র নিছক ভাবময় নিরাকার ঈশ্বরও হ'তে পারেন—যদিও ভাবের একটা রূপ আছে, কিংবা সাকারও হ'তে পারেন। কিন্তু মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সে সাকার রূপ চিন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মহাবীর হনুমানের ইষ্ট চিন্ময় আনন্দের মূর্তি—সেই রামমূর্তি।' ভক্তের দেহও চিদানন্দময়। জড় দেহের সাহায্যে যেমন স্থূল রূপ দর্শন হয়, তেমনি চিন্ময় বিগ্রহ দেখবার জন্য প্রয়োজন হয় একটি চিদানন্দময় দেহ। সেই 'ভাগবতী তনু' ভক্ত লাভ করে রাগভক্তির ফলে। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী :

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম।
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

সেই 'অপ্রাকৃত দেহ' রাগভক্তিরই ফল। ভক্তের এ দান পরম সম্পদ্। 'ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়।' সে সাকার 'নিত্যসাকার'ও হ'তে পারে। 'এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।'

এ কথা সত্য যে, ভক্ত প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞান চান না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন।' যে সগুণ ব্রহ্ম ভক্তি-সাধকের উপাস্য 'তাঁকেই প্রার্থনা কর, আর কাঁদো। চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখবে। ভক্তির আমি-রূপ আরশিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শোনেন, তাঁকেই বলো, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন।'

কথামৃতের রাগভক্তি শুধু সগুণ নিরাকার কিংবা সাকার ভগবানকে লাভ করবার উপায় নয়, সে নির্গুণ ব্রহ্মদর্শনেরও পথ। এই ভাগবতী প্রীতি চিত্তের একমুখী বৃত্তি ব'লে তার

মধ্যে অন্য কোন ভাব কিংবা চিন্তার স্থান নেই। গভীর প্রেমে অন্যান্য বৃত্তির হয় অন্তর্ধান। আর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে ব'য়ে যায় একটিমাত্র রসধারা। এ অবস্থায় সাধক হয় ভাবসমাধিস্থ। প্রেমাস্পদের কাছে প্রার্থনার ফলে ভাবসমাধির একবৃত্তিরও হয় অবসান—চিত্তের হয় নাশ—আর রসধারা মিশে যায় অসীম ব্রহ্মসমুদ্রে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

—নদী যেমন কুলকুল করতে করতে তার নাম-রূপ হারিয়ে সমুদ্রে শেষ হয়ে যায়, তেমনি ক'রে মিশে যায় জ্ঞানী তার নাম-রূপ হারিয়ে সেই পরম পুরুষের সত্তার অতল তলে। ভাগবত ইচ্ছা কিংবা কৃপাই যে ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত পথ, সে-কথা আচার্য শঙ্করও অস্বীকার করতে পারেননি সেই কৃপা-লাভেরই উপায় রাগভক্তি।

যে পরম অনুরাগের ফলে সাধক তুরীয়ে লীন হন, সে অনুরাগ কিন্তু অমর। ব্রহ্মজ্ঞানে তা আত্মহারা হয় সত্য, কিন্তু সমাধির পর তা আবার ফিরে আসে। এ যেন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের একান্ত বিশ্রামাগার। এই পান্থনিবাস থেকে পথিক যে কোন মুহূর্তে পথের শেষে পৌঁছতে পারেন। আবার এখানে তিনি বিশ্রামও নিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রহ্লাদ কখন দেখতেন 'সোঽহং' আবার কখন দাসভাবে থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য-সেবক ভাব আশ্রয় করতে হয়……হরিরস আস্বাদন করবার জন্য।' "বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে? এর উত্তর যে 'আমি' যায় না ·····সমাধির অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না……হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। 'আমি'-রূপ কুম্ভ। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল, তবু কুম্ভ তো আছে। এইটি ভক্তের 'আমি'র স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে—আমি তুমি আছে—ততক্ষণ তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত, এও আছে।" 'সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।' তাই রাগভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

রাগভক্তি স্বভাবতঃ তন্ময়, সর্বদা উদ্দীপনা। 'কি অবস্থাই গেছে! একটু সামান্যতেই উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা করলাম। চোদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ মা···। হঠাৎ নজরে প'ড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন…… রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রত। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না—' প্রেমিক চায় প্রেমাস্পদকে স্মরণ করতে। সামান্য উত্তেজনার ফলেও ভক্তের মনে পড়ে তার ভগবানকে। সন্তানের চিন্তা মায়ের সমস্ত অন্তর অধিকার ক'রে থাকে, তাই অতি সামান্য কারণেই তার স্মৃতি আসে ভেসে। ভাগবত স্মরণের বেদীমূলে রাগভক্তির হয় আত্মাহুতি।

সে স্মরণের অবসান নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে রাগভক্তির জয়গান করেছেন তার পতন নেই। ভক্ত এমন কথা বলে না, 'ভাই, এত হবিষ্য করলাম, কি হ'ল?' খানদানী চাষার সাথে তিনি ভক্তের করেছেন তুলনা। বহু বছর ফসল না হলেও সে চাষ করে। নিরাশা কিংবা ব্যর্থতাবোধ রাগভক্তির নেই। যে প্রীতি আঘাতে টলে পড়ে, তার বিশেষ

কোন মূল্য নেই। যে প্রেম প্রেমাস্পদের প্রতীক্ষা করতে জানে না, সে নিরর্থক; রাগ-ভক্তি মরমী সাধকের স্বধর্ম—নিজস্ব প্রকৃতি। নিজের সত্তা কেউ ত্যাগ করতে পারে না। মানুষের পক্ষে তার ছায়া অতিক্রম করা অসম্ভব। সাধকের ভক্তি তার মানসিক শক্তির পরিচায়ক, দুর্বলতার নয়। অথচ ফল লাভ হ'ল না ব'লে ভক্তি ত্যাগ করা কিংবা সাধনা থেকে বিরত হওয়া চিত্ত-গ্রন্থির শিথিলতার লক্ষণ। ভক্তের ধৈর্য অটল। সহিষ্ণুতা, প্রতীক্ষার শক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অবিচলিত প্রীতি—এ সবই রাগভক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদ্।

সেই ভক্তিরই জয়গান রাধারাণীর কণ্ঠে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে,
এতেক সহিল অবলা ব'লে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে!

'ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক'—এই সম্বন্ধের ভিত্তির উপরই ভক্তের প্রীতি হয় প্রতিষ্ঠিত। সাংসারিক জীবনে মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে সব সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তার কোন একটিকে অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে এই ভাগবত ভালবাসা। অবশ্য ভগবানে আরোপিত হবার পর মানবীয় ভাব ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় এক দিব্য অনুভূতিতে। সে বোধের সাথে প্রাথমিক প্রীতির পার্থক্য অনেক-খানি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ও কথামৃতে এই রাগভক্তিকে পাঁচটি রসে ভাগ করা হয়েছে—যথা: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শান্ত ভাব ঋষিদের ছিল। ভাগবত রস ছাড়া 'অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা তাদের ছিল না।' ইষ্টের মধ্যেই সমস্ত অভীষ্টের প্রাপ্তি এই রসের মূল উপাদান। দাস্যভাব হনুমানের—'রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য।' এ রসের মধ্যে একদিকে আছে সেবা ও দীনতা এবং অন্যদিকে পরম বীর্য। এ সেবার দীনতা ক্লীবতা নয়, পরম পৌরুষ। সেই পৌরুষেরই জীবন্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। স্ত্রীর ও মায়ের ভিতরেও সেবার ভাব, দাস্য ভাব আছে। "সখ্য বলতে বোঝায় বন্ধুর ভাব। 'এস, এস, কাছে বস'। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়ছে।" প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে সমত্ববোধই এই প্রেমের মূলকথা। এ ভালবাসা হয় সমানে সমানে। সামাজিক কোন নিয়ম, কৃত্রিমতা, ভদ্রতা কিংবা সৌজন্যের স্থান এ প্রীতির মধ্যে নেই—পারস্পরিক সেবা আছে। 'বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট।' ভগবানকে বালগোপালরূপে সেবা করা—এই রসেরই প্রকাশ। 'মধুর—যেমন শ্রীমতীর, স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ রসের ভিতর সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সেজন্যই এ রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে, যদিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বর-লাভের পথ হিসাবে প্রত্যেকটি রসই সমান কার্যকর এবং প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেকটি যুগের একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন মেটাতেই ভগবানের আবির্ভাব। তাই রাগভক্তির পঞ্চরসের সাধনা ও তন্ত্রমতে সমস্ত আরাধনা করেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পূজারী। শাস্ত্র যখন তাঁকে কোন তত্ত্ব শোনায়নি, গুরু যখন তাঁর কানে কোন মন্ত্র দেননি, তখন মহামায়াই মা হয়ে তাঁকে ঢেকে রেখেছিলেন

নিজের স্নেহের আঁচলে। সেই মায়ের ইচ্ছাতেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, সেই স্নেহময়ীর আদেশেই তাঁর বেদান্ত-সাধন। এবার ভগবানের হাসি ও কান্না, মান ও অভিমান, পূজা ও প্রার্থনা—সবই চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমাকে ঘিরে। 'যোগীরা যোগ ক'রে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বেদান্ত সাধন ক'রে যা জেনেছে'—সে সবই তো ৺ভবতারিণী সন্তানকে দিয়েছেন নিজের হাতে, তাঁর লৌকিক দীক্ষা নেবার বহু আগে। তাই তো সন্তানের রাগভক্তি এত মাতৃমুখী। 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি—তাঁকেই মা ব'লে ডাকা হচ্ছে। মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা।' এই ভক্তির ফলেই তত্ত্বময়ী হয়েছেন স্নেহময়ী জননী; আবার স্নেহরূপিণী হয়েছেন পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। ভক্তি তত্ত্বে, এবং তত্ত্ব ভক্তিতে হয়েছে রূপান্তরিত। 'মা, মা' বলতে বলতে তাপস হয়েছেন সমাধিস্থ। আবার সমাধি থেকে নেমে এসে বলছেন, 'আমাকে অন্ধকারে কে হাত ধরে নিয়ে যাবে? আমি যে বালক···বালকের মা চাই না?'

বালকের মায়ের প্রতি এই আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একই রক্তমাংসে গড়া মা ও ছেলে। 'মায়ের সত্তা আমার মধ্যে আছে, তাইতো মায়ের প্রতি অত টান।' যে দিব্য স্নেহ জগন্মাতার স্বরূপ, তারই প্রকাশ ভক্ত সাধক। দুইটি সত্তার এই একত্ববোধ না হ'লে রাগভক্তি শক্তি লাভ করে না—প্রেম নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভক্তি কর্তব্যবোধ নয়। হিতোপদেশ দিয়ে কাউকে প্রেমিক করা যায় না। বিশ্বপ্রাণের সাথে যদি মানবহৃদয় একই সুরে বাঁধা না থাকে, তবে তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ভক্ত ও ভগবানের এই নিবিড় প্রাণের সম্বন্ধ শুধু মাতৃপূজাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। 'কথামৃতে' তা গোপীপ্রেমেও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই প্রীতি রাগভক্তিকে দিয়েছে এক অপরূপ রূপ। তারই বন্দনা শ্রীমদ্ভাগবতে:

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

'ভক্ত যত সহজে গোপিকানন্দনকে লাভ করেন, তত স্বল্পায়াসে যোগী কিংবা জ্ঞানী তাঁকে পান না।' সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের গুণগান করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন সমাধিস্থ—'সখি সে বন কতদূর, যে বনে আমার শ্যামসুন্দর? আর চলিতে যে নারি···।'

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস*

রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত আমার জীবনের সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৯০৯ খৃঃ মথুরায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করি। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে যখন রামকৃষ্ণ আশ্রম ছিল ও নাদু মহারাজ ওখানকার অধ্যক্ষ, তখন আমার যাতায়াত আরম্ভ; ১৯১২।১৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিমবাবুর সহিত আশ্রমে দেখা হয়। তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন হইতে মহিমবাবু মথুরায় আমার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত প্রাণেশকুমার ব্রহ্মচারীর সহিত যাতায়াত করিতে থাকেন; কোন কোন সময় দুই তিন মাসও আমার বাড়ীতে কাটাইতেন।

১৯১৪ খৃঃ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়, মহিমবাবু সহ আমরা তিনজন সেখানে গেলাম। যাওয়ামাত্রই শ্রদ্ধেয় স্বামী কল্যাণানন্দ (কনখল আশ্রমের অধ্যক্ষ) আমাকে হাসপাতালে কলেরা-রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। আমি দিবারাত্র রোগীদের সেবা করিতে থাকি। মহিমবাবু আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, আমি কি খাইতাম না খাইতাম, আমার ঘুম হইল কি না, ইহা লইয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এইভাবে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয়দের মধ্যে তিনজনের কলেরা হইয়াছে; তিনি রোগীদের আমার চিকিৎসায় রাখিলেন ও ভগবৎকৃপায় ৪।৫ দিনের মধ্যে তাঁহারা সকলেই আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড স্নানের দিন আমি সাধুদের সহিত স্নান করিতে যাইতেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত চলিতেছে, কি জন্য জানি না, আমি পথহারা ও সঙ্গীহারা হইয়া পড়িলাম। জনস্রোতে অনেক মহিলা ও শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত সেই দিন হইয়াছিল; আমিও ভয়ে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

একটি দিব্য ইঙ্গিত দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না; মনে ভাবিলাম যে, ইহা ভ্রান্তি-মাত্র। যাহা হউক রৌদ্রের তাপে স্নান করিয়া কনখলে ফিরিলাম। ইহার এক মাসের মধ্যেই কাশিমবাজারের মহারাজা আমাকে ডাকাইলেন। রোগীরা আরোগ্যলাভ করিলে পর মহারাজা আমাকে তাঁহার সহিত বৃন্দাবন পর্যন্ত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বামী কল্যাণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক পূর্বেই মেলা ভাঙিয়া গিয়াছিল ও হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা খুবই কম, এজন্য তিনি আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন; আমি মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৃন্দাবনে মহারাজা আমাকে বাংলা দেশে গেলে কাশিমবাজার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ঐ বৎসর কয়েক মাস পরে আশ্বিন মাসে আমি কাশিমবাজার গেলাম ও মহারাজার অতিথি হইয়া তিন দিন রহিলাম। একদিন বেলা ৯টা কি ১০টার সময় মহারাজার বৈঠক-খানায় তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। ঐ সময় দেখিলাম, একজন কালো দাড়ি-ওয়ালা সাধু আমার পূর্বেই আসিয়া বসিয়া আছেন। তখন ডিগ্রি পাওয়ার জন্য

---

* বোম্বাইএর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরলোকগত Dr. A. C. Das.

আমার আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। অর্থাভাবে যাইতে পারি নাই। মহারাজাকে আমি অর্থ সাহায্যের জন্য প্রস্তাব করিলে, সাধুটি মহারাজাকে বলিলেন, 'ছোকরা এখানেই বিদ্যালাভ করিতে পারে, কি জন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়া আমেরিকা যাইবে?' তাঁহার উক্তি আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হইল। সাধু বলিয়া আমি তাঁহার কথার উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলিয়া গেলেন। মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাধুর পরিচয় জানিতে পারিলাম, তাঁহার নাম স্বামী অখণ্ডানন্দ, নিকটেই সারগাছিতে তাঁহার আশ্রম আছে। জানিতাম না যে, সারগাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে।

আমি ২।৩ দিন পরে কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কয়েকমাস পরে মহারাজা আমাকে এক হাজার টাকা মথুরায় পাঠাইয়া দিলেন। তখন হরিদ্বারে দৃষ্ট ইঙ্গিতের মর্ম কিছু বুঝিতে পারিলাম।

সেই বৎসর বা পর বৎসর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) পূঃ যোগীন-মা সহ বৃন্দাবনে আসিলেন। সেখান হইতে মথুরায় আসিয়া তাঁহারা আমার বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে ব্রহ্মচারী কানাই মহারাজ (পরে স্বামী অনন্তানন্দ) আমার এখানে আসা-যাওয়া করিতেন ও আমার বাড়ীতে পনর দিন এক মাস বাস করিতেন, আবার মাধুকরী করিয়া আসিয়া হয়তো দু-এক মাস থাকিতেন। পূঃ শরৎ মহারাজ আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনিও আসিলেন। সে সময় আমার সহধর্মিণী মথুরায় প্রথম আসিয়াছেন। তৎপূর্বে আমি একা থাকিতাম। কানাই মহারাজ ও আমি স্বামী বিবেকানন্দের যাবতীয় পুস্তক (works) ইত্যাদি পড়িতাম ও রাত্রে ছাদের উপর বসিয়া ধ্যান করিতাম।

পূঃ শরৎ মহারাজ ও যোগীন-মার গভীর ধ্যান দেখিয়া আমার খুবই ইচ্ছা হইত, এই মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া উচিত। একদিন সাহস করিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলাম, 'আমাকে দীক্ষা দিন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'সবে বিবাহ করিয়াছ, যখন সময় আসিবে, দীক্ষা লইবে।' আমি হতাশ হইয়া এ বিষয়ে আর কোন কথা কাহাকেও বলি নাই।

তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল, বহু সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিলাম। এমন কি ১৯২৭ খৃঃ মহাপুরুষ মহারাজ যখন বোম্বাই আসিলেন ও জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন, তখন আমার চিকিৎসায় রহিলেন। আমি দুইবেলা তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। তিনি জ্বরাবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিতেন, আমার মনে হইত, আমার শরীরের মধ্যে যেন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিতেছে। সহস্রাধিক ব্যক্তিকে তিনি এখানে দীক্ষা দিলেন; কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, আমাকে দীক্ষা দিন। তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিবার দিন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহার পূর্বনির্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর 'কুপে' পর্যন্ত প্রায় ১০ মিনিট কাল চলিলেন। আমি বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না, আমার মধ্যে কি অনুভূতি হইতেছিল, আমি যেন আত্মহারা হইতেছিলাম, একটা অপ্রাকৃত শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করিতেছিল। সময় সময় মনে হইতেছিল, কখন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। যাহা হউক আমি মনে সাহস আনিয়া দশ মিনিট এই অবস্থায়

কাটাইয়া তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম ও রক্ষা পাইলাম। কিন্তু শত শত নরনারী তাঁহার দর্শনের জন্য স্টেশনে ভিড় করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি আমার একটুও লক্ষ্য ছিল না, কে কখন আসিয়াছে বা গিয়াছে তাহার দিকেও হুঁশ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল; আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি প্ল্যাটফর্মে, তখন একজন সাধু বলিলেন, 'আপনি যাইবেন না, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছেন? চলুন।' তাঁহার অনুসরণ করিয়া নিজের গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম; সেই নেশা কাটাইতে আমার তিন দিন লাগিয়াছিল।

সুখে দুঃখে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯৩৩ খৃঃ আমেরিকা গেলাম, নিউইয়র্কে স্বামী নিখিলানন্দের নিকট কয়েকমাস থাকিলাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনার শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তবে কেন দীক্ষা নেন না?' আমি বলিলাম, 'সময় হইলে দীক্ষা হইবে।' যাহা হউক ১৯৩৪ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে আমি বোম্বাই ফিরিলাম। নভেম্বর মাসে এক রাত্রে বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে টেলিফোনে বলিলেন, 'বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী আসিয়াছেন, আপনি দেখা করিতে আসিবেন।'

পরদিন মঙ্গলবার প্রত্যুষে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছেন। নিকটে গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কি হে অবিনাশবাবু যে!' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আপনি কি আমাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন, আমার তো মনে পড়ে না যে, আমি আপনাকে দেখিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'মনে করিয়া দেখ ১৯১৫ খৃঃ কাশিমবাজারে মহারাজার বৈঠকখানায় আমাকে দেখিয়াছিলে কি না।' তখন মনে পড়িল—সেই সন্ন্যাসীর কথা। মহারাজ আমাকে বসিতে বলিলেন। এক পাশে একটা বেঞ্চ ছিল, আমি বসিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, 'দেখ অবিনাশ, তোমার সময় হইয়াছে, বয়সও হইয়াছে, এখন দীক্ষা নাও।' আমি বলিলাম, 'আপনি কি করিয়া জানিলেন, আমার দীক্ষা নেওয়ার সময় হইয়াছে?' তাহার কোন উত্তর না দিয়া তিনি স্বামী বিশ্বানন্দকে ডাকিলেন ও পঞ্জিকা আনিতে আদেশ করিলেন।

পঞ্জিকা দেখিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, 'শুক্রবার প্রাতে ৮টার সময় গাড়ী পাঠাইবে, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া দীক্ষা দিব।' আমার স্ত্রী প্রার্থনা করিলেন, 'মহারাজ আমাকেও দীক্ষা দিতে হইবে।' তিনি সম্মত হইলেন। শুক্রবার প্রাতে গাড়ী পাঠাইলাম। ১০টার মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ, অখিলানন্দ ও আরও ৪।৫ জন সাধুসঙ্গে আমার বাড়ী আসিয়া মহারাজ আমাদিগকে দীক্ষা দিলেন। তাঁহার দীক্ষার অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল। দীক্ষার পর সকলেই আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার পর সকলকে মঠে পৌঁছাইয়া দিলাম।

মহারাজ যতদিন বোম্বাই আশ্রমে ছিলেন, ২।৩ দিন অন্তরই এক একদিন আমার বাড়ীতে আসিতেন। তিনি শুক্তো ও পাটিসাপটা পিঠা খাইতে ভালবাসিতেন; এমন কি বেলুড়ে ও সারগাছিতে গিয়াও লিখিতেন, শুক্তো যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। মহারাজ প্রায়ই পত্র লিখিতেন, কিন্তু জীবনে আর তাঁহার সহিত দেখা হইল না।

কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী

স্বামী শান্তিনাথানন্দ

নূতন দেশ দেখার আনন্দ মানুষের সহজাত। নূতন নূতন দেশের সহিত পরিচিতি, নূতন ভাষা, নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, স্থানে স্থানে তীর্থমাহাত্ম্য যে অনুপ্রেরণা যোগায়, তা দৈনন্দিন একটানা জীবনের বিরস কর্মধারাকে সরসতায় সঞ্জীবিত করে। ঐতিহাসিক পায় নানা তথ্য, কবি দেখে চিরসুন্দরের লীলায়িত তুলিকায় অপরূপ রূপাবেশ, সাধক সন্ধান পায় যুগ-যুগান্তের ভাবাবেগ, প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে, মনে মনে ভাবে—কি সুন্দর! তাই বোধ হয় নূতন দেশভ্রমণের—তীর্থভ্রমণের সুযোগ মানুষ লুব্ধচিত্তে গ্রহণ করে।

আমার এক পুরাতন বন্ধু যখন এসে চুপি চুপি সংবাদটি দিলেন, কাশ্মীর যাবার একটি সুযোগ এসেছে, তিনি যেতে মনস্থ করেছেন এবং আমাকেও সঙ্গী হ'তে অনুরোধ করছেন, তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। বহু শতাব্দীর অতীত ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বর্তমান, অশোকের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, কনিষ্কের প্রভাব, শিব-উপাসনার কেন্দ্র, মোগলদিগের প্রমোদক্ষেত্র, স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্য ও বন্ধুগণ—সিস্টার নিবেদিতা, মিস্ ম্যাক্লাউড, মিসেস্ ওলিবুল প্রভৃতি সহ মাসাধিক কাল এখানে অবস্থান, সৌন্দর্য-পিপাসু বহু বৈদেশিকের এই ভূস্বর্গে আগমন, অবশেষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাড়াকাড়ি—এইসব চিন্তাধারা যুগপৎ মনকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। অন্তরে যেন কাশ্মীর-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। আস্তে আস্তে আরও তিনজন সহযাত্রীর আবির্ভাবে আমরা পাঁচজন কাশ্মীর-যাত্রার প্রস্তুতির পর্বে যোগ দিলাম।

যাত্রার দিন ২০শে মে, ১৯৬১। 'ভারত-দর্শন' স্পেশাল ট্রেন। যাঁর পরিচালনায় আমাদের এই যাত্রা, তিনি নিরলস অমায়িক ও আশাবাদী। এই যাত্রা তাঁর একটি আদর্শের রূপায়ণ। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভারতবাসী ভারতবর্ষকে জানবে দেখবে আস্বাদন করবে, পরস্পর যে যোগসূত্রে ভারতের ঐতিহ্য গ্রথিত, তার সূত্রটি আবিষ্কার করবে—যে সাধারণ মূর্ছনাটি ভারতবর্ষের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত, তাকে জানতে হবে, তবেই হবে 'ভারতদর্শন', তবেই হবে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল।

রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়বে। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম রাত্রি ৯টায়। পরিচয়পত্রাদি সংগ্রহ ক'রে বিছানাপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে ট্রেনে উঠলাম। বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রীরা সমবেত হয়েছেন, কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউ মালদহ, কেউ জলপাইগুড়ি, কেউ হুগলি, কেউ মেদিনীপুর, আর কলকাতা তো আছেই। বহু ব্যষ্টির সমন্বয়ে সমষ্টিগত এক বিরাট পরিবার, অপূর্ব তার সাজসজ্জা, বিচিত্র তার ভাষা, অননুভূত তার পরিবেশ। কিন্তু বৈচিত্র্যের মাঝে একটি সুরের অনুরণন যা প্রতিটি প্রাণের নিবিড়তম স্থানে বাজছে, মহৎ যাত্রা সফল হউক: 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।'

বিদায়-কোলাহলের মধ্যে ট্রেন ছাড়ল। শত শত হস্ত আন্দোলিত হ'ল, শত শত রুমাল বিদায়ের সঙ্কেত জানাল। আমরা শ্রীদুর্গা স্মরণ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। সমিতির ব্যবস্থা ভালই। ট্রেনে প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে বার্থ। দুই সীটের মাঝে টুল দেওয়া রয়েছে, তাতেও একজনের শয়নের ব্যবস্থা। পাচক চাকর, রান্নার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস, কাঠ কয়লা ইত্যাদি সঙ্গেই চলেছে। অনেক দূরের পথ। মাঝে মাঝে এমন জায়গায় ট্রেন থামাবার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে স্টেশনে রান্না ক'রে সকলকে খাওয়ানো যায় এবং রাত্রের খাবারও সঙ্গে দেওয়া যায়। গাড়ী প্রথম দিন ধানবাদে, তারপর দিন বারাণসী, তারপর মোরাদাবাদ ও শেষদিন পাঠানকোটে থামবে। সেখানে আগে থেকেই বাস-এর ব্যবস্থা করা আছে, যাতে আমরা ৭।৮ ঘণ্টা বিরতির মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসতে পারি। ইতিমধ্যে আহার্যও প্রস্তুত হয়ে যাবে।

*　　*　　*

ট্রেন চলার একটানা দোলনের মাঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, ভোরের আলোর সঙ্গে ঘুম ভাঙতে দেখলাম, বাংলার শ্যামল ক্রোড় হ'তে অনেক দূরে এসেছি। দু-ধারে টেলিগ্রাফের থামগুলি বিপরীত দিকে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে; বিস্তীর্ণ মাঠগুলিও যেন ঘুরপাক খেতে খেতে দূরে সরে চলেছে। মাঝে মাঝে খনি থেকে সদ্যোত্থিত কয়লার স্তূপের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হচ্ছে। খানিক পরেই ট্রেন ধানবাদ এসে গেল। এখানে কোন ভ্রমণসূচী নেই; শুধু স্নানাহার ও বিশ্রাম। সন্ধ্যা ৬টায় গাড়ী ছেড়ে দিল।

পরদিন শিবক্ষেত্র বারাণসী। পতিত-পাবনী সুরধুনী শত সহস্র মানবমন শুচিশুদ্ধ ক'রে যুগযুগ ধরে প্রবাহিতা। ঐ মণিকর্ণিকার ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার-ঘাট, ঐ অসংখ্য স্নানরত পুণ্যার্থীর দল। ঐ শত শত দেব-দেউলে ঘণ্টাধ্বনি—এ যেন চিরনূতন! যত বারই দেখি, পুরাতন হয় না। মনে পড়ে যায়, সেই পুরাতন কথা। শিবক্ষেত্র কাশীধামে অন্তে জীব শিবলোক প্রাপ্ত হয়; আর পুনর্জন্ম হয় না।

মা ভবানী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা সকলেই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তবে সৃষ্টি চলবে কেমন ক'রে?' ভোলানাথ উত্তর দিলেন, 'সকলেই মুক্তি পায় না, যার বিশ্বাস আছে সেই পায়।' সত্য কিনা দেখাবার জন্য ভোলানাথ মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতবৎ শুয়ে রইলেন। আর মা মৃত স্বামীর মাথা কোলে রেখে কাঁদছেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, 'মা, কাঁদছ কেন?' 'যে নিষ্পাপ সেই আমার স্বামীর মৃতদেহের সৎকার করতে পারবে আর কেউ নয়।'

কারও সাহস নেই। মনে প্রাণে নিষ্পাপ কে? সকাল দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা এল। এক মাতাল সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে সেই পথে উপস্থিত। প্রাণখোলা তার জিজ্ঞাসা 'কে মা, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কাঁদছিস কেন?'

'বাবা, আমার স্বামীর মৃতদেহের সৎকারের লোক পাচ্ছি না।'

'তোর ছেলে থাকতে ভাবনা কি?'

মা বললেন, 'বাবা, কিন্তু যে জীবনে কোন পাপ করেনি, সেই আমার স্বামীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে।'

'এই কথা? আচ্ছা একটু দাঁড়া।' এই ব'লে মাতাল দ্রুত গঙ্গাগর্ভে নেমে গেল, 'পতিতপাবনি গঙ্গে' ব'লে ডুব দিলে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললে, 'এইবার দে।' কিন্তু

কে কোথায়! পরীক্ষা হয়ে গেছে যার এই বিশ্বাস একবার গঙ্গাস্পর্শে কোটিজন্মের পাপক্ষয় হয়—এক জন্মের পাপ তো কোন্ ছার—যার এই 'পাঁচসিকে-পাঁচআনা বিশ্বাস' তারই হয়।

সারনাথ, বিড়লা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট বাস সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ক-জন গঙ্গাস্নান ৺বিশ্বনাথ দর্শন ও আমাদের আশ্রমে প্রসাদ পাওয়া স্থির ক'রে বাস ছেড়ে দিলাম। আশ্রম থেকে ফিরলাম বেলা ৪টা। ৫॥ টায় আমাদের ট্রেন ছাড়ল।

বেরিলী, মোরাদাবাদ ও জলন্ধর হয়ে ট্রেন ২৪শে পাঠানকোটে পৌঁছল। পরদিন ভোরে শ্রীনগরের বাস ছাড়বে। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ২৬৭ মাইল। সাধারণতঃ বানিহালে রাত্রিটা অপেক্ষা ক'রে সকালে আবার শ্রীনগর অভিমুখে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুমতি নেওয়ার ফলে সেই রাত্রেই শ্রীনগর পৌঁছনো স্থির হ'ল। দূর রাস্তা, পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে যেতে হয়, অন্যদিকে গভীর খাদ। রাত্রে চালকের হিসাবের অল্প ভুল হ'লে অথবা ক্ষণমাত্র তন্দ্রাভিভূত হ'লে কতগুলি অমূল্য প্রাণ কালের অতলে তলিয়ে যাবে! তাই এই সাবধানতা।

পূর্বনির্ধারিত সূচী-অনুযায়ী বাস ছাড়ল সকাল ৮টায়। গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। কখন পাহাড়, কখন সমতলভূমির মধ্য দিয়ে আমরা জম্মু এসে পৌঁছলাম বেলা এগারটায়। জম্মু বেশ গরম। নূতন নূতন দৃশ্য, আবার পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব—এই রকম ক'রে বানিহাল এসে পৌঁছলাম বৈকাল সাড়ে পাঁচটায়। বানিহাল পাস একটি দুমাইল-লম্বা টানেল। বাইশ মাইল পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে দু-মাইলে নিয়ে আসা হয়েছে।

দু-পাশের অন্ধকার চিরে দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে সারাদিনের ক্লান্তি যে কখন চোখের পাতায় নিদ্রারূপ নিয়েছে, জানতে পারিনি মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানি খেয়ে তন্দ্রা কেটে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই আচ্ছন্ন। তন্দ্রা ভাঙলো শ্রীনগরে এসে, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। নীল আবছা আলোয় এ যেন স্বপ্নের দেশে, তন্দ্রার রাজত্বে কোন্ অলকাপুরীতে এসে পৌঁছলাম! 'নামো, নামো, এসে গেছি' রব। সামনে সরকারী যুব হোস্টেল (Government Youth Hostel) পাঁচ শ' জন থাকবার মতো বাড়ী।

আমাদের কয়েকজনের সেখানে থাকা সুবিধা মনে হ'ল না। পরদিন অনুসন্ধান ক'রে নারায়ণ-মঠে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্য দুটি। প্রথম, ৺অমরনাথ দর্শন হয় কিনা, তার ব্যবস্থা করা। কাশীধাম হ'তে আভাস নিয়ে এসেছিলাম, যদিও গুরুপূর্ণিমা ও শ্রাবণীপূর্ণিমা—এই দুই দিনই যাত্রীদের যাত্রার অনুকূল, তবু তার আগে ঘোড়া ও গাইডের সাহায্যে যাত্রা চলে, অনেকে গেছেন। দ্বিতীয়, নারায়ণ-মঠে নির্জনতা এবং সাধুসঙ্গ আছে, দুটিই লোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। টুরিস্ট-অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই বৎসর দেরিতে বরফ পড়ায় রাস্তাঘাট এখনও বরফে ঢাকা, আর সরকার হ'তে যাত্রার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

* * *

পারসী কবিদের 'বেহেস্ত' এই কাশ্মীর মালভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় আশী মাইল ও প্রস্থে প্রায় পঁচিশ মাইল বিস্তৃত। পিরপঞ্জলের উত্তুঙ্গ শাখা (প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চে বানিহাল পাস দিয়ে অতিক্রম করতে হয়) কাশ্মীরকে ভারত হ'তে

বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তরে ও পূর্বে চির-তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের শৃঙ্গশ্রেণী, এইখানে নাম নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬৬০ ফুট)। পর্বতের অপর পার্শ্বে তিব্বত, চীন ও সোভিয়েট তুর্কীস্থান। উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঝিলাম অলস গতিতে এঁকেবেঁকে চলেছে পাকিস্তানের দিকে।

রাজধানী শ্রীনগর। অনেকের মতে ডাল হ্রদের পাশে অপূর্ব সুষমাময় এই ভূখণ্ডটি পাশ্চাত্যের ভেনিসের সঙ্গে তুলনীয়। ঝিলাম নদীতে নয়টি সেতু শ্রীনগরের উভয় তীরকে সংযুক্ত করেছে। জলে অসংখ্য সুসজ্জিত নৌগৃহ বা 'হাউসবোট' এবং ছোট ছোট নৌকা বা শিকারা টুরিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছে।

এ দেশের হাতের কাজ ও সূচীশিল্প অপূর্ব। লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্রশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। মাছ ও দুধ প্রচুর। কাশ্মীর সরকার কাশ্মীরের নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য এনে জমায়েৎ করেছেন সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে (Government Emporium)। উইলোর ক্রিকেট ব্যাট, দর্শনীয় নানাবিধ কাঠের কাজ, কাশ্মীর সিল্ক, পশমের উপর সূচীশিল্প, কার্পেট, জাফরান—হরেক রকমের খাঁটি মধু এখানে পাওয়া যাবে।

কাশ্মীরের প্রধান ফসল হ'ল, মাঠে ধান আর গাছে ফল—আপেল, আখরোট, খোবানি, নাসপাতি, সফেদা, মিষ্টিডুমুর, চেরী প্রভৃতি। এ ছাড়া যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হয় বাইরে থেকে। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, ডোগরা রাজপুত—মহারাজ করণ সিং। অধিবাসীরা বেশীর ভাগ মুসলমান।

করণ সিংহের পিতা হরি সিং বস্তুতঃ কাশ্মীরের শেষ স্বাধীন রাজা। ১৯৪৭ খৃঃ যখন হানাদারেরা হাজারে হাজারে পাকিস্তানের যোগসাজসে কাশ্মীরে ঢুকে প'ড়ল, হাতে শুধু কুড়ুল কাটারি ছোরা বর্শা নয়, বন্দুক ষ্টেনগান্ হ্যাণ্ডগ্রেনেড প্রভৃতি আধুনিকতম হাতিয়ার নিয়ে, তখন মহারাজ হরিসিংহের সাধ্য ছিল না তাদের বাধা দেবার। কারণ কাশ্মীরের সৈন্যসংখ্যা সামান্য। তাঁরা আপদে বিপদে বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভর ক'রে এসেছেন। আবার তাঁর সৈন্যদের অর্ধেক ছিল মুসলমান। বাধা দেওয়া দূরে থাক, কেউ কেউ হানাদারদের দলেই ভিড়ে গেল। কাশ্মীরের রাজ-সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। গ্রাম লুঠ ক'রে শস্যক্ষেত জ্বালিয়ে হানাদারদের দল এগিয়ে আসছে বিনা বাধায়, শ্রীনগর থেকে মাত্র ৬৫ মাইল—উরিতে এসে পৌঁছেছে। মহারাজ হরি সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির জন্য। নূতন ভারত সরকারের কাছে আবেদন 'কাশ্মীরকে রক্ষা করুন'। তারিখটাও মনে পড়ে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৭।

তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে হানাদার দলকে তাড়ানো হ'ল। বহু সৈন্য হতাহত হ'ল। ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রায়, ক্যাপ্টেন লাওনেল, প্রতীপ সেন প্রভৃতি বহু বীর প্রাণ দিলেন। তাঁদের রক্তে কাশ্মীরের 'আজাদী' টিকে রইল। আজ পাড়াগাঁয়ের চাষীও তাঁদের স্মৃতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'ওহি লোক হামকো বঁচায়া।' যাক, সে সব কথা এখনও ইতিহাসের পর্যায়ে পড়েনি। ঘটনা শেষ হলেও ক্ষত এখনও দগ্‌দগে রয়েছে। কাশ্মীরের পথে ঘাটে তা চোখে পড়বে।

শ্রীনগরের ডালহ্রদ এককথায় অপূর্ব। প্রকৃতিদেবী তাঁর সমস্ত সুষমা যেন এখানে ঢেলে দিয়েছেন। পাহাড়ের কোলে ডালের জলে যখন হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে,

তখন তার শোভা সত্যই অতুলনীয়। শত শত হাউসবোট অপেক্ষমাণ, শত শত শিকারা সুন্দর মখমলের গদী ও আস্তরণ নিয়ে যাত্রীদের জন্য প্রস্তুত। নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে ছোট ছোট নৌকা এক বোট থেকে অন্য বোটে যাচ্ছে। এখানেই নেহরু বাগ, করণ বাগ। পার্ক আর বাগানবাড়ী, রাত্রে রোশনাই-এর বাহার। জলের উপর শেওলা জমে জমে মাটি হয়ে গিয়ে ভাসমান বাগানে পরিণত হয়েছে। শ্রীনগরের ডালহ্রদ টুরিস্টদের একটি বিশেষ আকর্ষণের স্থান।

ডালহ্রদের পাশ দিয়ে চমৎকার রাস্তা চলে গেছে। যেতে যেতেই মোগল-উদ্যানগুলি চোখে পড়বে। শালিমার, নিশাতবাগ, চশমা-শাহি প্রভৃতি পাঁচটি বাগান নিয়ে মোগল উদ্যান—ফুলে ফলে সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। পাহাড়ে ঝরনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম জলাশয় ও ফোয়ারা করা হয়েছে। তার পাশে পাশে দেশী ও বিলাতী ফুলের সমারোহ। আর নানা রকম ফলের গাছ তো আছেই।

কাছাকাছি দুটি পাহাড় রয়েছে। শঙ্কর টিকলী—শিবের মন্দির, প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু। আর 'হরিপর্বত'। গতবৎসর শঙ্কর টিকলীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেখলাম।

শ্রীনগর ছাড়া পহেলগাঁও ও গুলমার্গ দুটি পার্বত্য শহর দর্শনীয়। ভেরীনাগ—ঝিলামের উৎপত্তি, অনন্তনাগ, কোকরনাগ, আচ্ছাবল প্রভৃতি দর্শকের আকর্ষণ-কেন্দ্র।

শ্রীনগরে তৃতীয় দিনে, আমরা সকলে পহেলগাঁও-এ উপস্থিত হলাম। বাস এখানে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। আমরা ৫।৬ জন একটি অনুচ্চ পাহাড়ে উঠে তৃণাসন অধিকার ক'রে বসলাম। চিন্তার স্রোত বয়ে চ'লল:

এই স্থান হতেই অমরনাথ-যাত্রার পথ, মাত্র ২৭ মাইল। কিছুদূরে চন্দনবাড়ী। এইখানেই স্বামীজীর ৺অমরনাথ যাত্রাকালে সিস্টার নিবেদিতার তাঁবু সকলের মধ্যে পড়ায় সন্ন্যাসিবৃন্দ বিষম আপত্তি জানালেন। নিজ শাবকের রক্ষণাবেক্ষণে মাতা যেরূপ অমিত শক্তিতে অগ্রসর হয়, স্বামীজী জ্বালাময়ী ভাষায় সকলের যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন। একজন নাগা সন্ন্যাসী স্বামীজীর ঐশীশক্তি উপলব্ধি ক'রে বললেন, 'স্বামীজী, আপনার শক্তি আছে জানি, কিন্তু অযথা তা ব্যবহার করা উচিত নয়।' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হলেন। বলা বাহুল্য স্বামীজীর যুক্তি সাধু-মণ্ডলী মেনে নিল এবং স্বামীজীও পরদিন হতেই নিবেদিতার তাঁবু পৃথকভাবে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

অদূরে প্রায় আঠার হাজার ফুট গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে পাঁচটি গিরিনির্ঝরের সঙ্গমস্থল পঞ্চতরণী। স্বামীজী এখানে তীর্থযাত্রীর আচার পালনপূর্বক আর্দ্রবস্ত্রে একের পর এক পাঁচটি গিরিতটিনীতে স্নান করেন। তারপরই চিরবাঞ্ছিত অমল ধবল, শ্বেত শুভ্র তুষারলিঙ্গ শ্রীশ্রীঅমরনাথ। দূর হতেই যেন সেই পবিত্র গুহা দৃষ্টিপথে পড়ে। আমরা মানসচক্ষে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। কৌপীন-মাত্রধারী ভস্মাচ্ছাদিত দেহে স্বামী বিবেকানন্দ গুহায় প্রবেশ করেছিলেন এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অচল অটল দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, '৺অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান করেছেন।' চিন্তাস্রোতে বাধা পেলাম নীচে হ'তে মাইকের আহ্বানে 'সময় হয়ে গেছে, চলে আসুন।' আমরাও আস্তে আস্তে বাজার ঘুরে বাসে এসে উঠলাম

ভ্রমণসূচীতে তিন-চারদিন বাদে 'উলার লেক ও ক্ষীরভবানী যাওয়ার কথা। আগের দিন থেকে মনটা আনচান করছে। সেই ক্ষীর-ভবানী? একান্ন পীঠের একটি পীঠস্থান? যাক অমরনাথ হ'ল না, তবু ক্ষীরভবানী তো দর্শন হবে। পরদিন সকলের আগেই বাসে গিয়ে সীট দখল ক'রে বসলাম।

শ্রীনগর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পশ্চিমে 'উলার' এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ হ্রদ। এর মধ্য দিয়েই ঝিলাম নদী পাকিস্তানের দিকে গতি পরিবর্তন করেছে। আমরা উলার লেক প্রদক্ষিণ ক'রে 'মানসবলে' খানিক বিশ্রাম নিলাম। দূরে পাহাড়ের সীমারেখার কোলে বিস্তৃত হ্রদের উপকূলে নাতি-উচ্চ ছায়াসমাচ্ছন্ন ঘাসের টিলা ও তার পাশে ডাকবাংলোটি সত্যই ক্লান্তিহারক, মনে 'বল'ই দেয়, সার্থক নাম 'মানসবল'। ক্ষীরভবানীতে পৌঁছলাম বেলা তিনটায়, বিশালবপু 'চেনার' গাছের ছায়া-সমাচ্ছন্ন বিরাট প্রাঙ্গণটি মনোরম। সবটাই পাথরে বাঁধানো। মধ্যস্থলে একটি প্রস্রবণ কুণ্ড-রূপে বাঁধানো। আতপ চাল, বাতাসা ও ফুলে জল বিকৃত বর্ণ ধারণ করেছে। তারই মাঝে দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির। দূর থেকেই দেবীকে পূজা ও ভোগাদি নিবেদন করতে হয়। চারি পাশে ইতস্ততঃ কিছু দোকান। দু-একজন সন্ন্যাসী বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বৃক্ষচ্ছায়ায় জপরত। এই কি সেই ক্ষীরভবানী, যা স্বামীজীর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত? এখানেই কি স্বামীজী দিব্যানুভূতি লাভ করেছিলেন? বারবার মুসলমানের আক্রমণে মন্দির দৈন্যদশাগ্রস্ত। স্বামীজী চিন্তা করছেন, 'আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বাধা দিতাম। কিছুতেই পবিত্র মন্দির ধ্বংস হ'তে দিতাম না।' সহসা দৈববাণী 'যদিই বা মুসলমানগণ পবিত্র মন্দির ধ্বংস ক'রে থাকে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' স্বামীজী বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরদিন আবার চিন্তা করছেন, 'যাই হোক, এখন আমি ভিক্ষা ক'রে অর্থসংগ্রহ ক'রব, আর জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার ক'রব।' আবার সেই দৈববাণী—'আমি কি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে সপ্ততল সোনার মন্দির তৈরী করতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে।' কর্ম-যোগীর ক্ষীণ আমিত্বের অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হ'ল। অজ্ঞানের পাতলা আবরণ যা মা-ই রেখে দিয়েছিলেন তাঁর কাজ করিয়ে নেবার জন্য, তা অপসৃত হ'ল। রইল মায়ের হাতের ক্রীড়নক শিশু বিবেকানন্দ; 'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র' মনে এই অপূর্ব ভাব শান্তি ও নিস্তব্ধতা নিয়ে ফিরলেন এক নতুন মানুষ।

মায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে, বৃক্ষতলে বসে কোন দৈব ইঙ্গিত খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হায়! এ কি বাতুলতা! কোথায় সে চক্ষুকর্ণ? কোথায় সে অনুভূতি?

সুসময়ের স্রোত দ্রুত বয়ে যায়। কাশ্মীরে দশটি দিন কেটে গেল— হর্ষ আনন্দ সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে। ৫ই জুন প্রত্যাবর্তনের পথে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাসে উঠে বসলাম। পথে অমৃতসর দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন এলাহাবাদ পাটনা হয়ে কলকাতায় ফিরলাম ১৫ই জুন। ঘটনা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতি পড়ে থাকে। কত নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়, কত নূতন স্থান দর্শন! অপরিচিতের কত ভয়, কিন্তু তখন মনে হয়—

'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।'

সমালোচনা

বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব (স্বপ্রকাশত্ব ও মিথ্যাত্ববিচার) : প্রণেতা—ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **প্রাপ্তিস্থান :** সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা—১৮৭+২০ ; মূল্য আট টাকা।

শাঙ্কর দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত ব্রহ্ম। ভগবান শঙ্করাচার্য উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে 'সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্রহ্মাত্মার একত্বে তাৎপর্য' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি সিদ্ধ আত্মার ভেদ ও জগতের সত্যত্বের সহিত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বিরুদ্ধ হওয়ায় লোকের শ্রুতির অর্থে আপাতপ্রতীয়মান 'জরদ্গব' প্রভৃতি উপাখ্যানের মতো সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভগবৎপাদ শঙ্কর বেদান্তদর্শনে প্রথমেই অধ্যাস বর্ণনা করিয়া দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন। দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের প্রায় সকল আচার্যই স্বকৃত গ্রন্থে—হয় প্রথমে জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়া পরে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ বা জীবব্রহ্মের একত্ব বর্ণনা করিয়া পরে তাহার উপপাদকরূপে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থটিও যে গ্রন্থ প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, সেই 'চিৎসুখী' গ্রন্থে প্রথমে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, অতএব তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ—ইহা প্রতিপাদন করিয়া সেই দৃক্স্বরূপ আত্মার সহিত দৃশ্যের ও দৃশ্যসম্বন্ধের আধ্যাসিকত্ব সাধনপূর্বক বিস্তৃতভাবে পরমতখণ্ডন সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। চিৎসুখী-গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। তাহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ও পরে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রথমে জ্ঞানরূপ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব স্থাপনে চিৎসুখীর প্রায় সকল কথাই এত সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকও একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে বেদান্তের রহস্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শুধু তাহাই নহে, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের পদার্থগুলি বুঝাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক পত্রের নিম্নে পাদটীকায় ন্যায়, বৈশেষিক, ভাট্ট, প্রাভাকর ও বেদান্তের বিষয়সকল পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নব্য বেদান্তে যে 'মহাবিদ্যা' অনুমানরীতি প্রচলিত আছে, তাহার আবিষ্কারক ও তাহার অর্থ বর্ণনা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে উহা যে নির্দোষ অনুমান নহে, তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়া ঐ অনুমান-খণ্ডনকারী 'ভট্টবাদীন্দ্রে'র ও তাঁহার 'মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে 'চিৎসুখী'র যে কয়েকটি বিষয় বুঝানো হইয়াছে, সেই সব বিষয়ে অদ্বৈত-সিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থের সমান প্রকরণের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ও দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ৭টি অধ্যায়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বপ্রকাশত্বের আবশ্যকতা, স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ ও প্রমাণ দেখাইয়া চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মাই যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে চিৎসুখীর দশটি পূর্ব-পক্ষাত্মক মিথ্যাত্বের লক্ষণ বুঝাইয়া দিয়া ন্যায়ামৃতেরও চারটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন। পরে অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিবৃত পাঁচটি সিদ্ধান্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ উল্লেখ করিয়া, তাহার চতুর্থটিকে চিৎসুখীর একাদশ সিদ্ধান্ত লক্ষণরূপে বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা ও নানাগ্রন্থের সমর্থনের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। অনন্তর অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধ্বের উৎপ্রেক্ষিত ছয়টি ব্যাঘাতাত্মক তর্কের আকার যাহা বিশ্লেষে দুইটি সুস্পষ্ট ও অবশিষ্ট চারিটি সূচিত, তাহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধির রীতি অনুসারে খণ্ডন করিয়াছেন। পরে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণের আলোচনা করিয়া পঞ্চম লক্ষণটিকে ও আনন্দবোধাচার্যের আবিষ্কৃত নির্দোষ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া মিথ্যাত্বের লক্ষণ-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের অনুমান-প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে চিৎসুখী-প্রদর্শিত মিথ্যাত্বের অনুমানে পূর্বপক্ষের কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাকালে অদ্বৈতসিদ্ধির অনেক কথা উল্লেখ করিয়া মিথ্যাত্বানুমানের দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব রূপ তিনটি হেতু অদ্বৈতসিদ্ধির রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের শ্রুতি-প্রমাণ সম্বন্ধে প্রথমে পূর্বপক্ষের বক্তব্য প্রদর্শন করিয়া শেষে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্তীর মত প্রতিপাদন করিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থে চিৎসুখীর যতটুকু অংশ আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা চিৎসুখী গ্রন্থের বা অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্যের বিষয়ীভূত পদার্থ সিদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তাহার কারণ দুরূহ বিষয়গুলিকে যথাসাধ্য সহজ ও নির্দোষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রায় কোন বিষয়ই অমূল বা অনপেক্ষিত বর্ণনা করেন নাই। কয়েকটি স্থলে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না, ভূমিকাতে একটি কথা অস্পষ্ট হইয়াছে।

২০ পৃষ্ঠায়—দণ্ডকে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের প্রতি কারণ এবং ঐ পৃষ্ঠায়—ঘটাবয়ব-প্রত্যক্ষের প্রতি সংযুক্ত সমবায়কে সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। ৬৭ পৃঃ—'কারণ অনুভূতি যদি অনুভাব্য হয়, তাহা হইলে সেই অনুভাব্য অনুভূতিও আবার অনুভাব্য হইবে।' নিম্নরেখ অনুভাব্য স্থলে 'অনুভাবক' হওয়াই উচিত।

৭৫ পৃঃ ৫।৮।১৪ পঙ্‌ক্তিতে তিনটি স্থলে 'অনুভূতিরূপ হেতুটি' না হইয়া 'অনুভূতিত্ব-রূপ হেতুটি' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূমিকায় প্রথমে বলা হইয়াছে 'বেদান্তদর্শন তিনটি প্রমাণের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ধারিত করিয়া থাকে—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব।' কিন্তু শ্রুতি শব্দপ্রমাণ, যুক্তি অনুমানপ্রমাণ—ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। অনুভবকে কি প্রমাণ বলা যায় অথবা প্রমা বলা যায়? যদি বলা যায় ভাষ্যকার 'শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ' ইত্যাদি বাক্যে অনুভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—ভাষ্যকার 'যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্‌' এই কথা বলিয়া অনুভবকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু 'অনুভব বস্তুতত্ত্ব নির্ধারিত করে' ইহা বলেন নাই। বস্তুতত্ত্বের নির্ধারণই অনুভব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানি উপাদেয় বলিয়াই মনে হইল এবং ইহার দ্বারা গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান অনুমিত হইল। এই জাতীয় বেদান্তগ্রন্থ বাংলা ভাষায় যতই প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। ইতি শম্‌।

—মেধাচৈতন্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা: প্রবোধচন্দ্র সেন। প্রকাশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স। পৃঃ ১৮৮; মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মনীষী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে এই আলোচনাসংগ্রহটি সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণীয়। লেখক স্বয়ং বাংলাদেশের অন্যতম চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্—সেইজন্যই এ গ্রন্থ আমাদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভূরিপরিমাণ আয়োজন সত্ত্বেও স্বল্পপরিমাণ শিক্ষার সার্থকতা লক্ষ্য ক'রে দেশবাসীকে মাতৃভাষায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, সে আবেদনে আজ পর্যন্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। তার কারণ, শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আজও চিন্তায় ও কর্মে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারিনি। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হ'লে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা দ্রুত অগ্রসর হবো—এমন একটা ধারণা রামমোহন রায় থেকে আধুনিক কাল অবধি চলে আসছে। তার ফলে এই দেড়শ' বছরের মধ্যে এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক-জনায় দাঁড়িয়েছে—সে তো সকলের জানা। অপরপক্ষে জাপানে সর্ববিধ বিদ্যা মাতৃভাষায় বিতরিত হওয়ার ফলে একটি জাতি কত দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে—তাও আমরা জানি। আসল কথা, চিন্তার রাজ্যে আমাদের উভয়সঙ্কট। ইংরেজী না শিখলে ভালো চাকরি হয় না, মাতৃভাষায় না শিখলে ভালো শিক্ষা হয় না। এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য সাহস যতদিন না জাতীয় চিত্তে দেখা দিচ্ছে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু মাতৃভাষায় সর্বস্তরের জ্ঞানসাধনা প্রকাশিত না হওয়া অবধি শিক্ষার মুক্তি নেই, একথা নিশ্চিত। শ্রদ্ধেয় লেখক বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি, সাহিত্যের মুক্তি—এই কয়টি প্রবন্ধে শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের উপযোগিতা নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। আন্তঃপ্রাদেশিকতা বা বহির্বিশ্বগত কারণে বিদেশী ভাষাকে চিরকাল শিক্ষার বাহন ক'রে রাখা যায় না। যে জাতির নিজস্ব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র সাহিত্যিক কারণে সেই জাতির ভাষাকে বিশ্ববাসী বেশীদিন শ্রদ্ধা করতে পারে না। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির মতো আত্মনির্ভরশীল ভাষাই যথার্থ সম্মানের অধিকারী। শোভন প্রচ্ছদ ও সুন্দর মুদ্রণে এই প্রবন্ধসঙ্কলনটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি: শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক: বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। পৃঃ ৫৫২; মূল্য টাকা ১২·৫০।

পদাবলী-সাহিত্যের ত্রয়ী কবিগুরু জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—সংস্কৃত, মৈথিলী ও বাংলা—এই তিনটি সাহিত্যে চিরন্তন সম্পদ্ দান ক'রে গেছেন। চৈতন্য-সাধনার অগ্রচারণ এই তিন মহাকবির রচনা ও ভাবনার পরিমণ্ডলে সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য বিধৃত। সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য-সৃষ্টিকে বাংলাদেশের জনমানস একান্ত আপন বলেই গ্রহণ করেছে। চণ্ডীদাস নানা নামের ধাঁধায় আচ্ছন্ন হলেও প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর কাব্যমাধুর্য সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই। বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলি কবি-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বাংলা পদাবলীর রচয়িতাদের আদর্শ চণ্ডীদাস। এইভাবে বৈষ্ণব-

সাহিত্যের সূচনা ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস আজ সাহিত্যপাঠকদের কাছে সুবিদিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার পর থেকে বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা অনেকেই করেছেন,—কিন্তু এ সব আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষাপ্রশ্নের সম্ভাবিত উত্তর, নয়তো স্তুতিমূলক আলোচনায় সুন্দর উদ্ধৃতির সমাবেশ। কাব্য-বিশ্লেষণের জন্য যে কবি-মনের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এ সব আলোচনায় তার একান্ত অভাব। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সেই অভাব পূরণ ক'রে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিভাগটি সমৃদ্ধ করেছে। সন তারিখ নিয়ে বিবাদ ক'রে তিনি কাব্যাস্বাদে অন্যমনস্ক নন, অথবা কাব্যের ক্ষেত্রে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সরল-রেখা টানবার অসাধ্য সাধন তাঁর ব্রত নয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদামৃত-সমুদ্রে নিজে অবগাহন ক'রে পাঠকের জন্যও তিনি সেই সিন্ধুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন। অনুভূতি-সমুজ্জ্বল তাঁর ভাষা মনীষীদের মতো নিজেই আলোক হয়ে পাঠকচিত্ত আলোকিত করে।

চণ্ডীদাসকে অধ্যাত্ম অনুভূতির কবি এবং বিদ্যাপতিকে পার্থিব প্রেমের কবি ব'লে যে ভাগ তিনি করেছেন—সে বিভাগকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া কঠিন। বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের (বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যে নিশ্চিত পৃথক্—এমন প্রমাণ নেই) রচনা-হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে মনে রেখে এ কথা বলছি। বিদ্যাপতির পদেও ক্ষণে ক্ষণে প্রেম পূজা হয়ে উঠেছে, এমন উদাহরণ আছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যবিশ্লেষণে যে নিপুণ বিচারবুদ্ধি ও রসজ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় লেখক দিয়েছেন, সেজন্য আন্তরিক সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য।

বাংলাসাহিত্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—বিশেষভাবে বিদ্যাপতির—পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াসরূপে এ গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালের উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

(১) অবতার-রহস্য (২) পুরাণ-রহস্য—শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীশিবধন মুখোপাধ্যায়, 'রামতীর্থ', মণিরামপুর, বারাকপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৩০ ও ১৪; মূল্য ছয় আনা ও চার আনা।

সম্প্রতি কোন কোন লেখক 'পুরাণ অবতার প্রভৃতি অমান্য' এই মর্মে পুস্তক রচনা করিতেছেন, এবং পুরাতন কুসংস্কার দূর করিতে বলিয়া স্বরচিত নূতন কুসংস্কারে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে বলেন। আলোচ্য পুস্তিকা-দুইটি তাহারই উত্তর-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণের কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া জন-সাধারণের নিকট বেদ ও উপনিষদের সনাতন সত্যের বাণীই সহজ সরলভাবে পরিবেশিত। শত শত সাধক সিদ্ধ ঋষিমুনি ও মহাপুরুষের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুরাণগুলি।

শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সুধী গ্রন্থকার তাহা 'অবতার-রহস্য' ও 'পুরাণ-রহস্য' পুস্তিকা-দুইটিতে যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া অর্বাচীন মত যথাযথভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। লোককল্যাণ ও ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে অবতার-লীলারহস্য প্রকাশ করিবার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। পুস্তক-দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও তথ্যপূর্ণ এবং বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ।

পাথেয়—ডাঃ বিজয়বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, ২৩নং ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা ১৪। ৭৫টি উপদেশ সংকলিত হয়েছে এই পকেট সাইজ বইটিতে।

A Yankee and the Swamis : John Yale [জনৈক মার্কিন ও স্বামীজীবৃন্দ—জন ইয়েল] প্রকাশক : জর্জ এলেন এণ্ড আনউইন, মিউজিয়ম স্ট্রীট, লণ্ডন। মূল্য—পঁচিশ শিলিঙ্‌।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময়ের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য দেশ ধর্মসাধনায় পাশ্চাত্যের গুরুস্থানীয় হবে এবং পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য তথা ভারতভূমি শিখবে কর্মকৌশল। এইভাবে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবসভ্যতা গড়ে উঠবে—এই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। পাশ্চাত্য দেশে ভারতের ধর্মসাধনার ক্রমপ্রসারের কাহিনী নানাসূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে,—সে সবই ভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা। এই প্রথম একজন ইয়াঙ্কি বা আমেরিকানের চোখে সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে আমেরিকার প্রাণসংযোগটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। এর আগে প্রকাশিত Vedanta for the Western World এবং Vedanta for Modern Man বই-দুটিতে বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার সংযোগের পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই আমেরিকা-আগত তীর্থঙ্করের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান তীর্থগুলির যে ছবি ধরা দিয়েছে, তার একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে। নিছক তত্ত্ব নয়, অধ্যাত্ম-পিপাসু মানবসমাজের যে গোষ্ঠীগত নিজস্ব জগৎ রয়েছে, সেই জগতের প্রাণোজ্জ্বল বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই শ্রীইয়েলের কৃতিত্ব। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীইয়েল আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রের অন্যতম ত্যাগী কর্মী (প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর সঙ্ঘগত নাম দেওয়া রয়েছে—ব্রহ্মচারী প্রেমচৈতন্য), কিন্তু তিনি শুধুমাত্র সঙ্ঘের সভ্যরূপেই এ গ্রন্থ রচনা করেননি। পাশ্চাত্য দর্শকের চোখে যে বিস্ময় থাকে, তাও এ গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু কোথাও অনাবশ্যক হিতোপদেশ নেই। ভারতবর্ষকে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মধ্যে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই পরিচয় নিয়েই এ গ্রন্থ ভারতবাসীর সাগ্রহ সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠেছে। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনের সময় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মস্থান কামারপুকুর-দর্শনে লেখকের তীর্থযাত্রার সার্থক সাহিত্যরূপ পাঠককে মুগ্ধ করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (আলোচনা) : ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ কর্তৃক আলোচিত। শ্রীঅন্নদা সেবাশ্রম, পলাশী, পোঃ মাঝিপাড়া, ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত। ২য় ও ৩য় ভাগ একত্রে পৃষ্ঠা ৬৪ ; মূল্য ১৲। ৪র্থ ও ৫ম ভাগ—মূল্য ১৲।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র ভাষা এমন সরল যে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী যত আলোচিত হয়, ততই ভাল। আলোচ্য বই-দুটিতে 'কথামৃত' থেকে বিশেষ বাণী উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা স্থানে স্থানে সুন্দর, কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ কেন করা হয়েছে, তা বোঝা গেল না। ৫ম ভাগের শেষের দিকে স্বপ্নবিষয়ক এমন অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট, যা নিষ্প্রয়োজন ব'লে মনে হয়।

Viveka (The Vivekananda College Magazine, March, 1961) : Edited and Published by Sri K. Vasudevan, Professor, Vivekananda College, Mylapore, Madras. Pp. 73 + 19 + 22.

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজ ম্যাগাজিন 'বিবেক'-এর এই সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত ইংরেজীতে ৩৬, হিন্দীতে ৫, সংস্কৃতে ৭, তামিলে ১১ এবং তেলুগু ভাষায় ১০টি সুনির্বাচিত রচনা মুদ্রিত। কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'The Legacy of Rabindranath Tagore', 'Dr. Albert Einstein', 'Taoism', 'Science versus Religion', 'বিশিষ্টাদ্বৈত-'দর্শনম্' 'অদ্বৈতদর্শনম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৫শে জুলাই স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দ (শশী মহারাজ) লখনৌএ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি নানা জটিল রোগে ভুগিতেছিলেন।

১৯২৫ খৃঃ হবিগঞ্জে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খৃঃ সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী মনীষানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১লা অগস্ট অপরাহ্ণ প্রায় চার টার সময় স্বামী মনীষানন্দ (মতি মহারাজ) বেলুড় মঠে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বাহ্ণে স্নান সারিয়া তিনি জপে বসিয়াছিলেন, এমন সময় মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হন এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

স্বামী মনীষানন্দ ১৯১৬ খৃঃ ২৩ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন-অনুষ্ঠিত বন্যা-ও দুর্ভিক্ষ-রিলিফে তাহার সেবা-কার্য উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সেবক ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বন্যার্ত-সেবা

সুরাট ঃ গত ১৯৫৯ খৃঃ সেপ্টেম্বরে তাপ্তী নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্যায় সুরাট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বন্যায় জনসাধারণের দুঃখের পরিসীমা ছিল না; বহু বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন হয়, অনেক মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে, বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র হইতে '৫৯ সেপ্টেম্বর হইতে '৬১ ফেব্রুআরি পর্যন্ত বন্যার্তদিগের সেবা (relief) করা হয়। বিভিন্ন তালুকের গ্রামে গ্রামে আর্থিক সাহায্যের সহিত খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও কম্বল বিতরণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি তালুকেরই (Taluka Chaurasi) ৩৮টি গ্রামে ৬,১০৮ পরিবারে (৩১,৮০৭ লোককে) ৪,২২২ ধুতি, ৪,৪৯৬ শাড়ি, ৮,১১৮ জামা, ৫,৪৬৪ কম্বল ও ১,২২,২৮৯'৭৩ টাকা দেওয়া হয় এবং খাদ্যাদি বাবদ ১৩,৯৬০'৪২ টাকা ব্যয় করা হয়। এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছয় লক্ষাধিক টাকা। অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল-গুলিতে ১২টি কলোনি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। কলোনিগুলিতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণের সমবেত প্রার্থনা-গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঞ্জোর ঃ মাদ্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলা বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেখানে মিশন হইতে সেবাকার্য শুরু হইয়াছে; আগামী মাসে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ Manager, Ramakrishna Math, Madras 4.

কার্যবিবরণী

পাটনা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) পাইয়া আমরা আনন্দিত। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে ২৮১টি আলোচনা হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪৬ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর। ছাত্রাবাসে ২৮ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জনের সম্পূর্ণ খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসের একজন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে

তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের ৫,৮৭৩ পুস্তকের মধ্যে নূতন সংযোজন ৩৪১। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৭৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। পাঠক-সংখ্যা ও গৃহীত পুস্তক-সংখ্যা যথাক্রমে ২৭,০০০ ও ১১,৪৪৫। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের বিশেষ করিয়া স্থানীয় ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে—বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বারা সাধারণের উপযোগী ধর্ম- ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক বিভাগে যথাক্রমে ৮১,৪৩৪ (নূতন ৯,৩০২) ও ৬৬,৬৩০ (নূতন ৯,৫৬৫) রোগী চিকিৎসিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়:

মার্চ ঃ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য; কে জানে, তুমিও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হইতে পার; হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রয়োগ; মনের রাজপথ ও নিভৃত পথ; বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম; জীবন, মৃত্যু ও জ্ঞানালোক; শব্দ-প্রতীকের মাধ্যমে ধ্যান; 'জগৎমিথ্যাত্ব' সাধন; শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এপ্রিল ঃ পুনরুজ্জীবন ও পুনরবতরণ; ধ্যান এবং শরীর মন ও আত্মার উপর ইহার প্রভাব; মানুষই অলৌকিক; অহংকার ও আত্মা; মনকে কিরূপে শান্ত করা যায়; আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার অদ্বৈত বেদান্ত; অবচেতন মন দ্বারা কি করা যাইবে? পবিত্র জীবনের জন্য সাধনা; বুদ্ধ ও খৃষ্ট।

মে ঃ ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি; আধ্যাত্মিক জীবনের দুঃখ ও আনন্দ; পূজা ও প্রার্থনা; কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম; বিশ্বশান্তির উপায়; কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়; সাধু, ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মানব ও অবতার পুরুষ; ঈশ্বর কি নির্লিপ্ত? স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে

কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে: প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত-ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

স্বামী মাধবানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতিজড়িত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park on the St. Lawrence river) স্বামী মাধবানন্দজী ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। এখন যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রত্যহ এক মাইল বেড়াইতে পারেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি নিউইয়র্ক শহরে ফিরিবেন—এইরূপ আশা করা যায়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা-সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন

ত্রিচুর: গত মে মাসে ত্রিচুরে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজসেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত শ্রীসারদা-সঙ্ঘের চারদিবসব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি, সভ্যা এবং মহিলা সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষিকা, চাকরিজীবী ও গৃহী ভক্তেরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্যনামে এই সম্মেলনে সমবেত হন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মেনন সকলকে স্বাগত জানান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী পাঠ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী হাকসার সঙ্ঘের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে পর শ্রীমতী মহাদেবী উদ্বোধন-ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করেন। সভানেত্রীর ভাষণে ডাঃ ইরাবতী বলেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সারদাদেবীর আবির্ভাব এবং তাঁর পুণ্য জীবনকে জানিবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইতেছে। ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী তপস্যানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন।

ডাঃ ইরাবতী ১৯৬১-৬২ খৃঃ জন্য সঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্বামী ভূমানন্দ তীর্থ শঙ্করাচার্য ও গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডাঃ ইরাবতী ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে দিল্লীর শ্রীমতী বালম্‌ বলেন যে, সমাজ-সেবাকে আত্মবিকাশ ও আত্মমুক্তির উপায়-হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ত্রিবান্দ্রামের শ্রীমতী লীলা আম্মা ভারতের সাধিকা-দের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রতিদিনই অধিবেশনের শেষে ভজন, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

কুমিল্লা: গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। সভায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ (সভাপতি) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুন্দর বক্তৃতা দেন।

সচিত্র টেলিফোন

আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ্ 'ছবিসহ টেলিফোন' উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই টেলিফোন ব্যবহারকারীরা কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সহিত কথা কহিবেন, তাঁহার ছবিও দেখিতে পাইবেন। এই প্রণালীর টেলিফোনে ডাকটিকিটের সাইজের মতো ছোট ছবি দেখা যাইবে। টেলিফোনের সঙ্গে একটি ছোট ক্যামেরা এবং ছবির একটি ছোট নল লাগানো থাকিবে। যে ব্যক্তির সহিত কথা বলা হইবে, তিনি যদি অদৃশ্য থাকিতে চান, তবে তিনি তাঁহার মাথা এমনভাবে সঞ্চালন করিবেন, যাহাতে তাঁহার ছবি পড়িবে না। যদি উভয় ব্যক্তিই পরস্পর অদৃশ্য থাকিতে ইচ্ছুক হন, তবে ছবির যন্ত্রটি ব্যবহার না করিলেই হইল। টেলিফোনে ছবি-প্রেরণের যে কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু 'বেল' ইঞ্জিনিয়ররা সন্তুষ্ট নন, এবিষয়ে আরও উন্নতির জন্য তাঁহারা গবেষণা চালাইতেছেন। (সঙ্কলিত)

আণবিক পরীক্ষার কুফল

ইউনাইটেড নেশনের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯৪৬ খৃঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে সব স্থানে একটির পর একটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইয়াছিল, তাহাদের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের রুগ্‌ণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও বলিভিয়ার প্রতিনিধিবর্গ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বিবরণী দিয়াছেন। রঞ্জল্যাপ দ্বীপের বহু অধিবাসীর অভিযোগ যে, তাহারা এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি নানাপ্রকার কঠিন রোগে ভুগিতেছে। তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি, অবসন্নতা, গাত্রবেদনা, পাকস্থলীর রোগ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রঞ্জল্যাপ দ্বীপে অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় বহু শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মৃত অবস্থায়ও অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। (সঙ্কলিত)

ভ্রম-সংশোধন

(১) গত আষাঢ় সংখ্যার উদ্বোধনে ৩১০ পৃষ্ঠায় ২৫ লাইন পরে পড়িবেন :

অন্য পদগুলির সমস্তই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত। 'কৃপাকণা' শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন, সন্ধির নিয়মে বিসর্গের লোপ হইয়াছে। 'তে' অর্থাৎ তব, 'সংসারে' সপ্তমীর একবচন।

(২) শ্রাবণের উদ্বোধনে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির নাম পড়িবেন : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।



প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৫



দেবীসূক্ত

[বাগাম্ভৃণী ঋষি, পরমাত্মা (আদ্যাশক্তি) দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দঃ]

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥

[ঋগ্‌বেদ—১০।১০।১২৫]

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ আত্মোপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন:

আমি ঈশ্বরী।
রুদ্র বসু আদিত্য
ও বিশ্বদেব যত,
সবারে চারণ করি।

আমি ঈশ্বরী।
মিত্র-বরুণেরে—
ইন্দ্র অগ্নি আর অশ্বিনীকুমারে,
আমিই ধারণ করি ॥ ১ ॥

আমি ঈশ্বরী।
শক্রম্ন সোমেরে—
ত্বষ্টা পূষা
আর ভগদেবতারে,
আমিই ধারণ করি।
আমি যজ্ঞেশ্বরী।
হবিষ্মান্
যে যজমান,
আমি করি তার
যজ্ঞফল দান ॥ ২ ॥
আমি ঈশ্বরী,
আমি রাজ্ঞী।
আমি সবাকার ধনদাত্রী,
যাগকারীদের আমিই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞাত্রী।
বহুভাবে আমি
সর্বভূতে প্রবিষ্টা,
দেশে দেশে আমি
দেব-নর-বন্দিতা ॥ ৩ ॥
যা কিছু মানব করে ভক্ষণ,
দর্শন, শ্রবণ কিংবা প্রাণের স্পন্দন—
আমি সবারই বিধাত্রী।
ঈদৃশী আমারে জানে
যারা ব্রহ্মপথযাত্রী।
এইরূপ জ্ঞানে যারা নহে জ্ঞানবান্,
সংসারে তারাই হীন—
চিরভ্রাম্যমাণ।
হে মোর বিশ্রুত সখা,
শ্রদ্ধালভ্য এই আত্মজ্ঞান
শোন আমি করি তার
উপদেশ দান ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ,
মনস্বী মানবগণ,
শ্রদ্ধায় যে ব্রহ্মতত্ত্ব
করেন পালন,
শোন সখা বলি সেই
অধ্যাত্ম কথন;
আমি ইচ্ছা করি যারে
শ্রেষ্ঠ আমি করি তারে—
কেহ ব্রহ্মা, কেহ ঋষি,
কেহ বা মনীষী ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মদ্বেষী অসুরেরে
করিতে নিধন,
রুদ্রের ধনুতে আমি
করি জ্যা-রোপণ।
জনকল্যাণে
আমি সংগ্রামকারিণী,
ভুবনে ভুবনে
প্রতি বস্তু সনে
আমি অন্তর্যামিনী ॥ ৬ ॥
ঊর্ধ্ব আকাশের
আমি প্রসবিত্রী,
যোনি মোর
সমুদ্র-সলিল-মধ্যবর্তী।
ঈদৃশী যে আমি—
ভুবনে ভুবনে অনুপ্রবিষ্টা,
সকল বস্তুতে
কারণরূপে আমি সংস্থিতা।
ঊর্ধ্বস্থ ঐ স্বর্গলোক যত
আমারই মায়ায় তারা বিস্তারিত ॥ ৭ ॥
বায়ুসম আমি
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
ভূতজাত কার্য যত
করি উৎপাদিত।
সৃজি দ্যৌ পৃথিবীরে
এ দুয়ের পরপারে
মহিমা-প্রদীপ্ত আমি
ঈদৃশী সংস্থিত ॥ ৮ ॥*

*অনুবাদ: শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

কথাপ্রসঙ্গে

'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'

'চণ্ডী'র অপর নাম 'দেবীমাহাত্ম্য'। 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী'—তাহাতে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য। পূজার বিবিধ উপকরণ বিচিত্র আয়োজন তখনই সার্থক হইবে—যখন সেগুলির সহিত দেবীর স্মরণ মনন কীর্তন সমন্বিত এই 'দেবীমাহাত্ম্য' পঠিত হইবে, ভক্তিভরে শ্রুত হইবে। দেবী নিজেই বলিতেছেন: (চণ্ডীর অন্তর্গত) এই স্তবগুলির দ্বারা যে আমার স্তুতি করে, আমি তাহার সকল বাধা দূর করিয়া দিই! (চণ্ডীতে বর্ণিত) আমার তিনটি চরিত্র যাহারা কীর্তন করে, যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদের পাপতাপ দূরীভূত হয়, সর্ববিধ ভয় তিরোহিত হয়।

চণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবতী-মুখে এই আশ্বাসবাণীই একদিন আশ্বস্ত করিয়াছিল স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেবতাগণকে; যুগ যুগ ধরিয়া এই আশ্বাসবাণীই আশ্বস্ত করিতেছে স্বাধিকারে বঞ্চিত দুর্বল জনগণকে, তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সকল শুভশক্তি সম্মিলিত করিয়া অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার সংগ্রামে।

চণ্ডী ইতিহাস না পুরাণ, রাজনীতি না সমাজনীতি—সে আলোচনা না করিয়াও এইটুকু বলা যায়, ইহার মধ্যে রহিয়াছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্তিলাভ করিবার রহস্য, শান্তি লাভ করিবার উপায়। চণ্ডীতত্ত্ব প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, কারণ দেহমনের সমস্যা লইয়াই আমাদের যত কিছু সংগ্রাম। দেহমনের মধ্যেই রহিয়াছে নানা শুভাশুভ শক্তি, তাহাদের সংগ্রামই পুরাণে বর্ণিত দেবাসুর যুদ্ধ! কর্মময় রজোগুণ দ্বারা ভ্রম ও আলস্যপূর্ণ তমোভাব জয় করিতে হইবে, সকাম কর্মের চঞ্চল স্তর অতিক্রম করিয়া তবে নিষ্কাম শান্ত সত্ত্বে প্রতিষ্ঠা, সেখানেই শুরু হয় গুণাতীত হইবার ঊর্ধ্বতর সাধনা!

প্রথমে দেবী তমোময়ী প্রসুপ্তা মহাকালী—'হরিনেত্রকৃতালয়া', বোধনমন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া তিনি মঙ্গলময় পালনীশক্তির আধার বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর মাধ্যমে সুখদুঃখ দ্বন্দ্ববোধরূপ দুই দুষ্টশক্তি পরাভূত করিয়া সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন।

পরবর্তী স্তরে রজোগুণের লীলা—দম্ভ দর্প ও ক্ষমতাপ্রিয়তার প্রতিমূর্তি মহিষাসুর—অর্ধপশু! তাহার নিধন জন্য দেবগণের সম্মিলিত শক্তি মহালক্ষ্মী দশপ্রহরণধারিণীরূপে প্রকটিতা! অপূর্ব সংগ্রামে সেই পশুভাব নির্জিত করিয়া বিজয়িনী সাক্ষাৎভাবে দেবগণের স্তব শ্রবণ করিয়া, পূজা গ্রহণ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'যখনই তোমরা বিপদে পড়িবে আমাকে ডাকিও।' যখনই তাঁহাকে ভুলি, তখনই আমরা বিপদে পড়ি, তখনই অসুরশক্তি মাথা চাড়া দেয়।

তৃতীয় চরিত্রে শুরু হয় রজোগুণের শেষ লীলা মানবিক স্তরে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ বাসনার শতকোটি অশুভশক্তিকে ধ্বংস করিতে দেবী এবার নিজস্বরূপশক্তিতে আবির্ভূতা। অদ্ভুত অভূতপূর্ব যুদ্ধের শেষে কল্যাণশক্তি কল্যাণী অকল্যাণের যাবতীয় শক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া আবার দাঁড়াইলেন দেবতাদের পূজাগ্রহণের জন্য—এবার নারায়ণীমূর্তিতে গুণাতীতা অথচ ত্রিগুণময়ী অপরূপ মূর্তিতে!

যিনি অরূপ তাঁহারই অশেষ রূপ, আমরা তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করি 'রূপং দেহি'—দেখা দাও তোমার অপরূপ অশেষরূপে! যিনি সর্বশক্তির ঘনীভূতা মূর্তি সর্বশক্তিস্বরূপিণী আমরা তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করি 'জয়ং দেহি'। আমরা জানি এই জীবন সংগ্রাম, আরও জানিয়াছি, অন্তরের শক্তি দ্বারাই আমরা জয়লাভ করিব এই জীবন-সংগ্রামে। তাই সেই অন্তর্যামিনী মহাশক্তির কাছে আমরা প্রার্থনা করি: 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'।

অজানা দেবতা*

স্বামী বিবেকানন্দ

১

অন্ধকার নিরালার বিসর্পিল পথে
ক্লান্তপদে
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভার-নত
চলেছে পথিক।
হৃদয়ের মননের কোন প্রান্ত হ'তে
কোথাও মেলে না প্রাণে
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন।
অবশেষে একদা যখন
লুপ্তপ্রায় সীমারেখা
ভালোমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের—
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তার।
কোন্ উৎস হ'তে এলো অচেনা এ আলো—
কিছুই তো জানে না সে।
তবুও জানালো সেই আলোক-ঈশ্বরে
তার প্রাণের প্রণাম।
অজানা আশার বাণী
ব্যাপ্ত হ'ল সমগ্র সত্তায়,
স্বপ্নাতীত মহিমায়
পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভুবন,
সে ভুবন পার হয়ে আভাসিল আর এক জগৎ।
বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল—
'অন্ধ এ বিশ্বাস।'
সে আলোর দীপ্ত কান্তি অনুভব করি'
বলিল সে নম্র প্রত্যুত্তরে,
'ধন্য মানি এ অন্ধবিশ্বাস।'

২

স্বাস্থ্য শক্তি সম্পদের সুরামত্ত
আর এক পথিক,
জীবনের ঘূর্ণস্রোতে ছুটে চলে
উন্মাদের মতো,
অবশেষে একদা যখন
এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন
খেলার পুতুল যত
কীটসম মানুষের দল,
নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলো
দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে,—ইন্দ্রিয় অবশ,
সুখদুঃখ একাকার, অনুভূতিহীন;
প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা
শবসম লগ্ন হয়ে থাকে দুই বাহুপাশে,
যত সে ছাড়াতে চায়,
তত তার বক্ষ জুড়ে আসে;
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বহুরূপে
মৃত্যুরে সে চায়,
ফিরে আসে আর বার মুগ্ধ আকর্ষণে।
তারপর একদিন
দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে—
হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন,
বেদনায়, অশ্রুধারে, মর্মযন্ত্রণায়—
আত্মীয়তা ফিরে পেল নিখিলজনার।
হাসে বন্ধুজনা।
শুধু তারি কণ্ঠে জাগে সকৃতজ্ঞ বাণী:
'ধন্য এ বেদনা'।

* স্বামী বিবেকানন্দের Angels Unawares-কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।

৩

সুন্দর সুঠাম দেহ,
শুধু মন তার শক্তিহীন—
দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে,
অমোঘ-প্রবৃত্তি-স্রোত
রুদ্ধ করা অসাধ্য তাহার।
সংসারে সবাই তারে—
সদাশয়, ভালো ব'লে জানে।
পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে।
দূর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে—
সংসার-তরঙ্গসাথে বৃথাযুদ্ধে রত
নরনারী যত।
দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মত
কেবলি ক্লেদাক্ত দেখে সকল সংসার
সব গ্লানিময়।
তারপর একদা কখন,
সহসা সৌভাগ্যসূর্য দেখা দিল হেসে,
তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন।
সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।

বুঝিল সে : নিয়ম ভাঙে না কভু
তরু ও প্রস্তর,
তবু তারা প্রস্তর ও তরু হ'য়ে থাকে।
নিয়মবন্ধন হ'তে উর্ধ্বে এসে
সংগ্রামসাধনা দিয়ে
ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয়—
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে।
চিত্তের জড়তা ঘুচি' নবীন জীবন
হ'ল মুক্ত, প্রসারিত—
সংগ্রামসমুদ্রপারে যে অনন্ত শান্তি বিরাজিত
তাহারি আলোক-রশ্মি
উদ্ভাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়।

পশ্চাতে রয়েছে পড়ি'
অতীতের অকৃতার্থ নিষ্ফল জীবন,
তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন,
আর একদিকে তার স্খলনপতন,
যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার।
সানন্দ-অন্তরে তবু
ধন্য মানি এ অধঃপতন
ঘোষিল সে : 'ধন্য এই পাপ।'

চলার পথে

'যাত্রী'

গঙ্গার তীরে বসে আছি। পিছনেই মন্দির—বেশ নামকরা মন্দির। মন্দিরের একপাশে মঠ—বহু সাধুর সমাবেশ। বৈকালে এবং সন্ধ্যার কিছুটা পর্যন্ত এ-ধারে লোকসমাগমও মন্দ ছিল না; এখন কিন্তু চৌদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সুমুখের ঐ চিরপ্রবাহিণী জাহ্নবীর দিকে তাকাচ্ছি—মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে পড়া বই-এর কয়েকটি ছত্র—'আমগাছে বোল আসে রাশি রাশি—ফল হয় কটা? ঝরে-পড়া মুকুলের মতো নিষ্ফলতাই কি আমাদের জীবন?'

প্রশ্নটা বারে বারে মনকে খোঁচা দেয়। দীর্ঘায়ত নদীর দিকে তাকিয়ে তার উত্তর খুঁজি—কিন্তু সন্ধ্যার অলস মুহূর্তগুলি কিছুতেই চিন্তাকে প্রসারিত হ'তে দেয় না। কেবল সুমুখের ঐ মায়াময় স্রোতপ্রবাহ এক মর্মরিত অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আমার দেহ-মনকে কি এক অতল সুধারসে ভরিয়ে তোলে। উদাস বাতাস মাঝে মাঝে তার দমকা ধাক্কায় প্রাণকে নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুললেও সঠিক চেতনা ফিরিয়ে দিতে পারে না। অভিনব স্বপ্নরাজ্যের ঘোর আর তাই কাটে না। সময় শুধু বয়ে যায়।

আবার তাকাই জলপ্রবাহের দিকে। মনের আকাশের সঙ্কুচিত ভাবনার রঙ বদলায়। নদীর চিরন্তন প্রবহমানতায় সহজাত এমন কিছু আছে, যার ছোঁয়ায় আমার সুমুখের এই নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্তিমিত পটভূমি হঠাৎ এক ভাবের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার সান্নিধ্যে তখন আবার চেতনা ফিরে পাই—চিন্তার ফানুসও ওড়াই।

নদীর অশ্রান্ত গতি—চিরউৎসাহে নবীন হয়ে কতকাল ধরে চলেছে তো চলেইছে। তার সেই পুরাতন ছন্দেতে কিন্তু আজও ছেদ প'ড়ল না। সুমুখে, নদীর ওপারে, উজ্জ্বল আলোগুলির দীপ্তি নদীর ঢেউয়ের ছন্দে মিশে কেমন এক রহস্যময়তায় গাঢ় হয়ে উঠেছে। এর ডাইনে আবছা, বোঝা যাচ্ছে—সেই বিখ্যাত শ্মশান-ভূমি, সেই অন্তিম আহ্বানের ধোঁয়া ও আগুন—বিশাল পৃথিবীর জনতার মধ্যে একজনের শেষ নিশ্চিহ্নতার স্বাক্ষর যেখানে ফুটে ওঠে। চিন্তাও তাই তখন কোন্ ফাঁকে এ-সবকে ঘিরে এক স্বপ্নে-জড়ানো রহস্য-পথে কতদূর এগিয়ে গেছে।

আবার ভাবছি—এই উদ্দেশ্যহীন জীবনে পথিকৃৎ কে হবে?—ঐ শ্মশানের শেষ পরিণতি, না, ঐ নদীর অবিশ্রাম গতি? উত্তর পাই না। স্মৃতির রোমন্থনও তখন থেমে গেছে। সুমুখের প্রসারিত দৃষ্টির রেখা ধরে মনটাকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম—সফল হ'ল না। কেবল মনে হ'তে লাগল—চারিদিকের এই স্বপ্নসম্ভারের সাথে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছে ঐ চলমান নদী। মাঝে মাঝে তাই চোখ মেলি, আর মনের মধ্যে এক বিচিত্র নির্বিরোধ অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি।

একটু পরেই আবার সম্বিৎ ফিরে আসে। নদী যেন আমার সঙ্গে তখন শরীরী হয়ে কথা বলতে লেগেছে। সুপ্তিভঙ্গের সাড়া তখন আমার চেতনায় উদ্বেলিত। আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণ এতে নেই। তবুও কে যেন বারে বারে আশ্বাস দিয়ে শোনাচ্ছে—'Learn

to recognize the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in sweetness and joy'—আনন্দ ও মধুরতার জননীই যে আবার বীভৎসতা, ভয়, দুঃখ ও নিঃস্বতার জননী এ-কথা বুঝতে শেখো।

কে এই জননী? কে সে?—কে তা জানি না, চিনিও না। তবুও তাঁর অদৃশ্য আবির্ভাবে চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। একটা চিরন্তনতা মূর্ত হয়ে ওঠে—চিন্তার সূত্রে আবার কিছুটা ভাবের মালা গাঁথা হয়ে যায়। ভাবি, নদী কি ক'রে পেল এই অবিরাম চলার শ্রান্তিহীন আনন্দ? সেই কবে বেরিয়েছে সে হিমালয়ের এক তুষার-প্রস্রবণ থেকে—আজও তার গতি থামল না। কত বাধা, কত বিপত্তি তাকে থামাতে চেয়েছে, সে কিন্তু সবকিছু কাটিয়ে, তার চলার তরঙ্গে শিহরণ তুলে সেই সত্য-শরণের জন্য আকুল হয়ে ছুটে চলেছে। আমাদেরও তো ঐভাবে চিত্তের চির-প্রোজ্জ্বল দীপটি জ্বেলে অনবরত খুঁজতে হবে সেই চিরশরণকে। ঐ নদীর স্রোতের মতোই হবে তার অফুরান জাগরণ। এই নিত্য চলার নিষ্ঠাটিকে আমাদেরও তো আপন ক'রে নিতে হবে।

তাই বলি, পূজার লগ্ন বয়ে যায়, ক'রছ কি পথিক? চল আর দেরি নয়, পূজায় বসি। চল, সেই নিত্যশরণের আগল-ভাঙা আহ্বানে সাড়া দিতে যাই চল। সর্বসুপ্তির অন্ধকার ঘুচিয়ে সেই আলোক-দিশারীর দিকে চল। যেখানে পৌঁছলে তোমার চিত্তের সুদূর-বিস্তৃত যবনিকা সরে গিয়ে এক অত্যদ্ভুত আনন্দের আস্বাদন পাবে। চল, চল আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বরাভয়া মা এসেছে!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বোধন-বাঁশী উঠলো বেজে, দিগন্ত চঞ্চল,
রূপের রাগে মধুর হাসে সারা জল-স্থল!
　　পূর্ণ ক'রে বনস্থলী,
　　উঠলো ফুটে কুসুম-কলি,
উঠলো ফুটে সরোবরে কুমুদ-কমল-দল!
আগমনীর বাঁশীর সুরে দিগন্ত চঞ্চল!

আঙিনাতে শিউলি আজি আঁকছে আলিম্পন,
অপ্‌রাজিতা কণ্ঠ-মালা করছে বিরচন!
　　বনের পথে শুভ্র কাশে,
　　দোলন লাগে কি উল্লাসে,
শিশির-জলে সিক্ত-তৃণে জাগছে শিহরণ!
শিউলি আজি মায়ের তরে আঁকছে আলিম্পন!

মুক্ত আকাশ নীল হ'ল আজ, মধুর প্রাণময়,
এ যেন মা'র সহজ সরল উদার অভ্যুদয় !
এ যেন মা'র দৃষ্টি-সুধা,
মিটাতে চায় সকল ক্ষুধা,
এ যেন মা'র স্নেহ-শীতল বুকের বরাভয় !
মায়ের মধুর দৃষ্টি ভরা—আকাশ প্রাণময় !

মা এসেছে, মা এসেছে, পূজা যে আজ তাঁর,
নিঃস্ব ও দীন আয় নিয়ে আয় প্রাণের উপচার !
মায়ের রাতুল অভয়-চরণ,
নিতে হবে আজকে শরণ,
থাকবে নাক' দুঃখ-বেদন, করুণ হাহাকার !
অভয়া মা এসেছে অই—পূজা যে আজ তাঁর !

মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোরা নই,
কেন রে হায়, কাঙাল সেজে দুখের বোঝা বই !
মা যে স্নেহের অসীম খনি,
সেই ধনেতে আমরা ধনী,
মায়ের স্নেহের অঙ্ক 'পরে আমরা সদা রই !
মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোরা নই !

দূরে দূরে আছিস্ কে রে, আয় তোরা সন্তান !
আজ বোধনের শঙ্খ-রোলে মা করে আহ্বান !
অর্ঘ্য ল'য়ে হস্ত-পুটে,
মায়ের পায়ে পড়্ রে লুটে,
মায়ের স্নেহের অঝোর-ধারায় কর্ রে অভিস্নান !
বরাভয়া মা এসেছে, আয় তোরা সন্তান !

মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

বেদান্তাদি শাস্ত্রে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে মহামায়াও কি মিথ্যা? শাস্ত্রে অনেক স্থলে ভগবতী দুর্গাকে মায়া, প্রকৃতি, মহামায়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়: না, মায়া মিথ্যা হইলেও দেবী মহামায়া মিথ্যা নয়, কারণ মহামায়া কেবল মায়া-স্বরূপ নয়। দেবী-উপনিষৎ, ত্রিপুরা-উপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদে দুর্গাদেবীকে জগতের মূলীভূত চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মরূপিণী বলা হইয়াছে। পুরাণ এবং উপপুরাণেও মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী, জগদম্বিকা, দুর্গা, শক্তি প্রভৃতিরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। চণ্ডীতে স্পষ্টই আছে—'ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা' অর্থাৎ তুমি জ্ঞান (চৈতন্য)-রূপা বুদ্ধি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে দুর্গা বা মহামায়ার স্বরূপ কি? তিনি কি অদ্বৈতবেদান্ত মতানুসারে শুদ্ধ ব্রহ্ম, অথবা মায়াবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-রূপ ঈশ্বর, অথবা চিজ্জড়াত্মক পৃথক্ পদার্থ? কারণ, দেবী যেমন চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, সেইরূপ বহুস্থলে তিনি প্রকৃতি, শক্তি, মায়া, মহামায়া, জগৎকারণ, বিশ্বকর্ত্রী ইত্যাদি রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের শুদ্ধব্রহ্মে জগৎকারণত্ব বা কর্তৃত্ব প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্ম নাই। সুতরাং মহামায়া শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ নহেন। আবার তাঁহাকে চিজ্জড়াত্মক পৃথক্ পদার্থ বলিলে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব-হানি হয়। আর যদি তাঁহাকে মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ ঈশ্বরাত্মক স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মায়ার মিথ্যাত্বহেতু তাঁহারও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব মহামায়ার স্বরূপ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, মহামায়া বা দুর্গাদেবী প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধব্রহ্মই। তবে যে শাস্ত্রে তাঁহাকে জগৎকর্ত্রী, পালয়িত্রী, সংহর্ত্রী, শক্তি, অচেতন-চেতনাত্মক সর্বজগৎস্বরূপিণী বলা হইয়াছে, তাহা মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত। অদ্বৈতব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে ও সাক্ষাৎকার করিতে জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ। অত্যন্তবৈরাগ্যবান্, অত্যন্তনির্মলচিত্ত, অতি-তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিই অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অদ্বৈত-ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। অথচ অদ্বৈত-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংসার হইতে মুক্তি অসম্ভব।

মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণ যাহাতে ব্রহ্মকে ধরিতে বুঝিতে পারে এবং তাঁহার উপাসনাদি করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, সেই জন্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে মায়াবচ্ছিন্ন জগৎকারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[২]

১ 'মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং রক্ষতি' ইত্যাদি [তাপনীয় উপনিষৎ] অর্থ:—এই নারসিংহী মায়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষা করেন।

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া' [চণ্ডী ১১ অ:] চণ্ডীতে প্রকৃতি, শক্তি, মহামায়া শব্দের উল্লেখ বহু স্থলে আছে।

২ 'নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥'

অর্থাৎ যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়াই শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে।

এই জন্য শাস্ত্রে মহামায়াকে কোথাও শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ বলা হইয়াছে, আবার কোথাও গুণময়ী বলা হইয়াছে; আর ইহাতে অদ্বৈতত্ত্বের হানি হয় না। কারণ—একই বস্তুকে অধিকারভেদে সগুণ ও নির্গুণ বলা হইয়াছে। দেবীভাগবতেও মহামায়াকে সগুণা এবং নির্গুণা উভয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩] সুতরাং দেবীর স্বরূপ লক্ষণ=সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে আছে—সেই দেবী পরম পুরুষ, চিদ্রূপ, পরমাত্মা, সকলের অন্তঃপুরুষ আত্মা; তিনিই জ্ঞাতব্য। মহামায়ার তটস্থ লক্ষণ=তিনি সকল জগতের আদিকারণ; এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও প্রসূতি। দেবী-উপনিষদে আছে—তাঁহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; তিনিই সর্বাত্মক।

প্রশ্ন হইতে পারে: এই মহামায়া কিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কারণ হন? শাস্ত্রে কোথাও বিষ্ণুকেই সর্বজগৎকারণ, কোথাও বা মহেশ্বরকে সর্বজগৎকারণ, কোথাও বা ব্রহ্মাকে সকলের কারণ বলা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, সেই শাস্ত্রেই আবার মহামায়াকে সর্ব-কারণ বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এপক্ষে যুক্তিও আছে, যথা—রজোগুণপ্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই ব্রহ্মা; শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে; সৃষ্টি রজোগুণের কার্য। সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই বিষ্ণু; বিষ্ণু পালন-কর্তা; পালন সত্ত্বগুণের ধর্ম; এই জন্য বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান। তমঃপ্রধান মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই শিব; শিব সংহারকর্তা; সংহার তমোগুণের ধর্ম। কিন্তু সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই মহামায়া দুর্গা।

সাংখ্যমতে যেমন তিনগুণের সাম্যাবস্থাত্মক প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ; সেই প্রকৃতি হইতে গুণের বৈষম্যযুক্ত 'মহৎ তত্ত্ব' প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হয়; সেইরূপ তিনগুণের সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মহামায়া হইতে এক একটি গুণপ্রধান বিশিষ্ট চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়। মহামায়ার উৎপত্তি নাই, কারণ সাম্যাবস্থাপন্ন মায়া অনাদি। এইজন্য দেবীভাগবত, দেবীমাহাত্ম্য, দেবী-উপনিষৎ প্রভৃতিতে এবং সকল তন্ত্র ও অন্যান্য অনেক পুরাণ ও উপপুরাণে মহামায়া সর্বজগৎকারণ, আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

যদিও চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, তথাপি যেমন অন্তঃকরণ প্রভৃতির উৎপত্তি-বশতঃ সেই অন্তঃকরণ প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি এক একটি গুণপ্রধান মায়ার উৎপত্তি-বশতঃ তাদৃশ মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতিরও উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এই যুক্তিতে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়ার উৎপত্তি না থাকায় তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্মক মহামায়ার উৎপত্তি নাই। তবে যে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা শিবকে অনাদি বলা হইয়াছে, তাহা এই যুক্তিতে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সেখানে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা মহেশ্বর বুঝিতে হইবে। এইভাবে ধরিলে আর কোন বিরোধ হয় না।

যাহা হউক আমরা সংক্ষেপে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা মহামায়ার জগৎকারণত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মস্বরূপত্ব দেখিতে পাইলাম। এখন এই

৩ নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ প্রোক্তা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥
অর্থাৎ জ্ঞানিগণ মহামায়াকে সগুণা ও নির্গুণা এই দুইভাবে বলিয়াছেন। সংসারে আসক্ত ব্যক্তিগণ সগুণভাবে ভজন করিবেন; বিরাগিগণ নির্গুণভাবেচিন্তা করিবেন।

মহামায়ার উপাসনার স্থান কোথায় এবং ইহার কি ফল—তাহাই সংক্ষেপে দেখাইয়া বক্তব্য শেষ করিব। শাস্ত্রে কোথাও জড়ের উপাসনা নাই। এইজন্য যাহারা হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকে, তাহারা কৃপার পাত্র। শুদ্ধ-চৈতন্য বা ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। অথচ শাস্ত্র মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য জল, প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, বীজ, ওঁকার, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি উপাধির উপদেশ দিয়া সেই সেই উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যেমন খড়্গ, জল ও দর্পণ প্রভৃতিতে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যাইলেও দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কারণ দর্পণ-রূপ উপাধি স্বচ্ছ; সেইরূপ একই চৈতন্য সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হইলেও উপাধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সেই সেই দেবতারও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সিদ্ধ হয়। মহামায়া বা দুর্গা বা কালী নামক আদ্যাশক্তির উপাধি হইতেছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত মায়া—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ মায়ার শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মহামায়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই কারণেই তাঁহার উপাসনারও শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হয়।

এই মহামায়াকে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম শীঘ্র প্রসন্ন হন এবং সাধককে বাঞ্ছিত ফল দেন। কারণ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নিকটতম। মায়া ব্রহ্মে সাক্ষাৎ আশ্রিত। মায়ার কার্য, সত্ত্ব রজঃ বা তমঃ প্রভৃতি এক একটি গুণ বা তাহার কার্য বুদ্ধি প্রভৃতি মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে আশ্রিত। অতএব সেই সাক্ষাৎ আশ্রিত মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ মহামায়ার উপাসনা করিলে যে শীঘ্রই ব্রহ্ম কৃপা করিবেন, তাহা যুক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়।

সমস্ত তন্ত্র, দেবীমাহাত্ম্য, দেবীপুরাণ, দেবী-ভাগবত প্রভৃতিতে মহামায়ার উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং ইহাতে শীঘ্র ফললাভ হয়—ইহা উক্ত আছে। তা ছাড়া সব দেবতার উপাসনার দ্বারা সব ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু এই একমাত্র দেবীর উপাসনায় সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি ইঁহার উপাসনায় ইহলোকে সকল প্রকার বাঞ্ছিত ভোগ এবং মৃত্যুর পর দেবী-লোকে গমন বা তাঁহার কৃপায় মুক্তিও সাধিত হয়।

'এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবী-সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥'

সকল তন্ত্রের এই মত।

সকল ব্রাহ্মণই এই শক্তির উপাসনা করেন, কারণ তাঁহারা গায়ত্রীর উপাসনা করেন। যথা:

'ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥'

এই মহামায়া দুর্গার উপাসনা যেমন নৈমিত্তিক কর্ম, সেইরূপ ইহা সন্ধ্যাবন্দনার মতো নিত্যকর্মও। এই কথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার দুর্গোৎসব-প্রকরণে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা এবং দেবীভাগবতের উপোদ্ঘাতে টীকাকার নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন। সুতরাং শক্তির উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও সকলের কর্তব্য।

সগুণব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে মহামায়ার উপাসনা যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা, তাহার একটি যুক্তি পূর্বে বলা হইয়াছে। তাছাড়া এই সংসারে মানুষের পক্ষে জননী যেরূপ একমাত্র ভরসার স্থল, আশ্রয়, এক-কথায় মানুষের সর্বপ্রকারে শরণ, সেইরূপ আর কেহই নয়। ইহা অতিমূর্খ, শিশু, মহাবিদ্বান্—সকলেই জানেন। আর সংসারে যত প্রকার ভাব আছে,

তাহাদের মধ্যে মাতৃভাব যে অতিপবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছেন। শাস্ত্রও অন্যান্য ভাবের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথা বলিলেও মাতৃভাবের কথা অধিকভাবেই বলিয়াছেন; সুতরাং মাতৃভাবে মহামায়ার উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তন্ত্রাদি শাস্ত্রপাঠে মাতৃভাবের উপাসনাই—অন্ততঃ কলিযুগে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং সংসারে যেমন মানুষের সর্বাবস্থায় মা-ই একমাত্র ভরসার স্থল, সেইরূপ উপাসনায় মাতৃভাবই সর্বত্র সর্বদা আশ্রয়ণীয়। তন্ত্র বলেন, শক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। শিবাবতার শঙ্করাচার্যও তাঁহার শৃঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরাযন্ত্র স্থাপন করিয়া স্তবস্তুতিতে শক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির সহিত কীর্তন করিয়াছেন। বাংলাদেশে বিশেষভাবে যে শক্তির আরাধনার প্রাচুর্য, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই।

শরত-ভুবনে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর, তুমি শরত-ভুবনে
কী রূপে যে ধরা দিলে!
আকাশগঙ্গা সীমাহীন হ'ল
মরালশুভ্র নীলে।
পাখিডাকা বনে অরুণকিরণ
ছায়া-আলোকের ছড়ালো হিরণ,
ধানখেতে দিল দোলা সমীরণ,
আলো জাগে খালে-বিলে।

পাহাড়শৃঙ্গে ঝলিল তুষার—
শেফালী-সুবাস জাগে।
ঘাসে-ঘাসে হাসে শিশিরবিন্দু
কার যেন ছোঁয়া মাগে।
পদ্মের বনে এনে দিলে ভোর,
কাশের কুঞ্জে খুলে দিলে দোর,
আগমনী-গানে বিশ্বমায়ের
হাসিখানি গেল মিলে।

আগমনী ও বিজয়া

শ্রীমতী উমা সেন

আগমনীর সুরে ভরপুর বাংলার আকাশ বাতাস। শরতের শিউলি-ঝরা সুন্দর প্রাতের শিশির-ভেজা অরুণিমা—নীল আকাশে হালকা মেঘের শুভ্র বলাকা—তার উপর খেলে যায় সোনাঝরা রোদের ঢেউ। চারিদিকেই কি এক আনন্দের আভাস—সব কিছুই যেন ঘোষণা করছে কার শুভ আগমন!

প্রকৃতি সেজেছে নবরূপে—তার সাজানো বাগান অপূর্ব ফলফুলের সম্ভার নিয়ে কার আগমনের আশায় উন্মুখ। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ আর বর্ষায় রিম্‌ঝিম্‌ বর্ষণের পর শরতের আগমন ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে আনে এক শান্তসমাহিত ভাব—তাতে উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু উচ্ছলতা নেই। বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ তপ্ত প্রাণে বুলিয়ে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ পরশ—মুছে দেয় মনের সব গ্লানি। প্রকৃতির এ নবরূপ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আনন্দের মায়ামন্ত্র—উদাসী মন ডানা মেলে কোন্‌ স্বপ্নরঙীন অজানা আশায়!

এমনি সোনালী সুন্দর ভোরেই হবে মহাপূজার বোধন, বোধনমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হবে সকলের মনপ্রাণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দেবে নিজেদের—শঙ্খশুভ্র ময়ূরপঙ্খীর মতো সাবলীল উল্লাসে। আগমন হবে মা আনন্দময়ীর; গিরিরাজ হিমালয় আর দেবী মেনকা ফিরে পাবেন তাঁদের হারানিধি উমাকে মাত্র তিনটি দিনের জন্য। সেই মহামিলনের আনন্দে আজ সবাই বিভোর! মা মেনকার সুরে সুর মিলিয়ে তাই বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয় আগমনী-গীতি:

'এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া
জামাই ব'লে মানব না।'

দশভুজা মা দুর্গাকে বাঙালী মাতৃজ্ঞানে, কন্যাজ্ঞানে আবাহন জানায়, ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে নিবেদন করে মায়ের চরণে।

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

মায়ের বন্দনামন্ত্রে ধ্বনিত হয় আকাশ বাতাস।

রামচন্দ্রের সেই অকাল-বোধন স্মরণ করেই শারদীয়া মহাপূজার প্রচলন। শরতের আগমনে তাই বাঙালী মেতে ওঠে মহোৎসবের আনন্দে। সেও মাকে অকালেই ডাকতে ভালবাসে।

* * *

আজকাল এ উৎসবে আনন্দ আছে, প্রাণের সাড়া নেই; আড়ম্বর আছে, সমারোহ নেই; সজ্জা আছে, কিন্তু শ্রীর অভাব। বাইরে জৌলসের মুখোস, কিন্তু ভিতরে দৈন্যের হাহাকার। ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতি আজ মাতৃচরণে কি প্রার্থনা জানাবে?—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি'। কিন্তু খাদ্যসমস্যা-সমাকীর্ণ দেশে রূপ আসবে কোথা থেকে? হতবীর্য জাতি জয় কামনা করবে কোন লজ্জায়? অপযশেই যারা নীলকণ্ঠ, তারা যশ প্রার্থনা করবে কিসের ভরসায়? তবু কালের চাকায় নিষ্পেষিত নরনারী প্রার্থনা জানায় সকল দৈবশক্তির ঊর্ধ্বে মহাশক্তির কাছে, আর্ত মানুষ কামনা করে সৌভাগ্য, আরোগ্য আর পরমশ্রী। পূজার উৎসব-মণ্ডপে, গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে,

শহরের রাজপথে মানবাত্মা আর্তস্বরে প্রার্থনা জানায় অশিবনাশিনী দুর্গতিহারিণী মা দুর্গার কাছে। উৎসবের ঘটা শেষ হয়ে আসে বিসর্জনের পালা। মা দুর্গাকে বিদায় দেয় ভক্ত বাঙালী অশ্রুজলে ভেসে—চারিদিকে শোনা যায় করুণ গাথা :

'মায়ের কোল আঁধার করি
শিবে নিয়ে যায় গৌরী
মায়ের পরানের ধন
শিবে কৈলাসে লয়ে যায়রে।'

বিসর্জনের পালা শেষ ক'রে সর্বহারা বাঙালী গায়,

'মাকে ভাসিয়ে জলে কি ধন নিয়ে যাব ঘরে
ঘরে গিয়ে মা ব'লে ডাকিব কারে ?'

তার পর শুরু হয় শুভ বিজয়ার সম্প্রীতি-উৎসব। হিংসা-দ্বেষ ভুলে, অতীতের সব গ্লানি মুছে ফেলে, শুচিস্নাত মন নিয়ে একে অপরকে করে কোলাকুলি—সুদৃঢ় হয় প্রাণের প্রীতির বন্ধন।

দুর্গাপূজার এ উৎসবের সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর জীবনের গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে। হিন্দু-ধর্ম একই ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছে ভোগ ও ত্যাগের মহান্ আদর্শ—মোহ ও মুক্তির পরম আস্বাদ। জীবনে কত আদরের ধন—স্নেহের পুতলিকে যেমন জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ভস্ম ক'রে আসতে হয় চিতার আগুনে, তেমনি কত সাধ ক'রে গড়া প্রতিমা—শিল্পীর সাধনার ধন—যার জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ, তাকেই উৎসব শেষে কঠিন প্রাণে বিসর্জন দিতে হয়! আগমনী যেখানে আছে, বিজয়া সেখানে আসবেই,—যেমন জন্ম হ'লে মৃত্যু হবেই। তাই কবি গেয়েছেন,

'আগমনী কাছে নিয়ে আসে
বিজয়ার শোক অশ্রুজল,
জীবন সে পূর্ণতার শেষে
পরিণত মরণে কেবল।'

আবাহন আর বিসর্জনের মধ্য দিয়েই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাঙাগড়ার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায়। আগমনী ও বিজয়ার মধ্যে আমাদের সমগ্র জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বছর বছর সম্পন্ন হয় শারদীয় মহোৎসব। শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেছিলেন রাবণ-বধের জন্য, যুগে যুগে অসুরনাশিনী মায়ের আবির্ভাবে দূর হয় হিংসা-উন্মত্ত পৃথ্বীর দানবরূপী কুটিলতা আর নারকীয় মনোভাব। আজ অজ্ঞানের অন্ধকার টুটে গিয়ে প্রকাশিত হোক চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্য শিব সুন্দরের দিব্য জ্যোতি। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক :

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

আগমনী

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

শারদা মায়ের আসার আভাস এনেছে শরতরানী
রচিতে মায়ের পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে ধরণীখানি।
মেঘ ঢালি জল করিছে মেদুর,
ধরণী শ্যামলে কোমলে মধুর,
আকাশে বাতাসে করে কানাকানি
হয়ে গেছে জানাজানি,
মায়ের আসার শুভ সমাচার এনেছে শরতরানী।

এনেছে শরত বারতা মায়ের, আসিছে শুভঙ্করী,
সবুজ সোনালী সোনার ফসলে ক্ষেত-মাঠ গেছে ভরি।
শ্যাম তৃণদল সবুজ সুতায়
মা'র তরে শাড়ী বোনে নিরালায়,
রুপালী ফুলের মরি কি বাহার—
শিশির পড়িছে ঝরি !
বনে বনে ফেরে মধু গুঞ্জরি মধুকর-মধুকরী।

কমল-কোরক ফোটেনি এখনো মার তরে দিন গোনে,
বাজে কি মায়ের চরণ-নূপুর, কান পেতে তাই শোনে।
রাখিতে মায়ের কমল চরণ
শেফালী ঝরিয়া বিছায় আঁচল,
সুরভি বিভল উতলা পরানে,
কল্পনা জাল বোনে,
জাগে কি মায়ের আসার আভাস পুবালী আকাশ-কোণে !

দূর নীল নভে উজ্জল-উছল, চাঁদিমা-তপন তারা—
ঢালিছে আবেগে আবেশে বিভোর, জোছনা কিরণধারা।
গাহিছে তটিনী কলকল ভাষে
শোভে দুই তীর বনফুল-কাশে
ধরণীর মাঝে আশা-আশ্বাসে
জাগিছে পুলক সাড়া,
এনেছে শরত ধূসর ধরায় মধুর জীবন-ধারা।

রামধনু-আঁকা শরত-আকাশে সোনার তরিটি বেয়ে
আসিছে জননী নিখিল প্রাণের সাগরের জলে নেয়ে।
বাজিছে মায়ের বোধনের বাঁশী—
শরতরানীর মুখে মধুহাসি,
মিলিছে সকলে ধরাবেদীমূলে
জননীর জয় গেয়ে,
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে সুরে-সুরে যায় ছেয়ে।

ভুবন-আসরে শরতরানীর পড়ে গেছে কত ত্বরা—
নব রূপায়ণে রূপায়িত করি, রূপময়ী হ'ল ধরা।
রূপের মাঝারে আসিবে অরূপ
ধরণী যে তাই হ'ল অপরূপ
রূপের মরতে মধুর-মুরতি
আসে চিরমনোহরা,-
মধুক্ষরা এই মধুর-ধরায়,—মধুময়ী দেবে ধরা।

বহ্নি-ললাটিকা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মাগো, অনেক ভক্ত দাঁড়াবে আজ পূজার বেদীতলে,
সাজিয়ে দেবে চরণে তোর—কেউ বা চোখের জলে—
পূজার অর্ঘ্য, প্রাণের জ্বালা, মনের অন্ধকার ;
শুনবে তুমি অনেক মন্ত্র মাতৃ-বন্দনার
গুঞ্জরিত চতুর্দিকে ; আগমনীর দিনে
আনন্দগান উঠবে বাজি বিশ্বকবির বীণে।
সেই সে কবির হাতের ছোঁয়ায় চন্দ্র সূর্য তারা
আনে আকাশ-ছাওয়া আলো, আনে জীবন-ধারা।
আনন্দ-রূপ, অমৃত-রূপ তোমার মহিমা যে
অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ শাশ্বত বিরাজে।
শিব-জটার গঙ্গাজলে তোমার অভিষেক
বিশ্বভুবন চেয়ে আছে নয়ন নির্নিমেখ।
অগ্নিমন্ত্র দাও মা তুমি, অভয় দাও মা মনে
বাজাও তোমার বিজয়-শঙ্খ আজকে শুভক্ষণে।
সবার্থ সাধন লাগি দাও মা শুভব্রত
চরণে তোর অনর্থেরা মাথা করুক নত।
আমি মা তোর চিরকালের কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে
কোলে তুলি নিয়েছিলি মা আবর্জনা ঠেলে,
অবোধ আমি, অবাধ্য যে, আমি যে অজ্ঞান
পালিয়ে বেড়াই, লুকিয়ে থাকি, জানি না সন্ধান
শান্তি কোথা, তৃপ্তি কোথা, কোথায় স্নেহ পাই ?
কোথায় আছে ঠাঁই ?
কোথায় জুড়াই এ যন্ত্রণা নিষ্ঠুর সংসারে ?
সব থেকেও যে নাইক' কিছু, তাইতো বারে বারে
পথ ভুলে যাই ; তবু জানি আমার যাত্রাশেষে
কে দাঁড়াবে হেসে
হাতে নিয়ে মঙ্গলদীপ, আশীর্বাদী ফুল—
সেই তো আমার সান্ত্বনা মা, সংশয়সঙ্কুল
অন্ধকারে সেই তো আমার জ্যোতির্ময়ী শিখা
আমার ধ্যানের বহ্নি-ললাটিকা।

জগন্মাতার বালিকামূর্তি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জগন্মাতাকে বালিকা কল্পনা করিয়া উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। মানবহৃদয়ের একটি প্রগাঢ় নির্মল আবেগকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়া ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং প্রেমকে অনুভব—ইহা যাঁহারা প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন একাধারে শিল্পী, কবি, মনস্তাত্ত্বিক এবং তত্ত্ব-দ্রষ্টা ঋষি। তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। শিশু-মাত্রেরই প্রতি পরিণত-বয়স্কের স্নেহ স্বাভাবিক হইলেও পুরুষ-শিশু ও স্ত্রী-শিশু—এই দুইয়ের উপর ঐ স্নেহের যে কিছু পার্থক্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। খোকা দুষ্টুমি করিলে মা তাহার গায়ে কখনও একটি চড় বসাইয়া দেন, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় খুকুমণির দেহে করাঘাত করিবার আগে তাঁহাকে তিনবার ভাবিতে হয়। খোকা ও খুকুর স্নেহের দাবি যদিও সমান, তবুও ঐ স্নেহের অভিব্যক্তি একরূপ নয়। ভক্তির আচার্যগণকে ঈশ্বরের প্রতি বাৎসল্যভাবকেও সেই জন্য দুইটি পৃথক্ রীতিতে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বালক কৃষ্ণ বা বালক রামের কাহিনী গান ও স্তোত্রাদিতে ভগবানের ঐশ্বর্যভাব কিছু কিছু প্রকাশ না করিয়া পারা যায় নাই। গোপাল গোকুলে কখনও কখনও নিরীহ শিশু, কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহার চাপল্যের কি অবধি আছে? এবং ঐ চাপল্যের সুযোগে পুরাণকারেরা ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কত না শক্তি গোপাল-চরিতে জুড়িয়া দিয়াছেন—পুতনাবধ, কালীয়-দমন, এমন কি গোবর্ধন-ধারণ পর্যন্ত। বাৎসল্যরতির সাধক-সাধিকারা যখন গোপালের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন শুধু স্তন্যপায়ী বা ক্রীড়ারত শিশুটিকে মনে রাখেন কি, না শিশুর ঐ সকল অলৌকিক বিভূতিকেও?

কিন্তু যিনি তরুণ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অপূর্বা তরুণী-রূপে দেখা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী রাধিকার বালিকাকালের খবর কি? না, তাঁহার বালিকাকাল বলিয়া কিছু ছিল না? একটি পৌরাণিক কাহিনী কতকটা এইরূপই আভাস দেয়। ঐ কাহিনী অনুসারে গোলক-ধামে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে তাঁহার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারূপে আবির্ভূতা হন একেবারে নবযৌবনসম্পন্না ষোড়শীরূপে। তা গোলকে যাহাই হউক, মর্ত্যের রাধা মর্ত্যের কৃষ্ণের ন্যায় পিতা বৃষভানু এবং মাতা কলাবতীর গৃহে বাল্যকাল যে কাটাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণে পাই, বারো বৎসর বয়সে আয়ান ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বারো বৎসর বয়সের সীমানায় বালক শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তো বহুতর অলৌকিক ঘটনা জমিয়া গিয়াছে। ঐ সব ঘটনার প্রত্যেকটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভক্তের চিত্তে কত স্নিগ্ধতা, কত মাধুর্য, কত প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। তুলনায় বালিকা রাধা কি সঞ্চয় করিয়াছিলেন? বালক শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া যে আনন্দ এবং ভগবদৈশ্বর্যের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, বৃষভানু-কলাবতীর গৃহে এবং পল্লীতে বালিকা রাধাকে কেন্দ্র করিয়া অনুরূপ কোন কিছু

জমায়েতের খবর তো বড় পাই না। পুরাণকারদের ভুল?—উপেক্ষা?—প্রয়োজনহীনতা? না। শ্রীকৃষ্ণ যদি জগন্নাথ হন, তাহা হইলে তাঁহার চিচ্ছক্তি শ্রীরাধাও জগন্মাতা। জগন্নাথের শৈশবলীলা যদি বাৎসল্যভক্তির উপজীব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগন্মাতার বালিকাবৃত্তও নিশ্চিতই ঐ উপজীব্যতার দাবি করিতে পারে। ব্যাপারটি এই যে, বালিকাকালে রাধারানী যে আনন্দপরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন, লিখিত বা কথিত কথিকায় তাহা প্রকাশ্য নয়। উহার প্রকৃতিই যে পৃথক্। হৃদয়ের গভীরে ঐশ্বর্যহীন এক অনন্যসুন্দর শুক্ল সরলতার পটভূমিকায় বালিকা রাধারানীকে দেখিতে হয়, দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, মুগ্ধ হইয়া হাসিতে হয়, কাঁদিতে হয়, চেতনা হারাইতে হয়। না, গোচারণ নাই, বাঁশী-বাজানো নাই, কালীয়দমন, গোবর্ধন-ধারণ—এ সকল কিছুই নাই। জগন্মাতা যে বালিকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ডুরে শাড়িখানি পরিয়া বালিকাবেশে মায়ের পাশে পাশে ঘুর ঘুর করিতেছেন, এই চিত্রই রাধা-বাৎসল্য-সাধকদের পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহা ঠিক যে, বাৎসল্য-রতির সাধক-সাধিকাদের অধিকাংশই বাল-গোপালকেই স্মরণ করেন, পূজা করেন; কিন্তু বালিকা রাধারানীরও ভক্তের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের আরাধনা গোপনে, হৃদয়ের ভাবলোকে। বালিকা রাধার মূর্তি গড়া যায় না, আঁকা যায় না; কাহিনী কবিতা দিয়া বর্ণনা করা যায় না। সে মূর্তিতে অলঙ্কার নাই, আভরণ নাই; সে গল্পে বীররস নাই, উত্তেজনা নাই।

বালক রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার চত্বরে দৌড়ঝাঁপ করিয়া রাজা দশরথ, তিন মহিষী এবং মন্ত্রী অমাত্য সভাসদ্ দাসদাসী তথা সমগ্র অযোধ্যার নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের তুফান ছুটাইতেছেন, তখন মিথিলাপুরীতে রাজর্ষি জনকের অট্টালিকায় একটি বালিকা কি করিতেছিল? তাহাকে ঘিরিয়া কি কোন নাটক জমিয়া উঠে নাই? নিশ্চিতই উঠিয়াছিল। তবে কবিদের লেখনী সে নাটককে লিপিবদ্ধ করে নাই, করা যায় না বলিয়া। গোঁসাই তুলসীদাসজী 'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিঁয়া' গান লিখিয়াছেন—শিশু রঘুনাথের নৃত্যরঙ্গের গান। কিন্তু বালিকা জানকীর সম্বন্ধে তেমন তো কিছু লিখেন নাই। নিশ্চিতই বিস্মৃতি নয়। লিখেন নাই এই জন্য যে, জগন্মাতার প্রতি বাৎসল্যভক্তির প্রকৃতি আলাদা। জগন্মাতা যখন বয়সে বাড়িয়া উঠেন, যখন মদনমোহনের পাশে বাঁকিয়া দাঁড়ান, যখন রঘুকুলতিলকের পিছনে পিছনে বনগমন করেন, যখন অশোকবনে বসিয়া কাঁদেন, যখন শুম্ভনিশুম্ভ বধ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন চিত্রকরের তুলি, কবির লেখনী, ভাবুকের মন পাগল হইয়া উঠে। কেন না, তখন মায়ের মহিমার অন্ত নাই, তাঁহার কীর্তির পরিমাপ নাই, তাঁহার মূর্তির সীমা ও সংখ্যা নাই। কিন্তু জগন্মাতা যখন বালিকা, তখন তাঁহাকে আমরা একান্তই হৃদয়ের গভীরে লুকাইয়া রাখি। তাঁহার লীলা তখন আরম্ভ হয় নাই বলিয়া নয়, তাঁহার লীলার মাধুর্য তখন এত গভীর যে উহা ভাবনাতীত, ভাষাতীত। গভীরতার লক্ষণ কি? সরলতা। জগন্মাতা যখন বালিকা, তখন তিনি সরলতমা।

জগন্মাতা দুর্গার সমস্ত অলৌকিক ঐশ্বর্য সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়া আমরা যখন বালিকা উমার কল্পনায় তাঁহার আরাধনায় ব্রতী হই, তখন আমরা কি এক অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভক্তি

আস্বাদন করি না? বাঙালী শত শত বৎসর ধরিয়া কত আগমনী গান বাঁধিয়াছে; গাহিয়াছে—কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সেইসব গানের মর্মকথা আর কয়টি?—

'মা, পতিগৃহে গিয়া এমনি করিয়া আমাদের ভুলিয়া থাকিতে হয়? আহা, পাগল ভোলানাথের সংসারে কত না কৃচ্ছ্রতা তোমাকে সহ্য করিতে হয়! সোনার বর্ণ তোমার মলিন হইয়া গেছে!

…আহা, উমা মা দূর কৈলাস হইতে কাল রাত্রে পৌঁছিয়াছে। বড় ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইতেছে। উহাকে এখন জাগাইও না।

…হায়রে, দেখিতে দেখিতে তিনটি দিন কাটিয়া গেল। এখন উমা আবার পতিগৃহে রওনা হইবে। হায়রে নবমীর রাত্রি, তুমি কেন প্রভাত হইলে? কেমন করিয়া স্বর্ণপ্রতিমাকে সেই দায়িত্বহীন জামাতার গৃহে পাঠাইব?

…যদি একান্তই যাইবে মা যাও, সাবধানে থাকিও। একেবারে আমাদের ভুলিয়া যাইও না। আবার সামনের বৎসরে আসিও।'

এই কয়টিই তো কথা। ইহাতে অলঙ্কার নাই, ছন্দ নাই, তত্ত্ববিচার নাই, দার্শনিকতা নাই। অথচ এই ভাব-কয়টির মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাংলার নরনারী কী অনবদ্য আধ্যাত্মিক স্নিগ্ধতা সঞ্চয় করিয়া চলে! চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বরী, তিনি অতি সহজ কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের ঘরে উপস্থিত। তাঁহাকে ভয় করিবার কিছু নাই, সমীহ করিবার কিছু নাই, তাঁহার নিকট লৌকিকতা কিছু নাই। তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে। তিনি যে আসিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের প্রাণ ভরপুর।

চণ্ডীতে মেধস-মুনি সুরথ-রাজা এবং সমাধি বৈশ্যের কাছে মহামায়ার নানা অলৌকিক কীর্তি-কলাপের বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। দেবীর ত্রিলোক-বিস্ময়কর জন্মকর্মের কথা শুনিয়া রাজা ও বৈশ্য উভয়েই রোমাঞ্চিত। কী অপরিমিত মায়ের শক্তি, কী বিশাল আকাশ-চুম্বী তাঁহার মূর্তি, কী অদ্ভুত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাঁহার মায়া! আদ্যচরিত এবং মধ্যম চরিত বর্ণনার পর মুনির মাথা ঘুরিতেছে। জগজ্জননীর উত্তুঙ্গ মহিমা প্রাণে জাঁকিয়া বসিয়া প্রাণের কণ্ঠরোধ করিতেছে। ক্ষুদ্র সরোবরে বিপুলকায় মহামাতঙ্গ নামিলে সরোবরের যে অবস্থা হয়, মুনির সেইরূপ দশা! উপায়? গুরুকৃপায় মুনি উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। চণ্ডীর উত্তরচরিতে দেড়টি শ্লোকে এই উপায়ের পরিচিতি আছে। দেড়টি শ্লোক পড়িতে বড় জোর পনের সেকেণ্ড লাগে। কিন্তু সেই পনের সেকেণ্ডে দেড়টি শ্লোকের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে অনন্তকালের মাধুর্য—জগন্মাতার সরল বালিকামূর্তির চকিত দীপ্তি এবং বালিকার মুখের চারটি শব্দকে বেড়িয়া অতিস্নিগ্ধ রসধারা।

ইন্দ্রাদি দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্রাণের জন্য বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতেছেন। ভাবিয়াছেন—বিষ্ণুমায়া যখন, তখন সামান্য দু-চার কথায় তো তিনি তুষ্ট হইবেন না। তাই দেবতারা নগরাজ হিমালয়ে গিয়া বেদ-বেদান্ত কাব্য-ব্যাকরণ সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিতেছেন এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত তিন-গ্রামে গলা মিলাইয়া আকাশ ফাটাইয়া স্তোত্র গাহিতেছেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তব, তিনি কিন্তু অলক্ষ্যে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন, হায়রে মহাজ্ঞানীর দল, আমাকে ডাকিতে কি এত কথা লাগে? মনের কোণে ফুট উঠিবার আগে আমি যে মনের

সকল অভিলাষের সন্ধান পাই, শব্দের জাল বুনিয়া তোদের অন্তরের কি পরিচয় দিবি আমার কাছে? অন্তর্যামিণী তখন একটি ভারী মজার খেলা ফাঁদিলেন।

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥
সাঽব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।

* * *

পর্বতনন্দিনীরূপে কাঁধে একটি গামছা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে যেখানে হিমালয়ের কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া জাহ্নবীর ধারা প্রবলবেগে ছুটিতেছে, সেখানে তিনি স্নান করিবার জন্য উপস্থিত। স্নান করিবার সময় তো কেহ সাজ-গোজ করিয়া জলে নামে না, তাই নিরাভরণা বালিকা। বিচিত্র বেশভূসায় বিচিত্র চেহারার দেবতাদের সমাবেশ দেখিয়া স্নানার্থিনীর না আছে সঙ্কোচ, না আছে ভয়, বরং বড় কৌতুক জাগিয়াছে। সুন্দর ভ্রূ-দুটি দুলাইয়া, চোখ দুটি নাচাইয়া, ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি মাখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা কার স্তব ক'রছ?' এইটুকু চিত্র, এইটুকু সংলাপ। পরবর্তী ঘটনা চণ্ডীপাঠকের জানা আছে—দেবীর নানা পরাক্রমের কাহিনী, আশ্চর্য ঘটনাপরম্পরায় তাঁহার বিশ্বপালিনী, অসুর-সংহারিণী ভাগবতী লীলার পরিবিস্তার। সে সব কাহিনীর মধ্যে তত্ত্বের অনুশীলন আছে, ভয়-ভক্তি-শরণাগতির নিশ্চিত-ফলত্বের নির্ণয় আছে, সে সকল কাহিনীর মূল্যবত্তায় কেহ সংশয় করে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর এই দেড় শ্লোকের চিত্র ও সংলাপের মূল্য কোন্ পর্যায়ের? জগন্মাতার এই অনাড়ম্বর বালিকামূর্তি কি ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে একটি শাশ্বতকালের অতীন্দ্রিয় স্নেহাবেশ সঞ্চার করে না? পর্বতকুমারীর উচ্চারিত চারটি সরল কথা হইতে ভাবলোকের এক চিরনূতন চির-মধুর অনবদ্য সঙ্গীত কি ঝরিয়া পড়িতেছে না?

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে কুমারিকা অন্তরীপে জগন্মাতার বালিকামূর্তি কন্যা-কুমারীর মন্দির। বোধ করি আমাদের বিশাল দেশে আর কোথাও এইরূপ কন্যামূর্তির স্থায়ী আরাধনার জন্য দেবালয় নাই। না থাকাই স্বাভাবিক। জগদীশ্বরীকে বালিকা কন্যা ভাবিয়া বাৎসল্যভক্তি সহজ নয়। উহার জন্য হৃদয়ের ঐশ্বর্যচিহ্নমুক্ত যে নিরাকাঙ্ক্ষ সাত্ত্বিকতার প্রয়োজন, তাহা ভক্ত দিনের পর দিন বজায় রাখিতে পারেন না। সেই জন্য নৈমিত্তিক পূজার্চনা হিসাবে কিছু সময়ের জন্য আমরা জগন্মাতার বালিকামূর্তির আরাধনা করি—দুর্গাপূজার সময় বা কামাখ্যাপীঠে গিয়া। কন্যাকুমারীতে যাঁহারা দেবীকে দর্শন করিয়াছেন, পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই যে, এখানকার আধ্যাত্মিক তৃপ্তির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতের অন্য কোনও দেবালয়ে অনুভূত হয় না। ঠিকই কথা। যে ভাস্কর পাথরে দশ-বৎসরবয়স্কা এই দেবীমূর্তি ফুটাইয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাঁহার ভাবদৃষ্টি এবং কলা-কুশলতা অতুলনীয়। তাহার পর শত শত বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পাথরকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কী আশ্চর্য হাসি কন্যাকুমারীর মূর্তিতে! এক মুহূর্তে উহা অন্তরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে সারা প্রাণ প্লাবিত করিয়া দেয়।

এক শতাব্দী পূর্বে বাংলার বুকে সেইরূপ এক জ্যোৎস্নালোকের বন্যা নামিয়াছিল—জগন্মাতার বালিকা-রূপের বন্যা। না, কোনও দেবতার দল উহা প্রত্যক্ষ করে নাই, কোনও

যোগী-মুনি-তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে উহা পড়ে নাই। যোগী-মুনিরা তখন নির্জন গুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তত্ত্বান্বেষীরা তখন শাস্ত্রবিচারে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সুযোগ পাইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া জগন্ময়ী লালচেলীপরা একটি ক্ষুদ্র বালিকার মূর্তিতে মল ঝমঝম করিয়া নাচিতে নাচিতে পল্লীর এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর গলা জড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।

জগন্মাতার এই বালিকামূর্তি যুগ যুগ ধরিয়া ভাবুকের হৃদয়ে আনিবে এক ইন্দ্রিয়াতীত স্নেহাবেশ ও শান্তি, তাঁহার উচ্চারিত কথা ভক্ত-প্রাণের সকল তন্ত্রী অনুরণিত করিয়া তুলিবে এক সুমিষ্ট সঙ্গীত।

পরে বালিকা বেশ বদলাইয়াছিল। লাল চেলী ছাড়িয়া গ্রামের তাঁতীর বোনা আট-পৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরিয়া জলে নামিয়া দিনের পর দিন গরুর জন্য দলঘাস কাটিত, দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের পরিবেশিত গরম গরম খিচুড়ি শীঘ্র জুড়াইবে বলিয়া দুই হাতে বাতাস করিত, বাড়ি হইতে দূরে ধান্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষি-মজুরদের জন্য মুড়ি বহিয়া লইয়া যাইত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সংসারে এই সকল দৈনন্দিন ছোট ছোট কর্মরত বালিকারূপে জগজ্জননীকে ভাবিতে কেমন লাগে? কল্পনার উপর একটুও টানা-হেঁচড়া করিতে হয় না। কে না বাংলার পল্লীর পুকুর দেখিয়াছে, লম্বা লম্বা ঘাস, খিচুড়ি, হাতপাখা, ধানের ক্ষেত, ক্ষেতে নিযুক্ত মুনিষ এবং মুড়ির দোনা দেখিয়াছে? কে না বাংলার পাড়াগাঁয়ে একটি ছোট শ্যামাঙ্গী বালিকাকে দেখিয়াছে? নিত্যপরিচিত দৃশ্য। এই সকল চেনা ছবির টুকরা জোড়া দিয়া ভাবুক যখন বালিকা সারদার মূর্তি হৃদয়ে গড়িয়া তুলেন, তখন তাহা এক অপরূপ মাধুরীতে ঝলমল করে। এই বালিকা মহামায়ার উদ্দেশ্যে কোনও স্তব রচনা করা যায় না, তাঁহার কাছে কোনও প্রার্থনা করা চলে না, বাহিরে রং-তুলি দিয়া বা মাটি-পাথর খুদিয়া তাঁহার ছবি বা প্রতিমা আঁকা বা গড়া সম্ভবপর নয়। তবুও চন্দ্র সূর্য যেমন সত্য, জগন্মাতার এই বালিকা-মূর্তিও তেমন সত্য। এই মূর্তিতে জগন্মাতার পরিপূর্ণ সত্তা বিদ্যমান, যেমন তাঁহার বিভিন্ন ঐশ্বর্যপ্রকাশক অন্যান্য নানা দেবীমূর্তিতে বর্তমান।

ইহকাল-পরকালের সকল চাওয়া-পাওয়া উপেক্ষা করিয়া নির্মল নিষ্কাম প্রীতিতে যিনি জগজ্জননীর এই বালিকা মূর্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি নিশ্চিতই ধন্য।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী

[গত ৯ই জুলাই, ১৯৬১ রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী যাহাতে উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী সমগ্র ভারতে এবং জগতের বহু সভ্য দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইজন মহাপুরুষ বাংলা দেশে দুই বৎসরের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বাঙালী-মাত্রেরই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহাদের জন্মভূমি হইলেও তাঁহারা কেবল বঙ্গদেশের নহেন, এমন কি ভারতবর্ষেরও নহেন, তাঁহারা বিশ্বের বরেণ্য এবং সমগ্র জগৎ তাঁহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ বৎসরও মর্ত্য দেহে ছিলেন না, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি স্বদেশের ও বিদেশের সমগ্র মানবজাতির যে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়াছেন, আজিকার এই যুগসঙ্কটে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে তাঁহার বাণী ও উপদেশের প্রকৃত মর্ম জনসমাজে প্রচারিত হয় এবং তিনি যে আদর্শ জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের কাছে জীবন্ত হইয়া ওঠে, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষ স্তুতি ও সম্মানের বহু উর্ধ্বে। আমাদের এই অনুষ্ঠান তাঁহার মহিমা বাড়াইবে, এরূপ স্পর্ধা কাহারও নাই। কিন্তু আমরা নিজেরা যাহাতে তাঁহার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি, তাহার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলেও যে বহু সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। আজিকার দিনেই আমাদের স্বামীজীর কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। স্বামীজী পরাধীন দেশেই জন্মিয়াছিলেন, পরাধীন দেশেই দেহরক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়। আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার বা বুঝাইবার স্পর্ধা আমার নাই। মহাযোগী বা মহাসাধক হইলেও তিনি ঠাকুরের আদেশে অথবা নির্দেশে সংসারকেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তাই সংসারের মধ্য দিয়া তিনি যেটুকু প্রকট হইয়াছিলেন, আমরা সংসারী লোকেরা কেবল তাহাই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারি। সেদিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, স্বামীজী কিরূপে এই অধঃপতিত দুর্বল মোহগ্রস্ত ভারতবাসীর মধ্যে এক নূতন শক্তি ও জাতীয়তার প্রেরণা দিয়াছিলেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে যখন আমাদের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত,

যখন আমরা আমাদের হীনতা ও দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ, তখনই স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে আমাদিগকে এই অভয়বাণী শুনাইলেন: তোমরা অমৃতের পুত্র, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, মাভৈঃ

যেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরে স্বামীজী হিন্দুধর্মকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসিবার অধিকার অর্জন করিয়া দিলেন, সেই দিন মৃতপ্রায় ভারতে নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতবাসী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। আমাদের জাতীয় জীবনে সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই জন্যই আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস-লেখক স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের জাতীয়তাবোধের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জড়তা ত্যাগ করিয়া ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য তিনি দেশের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার এ আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই। শত সহস্র যুবক তাঁহার অভয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়া তাহার মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

'দেশ' বলিতে কি বুঝায়, স্বামীজী তাহা আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এই দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্র হীন অন্ত্যজ পদদলিত লাঞ্ছিত নিঃস্ব সহায়হীন নরনারী—ইহাদের লইয়াই দেশ। দেশের মুক্তির অর্থ ইহাদের মুক্তি। কেবল বিদেশের শাসনভার দূর করিতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—যতদিন সমগ্র ভারতবর্ষের নরনারীর উন্নতিবিধান না হয়, ততদিন আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন ও মূল্যহীন। স্বামীজীর এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য আজ আমরা ক্রমশঃ বুঝিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর একটি কথাও আজ প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। তিনি বলিতেন যে, দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে চাই—মানুষ তৈরী করা। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন: সারাটা দেশ ঘুরে দেখলাম, মানুষ নেই। আগে চাই মানুষ। তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে তিনি যে অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আজ আমরা মর্মে মর্মে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে 'মানুষ' তৈরী করিবার দিন আসিয়াছে।

কিন্তু স্বামীজী কেবল ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন নাই। জগতের সমস্যাও তাঁহার দিব্য দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসীরাও যাহাতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ অভাব। এ জন্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি ক্রমশঃ তাহাদিগকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এই উভয়ের সমন্বয় ভিন্ন মনুষ্যজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। বিজ্ঞান-চর্চায় বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবাসী চরম দুর্দশায় উপনীত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিমুখ থাকিয়া কেবল বিজ্ঞানের অনুশীলন করার ফলে দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা যে কত বড় নিদারুণ সত্য, আজ সমগ্র বিশ্ববাসী তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছে। আজ তাই স্বামীজীর আদর্শ বিশ্বের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতের প্রধান ব্রত হইবে পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক আদর্শ

প্রচার করা। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলে কেহ তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিবে না। আজ স্বাধীন ভারত স্বামীজীর মহামন্ত্র প্রচার করিলে জগতে তাহা স্বীকৃতি লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যদি এই উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সফল হয়, তাহা হইলেই আমাদের উৎসব গৌরবমণ্ডিত হইবে।

শ্রীভগবান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখতে তোমায় পাইনি বটে, তবু নিবিড় পরিচয়,
অনুক্ষণই ভাবি তোমায়—দেখাই তো খুব বড় নয়
দেখতে তোমায় যে পুণ্য চাই,
অধম আমি—আমার তা নাই,
শুধু আকুল বিস্ময়েতে—ডাকি তোমায় সুধাময়।

নামে তোমার অমৃত হে, ধ্যানে তোমার অমৃত
কৃপার নীরে অবগাহি, দুঃখ কিসের নিমিত্ত ?
বুদ্বুদ আমি সুধাব্ধিরই—
তুমিই আছ আমায় ঘিরি,
তোমা ছাড়া নাইক' কিছু, জীবন মরণ দুই অভয়।

সখ ক'রে তো ডাকি নাক', পূজিনাক' তোমারে—
তোমার পূজা তোমায় ডাকা—প্রাণের ক্ষুধা নিবারে
তুমি অতি দুর্লভ ধন—
নিত্য তবু তার প্রয়োজন,
তোমা বিনা ঘর করা যে বিড়ম্বনা মনে হয়।

তাহাদিকে সাবাস্ যে দিই—দিই তাদিকে ধন্যবাদ—
সত্য স্বাবলম্বী তারা, থাকুক তাদের ভুল প্রমাদ।
তারা তোমায় আমার মতো
করেনাক' বিরক্ত তো,
তারা করে তোমার কাজই, নাইবা দিলে তোমার জয়

জ্ঞানদাসের সাধনা

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখায় (১।১১) তাঁহার নাম ধরিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদ হইতে জানা যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন (গৌরপদ-তরঙ্গিণী পৃঃ ৪৭০, ১ম সং)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় জ্ঞানদাসের ৩৬৩টি সম্পূর্ণ ও ৩১টি অসম্পূর্ণ পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রামাণিক পদ-সঙ্কলনগুলি ও বহুসংখ্যক প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানদাসের আরও ৯৬টি পদ পাইয়াছি। তাঁহার রচিত প্রায় পাঁচ শত পদ হইতে তাঁহার সাধনার ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

লৌকিক কাব্য ও উপন্যাসের লেখক তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান। তাঁহার নিজের সুখ-দুঃখাদি অনুভব কাব্যাদির পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া প্রকাশ করেন; আবার তাহাদের ভাব ও ভাবনা প্রকাশের সময় স্রষ্টা কখন কখন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হন। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাকে সেবা করিবার ভাব দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে ইঁহাদের পার্থক্য এইখানে।

সেবা সখীভাবে হইতে পারে, আর সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে হইতে পারে।

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
(চৈঃ চঃ—২।৮)

কিন্তু 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ও গোবিন্দদাসের পদে দেখা যায়, কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দূতীরূপা সখীর সঙ্গে বিলাস করেন। সখীগণ নিভৃত লীলাসময়ে নিকটে থাকেন না, মঞ্জরীরা সে সময়েও সেবা করেন। মঞ্জরীভাব শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত হইলেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা উহা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন, তাঁহার এমন সুদিন কবে হইবে, যেদিন শ্রীরূপের আজ্ঞায় সেবার সামগ্রী সব রত্ন-থালিতে করিয়া রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দিবেন। 'শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটি পায়'। 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় তিনি লিখিয়াছেন:

সখীর অনুগা হৈয়া ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া
সেই ভাব জুড়াব পরাণী॥

পুনরায় ঐ গ্রন্থেরই অন্য স্থানে বলিয়াছেন:

সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥

এই সেবা-ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ বলেন, তিনি রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কালে—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুঁহুজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস॥

কোন পদে দেখি গোবিন্দদাস চামর ঢুলাইতেছেন, কখন মূর্ছিতা রাধাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, কখন বা সাধারণভাবে বলিতেছেন—

অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে,
কহয়ে গোবিন্দদাস।

ভণিতায় এইরূপ সেবাভিলাষ প্রকাশ করা প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে দেখা যায় না।

জ্ঞানদাসের পদেও সখীর অনুগা হইয়া সেবা করিবার কথা নাই। জ্ঞানদাস ভণিতায় সখী-ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র দুইটি পদে তিনি রাখালদের সঙ্গে সখ্যভাবে গোষ্ঠে যাইবার কথা বলিয়াছেন ও অন্য একটি পদে 'রাখাল-পদে আশ্রিত' হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি পদ ছাড়া অন্যত্র সকল ভণিতাতেই জ্ঞানদাসের সখীভাব। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুধু অলৌকিক বলিয়া মানেন না, এই লীলার এমনই নিগূঢ় রহস্য যে ইহা 'বিরিঞ্চি-অগোচরী'।

রাধা যখন বলেন, 'শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে', তখন জ্ঞানদাস সখীভাবে তাঁহাকে বলেন—

কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি।

রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হইয়া বলেন, 'বিষেতে জিনিল সর্বগা', তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন, 'জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি'। সখীর কথা শুনিয়া যখন রাধার হিয়া উতরোল হইয়াছে, তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কুঞ্জে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে চল ঝট কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই॥

বনের মাঝে যখন বাঁশী বাজিয়া উঠে এবং রাধার মন আর ধৈর্য মানে না, তখন জ্ঞানদাস রাধাকে বলেন—

জ্ঞানদাসেতে কয়, আর বিলম্ব না সয়।
ছুটিল করের শর নিবারণ নয়॥

মন আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন তো আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না; যেমন নিক্ষিপ্ত বাণ আর নিবারণ করা যায় না, সুতরাং রাধার আর দেরি করা উচিত নহে।

কুঞ্জে যখন কৃষ্ণ আকুল হৃদয়ে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাধা সেখানে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কানাইয়ের যেন অমৃত-সাগরে স্নান করা হইল। সহচরীরা রাধার সঙ্গে গিয়াছিলেন, জ্ঞানদাসও যেন তাঁহাদের দলে ছিলেন। তাঁহারা উভয়কে একত্র রাখিয়া দূরে গেলেন। তাহা দেখিয়া কিশোর-কিশোরীর আনন্দ হইল—

পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখিপাশ।

যে সখীর নিকট জ্ঞানদাস এ কথা বলিলেন, তিনি ঐ দলে ছিলেন না, জ্ঞানদাস ছিলেন—এই ভণিতা হইতেই প্রমাণিত হয়।

রাধা 'প্রেমে পড়িয়াছেন', কিন্তু সখীদের সে কথা বলেন নাই। সখীরা রাধার আকার ও আচরণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন। জ্ঞানদাস সেই সখীদের পর্যায়ে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকানো না যায়॥

সখীরা একদিন রাধার 'লহু লহু মুচকি হাসি' ও বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আজ তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

দশদিন দুরজন　সুজনে একদিন
আজু পেখলু নিজ আঁখি।

এই রকম করিয়া বলায় জ্ঞানদাসের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি সখীকে বলিলেন, সখি! তুমি আর বলিও না, রাই আমাদের বড় লজ্জা পাইল যে!

জ্ঞানদাস কহ　সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে ॥

সখীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া লীলা প্রত্যক্ষ না করিলে কি এমন অন্তরঙ্গতার সুরে কেহ কথা বলিতে পারে?

রাধা সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভাঙা নৌকায় চাপিয়াছেন। নৌকায় জল উঠিতেছে দেখিয়া জ্ঞানদাস ভয় পাইয়া জল ফেলিতে লাগিলেন।

'বাসকসজ্জা'র একটি পদে রাধা বলিতেছেন, 'কি জন্যই বা আমি ক্ষীর-সর আনিলাম, কেনই বা সুবাসিত জল ও তাম্বূল সংগ্রহ করিলাম!' জ্ঞানদাস এই পদের ভণিতায় বলিতেছেন—

কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি ॥

—রাধা কেন আর রাত্রি জাগিতেছেন, জ্ঞানদাসকে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই দিন। এই কথার অর্থ, জ্ঞানদাসই রাধাকে খবর আনিয়া দিয়াছিলেন যে, আজ কৃষ্ণ সঙ্কেতস্থানে আসিবেন; তাই রাধা তাঁহার জন্য সাজগোজ করিয়া বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন আসিলেন না, তখন জ্ঞানদাসের মনে হয়, তাঁহাকে শাস্তি দিয়া রাধা তাঁহার মনের জ্বালা মিটান।

জ্ঞানদাস রাধার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া এমনই গভীর-ভাবে ভালবাসিয়াছেন যে, তিনি লাজ ভয় সব হারাইয়াছেন। রাধার এমন ভাব দেখিয়া 'জ্ঞানদাস কম্প অনিবার',—জ্ঞানদাসের বুকের কাঁপুনি আর থামে না। রাধা একা একা নিজের মনে দুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়া জ্ঞানদাস অনুনয় করিয়া বলেন, তুমি তোমার দুঃখের কারণ, আমাকে বল—'কহিলে ঘুচিবে তাপ'। জ্ঞানদাসের ভণিতার ভঙ্গী হইতেই রাধার ভয় পাওয়ার কথা অনুমান হয়—

জ্ঞানদাস কহে,　আমরা থাকিতে
কিবা পরমাদ তোরে ॥

ননদিনীর সাধ্য কি—জ্ঞানদাস থাকিতে রাধাকে কোন রকমে হেনস্তা করিতে পারে।

ভোর হইয়াছে। রাধাকে এখন ঘরে ফিরিতে হইবে। জ্ঞানদাস কৃষ্ণকে বলিতেছেন, এখন 'চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর'। সখীরূপে জ্ঞানদাস কৃষ্ণকেও মাঝে মাঝে ধমকাইয়া দেন। 'দানলীলা'য় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছুঁইতে আসিতেছেন দেখিয়া—

জ্ঞানদাস কহে,　ইঙ্গিত না হ'লে
কি লাগি বাহু পসার ॥

রাধা তো ইঙ্গিতেও অনুমতি দেন নাই, তবে তুমি কোন্ সাহসে হাত বাড়াইতেছ? কৃষ্ণ পথ আগলাইলে, কবি রাধাকে বলেন, 'কিবা ভয়, যাও হাত ঠেলা দিয়া'। রাধা কৃষ্ণকে কালো বলিয়া, ত্রিভঙ্গ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন, ওগো শ্যাম! নিজেকে একেবারে অতুলনীয় সুন্দর ভাবিও না—

জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম ॥

কৃষ্ণ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাহা হইলে অগত্যা জ্ঞানদাসকে প্রতীকারের জন্য রাজ-দরবারে নালিশ করিতে হইবে—'জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া'।

প্রয়োজন হইলে জ্ঞানদাস রাধাঠাকুরানীকেও দু-চার কথা শুনাইয়া দিতে পিছপা হন না। 'দানলীলা'য় কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনিয়া রাধা যখন বলিলেন, এ-রকম কথা 'শ্রুতিসম্ভব নহে' অর্থাৎ শুনিবার যোগ্য নহে, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এমন করিয়া বলিতেছ কেন? তুমি যে নব-অনুরাগে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছ—

জ্ঞানদাস কহে—ঐছে কহসি কাহে
আওলি নব-অনুরাগে।

রাধা কৃষ্ণকে 'কাঁচ' বলায় জ্ঞানদাসের রাগ হইয়াছে। তিনি রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন কৃষ্ণ কাঁচ নহে, 'কষটি পাষাণ'—কষ্টিপাথর। কৃষ্ণের প্রণয়-চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া রাধা যখন তাঁহাকে বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন, তখন জ্ঞানদাস আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—

জ্ঞানদাস বলে, গোপঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

নৌকায় চড়িয়া রাধা দেখিলেন যে, নাবিক নৌকা বাহেন না, তাঁহাকে ছুঁইবার জন্য আগাইয়া আসেন। কৃষ্ণের অনেক আবেদন-নিবেদন ও চাটুবচনেও যখন রাধার মান ভাঙিল না, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের কথা তো শুনিলে না, কিন্তু অন্ততঃ আমার মুখ চাহিয়া তুমি কানাইকে সরস স্পর্শ দিয়া বাঁচাও—

জ্ঞানদাস কহে ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও॥

সাধনার কোন্ উচ্চস্তরে উঠিলে কবি এরূপ কথা বলিতে পারেন! যেখানে কৃষ্ণের সকল অনুনয় ব্যর্থ হইল, সেখানেও জ্ঞানদাসের মনে ভরসা আছে যে, রাধা তাঁহার মুখ চাহিয়া মান ত্যাগ করিবেন রাধার প্রতি কতখানি প্রীতি থাকিলে মনে এমন ভরসা জাগে? জ্ঞানদাসের সাধনা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনায় তাঁহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি নিজেকে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার পরিকররূপে ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জ্বালায় অস্থির হইয়া রাধা ভাবিতেছেন, তিনি নিজে মথুরায় যাইয়া তাঁহার বঁধুয়াকে বাঁধিয়া আনিবেন। জ্ঞানদাস এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে বিনয়-বচনে
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা।

কবি নিজেই মথুরায় চলিলেন—

শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ!
চলিল ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাধার দশা নিবেদন করিয়া 'জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধভাগী'। অন্য একটি পদে—

জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি বধ লাগবে তোয়॥

জ্ঞানদাস রাধার দুঃখ চোখে দেখিতে পারেন না। রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যের জন্য অনুরাগ করেন এবং অবশেষে নতি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন, রাধাকে ভালবাসা দিয়া জ্ঞানদাসের প্রাণ রক্ষা কর—

অব দোষ ক্ষেম নাথ অভাগীরে কর সাথ
জ্ঞানদাসের রাখহ পরাণী॥

কৃষ্ণের উপর জ্ঞানদাসের যথেষ্ট দাবি আছে, না হইলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য রাধাকে সঙ্গ দিবার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিতেন না। প্রিয়াজী যখন বলেন, পরিণাম

যাহাই হউক না কেন, আমি শ্যামকে ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং সখীদিগকে তিনি বলেন—

চল সভে মেলি,　　শ্যাম শ্যাম বলি,
রহিতে না পারি ঘরে।

তাঁহার কথায় সায় দিয়া জ্ঞানদাস বলেন, নিশ্চয়, আমিও তোমার সহিত চলিব—

জ্ঞানদাস কয়,　　মন অন্য নয়,
শ্যামের পিরিতি সার।
লজ্জা কুলশীল,　　যে জন রহিবে,
আমি না রহিব আর॥

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন—

মোর মনে হেন লয়, শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞানদাসের পাঁচটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'বলিতে সঙ্কোচ হয়, এই কয়টি পদে কবির বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে' (জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভূমিকা—॥৶০)। তাঁহার এই উক্তি যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানদাসের যে সখীভাব আমরা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সহজিয়ারা নিজেকে রাধা ভাবিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং কখন বা নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত নায়িকার সঙ্গে বিহার করে। তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা'; আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা হইতেছে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা'। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই হইতেছে সখীদের কাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥
(চৈঃ চঃ ২।৮)

লতার মূলে জল দিলে লতার ফুলপাতা আপনিই বাড়িয়া উঠে; আর মূলে জল না দিয়া ফুলপাতায় জল ছিটাইলে অল্পদিনের মধ্যেই ফুলপাতা ঝরিয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করা প্রয়োজন, জ্ঞানদাস ঐ পাঁচটি ভণিতায় নিজে রাধার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। হরেকৃষ্ণবাবু কোন পদের আকর উল্লেখ করেন নাই এবং সাধারণতঃ প্রায় কোন পদেরই পাঠান্তর ধরেন নাই; তাহাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম দৃষ্টান্তটি এই—

জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

এই ধরনের ভণিতা কোন প্রামাণিক পদসঙ্কলনে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে পাঠ ধরিয়াছেন—

জ্ঞানদাস বলে সখি সেই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি সাগরে মরিব॥ (৪।৫)

'পদামৃতসমুদ্রে' (৪২৬ পৃঃ) ও 'পদকল্পতরু'তে (২৫২৯) পাঠ আছে।

জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥

ঐ পদটি 'পদকল্পতরুতে' দুইস্থানে ধৃত হইয়াছে। প্রথম বারে ধৃত পদের ভণিতা—

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥ (৯২৩)

'পদরসসারে' (২১৪ এবং ১৪০৪) শেষ চরণ—

কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব।

এই সকল ভণিতাতেই স্পষ্টতঃ বা ব্যঞ্জনায় 'সখি' সম্বোধন আছে। জ্ঞানদাস সখীভাবে রাধাকে বলিতেছেন, তোমার কানুর জন্য আমি সাগরে অথবা যমুনায় প্রবেশ করিব, সেখানেও যদি তাঁহাকে পাই, আনিয়া তোমার সঙ্গে মিলন

ঘটাইব। 'সাগরে মরিব' কথার ব্যঞ্জনা এই, যে কামনা করিয়া সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, পরজন্মে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়।

হরেকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হইতেছে—

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি,
তিল-তুলসী দিয়া॥

পদটির আরম্ভ 'কি মোর ঘরদুয়ারের কাজ'। 'পদকল্পতরু'তে (৮৪৭) ইহার ভণিতা নাই। 'পদামৃতসমুদ্রে' (পৃঃ ২৪৯) ইহার ভণিতা এই—

সো মুখ না দেখি পরাণ বিদরে
রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী 'বৈষ্ণবপদ-লহরী'তে (২৩৮ পৃঃ) এই পাঠই ধরিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠ উপেক্ষা করিয়া কোন অজ্ঞাতনামা পুঁথির পাঠকে প্রামাণিক ধরিলে অর্থবিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য নহে। 'পদামৃতসমুদ্রে' এই পদের তৃতীয় কলিতে আছে—

গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে আপনা বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥

এটি শ্রীরাধার উক্তি। এই কথাই পদের শেষে ভণিতায় পুনরায় কবি নিশ্চয়ই বলেন নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতেছে—

পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখন অন্তরদাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ॥

রাধা বলিতেছেন, প্রেম পরের বশে—পরের উপর নির্ভর করে, আমার আর্তি বা বাসনা মিটিল না, তাই সব সময়ে বুকে জ্বালা। জ্ঞানদাস তাহার উত্তরে বলিতেছেন, তুমি শুধু জ্বালাটার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্যামকে দেখিলে প্রতিক্ষণে তোমার যে কত সুখ হয়, তাহা বলিলে না। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ যদি একই ব্যক্তির উক্তি হয়, তাহা হইলে উহা পরস্পর-বিরোধী হয়।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হইতেছে—

খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে
আনল ভেজাই ঘরে॥

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি; দ্বিতীয় চরণ 'অনুগতা সখীরূপা' জ্ঞানদাসের কথা। রাধে, তুমি বলিতেছ তোমার এত কষ্ট!

প্রাণ সই কি আর কুলবিচারে।
প্রাণবন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জিউ,
কি মোর সোদর পরে॥

জ্ঞানদাস তাঁহাকে বলিতেছেন, কি দরকার তোমার কুল রাখিয়া, তুমি ইঙ্গিত করিলে আমি তোমার ঘরদুয়ারে আগুন লাগাইয়া দিব। পদটি কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) জ্ঞানদাস-ভণিতায় এবং পদকল্পতরুতে (৮৯৩) চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়!

শেষ উদাহরণটি এই :

হিয়ার পিরিতি, কহিল না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ, নব অনুরাগ
অমিয় অধিক লাগে॥

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি। পদের প্রথম দিকে রাধা বলিয়াছেন, 'সই গো মরম কহিনু তোরে'। তাহারই উত্তরে 'সখীরূপা'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তোমার নূতন অনুরাগ, তাহা অমৃতের চেয়েও সুমিষ্ট, সুতরাং সেই প্রেমের কথা চিত্তে অবিরত জাগিবেই তো!

জ্ঞানদাস কোথাও স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভণিতা দেন নাই। তিনি সখীভাবেই সাধনা করিতেন। সখীরা রাধার কায়ব্যূহস্বরূপ। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী। জ্ঞানদাসের দীক্ষাগুরু জাহ্নবাদেবী স্বয়ং সখীভাবে উপাসনা করিতেন। এই কথা শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ তাঁহার 'জাহ্নবীতত্ত্বমর্মার্থ' নামক অপ্রকাশিত পুঁথিতে (বরাহনগরে গ্রন্থমন্দির বিবিধ ৬২ ক) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জাহ্নবা বৃন্দাবন-লীলার অনঙ্গমঞ্জরী। ১৫৭৬ খৃঃ কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে (৬৬) বলিয়াছেন:

'অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে'।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জ্ঞানদাস বা অন্য কোন বৈষ্ণব মহাজন রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেন না গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন অনুসারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি। তিনি অন্তরঙ্গা শক্তি, আর জীব তটস্থা শক্তি। জীব মায়ার অধীন, আর শ্রীরাধাকে বহিরঙ্গা মায়া কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে না।

ফারসী-চর্চায় হিন্দু সুধী

অধ্যাপক রেজাউল করীম

বিশ্বকবি বলেছেন, 'শকহুনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।' ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, বিশ্বকবির কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমন্বয়। এখানে হাজার হাজার বছর ধরে নানা ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

ইওরোপের ইতিহাসে দেখি, সেখানেও সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু ভারতের মতো নয়। ইওরোপ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে চূর্ণ ক'রে ভেঙে দিয়ে একরূপতার সমন্বয় গড়ে তুলেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিভিন্নতাকে ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করেনি, বরং বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় রচনা করেছে।

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন দেশ থেকে নানা জাতি এসেছে, তারা ভারতের নিকট থেকে নিয়েছে বহু বিষয়, আবার দিয়েছেও বহু। যখন দুর্বার বেগে মুসলিমগণ ভারতে এল, তখন মনে হয়েছিল, সব বুঝি ভেঙে চুরে একাকার ক'রে দেবে। তারা চারিদিকে রাজ্যবিস্তার করেছে, অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু তাদের সাতশ' বছরের ইতিহাস কেবল একটানা ধ্বংসের ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস; কেউ কাউকে গ্রাস করেনি, একের মধ্যে অপরের প্রভাব অদ্ভুতভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি, বা ভবিষ্যতেও

হবে না। কিন্তু যদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করি, তবে দেখে স্তম্ভিত হবো যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছিল, এবং তার ফলে কিছুটা সমন্বয়ও সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই আমরা দেখি মনীষী আলবেরুনীকে। আলবেরুনী হচ্ছেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রধান সেতু। তাঁর মতো পরে আরও বহু মুসলিম পণ্ডিত ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা আরব দেশে, এবং সেখান থেকে পাশ্চাত্যে ভারতের কথা প্রচার করেন। আরবের বহু সুধী ভারতীয় দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আরবীতে অথবা ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন। এইভাবে 'নিকট প্রাচ্যে'র (Near East) নানা অঞ্চলে ভারতের জ্ঞান ও দর্শন প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় কৃষ্টির ভাব (Spirit of Culture) আরব দেশের গভীরতর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, ভারতের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত—এই সবের অনুবাদ হয়েছে আরবী ও ফারসী ভাষায়। সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী নাম 'আনোয়ার সোহেলা'। এই গ্রন্থ আবার আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, তার আরবী নাম 'কালিলা ও দামনা।'

আরবের বহু খলিফা, বাদশাহ ও শাসকগণ আরবদেশ ও বহির্বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে-জন্য অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি। যুক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে একটা নবতর সভ্যতা গঠনের প্রতি তাঁদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁরা জানতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিলন ঘটাতে হ'লে তাদের দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার। মূলগ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ না করলে নিরপেক্ষভাবে দর্শন-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হ'তে পারে না, সেইজন্য সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য একশ্রেণীর মুসলিম সুধী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি, মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতগণ পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন সযত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, সেইরূপ হিন্দু পণ্ডিতগণও আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি। কিছুসংখ্যক হিন্দু পণ্ডিত মুসলিম 'কালচার' সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়, ফারসী ও আরবী ভাষাতেও তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথা ব'লব, যাঁরা আরবী অথবা ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে-সব গ্রন্থের জন্য তাঁরা এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, ভারতের বাইরেও তাঁদের গ্রন্থের সমাদর হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যাবে যে, সে-যুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাটা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বৃটিশদের ভারতে আগমনের বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে আসছিল। যে-সব হিন্দু সুধী আরবী ও ফারসীতে পুস্তকাদি রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতের

মুসলিম ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

ভারতে বৃটিশ-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা। সরকারী কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমানের অনেকেই ফারসী ভাষা শিখতেন, কিন্তু সেটা ছিল স্বতন্ত্র বিষয়। রাজকার্য-পরিচালনার জন্য যতটুকু ফারসী শিখতেন, তাতে সাহিত্যিক জ্ঞান হ'ত না। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে যাঁরা ফারসী শিখতেন, তাঁদের শিক্ষাই ছিল আসল শিক্ষা।

শত শত হিন্দু সুধী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যকে ভালবাসতেন ব'লে সংস্কৃত ভাষার মতোই ফারসী শিখতেন। ইসলামিক জগতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সাধনা করতেন। বহু হিন্দু কবি, দার্শনিক ও শিল্পী ছিলেন, যাঁরা যে-কোন ফারসীভাষী পণ্ডিতের মতো সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে ফারসী লিখতে পারতেন। ইসলাম-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ তাঁরা ফারসী ভাষাতেই লিখে গেছেন। কেউ কেউ আবার আরবীতে লিখেছেন। এইসব লেখক-গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর—এ দেশে একটা অপপ্রচার করা হয়েছে, যার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতিপূর্বে যে-সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, এই সব অপপ্রচারের ফলে সেটা অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে যে-সব হিন্দু-মুসলমান সুধী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন, তাঁরা ছিলেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মশালবাহী সাধক। তাঁরা যে-স্রোত বহিয়ে দিয়েছিলেন, তা যদি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকত, তবে ভারতের অবস্থা অন্যরূপ হ'ত, এই সব সাধকদের জীবনের ব্রত সার্থক হ'ত এবং বহুপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এই প্রবন্ধে কেবল কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথা বলছি, যাঁরা অতীত যুগে ফারসী ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করতে সহায়তা করেছিলেন।

প্রথমেই ফারসী ভাষায় লিখিত একটি পুস্তকের নাম করা যাক—'গুলরানা'। এটা কবিদের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। লেখকের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর কবি-নাম 'শফীক'। লক্ষ্মীনারায়ণের আদি বাসস্থান আহমদাবাদ। তাঁর 'গুলরানা' গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে আছে ভারতীয় কবিদের বিবরণ; অপর অধ্যায়ে মুসলিম কবিদের পরিচয়, আর এক অধ্যায়ে সেই সব হিন্দু কবিদের বিবরণ আছে, যাঁরা ফারসী ভাষায় কাব্য-চর্চা করেছেন।

লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আসলে একজন ঐতিহাসিক। তিনি ১৭৯৪ খৃঃ ভারতের একটি ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর সে-ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'হাকিকতে হিন্দুস্তান'। এই পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত আর একটি পুস্তকের নাম 'মাসার-ই-আসাদী'। এতে আছে ১৬৭১ থেকে ১৭৬১ খৃঃ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের ইতিহাস। এ-সব ঐতিহাসিক গ্রন্থের একটা নিজস্ব মূল্য আছে সত্য, কিন্তু 'গুলরানা' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, আকবরের রাজত্ব-কালে ভারতে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই যুগের একজন বিখ্যাত হিন্দু

কবি ছিলেন, তাঁর নাম 'মনোহর তানসানি'। মনোহর তানসানি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্য-রাজ্যের সিংহাসনকে চতুষ্পদী কবিতার শ্লোক দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

শাহজাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে 'ব্রাহ্মণলাহুরী' ব'লে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি একটি 'দেওয়ান' লেখেন, তাতে তাঁর রচিত বহুবিধ কবিতা সঙ্কলিত আছে। মোগলসম্রাট্ শাহআলম, ফারোকসিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু কবি কাব্য রচনা ক'রে অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ভারতীয় পটভূমিকার উপর ফারসী কবিতা লিখতেন। 'গুলরানা'র লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আরও কয়েকজন হিন্দু কবির নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল:

১। অচলদাস: তিনি জাহানাবাদের অধিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয়। অচলদাস ছিলেন স্বভাবকবি। তাঁর কবিতার একটি নমুনা ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে দেওয়া হ'ল। এই ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ দিলাম না, কারণ তাতে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে যাবে।

'I did not see any place void of the splendour of the traceless one ; The six directions are full to the brim with His beauty, while His space is vacant—He being not inclined to any particular place'.

২। কিশনচাঁদ: ইনি 'এখলাস' এই কবিনাম নিয়ে কাব্য-চর্চা করতেন। কিশনচাঁদ উপরি-উক্ত অচলদাসের পুত্র। তিনি মিরজা আব্দুল চাঁদী এবং কাবুল কাশ্মিরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন কিশনচাঁদ ছিলেন সুন্দরের কবি। জীবনে প্রথম শ্রেণীর বহু কবির সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনিও একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম 'হামেশা বাহার' অথবা চির-বসন্ত। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে দু-একটি শ্লোকের অনুবাদ:

'When the heart is overcome with love, reason vanishes. When the king is defeated, the courage of the army vanishes.'

'Art and skill is a sufficient sign for a clever man. The name of a sage subsists through his thought and idea. Do not be perplexed, O Ekhlas, for attaining eminence, for the ups and downs of the world are like a ladder.'

৩। আনন্দ-কন: তাঁর আসল নাম বৃন্দাবন। তিনি ফারসী ও সংস্কৃত এই দুই ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত ভাষায় সমগ্র গীতার ফারসী অনুবাদ করেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজী অনুবাদেও পরিস্ফুট:

The pillow is drenched throughout
the night with my tears,
The rose-petals become
sparks of fire on my bed,
The slumber comes
and sees water in my eyes,
She fears being drowned, so turns back.

৪। উলফৎ লালা অজাগর চাঁদ: ইনি মথুরার এক বিখ্যাত কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তরুণ বয়স থেকেই কবিতা-লেখা অভ্যাস করেন। বহু দিন পর্যন্ত তিনি আজিমাবাদে বসবাস করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অল্প আয়ে দিনপাত করতেন। তাঁর

সহজ ব্যবহার, নম্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ ক'রে তুলত। প্রথম জীবনে তাঁর কবি-নাম ছিল 'গুর্বৎ' অর্থাৎ দারিদ্র্য। কিন্তু পরে তিনি ঐ নাম পরিবর্তন ক'রে 'উলফৎ' এই নাম গ্রহণ করেন। তাঁর রচনা মধুর ও প্রীতিপদ। নিম্নের উদ্ধৃতি তাঁর রচনামাধুর্যের পরিচয় দেবে :

'In the evening there came into my
bosom a guest named 'grief',
Unceremoniously I placed a fray
before him from the strain of my heart,
My heart is becoming intoxicated
with 'kaaba' of the black eyes,
For it possesses a hundred pitchers of
wine of pleasure of this night,'

৫। ব্রাহ্মণ রায় চন্দ্রভান : এঁর জন্মভূমি লাহোর। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তিনি কিছুদিন মোগলসম্রাট শাহজাহান ও তৎপুত্র দারা শিকোহের সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন। দারা যখন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করতেন, তখন তিনি কবি চন্দ্রভানের নিকট বহু সাহায্য গ্রহণ করতেন, দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা তাঁর নিকট বুঝে নিতেন। এমন কি দারা তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থে চন্দ্রভানের ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেক গ্রন্থ লেখেন, তন্মধ্যে দুটি গ্রন্থ সুবিখ্যাত :

(১) 'মুনশা-আতে ব্রাহ্মণ'—তিনি শাহ-জাহান ও তাঁর দরবারের কয়েকজন ওমরাহকে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, এতে আছে সেই সব চিঠির সঙ্কলন।

(২) 'দিওয়ান-ই ব্রাহ্মণ'—এটা একটা কবিতার সঙ্কলন। তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, বর্ণানুসারে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবিতা সে-যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

৬। কন্‌কা, অন্য নাম কঙ্কা : অষ্টম শতাব্দীতে কবি কন্‌কার আবির্ভাব ঘটে। সে-যুগে তিনি একজন পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী দুই ভাষাতেই রচনা করতেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং সুদূর বাগদাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। খলিফা মামুনের দরবারে একজন ভারতীয় পণ্ডিত ব'লে সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন। জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু ভারতীয় গ্রন্থ তিনি বাগদাদে নিয়ে যান এবং অপরাপর পণ্ডিতের সহ-যোগিতায় সেগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের নাম 'সিন্ধ হিন্দ'। কন্‌কা আরবী ভাষায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল : (১) আলমু-মুজাফিল-আমর—অর্থাৎ জীবনের আদর্শ। (২) কিতাব-ই-আসরার আল মাওয়ালিদ—অর্থাৎ জন্মরহস্য। (৩) কিতাবুল-কিরানাতুল কাবির—অর্থাৎ গ্রহ ও উপগ্রহ-সংক্রান্ত গ্রন্থ। (৪) কিতাবুত্‌ তিব্বেকান্নাম—এটা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পুস্তক। (৫) কিতাবুল তারাহাম—কল্পনা-সংক্রান্ত পুস্তক। (৬) কিতাবুল আহাদিসুল আলাম—এটা পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব-সংক্রান্ত পুস্তক।

৭। কেবলরাম : ইনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'তাজ-কেরাতুল ওমারা'। এতে আছে কতিপয় বিখ্যাত আমির-ওমরাহদের জীবনীর সঙ্কলন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে মুসলিম ওমরাহ-সভাসদ্‌দের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিন্দু সভাসদ্‌দের কথা।

৮। কিশোরী : তিনি ফারসী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। পাঠান-যুগের

তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁর গ্রন্থগুলি আজকাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা 'মাজমায়ে আশার' নামক একটি কবিতা-সঙ্কলনে সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি পাঠ ক'রে জানা যায় যে, তাঁর কবিতা যেমন তেজস্বিতাপূর্ণ তেমনি প্রাঞ্জল।

৯। নরনারায়ণ: মোগলসম্রাট্ ফারোখ-সিয়ারের সময় কবি নরনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং দুই ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'গুলশনে রাজ'। সে যুগের সুধীমণ্ডলী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা ও দৃশ্যাবলী থেকে গৃহীত। তিনি সে-সব দৃশ্যকে তাঁর যুগের পটভূমিকার উপর অপরূপ-ভাবে অঙ্কিত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় বিষয়ের উপর ফারসী ভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ অতি অল্পই লেখা হয়েছে। সুমধুর ফারসী কবিতার এ একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১০। রায় বৃন্দাবন: ফারসী ভাষায় ইনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর প্রধান কীর্তি এই যে, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'কে ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন। সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা তিনি সবিস্তারে এই অংশে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম 'লুৎবাতুত তওয়ারিখ'।

১১। শানাক: তিনি ফারসী ভাষায় ঔষধপত্র ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং চিকিৎসার বহু অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর তিনখানি পুস্তক খ্যাতি লাভ করেছে। (১) 'কেতাবুস-সুমাম ফি খামসে মকালাত'—এতে আছে বিষ-সম্বন্ধে আলোচনা। (২) 'কেতাবুল বায়ম-তারাব'—এতে আছে পশুরোগ-সম্বন্ধে আলোচনা। (৩) 'কেতাব ফি ইলাম হুজুম'—এতে আছে জ্যোতির্বিদ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা।

১২। সানজাহাত: দশম শতাব্দীতে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন করেন। আলবেরুনী এঁর ভেষজ-সংক্রান্ত একখানা পুস্তক পড়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সানজাহাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মরহস্য সম্বন্ধেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম 'কেতাবুল মোওয়া-লিদাল কবির'।

১৩। সুজনরাজ: প্রবন্ধের শেষে আর একজন সুপণ্ডিতের নাম ক'রব—যিনি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে আওরঙ্গজেবের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন ফারসী ভাষায়। তাঁর সে গ্রন্থের নাম 'খোলাসাতুত্ তারিখ'। আওরঙ্গজেবের যুগের বহু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় তিনি বহু ফারসী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, যথা: 'তারিখে আকবর', 'জাহাঙ্গীর-নামা', 'আকবর-নামা'।

আরও বহু হিন্দু সুধী ফারসী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। স্থানাভাববশতঃ বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের নাম ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বৃটিশ যুগের পর ফারসীর স্থলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হ'ল ইংরেজী। সুতরাং দেশে ইংরেজী শিক্ষার খুব ধুম পড়ে গেল; আর ফারসী ভাষা অবহেলিত হ'তে লাগল। তারপর থেকে ফারসী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে

হিন্দু চিন্তা ও মুসলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে আদানপ্রদান হয়ে আসছিল। ফলে উভয় ধরনের চিন্তাধারা একই মহাসাগরে মিলিত হচ্ছিল। এইভাবে ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পথ সুগম হয়ে আসছিল; কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সে সমন্বয় বন্ধ হয়ে গেল। আবার নূতন উদ্যমে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাকে প্রবাহিত ক'রে দিতে হবে। মুসলমানকে যেমন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতে হবে, সেইরূপ হিন্দুকেও আরবী-ফারসীর চর্চা করতে হবে। ভাষার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। আরবী-ফারসী চর্চা না করলে ভারতবর্ষ ইরান, ইরাক—তথা সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাহারায়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার 'নীল'-এর স্নিগ্ধ করুণার ধারা
কতদূরে, কতদূরে? আমার সাহারা
রৌদ্রতপ্ত কাঁদে আজও দিগন্তপ্রসারী!
কোথায় তৃষার্ত তার পিপাসার বারি
সুশীতল? যতদূর যতদূর চাই
কোনখানে শ্যামলের চিহ্নমাত্র নাই!
বড়ো শূন্য! বড়ো একা! বলো বলো মোরে
আছ মোর পিতা তুমি হাতখানি ধ'রে
তোমার হাতের মাঝে! দাও এ বিশ্বাস—
সূর্যে সূর্যে যে-তোমার জ্যোতির প্রকাশ,
যে-তুমি সর্বজ্ঞ আর সর্বশক্তিমান্
নগণ্য আমার লাগি সে-তোমার প্রাণ
কাঁদিতেছে অহরহ! এক-পা এগোলে
বলো, বলো আস তুমি শতপদ চ'লে!

'বিশ্বশিক্ষক-সম্মেলন'

শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ

১৯৫২ খৃঃ একটি সম্মেলনে তিনটি আন্তর্জাতিক শিক্ষক-সংস্থা 'ওয়ার্লড্ কনফেডারেসন অব অরগেনাইজেশন অব টিচিং প্রফেসন' নামে একটি বিশ্বশিক্ষক-সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের শিক্ষকগণের জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়তে চায়। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে (১) আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র ও শুভেচ্ছার সহায়ে শিক্ষা শান্তি, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদার রক্ষক হবে; (২) শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠন উন্নয়নের এবং বৃত্তিমূলক ও শিক্ষাগত উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষকগণ যুবসমাজের কল্যাণে ব্রতী হবেন; (৩) বিভিন্ন দেশের শিক্ষকগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

এর প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যসূচীর ক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়েছে। এই সংস্থার সভ্যসংখ্যা বর্তমানে ৭০ থেকে ১২১ দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ৩৭টি দেশের শিক্ষক-সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়, কিন্তু বর্তমানে ৭০টি দেশের শিক্ষক-সংস্থা এর সভ্য। এই সংস্থার অনেকগুলি আঞ্চলিক সম্মেলন ও সভা হয়েছে। ১৯৫৮ খৃঃ এফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির একটি সম্মেলন সিংহলে হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই সংস্থার এশিয়া কমিটি ও অঞ্চল পর্যদ এশিয়া মহাদেশের শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য সংগঠিত হয়। আফ্রিকাতেও এইভাবে ১৯টি দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থাগুলির সাহায্যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়নই এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই বিশ্বসংস্থা UNESCO-এর পরামর্শদাতা ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও UNECF, FAO প্রতিষ্ঠান-দুটির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। U.N.O.-কে এই সংস্থা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই ভাবে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে এই সংস্থা জগতের জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী আছে।

প্রতি বছর এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান সংগঠন-সংক্রান্ত বিষয় ও শিক্ষা-সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বান করে। এই অধিবেশন পূর্বে অক্সফোর্ড, অস্লো, ইস্তানবুল, ম্যানিলা, ফ্রাংকফুর্ট, রোম, ওয়াশিংটন ও আম্স্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরে দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল দিল্লীতে এবং আগামী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে স্টক্হল্মে।

দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সমবেত এই সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ঘোষণা করেছেন: 'Education for responsibility grows out of the convictions held by the society with regard to fundamental moral, spiritual and national values.' আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছাত্রজগতে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা পরিহার করতে হ'লে শিক্ষকগণের কর্তব্য নৈতিক ও আত্মিক মূল্য-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রগণকেও ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। এই মূল আদর্শকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের জন্য 'পঞ্চশীলের' সুপারিশ করেছে। (১) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যে আস্থা; (২) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

ও প্রয়োজন-বোধে সংশোধন ; (৩) বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধি ; (৪) কৌতূহলী মানসিকতাকে উৎসাহ-দান ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ; (৫) মানব-অধিকারের ঘোষণা-অনুযায়ী শিক্ষাকার্য-পরিচালনা।

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, দায়িত্ব-পালনের উপযুক্ত হ'তে হ'লে শিক্ষকগণের যথার্থ সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োজন এবং জনশিক্ষার বাহনগুলিকে কাম ও অপরাধের বিকৃত পরিবেশন বন্ধ রাখতে হবে।

এই অধিবেশন সরকারী সহযোগিতা ও সাহায্যে পুষ্ট। তাই বিশ্বসংস্থার প্রস্তাব ও উদ্দেশ্যের মূল সুরটি সরকারী কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দের বিশেষ ক'রে অনুধাবন করা উচিত। এই অধিবেশন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার কারণ ও তার সমাধান নির্দেশ করতে দুটি মূল সিদ্ধান্তে এসেছে। প্রথমটি আত্মিক মূল্য-বোধের অভাব এবং অপরটি শিক্ষকগণের দারিদ্র্য ও আদর্শবোধের অভাব। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে, মানবতাবাদের মাধ্যমে ভোগবাদের প্রবল বন্যা সমাজের সকল স্তরকে প্লাবিত করেছে। তাই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে শিক্ষকগণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান বজায় রাখতে পারবেন ব'লে মনে করা নিতান্তই অবাস্তব আশাবাদের কথা। এটা শিক্ষক-সমাজের সাধু সঙ্কল্প, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলে এ সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করা দুঃসাধ্য ব'লে মনে হয়। তাই শিক্ষা—তথা মানব-জীবনকে সার্থক করবার জন্য প্রয়োজন আপামর জনসাধারণের অন্তরে আত্মিক মূল্য-বোধের পুনর্বাসন। কিন্তু এ সমাজের সকল স্তরে আত্মিক মূল্যবোধের সমস্যা সম্পর্কে কোন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কার্যক্ষেত্রে নিতান্তই উদাসীনতা অবলম্বন ক'রে জাতির সর্বস্তরে নাস্তিকতা ও ভোগবাদের মাধ্যমে জাতিকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এ কারণেই বৈশ্যমূল্য ও বিশ্বস্বার্থের প্রাবল্যে হতাশায় মুহ্যমান শিক্ষক-সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তা ছাড়া এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

অধিকন্তু যে-দেশে একদিকে দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষক এবং অপর দিকে আর এক শ্রেণীর মানুষের জন্য সস্তায় মোটরগাড়ি উৎপাদনের ব্যবস্থা, সে-দেশে শিক্ষকের মাধ্যমে এতবড় আদর্শগত কর্তব্য কি ক'রে সম্ভব ?

স্বামীজী বলেছেন, খালি পেটে 'ধর্ম' হয় না। 'শিক্ষা'র ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্য। 'Education is the manifestation of perfection already in man'—এই যে মহাসত্য স্বামীজী ঘোষণা করেছেন, তার মৌখিক স্বীকৃতি এই বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে অন্য ভাষায় পাই, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যতদিন পর্যন্ত না এই শিক্ষা-আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াসী হচ্ছেন, তত দিন শিক্ষা ও শিক্ষকের কোন ভবিষ্যৎ আছে ব'লে মনে হয় না।

বিশ্বসংস্থার এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার জন্য চাই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-ভাবাদর্শের সম্যক্ অনুশীলন। কারণ এই আদর্শেই ব্যক্তির আত্মিক মূল্য ও সমাজের মূল্য সুন্দরভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই আদর্শের অনুপ্রেরণাই ভোগবাদী বৈষম্যের আদর্শ থেকে মানব-সমাজকে মুক্তি-পথে নিয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া শিক্ষকগণের আত্মিক নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ; অর্থাৎ এ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষাদান-কার্য অসম্ভব। আশা করি, মুক্তবুদ্ধি মানুষ এ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে সচেতন হবে। অন্যথা সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

সংকল্প ও সাধনা

শ্রীমতী বেলা দে

মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আছে, যার বশে সে তার সংকল্প রক্ষা করে, এবং হাতের কাজ শেষ না ক'রে ছাড়ে না। যে কথা সে বলেছে, যে কর্তব্য সে স্বীকার করেছে, তা পালন না করলে তার মান থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানুষ 'প্রাণের চেয়ে মান, এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড় মনে করে।' এই মানের জিদেই মানুষ পৃথিবীতে যত কিছু মহৎ কাজ করেছে, মান রাখতে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে।

সংকল্প-সাধনের জন্য মানুষ তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে। প্রত্যেক উপায়েই শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। শিশু যা চায়, তা পাবার জন্য হাত পা ছোঁড়ে, এবং শেষে কাঁদতে শুরু করে। কেউ যদি সে কথায় কর্ণপাত না করে, তা হ'লে সে কাঁদতে কাঁদতে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন মা-বাপকে বাধ্য হয়ে শিশুর কাছে আসতে হয়। আর একটু বয়স বাড়লেই সে অভীষ্টলাভের জন্য কলহ করতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের কলহ শুরু হয় এইভাবেই স্বার্থলাভের সংঘর্ষে। তাতে কষ্ট পায় ছেলেমেয়েরাই। শৈশবের এই একগুঁয়েমি কৈশোরে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে কিছুটা সাধুপথে চলে, সংযমের বাঁধা পথ ধরে। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও কিশোরের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হয়। খেলতে খেলতে হাত-পা ভাঙে, তবুও জয়লাভের আশায় খেলতে হয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলা এবং নানাবিধ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা কৈশোরে এই জিদকে মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। যৌবনের জিদ আরও প্রবল।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন'—এই হ'ল বিশ্বকল্যাণের বাণী। নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য অনেকেই অনেক কষ্ট সহ্য করেন। ব্যক্তিগত জীবন-সাধনাতেও মানুষ সংকল্প-সিদ্ধির জন্য যে কোন কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং যারা পারে তারাই জীবনে কৃতকার্য হয়। সত্য-রক্ষার জন্য, প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য দৃঢ়সংকল্প থাকা চাই। যে তরলমতি, যে জীবনকে সত্য জ্ঞান করে না, যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সামান্য বিপদেই সে কর্তব্যচ্যুত হয়।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি বিশিষ্ট কর্তব্য বা ব্রত আছে। সেই কর্তব্যই তার জীবনমন্ত্র। কেউ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ বা যোদ্ধা নাবিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হ'তে চায়। প্রত্যেক মানুষের কর্মধারাই তার পক্ষে তপস্যা। প্রত্যেক কাজেরই একটি বিশেষ উন্মাদনা আছে, প্রকৃত কর্মবীর সেই উন্মাদনা আস্বাদন করেন। কর্মের প্রতি এই অনুরাগ মানুষকে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে।

মানুষ হ'তে হ'লে জীবনের পুরো দাম দিতে হবে, নতুবা ভাগ্যে মিলবে শুধু অপমান আর মৃত্যু। অলসতায় বা বিফল আমোদ-প্রমোদে যারা বহুমূল্য সময় নষ্ট করে, তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিফলতা বরণ ক'রে পরে অনুতাপ করতে থাকে। যে কোন বিষয়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন দৃঢ়সংকল্প-নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। দীনহীন কাঙালের সন্তান নিজ পুরুষকার-বলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ ক'রে নিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু সংকল্পনিষ্ঠার আনুকুল্যে। সেই সব কোটি কোটি মানুষের তপস্যার কথা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে।

সাধনপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গান*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীরামপ্রসাদ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। জগদম্বা তাঁর কন্যারূপে এসে তাঁর বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন তিনি মাকে বেঁধেছিলেন ভক্তি প্রেম ও অনুরাগের ডোরে। কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে ডাকতেন। প্রতি গানের মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তরের এই আর্তিভাব ফুটে ওঠে। এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি মাকে ডাকতেন, অন্তরের কাতর প্রার্থনা জানাতেন। এই গানই ছিল তাঁর সাধনা। মা-ই ছিল তাঁর একমাত্র কামনার বস্তু, সকরুণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্যাকুলভাবে তিনি গান গেয়ে গেয়ে মাকে ডেকেছেন। তিনি সংসারের সম্পদ্ ঐশ্বর্যকে বলছেন, 'সামান্য ধন'। তাঁর একমাত্র সম্পদ্ 'মা'। যে সম্পদ্ লাভ করলে অন্য সব সম্পদ্ তুচ্ছ বোধ হয়, সেই 'মাতৃ-ধন'ই তিনি চাইছেন। এই তাঁর জীবনের শিক্ষা। তিনি মধ্যবিত্ত, প্রায় দরিদ্র ছিলেন বলা যায়। গ্রাম ছেড়ে জীবিকার জন্যে তাঁকে আসতে হয় কলকাতায়, সেখানে এক ধনীর ঘরে তিনি খাতা লেখার কাজ নেন। এখানেও তিনি গান বাঁধতেন। হিসেবের খাতায় লিখেছিলেন, 'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।' ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি মাকে ডাকছেন, সব সম্পদ্ ছেড়ে তিনি মায়ের খাস-তালুকের তবিলদারী চাইছেন। তাঁর জীবনের শিক্ষা অপূর্ব ত্যাগ, ভোগে বিতৃষ্ণা। মানুষ বিষয়ের নেশায় ডুবে আছে, কিন্তু তিনি মাকে বলছেন, সামান্য ধনসম্পদ্ তাঁর কাছে তুচ্ছ, তা তিনি চান না; চান শুধু শ্যামাধন, কালীধন তিনি চান। তাঁর গানে—আছে আলো, আছে পথ।

তিনি বলছেন, সাধন-ভজন বিনা গুরুদত্ত মহামন্ত্র হারিয়ে ফেলেছি। তার অর্থ ভগবানকে পেতে হ'লে সাধনের যেমন প্রয়োজন, তার ওপর আরও একটি জিনিস চাই। সাধন করলেও যেমন তাঁকে পাওয়া যায় না, তেমনি না করলেও আবার তাঁকে পাওয়া যায় না, এটি হয় তাঁর কৃপায়। তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায়—তাঁর কৃপা। কৃপানাথ তিনি। 'তাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটিও নড়ে না' ঠাকুর বলতেন। তাঁর কৃপারূপ পরশমণির স্পর্শে তিনি লোহাকেও সোনা ক'রে দেন। তাই আগে তাঁর কৃপা চাই। কৃপা আসে ব্যাকুলতা থেকে, আর্তি থেকে। ঠাকুর বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দাও'। ঐ পাল তোলার পরিশ্রমটি অর্থাৎ সাধন-ভজন করতে হবে। তবে তাঁর কৃপা আসবে। অনুরাগ-মিশ্রিত সাধন চাই। প্রসাদের সাধন কায়িক পরিশ্রমে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে অনুরাগ-মিশ্রিত আকুলতাই তাঁর সাধন। তাই মাকে তিনি হারাননি। তিনি পার্থিব সম্পদ্ চাননি। হৃদিকমলে মাতৃধন চাইছেন তিনি।

'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনের দয়া হ'ল। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল'। রামপ্রসাদ বলছেন, একের দয়া, কিনা মনের দয়া হচ্ছে না। তাই তাঁর মনে সংশয়। মহামন্ত্র তিনি বুঝি বা হারিয়ে ফেলছেন। গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত হচ্ছে না।

---

* আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৯. ১১. ৫৬ সন্ধ্যায় আরাত্রিক অন্তে ধর্মপ্রসঙ্গ। শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।

বিষয়াসক্ত মন সোজা হচ্ছে না। এর জন্যে চাই সাধুসঙ্গ। ঠাকুর বলতেন, 'ভিজে দেশলাই যতই ঘসো, জ্বলবে না। তাকে শুকিয়ে নাও, ফস্ ক'রে জ্বলে উঠবে।' সাধুসঙ্গে শুকিয়ে নাও, তবে জ্বলবে। তাই তিনি প্রার্থনা করতেন, 'মা, তুই কৃপা ক'রে এসে হৃদয়ে বোস্, তবেই জীবন সার্থক হবে। সব চেয়ে মজা এই, যতই তাঁর দিকে এগনো যায়, মনে ততই আক্ষেপ আসে যে, কই কিছুই হচ্ছে না। আরও চাই আনন্দ। এতে মন তৃপ্ত হচ্ছে না। আর যারা অল্প কিছু পায়, তারা মনে করে—কত না জানি পেয়েছে!

রামপ্রসাদ আবার বলছেন, 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না, এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।' আবাদই সাধনা,—এই সাধনের সময় গুরুদত্ত বীজ-রোপণ। সাধনকালে 'নাম' বীজ রোপণ করতে হয়। ভক্তিভাবে সাধন করতে হয়। চাষের কালে জমি থেকে ইট-পাটকেল ফেলে দিয়ে, আগাছা সরিয়ে জমিকে পরিষ্কার করতে হয়; সেই পরিষ্কার জমিতে সার এনে দিতে হয়, তার পর বীজ পুঁততে হয়। আমরা কিন্তু ঐ জমি তৈরীর দিকে লক্ষ্য রাখি না, শুধু গুরু-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে যাই। দীক্ষাগ্রহণের আগে মন তৈরী করতে হয়। তৈরী জমিতে বীজ দিলে যেমন ভাল ফসল ফলে, তেমনই শুদ্ধ মনে মন্ত্র পড়লে আনন্দ লাভ হয়। শিষ্য চায় সদ্‌গুরু, আবার গুরুও চান শুদ্ধ পবিত্র শিষ্য।

বাইবেলে এইটি বোঝাবার জন্য একটি সুন্দর দেওয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি কিছু বীজ নিয়ে এসে জমিতে ছড়াতে লাগলো। তার সেই বীজ কিন্তু সবই ভাল জমিতে প'ড়ল না; কিছু প'ড়ল পথে, কিছু প'ড়ল পাহাড়ে, কিছু কাঁটাগাছের মধ্যে—ঝোপে, আর কিছু প'ড়ল উর্বর জমিতে। যে বীজগুলি পথে প'ড়ল, পাখী এসে সেগুলি খেয়ে নিল, যেগুলি পাহাড়ে প'ড়ল, সেগুলি অঙ্কুরিত হ'ল না, রৌদ্রে শুকিয়ে গেল। যেগুলি কাঁটাঝোপে প'ড়ল, সেগুলি একটু বড় হ'তে না হতেই কাঁটা গাছের চাপে মরে গেল। আর যেগুলি চষা উর্বর জমিতে প'ড়ল, সেগুলি থেকে চারা বেরুল আর সুন্দর ফসলে মাঠ ভরে উঠল।

যেখানে সেখানে বীজ পড়লে ফসল হয় না, চাষ-করা জমি চাই। সাধন করতে হয়, কিন্তু অহংকার করতে নেই। মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ো না। অহংকার বর্জন কর, কাউকে হেয় ক'রো না। ঐ বীজ থেকে যখন চারাগাছ দেখতে পাবে, তখন তাতে বেড়া দেবে। সাধক রামপ্রসাদ জগদম্বাকে জেনেছিলেন, তাই তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলা কর্তব্য।

তৈরী-করা জমিতে বীজ বপন করতে হয়, কিন্তু একটি কথা, পুরুষকারের ওপর নির্ভর করলেই হয় না—অর্থাৎ শুধু সাধন করলেই হয় না। দৈব ব'লে একটি জিনিস আছে। কত পরিশ্রম ক'রে চাষী নিজ পুরুষকারের দ্বারা অনুর্বর জমিকেও উর্বর ক'রে তোলে। কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয়, তবে তো সবই পণ্ড, ব্যর্থ সব পরিশ্রম! চাই বৃষ্টি—দেবতার কৃপাবারি এর সঙ্গে কিন্তু আরও একটি বিষয় আছে, সেটি কাল—শুভ সময়, শুভ মুহূর্ত।

কোন কিছুতে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে চাই তিনটি একসঙ্গে—পুরুষকার, দৈব আর শুভ সময়। এইগুলির একত্র যোগাযোগ হ'লে তবে ফললাভ। এদের মধ্যে একটি তোমার হাতে, আর বাকী দুটি দেবতার

হাতে—কৃপা ও সময়। আমরা বলি, এর এখন ভাল সময় চলছে, ওর এখন সময় ভাল নয়। এই সময় ভাল-খারাপ এলোমেলো ভাবে আসে না, আসে কর্মফল থেকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেবতা প্রতিকূল থাকায় ফললাভ হয় না। কিন্তু তাই ব'লে চেষ্টা ছাড়বে না, কোন্ সময় যে দৈব অনুকূলে আসবে তা তুমি জানো না। তাই পুরুষকারও চাই, চেষ্টা তুমি ক'রে যাবে, সাধন ক'রে যেতে হবে, আর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে শুভলগ্নের ও দৈবী কৃপার। ঠাকুর 'খানদানী চাষা'র উদাহরণ দিতেন। জন্মগত পেশা তার চাষ করা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি—সব সময়ই সে চাষ ক'রে যায়। স্নানাহারের সময় তার থাকে না। একগুঁয়ে হয়ে কাজ ক'রে শেষে সারাদিন পরে যখন দেখে জমিতে কুলকুল ক'রে জল আসছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তামাক খায়।

কিন্তু এই পুরুষকার ছাড়া দৈবকৃপারও সময় আছে। স্বামীজীর জীবনে দেখি, তাঁর বাবা মারা যাবার পর তিনি কত চেষ্টা করলেন, কত অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, কিন্তু কোন সুবিধা হয়নি। পুরুষকার বিফল হয়েছে। দৈব ও সময় এখানে প্রতিকূল ছিল। আবার সময় ও দৈব অনুকূল থাকা সত্ত্বেও পুরুষকার না থাকায় ফললাভে বঞ্চিত হ'তে হয়। তাই অপেক্ষা করতে হয়, লেগে থাকতে হয়। সবই তাঁর কৃপায় হয়। হিটলার অত প্রবল পরাক্রান্ত হলেন, পুরুষকার, দৈব ও শুভ সময়ের একত্রমিলনের ফলে। কিন্তু যখন তাঁর সময়ের পরিবর্তন হ'ল, তখন পুরুষকার থাকা সত্ত্বেও তাঁর কি হ'ল! সব সময় এই তিনটির প্রয়োজন। তাই রামপ্রসাদ বলছেন, কৃষিকাজ ছাড়বে না, চাষ করতে হবে। বীজ যেমন জমিতে পড়বে, সেই রকম ফল পাবে। ঐ 'খানদানী চাষা'র মতো নিষ্ঠা চাই।

ঐ মহাজনদের প্রদর্শিত পথই পথ। এই পথ অনুসরণ করেই তাঁরা ভগবানকে লাভ করেছিলেন, সব ত্যাগ ক'রে তবেই তাঁকে পেয়েছিলেন। সংসারী হওয়া সত্ত্বেও রামপ্রসাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল—মা; তাঁর সব আসক্তি ছিল মায়ের ওপর। আর আমাদের লক্ষ্য—টাকাকড়ি। সেটা তাঁর কাছে 'সামান্য ধন'। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, পথচ্যুত হয়ে চলছি। এঁদের প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলতে হবে। ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' ব'লে বলছেন, 'মা তোকেই চাই, টাকা চাই না।' মা-ও চাই, টাকাও চাই—তা হয় না।

ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ! এই ভোগসুখ ত্যাগ। বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ—দুটিই আনন্দ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষেরটি পেতে হ'লে ভেতরের আগাছা দূর করতে হয়। যাদের পূর্বজন্মের সংস্কার আছে, তারা জমি পরিষ্কার করেই গুরুর কাছে আসে। গুরুর কাজ শুধু 'নাম' বীজ পুঁতে দেওয়া। এই বীজ থেকে গাছ বেরোনোর পর চাষী কত যত্ন ক'রে আগাছা তুলে ফেলে ঝোপ-ঝাড় থেকে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ঝোপ-ঝাড় ও আগাছা হচ্ছে সঙ্গদোষ-জনিত কুচিন্তারাশি, যা মনকে সব সময় বিক্ষিপ্ত করে।

এই সঙ্গদোষই হচ্ছে মারাত্মক। মানুষের মনের অশুভ সংস্কারগুলি বেড়ে ওঠে এই কুসঙ্গে। বিষয়ীর সঙ্গে মিশলে বিষয়-চিন্তাই বেড়ে উঠবে। আর সাধুসঙ্গ করলে সৎ চিন্তার বিকাশ হয়। তাই 'কালীনামের দাও রে বেড়া, ফসলের তছরূপ হবে না।' এই নামের

বেড়া হচ্ছে সৎসঙ্গ। এত খাটুনি, এত যত্ন, কেন? ফললাভ করাই তো উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলতেন, 'সংসারের পথ কলম-বাড়া রাস্তা'। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে যায়। কিছু দূর চলে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'লে দেখা যায়, 'বাবাঃ কতদূর নেমে এসেছি!' সংসারের পথও এমনি ঢালু; ঢালু হ'তে হ'তে ক্রমশঃ অতলে গিয়ে মিশেছে। এই পথ কেবল টেনে নিয়ে যায় বিষয়ের দিকে। তাই ঐ স্রোত না ফিরালে ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গই এই স্রোত ফেরাতে একমাত্র সহায়। বিষয়ীদের বদ্ধচিন্তা, এর থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে লক্ষ্যে স্থির থাকা চাই।

প্রসাদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই—ত্যাগ; 'সামান্য ধন' তিনি চান না। তারপর চাষ করা—সাধন-ভজন করা। 'সাধন করনা চাহিরে মনুয়া'। বিষয়-তৃষ্ণা এত বেশি যে, মন কখনও ভরে না। শুধু আরও চাই, আরও দাও—এই মনোভাব। এটি প্রসাদ বুঝেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন শ্যামাধন—কালীধন। সংসারের তেতো-মিষ্টি খেয়ে তিনি এর অসারত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেদিকে ফিরেও তাকাননি। আর আমরা তেতো বা কটু যখন খাই, তখন সেই মুহূর্তের জন্য সাময়িক অবসাদ আসে মনে। মুখে বলি আর খাব না; কিন্তু কিছু পরেই তার তিক্ততা ভুলে যাই, আবার ডুবে যাই সংসারের তিক্ত-কটু রসে।

যার মন এই বিষয়ানন্দ থেকে একেবারে উঠে গেছে, সেই পারে বলতে 'কাজ নাই মা, সামান্য ধনে'। কারণ সে যে আরও বেশী আনন্দ চায়, আরও বেশী সম্পদের অধিকারী হ'তে চায়! চতুর্বর্গপ্রদায়িনী শ্যামা-ধনকেই সে চায়।

ঠাকুর এই ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শ্যামা-মা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি মাকে দেখতেন, এবং স্পর্শ করতে পারতেন তাঁর মায়ের সেই ভাবঘন দিব্য তনু। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যদের তিনি বলছেন, 'সত্যি বলছি, মাইরী বলছি, মাকে আমি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি।'

কোন সাধকের জীবনে এরূপ দেখা যায়নি। সাক্ষাৎ জগদম্বা কন্যারূপে এসে রামপ্রসাদের কাজ ক'রে দিচ্ছেন। একটি গানে তিনি বলছেন, 'মন তুমি কৃষি-কাজ জানো না'। আমরা আমাদের এই মনুষ্যজন্মে, শুধু বিষয়-চিন্তাতেই মগ্ন থেকে গেলাম, যে মনে ইচ্ছা করলে সোনা ফলাতে পারতাম, ভগবানকে লাভ করতে পারতাম, সেই মন সংসারের বিষয়-সম্পদে দিয়ে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিলাম! তাই সাধক কবি বলছেন—তুমি ভাল চাষী নও, আবাদ করবার জ্ঞান তোমার নেই, ভালমন্দ বিচার তোমার নেই।

এর ফলে সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মন এখানে শত্রুর কাজ করছে। সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণা মনই দিচ্ছে। তাই ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে বলছেন, 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো।' সব স্বাধীনতা হারিয়েছি, চোখে ঠুলি দিয়ে অন্ধের মতো ঘোরাচ্ছ। মোহান্ধ ক'রে মায়ায় বদ্ধ ক'রে রেখেছ মা! এই সংসার-চক্রে, ভবের গাছে অবিরত পাক খাওয়াচ্ছ, ঠিক বলদের অবস্থায় রেখেছ। তাই ব্যাকুল হয়ে মাকে তিনি বলছেন, মা, আমায় আসল ফেলে, নকল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ। 'বিবেক' তিনি প্রার্থনা করছেন। এই ভবের হাটে চলতে গেলে বিবেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়, ভাল-মন্দর বিচার সেই ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মানব-প্রকৃতি দুই রকম, কুলোর মতো আর চালুনির মতো। কুলো ভুষি ফেলে দিয়ে শস্যের দানাগুলি ধরে রাখে, আর চালুনি শস্যের সার ফেলে দিয়ে অসার ভুষিকেই ধরে রাখে। সাধারণ মানুষের স্বভাব চালুনির মতো, সার ফেলে দিয়ে, অসার, অপ্রয়োজনীয় অংশকেই ধরে রাখে। কিন্তু বিবেকবান্ যারা, তাদের কুলোর প্রকৃতি। তাই প্রাণভরে মন মুখ এক ক'রে ঐ কুলোর স্বভাব প্রার্থনা কর, ভাবের ঘরে চুরি নয়, প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা। এগুলি সহজ নয়। এতে চাই আবেগ, আকুলতা, ক্রন্দন। তবে আসবে এই অবস্থা।

রামপ্রসাদ বলতেন, 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরুমূলে (রে মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' রাজসিক মন বাহ্যবস্তু নিয়েই ব্যস্ত, সে খোঁজে শুধু কি ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানো যায়, কিন্তু সাত্ত্বিক মন বিচারবান্, ফুলের মতো। ইন্দ্রাদির সম্পদ্ও তার কাছে তুচ্ছ। হরিদ্বারে এক সাধু দেখেছিলাম আশী বছর বয়স, তিনি বলতেন, 'পর্বতপ্রমাণ সোনা সামনে দেখলেও তাতে মন আকৃষ্ট হয় না।' তাহলেই বোঝো, এমন কিছু একটা তিনি পেয়েছেন, যার তুলনায় এই বিরাট অর্থও তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তাঁর সেই বস্তু নিশ্চয়ই এটির থেকে বেশী আনন্দপ্রদ। সেটি হ'ল ভূমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যা পেলে সব ভোগ্য বস্তুই নগণ্য মনে হয়।

রামপ্রসাদ মুক্ত হয়ে মাকে ডেকেছিলেন, কত দুঃখ পেয়েছেন এই সময়, কিন্তু বিচলিত হননি, তাঁর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেননি, আবার মা ব'লে তাঁকেই জড়িয়ে ধরেছেন, তিনি জানতেন, মা-ই তাঁর একমাত্র শরণ, মা ছাড়া তাঁর গতি নেই। ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এটি শাস্ত্রমতে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। অনেক কষ্ট ভোগের পরই আসেন আনন্দময়ী। প্রসাদও তাই বলছেন, 'ভূতলে আনিয়া মাগো, করলি আমায় লোহাপেটা—আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।' ছেলে বিপদে পড়লেও মাকে কখন ছাড়ে না, পাতানো মাকে ছাড়া যায়, কিন্তু নিজের মাকে কি ছাড়া যায়? সম্পদে বিপদে কখন মাকে ছাড়া যায় না। 'আর কারে ডাকবো শ্যামা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।' গলা ধরে ফেলে দিলেও তবু 'মা, মা' ব'লে ডাকে। সকল অবস্থায় মা-ই আমাদের আশ্রয়। মাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব?

প্রেম-প্রীতি অনুরাগ এলে মন স্বার্থলেশহীন হয়ে যাবে। তাই তিনি পথ দেখাচ্ছেন—'আয় মন বেড়াতে যাবি'—কালী-কল্পতরুমূলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্বর্গ-ফল পাওয়া যায়। ঠাকুর একটি সুন্দর গল্প বলতেন: একটি লোক অরণ্যের পথ ধরে যেতে যেতে শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে এসে বসেছে। এখন সেই গাছটি ছিল কল্পবৃক্ষ। তার কাছে যা চাওয়া যেত, তাই পাওয়া যেত। সেই লোকটি সেখানে বসে বসে চিন্তা ক'রল,'আহা, একটি পালঙ্ক যদি তার থাকত, তবে সে বেশ আরামে একটু ঘুমিয়ে নিত,' ব্যস্, যেই না চিন্তা করা, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক পালঙ্ক এসে হাজির! সে বেশ আরাম ক'রে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, কিছু পোলাও-কালিয়া যদি এখন পাওয়া যেত, খিদেটা মিটত। সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগ খাদ্য এসে উপস্থিত! সে পেট ভরে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য খেয়ে শুয়েছে, আর ভাবছে, এখন কেউ যদি এসে একটু সেবা ক'রত, তবে সময়টা মন্দ কাটত না। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার

পদসেবা করতে শুরু ক'রল। এই আনন্দের মধ্যে লোকটি মনে ক'রল, এই জঙ্গলে এখন যদি বাঘ এসে তাকে খায়! ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট বাঘ এসে তাকে ধরে হালুম ক'রে খেয়ে নিল। ভোগের এই অবস্থা!

গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বলা হয়েছে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। প্রসাদ বলছেন, মায়ের কাছে যাওয়ার পথে নিষ্কামভাবে যেতে হয়। তিনি বলছেন, মনের দুই পত্নী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। 'প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।' বিষয়ের মধ্যে থেকেও প্রসাদ বিষয় ভোগ করেননি। ত্যাগকেই তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন। আমরা মায়ের কাছে লাউ-কুমড়ার মতো তুচ্ছ জিনিস চাই। কিন্তু তিনি চাইছেন 'অমৃতফল'। ঠাকুর একটি গান গাইতেন; রাবণের মৃত্যুবাণ আনবার জন্য মহাবীরকে লঙ্কায় রাজপুরীতে যেতে হয়েছিল, তিনি সেখানে স্ফটিক-গুম্ভ ভেঙে মৃত্যুবাণ পেয়েছিলেন। ছাতে এসে বসে তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন মন্দোদরী কিছু ফল এনে তাঁকে তুচ্ছ বানর মনে ক'রে ভুলিয়ে মৃত্যুবাণ নিয়ে যাবেন, ভাবলেন। কিন্তু মহাবীর গানের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলেন, 'আমার কি ফলের অভাব, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম সফল।'

তিনি মোক্ষফল পেয়েছিলেন; রাম-রূপ মোক্ষফল তিনি হৃদয়ে ধারণ করতেন। তিনি শ্রীরাম-কল্পতরুমূলে বসে রয়েছেন, যখন যে ফল বাসনা করেন, তখনই সে ফল পান। 'আমি ও ফল চাই না, যাব তোদের প্রতিফল দিয়ে।'

প্রসাদ বলছেন, মনের প্রবৃত্তি-জায়া হচ্ছে সংসার। আর নিবৃত্তি হচ্ছে বৈরাগ্য। প্রবৃত্তির সন্তান কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। প্রসাদ এদের পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়া পত্নী নিবৃত্তির গর্ভজাত পুত্র বিবেককে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছেন। তিনি মাতৃকল্পতরুমূলে যেতে বলছেন, বিবেককে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে চারি ফলের মধ্যে মোক্ষফলই তাঁর কাম্য। ত্যাগের পথে তিনি অন্তরে প্রবেশ করছেন। এ পথে যেতে হ'লে ভগবানে আসক্ত হ'তে হবে। এ পথে বিবেকই সম্বল, এটি সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সৎ-অসৎ বিচার ক'রে পথ দেখিয়ে দেবে, নিত্য-অনিত্য বুঝিয়ে দেবে, তাই এটি চাই সঙ্গে। বুদ্ধের বিবেক লাভ হয়েছিল; প্রথম জীবনে রাজ-ভোগে তিনি সংসার করলেন, হঠাৎ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও সন্ন্যাসীকে দেখে জীবনে তাঁর বিতৃষ্ণা এল। তিনি বিবেক লাভ করলেন; তারই প্রেরণায় তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ ক'রে অমর হয়ে গেলেন। লালাবাবুরও তাই ধোপানীর 'বেলা যায়' কথাটি শুনে চৈতন্যের উদয় হ'ল, বিবেক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বিবেকই জীবকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। আলোর পথের দিশারী বিবেক।

রামপ্রসাদের গান তোমাদের নূতন জীবনের পথ দেখাক। শুধু সংসার করা নয়, গতানুগতিকতা নয়। বিবেককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পথে চলো! তাঁর হও! তবেই এ মানবজন্মের সার্থকতা।

রামমোহন-স্মরণে

অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতের নতুন যুগের গোড়াকার লোক রাজা রামমোহন রায়। ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির যে জোয়ার এসেছিল, তার অনেক কিছুরই সূচনাতে আছেন রামমোহন। রামমোহনকে বাদ দিয়ে বাংলা বা ভারত সমাজ-সংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। আজ এক-শ' আটাশ বছর হ'ল রামমোহন গত হয়েছেন। ১৭৭২ খৃঃ জন্মগ্রহণ ক'রে ১৮৩৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ব্রিস্টলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পুণ্য কর্মের উত্তরাধিকারী আমরা তাঁর কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

রামমোহনের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও বিস্তৃত। বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, এমন কি তিব্বতী ভাষাও তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। এ ছাড়া বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে ভাব-প্রকাশের উপযুক্তরূপে রূপায়িত করেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন এবং এইজন্যে প্রথমে 'আত্মীয়সভা' এবং পরে ১৮২৮ খৃঃ 'ব্রাহ্মসভা' সংগঠন করেন। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের যে আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার আদিতে ছিলেন রামমোহন। ধর্মের ব্যাপারে চারটি জিনিসের তিনি ঘোর সমালোচক ছিলেন - গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পুরোহিত-তন্ত্র। সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহনের প্রচেষ্টা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরের দুরভিসন্ধি রোধ করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। হিন্দুধর্মের আসল রূপ কী, তার ব্যাখ্যানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্‌বিশ্বাস জাগরিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজের অনেক ব্যাপারেই রামমোহন হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আমরা জানি তার মধ্যে প্রধানরূপে খ্যাত হয়ে আছে সতীদাহপ্রথা-নিবারণ। সে সময় সতীদাহের সরকারী সংখ্যা ছিল বছরে পাঁচ-শ'র ওপর। এর বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে রামমোহন এর জন্যে লড়াই করেছিলেন। অবশেষে ১৮২৯ খৃঃ বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের ঘোষণায় এই নিষ্ঠুর প্রথা আইনতঃ রদ করা হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন একজন অগ্রণী পুরুষ। বিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে যে কথাবার্তা চলে, রামমোহন তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে একটা ভাল দিক আছে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনিই সর্বপ্রথম তাকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। এ সম্বন্ধে তিনি যে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, তার

অধিকাংশ তাঁর মৃত্যুর পরে লর্ড মেকলে-প্রচারিত 'শিক্ষা-বিবরণে' স্থান পেয়েছিল। বিখ্যাত মিশনরী শিক্ষাপ্রচারক ডাফ সাহেব যখন এদেশে আসেন, তখন রামমোহন তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

জাতীয় নানা ব্যাপারে রামমোহন সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। ব্রিটিশ প্রভুত্বের দুষ্ট অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি সতর্ক ছিলেন এবং কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, শুধু জাতীয়তাবোধই নয়, রামমোহনের মধ্যে সেই সময়েও একটা আন্তর্জাতিক বোধ জাগরূক ছিল। তদানীন্তন অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি আলোকসম্পাত ক'রে গেছেন।

ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও কর্মসাধনাকে রূপ দিতে তিনি বহু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি 'সংবাদকৌমুদী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র এবং 'মিরাত-উল-আকবর' নামে একটি ফারসী সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন একজন অগ্রগণ্য পুরুষ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদিকার যোদ্ধা।

ভাবতে অবাক্ লাগে যে, একজন মানুষ কত দিন আগেই আমাদের সমাজব্যবস্থার অবনতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এবং তার সংস্কারের জন্যে সক্রিয় সাধনা করেছিলেন। কতদিন আগেই একজন মানুষ দুই বিশাল ও ভিন্ন সংস্কৃতির—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন। আর কতদিন আগে একজন মানুষের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা, স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতীয়কে ভালবাসা।

নিঃস্বার্থ কর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, 'মহান্ হিন্দু-সংস্কারসাধক রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই নিঃস্বার্থ কর্মের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। সমস্ত জীবনটাই তিনি দিয়ে গেছেন ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে।...যশ বা নিজের ফলাফলের জন্যে তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেননি।'

এমনই মানুষ ছিলেন রামমোহন।

জয়তু রামমোহন।

That has been the one great cause, that we did not go out, that we did not compare notes with other nations,—that has been the one great cause of our downfall, and every one of you knows that that little stir, the little life that you see in India, begins from the day when Raja Rammohan Roy broke through the walls of exclusiveness. Since that day, history of India has taken another turn, and now it is growing with accelerated motion.

— *Swami Vivekananda in 'Reply to Calcutta Address.'*

শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপক্রমণিকা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'এখনকার লোক সব সেয়ানা। (ঠাকুরের) ছবিটি তুলে নিয়েছে। কোনও অবতারের কি ছবি (ফটো) আছে?' জনৈক ভক্ত একদা শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, 'ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।' অপর এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, 'ঠাকুরের ধ্যান আর কি? তাঁর ফটো দেখলেই হবে। ছায়ায় কায়ায় ভেদ নেই। ফটোতে তিনি স্বয়ং রয়েছেন।'

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জনৈক সহচর লিখেছেন, 'তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই।'

ক্যামেরায় তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের চারিটি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়।—দুটি দণ্ডায়মান, একটি উপবিষ্ট, আর একটি শেষ-শয্যায় শায়িত অবস্থার। প্রথমোক্ত চিত্র-তিনটি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকাকালে এবং শেষোক্তটি মহাসমাধিলাভের পর তোলা হয়। এই ফটোগ্রাফগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে গৃহীত। বস্তুতঃ এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও তাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিমেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত ফটো-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি ফটো দেশে বিদেশে সর্বত্রই সুপ্রচারিত, নানা পুস্তক-পুস্তিকায় এবং পত্র-পত্রিকাদিতে বহুল-প্রকাশিত। কিন্তু শেষোক্ত চিত্রটি একরূপ অপ্রকাশিতই বলা চলে। এই চিত্রটি পুস্তক-পত্রিকাদিতে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রথম ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ফটোটি গৃহীত হয় ১৮৭৯ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার, কেশব-ভবনে। তাঁর দেহ তখন রুগ্‌ণ, কঠোর তপশ্চর্যার ফলে বিশীর্ণ; কিন্তু তাঁর মুখকমল এক স্বর্গীয় লাবণ্যে ও মধুর সুষমায় উৎফুল্ল।

ব্রাহ্ম উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সাদর নিমন্ত্রণ ক'রে ঐ দিবস সার্কুলার রোডস্থিত স্বীয় 'কমলকুটীর' ভবনে নিয়ে আসেন। কেশব-ভবনে ঐ মহোৎসব-বাসরে ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল সুমধুর কীর্তন গাইছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের ভাবপূর্ণ সংকীর্তন শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য আনন্দে আত্মহারা হন। তিনি ঈশ্বরপ্রেমে ভাবস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি প্রেম-গদ্‌গদ স্বরে ওঁকার-ধ্বনি করতে করতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পূর্বক সহসা দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হয় এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। তাঁর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য নিস্পন্দ নিথর দেহখানি পাছে ভূতলে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁর ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ তাঁকে ঐ অবস্থায় সন্তর্পণে ধারণ করেন। ঐরূপ ভাবাবস্থায় হঠাৎ দণ্ডায়মান হবার সময় তাঁর বাম স্কন্ধস্থিত সুবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চলটি ভূলুণ্ঠিত হয়। হৃদয় উহা সযত্নে তাঁর কটিদেশে বেঁধে দেন। যা হোক,

শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য ভাবে গভীর সমাধিনিমগ্ন দেখে কেশবচন্দ্র তখন তাঁর ঐ অপরূপ নয়নাভিরাম মূর্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেন।

ঐ মূল ফটোটিতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণ হস্তটি উর্ধ্বে উত্তোলিত এবং ঐ হস্তের অঙ্গুলিসকল মৃগমুদ্রাযুক্ত। বাম হস্তটি তাঁর বক্ষোদেশে সংস্থাপিত, এই হস্তের অঙ্গুলিগুলিও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত। তাঁর মনোহর মুখশ্রী দিব্যহাস্যে সমুৎফুল্ল; নেত্রযুগল নিমীলিত, অপার করুণায় বিগলিত। তাঁর বদনমণ্ডল এক অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত, অভয় পাদপদ্মযুগল সুরঞ্জিত কার্পেট-আসনে স্থাপিত। পরিধানে কিঞ্চিৎপ্রশস্ত-পাড়যুক্ত শুভ্র বসন। গায়ে ফুলহাতা কামিজ। কটিদেশে সুবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চল। তাঁর পশ্চাতে কিঞ্চিৎ বামভাগে হৃদয়রাম দণ্ডায়মান। তিনি মাতুলের বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ কোমল অঙ্গখানি অতি সন্তর্পণে ধারণ ক'রে রয়েছেন। ত্রৈলোক্য সান্যাল এবং আরও জন-সাতেক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে মেজেতে গালিচার উপর উপবিষ্ট। ত্রৈলোক্যের সম্মুখে (শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পদতলে) একটি মৃদঙ্গ এবং সকলের পশ্চাদ্ভাগে কাষ্ঠনির্মিত ঝিলিমিলিযুক্ত একটি পর্দা স্থাপিত।

হাততোলা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে-চিত্রটি সর্বত্র দেখা যায়, সেটি কেশব-ভবনে গৃহীত এই মূল ফটোগ্রাফেরই অন্তর্গত চিত্র। কোথাও দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভাবে একক দণ্ডায়মান। কোথাও বা দেখা যায়, তাঁর পশ্চাতে হৃদয় তাঁকে ধরে রয়েছেন। এই মূল ফটোগ্রাফের পরিপূর্ণ চিত্রটি কচিৎ দৃষ্ট হয়। পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকায় বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে অগ্রহায়ণ), শনিবার। রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ কমলকুটীরে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁর ঘরের দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দণ্ডায়মান সমাধি-চিত্রটি টাঙানো ছিল। কেশববাবু এই চিত্রখানির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রসঙ্গতঃ বলেন, 'এরূপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য—এঁদের হ'ত।'

কেশববাবু গাজিপুরে বিখ্যাত যোগিরাজ পওহারী বাবাকে দর্শন করতে যান। বাবাজীর অত্যাশ্চর্য যোগ-সমাধি দর্শনে তিনি বিমুগ্ধ হন। অতঃপর আলাপন-প্রসঙ্গে তিনি বাবাজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, মহাভাব, নির্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি অসাধারণ যোগাবস্থার কথা বলেন এবং তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধি-চিত্রখানি দেখান। বাবাজী এই চিত্র-দর্শনে বিমোহিত হন এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মহান্ যুগত্রাতা পুরুষ ব'লে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেন। বাবাজী কেশববাবুর নিকট হ'তে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ প্রতিকৃতিটি পরম আগ্রহভরে চেয়ে নেন এবং সযত্নে সেটি নিজ গুহাস্থিত কক্ষে রক্ষা করেন।

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার—কোজাগর লক্ষ্মীপুজা-দিবস। কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ সহ অপরাহ্নে স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবিন-ঘরে সমাধিস্থ। ঐ ঘরে কেশব, বিজয় এবং আরও বহু ভক্ত উপস্থিত। 'কথামৃত'-কার মাস্টার মহাশয়ও সেখানে রয়েছেন। গাজিপুরের নীলমাধববাবু এবং তাঁর জনৈক ব্রাহ্মবন্ধুও সেখানে আছেন। কেবিনে তিলধারণের স্থান নেই, বাহিরেও বহু ভক্ত। সকলে নির্ণিমেষ

নেত্রে পরম-পুরুষের সমাধিমগ্ন নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শন করছেন। তাঁর ঐ অপূর্ব সমাধি দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমশঃ তাঁর বাহ্যজ্ঞান হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধি দর্শনে নীলমাধব-বাবু ও তাঁর উক্ত বন্ধু পওহারী বাবার প্রসঙ্গ করছেন। জনৈক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে সবিনয়ে বলছেন, 'পওহারী বাবাকে (এঁরা) দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন, আপনার মতো আর একজন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশঃ অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। এখনও কথা বলতে পারছেন না। ব্রাহ্মভক্তটির ঐ কথা শুনে তিনি ঈষৎ হাস্য করলেন। ব্রাহ্মভক্তটি তাঁকে আরও বললেন, 'মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হাস্যে নিজ দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, 'খোলটা'। 'কথামৃত'কার শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, 'বালিশ ও তার খোলটা। দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী। অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর ক'রে কি হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত?'

অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার বলেন, 'তবে একটা কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাস স্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁর জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' যুগাবতার ও মহাপুরুষগণের দেহের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা 'ভাগবতী তনু' প্রাপ্ত হন। তাঁদের দেহ চিন্ময়।

১৮৮২ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর, সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে প্রসঙ্গ করছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি): —এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, 'কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবো। তুমি যাবে?' হলধারী বললে, 'একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?' হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে, 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐ কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়'।

১৮৮৩ খৃঃ ১লা জানুআরি। সাকার-পূজা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈক মারোয়াড়ী ভক্তকে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।'

১৮৯০ খৃঃ ফেব্রুআরি-মার্চ মাস। স্বামীজী গাজিপুরে পওহারী বাবার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বাবাজীর অদ্ভুত ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনয়-ভক্তি ও মহোচ্চ যোগাবস্থা দর্শনে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি যোগ-

শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাবাজীকে যোগ-শিক্ষার আচার্যরূপে বরণ করার সংকল্প করেন।

স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য ও প্রধান পার্ষদ—একথা বাবাজী তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অবগত হন। একদিন বাবাজী তাঁকে নিজ গুহায় নিয়ে যান। স্বামীজী সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত ফটোটি দর্শন ক'রে চমকিত হন। অতঃপর তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবোদয় হ'ল। ফলে, তাঁর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং নেত্র-যুগল অশ্রুপ্লাবিত হয়। ঐরূপ আবিষ্ট অবস্থায় তিনি তথায় বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকেন। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লে তাঁর অন্তরে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—'শ্রীরামকৃষ্ণ, না পওহারী বাবা?'

এই ঘটনার পর স্বামীজীর আরও আশ্চর্য দর্শনাদি ও দিব্য অনুভূতি লাভ হয়। তার ফলে, তিনি বাবাজীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তিনি লেখেন, 'আর কোনও মিঞার নিকট যাব না।'

এই উপলক্ষেই লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়!' নরেন্দ্রনাথের মনে প্রাণে ধ্বনিত হ'তে লাগলো শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সেই গান:

আপনাতে আপনি থেকো,
যেওনা মন কারো ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

দ্বিতীয় ফটোর বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় ফটোগ্রাফটি তোলা হয় ১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে অগ্রহায়ণ), শনিবার। সে দিন ঠনঠনিয়ায় বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে মহোৎসব। রাজেন্দ্র মিত্র পুরাতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মেসোমহাশয়।

ঐদিন বেলা ৩টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সিমলায় মনোমোহন মিত্রের বাটীতে শুভাগমন করেন। তিনি রাজেন্দ্র-ভবনে মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এই উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে মনোমোহনের বাটীতে আসেন। যা হোক, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-গ্রহণের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিঞ্চিৎ জলযোগও করেন। সুরেন্দ্র (সুরেশ) মিত্র এবং আরও কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। সুরেন্দ্র প্রসঙ্গতঃ তাঁকে বললেন, 'আপনি কল (ক্যামেরা) দেখবেন বলেছিলেন—চলুন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। সুরেন্দ্র তাঁকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপরাহ্ণে রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। সুরেন্দ্রের অনুরোধে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা-যন্ত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখালেন ও কিভাবে ফটো তোলা হয়, তা বুঝিয়ে দিলেন—'কাঁচের পিছনে কালি (Silver-Nitrate) মাখানো হয়, তারপর ছবি ওঠে।' শ্রীরামকৃষ্ণ পরম আগ্রহভরে খুঁটিনাটি সকল বিষয় বুঝে নেন।

সুরেন্দ্র এই সুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ফটোগ্রাফ গ্রহণের বাসনা করেন। তিনি চুপি চুপি ফটোগ্রাফারকে নিজ অভিপ্রায় জানান। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যামেরা দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। এই অবসরে তাঁর ফটো তুলে নেওয়া হয়।

এই ফটোটিতে দেখা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। তাঁর দক্ষিণ হস্তটি একটি থামের উপর স্থাপিত; ঐ হস্তের অঙ্গুলি সকল বিশেষ মুদ্রাযুক্ত (অনেকটা মৃগমুদ্রার ন্যায়)। বাম হস্তটি বক্ষোদেশের কিঞ্চিৎ





নিম্নভাগে সন্নিবদ্ধ; এই হস্তের অঙ্গুলিগুলিও এক বিশিষ্ট মুদ্রাযুক্ত। তাঁর পরিধানে ধুতি; গায়ে ফুলহাতা কামিজ, কামিজের উপর রঙিন কোট। বামস্কন্ধে পরিধেয় বস্ত্রের সুবিন্যস্ত অঞ্চলখানি সুশোভিত। পায়ে চটি জুতা। তাঁর চক্ষুদুটি অর্ধনিমীলিত। মস্তকের কেশরাশি সুবিন্যস্ত। বিমোহন মুখশ্রী বিমলানন্দে সমুৎফুল্ল, বদনমণ্ডল এক দিব্য বিভায় সমুদ্ভাসিত। এক অপরূপ সুমোহন মূর্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সুরেন্দ্র মিত্র সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি মনোরম তৈলচিত্র অঙ্কন করান। ঐ চিত্রে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মমত ও বিবিধ সম্প্রদায়ের অনবদ্য সম্মিলন দেখা যায়। একই প্রাঙ্গণে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা অবস্থিত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচার্যগণ তথায় অপূর্ব প্রেমভরে সম্মিলিত। শিবমন্দির ও মসজিদের সম্মুখে যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপার প্রেমে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক মধুরভাবে নৃত্যরত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আচার্যগণ ও ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের প্রতীকচিহ্নহস্তে দণ্ডায়মান। গির্জার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব সেন বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে অভিনব সর্বধর্মসমন্বয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখাচ্ছেন ও আনন্দ করছেন।

এই কল্পিত তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে প্রতিকৃতিটি দেখা যায়, সেটি তাঁর এই দ্বিতীয় ফটোরই চিত্র। সুরেন্দ্র বহু যত্নে এই তৈলচিত্রটি প্রস্তুত করান এবং দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিত্রদর্শনে পরম আনন্দিত হন এবং ভক্তবর সুরেন্দ্রের বহু প্রশংসা করেন।

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার; কোজাগর লক্ষ্মীপূজা-দিবস। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দিন কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণসহ ভাগীরথীবক্ষে ষ্টীমার-ভ্রমণে আনন্দ ক'রে কতিপয় ভক্তসহ সিমলা-পল্লীতে সুরেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শুভাগমন করেন। সুরেন্দ্র কিন্তু অনুপস্থিত, তাঁদের নতুন বাগানবাড়িতে গিয়েছেন। যাহোক, বাড়ির লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা তাঁকে বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে বসান। ঐ কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত সর্বধর্মসমন্বয়ের মনোহর তৈলচিত্রখানি শোভিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চিত্রটির নিকটে গিয়ে এক দৃষ্টে তা দর্শন করেন এবং আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করেন।

১৮৮২ খৃঃ ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রমুখ ভক্তগণকে একটি সুন্দর উপমাসহ কাঁচা-ভক্তি ও পাকা-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপমাটি রাধাবাজারের স্টুডিওতে তাঁর 'কল' (ক্যামেরা) দেখারই অভিজ্ঞতার ফল। যাহোক, তিনি বলেন, 'যার কাঁচা-ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Silver-Nitrate) মাখানো থাকে, তাহ'লে যা ছবি পড়ে, তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।'*

(ক্রমশঃ)

* এই প্রবন্ধের উপাদান 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', শশিভূষণ ঘোষ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব', স্বামীজীর 'পত্রাবলী' এবং বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র হইতে গৃহীত।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার যে ইতিহাস, তাহাতে ১৯৪১ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মার্কিন শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউডের উদার অর্থানুকুল্য সম্বল করিয়া মঠ ও মিশনের কলেজীয় শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা 'বিদ্যামন্দিরে'র শুভ উদ্বোধন এই দিনটিতে হইয়াছিল। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ভারতীয় প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার অনুসরণে এমন একটি বলিষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা চরিত্র-গঠন এবং মনুষ্যত্বলাভের আদর্শকে সর্বোচ্চ আসন দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধর্মের একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করিবে এবং ভারতীয় যুবসমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। কিন্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত মহৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ-সাধনের পথে আসে অজানিত বিপদ্ ও অচিন্তিত বাধা। তাহা ছাড়াও এইরূপ মহৎ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় অপরিসীম ধৈর্য, অপরিমিত উৎসাহ, প্রভুত স্বার্থত্যাগ এবং সর্বোপরি দায়িত্ব-সম্পাদনে সমর্থ ব্যক্তি-নির্বাচন। যে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা রামকৃষ্ণ মিশনের জনসেবামূলক প্রচেষ্টাসমূহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, অনুরূপ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা লইয়াই এই বিদ্যাভবন একাদশজন শিক্ষক ও মাত্র চারিজন ছাত্রসহ পূর্বোক্ত দিবসে অপরিসীম আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে তাহার শুভ উদ্বোধন সূচনা করিয়াছিল। উদ্বোধনকালে ছাত্র ও শিক্ষকের এই অত্যল্প সংখ্যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আশাবাদী ব্যক্তিকেও যে নিরাশ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিদ্যামন্দির কোন কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ধীরগতিতে এক সীমাহীন জীবনসমুদ্রে তরী ভাসাইল।

সাফল্যের পথে

২০ বৎসরের জীবনপথে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে বহুবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, লোকাভাব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়াপাত প্রভৃতি বহু বিপদ সময়ে সময়ে এই বাণীমন্দিরের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই মহতী প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে ঐশী প্রেরণা বর্তমান ছিল, তাহাই নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়াছিল এবং ইহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ইচ্ছা ঐকান্তিক হইলেই উপায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সততা ও ঐকান্তিকতার জয় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ খৃঃ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় বিদ্যামন্দির অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করিল। একজন ছাত্র দশম স্থান অধিকার করিল এবং পাসের হার আশাতীত উচ্চ হইল। একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শৈশব অবস্থাতে এই চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়া সরকার এবং জনসাধারণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষার এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া শিক্ষকবৃন্দ বৃহত্তর সাফল্যের জন্য তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিলেন।

বিদ্যামন্দিরে মুখ্যতঃ সাহিত্য-বিভাগ

থাকিলেও অনতিবিলম্বে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান-বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হওয়ায় এই মহাবিদ্যালয়ের কর্মধারারও গতি পরিবর্তিত হইল এবং ইহার আদর্শনিষ্ঠ কর্মপদ্ধতির ও নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রতি আরও অধিক-সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হইল। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষায়তনটি প্রতি বৎসর নূতনতর সাফল্য অর্জন করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এখানকার ছাত্রগণের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইল। ১৯৫৬ খৃঃ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রথম স্থান অধিকার করিবার গৌরব এই শিক্ষাভবনের জীবন-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ খৃঃ দেশের শিক্ষাজীবনে নূতনতর একটি শুভসূচনা করিয়াছিল, আজ ১৯৬০ খৃঃ সে গৌরবের শীর্ষদেশে পৌঁছিয়া তাহার যাত্রাপথের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় সমাপ্ত করিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের ভূমিকা

বিদ্যামন্দিরের এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের কারণ অতি সুস্পষ্ট, দুইশত ছাত্রসমন্বিত এই মহাবিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ আবাসিক হওয়ায় এখানকার ছাত্রগণের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা, পাঠ, শরীরচর্চা, খেলাধূলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের এমন একটি সুসমন্বিত সমাবেশ করা সম্ভব হইয়াছে যে, ছাত্রগণ তাহাদের জীবন ও চরিত্রকে অনায়াসে সুগঠিত করিয়া দেশের যথার্থ নাগরিক হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। আত্মোন্নতির একটি প্রধান উপায় চিন্তার স্বাধীনতা। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। যদিও সর্ব-প্রকার রাজনীতিক কার্যাবলী হইতে এই শিক্ষায়তন দূরে অবস্থান করে, তথাপি দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত ছাত্রগণ যাহাতে পরিচিত হইতে পারে, তাহার সুযোগও এখানে বর্তমান। শিক্ষক ও ছাত্রের সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক, শ্রমে মর্যাদাবোধ, জীবনে নীতিনিষ্ঠা —এইগুলি এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই দিকগুলি বিবেচনা করিলে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহা বিন্দুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদল সময়ের সদ্ব্যবহার, হৃদয়বৃত্তির বিস্তার এবং গঠনমূলক কর্মধারার মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিয়া শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে, তাহা নহে, সমাজ-জীবনেও উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

আজিকার প্রয়োজন

কালক্রমে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই প্রভূত পরিবর্তন আসিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, অতীতে নবীন বিদ্যার্থিগণকে তাহাদের প্রথম জীবনে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নৈতিক জীবনের শিক্ষাসমূহ দেওয়া হইত। আজ ছাত্রসমাজের জীবনে শিক্ষাকে যদি আমরা যথার্থ ফলপ্রসূ করিতে চাই, তবে শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এ-কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, জাতির সাংস্কৃতিক জীবন-সৌধ তাহার ধর্মনায়কগণের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নৈতিক জীবনের পুনর্গঠনকল্পে আমরা ধর্মকে যদি গ্রহণ না করি, তবে উহা আমাদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার নামান্তর হইবে। যুবসমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল রাখিয়া কোন বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন গঠন করা সম্ভব নহে। জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের এই শুভমুহূর্তে আজ আমাদিগকে জাতীয় সংহতি ও পরিবিস্তৃতির জন্য আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের মূলধনকে সম্বল করিতে হইবে এবং ইহার জন্য একটি জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই আজ আমাদের চরম ও পরম কর্তব্য।

সার্থক পরিসমাপ্তি

এইরূপে বিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভূমির সরস মৃত্তিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে শিশুবৃক্ষটি রোপণ করা হইয়াছিল, তাহা আজ এক ফলপ্রসূ সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া জ্ঞানান্বেষী বহুজনকে উহার শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিতেছে। মাধ্যমিক কলেজ হিসাবে যদিও বিদ্যামন্দিরের পরিসমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু ইহা প্রাচীন ফিনিক্সের (Phœnix) মতো পুনরায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগ-সমন্বিত একটি ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কলেজরূপে আবির্ভূত হইয়া আগামী দিনের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। এই কলেজটিতে ইতিমধ্যেই একটি সুসজ্জিত গবেষণাগার এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহে পূর্ণ একটি আধুনিক গ্রন্থাগার সংযুক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন। আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-স্মারক হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তনের জন্য আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। অতি আনন্দের বিষয় যে, শিক্ষক-শিক্ষণ, সমাজ-শিক্ষণ, উচ্চতর সংস্কৃত এবং যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিকরূপে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে বহুমুখী শিক্ষামূলক কর্মধারার সার্থক পরিণতিরূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবান এই নূতন পরিকল্পনাটিকে নূতনতর সাফল্যের পথে লইয়া চলুন—ইহাই আজ একান্ত প্রার্থনা।

What I now want is a band of fiery missionaries. We must have a College in Madras to teach comparative religion, Sanskrit, the different Schools of Vedanta and some European languages ; we must have a press, and papers printed in English and in the vernaculars.

—SWAMI VIVEKANANDA

(In a letter dated the 12th Jan. 1895)

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'নিবেদিতা-বক্তৃতা' : ৭ই—৯ই আগস্ট, ১৯৬১]

ডক্টর রমা চৌধুরী

সত্যই অপূর্ব এই মনুষ্য-জীবন। কত বহুমুখী তার মতি, কত বিচিত্র তার গতি, কত বিভিন্ন গুণ-শক্তি, কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-প্রচেষ্টার সমবায়ে তার স্থিতি। কিন্তু এই সব আপাতদৃষ্ট বহু বিচিত্রতা, বহু বিভিন্নতা, বহু বৈপরীত্যের মধ্যেও মানুষটি সেই একই, তার জীবন সেই একই। তার কারণ হ'ল এই যে, এই সকলের মধ্যে রয়েছে একটি শাশ্বত অচ্ছেদ্য মিলন-সূত্র, তাকেই বলা হয়—মানুষের জীবন-দর্শন। এস্থলে 'দর্শনের' অর্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহ নয়। কিন্তু বিস্তৃত সংসার-প্রান্তরে যে অসংখ্য জীবন-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে নিজ নিজ পথে, তাদের সকলের একটি নিজস্ব লক্ষ্য আছে, এবং আছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার একটি উপায়। কত অসংখ্য তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রত্যেকের জীবন, কত সর্পিল তার বিস্তৃতি, কত দেশদেশান্তর অতিক্রমকারী তার ধারা। তা সত্ত্বেও সেই একই লক্ষ্য, সেই একই উপায় এনে দিয়েছে একটি অনুপম সমগ্রতা, অখণ্ডতা, অবিচ্ছিন্নতা; যার ফলে প্রত্যেকেই এক একটি পরিপূর্ণ সত্তা, এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেজন্য যে কোন মানুষকে জানতে গেলে জানতে হবে তার এই জীবন-দর্শন।

যাঁরা মহীয়ান্ মহীয়সী, যাঁদের কমল-পাদস্পর্শে ধরণীর ধূলায় ধূলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে শত শত শতদল; যাঁদের দিব্যালোকে দূর হয়ে গেছে জগতের অজ্ঞানান্ধকার; যাঁদের কম্বুকণ্ঠে অম্বুদ-নিনাদে ধ্বনিত হয়েছে নিরন্তর এক চিরন্তনী আশা ও প্রীতি-ভক্তি-মৈত্রীর বাণী, তাঁদের জীবন-দর্শন হয় জীবন-প্রদর্শক—জগতের গতিপথের প্রদীপস্বরূপ। সেজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এই জীবন-দর্শন উপলব্ধি করা প্রয়োজন কেবল তাঁদের পুণ্য জীবন জানবার জন্যই নয়, আমাদের নিজেদের জীবনকেও জানবার জন্য। প্রদীপের আলোকে প্রদীপটিকেই যে কেবল দেখা যায়, তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, অন্যান্য সকল বস্তুকেও সমভাবে। একই ভাবে এই সকল বিশ্বদীপ-স্বরূপ মহাত্মাদের জীবন-দর্শনের আলোকে, আমরা তাঁদেরও যেমন জেনে নিতে পারি নিঃশঙ্কচিত্তে, ঠিক তেমনি চিনে নিতে পারি নিজেদেরও জীবন-পথ নিঃসন্দিগ্ধভাবে।

এই কারণে মহামহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন অনুধাবন আজ আমাদের নিকট অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সমগ্র জীবনের মূলে যেরূপ জীবন-দর্শন, সেরূপ সমগ্র জীবন-দর্শনের মূলেও একটি কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব চিরস্থিতিরূপে বিরাজমান। যেরূপ সহস্ররশ্মি সূর্যের সহস্র কিরণ বিচ্ছুরিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ অগ্নি-গোলক থেকে, যেরূপ সহস্রদল পদ্মের সহস্র দল প্রস্ফুটিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ মধু-কোষ থেকে, যেরূপ সহস্র-ধারার নির্ঝরিণীর সহস্র ধারা উৎসারিত হয় একটি কেন্দ্রস্থ উৎস থেকে—সেরূপ জীবনদর্শনের সহস্র রশ্মি, সহস্র দল, সহস্র ধারা নিরন্তর উচ্ছলিত হয়ে উঠছে একটি কেন্দ্রস্থ মূলীভূত তত্ত্ব থেকে। সেই তত্ত্বকেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে জীবনকে,—মানুষকে উপলব্ধি করতে হ'লে।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শনের এই কেন্দ্রীভূত মূলগত তত্ত্ব কি?

তা অন্বেষণ করতে আমাদের অধিক দূর যেতে হয় না, কারণ তা তাঁর সর্বত্রই প্রকটিত। জীবন-দর্শন অবশ্য জীবনে সর্বত্র ও সর্বদাই প্রকটিত। তা সত্ত্বেও এই প্রকাশের প্রকার-ভেদ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট প্রকাশিত, বহুল-পরিমাণে প্রকাশিত; কোন কোন ক্ষেত্রে তা নয়। নিবেদিতার জীবনে অস্পষ্ট কিছুই ছিল না; এবং সেজন্য তাঁর জীবন-দর্শনও অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সংসার-মুকুরে। কি সেই অপরূপ উজ্জ্বল কেন্দ্রীভূত জীবন-দর্শন-তত্ত্ব? তা হ'ল এক কথায়—তেজ। নিবাত-নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মতোই ছিল তাঁর সমগ্র জীবন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'শিখাময়ী'। এর অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত, সুষ্ঠু, শোভন বর্ণনা আর হ'তে পারে না।

মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক ঋষিরা মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মোক্ষের উপায় নির্দেশ ক'রে অতি সুন্দরভাবে বলেছিলেন:

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥'

—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, গ্রন্থপাঠ ও বহু শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁকে বরণ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। কেবল তাঁরই নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

অতি সুন্দর রোমাঞ্চকর কথা। কিন্তু সন্দিগ্ধ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি বরণ করবেন কি নিয়মানুসারে? তিনি তো যদৃচ্ছাভাবে তাঁর এই মহানুগ্রহ বিতরণ করতে পারেন না উচ্ছৃঙ্খল পক্ষপাতদুষ্ট নৃপতির ন্যায়। সেজন্য পরের মন্ত্রেই পুনরায় বলা হচ্ছে সমান সুন্দরভাবে:

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥'
(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩-২-৪)

—যিনি বলহীন, তিনি এই আত্মাকে লাভ করতে পারেন না। ভোগেচ্ছা ও বৃথা লক্ষ্যহীন তপস্যা দ্বারাও তাঁকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যিনি বীর্য নিষ্কামতা ও প্রকৃত তপস্যার পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।

নিবেদিতারও ছিল বীর্য নিষ্কামতা ও তপস্যার পন্থা। তাঁর তেজোদীপ্ত জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই তেজ বিচ্ছুরিত হ'ত অমিত বিক্রমে। তাঁর তেজোমূলক এই জীবন-দর্শনের প্রমাণ আমরা পাই একদিকে তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি লেখায়; অন্যদিকে তাঁর প্রতি কার্য-কলাপে, প্রতি আচার-আচরণে; কারণ তাঁর অন্তর ও বাহির ছিল সমান—তিনি মনে যা ভাবতেন, মুখেও তাই বলতেন, কাজেও তাই করতেন! আমরা এই নিবন্ধে তাঁর জীবন-দর্শনের অনুসন্ধান ক'রব তাঁর এই অনুপম অনলবর্ষী অমৃতস্রাবী রচনায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর তেজোদীপ্ত রচনা 'Aggressive Hinduism' ধরা যেতে পারে। তাঁর রচনা-পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনি সর্বদাই ভারতীয়দের কথা বলতে গিয়ে 'আমি', 'আমরা', 'আমাদের' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন—বিনা দ্বিধায়, অতি সহজ সরল সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে।

এই 'Aggressive Hinduism' নামক রচনাটি চারটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধের সমাহার :

'The Basis', 'The Task before us', 'The Ideal', 'On the way to the Ideal'.

'The Basis' অথবা 'ভিত্তি' এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি আরম্ভ করেছেন একেবারে মূল থেকে। আমাদের জীবনের ভিত্তি কি হবে? সাধারণতঃ আমরা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে বর্ধিত হই, যে দেশে জীবন অতিবাহিত করি, সেই পরিবার, সেই সমাজ, সেই দেশের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-দৃষ্টিভঙ্গী নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নিয়ে, শান্ত-শিষ্ট, অমায়িক-মসৃণ, নিরুপদ্রব-নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করি, এবং একদিন একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতোই বিনাশের অন্তহীন গভীরে নিঃশেষে—নিশ্চিহ্ন ভাবে মিলিয়ে যাই। মিলিয়ে যাই কেন? যেহেতু এ কেবল দৈহিক জীবন—পশুর জীবন। দৈহিক দিক্ থেকে একটি জড় নিঃসাড় বস্তুর ন্যায়ই আমরা বর্ধিত হই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে; পশুর ন্যায় একটি অচল অনড় জীবনই আমরা যাপন করি। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন, এরূপ জীবন জীবনই নয়—এরূপ ভিত্তিতে যদি আমরা জীবন আরম্ভ করি, যাপন করি, শেষ করি—তা হ'লে ঐ জড় বস্তুর স্থিতিই কেবল আমাদের হবে, এই পশুর জীবনই কেবল আমাদের হবে, হবে না কেবল মানুষ হওয়া, মানুষের জীবন যাপন করা, মানুষের লক্ষ্য লাভ করা।

তা হ'লে আমাদের জীবনের, মানুষের জীবনের কি ভিত্তি হওয়া উচিত? নিবেদিতা এক কথায় বলছেন, 'Aggression'—কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ নয়, সক্রিয়ভাবে দান; কেবল স্থৈর্য-অবলম্বন নয়, বীর্য-প্রদর্শন; কেবল তৃপ্ত হয়ে বসে থাকা নয়, দৃপ্ত হয়ে এগিয়ে চলা; কেবল অবিচলিত সন্তোষ নয়, অনমনীয় সাহস; কেবল সভয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকা নয়; নির্ভয়ে আক্রমণ করা। এই ভাবে সক্রিয় 'আক্রমণ', 'আক্রমণের' চিন্তা, 'আক্রমণের' আদর্শ—এই তো হওয়া উচিত আমাদের জীবনের ভিত্তি, জীবনের চিন্তা, জীবনের আদর্শ।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজোদীপ্ত ভঙ্গীতে নিবেদিতা বলেছেন :

'Instead of passivity, activity; for the standard of weakness, the standard of strength; in place of a steady-yielding defence, the ringing cheer of the invading host.'

—নিষ্ক্রিয়তার স্থলে সক্রিয়তা, দুর্বলতার স্থলে সবলতা, ক্রমভঙ্গুর প্রতিরক্ষার স্থলে আক্রমণকারী দলের উদাত্ত বিজয়োল্লাস।

আক্রমণ ক'রব কাকে?—বিশ্ববাসীকে। কি দিয়ে আক্রমণ ক'রব?—আমাদের চিন্তা দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, এক কথায় আমাদের চরিত্র দিয়ে, সত্তার সারপদার্থ দিয়ে, আত্মার বল দিয়ে। সেজন্য **চরিত্র-সংগঠনই** হ'ল আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা '*custom*' ও '*character*'-এর মধ্যে একটি সুন্দর পার্থক্য দেখিয়েছেন। এই পার্থক্যের বিষয় অবধারণ করা আমাদের, হিন্দুদের বিশেষভাবে কর্তব্য। যেহেতু আমাদের সমাজে প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি প্রায়ই আবৃত হয়ে যায়।

'Custom' কি? 'Custom' হ'ল সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন। জন্মের পর থেকেই আমরা অজ্ঞাতসারেই এই সকল সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করি, আচার-ব্যবহার অনুসরণ করি, নিয়ম-কানুন মেনে চলি। বিশেষ ক'রে সাধারণতঃ হিন্দু

সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অল্প। শিশুকাল থেকেই হিন্দুসন্তানের আহার-বিহার, আচার-বিচার, কার্যকলাপ যেন একই ছাঁচে ঢালা—নূতন কিছু করতে গেলেই নীরব বিস্ময় ও সরব প্রতিবাদ তার প্রাপ্য। এই ভাবে, হিন্দু-সমাজে '*custom*' এবং 'tradition', সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব অত্যধিক।

কিন্তু নিবেদিতা বলছেন, তাকিয়ে দেখুন একবার পশ্চিমের দিকে। অন্ততঃ এই দিক্ থেকে, তার নিকট থেকে আমাদের শিক্ষণীয় যথেষ্ট আছে। পশ্চিমের শিক্ষার প্রণালী স্বতন্ত্র। পশ্চিমেও নিশ্চয়ই সমাজ আছে, সমাজের শাসনও আছে, সমাজের উপকারিতাও আছে; কিন্তু সেখানে সেই সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবকাশও অল্প নয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় অবশ্য সেই দেশেও শিশুশিক্ষা রয়েছে ন্যস্ত নারীদেরই হাতে। বরং বলা যেতে পারে যে, প্রাচ্যদেশের অপেক্ষা প্রতীচ্যে শিশু-শিক্ষায় নারীদের অধিকার ও দান বহুগুণে অধিক। সে যা হোক, Nursery Education বা শিশুশিক্ষার স্তর অতিক্রম ক'রে বালক-বালিকা, যখন 'সামাজিক ব্যক্তি'রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের কি বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে শিক্ষা দেন? এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মধ্যে একটি প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সেটি হ'ল এই: তাদের শান্ত হ'তে, বিনীত হ'তে আজ্ঞানুবর্তী হ'তে, সহনশীল হ'তে, বিনা দ্বিধা ও প্রতিবাদে নির্বিচারে নীরবে সমস্ত কিছুই গ্রহণ করতে শিক্ষা না দিয়ে, বরং শিক্ষা দেওয়া হয় তেজস্বী হ'তে, দায়িত্বজ্ঞানশীল হ'তে, নূতন বিষয়ে অগ্রণী হ'তে, প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহী হ'তে। সেজন্য শিশুদের 'রাগ ও জিদ্'কে পাশ্চাত্য জগতে অতি ভয়াবহ বস্তু ব'লে মনে করা হয় না, উপরন্তু মনে করা হয় যে, এগুলি শিশুর জীবন-পথে চলবার অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সেজন্য এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দমন অথবা ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা না ক'রে প্রচেষ্টা করা হয় কেবল শুভদিকে পরিচালিত করবার, মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবার, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে, তেজ ও অনমনীয়তায় রূপান্তরিত করবার। এই কারণে পাশ্চাত্য জগতে খেলার মাঠে বালকে বালকে হাতাহাতি, যুদ্ধাযুদ্ধি প্রভৃতিকে বর্জনীয় না ব'লে বরং প্রশংসনীয় ব'লে গ্রহণ করা হয়, যদি অবশ্য তা অন্যায়-অবিচারমূলক না হয়ে ন্যায়ানুমোদিত হয়। সেজন্য পাশ্চাত্যের পিতামাতাদের মত এই যে, এই ভাবে বালক-বয়সেই সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত না হ'লে পরে দুর্গম সংসারারণ্যে সন্তানেরা দিশাহারা হয়ে পড়বে। বলাই বাহুল্য যে, যা এইমাত্র বলা হ'ল, সেই সঙ্গে তাদের শিখে নিতে হবে সেই সংগ্রামের মূল নীতি ও নিয়মাবলীও সমভাবে। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেই যে, কেবল পশুবলই হবে মূলধন, কেবল স্বার্থই হবে মূল লক্ষ্য, কেবল উদ্দামতাই হবে মূল-প্রণালী, তা তো কোন ক্রমেই হ'তে পারে না। সেজন্য এরূপ সংগ্রামের অন্তরালে গঠিত হয়ে ওঠে মানব-জীবনের সেই একমাত্র ভিত্তি—চরিত্র।

বস্তুতঃ **ব্যক্তি** ও **সমাজের** প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া কর্তব্য—তা হ'ল সকল দেশের সমাজ-বিজ্ঞানেরই একটি দুরূহ সমস্যা। একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে; অন্যদিকে—সামাজিক শাসনের মূল্যও অল্প নয়। ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে স্বকীয় সৌন্দর্যে সৌরভে আনন্দে; দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হবে তার গরিমা, বাধাহীন হবে তার বিকাশ, উন্মুক্ত হবে তার স্থিতি। তা সত্ত্বেও

ফুলের মূল রয়েছে আদ্যন্ত-কাল মৃত্তিকার ঘনাভ্যন্তরে অনড় অচল অটলভাবে। এক-দিকে, যেমন ফুল মূলকে অস্বীকার করতে পারে না, অন্যদিকে—তেমনি মূল ফুলকে বন্ধন ক'রে রাখতে পারে না। এই তো হ'ল ফুল ও মূলের—ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ। প্রতীচ্যে ফুলের, প্রাচ্যে মূলের সমাদর সমধিক হ'তে পারে; কিন্তু কেবল একটি রেখে অন্যটিকে বর্জন করা কারও পক্ষেই যে সম্ভবপর নয়, তা সুনিশ্চিত।

সেজন্য দূরদর্শিনী নিবেদিতাও ভারতীয় সমাজের এই মূলগত দোষ দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ মৌলিক চিন্তা-প্রণালী দ্বারা ভারতের 'দশাবতার'-তত্ত্বের মধ্যে এই '*Aggressive Hinduism*'এর আভাস লাভ করেছিলেন। অতি সুন্দরভাবে তিনি বলছেন যে, মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতির স্তর অতিক্রম ক'রে এই অবতারের পুণ্যমূর্তি আমরা দেখি, দুই ক্ষত্র-মহাবীরের রূপে—রাম ও কৃষ্ণ। তাঁদের অতুল বীর্যের সম্মিলিত মহিমার ফলেই যেন পরিশেষে উদিত হলেন করুণাঘন প্রশান্তমূর্তি ভগবান বুদ্ধ। তাতেও কি শেষ হ'ল? না। কলির কল্কি অবতারে নিহিত রয়েছে আরও বীর্যের আরও জয়ের নিশ্চিত নিশানা।

এই ভাবে শান্তির পশ্চাতে থাকবে শক্তি, গ্রহণের পশ্চাতে থাকবে দান, সহনশীলতার পশ্চাতে থাকবে দহনপ্রবণতা। তা হলেই হবে জীবনের প্রকৃত চরিতার্থতা। সেজন্য কেবল বিনয়, কেবল ধৈর্য, কেবল সন্তোষ—দুর্বলতারই নামান্তর মাত্র। আমাদের ভারতীয় সমাজে অবশ্য এগুলির মূল্য সমধিক। কিন্তু বলদীপ্ত পাশ্চাত্যের ভাবধারায় পুষ্ট নিবেদিতা এগুলির সম্যক্ ভিত্তি নির্দেশ করেছেন—সুপ্ত ভারতের জাগরণের জন্য। বস্তুতঃ বিনয় যদি হয় গুণ-হীনতা, ধৈর্য যদি হয় নিষ্ক্রিয়তা, সন্তোষ যদি হয় উদ্যমহীনতার রূপান্তরমাত্র—তা হ'লে তাদের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতাই হবে বহুগুণে অধিক, নিঃসন্দেহ।

সেজন্য ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন যে, এই ভিত্তি 'Custom' (রীতি) নয়, 'Character' (চরিত্র)। প্রথমটিকে কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্ষণ করলেই চলে; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে করতে হয় সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি,—গঠন। সমাজ তার আবহমানকাল-প্রচলিত রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুনকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে অনায়াসে; কিন্তু চাপিয়ে দিতে পারে না চরিত্রকে। কারণ চরিত্র সমাজগত সম্পত্তি নয়, গ্রহণ ও রক্ষণের বস্তু নয়—ব্যক্তিগত সম্পদ্, অর্জন ও সর্জনের বস্তু।

নিবেদিতার সেই মহাজীবনস্বপ্ন আমরাও একবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দেখি না কেন?

'Let us suppose, then, that we see Hinduism no longer as the *preserver* of Hindu *Custom*, but as the *creator* of Hindu *Character*.'

—মনে করা যাক্ যে, আমরা হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করি হিন্দু রীতিনীতির রক্ষকরূপে আর নয়, কিন্তু হিন্দু চরিত্রের স্রষ্টারূপে।

এই 'মনে করার' ভিত্তিতেই নিবেদিতা হিন্দুসমাজের স্থির পন্থা নির্দেশ করেছেন।

সেই পন্থা হ'ল, কেবল নিজেকে রক্ষা করা নয়, কিন্তু অন্যদের নিজমতে আনয়ন করা—

'Our work is not, now, to *protect* ourselves, but to *convert* others.'

—কেবল নিজেদের রক্ষা করা নয়, কিন্তু অন্যদের স্বীয় মতে আনয়ন করা—এই হবে, এখন আমাদের কার্য। (ক্রমশঃ)

আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আজ বহু ভারতীয় মনীষী তারস্বরে ঘোষণা করছেন যে, আমাদের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে ভাষা-সমস্যার একমাত্র সমাধান—সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা ব'লে গ্রহণ করা। সংস্কৃতের সুদৃঢ় বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষ যতদিন সংগ্রথিত ছিল, ততদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণের কাছে ভারতবর্ষ মস্তক অবনত করেনি। আমাদের ঐতরেয় আরণ্যক বলেছেন :

'কলিঃ শয়ানো ভবত্যুজ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।'

অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত দেশে কলি বিরাজমান, যতদিন দেশবাসী সুপ্ত; যখন দেশবাসী গা মোড়ামুড়ি দিতে আরম্ভ করে, তখন দ্বাপর; দেশবাসী উঠে দাঁড়ালেই আসে ত্রেতা এবং দেশের মানুষ চলতে আরম্ভ করলেই সত্য যুগের আবির্ভাব হয়। অতএব—চলতেই থাকো, চলতেই থাকো।

যুগে যুগে বার বার দেখা গেছে, যখনই আমরা চলতে থাকি, তখনই দেশে সত্য যুগ বিরাজমান এবং তখন সংস্কৃতকেই জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ ক'রে আমরা চলতে থাকি। দেশ যখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন—তখন সংস্কৃতেরও অবসাদ ঘনীভূত। সংস্কৃতও মরেনি, ভারতও মরেনি। সংস্কৃতও মরবে না—ভারতেরও মৃত্যু নেই।

সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগই ভিত্তিহীন

(১) প্রথম অভিযোগ—সংস্কৃত মৃত।

সংস্কৃত দেবভাষা, মৃত্যুহীন। যে-ভাষা মৃত, তাতে হাজার হাজার লোক দৈনন্দিন কথা বলছে কি ক'রে? যে-ভাষা মৃত, প্রতি বৎসর সে-ভাষায় এত নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে কি ক'রে? যে-ভাষা মৃত, তার আশ্রয়-ভিন্ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি-বিষয়ক বা অন্য যে-কোন পরিভাষা-সমিতি একটিও নূতন শব্দের সৃষ্টি করতে পারেন না কেন? যে-ভাষা মৃত, সে-ভাষায় কত ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা চলছে কি ক'রে? নিশ্চয় ভারতের অনেকেরই আজ সত্যিকার দৃষ্টিশক্তি বিদেশী কাচের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বা অন্য যে-কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। না হয়—হাজার হাজার বৎসর যে-ভাষা সমস্ত এশিয়া, ইওরোপ, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, মেলানেসিয়া এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চলকে জ্ঞানের দিব্যালোকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে, যে-ভাষা পৃথিবীর সকল আর্যভাষার জননী এবং যে-ভাষা পৃথিবীর সকল ভাষাকেই অল্পবিস্তর করেছে সম্পদ্ বিতরণ—তার গলায় মৃত ভাষার বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিয়ে করতালি দেওয়া—নিতান্তই বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক, সন্দেহ কি?

সংস্কৃত ভাষা সকল ভারতবাসীর প্রাণে কত আনন্দের ঝঙ্কার তোলে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই—আমাদের[১] সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সময়—স্বদেশে এবং বিদেশে। সংস্কৃত স্তোত্র, গান এবং মন্ত্র সকলের হৃদয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিস্রোতোধারা প্রবাহিত ক'রে দেয়।

১ প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের উদ্যোগে

(২) দ্বিতীয় অভিযোগ—সংস্কৃত কঠিন ভাষা।

এই উক্তি আরও অসার, একান্ত প্রবঞ্চনাময়। আমরা নিজেরাই দেখেছি,—লণ্ডনে, ইওরোপের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাঁরা ভারতীয় আর্যভাষার কিছুই জানেন না, তাঁরাও ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃত ভাল করেই শিখে নেন; এক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতে পারেন ধীরে ধীরে। এমন সুন্দর আইন-কানুনে সুরক্ষিত, সুসংবদ্ধ মধুরিমময় ভাষা—আপন ঝঙ্কারেই পৃথিবীর সকলকে মাতোয়ারা ক'রে দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়ার একটি দেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহে—অহোরাত্র অবিরলধারে সংস্কৃতের চর্চা হয়েছে; সেই সেই দেশে কত উচ্চদরের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত ভাষায় কত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা ক'রে গেছেন। কম্বুজ দেশে পর্যন্ত ইন্দ্রদেবী প্রভৃতি মহীয়সী নারীরাও করেছেন সংস্কৃত ভাষাকে স্বকীয় অনবদ্য দানে সমৃদ্ধ। এ ভাষাকে কঠিন ব'লে পরিহার করার কথা আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখেই শোনা যায়। ভারতবর্ষের বাইরের কোন শিক্ষিত লোক এ কথা বলেন না। অধ্যাপক রাইল্যাণ্ডস্, ডাঃ এফ. ডব্লিউ. টমাস প্রভৃতি সকলেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কথা উঠলেই অকুণ্ঠিত চিত্তে, অতিদৃঢ়ভাবে সংস্কৃতের নামই উল্লেখ করেন; শুধু তাই নয়, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করার যুক্তিটা কোথায়, খুঁজে পান না ব'লে তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কাজেই সংস্কৃত মৃত ও কঠিন ভাষা—এই যে উক্তি, এটি অনেকটাই স্বকপোলকল্পিত অথবা উদ্দেশ্যমূলক—বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃত

এই বিষয়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ্ বা সাহিত্যাচার্যের দ্বিমত নেই। এত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা বৃথা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কেবল শ্রেষ্ঠ নয়, প্রাচীনতমও। এই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার প্রথম গ্রন্থটিই, অর্থাৎ ঋগ্বেদই আমাদের ভারতীয় ভাবধারার ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের মূল আকর।

যুগযুগান্তরের ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতা সংস্কৃতের সহায়তায় পুষ্ট

কেবল বর্তমানের নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ও সাহিত্যরাজির আলোচনায় এটি অতি সুস্পষ্ট যে, সংস্কৃতের উপর নির্ভর করেই আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখানে এমন স্থান নেই—যাতে আমরা উদাহরণের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারি—যেমন কর্ণাট দেশের ভাষাই ধরা যাক। সত্যি এটি একান্ত উল্লেখযোগ্য যে কর্ণাটের পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, কনক দাস, স্বাদি বাদেরাজ, বা আরও পরবর্তীকালের নারীকবি হেলেবনকট্টি গিরিয়ম্মা—হোক তাঁরা ব্যাসকূট বা দাসকূটের অন্তর্গত—সকলেই সংস্কৃতের ভাবধারায় একান্তভাবে পরিপ্লাবিত; ভাষাও নিতান্ত সংস্কৃতপ্রধান। মারাঠী অভঙ্গ বা হিন্দী দোঁহা বুঝতে কোন বাঙালী, উড়িষ্যাবাসী বা আসামপ্রান্তের অধিবাসীর কষ্ট হয় না—যদি সংস্কৃত কিছু পড়া থাকে, অথবা—স্ব স্ব ভাষার উপরে দখল থাকে, কারণ এই পরবর্তী ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেই শতকরা ৬০।৭০টি সংস্কৃত শব্দ দিয়ে, বাংলাভাষার মতো ভাষার শতকরা ৯০টি শব্দ দিয়ে কথাবার্তা বলেন—সাহিত্য রচনা করেন তো বটেই।

আজকের দিনের এই যে চিত্র, এটিই ভারতের শাশ্বত চিত্র, এটিই প্রকৃত ইতিহাসের রূপরেখা। ভগবান্ মহাবীর ও ভগবান্ বুদ্ধ যথাক্রমে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষায় স্বধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। দুইশত বৎসর যেতে না যেতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে হাঁপিয়ে গেলেন, এবং সংস্কৃতের গঙ্গাধারায় স্নান ক'রে পুনরায় ধন্য হলেন। পেলাম আমরা কত অগণিত জৈন ও বৌদ্ধ কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে—সকলেই সংস্কৃতে রচনা ক'রে অমর হয়ে গেছেন। এই রকম একশত, দুইশত মনীষী নন—হাজার হাজার। ভারতে নয়, এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র, জগতের অবশিষ্ট স্থানেও। ভারতের বাইরের মনীষীরা সংস্কৃতের প্রসাদে ধন্য হয়ে বললেন—'আমরা ভারতের ধর্মসন্তান; মহা-জননীর জয়গান করি।' মহাকবি অশ্বঘোষ, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন, অনঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতিরা ছুটে এসে বললেন—'চিরারাধ্যে সংস্কৃতজননি! হারানিধি আমরা, মা! তোর বুকে ছুটে এসে জীবনরক্ষণে হলাম সমর্থ।' একমাত্র সংস্কৃতকেই লক্ষ্য ক'রে বিদ্যাপতির ভাষায় বলা যায়—কত ভাষার ব্রহ্মা এলেন, গেলেন—তোর মহিমার পার কে পায় মা!

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর-লহরীসমানা॥'

অনন্ত সংস্কৃত-সাগরবক্ষে বুদ্বুদের মতো ভাসছে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি দিনে দিনে, মাসে মাসে উঠছে পড়ছে—লীলা চলছে ভাষাসমূহের, কিন্তু বুদ্বুদেরই লীলা তো, স্থায়িত্ব তাদের কোথায়? ভাষাবুদ্বুদের খেলায় যা কিছু স্থায়িত্ব-লাভের আশা করেছে—তাই সংস্কৃতের আশ্রয়ে রূপান্তর লাভ ক'রে যুগের বুকে সিংহাসন জুড়ে বসে আছে।

সংস্কৃতের ব্যাপকতা যেমন অসীম, গভীরতাও তাদৃশ। প্রাচান ইরান দেশে কি বিস্ময়কর সংস্কৃত চর্চা চলেছে! কত অগণিত চিকিৎসক, জ্যোতিষী সংস্কৃতের মণিরত্ন মস্তকে ধারণ ক'রে সেখানে গেছেন; ফারসী ভাষায় হয়েছে সে সকল অনূদিত। পাশ্চাত্য থেকে পর্যন্ত আমরা নিয়েছি কত, যেমন রোমক-সিদ্ধান্ত। কত ফারসী গ্রন্থ আমরা সংস্কৃতে রূপ দিয়েছি—যেমন শ্রীবরের কথা-কৌতুক। 'ইউসুফ-জুলেখা'র প্রেমকাহিনী যে শ্রীবর সংস্কৃতে রূপায়িত করেছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে ঐতিহাসিক। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীকে জোনরাজ, শ্রীবর ও প্রাজ্যভট্ট টেনে এনে জনসাধারণের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন—আকবরের কাশ্মীর-বিজয় পর্যন্ত।[২] আবার কত মুসলমান সাহিত্যধুরন্ধর ভারতের মধ্যযুগে সংস্কৃতের কেবল পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা নয়, মৌলিক রচনাতেও সংস্কৃতকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন, শেখ ভাবন, মহম্মদ শাহ্, খানখানান আব্দুল রহমান, দারা শুকোহ, প্রভৃতি।[৩] জগতের নারীশিক্ষার ইতিহাসের প্রারম্ভিক ইতিহাসে শুধু নয়, প্রথম দিকে বহুকাল ভারতীয় মাতৃমণ্ডলীর দান ব্যতীত অন্য কোনও দানই পাওয়া যায় না, যেমন

২ এই সুন্দর ইতিহাসের নিমিত্ত বর্তমান লেখক প্রণীত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থেতিহাস—পৃঃ ২০৫৯ দেখুন। ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লণ স্বয়ং রচনা করেছেন; জোনরাজ 'রাজাবলী'তে সে ইতিহাসের ধারা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে এনেছেন; শ্রীবর ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত; অবশিষ্টাংশ রাজ্যভট্ট-কৃত।

৩ এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের Contributions of Muslims to Sanskrit Learning গ্রন্থমালার ১—৪ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কেবল ঋগ্বেদেই ২৭ জন নারী ঋষি-কবি আছেন।[৪] তদ্ব্যতীত পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও নারীদের কত মধুমাখা জ্ঞানদীপ্ত উক্তি রয়েছে—জগতের কোন্ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য এ নিয়ে তুলনায় অগ্রসর হ'তে পারে?[৫] ভারতের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, পুরুষ-নারী, ভারতে বাসকারী অভারতীয়গণ, ভারতের বহির্বর্তী অগণিত দেশের পুরুষ-নারী—হাজার হাজার বৎসর ধরে যে সাহিত্য-ভারতীর চরণোপান্তে বসে, কখন বা সুমেরু-কুমেরু শিখরে বা পাদদেশে, কখন বা কাশ্যপহ্রদের (Caspian Sea?) তীরে বসে, কখন বা বোরবুদুরে, কখন জাপানের ফুজি পর্বতমালায়—লক্ষ লক্ষ সংস্কৃত সাধকেরা হাজার হাজার বৎসর ধরে যে মহাজননীর সেবা ক'রে তার কুলকিনারা পাননি,—ফলতঃ বেড়েই চলেছে যার নিরন্তর বিস্তৃতি, অননুমেয় পরিধি—তাকে কঠিন ও শক্ত ভাষা হওয়ার অজুহাতে দূরে সরিয়ে রাখলে অথবা কোণঠাসা করতে গেলে, কার কি লাভ হবে? কেবল ভ্রাতৃদ্রোহের গ্লানিতে ছারখার হওয়ার দিকে দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে।

সংস্কৃত ভাষাই প্রকৃতকল্পে চিরকালই ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। ভারতের স্বপ্ন, জাগরণ, অভ্যুদয়—সব কিছুরই মূলস্থান ঐটি। বৈদিকযুগের হাজার হাজার বৎসর কালে আর যে অন্য কোন ভাষা ছিল—তার কোন প্রমাণ নেই। মহাভারতের যুগে যখন হস্তিনার রাজান্তঃপুরে কান্দাহার (গান্ধার), মদ্র, কুন্তি-ভোজের রাজকন্যারা এসে স্থান পেলেন, তখন তাঁরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যপদেশে কোন্ সনাতন ভাষা ব্যবহার করতেন? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হলেন—কোন্ আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে তাঁরা নিজ নিজ মনোভাব নিবেদন করলেন? সিংহলের অশোক-কাননে মা-সীতা যখন অঝোরে চোখের জল ফেলছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাক্ষস রাবণ বা বানর হনুমান্ কোন্ ভাষায় কথা বলেছিলেন? রামায়ণ বলছেন—হনুমান্ অশোক-কাননে চিন্তা করছেন:

যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা সা সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥[৬]

অর্থাৎ 'যদি আমি এখন হঠাৎ সংস্কৃতে কথা বলতে আরম্ভ করি, মা-লক্ষ্মী সীতা আমাকে রাবণ ভেবে যদি মূর্ছা যান, তা হ'লে কি হবে? কে তার মূর্ছা ভঙ্গ করবে?' কথাটি এই তো দাঁড়াচ্ছে—লঙ্কানিবাসী রাক্ষস রাবণ আর্যাবর্তের এই রাজকন্যা রাজপুত্রবধূর সঙ্গে সংস্কৃতেই কথা বলার চেষ্টা করতেন। রামচন্দ্র ঋষ্যমূক পর্বতে যখন উপস্থিত হলেন, তখন কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা কি অপূর্ব সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন, তাতে একটিও অপশব্দের প্রয়োগ ছিল না; শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের সম্পর্কে বলছেন:

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতাঽনেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥[৭]

এত যে সংস্কৃত হনুমান্ বললেন অপশব্দের প্রয়োগ কোথাও তাঁর হয়নি

৪ See Sanskrit Poetesses by J. B. Chowdhuri, Vols. 1 & 2.

৫ বর্তমান লেখকের Contributions of Women to Sanskrit Learning Series-র ১—৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৬ বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ, ১৮নং শ্লোক, লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃঃ ১০৩৭।

৭ বাল্মীকি-রামায়ণ, পূর্বোক্ত সংস্করণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, তৃতীয় সর্গ, ৩০নং শ্লোক, পৃঃ ৪৭৩।

'কুমারসম্ভবে'ও (৭।৯০) মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিষয়ে একই মনোভাব ও সত্য প্রকাশ করেছেন। মহাকবি শ্রীহর্ষের দিব্য দৃষ্টিতে চিরকালের সত্য অতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। দময়ন্তীকে লাভ করার জন্য বিদর্ভ দেশে এসেছেন দেবতা মানব—সকলেই। কিন্তু সকলে এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃত বলছেন যে, দেবতাদের থেকে মানুষের, এক দেশের লোক থেকে অন্য দেশের লোকের পার্থক্য বুঝবার কোন উপায় নেই—দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় সকলেই দেবভাষার মাধ্যমে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত।

'অন্যোন্যভাষানববোধভীতেঃ
সংস্কৃতিমাভির্ব্যবহারবৎসু।
দিগ্‌ভ্যঃ সমেতেষু নরেষু তেষু
সৌবর্গবর্গো ন জনৈরচিহ্নি॥'
(নৈষধচরিতম্, ১০।৩৪)

আজ থেকে একশত বৎসর পরে যদি কোন বাঙালী সন্তান জিজ্ঞাসা করেন—

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনি
নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বলধরণী
জনকজননী জননী॥'

—এই রবীন্দ্র-গীতি কোন্ ভাষায় লিখিত, বঙ্গসন্তানকে কি উত্তর দেবেন? এটি কি সংস্কৃত 'ভারত-লক্ষ্মী' সঙ্গীত নয়? এখনও কে বলবে, তখনও বা কে বলতে পারবে? বাংলা ভাষার চেহারা বদলাতে বদলাতে তখন কি রূপ নেবে, কে জানে? সে সময়ে পণ্ডিতেরা, অপণ্ডিতেরা সকলেই বলবেন—ঐ স্বদেশী গান সংস্কৃতেই লেখা। যুগযুগান্তরের বহু রচনা এভাবে সংস্কৃতের ভাণ্ডার পুষ্ট করছে এবং চিরকাল করবে।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাধারার মধ্যে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের স্থান আছে, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থান আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু ভারতীয়দের শিক্ষা সংস্কৃতায়িত হওয়া একান্তই দরকার। না হয়, ভারতীয় সন্তানেরা 'জেলি-ফিস্' (Jelly-fish)-ই থাকবেন, মানুষ হবেন না। স্বামীজীর দৃষ্টি কালজয়ী, অভ্রান্ত। যাঁরা সত্যাসত্য-বিনির্ণয়ে অসমর্থ, জগতের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ও আন্তর্জাতিক দূত বিশ্ববরেণ্য স্বামীজীর চিন্তাধারাকে তো তাঁরা মেনে নিতে পারেন।

বন্দেমাতরম্।

তৃতীয় পরিকল্পনা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

১৯৬১ খৃঃ ১লা এপ্রিলে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তৃতীয় যামে এসে পড়েছি। পূর্ব পরিকল্পনাগুলির মতো এরও উদ্দেশ্য লোকের আয়বৃদ্ধি করা, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ কমানো, কর্মপ্রার্থীদের জন্য কর্মসৃষ্টি করা—ইত্যাদি। যে পরিকল্পনায় এরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তার জন্য লোকের উৎসাহের অভাব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, দেশের অধিকাংশ লোকের মনে এই পরিকল্পনা কোন প্রকারের আগ্রহ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। সরকারী রিপোর্টে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অনেক বর্ণনা ছাপা হয় এবং এ বিষয়ে পরিসংখ্যানেরও অভাব নেই। গত দশ বৎসরে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ; গড়পড়তা জনপ্রতি আয় বেড়েছে শতকরা ১৬ ভাগ—অর্থাৎ প্রতি পরিবারের মাসিক আয় গড়পড়তা প্রায় ১২০৲ টাকা থেকে ১৩৮৲ টাকা হয়েছে। দেশের নানা অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে—লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, এলুমিনিয়ামের কারখানা, যন্ত্রনির্মাণের কারখানা, তেলের খনি, রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা—এদের চিমনি সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। আমরা বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়েছি, বাঁধের জল খাল কেটে চাষীর ক্ষেতে পৌঁছে দিয়েছি, জলে যন্ত্র বসিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করেছি। বিদেশীরা প্রশংসা ক'রে আমাদের প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছে এবং আরও দেবে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও যে প্রজাদের মনে শান্তি নেই, তা নিঃসন্দেহ।

এর কারণ খুঁজতে হ'লে গত দশ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে হবে। এই পরিকল্পনার পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৫০-৫১ খৃঃ থেকে—স্বাধীনতা-লাভের তিন বৎসর পরে। প্রথম পরিকল্পনার পথে দেবতার শুভদৃষ্টি ছিল। জমিতে সোনার ফসল জন্মাল ও খাদ্যশস্যে দেশ ভরে গেল। পাঁচ বৎসর পরে আমরা সহাস্য বদনে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বরণ ক'রে নিলাম। কিন্তু এই পরিকল্পনায় দেবতা তুষ্ট ছিলেন না। প্রথমেই বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবের ভুলে সঞ্চিত তহবিল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর এল বর্ষালক্ষ্মীর চঞ্চল অকরুণ দৃষ্টি। ফলে—জমির ফসল কমে গেল ও খাদ্যশস্যের মূল্য হ'ল ঊর্ধ্বগামী। এই রন্ধ্রপথে 'ইন্‌ফ্লেশন'-শনি দেশ অধিকার ক'রে বসল। ইন্‌ফ্লেশন ধনীর দেবতা—সে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে। ফলে ধনবৈষম্য বেড়ে গেল। এদিকে আবার পরিকল্পনায় নূতন কর্মসৃষ্টির যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কাজে দেখা গেল যে, তা যথেষ্ট নয়। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারবৃদ্ধি, ইন্‌ফ্লেশনে স্ফীতোদর ধনীর নির্লজ্জ ধনবিলাস, সরকারী কর্মচারীদের অলসতা—সব কিছু মিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনন্দ অপেক্ষা বিতৃষ্ণার সঞ্চারই হয়েছে বেশী। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনার আগমনে কেহই শঙ্খঘণ্টা বাজায়নি, বরমাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেনি; বিশেষতঃ জন্মভূমিচ্যুত, প্রতিবেশী-লাঞ্ছিত বাঙালীর চিত্তে এই পরিকল্পনায় আগমনীর সুর মোটেই বাজেনি।

কিন্তু এই অনাদৃত তৃতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। দেবতার কৃপায় ও বিদেশীর দয়াদাক্ষিণ্যে আমরা যদি পরিকল্পনার লক্ষ্যভেদ করতে পারি, তবে আমাদের গড়পড়তা পারিবারিক আয় দাঁড়াবে মাসিক ১৬০৲ টাকা। বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয় যে খুব বেশী, এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি যদি নিরস্ত করা সম্ভব হয়, তবে এর দ্বারা অভাব-অনটনের হাত থেকে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। খুব সম্ভব খাদ্যশস্যের অকুলন দূর হবে। বহু নূতন শিল্প গড়ে উঠবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ এমন পাকা করা যাবে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমস্তই আমরা নিজেরাই তৈরী করতে পারব।

আসলে তৃতীয় পরিকল্পনা হ'ল শিল্পগঠনের পরিকল্পনা। শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে হ'লে চাই যন্ত্রপাতি, আর যন্ত্রের মূল উপাদান হ'ল লোহা ও ইস্পাত। এই জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিনটি নূতন লোহা-ইস্পাতের কারখানা বসানো হয়েছে ও তৃতীয় পরিকল্পনায় আর একটি কারখানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই লোহা দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরী ক'রে আমরা বহু শিল্প গড়ে তুলব এবং ক্রমে শিল্পক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হ'তে পারব। এই মূল শিল্পগুলির ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন রেলওয়ের প্রসার ও উন্নতি করতে হবে—আরও নূতন ও ভাল রাস্তা তৈরী করতে হবে ও চলাচলের যানবাহনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিল্পপ্রসার হলেই কৃষিজাত কাঁচা মালের চাহিদা বেড়ে যাবে। পাটের কলের জন্য বেশী পাট চাই—কাপড়ের কলের জন্য তুলা চাই—বনস্পতির কারখানার জন্য তৈলবীজ চাই। এ ছাড়া খাদ্যশস্যের চাহিদাও অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং কৃষির উন্নতির দিকেও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার দোষত্রুটি তৃতীয়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে কি? তা না হ'লে এই নবজাত শিশুটির জীবনযাত্রাও দুঃখভারাক্রান্ত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির কাজে কিছুটা শৈথিল্য দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ আমাদের হিসাব বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাব। প্রথম পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে এদেশে ভাল বর্ষা হয়েছিল এবং ফসলও জন্মেছিল প্রচুর। সেইজন্য খাদ্যশস্যের মূল্য যথেষ্ট নেমে গিয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা-কমিশন তাই ভেবেছিলেন যে, কৃষির জন্য আর তত বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'উল্টা বুঝিলি রাম'। পরের বৎসর থেকেই বর্ষা কমে গেল ও ক্ষেতে কম শস্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী হ'ল। গত দুই বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আবার কিছুটা বেড়েছে এবং আমেরিকা থেকে বেশী খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। শেষ বৎসরে তাই খাদ্যশস্যের মূল্য একটু নীচের দিকে নেমেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্যের ফলন কম হয়েছে এবং এদের মূল্য অনেক বেড়েছে। কাঁচা মালের দাম বেড়েছে ব'লে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়তির দিকে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নতির দিকে আমাদের আরও বেশী নজর রাখতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির

উৎপাদনবৃদ্ধি করা যে খুব শক্ত বা ব্যয়সাপেক্ষ, তা নয়। যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয়। জমিতে সময়-মত কিছু জল ও একটু সার দেওয়ার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলেই ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। ছোট ছোট সেচব্যবস্থা—যেমন গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসানো, ইঁদারা ও পুকুর কাটা কিংবা যেগুলি আছে তার ঠিকমত সংস্কার করা—এর দ্বারাও জমিতে হয়তো আরও বেশী জল সহজেই পৌঁছে দেওয়া যেত; কিন্তু এটুকু করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। কারণ আমাদের সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল বড় বড় কাজের দিকে। তাঁরা ডি. ভি. সি, হীরাকুন্দ প্রভৃতি অতিকায় স্কীম নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। এইগুলি গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের জল ঠিক সময়ে ও ঠিক পরিমাণে জমিতে পৌঁছচ্ছে না। এর জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ ও সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব কম নয়। সারের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সিন্দ্রির মতো আরও কয়েকটি কারখানা গঠনের ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সব করা সত্ত্বেও মুস্কিল এই যে, জল ও সার ঠিকমত চাষীর জমিতে পৌঁছে দিতে হ'লে যে উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা আমাদের নেই।

পরিকল্পনার প্রতি লোকের অনুৎসাহের একটি বড় কারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্য-বৃদ্ধি। 'ইন্‌ফ্লেশন'-ব্যাধির বিনাশ করতে না পারলে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নানাভাবে ব্যাহত হবে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বহু কারণ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ঘাটতি—একটি বড় কারণ। আগামী পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়ানো যাবে কিনা, এ-কথা বলা শক্ত। এ নির্ভর করছে বর্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির উপরে। তবে ভরসার কথা এই যে, আমেরিকার বদান্যতায় আমরা কিছু খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে পেরেছি। দেশে যখন শস্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখন গুদামের শস্য বাজারে বিক্রি করা হবে এবং তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির গতি সংযত করা যাবে। কাঁচামাল সম্বন্ধে এই রকম কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না; কিন্তু কাঁচামালের দাম বেড়ে গেলে উৎপন্ন দ্রব্যেরও দাম বেড়ে যাবে। এই মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি ভাবে দূর করা যায়, এ বিষয় নিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকমত কি ব্যবস্থা করা হ'লে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, তার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদি পর পর কয়েক বৎসর ভাল বর্ষণ হয়, তবে হয়তো বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরই যে ভাল বর্ষা পাওয়া যাবে, তার ভরসা নেই বললেও চলে। কাজেই ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম, না বেশী—এ বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তবে কম হওয়ার পক্ষে একটি যুক্তি আছে এই যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, এর অধিকাংশই কর বসিয়ে ও বাজারে দেনা ক'রে চালানো হবে—বলা হচ্ছে। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ কম থাকবে ব'লে কাগজী নোট ছেপে ব্যয়-নির্বাহের প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হবে। তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা হয়তো কিছু কম থাকবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অপ্রিয়তার আর একটি কারণ হচ্ছে—বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি।

দেশের গড়পড়তা আয় কত পরিমাণ বেড়েছে এ আলোচনা বেকারের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন ব'লে মনে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? পরিকল্পনা-কমিশন যে হিসাব দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে নূতন কাজ দেওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে এই পাঁচ বৎসরে চাকরির বাজারে নবাগতদের সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ—অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার-সমস্যা যেরূপ ছিল পাঁচ বৎসর পরে তা বরং খারাপের দিকেই যাবে। এর কারণ যন্ত্রশিল্প লোহা ও ইস্পাত-শিল্প প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যে-পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হবে, কর্মীর প্রয়োজন হবে সেই অনুপাতে অনেক কম। ফলে নূতন চাকরির সৃষ্টি হবে কম। অবশ্য কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলেও লোককে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সব কিছু হিসাব করেও দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা কমানো যাবে না। পূর্বের দুইটি সমস্যার তুলনায় বেকার-সমস্যাটি অনেক বেশী গুরুতর। আমরা যদি ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারি, জমিতে জল ও সার পৌঁছে দিতে পারি, তবে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে ও দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিও রোধ করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয়টির (বেকারের) কোন সমাধান হবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনার এইটিই হ'ল সব চেয়ে বড় গলদ। এই পরিকল্পনা পূর্ণনিয়োগের স্বপ্ন দিয়ে গড়া নয়। এমন কি আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেও যে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না, এ-কথা নিশ্চিত। আমরা দ্রুততালে শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। ভিত্তি গড়ার কাজে বেশী লোককে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই কাজ শেষ হ'লে যখন চারিদিক থেকে শিল্পের গাঁথনি তোলা হবে—বহু নূতন কারখানায় দেশ ছেয়ে ফেলা হবে—তখন হয়তো বেকার-সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। প্রথম থেকেই পরিকল্পনার কাঠামো এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, এর দ্বারা বেকার-সমস্যার আশু সমাধান মিলবে না। আমাদের দেশে শ্রমিক ও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। অথচ মূলধন ছাড়া শ্রমিককে কাজে লাগানো যায় না। সেই জন্য প্রথম দিকে মূলধন-বৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে। যখন উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন সঞ্চিত হবে, যন্ত্রপাতি তৈরী হবে এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার হবে—তখন কর্মপ্রার্থীদের আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হবে না। পূর্ণনিয়োগের (full employment) স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

এই হ'ল পরিকল্পনাকারীদের কল্পনা বা চিন্তাধারা। এ যে অযৌক্তিক—এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু আজ যে বেকার বসে আছে, তার মনে এই যৌক্তিকতা কোন সান্ত্বনা দেবে না। সে সুদূরের পিয়াসী নয়, বর্তমানের পূজারী। বহু পরিবারে তাই তৃতীয় পরিকল্পনার কোন স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে না।

গত দশ বৎসরে এ-দেশে ধনবৈষম্য বেড়ে গেছে, এ-কথা অনেকেই বলেন। তবে এই জন্য পরিকল্পনাগুলি কতটা দায়ী, সে বিষয় বিচারসাপেক্ষ। এ-কথা ঠিক যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়েই 'ইন্‌ফ্লেশন' এসেছে এবং

ইন্‌ফ্লেশনে ধনবৈষম্য বাড়ে। সেই হিসাবে পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী বলা চলে। আর পরিকল্পনার ফলে বহু শিল্পবৃদ্ধি ঘটেছে, এবং সেইজন্য অর্থোপার্জনের সুযোগও অনেক বেড়েছে। তুলনায় গরীবের ভাগ্যে অর্থলাভের সুবিধা তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়নি। এই হিসাবেও পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী করা যেতে পারে। অবশ্য সবচেয়ে বড় কারণ—কর ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, বর্তমান জগতে অতি ধনীলোক থাকা সম্ভব নয়। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে যে, সে অতি অসৎ—অর্থাৎ সে অতিমাত্রায় সরকারকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। অধিকাংশ দেশেই আয়কর ও উত্তরাধিকার-করের হার এত বেশী যে, ঠিকমত কর দিলে লোকের হাতে খুব বেশী টাকা থাকবার কথা নয়। আমাদের দেশেও এ-কথা খাটে। কারণ এদেশেও ধনীদের উপর উচ্চহারে আয়কর বসানো আছে এবং এ-ছাড়া তাদের ব্যয়কর, সম্পত্তিকর এবং উত্তরাধিকার-কর দিতে হয়। যে লোকের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকা ও অন্ততঃ তার যদি দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকে, তবে আয়কর বাবদ তাকে দিতে হয় প্রায় ৫২ হাজার টাকা ও সম্পত্তিকর বাবদ ৮ হাজার টাকা; অর্থাৎ তার হাতে থাকবে মাত্র ৪০ হাজার টাকা। সকলে যদি ঠিকমত কর দিত, তবে ধনবৈষম্য যে অনেক কম থাকত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃহৎশিল্প-প্রসার, আমদানি-নিয়ন্ত্রণ, মূল্যবৃদ্ধি ও ফাট্‌কা-বাজির সুযোগবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে একশ্রেণীর লোকের লোকের হাতে প্রচুর অর্থ-সমাগম হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই খুব সাফল্যের সঙ্গে কর ফাঁকি দিতে পারছে। এর জন্যও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকটা দায়ী। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধনবৈষম্য কমাবার কথা আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয় নি; বরং এই পরিকল্পনাভুক্ত একটি প্রস্তাবের ফলে ধনবৈষম্য কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। ব্যয়নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত যে-রাজস্বের প্রয়োজন, তা পরোক্ষ কর ধার্য ক'রে তোলা হবে—এই কথাই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। তা হ'লে ধনবৈষম্য হয়তো একটু বেড়েই যাবে। কারণ পরোক্ষ কর দেবার পর ধনীদের আয় যতটুকু কমে, গরীব মধ্যবিত্তদের আয় সেই তুলনায় বেশী কমবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা একপঞ্চমাংশ। আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় আরও অনেকটা বেড়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের অধিকাংশই যদি মুষ্টিমেয় ধনীর কুক্ষিগত হয়, তবে জনসাধারণের ভাগ্যে জুটবে খুদ্‌কুঁড়ো মাত্র।

সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রাপথের বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখা যাচ্ছে। যাত্রা-পথের এই বিপদাশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তবে তার জন্য পরিকল্পনার কাঠামোকে খুব দোষ দেওয়া যাবে না। আসল গলদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে এবং অধিকাংশ কর্মচারীর মধ্যে। শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে যে আত্মত্যাগ, সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, আজ সেই গুণগুলির অনেক অভাব দেখা যাচ্ছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সকলেই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম—নিজেদের পদোন্নতি বা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করার কথা ভেবে নয়, এ দেশের অগণিত দরিদ্র-নারায়ণের দৈন্য দূর করার জন্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে রচিত বিরাট পরিকল্পনা যে সাফল্য-মণ্ডিত হ'তে পারছে না, তার কারণ আমাদের আত্মকেন্দ্রীয়তা ও নৈতিক মানের নিম্নগতি।

আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী

শ্রীশান্তশীল দাস

আমি তো বৈরাগী নই ; 'মায়াময়' ব'লে এ-জগৎ
অরণ্যে পর্বতে ছুটে সন্ধান করিনি মুক্তিপথ।
আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী— এই বসুন্ধরা ;
হাসি-কান্না, আলোছায়া, আনন্দ ও বেদনায় ভরা।

প্রতিদিন দেখি আমি বিচিত্র রূপের সমারোহ ;
'মিথ্যা সব' ব'লে মন কোন দিন করেনি বিদ্রোহ।
ভোগ করি মহানন্দে এই রূপ-রঙের সম্ভার ;
এর সাথে মাঝে মাঝে আসে বটে ঘন অন্ধকার।
সে-আঁধারও হাসিমুখে মেনে নিই ; অভিশাপ ব'লে
কোনদিন উপাধান ভাসাই না নয়নের জলে।

দেখেছি যে চোখ ভরে বিচিত্র রঙের কত খেলা,
পেয়েছি আনন্দ কত ধরণীর উৎসবের বেলা।
ঊষর জীবন-পথে রক্তস্নাত হয়েছে চরণ,
অভিযোগ করিনিক', সে-ব্যথাও করেছি বরণ।

অরণ্যে, গুহার মাঝে, জানি না সে কোন্ ভগবান
ভক্ত লাগি' বর নিয়ে রয়েছেন—তাঁহার সন্ধান
করিনিক' কোন দিন। আমি তাঁর প্রসাদ যে পাই
দিনে রাতে, সুখে দুঃখে ; কোন ক্ষোভ মনমাঝে তাই
জাগেনিক' হাসি-অশ্রু আনন্দ ও বেদনার মাঝে,
সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতা রাজে।

অকারণে কেন তবে মুক্তি লাগি এই ব্যাকুলতা !
স্রষ্টার আনন্দলোক—যেখানে রয়েছে সার্থকতা
জীবনের—সেই তীর্থে বিকশি' উঠুক চিত্তদল ;
আলো-আঁধারের মাঝে এ-জীবন হোক্ না সফল !

দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসব

শ্রীযশোদাকান্ত রায়

আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্য ভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন। যাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতেই এই সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ-সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসংকীর্তন প্রভৃতির বন্দোবস্ত কর।

[১৮৯৪, ১৯শে নভেম্বরে লিখিত পত্র হইতে] **বিবেকানন্দ**

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জিলা এবং উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার ২৩,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত অরণ্যবহুল জনবিরল অঞ্চল এতদিন অনেকের কাছেই অপরিচিত ছিল। রায়পুর হইতে বিজয়নগর অবধি যে জাতীয় সড়কটি এই অঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছে, সেইপথে অরণ্যসম্পদ্ এবং শস্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে কিছু ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছাড়া বাহিরের সঙ্গে এই অঞ্চলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সম্প্রতি এখানে কর্মের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং দণ্ডকারণ্য-যোজনার উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অনেক উদ্বাস্তু বসবাসের জন্য এখানে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া এবং অরণ্য হইতে সদ্যোমুক্ত বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিয়া এখানে নিজেদের জন্য গ্রাম গড়িয়া তুলিতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া ইহারা বহুদিন সরকারী শিবিরে অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। এখন নিজস্ব গৃহ ও জমি পাইয়া ইহাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ইহারাই দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসব করে।

অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতি মায়া এবং তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অভ্যস্ত স্থান ছাড়িয়া বাহিরে গেলেও, নূতন স্থানে গিয়া পুরাতন পরিবেশটিই সে সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। কালক্রমে নূতন স্থানটিতেই যখন তাহার জীবনের শিকড় বসিয়া যায় এবং সেখান হইতেই যখন তাহার দেহে মনে শক্তি-সঞ্চার হইতে থাকে, তখন সে এক নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ভারতের ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

বাঙালীরা বাংলা দেশে যেমন চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারি দুর্গোৎসব করিত, এখানেও তেমনই করিতেছে। এখানেও পূজার মধ্যে তেমনই বহিরঙ্গের সমারোহ। বাংলা দেশে যাহা কিছু তাহাদের প্রিয় ছিল, এই নূতন

স্থানে তাহারা সে সবই আস্বাদন করিতে চায়। তবু দণ্ডকারণ্য বাংলা দেশ নয় এখানকার পরিবেশ এবং এখানকার প্রতিবেশীরা উভয়ই বাঙালীর কাছে নূতন। বাংলা দেশের সঙ্গে এই স্থানের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদও আছে।

দণ্ডকারণ্য-যোজনা যেখানে কর্মরত, সেই স্থানই রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্য কি না—সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। এখন এখানে রাক্ষসেরাও নাই, মুনিঋষিরাও নাই। রামায়ণের যুগে হয়তো নর্মদা, মহানদী এবং গোদাবরীর অববাহিকা ব্যাপিয়া এক বিস্তীর্ণ বনভূমি 'দণ্ডকবন' নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে ইহার ভয়াবহতার বর্ণনা আছে। রামচন্দ্র বহু বৎসর এই অরণ্যে থাকিয়া বিরাধ, মারীচ প্রভৃতি রাক্ষস বধ করিয়া ইহাকে সর্বভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন দণ্ডকারণ্যে ভয়াবহ কিছুই নাই। দণ্ডকারণ্য-যোজনার কর্মস্থল এই বিশাল বনভূমির একাংশ মাত্র। এখানে কালিদাস-বর্ণিত 'রামগিরি' এবং 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদক' প্রস্রবণ এখনও রাম ও সীতার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও সেখানে বৎসরে একবার মেলা বসে। গোদাবরীর শাখা ইন্দ্রাবতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অসংখ্য ঝরনা ও নালা এখানকার বর্ষার জল বহিয়া লইয়া যায়—গোদাবরী ও মহানদীতে। বর্ষাকালে এগুলি জলপূর্ণ হইয়া মাঝে মাঝে কূল ছাপাইয়া যায়, আবার বর্ষান্তে ইহাদের অধিকাংশই একেবারে শুকাইয়া যায়। পাহাড় ও বনশোভিত এই স্থানটি বড়ই সুন্দর। এখানকার জমিও খুব উর্বরা। প্রধান শস্য ধান, তাহা ছাড়া ভুট্টা, জোয়ার, সরিষা, কলাই, তামাক, আম, জাম, কাঁঠাল, লেবুজাতীয় ফল, তরিতরকারি প্রচুর জন্মে। বনসম্পদের মধ্যে শাল, সেগুন, হরীতকী, আমলকী, বিড়িপাতা প্রধান। লোহার আকর এখানে প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। স্থানীয় আদিবাসীরা এই সব আকর হইতে নিজেরা আদিম প্রথায় লোহা গলাইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম তৈরী করে। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২,০০০ ফুট উঁচু; আবহাওয়া খুব মনোরম। গ্রীষ্মের তেমন প্রখরতা নাই, অন্যান্য ঋতুগুলি বাংলা দেশেরই অনুরূপ।

এই পরিবেশে বাঙালীরা বাস করিতে আসিয়াছে। পূর্ববাংলার প্রশস্ত ও চিরপ্রবাহী নদী এখানে নাই, দিগন্তলীন সমতল শস্যক্ষেত্রও নাই। এখানে চাষ করিতে হইবে পাহাড় ও বনবেষ্টিত অসমতল উপত্যকায়। বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া জলের চাহিদা মিটাইতে হইবে। নদীপথে যাত্রী এবং পণ্য বহনের সুবিধা এখানে নাই, অরণ্যপথে গো-যানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাত্রী ও পণ্য লইয়া যাইতে হইবে, অবশ্য মোটরগাড়ী চলিবার উপযুক্ত অনেক রাস্তাই আছে। এই পরিবেশ সম্পূর্ণ বাংলার মতো না হইলেও ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা বাঙালীর বসবাসের প্রতিকূল। বাঙালীর প্রতিভা এই পরিবেশকে সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারিবে। আন্দামান হইতে রাজস্থান ও নৈনীতাল পর্যন্ত বাঙালী যেখানে গিয়াছে, কোথাও পরিবেশ তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। দণ্ডকারণ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। এই দেশেও আবাদ করিয়া বাঙালী সোনা ফলাইবে।

এই পরিবেশের মধ্যে বাঙালীরা আর একটি বলিষ্ঠ মানব-গোষ্ঠীকে প্রতিবেশীরূপে পাইয়াছে। তাহারা এতদঞ্চলের আদিবাসী। আচারে ও সংস্কারে তাহারা বাঙালীদের মতো

নয়। বৌদ্ধযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাহিরের সমস্ত প্রভাব পূর্ববাংলায় অবাধে প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ববাংলার সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। দণ্ডকারণ্যে তাহা ঘটে নাই। অরণ্য ও পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরের প্রভাব সহজে এখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই অত্যন্ত আদিম অবস্থার মানুষ এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ-পথ খুলিয়া গিয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন-যোজনার মাধ্যমে অরণ্যের গভীরেও আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য-যোজনাও আদিবাসীদের জন্য নানারূপ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত। আদিবাসীরা অধিকাংশই 'গোন্দ' জাতীয়। ইহারা মারিয়া, মুরিয়া, পরজা প্রভৃতি নানা উপ-জাতিতে বিভক্ত। অরণ্যের নিভৃতে ইহারা বহুকাল এমন একটি সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহার অনেক কিছুই সুন্দর ও প্রশংসনীয়। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে। চাষের কাজ, নৃত্য, গীত, আনন্দ-উৎসবাদি উভয়ে মিলিয়া করে। স্ত্রী-পুরুষের এই মিলন সমাজের শাসনে বিস্ময়কর-ভাবে সংযত। ইহাদের সমবেত গীত, বাদ্য এবং নৃত্য ভারতীয় লোকসঙ্গীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নর্তকদের বেশবৈচিত্র্যে, নর্তকীদের সংযত ও ললিত ভঙ্গীতে এবং সুরমাধুর্যে এই লোকসঙ্গীত অনুপম। ইহাদের শিল্পসামগ্রীর মধ্যেও এমন শিল্পবোধের পরিচয় আছে, যাহা সচরাচর দুর্লভ। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ইহাদের পিতলশিল্প। মাটি, মোম এবং পিতলের সাহায্যে ইহারা যে সব জিনিস তৈরী করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের মধ্যে সেগুলি স্থান পাইবার যোগ্য। দণ্ডকারণ্যের নানা স্থানে পাথরে খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়। আদিবাসীরা এই সব মূর্তি পূজা করে। শিল্প-হিসাবে মূর্তিগুলি অনবদ্য। আদিবাসীদের পিতল-শিল্পের শিল্পশ্রেণীর সহিত এই প্রস্তর-মূর্তিগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, এই মূর্তিগুলি আদিবাসী ভাস্করদেরই কীর্তি। এখন এই প্রস্তরশিল্প লোপ পাইয়াছে।

এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাঙালীকে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়া বাস করিতে হইবে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া চাষের কাজে, ইহারা পরস্পরকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। স্থানীয় আদিবাসীদের চাষের রীতি বাঙালীরা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একটি মিলনভূমি প্রস্তুত হইয়া আছে। বাংলার মতো দণ্ডকারণ্যেও শিবশক্তি-পূজার বহুল প্রচলন আছে। বাংলার মতো এখানেও চড়কপূজা হয় এবং 'দেল' লইয়া ভক্তেরা গাজনে বাহির হয়, আবিষ্ট অবস্থায় কাঁটার আসনে বসে এবং নানারূপ অসাধ্য সাধন করে। আদিবাসীদের কোন কোন দেবস্থানের সম্মুখে একটি কাঁটার আসন ঝুলাইয়া রাখা হয়। শিবের পূজা করিয়া পুরোহিতেরা সেই আসনে বসে। আবার বাংলায় যেমন শক্তিপূজার প্রচলন, এখানেও তেমনই দেবীপূজার প্রচলন আছে। আপদে বিপদে দেবীই ইহাদের সহায়। 'কারণ' এবং ছাগ উৎসর্গ করিয়া ইহারা দেবীর পূজা করে। সিংহবাহিনী দশভূজা ঢাকেশ্বরী যেমন ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তেমনই দণ্ডকারণ্যের বস্তার অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিংহবাহিনী দন্তেশ্বরী। ইহাদের বিশ্বাস—দেবী দন্তেশ্বরীর কৃপাতেই এই অঞ্চলে কখনও

ক্ষ হয় নাই।

বাঙালী যেখানে যায়, সেখানেই যথাসম্ভব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করে। তাই দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসবের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে শক্তিপূজার এমন অনুকূল পরিবেশ অন্যত্র দুর্লভ। দুই বৎসর পূর্বে বাঙালী উপনিবেশীরা দণ্ডকারণ্যে যে দুর্গোৎসব করিয়াছিল, তাহা তাহাদের প্রথম দুর্গোৎসবরূপে স্মরণীয়। উপনিবেশীদের সংখ্যা তখন অল্প ছিল এবং গ্রামও তৈরী হইয়াছিল মাত্র একটি। প্রতিমা, পুরোহিত এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বহু দূরবর্তী শহর রায়পুর হইতে। তেলের ড্রামের মুখে চামড়া আঁটিয়া ঢাক তৈরী হইয়াছিল। শত বাধা সত্ত্বেও বাঙালীদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। নূতন স্থানে আসিয়া বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা করা যাইতেছে—একদিকে যেমন এই আনন্দ ছিল, অন্যদিকে—তেমনই জীবনের নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে দেবীর কাছে প্রণতি জানাইবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। আদিবাসীদের কাছে এই উৎসবটি হইয়াছিল এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ২৫।৩০ মাইল দূরের গ্রামাঞ্চল হইতেও অরণ্যপথে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া তাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল। বাঙালীরা যেমন আরাত্রিক, মহোৎসব, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি দ্বারা উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আদিবাসীরাও তেমনই অহোরাত্র নাচিয়া গাহিয়া উৎসব মুখরিত করিয়াছিল। দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, ইনিই তো দন্তেশ্বরী মা।

বাঙালী উপনিবেশীদের সংখ্যা তাহার পর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর দুর্গা-পূজার পূর্বেই চৌদ্দটি গ্রাম নির্মিত হইয়াছিল এবং দুর্গাপূজা আরও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমা, পুরোহিত এবং অধিকাংশ উপকরণ দণ্ডকারণ্যেই পাওয়া গিয়াছিল, বাহির হইতে আনিতে হয় নাই। আদি-বাসীরাও অধিকতর সংখ্যায় এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল। এক স্থানে তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিল প্রতিমা বিসর্জন না দিয়া মণ্ডপেই রাখা হোক, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ আসিয়া দেবীর পূজা করিতে পারে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসী-দের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। ইহাতে বাঙালীর সংস্কৃতি যেমন নূতন পরিবেশ হইতে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া নবরূপ গ্রহণ করিবে, আদিবাসীরাও তেমনই পাইবে বাঙালীর বহুযুগ-সঞ্চিত সাধনারাশির স্পর্শ। দণ্ডকারণ্যে এই মহত্তর ভবিষ্যতের ভূমিকাই রচিত হইতেছে।

সমস্যা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কি নামে তোমায় ডাকিব বন্ধু ?
কি নামে কানটি সজাগ থাকে ?
কেউ বলে 'হরি', কেউ বলে 'হর',
'তারা' 'তারা' ব'লে কেউ বা ডাকে।
তোমারে ডাকিতে কেন করে বলো,
অকারণে দু'টি আঁখি ছল-ছলো,
বলো তো কী আছে নামের ফাঁকে ?
'জয় কালি !' ব'লে কেউ ডেকে ওঠে
কী নাম আসল শুধাই কাকে ?

'প্রভু ! প্রভু !' বলা সাজে না তোমায়,
তোমাকে 'বন্ধু' ব'লে যে জানি,
আমি শুধু চাই আমার হৃদয়ে
তোমার প্রেমের পরশখানি।
'নাথ' ব'লে কেউ করে প্রণিপাত ;
আমি 'প্রিয়' ব'লে ধরেছি যে হাত,
প্রণম্য ব'লে কেমনে মানি ?
আমি যে পেয়েছি তোমার আদর,
কানে, প্রাণে ভরা তোমার বাণী।

'গুরু ! গুরু !' করা, হাঁকা 'জয় গুরু !'
গুরুতর ঠেকে আমার কাছে !
ডাকবো আমার ঠাকুরকে আমি,
গুরুজীর এতে কাজ কী আছে ?
প্রিয়-মিলনের লগ্নেই সতী
আপনিই চেনে আপনার পতি ;
নীড় চেনে পাখী—কোন্ সে গাছে।
জল কোথা কত গভীর অতল
কেউ কি সে কথা শেখায় মাছে ?

হয়তো অনেক উপরেই কেউ
উঠেছেন নিজ সাধন-বলে ;
আমি কেন যাবো হাত ধ'রে তাঁর,
ভক্তশিষ্য সাজার ছলে ?
অন্যের হাতে গাঁজা খেলে ভাই,
নেশায় তেমন মৌজ কি পাই ?
আমার ক্ষুধার তৃপ্তির বেলা
বকলমে কাজ সারা কি চলে ?

ইওরোপ-ভ্রমণকালে

[রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের প্রভাব-দর্শন]

শ্রীমতী শান্তি সেন

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব ইওরোপের অখ্যাত গ্রামের ভিতরে পর্যন্ত, নরনারীর হৃদয় কী গভীরভাবে যে স্পর্শ করেছে, তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। আমরা যখন ওদেশে ছিলাম, তখন ভ্রমণ করবার সময় যে কটি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়েছে, তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

ইংলণ্ড

একবার গ্রীষ্মকালে আমরা 'ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্ট'এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একদিন বিকেলবেলা—বিকেলই ব'লব, কারণ তখনও দিনের আলো ছিল, যদিও ঘড়িতে তখন ৯টা বেজে গিয়েছে, আমাদের রাত্রির খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদেশে গ্রীষ্মকালে রাত্রির অন্ধকার দশটা সাড়ে দশটার আগে নামে না। লণ্ডনেই দশটা সাড়ে দশটার আগে নামে না, আর লেক ডিস্ট্রিক্টে তো আরও একটু পরেই অন্ধকার হয়। সেইজন্য রোজই আমরা ডিনারের পর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেড়াতাম।

সে-দিন বেড়াতে গিয়ে আমরা একটি ফেরী বোটে ক'রে গ্র্যাসমিয়ার (Grassmere) লেকটি পার হয়ে অপর পারে গিয়েছিলাম। ফেরী বোটে আমরা ছাড়াও অনেকে ছিলেন। সেখানে আমরা তিনজন ভারতীয় ছিলাম। আমরা হ্রদটির শোভা দেখছিলাম, আর সে-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি কিনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমরা কি জানি? তাঁদের সম্বন্ধে বই কোথায় পাওয়া যায়? আমরা তাঁকে লণ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের ঠিকানা দিলাম। তখন তিনি বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কিছু বই পড়েছেন। তাঁকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে, তাই তাঁর সম্বন্ধে আরও জানতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ক্রাইষ্টের মতো ব'লে মনে হয়। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর উপদেশ মতো ওঁরা সংযতভাবে জীবনযাপন করেন। এইরূপ আরও অনেক কথা বলেছিলেন। লেকের অপর পারটি নির্জন, ওখানে গিয়ে তিনি ধ্যান করেন।

একটু পরে আমরা লেকের অপর পারে পৌঁছে গেলাম। লেকের এই পারটি একটি ঢালু পাহাড়—লেকের জল থেকে ঢালুভাবে উপরে উঠে গেছে এবং জল থেকে আরম্ভ ক'রে চূড়া পর্যন্ত ঘন লম্বা সবুজ ঘাসে ঢাকা। ঘাসগুলি এত ঘন ও নরম যে, বসলে বা শুলে নরম গদির মতো মনে হয়। তাতে আবার এত লম্বা যে, বসলে পাশের লোকও দেখতে পায় না। মাঝে মাঝে এক একটি বড় গাছও আছে। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বোট থেকে নেমে জলের ধারে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপরে বসে পড়লেন। আমরা উপরে উঠে গেলাম, সেখানে গিয়ে বসলাম। লেকের তীরটি খুব বিস্তৃত; তাই যদিও বহুলোক এখানে আনন্দ করতে আসে, তবুও নির্জন বোধ হয়।

সেদিন ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্টের সন্ধ্যায় গ্রীষ্মকালের অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোতে ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর দেখে সত্যই খুব অবাক্ হয়েছিলাম। যখন চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহোৎসব, সব লোক আনন্দে মত্ত, তখন ভদ্রলোকটি শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে ব্যগ্র। তাঁর অন্য কোন দিকে মন নেই, ঠাকুরের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তাঁর এত বেশী যে, নিজেদের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না। ইংরেজরা অপরিচিতের সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না; কেউ পরিচয় করিয়ে দিলে তবে আলাপ করে। এই তাদের সামাজিক রীতি এবং এরা খুব রক্ষণশীল ব'লে সহজে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে না। কিন্তু এই ইংরেজটির ঠাকুরের বিষয় জানার আগ্রহ এত বেশী হয়েছিল যে, তিনি তাঁদের গতানুগতিক নিয়ম ভঙ্গ ক'রে এসে ঠাকুরের কথা জানতে চাইলেন, এবং চারদিকের আমোদ-প্রমোদে যোগদান না ক'রে, একান্তে বসে ধ্যানে মগ্ন হলেন। এ দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর! সেদিন আমরা বুঝেছিলাম, ঠাকুরের ভাব কত দূরে দূরে ও গভীরভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করছে!

কোপেনহাগেন

পরবৎসর গ্রীষ্মকালে আমরা স্কাণ্ডিনেভিয়ান (Scandinavian) দেশগুলি দেখতে যাই; সে সময় আমরা ডেনমার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন কোপেনহাগেনে একটি ডেনিস-ভারতীয় সোসাইটিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি। সেখানে চা খাওয়া ও ডেনিস ও ভারতীয়দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের চা খাওয়ার পর গল্পগুজব হচ্ছে, এমন সময় একটি ডেনিস যুবক, বয়স তার ২৮।২৯ হবে, আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমি কি জানি? তাঁর সম্বন্ধে কি কি বই আছে, এবং কোথায় সেই বই পাওয়া যায়? আমি তাকেও লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্রের ঠিকানা দিয়েছিলাম। তখন সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বামীজীর প্রশংসা করতে লাগলো; ব'লল, এমন তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা সে আর কখনও শোনেনি। ভারতীয় যোগীদের কথা সে শুনেছে, কারও কারও জীবনীও সে পড়েছে, কিন্তু এত ভাল তার আর কাউকে লাগেনি। স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে আমি অবাক্ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের দেশের সন্ন্যাসীর আদর্শ সে এমন ক'রে বুঝতে পারলো কী ক'রে? ছেলেটি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লল, 'কেন, আমাদের দেশে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও তো সন্ন্যাসী আছে? তবে এ-কথা ঠিক স্বামীজীকে তার যত ভাল লেগেছে, তত ভাল আর কাউকে লাগেনি।' সুদূর পাশ্চাত্যের কোপেনহাগেন শহরে এসে, একজন ডেনিস যুবককে স্বামীজীর এত অনুরাগী ভক্তরূপে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

লণ্ডন

আমরা যখন লণ্ডনে ছিলাম, ঘনানন্দ স্বামীর সঙ্গে তখন আমাদের প্রায়ই দেখা হ'ত। সপ্তাহে একদিন ক'রে তাঁর মিটিং থাকত, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানেও আমরা যেতাম। তিনিও আমাদের বাড়িতে আসতেন; একদিন ফিজি রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রের স্বামী রুদ্রানন্দকে নিয়েও এসেছিলেন।

লণ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের লেকচার-হলে ধীরে ধীরে কিরূপে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগলো, তা আমরা দেখেছি। প্রথমে যাঁদের

চোখে কেবলমাত্র কৌতূহল, এমন কি বিদ্রূপ পর্যন্ত দেখেছি, ধীরে ধীরে তাঁরাই আবার আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন—তাও দেখেছি। অনেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত হয়ে গেছেন। ক্রমে কয়েকটি ইংরেজ ছেলেমেয়ে স্বামী ঘনানন্দের কাছে আসতে লাগলেন। তাঁরা ভারতীয় যোগীর মতো হ'তে চান। দু-একটি ছেলে ব্রহ্মচর্য নিয়ে ঘনানন্দজীর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। এইরূপ কয়েকজনকে আমরা দেখেছি। তাঁরা ওখানকার সব কাজ করতেন, এবং ধ্যান জপ ক'রে ভারতীয় সাধুদের মতো জীবনযাপন করতে চেষ্টা করছেন। ধনীরাও ক্রমে আকৃষ্ট হলেন এবং ঠাকুর-স্বামীজীর নামে আশ্রম করার জন্য বাড়ি ও টাকা দান করলেন।

গ্রাৎস্-এ একদিন

গ্রাৎস্ একটি ফরাসী গ্রাম। প্যারি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একবার ঈস্টারের ছুটিতে আমরা সেখানে গিয়ে একদিন ছিলাম। ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তখন ওখানকার অধ্যক্ষ; তিনিই ঐ আশ্রমটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ফরাসী বলতে পারতেন একজন ফরাসীর মতো। বহুদিন ধরে তিনি প্যারি ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ঠাকুরের নাম প্রচার করেছিলেন। ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত একজন ফরাসী noble man (জমিদার) তার Chateauটি (সাতো অর্থাৎ প্রাসাদটি) ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য দান করেন। এই বাড়িতেই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা ঈস্টারে ওখানে যাব ঠিক ক'রে সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর লণ্ডন থেকে আমরা জার্মানি যাই, সেখানে কিছুদিন থেকে ঈস্টারের আগের দিন প্যারিতে পৌঁছাই। প্যারিতে নেমেই দেখি, একজন ইংরেজী-জানা ফরাসী মেয়ে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা গ্রাৎস্-এ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাব কিনা। আমরা খুশী হয়ে সম্মতি জানালে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তাঁকে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর নামটি আজ আর মনে নেই। তিনি প্যারি ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট ও ঠাকুর-স্বামীজীর খুব ভক্ত, গ্রাৎস্ আশ্রমে প্রায়ই যান। তিনিই ট্যাক্সি ঠিক ক'রে আমাদের সরবোর্ন অঞ্চলে অর্থাৎ প্যারির ইউনিভার্সিটি পাড়ায় একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন আর বললেন, পরদিন সকালে এসে আমাদের গ্রাৎস্-এ নিয়ে যাবেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আমরা একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে রাত্রির খাওয়া সেরে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে স্নান ও প্রাতরাশ সেরে তৈরী হতেই দেখি পূর্বদিনের সেই মেয়েটি এসে উপস্থিত। তারপর আমাদের নিয়ে স্টেশনে গেলেন ও একটি ট্রেনে চড়ে আমরা গ্রাৎস্ চললাম। অল্প সময়েই পঁচিশ মাইল ট্রেন যাত্রা শেষ হ'ল। আমরা গ্রাৎস্-এ এসে, ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের সবুজ গাছপালা ও ঘাসে-ঢাকা মাঠ—আমাদের দেশেরই মতো। কেবল বাড়িগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরনের এবং রাস্তাঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রমের সাদা বাড়িটি সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট লনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ লনের এখানে সেখানে গোলাপের ঝাড়। অন্য নানা ফুলগাছের ঝোপ। সব গাছে রকমারি রঙের ফুল ফুটেছে। আর সেই

দিনটিও ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল; তাই সবুজ মাঠ, সাদা বাড়ি সবই রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছিল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখি বিরাট বিরাট হল; সবই সুসজ্জিত। সুসজ্জিত প্রাসাদটিই জমিদার আশ্রমের জন্য দান করেছেন।

আশ্রমে পৌঁছে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে প্রণাম করলে তিনি আমাদের দোতলায় ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই ঠাকুরঘর। সিংহাসনের উপরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি বসানো আছে। আর অজস্র গোলাপ দিয়ে সিংহাসন ও ছবিগুলির অর্ধেক ঢাকা। ফুলদানিতেও প্রচুর ফুল রাখা হয়েছে। দু-পাশে ধূপকাঠি জ্বলছে। মনে হ'ল ঠিক যেন ভারতবর্ষের কোন ঠাকুর-ঘরে এসেছি!

প্রণাম ক'রে আমরা নীচে নেমে এলাম। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, এখানকার সব কাজ আশ্রমের ছেলেরাই করে। ঠাকুরঘর ধোয়া-মোছা, ঠাকুর সাজানো, ধূপ জ্বেলে দেওয়া ইত্যাদি তো করেই, এই বিরাট বাড়িটি পরিষ্কার রাখা, রান্না করা, কাপড় কাচা, ইত্যাদি সব কাজই এরা নিজেরা করে। আবার ভারতীয় সাধুদের মতো ধ্যান জপ ক'রে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছে। তিনি আরও বললেন, এরা ঠাকুর স্বামীজী ও মাকে তো মানেই, আমাদের দেশের 'বিষ্যুদ'বারটি পর্যন্ত মানে,—ঠাকুর ও মা মানতেন যে! ঠাকুর-স্বামীজীকে এরা এত ভালবাসে যে, তাঁদের দেশের সবই এদের প্রিয়। সুদূর বিদেশে এসে এরূপ একটি আবহাওয়া পাওয়া আশার অতীত। আমাদের মনে হ'ল যেন দেশেই এসে গেছি!

তারপরে আশ্রমের একটি যুবক আমাদের আশ্রমটির সব দেখালে। তার কাছেই জেনেছিলাম যে, ভক্ত ফরাসী জমিদারটি সুসজ্জিত প্রাসাদটিই আশ্রম করার জন্য দান করেছেন। তারপর আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খাবার-টেবিলে ভারতীয় এবং ফরাসী রান্না করা নানা প্রকারের খাদ্য সাজানো ছিল। দইকারী, বিন-ভাজা, পায়েস, পুডিং ইত্যাদি। তখন আশ্রমে দুইটি দম্পতি অতিথি ছিলেন: জেনিভার অধ্যাপক (Professor of medicine) ও তাঁর স্ত্রী; আর ছিলেন, স্টক্‌হল্‌মের বৈমানিক (Civil aviation Assistant controller) ও তাঁর স্ত্রী। শেষোক্ত ভদ্রলোকের অল্পদিন আগেই একমাত্র সন্তান মারা যাওয়াতে, তাঁর স্ত্রী খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই শান্তিলাভের আশায় তাঁরা আশ্রমে এসেছেন এবং সপ্তাহ-দুই এখানে থাকবেন ঠিক করেছেন। আর জেনিভার প্রফেসর—তাঁর ক্লান্ত স্নায়ুকে আশ্রমের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিশ্রাম দেবার জন্য এসেছেন। তিনিও ৮।১০ দিন আশ্রমে থাকবেন। তা ছাড়াও সেদিন ঈস্টার ছিল ব'লে প্যারি থেকে বহু ভক্ত মেয়ে এবং পুরুষ আশ্রমে এসেছিলেন।

আমরা বারো চোদ্দ জন খাবার টেবিলে বসেছিলাম। সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর একপাশে আমি বসেছিলাম এবং আমার বাঁ পাশে জেনিভার প্রফেসর বসেছিলেন। পরিচয় করানো হয়ে গেলে জেনিভার প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীরা কত বৎসর বয়সে যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ করে, আমি তো শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। কি জবাব দেবো, বুঝতে পারছি না। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, 'বারো বৎসর বয়স থেকে, কারণ ঐ বয়সেই আমাদের উপনয়ন

হয়।' বিদেশে শিক্ষিত লোকেদেরও যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত, কিরূপ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা—জেনে খুবই বিস্ময় বোধ হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, যারা ভাবে ভারতীয়েরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসভ্য; আর একশ্রেণীর লোক ভাবে, ভারতবর্ষ যোগীর দেশ, সকলেই বুঝি যোগাভ্যাস করে। যাই হোক এইরূপ নানা আলোচনায় আহার-পর্ব শেষ হ'ল। ওরা রান্না বেশ ভাল করেছিল। আর ফরাসী মেয়েরা বিনুনী ক'রে খোঁপা বেঁধে খুব কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিল।

খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে একটি বড় হলে সমবেত হলাম। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী আমাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে বাইবেল থেকে ক্রাইষ্টের 'পুনরুত্থান' বিষয়টি পড়ে শোনালেন, তারপর ব্যাখ্যা করলেন। পাঠ ফরাসী ভাষায়, ব্যাখ্যাও ফরাসী ভাষায়; তাঁর বলা খুব স্বচ্ছন্দ, ভাষাও খুব সহজ। আমাদের খুব ভাল লাগলো। পাঠ ও প্রার্থনার পরে আমরা উঠে এলাম। তখন সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরি নেই। আশ্রমের ছেলেরা ঠাকুরঘরে আলো দিতে ও আরতি করতে চলে গেল। আশ্রমের অতিথিরা লনে একটু বেড়াতে লাগলেন। আমরা এবং আরও যাঁরা প্যারি থেকে এসেছিলেন, সকলে আবার ট্রেনে প্যারি ফিরে গেলাম। গ্রাৎস্-এ একদিন, আমাদের অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা, এত দূর দেশেও এই-রূপ ছড়িয়ে পড়েছে দেখে আরও আনন্দ হ'ল।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Reminiscences of Swami Vivekananda—By His Eastern and Western Admirers. Published by Swami Gambhirananda, President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Centre: Advaita Ashrama, 5, Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pp 404 ; Price : Rs. 7·50.

আলোচ্য পুস্তকটিতে দেশবিদেশের ৩১ জন ভক্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন-সময়ে যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা গ্রথিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণের পুণ্যস্মৃতিও অন্তর্ভুক্ত। এই সব স্মৃতিকথা ইতিপূর্বে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি স্মৃতিকথা মূলতঃ বাংলায় উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির অনুবাদও এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত। যাঁহারা স্বামীজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজির পূত সঙ্গে যাঁহাদের জীবন রূপান্তরিত হইয়াছিল, যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নিজেদের জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি একসঙ্গে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ—এই পুস্তক পাঠে একদিকে যেমন স্বামীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিবেন, অপরদিকে তেমনি দেশের ও জাতির নানা সমস্যার সমাধান পাইবেন। স্বামীজীর শতবার্ষিকীর পূর্বে প্রকাশিত এই পুস্তক স্বামীজীর জীবন ও বাণী বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

অগণিত সাধুমহাপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ৯৮ বৎসর পূর্বে প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া জগৎকে মানব-জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য 'স্বামী বিবেকানন্দ' উপহার দিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী—একাধারে দেশপ্রেমিক ও সন্ন্যাসী, জাতীয়তাবোধে পূর্ণ আবার আন্তর্জাতিক। দেশবাসীর সমক্ষে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং উন্নতি ও বিকাশের নিজস্ব পথে জাতিকে পুনর্গঠনের মহৎ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বানে ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মা জাগিয়া উঠিল এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশিত করিল।

অধিকন্তু নূতন এক সভ্যতার ঊষাগম তাঁহার সত্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলিত হইবে, অথচ প্রত্যেকেরই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিবে। এই সমন্বয়ের আদর্শ তিনি কেবল ভারতেই প্রচার করেন নাই, পাশ্চাত্যেও প্রচার করিয়াছিলেন; ইহার দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত মানবজাতিকে উন্নততর সভ্যতার পথনির্দেশ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে শান্তি আনিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দূরতম স্থানেও এই মহান্ জগদ্গুরুর সঞ্জীবনী বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থির হইয়াছে যে, তাঁহার জন্মশতবর্ষজয়ন্তী (১৯৬৩ খৃঃ) জগতের সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা-সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাপক কার্যসূচী কার্যকরী সমিতির সভায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হইবে, ইহা হইতে লোকহিতকর কার্য এবং বৃত্তিগত ও শিল্প-সংক্রান্ত প্রণালীতে জনশিক্ষা ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যে সাহায্য করা হইবে। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিবার জন্য সাধারণ কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প এবং সামনে কাজ অনেক। তাহা হইলেও আমরা আশা করি, এই মহান্ ভারত-সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহার অনুরাগী ব্যক্তিগণের সহৃদয় ও সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা জগতের সর্বত্র এই শতবার্ষিকী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

সাধারণ কমিটির সভ্যপদ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট উন্মুক্ত। সভ্য হইবার এককালীন চাঁদা অন্যূন মাত্র কুড়ি টাকা (২০৲), একই পরিবারের দুই ব্যক্তি সভ্য হইলে ত্রিশ টাকা (৩০৲) দিলেই চলিবে। ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাত্র দশ টাকা (১০৲) দিয়া সভ্য হইতে পারিবেন। বৈদেশিকগণের জন্য তিন পাউণ্ড বা দশ ডলার। যাঁহারা শতবার্ষিকী তহবিলে পাঁচশত টাকা বা তদূর্ধ্ব দান করিবেন, তাঁহারা সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য হইবেন। পরিকল্পনাটি পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ভারতে ও ভারতের বাহিরে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং শতবার্ষিকী তহবিলে মুক্তহস্তে দান করিয়া, উৎসবের সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করিয়া স্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে সাদরে প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে:

১। কোষাধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

২। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪।

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯।

৪। কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩।

৫। দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, A/c শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি,
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ১

৬। দি সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, A/c শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি,
১০০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১।

৭। ভারতের ও বাহিরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-কোন কেন্দ্র।

৮। সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, সুরফ্রিজ ভবন,
১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪।

স্বামী শঙ্করানন্দ (সাধারণ কমিটির সভাপতি)

স্যার বি. পি. সিংহরায়
মাদাম রোমাঁ রোলাঁ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী (পশ্চিম বঙ্গ)
ডক্টর কালিদাস নাগ
শ্রীজি. বসু
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
স্যার এ. রামস্বামী মুদালিয়র
মাননীয় বিচারপতি পি. বি. মুখার্জি
শ্রীএম. এন. ব্যানার্জি, বার-এট-ল'
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবি. কে. দত্ত
শ্রীআর. এন. মজুমদার
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সম্পাদক)
প্রভৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিবেদিতা বিদ্যালয়, কলিকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় ও সারদা-মন্দিরের ১৯৫৯-৬১ খৃ: কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃ: প্রাথমিক কার্য শুরু হয়; ১৯০২ খৃ: ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ খৃ: উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা (প্রাথমিক বিভাগ সহ) ৭৩০। শিল্পবিভাগে বয়ন, সেলাই, খেলনা তৈরী, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প প্রভৃতি শেখানো হয়। শিল্পবিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৭৮। গ্রন্থাগারে ৬,৪৪৩ পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৪টি সংবাদপত্র ও ১৬টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

সারদা-মন্দিরে শ্রীসারদা-মঠের ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা ১১জন কর্মী আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, ত্যাগ ও সেবামূলক সেই আদর্শে এই বিদ্যালয়ের বিভাগগুলি পরিচালিত হইতেছে। ছাত্রীনিবাসের ৩৮ জন ছাত্রীর মধ্যে কয়েকজন বিনা খরচে ও আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং প্রধান উৎসব-দিনগুলি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের উপযোগী সুন্দর একটি স্থান। একটি ছোট পাহাড়—চারিদিকে ওক-বৃক্ষের শ্রেণী; এখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৮৫ খৃ: সাত সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানের পুণ্য স্মৃতিধন্য একটি কুটির। কি এক উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় স্বামীজী এই সময় থাকিতেন, তাহা 'দেববাণী' (Inspired Talks) গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়। এইস্থানে স্বামীজী কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীকে 'দেববাণী' উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি বিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) রচনা করেন এবং ভারতে তাঁহার কাজের জন্য অনেক চিন্তা করেন। অধিকন্তু এখানে তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হয়। পশ্চিম গোলার্ধে সেই জন্য এই স্থানটি সকল বেদান্তানুরাগীর নিকট পবিত্র তীর্থ।

স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়, এই স্থানে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ধারা অব্যাহত থাকিবে। গত বৎসর দুই সপ্তাহ যাবৎ স্বামী নিখিলানন্দ এখানে একটি ছাত্রসঙ্ঘ পরিচালনা করেন ও 'বেদান্তসার' অধ্যাপনা করেন। এবারে গ্রীষ্মের সময় গত ২রা হইতে ১৫ই অগস্ট দুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি উপনিষৎ হইতে নির্বাচিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা করেন ২৬ জনের একটি ছাত্রসঙ্ঘে। এই সব ছাত্র দূর দূর অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহারা আসেন ম্যাসাচুসেটস্, মিশিগান, নিউজারসি, নিউইয়র্ক, ওহিও, পেনসিলভানিয়া, ভার্জিনিয়া ও কানাডা হইতে। কয়েকজন ছাত্র দুইদিন ধরিয়া মোটরে করিয়া এখানে আসেন। সকলেই বার্ষিক অবকাশের অধিকাংশ সময় পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত করেন।

এই সময় ছাত্রগণ সকালে প্রায় দেড়ঘণ্টা উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং তাঁহাদের কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার সমাধান করাইয়া লইতেন। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে (যে ঘরটিতে স্বামীজী থাকিতেন) সকলে সমবেতভাবে আরাত্রিকে যোগ দিতেন এবং পরে ভজন ও ধ্যানাভ্যাস করিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী মাধবানন্দ গ্রীষ্মকাল কাটাইতেছেন, কয়েকজন ছাত্র তাঁহার পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

তাঞ্জোরে বন্যার্ত-সেবা

জনসাধারণ অবগত আছেন, রামকৃষ্ণ মিশন তাঞ্জোর জেলায় বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে তিরুক্কাটুপল্লী ও থিরুভায়ার কেন্দ্র হইতে সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। মিশনের কর্মিগণ দুঃস্থ পরিবারগুলির অবস্থা দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগকে বুক-জলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। নিম্নলিখিত জিনিসগুলি গত ৩০. ৭. ৬১ পর্যন্ত ১,৩৬৩ পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে:

নূতন শাড়ি	...	১,৭৩২
„ ধুতি	...	১,৫৬৭
„ তোয়ালে	...	১,৫৬১
„ মাদুর	...	৭৭৩
„ পোষাক (শিশুদের)		৮৮৭
পুরাতন জামা-কাপড়		২,০০০

সাহায্য গ্রহণকারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান ও খৃষ্টান আছেন, সকল প্রার্থীকেই সমভাবে দেখা হইতেছে এবং সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

সহৃদয় জনসাধারণ ও বন্ধুবর্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহারা যেন 'ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৪'—এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করেন। যে কোন প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডাঃ সুবোধ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভিয়েনায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজিক্যাল সম্মেলনে গিয়াছিলেন। ডাঃ মিত্র ১৯৪৫ খৃঃ হইতে সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য এবং পরে উপাচার্যরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। মৌলিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কলেজ (College of Basic Medical Sciences) প্রতিষ্ঠার কার্যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিকট ঋণী। RWAC প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সংগঠক ছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার সময়ে তাঁহার সেবা উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচারে তাঁহার খ্যাতি ছিল পৃথিবীব্যাপী। তাঁহার মৃতদেহ বিমানযোগে দমদমে আনা হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানে লইয়া গিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সৎকার করা হয়।

এই বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যুতে চিকিৎসা-জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা: স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯০২ খৃঃ স্থাপিত এই সমিতির ১৯৬০ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটির কর্মধারা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত: প্রচার, শিক্ষা ও সেবা।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় গীতা, নারদীয় ভক্তিসূত্র, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি আলোচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে তাঁহাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। সমিতি-ভবনে সভ্যগণ কর্তৃক পূর্বপূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীকালী-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৪৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৭ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে ১৩৮৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৯০০ পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ২,৮১৫ পুস্তক গ্রাহকগণকে পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। পাঠাগারে ১৮টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী সংবাদ: প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবন নির্মাণ-কল্পে গত ৩রা জুলাই কলিকাতা ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে প্রায় ৪॥০ কাঠা জমি কেনা হইয়াছে। গৃহ নির্মাণের জন্য সোসাইটি জনসাধারণকে আবেদন জানাইতেছেন।

জনসংখ্যা

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U N O) কর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বোম্বাই নগর পৃথিবীর দশটি বৃহত্তম নগরের অন্যতম। টোকিও এই সকল নগরের মধ্যে বৃহত্তম; উহার আয়তন ১,৮৮৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১,১৩,৭০,০০০। নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, সাংহাই এবং লণ্ডন এই সকল বৃহৎ নগরের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যানবিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর যে চারটি দেশে শিশুমৃত্যু সর্বাপেক্ষা অধিক, সিকিম তাহাদের অন্যতম। তথায় যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের প্রতি ১,০০০-এর মধ্যে ২০০টি শিশু তাহাদের প্রথম জন্ম-তিথির পূর্বেই মারা যায়; ভারতবর্ষ, টাঙ্গানিকা, তিউনিসিয়া ও ব্রাজিলে প্রতি ১,০০০ শিশুর ১৫০-এরও বেশ কিছু বেশী মারা যায়। ভারতবর্ষে প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদের পক্ষে ৩২'৪৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে ৩১'৬ বৎসর।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষের মতো খুব কম দেশই আছে, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদিগের জীবনকাল অপেক্ষা কম। সিংহল ও কাম্বোডিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। অতিরিক্ত হারে প্রসূতি-মৃত্যু স্ত্রীলোকদিগের অধিক সংখ্যায় মৃত্যুর অন্যতম বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে করা হয়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে কমপক্ষে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র পৃথিবীর গড়-পড়তা জন্মহার হাজারপ্রতি ৩৬ জন এবং মৃত্যুহার হাজারপ্রতি ১৯ জন।

ইওরোপ অপেক্ষা এশিয়ায় দ্বিগুণহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন এশিয়ায় বাস করে, অথচ পৃথিবীর ভূভাগের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ এশিয়ার অন্তর্গত। (সংকলিত)

চলচ্চিত্রে আমেরিকা পরিক্রমা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রঞ্জি স্টেডিয়ামে নবনির্মিত জিওডেসিক ছাউনির ভেতর U S I S-আয়োজিত 'সার্কারামা'র প্রথম প্রদর্শনী যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি আনন্দদায়ক। এ এক নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, ছাউনির মধ্যে চারিদিকেই চলচ্চিত্রের ১১ খানি শুভ্রপট ৩৬০° ঘিরে রয়েছে! দর্শকগণ বুঝতেই পারছেন না কোনটিতে কি দেখানো হবে।

হঠাৎ শুরু হ'ল ক্যামেরার যাদুকর ওয়াল্ট ডিজনীর 'সার্কারামা' (circarama) চারিদিকে ছবির স্রোত! প্রথমে বোঝা যায় না কোনটি দেখব, আর কোনটি বাদ দেবো, ধীরে ধীরে বোঝা যায়—সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মনে হয়, দর্শকেরাই চলেছে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আগিয়ে, সামনের দৃশ্যই পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন চলমান যানের মধ্য থেকে দেখা যায়।

'দর্শক যাত্রীদল' প্রথমে চলেছে যেন স্টীমারে নিউইয়র্ক বন্দর অভিমুখে তারপর সেই আকাশচুম্বী সৌধাবলী-শোভিত মহানগরী দেখে দর্শকদের 'মোটর' যেন চলেছে রাজধানী ওয়াশিংটন, শান্ত পল্লী-অঞ্চল পার হয়ে কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী, শিক্ষাকেন্দ্র, পশুচারণের নির্জন প্রান্তর, ফসলে ভরা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে দর্শকেরা যেন বিমানবাহিত হয়ে এসে পৌঁছয় গ্র্যাণ্ড কেনিয়নের ওপর, তারপর দেখা যায় পশ্চিম উপকূলের তোরণদ্বার স্যানফ্রান্সিকো, গোল্ডেন গেট ব্রিজও বাদ যায় না।

এক অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে ২৫ মিনিটে ২৫,০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ ক'রে দর্শকগণ বেরিয়ে আসেন কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গণে! নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতার এ প্রদর্শনী থাকবে, আশা করা যায়—সকলেই দেখবার সুযোগ পাবে

বিজ্ঞপ্তি

কার্ত্তিক মাসের 'উদ্বোধন' মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট পৌঁছিবে। তখনও না পাইলে পত্রদ্বারা জানাইবেন।

—কার্যাধ্যক্ষ



রাত্রিসূক্ত

[কুশিক ঋষি, রাত্রি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

দেশে দেশে
দীপ্তিক্রীড়াময়ী
নেমে আসে রাত্রি ধরাতলে—
নক্ষত্রনয়না দেবী
সর্বশ্রীধারিণী ॥ ১ ॥
অমরা এই রাত্রিদেবী
নেমে আসে দিবলোক হ'তে—

তমসা-পূরিত করি
অন্তরীক্ষ দেশ,
আবরে সে স্বীয় তেজে
বৃক্ষ গুল্ম লতা—
ঊর্ধ্বগতি, নীচগতি সবে।
নক্ষত্র-আলোকে
বাধে পুনঃ সেই তমসারে ॥ ২

ভগিনী উষারে
রাঙাইয়া প্রকাশে সে
নিশাশেষে অরুণের রাগে।
দূরে যায় নৈশ অন্ধকার ॥ ৩ ॥
আগত এক্ষণে রাত্রির সে যাম—
বিশ্ববাসী নিদ্রাতুর সবে।
হে রাত্রিদেবতা,
প্রসাদে তোমার—
বৃক্ষনীড়ে সুখসুপ্ত বিহঙ্গম সম—
সুখসুপ্তি লভি যেন মোরা ॥ ৪ ॥
কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে
ফিরিয়াছে গৃহে গৃহে গ্রামবাসী সবে,
নিয়েছে আশ্রয় তারা সুষুপ্তির ক্রোড়ে
সুপ্ত—গাভী, অশ্ব, পক্ষী সব।
দ্রুতগতি শ্যেন—
সেও সুপ্ত ॥ ৫ ॥
রাত্রি সুগভীর।
হানা দেয়
আরণ্যক হিংস্র বৃক বৃকী;
হানা দেয়
পরধন-অপহারী তস্করের দল।
হে রাত্রিদেবতা,
আমা সবাকার থেকে
দূরে রাখ
বৃক বৃকী, তস্করের দলে।
সুতরা মোদের হও তুমি দেবী ॥ ৬ ॥
সকল বস্তুতে
দৃঢ়লগ্ন অন্ধকার।
কৃষ্ণ বর্ণ তার
প্রকটিত স্পষ্টরূপে।
সেই অন্ধকার
আসন্ন আমার কাছে এবে।
হে উষা আলোকময়ী,
দূর কর এই অন্ধকার—
অবাঞ্ছিত ঋণ সম ॥ ৭ ॥
পয়স্বিনী গাভারে যেমন
দোগ্ধা জানায় তার
দোহন-প্রার্থনা—
এ স্তুতি তোমার কাছে
হে রাত্রিদেবতা,
জানায় প্রার্থনা মোর।
আগত হবন-কাল।
শত্রু জয় লাগি,
হে সূর্য-দুহিতা,
হুত মোর এই হবি—
এই স্তুতি সম—
কর এ গ্রহণ ॥ ৮ ॥

[বঙ্গানুবাদ: শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী]

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

জাতীয়সংহতি-সম্মেলন

যে কোন কারণেই হউক, জাতীয় সংহতি (National integration) লইয়া নানাভাবে চিন্তা ও আলোচনা শুরু হইয়াছে। অনেকের ধারণা বুঝি বা ভারতের পূর্বে পশ্চিমে বা দক্ষিণে কোথাও ভাঙনের কোন লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাই এই প্রশ্ন আজ এত বড় করিয়া জাতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমাধান দাবি করিতেছে। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-বিভাগ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে, ভারতবাসীর মন কিন্তু এ সকলের উর্ধ্বে সর্বদাই একটা একত্বের উপাসক। সেই অন্তর্নিহিত একত্ব আজ বাহিরের জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে, ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠভাব অদ্বৈততত্ত্ব আজ সমাজ-জীবনে রূপায়িত করিতে না পারিলে ভারতবাসীর মহৎ জীবনাদর্শ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে জাতির সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই আহ্বান আসিয়া থাকে। অন্তরের ও বাহিরের শক্তির সংঘাতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। জাতির ঐতিহ্য-প্রসূত প্রতিভা ও শক্তিশালী নেতা যদি সমসাময়িক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন, তবেই জাতি সে যাত্রা বাঁচিয়া যায়, নতুবা জাতীয় জীবন ভূলুণ্ঠিত হইয়া পরবর্তী উত্থানের অপেক্ষা করে, আর যেখানে জাতীয় জীবনের নূতনতর বিকাশের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না— সেখানে সে জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা কি আজ সেইরূপ কোন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি ?

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত একটি চিন্তাই প্রবল ছিল। কি করিয়া বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে দেশ-জননীকে মুক্ত করা যায়। যে ভাবেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক বিদেশী শাসন সরিয়া গেল, জাতি যেন সুপ্তোত্থিত রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো জাগিয়া উঠিল— তাহার সকল শুভাশুভ সংস্কার লইয়া। দেশ-বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি কিছুটা স্তিমিত হইলেও ভাষা লইয়া বিরোধই আজ বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। সেই সমস্যার সমাধান আজ একান্ত প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় যেমন ভাষাবিরোধের সময়ও তেমনি—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-লাভই উদ্দেশ্য, কারণ রাজনীতিক ক্ষমতা-লাভের মধ্যেই আর্থনীতিক ও অন্যান্য উন্নতিলাভের আশা নিহিত। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সংখ্যায় যাহারা বেশী, তাহারাই ক্ষমতা লাভ করিবে, অতএব আজ সর্বত্র সেই চেষ্টাই চলিতেছে। ইহাতে সংখ্যালঘুগণ অধিকার-বঞ্চিত হইতেছে এবং এইখানেই জাতীয় জীবনে ফাটল ধরিয়াছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দেই শ্রীদেশমুখের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট কমিটির একটি আলোচনা-চক্রে (U. G. C. Seminar) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: শিক্ষার বিভিন্নস্তরে কি মাধ্যম হইবে? জনগণ যেন মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়। আবার

সারা ভারতে সকলের বোধগম্য এবং ব্যবহার্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তাও বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছে। সংবিধানে হিন্দীকে সেই ভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একদিকে হিন্দী ভাষাভাষীদের যথাশীঘ্র সর্বত্র হিন্দী চালু করিবার প্রবল আগ্রহ, অন্যদিকে অনেকের ইংরেজীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালু রাখিবার ইচ্ছা আর এক বিরোধের আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ এই বিরোধ দূর করিয়া জাতিকে সুসংহত করিবার চেষ্টায় কংগ্রেস জাতীয় সংহতি-কমিটি (National Integration Committee) স্থাপন করিয়া ব্যাপারটি সব দিক দিয়া বিবেচনা করিতে বলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবে গত মে, জুন ও অগস্ট মাসে বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া আলোচনা করেন, সেখানেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হয়, —বিশেষত ১৯৫৬ খৃঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস কার্যকর করিতে বলা হয়।

সম্প্রতি ভাষাভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি জাতির সংহতি বিষয়ে আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়াছে; মনে হয় তাহারই প্রতিকারকল্পে জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের পূর্বেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলন এবং পরেই আলিগড়ের হাঙ্গামা—অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন অধিকাংশ ভারতবাসীকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছে না।

যাহাই হউক এই সংকট মুহূর্তে সর্বদলের সহযোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন এক নূতন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে, আশা করা যায়। কয়েকজন নির্দলীয় নেতা এবং মনীষীর উপস্থিতি সম্মেলনকে শক্তিশালী করিয়াছে। আহূত ব্যক্তিদের তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, শিল্পনায়ক প্রভৃতি থাকায় সম্মেলনের ভিত্তি বিশাল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী দলের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে, হয় তো ইহা অপরিহার্য।

এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন দেশহিতৈষী চিন্তানায়ক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দুঃখ করিয়া বলেন: জাতিভেদ-প্রথা আজ সমাজ ছাড়িয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, নির্বাচনী দ্বন্দ্বে বর্ণ-বৈষম্যকে লাগানো হইতেছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন যতই প্রয়োজনীয় হউক, উহা সমস্যাকে কঠিন করিয়াছে। হিন্দী সরকারী-ভাষারূপে গৃহীত হইলেও বর্তমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের ইংরেজী শিখিতেই হইবে। আঞ্চলিক ভাষার নামে ভারতকে আর ছিন্নভিন্ন করা চলিবে না।

'জাতীয় সংহতি' আলোচনার অন্যতম প্রবর্তক শ্রীদেশমুখ বলেন: রাজনৈতিক সংহতির অভাব না থাকিলেও দেশে একতাবোধের অভাব আছে—কর্তব্যবোধের অভাব আছে; উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ে তাহা দূর করিতে হইবে।

নির্দলীয় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ একটি নূতন সুর তুলিয়া বলেন: ভারতবাসীকে একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। আধুনিক জাতি বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতে তাহা কখনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ জানে না—জাতির প্রতি আনুগত্য বলিতে কি বুঝায়। আসাম ও জব্বলপুরের ঘটনা তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে যদি একটি সর্বসম্মত কর্মসূচী গৃহীত হয়, এবং

উহা কার্যে পরিণত হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষাবিদ জাকির হোসেনের মতে রাজনীতিই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী।

এই সম্মেলনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে ভাষা ও লিপির ভূমিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ইংরেজী ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা (National Language) বলিয়া ঘোষণা করা হউক। কিন্তু ইংরেজীর বিরুদ্ধে এবং হিন্দীর স্বপক্ষে বলেন কাকা কালেলকর ও শ্রীলোহিয়া। তাহাদের মতে ইংরেজী-ভাষাভাষীরা জনগণ হইতে পৃথক একটি শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে।

ভাষার প্রশ্নের পর লিপির প্রশ্নের তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়; এ বিষয়ে তিনটি সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত হইয়াছে।

(১) প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে দেবনাগরী অক্ষরই সর্বভারতের সাধারণ লিপি বলিয়া অনুমোদিত হয়, তাহা এই সভায় অনেকেই অনুমোদন করেন।

(২) ইহার বিরুদ্ধে রোমীয় লিপি (ইংরেজী অক্ষর) প্রস্তাবিত হয়, কারণ দেবনাগরীতে সব ভাষার সব অক্ষর আসে না।

(৩) ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, রোমীয় লিপিতেও সব ভাষার সব অক্ষর বা ধ্বনি আসে না, অতএব ক্রমবিকাশের পথে নূতন কোন লিপি প্রবর্তন করিতে হইবে—যাহার দ্বারা সব ভাষার সব ধ্বনি ও অক্ষরকে প্রকাশিত করা যায়।

এ প্রসঙ্গে এ-কথাও চিন্তনীয়: লিপির ঐক্যকে এত বড় করিয়া দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, রোমীয় লিপি ইওরোপকে বা আরবী লিপি মুসলিম জগৎকে কি ঐক্যে আবদ্ধ করিয়াছে

শিক্ষার মাধ্যম আলোচনাকালে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা (Regional language) যে মাধ্যম হইবে এ বিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা সম্বন্ধেই বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাই চলুক, কেহ বলেন আন্তর্জাতিক কারণে ইংরেজী মাধ্যম ছাড়া উচিত হইবে না, আবার কেহ বলেন, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দী প্রচলিত করা উচিত। মোটামুটি এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের 'তিন ভাষার ফর্মুলা' (3-language formula)-ই অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকে মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে—আঞ্চলিক, হিন্দী ও ইংরেজী। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের একটি দাক্ষিণাত্যের ভাষা শিখিতে হইবে। ইহা দ্বারা ভাষাগত বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে এবং ভাষাগত একটা সাম্য ও সংহতি স্থাপিত হইতে পারে।

সারা দেশের শিক্ষাব্যাপারে অধিকতর সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা-বিভাগ (All India Education Service) স্থাপন করিবার এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Academic Board) তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের মনে হয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন-ব্যাপারে সরকারের পরোক্ষ নির্দেশই গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে কি ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সন্ধান লইয়া তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

ভারতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষার লোক আছে। কিন্তু সকলের মধ্যে একটি একত্ব রহিয়াছে! আবার রাজনৈতিক একত্ব সত্ত্বেও আঞ্চলিক অধিবাসীদের মনে একটি কেন্দ্রাতিগ

শক্তি (Centrifugal force) খেলা করিতেছে। এই উভয় ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয় জীবন চালিত করিতে হইবে। ধর্ম ও ভাষার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু উহা যেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। জাতীয় স্বার্থের বোধ অবশ্যই একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই উহা জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করিতে হইবে। অন্তরে একত্ব বোধ না করিলে বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী কি করিয়া বোধ করিবে 'আমি ভারতবাসী'?

মেগাটন ও নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের আতঙ্কে মানুষ আজ বিপন্ন; আন্তর্জাতিক আকাশ আজ শুধু দুর্যোগের ঘনমেঘে নয়, বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বিকীরণে সমাচ্ছন্ন। পৃথিবীর মানুষ এই বিপদের মুখে জীবন রক্ষা করিবার জন্য আজ এমনভাবে একীভূত হইতে চাহিতেছে, যেমনটি আর কখনও চাহে নাই। এ হেন বিশ্বজনীন বিপদের সময় আমরা কি আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া সমস্বার্থবোধ করিয়া জাতীয় সংহতিরক্ষার জন্য একমত হইতে পারিব না?

হইতে পারে এই সম্মেলন সকলের মনের মত হয় নাই, ইহার প্রতিনিধি নির্বাচন আশানুরূপ হয় নাই, একটি দলের প্রাধান্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়; হইতে পারে যাহারা আজ সংহতি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে সংহতি নাই, এমনও হইতে পারে তাঁহাদেরই কথা ও কাজ একদিন জাতিকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

সম্প্রতি-কালের মধ্যে এতগুলি দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক ও মনীষী মিলিত হইয়া দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে এত খোলাখুলিভাবে জাতীয় সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করেন নাই। 'অসংহতির প্রকৃত কারণ'রূপ নগ্ন সত্যের সম্মুখীন না হইলেও এই সম্মেলন নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ন্যূনতম সম্মতির সূত্র ধরিয়া যদি কিছু পরিমাণ চিন্তা ও কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হইবে, এবং জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে

চলার পথে

'যাত্রী'

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি?—ভাবছিলাম এই কথাটাই সেদিন শ্মশানে দাঁড়িয়ে। পায়ের নীচে ঐ শ্মশানভূমি, পাশেই খরতোয়া 'খর্কাই' নদী বয়ে চলেছে। ভাদ্রের বর্ষার শেষ আশীর্বাদ নিয়ে খর্কাই আজ সত্যি খরকায়া। ও-ধারে, ঐ দূরে মাথা তুলেছে টাটার কারখানা। সেখানেও বিলোল ধূম চিমনির মুখে—এখানেও বিলম্বিত ধোঁয়া চিতার বুকে। আর এই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝে কেমন এক প্রচ্ছন্ন প্রেরণায়, মনের মধ্যে সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা জাগছে—মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি?

মৃত্যুর পরও যে জীবন, সে জীবনেও কি আমার এই প্রাণের অনুভূতি থাকে? থাকে কি তখনও এই ফেলে-যাওয়া জীবনের স্মৃতি-সম্পদ্। এই সুদূরের যাত্রার, এই অজানায় পাড়ি দেওয়ার সময়েও, সেই দেহ-নিঃসম্পর্কিত মনেও কি চিন্তার চেতন-সত্তায় চৈতন্যের পরশ লাগে?

লাগে কি সেই মনেও—স্মৃতির হাতছানি, অজানার আহ্বান? কৃষ্ণ-বাঁশরীর যে টানে রাধা ছুটতেন সব ফেলে, সব ছেড়ে—সেই বাঁশরীর সঙ্গীত-সুষমার বিচিত্র প্রয়াসে কি ও-পারের বাঁশীর স্বরগ্রামগুলি বাঁধা থাকে? কে জানে? নিজের মন এতে উত্তর দেয় না—মানস-ই একমাত্র তখন তাকে বোঝাতে প্রয়াস পায়। সর্বমানবলোকের কত কথাই না শোনায় তখন ঐ মানস—ঐ মনন-সত্তা, ঐ বিবেক—যাকে বিচারশক্তিও বলা যায়।

তাই ভাব-সাধনার মানসপটে ঐ সর্বমানবীয় প্রশ্ন নিয়ে কত আঁকজোক টানি। কত জীবনবাদের স্পন্দন তুলি। কত ঢেউ, কত তরঙ্গ বর্তমান মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই কূলহারা ভেসে-হাওয়া অবস্থায় মনে হয় তট পাবো-তীরে উঠব। কিন্তু এই তটের আশ্বাস থাকলেও তার আগমন ঘটে ক্বচিৎ। কেবল চিন্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঘূর্ণির পাকে পাকে জিজ্ঞাসাটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় তাই চিন্তার সুতো কেটে দিই, তখন মনের লাটাইয়ের তত্ত্বের ঘুড়িটা আর ফিরে আসে না—অসীম অজানার আকাশে ঐ ঘুড়িটা তখন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ক'রে লাট্ খেতে খেতে কোথায় ভেসে যায়—কে জানে?

বাস্তবপন্থী বলবেন, এত চিন্তা কেন? মৃত্যু তো তোমার দেহে ঘটছে প্রতি মুহূর্তেই। তোমার দেহের জীবকোষগুলির দিকে তাকাও—দেখবে যাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমষ্টি নিয়ে তোমার এই দেহ, এই জীবন, এই প্রাণ-স্পন্দন টিকে রয়েছে। সেই জীবকোষগুলির কত সহস্র প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আবার প্রতিদিন কত শত নূতন কোষের প্রাণ উন্মেষিত হচ্ছে; কিন্তু কৈ, তুমি তো তাদের জন্য ব্যাকুল হও না। তোমার দৈনন্দিন জীবনের গতি যে তাতে একটুও যে ব্যাহত হয়, তাও তো নয়। বরং তুমি তোমার জীবনরূপ বিরাট্ সত্তাকে নিয়ে আদর্শের দিকে সমান ভাবেই এগিয়ে চলো। তেমনি এই মহাবিশ্বের তুলনায় ঐ জীবকোষ-সন্নিভ তোমার জীবদেহ-ধ্বংসে ঐ বিরাটের চিন্তার ও চলার কি আর বিপ্লব ঘটবে!

তাই তো জীবকোষের ধ্বংসে যেমন জীবন বেঁচে থাকে, তেমনি প্রাণী-জীবনের ধ্বংসেও ঐ মহাজীবনই—তথা অমরত্ব চিরদিনই টিকে থাকবে। আর ঐ অমরত্ব ঐ চিরন্তন সত্তাকে ধরা তো অমৃতত্ব। এই নির্বিরোধ অমরত্ব ছাড়া ভারত আর কিছুই চায়নি। এই কল্পনার মহোৎসবে ভারত তাই সুস্পষ্ট ক'রে বলেছে—'কিমহং তেন কুর্যাম্ যেনাহং নাহমৃতা স্যাম্' (যে জিনিস অমৃত দেয় না, তা নিয়ে আর কি ক'রব)। এবং ভারতের এই উক্তির বহু পরে পাশ্চাত্যের ভাব-নদীতে এর ফুট উঠেছে—'The light that never was on sea or land, the concentration and the poet's dream.'

এই অমৃত আস্বাদনের জন্য আমাদের ত্যাগ চাই। শ্মশান সেই ত্যাগের প্রতীক, বৈরাগ্যের অভীমন্ত্রের উৎসমুখ। পৃথিবীতে সব কিছুই ভয় দেখায়, কেবল বৈরাগ্যই মনে নির্ভীকতা এনে দেয় (সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্)। এই বৈরাগ্যের আবাসভূমি শ্মশান তাই ভয়ের জায়গা নয়, ভাবের জায়গা। ভয়ের জায়গা বরং ঐ লোহার কারখানাটা। যেখানে মানুষ যন্ত্রের কলকব্জার মতো কেবল automaton হয়ে কাজের মোহে বাঁধা পড়েছে। যেখানে মানুষের কৃত্রিম জীবনের জৈবসত্তাটাই বড়। চৈতন্যসত্তার চিন্তামাত্রও যেখানে পঙ্গু। যেখানে সর্বময় প্রেমের সেই অমৃতপরশ মেলে না। যেখানে ঐ নিশ্চেতনার

লৌহকারাগারে বাস করতে করতে কি-এক ছদ্ম-বৈরাগ্যে মানুষ সেই মহান্‌কে আস্বাদন করার স্পৃহাটুকুও হারিয়ে ফেলে। অথচ এই আনন্দ-আস্বাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিতে একে ঘিরেই ভারতের মহাবাণী উদ্ঘোষিত হয়েছে : প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ।

এই সর্বশ্রেষ্ঠকে পাবার জন্য হিমালয়ে ছুটতে হবে না—নিজের কর্মসংস্থাও ছাড়তে হবে না—কারণ এ তো সকলের মধ্যেই অনুস্যূত। শুধু সে যে আছে, সত্যই আছে, এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব দিলেই তাকে পাওয়া যাবে। তাইতো শাস্ত্র বলেছে : এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। কেবল কুকুর-শেয়ালের মতো নিজের জৈবদেহটাকে উপভোগের চিতায় তুলে একমুঠো ছাইমাত্রে পরিণত না ক'রে ঐ মহান্‌কে পাওয়া যায় এই বোধ—এই অপরোক্ষ অনুভূতিটুকু জাগিয়ে আনন্দসত্তার আস্বাদন-টুকু নিতে চেষ্টা কর, পথিক। আর এই চেষ্টার জন্যই তো তোমার মনুষ্যদেহ ধারণ। তাই বলি আর দেরি নয়— চল সেই পরাপ্রাপ্তির পথে, আস্বাদনের অপূর্বতায়। চল আর দেরি নয় —**শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ**।

কে জানে মায়ের খেলা !*

স্বামী বিবেকানন্দ

কে জানে—হয়তো তুমি ক্রান্তদর্শী ঋষি !
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন,
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি !

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে,
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত,
মুহূর্তে যা হ'তে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে !

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান্ তাপস,
বলেছেন যতটুকু,
তারো বেশী পেয়েছেন প্রাণে।
কে জানে কখন,
কার হৃদি-সিংহাসনে
মা আমার পাতেন আসন।

মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্যবলে ?
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার,
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।

হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে,
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়,
হয়তো সহস্র শক্তি কন্যার অন্তরে
রেখেছেন বিশ্বমাতা—সযত্ন সঞ্চয়।

* *Who Knows How Mother Plays* কবিতার অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামীজীর একটি চিঠি

(মিস মেরী হেলকে লিখিত পত্রের অনুবাদ)

রিজলি ম্যানর*

৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের আশাবাদী ভগিনি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। স্রোতে-ভাসা আশাবাদীকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার মতো কিছু একটা যে ঘটেছে, তার জন্য আনন্দিত। তোমার প্রশ্নগুলি দুঃখবাদের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে, বলতে হবে। বর্তমান বৃটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, যদিও অজান্তে ঘটেছে—তা ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে। সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হ'ত—অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—তা হ'লে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে আরও কত বিস্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল; কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার-কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধশিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বৃটিশ ভারতের সাজানো তামাশা—আর কিছু নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে।

ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, (দেশীয় রাজ্যে কখন দুর্ভিক্ষ হয়নি) তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুসলমান শাসনের আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌঁছয়নি। বর্তমান জনসংখ্যার অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে—যদি সব কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।

এই তো অবস্থা—শিক্ষাবিস্তার একরকম বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই), যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি, আরও কী আসে! কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না, কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান?

মেরী, তুমি আশাবাদী হ'তে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ ক'রে দাও—ভারতের নূতন কাহুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি, তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসক-সম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমরা যে 'হিদেন'। এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম নীরো (Nero)। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা তারা সংবাদ হিসাবেও লেখবার উপযুক্ত মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেণ্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক তৈরী' ঠিক উলটো খবরটি বাজারে ছাড়বে। হিদেন-হনন খ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত অবসর-বিনোদন। তোমাদের মিশনরীরা ভারতে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে যায়, কিন্তু ইংরেজদের ভয়ে সেখানে একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে না; যদি করে, পরদিন ইংরেজেরা তাদের দূর ক'রে দেবে।

পূর্বতন শাসকেরা শিক্ষার জন্য যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সবই গ্রাস ক'রে নেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে,—আর সে কী শিক্ষা! মৌলিকতার সামান্য চেষ্টাও টুঁটি টিপে মারা হয়।

মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।

হ্যাঁ, আশা করছি—কয়েক সপ্তাহ পরে চিকাগো যেতে পারব এবং তখন সব কথা খুলে ব'লব।...

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে '—' এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ; ইংরেজ প্রভুর কাছে আমাদের বাঁচতে দেবার প্রার্থনা নিয়ে এরা গজিয়ে উঠেছে। আমরা এক নূতন ভারতের সূচনা করছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। নূতন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাসী, যখন জাতির তা প্রয়োজন এবং যা আমাদের পক্ষে যথার্থ সত্য হবে। অন্যদের সত্যের পরীক্ষা হ'ল 'আমাদের প্রভুরা যা অনুমোদন করেন'; আর আমাদের হ'ল, যা ভারতীয় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অনুমোদিত হয়, তাই। লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, '—' ও আমাদের মধ্যে নয়,...শুরু হয়েছে আরও কঠিন ও ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে।

একতার সমস্যা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

১

ভারতবর্ষে একতার প্রশ্ন নিয়ে চারদিকেই রব উঠেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবিধ বিবরণ পড়ে যে-ধারণা একজন সাধারণ ব্যক্তির মনে জন্মায়, তা হচ্ছে এই যে, সকলেই যেন ভদ্রতার খাতিরে কিংবা অপর কোন উহ্য কারণে অনৈক্যের আসল হেতুটি মুখ ফুটে বলতে নারাজ, যেহেতু ওটা অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য। একটি প্রবচন আছে, 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। আচার্য-প্রফুল্লচন্দ্র ব'লে গেছেন যে এটাকে পালটে লেখা উচিত 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ব্রূয়াচ্চ সত্যমপ্রিয়ম্'। শৌখিন এবং মজলিশি ব্যাপারে অপ্রিয় সত্য না-বলার রীতি হয়তো চলতে পারে, কিন্তু যেখানে জীবনমরণ-সমস্যা, সেখানে শুধু অপ্রিয় বলার ভয়ে সত্যকে চেপে যাবার ন্যায় মূর্খতা আর কিছুই হ'তে পারে না। 'দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র।' (রবীন্দ্রনাথ)

বর্তমান যুগ, ধুয়ার (slogan-এর) যুগ। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে যাঁরা মহারথী, তাঁরা একটি ধুয়া কিংবা বুলি ধরিয়ে দেন, আর প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে সেই বুলি লক্ষবার, কোটিবার ধ্বনিত হ'তে থাকে,—যার ফলে মানুষের বিচারবুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং কোনরূপ যাচাই না করেই তারা সেই বুলিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান + সংবাদপত্র + রেডিও + দলগত-রাজনীতির সমবায়ে যে-কয়েকটি মারাত্মক বিপদ মানবজাতির সম্মুখে দেখা দিয়েছে, স্লোগান-আশ্রিত প্রচার হ'ল তাদের অন্যতম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে; যা কিছু সেই বিচারবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় অথবা বিনষ্ট করে, তা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। কারণকে দূর করা সম্ভবপর নয়, একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণের পক্ষে নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিকে সজাগ রাখা, এবং যে-কোন ধুয়া উঠুক, তাকে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করা। অনৈক্যের আসল কারণ-নির্ণয়ের পথ সুগম করবার জন্যে আমরা প্রথমে কয়েকটি চলতি ধুয়ার একটুখানি বিচার ক'রব।

২

একটি ধুয়া হচ্ছে 'Casteism'। এই জিনিসটি নাকি আমাদের পরস্পর রেষারেষির প্রধান কারণ। এমন কি আসাম থেকে বাঙালী-বিতাড়ন সম্পর্কে বড় বড় নেতারা আমাদিগকে শুনিয়ে আসছেন, অনর্থের মূলে তোমাদের ঐ 'Casteism'। 'Casteism'-এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ কিংবা অনুবাদ খুঁজে পাচ্ছি না। Casteism বলতে কি বুঝায়, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমাদিগকে শোনানো হয়নি। Casteism বলতে যদি নিজের জাতের প্রতি অতিরিক্ত টান বুঝায়, তা হ'লে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও অসমীয়া ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই বিভেদ ঘটত না; তারা অন্ততঃ এক হয়ে দাঁড়াত। Casteism বলতে যদি ছোঁয়াছুঁয়ির আতঙ্ক বুঝায়, অর্থাৎ নিজের শরীর এবং খানাপিনা সম্পর্কে স্পর্শদোষে

বিশ্বাস কিংবা স্পর্শদোষ মেনে চলা বুঝায়, তবে আসামের ব্যাপারে Casteism-এর কারণত্ব বুঝা দুরূহকর। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার নিয়ে এক দল আর এক দলের মাথা গুঁড়ো করতে চেয়েছে—এমন কোন ঘটনার কথা শোনা যায়নি। যদি বলা হয় যে, যারা পানাহারে স্পর্শদোষ মানে, তাদের মন স্বভাবতঃ সংকীর্ণ হয় এবং এই সংকীর্ণতা থেকে ভেদবুদ্ধি অন্যান্য দিকে প্রসারিত হয়, তবে প্রশ্ন জাগে এই যে, যে-সমস্ত 'শিক্ষিত' ব্যক্তি, স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তারা সকলেই কি খুব গোঁড়া হিন্দু, এবং ছোঁয়াছুঁয়ি অত্যন্ত মেনে চলে? পানাহারে স্পর্শদোষ না মানলেই কি রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষ খুব উদারচেতা হয়? যদি বলি যে, খানাপিনায় ছোঁয়াছুঁয়ি মানা-না-মানার উপর ধর্মবোধ এবং মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না, তবে কি খুব বেঠিক বলা হয়? স্বর্গত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ছোঁয়াছুঁয়ি মানতেন; আমরা অনেকেই মানি না। আমাদের স্বদেশানুরাগ, মনুষ্যত্ব এবং মানবপ্রেম কি তাঁর চেয়ে বেশী?

Casteism বলতে যদি বৈবাহিক আদান-প্রদানের নিষেধ বুঝায়, তবে প্রশ্ন আরও কঠিন। ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্প্রদায় ও ভাষাভাষীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক আদানপ্রদানের রক্তমিশ্রণ যদি নেশন-গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়, তবে তার সম্ভাবনা কোথায় এবং ভারতীয় সংবিধানে তদুদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? ইতিহাসের আদিম যুগে প্রভূত রক্তমিশ্রণ মানবসমাজে অবশ্যই ঘটেছিল; কিন্তু তৎপরবর্তীকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের পরে ব্যাপক রক্তমিশ্রণ কোন দেশে ঘটেছে কি? হিন্দুসমাজের ভিতরে রক্তমিশ্রণে যে-সমস্ত আইনগত বাধা ও অসুবিধা ছিল, তা সমস্তই তো ইদানীং দূরীভূত করা হয়েছে। যদি উহাই যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তো এই মর্মে আইন করতে হয় যে, নিজ নিজ বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের বাইরে ব্যতীত, ভিতরে আর কোন বিবাহ-সম্বন্ধ হতেই পারবে না। এরূপ আইন করা সম্ভবপর অথবা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে কি?

আর কোথাও না হোক, সুদূর অতীতে অন্ততঃ পূর্ব-ভারতে (আসাম, বাংলা, বিহার উড়িষ্যায়) জাতিমিশ্রণ যে খুব ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, আমাদের বর্তমান চেহারা তার অকাট্য প্রমাণ। আবার এও নিঃসন্দেহে সত্য যে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে এ অঞ্চলে জাতিভেদ দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কেমন ক'রে জাতিভেদ ফিরে এল, এবং আসা সত্ত্বেও কেমন করেই বা আমরা সভ্য মানবরূপে এখনও পরিচিত রয়েছি—এগুলো কি ভাববার বিষয় নয়? যে বিশিষ্ট প্রণালীতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার সঙ্গে কি এ সমস্ত ব্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই? অতীতের মূলোচ্ছেদ ক'রে নেশন-গঠনের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত এবং শুভদায়ক হবে কি?

আর একটি মাত্র কথা ব'লে Casteism-এর প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। অবস্থার চাপে এবং অন্যান্য কারণে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার খুবই হ্রাস পেয়েছে; স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অনতিকাল মধ্যে হিন্দুসমাজে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টার দরকার হবে না। এই মরণোন্মুখ প্রথাকে আর ঠেঙাবার কোনই প্রয়োজন নেই। দেশের ভিতরে নূতন কল্পে যে অনৈক্য

ও ভেদবিবাদ দেখা দিয়েছে, Casteism কিংবা জাতিভেদপ্রথা নিশ্চয়ই তার মূল কারণ নয়, এমনকি মুখ্য কারণও নয়, গৌণ কিংবা আংশিক কারণ কি না, তাতেও সন্দেহ। অনৈক্যের কারণ অন্যত্র।

৩

দ্বিতীয় একটি বুলি প্রচারিত হচ্ছে—Linguism. দেশের ভিতরে অনৈক্যের জন্য 'লিঙ্গুয়িজম'কে দায়ী করা হচ্ছে। কারা এই জিনিসটিকে আমদানি করেছে ও কাজে লাগাচ্ছে, তার স্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে বা শুনতে পাই না। দোষী করা হচ্ছে একটা ভাববাচক বিশেষ্যকে—একটা Abstract Noun-কে—কারণ এই পন্থা একদম নিরাপদ। Abstract Noun আমাদের মাথা গুলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভাঙতে পার না।

Casteism-এর ন্যায় Linguism-ও অভিধান-বহির্ভূত শব্দ। সুতরাং এর মানে ধোঁয়াটে রাখার পক্ষে খুবই সুবিধা। Linguism-এর এক মানে হ'তে পারে ভাষার উপর অতিরিক্ত-মাত্রায় গুরুত্বের আরোপ। সম্প্রতি দেশের একজন সেরা মনীষী বলেছেন: ভাষা একটা তুচ্ছ জিনিস, এ নিয়ে বাদবিসংবাদের কোন অর্থ হয় না। খুব উঁচু স্তরে উঠে গেলে ভাষা-সম্পর্কেও হয়তো এ-কথা খাটে যে, এটা নিজের কিংবা পরের ভাষা, তা 'গণনা লঘুচেতসাম্'। কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধিতে খটকা লাগে, মাতৃভাষা কি নগণ্য জিনিস? যেমন মাতৃভুমির প্রতি, তেমন মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ, এবং উভয়ের জন্য চরম স্বার্থ-ত্যাগ কি গৌরবের বস্তু নয়? ভাষা যদি নগণ্য জিনিস হয়, তবে ভারতীয় সংবিধানে ভাষা-সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা এবং রক্ষাকবচই বা কেন?

Linguism বলতে যদি ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠনের দাবির প্রতি কটাক্ষ বুঝায়, তবে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই দাবি ভারতবর্ষের পনের আনা ভুখণ্ডে স্বীকৃত এবং কার্যকরী করা হয়েছে। যেটুকু অংশে করা হয়নি, সেখানে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে।

Linguism মানে যদি Linguistic imperialism হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ভাষা-বিশেষের প্রচলন ও প্রতিপত্তি বাড়ানো বুঝায়, এবং ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানেরা যদি এবম্বিধ আচরণকে বস্তুতঃ দূষণীয় মনে করেন, তবে তাঁদের আচরণে এর কোন প্রমাণ পাই না কেন? এ-প্রকার অন্যায় যে দেশের কতক অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণেই চলেছে, সেন্সাস-রিপোর্টসমূহে তার বিস্তর সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু তা নিবারণের চেষ্টা দূরের কথা, তার মৌখিক নিন্দাবাদ পর্যন্ত শোনা যায় না কেন? ঘটনাচক্রে, কিংবা চক্রান্তের ফলে যারা দুর্বল এবং সংখ্যালঘু, তাদের জন্যই সদুপদেশ: ভাষার প্রশ্ন তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। এও বলা হয় যে, তারা এবং তাদের ছেলেপিলেরা ৩।৪ টা ভাষা শিখে নেয় না কেন!

'Linguism অনৈক্যের ইন্ধন জোগাচ্ছে', এ-কথা বলার আগে Linguism কথার অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। বাক্যের ধূম্রজাল রচনার দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট কখনও হয় না। সাধারণবুদ্ধিতে আমরা এটুকু বুঝি যে, ভাষাকে উপলক্ষ্য ক'রে স্থানে স্থানে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে, তার মূলে গভীরতর কারণ বিদ্যমান, উহা ব্যাধি নয়, ব্যাধির বাহ্য লক্ষণ। অনৈক্যের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে।

৪

'Emotional integration' নামক আর একটি বুলি আজকাল খুব আওড়ানো হচ্ছে। এর বাংলা তরজমা করা যেতে পারে 'ভাবালুতার সাহায্যে একীকরণ কিংবা ঐক্যবদ্ধ হওয়া'। এ-প্রকার চেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখেছিলাম, খিলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষে। বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে ভাবালুতার আবেশে হিন্দুরা তখন মুসলমানের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফল ফলতে দেরি হয়নি। প্রথম ঘটে মালাবারে হিন্দুদের উপর মোপলা বর্বরতার অভিযান, তার অল্পকাল মধ্যেই শুরু হয় নূতন উৎসাহে মুস্লিম-লীগের হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি। Emotion-এর বন্ধুত্ব আসে আচমকা, তা আবার শত্রুতায় পরিণত হয় আচমকা। এর উপর জাতীয় ঐক্যের সৌধপ্রতিষ্ঠা শুধু বালু দিয়ে বাঁধ-রচনা।

৫

স্লোগানের আলোচনা ছেড়ে এবারে আসল কথায় আসা যাক। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অধীনে রাষ্ট্রিক একতা ভারতবর্ষে কয়েকবারই ঘটেছে; কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিতে সমগ্র দেশব্যাপী এক শাসনের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের একত্ব-সংস্থাপন কিংবা একত্ব-সংরক্ষণের যে সমস্যা, তা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। ইওরোপেরও গণতান্ত্রিক নেশন-রাষ্ট্র খুব বেশী দিনের নয়। ইওরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই সুশাসক (Enlightened Despot) রাজার আমলে নেশন-রাষ্ট্রের কাঠামো প্রথমে গড়ে উঠেছে, দেশের একতা সুদৃঢ় হয়েছে; এবং হয় ধাপে ধাপে, নয় তো বিপ্লবের পন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ সমগ্র ভারতবর্ষকে এক শাসনরজ্জুতে বন্ধনপূর্বক একরাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসার মনবুদ্ধির জন্যে এনেছিল এক নূতন মুক্তি,—তার সম্মুখে খুলে দিয়েছিল এক নূতন জগৎ। ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের ফলেই ভারতবাসীর মনে জাগে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এবং লোকে বুঝতে পারে যে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন। এই মনোভাব এবং অভিলাষকে যদি ইংরেজ সুনজরে দেখত, তবে সুশাসন ও ন্যায়বিচারের দ্বারা ভেদ-বিবাদের কারণগুলোকে ক্রমশঃ দূরীভূত ক'রে একটা দৃঢ়বদ্ধ একতা ইংরেজ এদেশে হয়তো গড়ে তুলতে পারত। একতার ভাব এবং চরিত্রবল যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠবার পর দেশে গণতন্ত্র চালু হ'লে তা থেকে অনিষ্ট জন্মাবার আশঙ্কা থাকত কম। কিন্তু ইংরেজ সে পথে গেল না। ইংরেজ যখন বুঝতে পারলে যে, নূতন রাজনৈতিক সাধনায় ভারতবর্ষ যদি সিদ্ধিলাভ করে, তবে ভারতবর্ষকে আর শোষণ করা চলবে না,—তখন দেশের সমস্ত ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় ও উস্কানি দিয়ে সে চাইলে একতার ভিত্তিমূলকেই বিনষ্ট ক'রে দিতে। সেই মনোবৃত্তি ও চেষ্টার চরম পরিণতি—দেশবিভাগ।

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের একতা-সাধনে ইসলাম-ধর্মকে পাকিস্তান সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর পরিণাম ভাল কি মন্দ, তার বিচার এখানে হচ্ছে না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আমরা ও-পথে যাইনি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমরা ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। সুতরাং ভারতবর্ষে নেশন-রাষ্ট্র গঠনের কাজে হিন্দুধর্মের দোহাই আমরা

পাড়তে পারব না। হিন্দুধর্ম বিভেদকেই প্রাধান্য দেয়; অথবা সর্বভূতে সমদৃষ্টি এবং সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনকেই প্রাধান্য দেয়, সে সমস্ত তর্ক আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর এবং বৃথা।

জাতি (Race), ধর্ম এবং ভাষার একতা নেশনগঠনের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও এগুলো প্রায় সর্বত্র নেশনগঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু আমাদের পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, ভারতবর্ষে এর কোনটির সাহায্যই আমরা পাব না। জাতির (Race) একতা ভারতবর্ষে অস্তিত্ববিহীন; ধর্মের একতাও তথৈবচ; ভাষার ঐক্যও ভারতবর্ষে অবিদ্যমান। প্রধান ভাষার সংখ্যাই চৌদ্দটি; অপ্রধান তো আরও অনেক বেশী। জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সুতরাং বাধ্য হয়ে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব' (Unity in diversity), —এই নীতিকেই আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং নেশনগঠনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেছি। এই নীতির উপরেই ভারতীয় সংবিধান গঠিত। 'বহুর মধ্যে এক বিরাজমান'—একমেবাদ্বিতীয়ম্ —এটিও হিন্দুধর্মের একটি প্রধানতত্ত্ব। সংবিধানে হিন্দুধর্মকে স্থান না দিলেও হিন্দু-ধর্মের এই তত্ত্বকে সীমিতভাবে ভারতের গঠনতন্ত্রের মূলনীতিরূপে আমরা গ্রহণ করেছি।

দেশের ভিতরে নানা বৈচিত্র্য আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু একতার তত্ত্বটি তত পরিস্ফুট নয়। একরাষ্ট্রানুগত্যই আমাদের একমাত্র বন্ধনরজ্জু, এতদ্ভিন্ন আর কোন বন্ধন-রজ্জুই কার্যকরী হ'তে পারে না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, দেশময় এক ধর্ম প্রচলিত করার চিন্তাকে আমরা স্থানই দিইনি। ব্যাপকভাবে রক্তমিশ্রণের দ্বারা দেশময় এক নূতন সঙ্কর-জাতির (Creation of a mixed race by extensive miscegenation) সৃষ্টি করাও অসম্ভব বলা বলে। অপর সমস্ত ভাষাকে তুলে দিয়ে কিংবা নগণ্য ক'রে দিয়ে শুধু একটিমাত্র ভাষাকে দেশময় চালু করা—তার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এইজন্যেই বলছি যে, রাষ্ট্রানুগত্যই আমাদের একমাত্র বন্ধনরজ্জু হ'তে পারে; তার বেশী আর কোন একতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই রাষ্ট্রানুগত্য যদি উপর থেকে আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়, আমাদের অন্তরের সমর্থন তাতে না থাকে—তবে সেই আনুগত্য দ্বারা একতা কিছুতেই সাধিত হবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আনুগত্য প্রত্যেকের হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রানুগত্য আপনা থেকে আসবে, যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, এবং যদি প্রত্যক্ষ দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা সেই লক্ষ্যাভিমুখে সত্যই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রিকের* প্রাণ পর্যন্ত দাবি করে। দেশরক্ষার জন্য সবাইকে সৈন্যদলে ডাকা যেতে পারে। তার বদলে রাষ্ট্রিকও রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের জন্য একটা মহৎ আশ্রয়, আর দেশের জন্য একটা মহৎ লক্ষ্য, মহৎ সম্ভাবনা দেখতে এবং পেতে চায়।

*Citizen কথার প্রতিশব্দরূপে 'রাষ্ট্রিক' শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে ম'নে করি। প্রাচীন গ্রীসের City State থেকে Citizen কথার উৎপত্তি। State এখন আর City মাত্র নয়; Citizen কথা প্রচলিত থাকলেও তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাতে Citizenএর প্রতিশব্দরূপে 'নাগরিক' শব্দের ব্যবহার মোটেই যুক্তিযুক্ত কিংবা শোভন নয়। Citizen অর্থে 'রাষ্ট্রিক' শব্দের ব্যবহার অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু। যেমন 'নগর' থেকে 'নাগরিক', তেমনি 'রাষ্ট্র' থেকে 'রাষ্ট্রিক'। রাষ্ট্রের বাসিন্দারূপে বিবিধ অধিকার যে ব্যক্তি পেয়েছে এবং দায়িত্ব যার উপর বর্তেছে, সেই 'রাষ্ট্রিক'।

ভারতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? সংবিধানের প্রারম্ভেই বড় বড় অক্ষরে তা লেখা রয়েছে। উদ্দেশ্য—প্রত্যেক রাষ্ট্রিক যাতে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি নির্বিবাদে ও নিশ্চিতরূপে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা:

প্রথমত:—সামাজিক, আর্থিক, বার্তিক, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার।

দ্বিতীয়ত:—চিন্তায়, ভাবপ্রকাশে, মতবাদে, ধর্মবিশ্বাসে এবং পূজোপাসনায় স্বাধীনতা।

তৃতীয়ত:—মর্যাদার এবং সুযোগ-সুবিধার সমতা। অধিকন্তু রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে, (উপর্যুক্ত জিনিসগুলির সাহায্যে) সমস্ত রাষ্ট্রিকদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিবর্ধিত করা, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এবং নেশনের একতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা-পরিচালনা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র হচ্ছে গবর্নমেণ্ট বা সরকার। অতএব সরকারের কর্তব্য- ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের যে গ্যারান্টি অথবা প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক রাষ্ট্রিককে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতির অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন। এ যদি না করা হয়, তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের একতা কখনও বজায় থাকতে পারে না। এ-সকল প্রতিশ্রুতি যদি সরকার কার্যে পরিণত করেন, তবে প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তি রাষ্ট্রকে তার প্রাণের জিনিস ব'লে মনে করবে, রাষ্ট্রের গৌরবে নিজে গৌরবান্বিত, রাষ্ট্রের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত ব'লে জ্ঞান করবে। নতুবা রাষ্ট্র এবং শাসন-যন্ত্রকে সে মনে করবে একটি পেষণযন্ত্র, এবং ভাবতে বাধ্য হবে যে, তার মর্যাদা ও অধিকার হরণের জন্যেই সেই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে একতার মূলোচ্ছেদ ঘটবে।

সরকারের কর্মকুশলতা, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ইত্যাদির উপর দেশের একতা বহুলাংশে নির্ভর করে। যেহেতু আমাদের মধ্যে জাতি ধর্ম এবং ভাষার বন্ধন অবিদ্যমান কিংবা শিথিল, অতএব আমাদের একতার জন্য সরকারের কার্যে এবং আচরণে এই সমস্ত সদ্‌গুণ যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাষা, চাকরি ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি ফর্মুলা, কিংবা শুধু বাগাড়ম্বর, সভাসমিতি, কমিটি-কমিশন, ইস্তাহার, প্রচারবুলি ইত্যাদি দ্বারা দেশের ভিতরে একতা রক্ষিত এবং বর্ধিত হবে, এ আশা নিতান্ত দুরাশা। প্রাদেশিকতা-সমস্যার, ভাষাসমস্যার এবং অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হ'তে পারে, যদি রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সাহস-সঞ্চয়পূর্বক সংবিধানের লক্ষ্য এবং মূলনীতি অনুযায়ী সুশাসন দেশে প্রবর্তিত করেন।

যেমন শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেরই আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য আছে, তেমনি যাদের উপর দেশের শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত, তাদেরও একটা ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য আছে। সেই ধর্মের নাম রাজ-ধর্ম। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের মতে রাজধর্ম অপর সকল ধর্মের আশ্রয়; রাজধর্ম যথাযথ পালিত না হ'লে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যে অবহেলা করে এবং দেশ উচ্ছন্ন যায়। এ বিষয়ে মহাভারতের দুটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা সমাপ্ত করা যাক—

মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং
সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধাঃ।
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ
ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে॥
সর্বে ত্যাগা রাজধর্মেষু দৃষ্টাঃ
সর্বা দীক্ষা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ।
সর্বে বিদ্যা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ
সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ॥

[—শান্তিপর্ব, ৬৩।২৮-২৯]

ভগিনী নিবেদিতার জীবনদর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী

[নিবেদিতা বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

এই প্রসঙ্গে সত্যই ভারতীয় ধর্মের একটি মূলগত প্রকৃতির কথা আমাদের মনে পড়ে। সেটি হ'ল এই যে, ভারতবর্ষে কোন দিনও যাকে বলা হয় 'Conversion',—অথবা অপরকে স্বধর্মে আনয়ন-প্রচেষ্টা—তার প্রাবল্য ছিল না। প্রায় সকল ধর্মেই 'Conversion' অথবা এরূপ প্রচেষ্টা ধর্মপ্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের একটি প্রধান উপায়রূপে পরিগণিত করা হয়। যথা, ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মে এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম-শিরোমণিগণের স্থির মত এই যে, হিন্দুধর্ম এরূপ একটি মহাপুণ্যশীল ধর্ম যে, বহু জন্মের বহু সুকৃতির ফলেই কেবল হিন্দু-পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে হিন্দু হওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়; সেজন্য হিন্দুধর্মে 'conversion'র কোন স্থান অথবা প্রশ্নই নেই। উপরন্তু যাতে বিধর্মীদের কলুষ-স্পর্শে হিন্দুধর্মের পবিত্রতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েই আমাদের সর্বমনপ্রাণে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবে আদ্যন্ত কাল হিন্দুধর্ম 'সংরক্ষণের' প্রশ্নই কেবল উঠেছে, 'সম্প্রচারের' নয়।

নিবেদিতা এই সনাতন রীতির বিরুদ্ধেই আপত্তি উত্থাপন করছেন। সংরক্ষণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা প্রধানতঃ প্রারম্ভে কেবল—পরিশেষে প্রয়োজন বরং সম্প্রসারণ। যখন বহু সঞ্চয় হয়ে যায়, তখন তা কেবল পুঞ্জীভূত ক'রে না রেখে বরং অকাতরে দান করাই কি শ্রেয়ঃ নয়? পুষ্পটি যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন তার সৌন্দর্য স্বভাবতই দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে, সৌরভ বিস্তৃত হয় দিকে দিকে; মধু আকৃষ্ট করে শত শত ভ্রমরকে। এ সব কি লুক্কায়িত ক'রে রাখা যায়?

একই ভাবে আজ হিন্দুধর্ম যুগযুগান্তব্যাপী সাধনা-তপস্যায় বহু সম্পদের অধিকারী। আজ তার কর্তব্য—মুক্তহস্তে দান করা, নিজেকে আচার-বিচারের অন্ধজালে আবৃত ক'রে না রেখে। কারণ দানেই তো সঞ্চয়ের পূর্ণ সার্থকতা।

অবশ্য এ স্থলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হ'ল এই যে, যদি দান করবার সামগ্রী আমাদের থাকেই, তা হ'লে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে উপযাচকরূপে অন্যদের উপরে তা চাপাতে যাব কেন? অন্যেরাই যদি আমাদের মহিমা উপলব্ধি ক'রে নিজেরাই আমাদের দাতব্য বস্তু গ্রহণ করেন, তা হ'লে তাই কি শতগুণে শ্রেয়ঃ নয়? সেক্ষেত্রে 'conversion'-এর প্রয়োজন কি?

নিবেদিতা স্থির বিশ্বাসভরে বলছেন যে, প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবনযাপনে আমরা—হিন্দুরা সাধারণতঃ অভ্যস্ত, তার যুগ আজ আর নেই। আজ কর্মের যুগ, গতির যুগ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। আজ সকলেই নিজ নিজ, পৃথক্ পৃথক্, ব্যাপারাদিতে সর্বদাই এরূপ ব্যস্ত যে, অপরের সম্পদ্‌লাভের জন্য সেরূপ আগ্রহ সর্বত্র লক্ষিত নাও হ'তে পারে। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে,

আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃততর হচ্ছে; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃততর হচ্ছে অপরের উপর নিজেদের প্রভাব-বিস্তারের প্রচেষ্টা। কারণ ক্রমশঃ ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি প্রাধান্যও বিস্তার লাভ করছে আধুনিক জগতের বর্তমান রীতি অনুসারে। এই কারণে আজ আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অপর সকলকে সেই ভাবে প্রভাবান্বিত করতে হবে।

এই আধুনিক নিয়মানুসারেই নিবেদিতা বলছেন, যখন এই হচ্ছে প্রচলিত প্রয়োজনীয় ধারা, তখন কেবল ভারতবর্ষই বা ব্যতিক্রম হবে কেন, পশ্চাতে পড়ে থাকবে কেন? সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, পা ফেলে তাকেও তো হ'তে হবে সমান সক্রিয়, সমান প্রচারশীল, সমান উৎসুক স্বীয় সম্পদ্-বিতরণের জন্য। এই জন্যই তিনি অত জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'Aggressive Hinduism'-এর বিষয়।

কিন্তু 'Aggressive' কথাটা আমাদের—ভারতীয়দের বিশেষ ভাল লাগে না। কারণ মনে হয় যেন, বাইরে থেকে জোর ক'রে মূল্যহীন কিছু অপরের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা এতে আছে।

এই ধারণা ক্ষালনের জন্য নিবেদিতা বলছেন যে, দান হবে যোগ্যদান, আক্রমণের পশ্চাতে থাকা চাই সম্পূর্ণ যোগ্যতা– না তো এ সব বৃথা। এই জন্যই তিনি অতি সুন্দর-ভাবে বলছেন:

Point by point, we are determined not merely to keep what we had, but to win what we never had before. The question is no longer of other people's attitude to us, but rather of what we think of them. It is not how much we kept, but how much we have annexed. We can not afford now to lose, because we are sworn to carry the battle far beyond our remotest frontiers. We no longer dream of submission, because struggle itself has become only the first step towards a distant victory to be won. (p. 8)

—প্রত্যেক বিষয়ে যা আমাদের আছে, কেবল তাই রক্ষা করতেই যে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাই নয়; কিন্তু যা আমাদের নেই, তা অর্জন করতেও আমরা সমভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প। অন্যেরা আমাদের প্রতি কি ভাব-সম্পন্ন—তাই তো কেবল প্রশ্ন নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন যে, আমরাও তাদের কি ভাবে দেখি। আমরা কতটা রক্ষা করেছি, তাই কেবল প্রশ্ন নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন—আমরা কতটা লাভ করেছি। এখন পরাজিত হ'লে আমাদের চলবে না; কারণ আমাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমরা দূরদূরান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমরা পরাজয় বরণ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবব না, কারণ আমাদের এই যে যুদ্ধ, তা তো প্রথম সোপান মাত্র; আমাদের লক্ষ্য সুদূর ভবিষ্যতে জয় লাভ করা।

কত জোরের সঙ্গেই না নিবেদিতা বারংবার যুদ্ধের কথা বলছেন, জয়ের কথা বলছেন। বলাই বাহুল্য, এই যুদ্ধ দৈহিক যুদ্ধ নয়, আত্মিক যুদ্ধ। লোভের যুদ্ধ নয়, দানের যুদ্ধ। এতদিন আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা কেবল রক্ষণশীলতার অনড় অচল দৃষ্টিভঙ্গী যা আমাদের যুগযুগান্ত ধরে আছে, যা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, তাই কেবল সযতনে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা। এর ত্রুটি দুটি দিক্ থেকে। একদিক্ থেকে, আমরা অপরের

নিকট কোন কিছু গ্রহণ করতে পারি না। অন্যদিক্ থেকে আমরা অপরকে কোন কিছু দানও করতে পারি না। এ যেন একটি স্রোতোহীন পুষ্করিণী—কোন জলধারা এসে এতে পড়ছে না; কোন জলধারা এর থেকে বের হচ্ছে না। এরূপ গতিবিহীন জলাশয়ের গতি কি, তা আমরা জানি—পঙ্কিলতা। ভারত-সংস্কৃতি-পুষ্করিণীরও এই দুটি ত্রুটির বিষয় নিবেদিতা উপরের রচনাংশে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, পুষ্করিণীর উদাহরণ এ স্থলে সম্পূর্ণ খাটে না, যেহেতু ভারত-সংস্কৃতির পঙ্কিলতার কোন লক্ষণ আজও দেখা যায়নি। এটি সত্য—এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভারতের উত্থান-পতনশীল সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিনও এসেছে, যখন ভারত-সংস্কৃতির কদর্থ-বাষ্পে সমাজ-জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, তাতে অন্তর্নিহিত প্রকৃত শাশ্বত ভারত-সংস্কৃতির স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মহিমার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

এই কারণে ভারতের অনুপম, অনবদ্য, ধ্বংসবিহীন সম্পদের বিষয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই, নিবেদিতা এ স্থলে অন্যদের নিকট গ্রহণ অপেক্ষা, অন্যদের দান করার বিষয়ই বারংবার অধিক জোরের সঙ্গে বলেছেন। গ্রহণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে—সে বিষয়ে আর দ্বিমত কি? কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে—বর্তমানে তার অপেক্ষাও শতগুণ অধিক প্রয়োজন দান; অকাতরে দান, নিজে অগ্রসর হয়ে দান, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান, সাহসভরে দান।

এরই নাম নিবেদিতা দিয়েছেন, 'Dynamism'—সক্রিয়তা, সাহসিকতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য, জীবনগতি।

স্থির বিশ্বাসভরে তিনি বলছেন যে, এরূপ 'Dynamism' হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেরূপ সম্ভবপর, অন্যান্য ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। তার কারণ কি? তার কারণ, আমরা বলতে পারি যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা—সম্পদ্-শক্তি। যার কিছু নেই, সে দান করবে কি? যার শক্তি নেই, সে যুদ্ধ করবে কি ক'রে? যার পূর্ণতা নেই, সে জয় করবে কি ক'রে? এই কারণে বাইরের দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন, প্রকৃতকল্পে হিন্দুধর্মের পক্ষে 'Dynamic' হওয়া, 'Aggressive' হওয়া অতি সহজসাধ্য এবং অতি প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে সেই এক মূলগত কেন্দ্রীভূত প্রশ্ন: আমরা সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়ে জগৎকে কি আজ দান ক'রব?—ক'রব সেই একটিমাত্র বস্তুই, যা ভারতের শাশ্বত সম্পদ্, বিশেষ সম্পদ্—অর্থাৎ 'আধ্যাত্মিকতা'। ভারতের সম্পদ্ আদ্যন্তকাল আত্মার সম্পদ্; ভারতের বাণী শাশ্বতকাল আত্মার বাণী; ভারতের আদর্শ চিরন্তনকাল, আত্মার আদর্শ। এই তো আমরা জগৎকে দান ক'রব; এ ছাড়া ভারত ভারতই নয়; ভারতের ভারতীয়ত্ব কেবল এইখানেই।

যে চরিত্রগঠনের কথা নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, সেই চরিত্রই ভারতের প্রাণ-স্পন্দন, সেই চরিত্রই 'আধ্যাত্মিকতা'। নিবেদিতা ভারতের এই শাশ্বত অনাবিল রূপটি উদ্‌ঘাটিত ক'রে বলছেন: 'Character is spirituality'.

এই Spiritualityই হ'ল ভারতের 'Dynamism', ভারতের 'Aggressiveness'. 'Spirituality'র অর্থ কি? এর উত্তরে নিবেদিতা ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন অনুপম-ভাবে। কি সেই মূলতত্ত্ব? এই মূল তত্ত্বটি অতি গভীর তত্ত্ব নিঃসন্দেহ,

কিন্তু সুদীর্ঘ তত্ত্ব নয়। তা প্রকাশ করা যায় সংক্ষেপে, একটিমাত্র বাক্যে—স্মরণ করুন উপনিষদের সেই রোমাঞ্চকারী মহামন্ত্র :

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) —পৃথিবীতে সব কিছুই ব্রহ্ম। তত্ত্বের তাত্ত্বিক দিক্ হ'ল—সর্বাত্মবাদ; ব্যাবহারিক দিক্ হ'ল—সর্বমৈত্রীবাদ। সব কিছুই ব্রহ্ম হ'লে তোমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ এক ও অভিন্ন, যেহেতু আমরা উভয়ে একই। সেজন্য এই তত্ত্বানুসারে ব্যক্তিগত সুখের কথা না ভেবে আমরা কেবল ভাবব বিশ্বগত সুখের কথা; কেবল নিজের মুক্তির কথা না ভেবে আমরা কেবল ভাবব মানবজাতির মুক্তির কথা। শুনুন নিবেদিতার স্নেহমধুর বাণী :

To Ramakrishna and Vivekananda, the many and the one were the same Reality perceived differently and at different times by the human consciousness. Do we realise what this means? It means : **Character is Spirituality.** It means to protect another is infinitely greater than to attain salvation. It means Mukti lies in overcoming the thirst for Mukti. It means conquest may be the highest form of **Sannyas.** It means, in short, that Hinduism is become aggressive, that the trumpet of Kalki is sounded already in our midst; and that it calls all that is noble, all that is lovely, all that is strenuous and heroic amongst us, to a battle-field on which the bugles of retreat shall never more be heard. (p. 9).

—জ্ঞান এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল : চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা। এর অর্থ হ'ল : দুর্বলতা ও পরাজয় ত্যাগ নয়। এর অর্থ হ'ল—অন্যকে রক্ষা করা মোক্ষলাভের অপেক্ষা অনন্ত-গুণে শ্রেয়ঃ। এর অর্থ হ'ল—মোক্ষলাভের কামনা জয় করাই প্রকৃত মোক্ষ। সংক্ষেপে এর অর্থ হ'ল হিন্দুধর্ম আজ হয়েছে আক্রমণশীল, কল্কির ভেরী আমাদের মধ্যে নিনাদিত হচ্ছে, এবং আমাদের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রমসঙ্কুল, যা কিছু বীর্যবান্ আছে, তা সবই আহ্বান করছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে পরাজয়ের ভেরী আর কোনদিনই শোনা যাবে না।

উপরের উদ্ধৃত অংশে নিবেদিতার জীবন-দর্শনের কি সুন্দর দর্শনই না পাওয়া যায়? তাঁর এক একটি পঙ্‌ক্তি নিয়েই এক একটি বৃহৎ দার্শনিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা করা যায়।

প্রথমেই ধরুন 'Many' and 'One'-র প্রকৃত সম্বন্ধ-বিষয়ক পঙ্‌ক্তিটি। এস্থলে তিনি বলছেন :

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট 'এক' ও 'বহু' ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন সময়ে দৃষ্ট একই তত্ত্ব।"

বস্তুতঃ এটি দর্শনশাস্ত্রের মূলীভূত সমস্যা। কেহ বলেন, 'কেবল একই সত্য'; কেহ বলেন, 'কেবল বহু সত্য'। নিবেদিতা তাঁর প্রাণপ্রতিম গুরুদ্বয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, এ সমস্যা তো সমস্যাই নয়। কারণ 'এক' ও 'বহু' দুটি তত্ত্বই নয়—একই তত্ত্ব। যথা, সমুদ্র 'এক' কি 'বহু' এ প্রশ্নটিই কি হাস্যকর নয়? সমুদ্ররূপে দেখ—'এক'; তরঙ্গরূপে দেখ—'বহু'। সমস্যা কোথায়, বিরোধ কোথায়, দ্বিমত কোথায়?

এই 'একতত্ত্ব'বাদ স্বীকার ক'রে নিলে, আর সবই তো সহজ হয়ে যাবে। এই মহাতত্ত্বের পাঁচটি অর্থ নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন :

জ্ঞান কি—এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল : **'চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা'।**

এর ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা—আমাদের আত্মা কি? আমাদের আত্মা দেহ নয়, চরিত্র—জ্ঞান-ভক্তি-কর্মে গঠিত চরিত্র। চরিত্র কি? চরিত্রই মানব-জীবন, মনুষ্যত্ব; এবং এরূপ মনুষ্যত্বের মূল কথা হ'ল একদিকে তেজ, অন্যদিকে ত্যাগ। 'তেজ' ও 'ত্যাগ' একই মহাতত্ত্বের দুটি দিক্। কারণ এই 'তেজ' স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ নয়—এই তেজ ত্যাগের মহিমায়, বিশ্বপ্রেমের দীপ্তিতে, মানবসেবার গৌরবে ভাস্বর। অপর পক্ষে 'ত্যাগ' দুর্বলের অধিকার-লাভে পরাঙ্মুখতা নয়, নিরুপায়ের নিষ্ক্রিয়তা নয়, আশাহীনের হতাশা নয়।

এই ভাবে মানব-জীবনের, তার শাশ্বত আদর্শের ভিত্তির বিষয় বলতে গিয়ে চির-তেজস্বিনী অনমনীয়া ।নবেদিতা এই আত্মিক-বলের বিষয়ই বারংবার বলেছেন অতি জোরের সঙ্গে। বল, বীর্য, তেজ, শক্তি—এই ছিল তাঁর জীবন-মন্ত্র; এবং কতভাবে, কত উপমার সাহায্যে, কত সুন্দর উদ্দীপনাময় ভাষায় তিনি এই মন্ত্র প্রকাশ ও প্রচার ক'রে গেছেন আজীবন, প্রাণ পণ ক'রে, সমগ্র শক্তি দিয়ে।

একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন, এই মহা-মন্ত্রের মহিমা। এক কথায় এর অর্থ হ'ল: কেবল স্থিতি নয়, গতি; কেবল অস্তিত্ব নয়, বিকাশ; কেবল নির্বিকারতা নয়, উৎসাহ। গভীর অতল যে দীঘি, তার স্থিতি আছে, অস্তিত্ব আছে, নির্বিকারতা আছে। অপর পক্ষে, অগভীর চঞ্চল যে ঝরনা, তার গতি আছে, বিকাশ আছে, উৎসাহ আছে। এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ? নিবেদিতার মতে—প্রয়োজন দুটিরই পূর্ণ সংমিশ্রণ। সেই দিক্ থেকে আমরা কি আর একটি সুন্দর উপমার উল্লেখ করতে পারি না? সেই প্রাচীন সর্বজনবন্দ্য নদীর উপমা? অগভীর ঝরনা থেকে ক্রমশঃ হয় নদীর উৎপত্তি, নদী এসে মিলিত হয় সমুদ্রে। ঝরনার বিকাশ আছে, গভীরতা নেই; নদীর বিকাশও আছে, গভীরতাও আছে; সমুদ্রের বিকাশ নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। মানব-জীবনেও তো একই ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষিত হয়। শিশু-বয়সে সাধারণ রীতিই হ'ল নিজেকে প্রচার করা—প্রকৃত গভীরতা থাকুক বা নাই থাকুক। পরে পরিণত বয়সে, এই প্রকাশের ইচ্ছা অল্প হয়ে যায়, গভীরতা বর্ধিত হয়। পরিশেষে, বৃদ্ধবয়সে গভীর বিস্তার-বিহীন সমুদ্রের মতোই হয় জীবন। সমুদ্রের আর একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। সে গভীর অথচ বিস্তার-বিহীন, বিস্তারবিহীন অথচ সদাচঞ্চল। সেই ভাবে. শেষ বয়সে গভীরতা বর্ধিত হয়, প্রকাশ-প্রচারের প্রয়োজন থাকে না, অথচ প্রাণ-চাঞ্চল্য, জীবনোৎসাহ, চিত্তোদ্যমের অভাবও যেন না ঘটে—এইটিই তো হওয়া উচিত জীবন-লক্ষ্য।

হয়তো উপরের উপমার সাহায্যে আমরা নিবেদিতার জীবনাদর্শ-ভিত্তির বিষয় কিছু উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের পরিণত যৌবন যেন হয় পূর্ণ নদীর ন্যায়। নিজের সুমধুর বারিধারাকে কত সাহসভরে আগ্রহ-সহকারে আবেশ-বশে সে দান করে দেশ-দেশান্তরে—এই তো হ'ল তার 'Aggressive-ness'—তার নিষ্কাম আক্রমণশীলতা; কত অনুর্বর কঙ্করময় ভূমি তার এই সস্নেহ আক্রমণে পরাজিত হয়ে উর্বর উদ্যানে পরিণত হয়েছে, তার ইয়ত্তা কি?

এরূপ আক্রমণশীলতাই হোক হিন্দু-ধর্মের

মূলমন্ত্র—নিজেকে চতুর্দিক থেকে পূর্ণ ক'রে নিয়ে নিজেকে চতুর্দিকে পূর্ণভাবে দান করা—ঠিক একটি নদীর ন্যায়—এর অপেক্ষা অধিক মহনীয় আর কি হ'তে পারে? এই হোক তার জীবন-ভিত্তি, এই হোক তার মহালক্ষ্য, এই হোক তার পূর্ণ সার্থকতা।

নিবেদিতার ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিত মহাজীবনেরও এই তো ছিল সুদৃঢ়-ভিত্তি। তাঁর জীবন-দর্শন অনুধাবন করতে গেলে, এইটিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে। কি কোমল, কি মধুর ছিল তাঁর জীবন। কিন্তু কোমলতার সঙ্গে তেজ, মধুরতার সঙ্গে সাহসিকতার যে অপূর্ব সমন্বয় তাঁর ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, তা সত্যই জগতের ইতিহাসে বিরল। সত্যই, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, তাঁর 'শিখাময়ী' নামটি অতি সার্থক। তিনি যেন সত্যই একটি প্রদীপ্ত আলোক-শিখা, শিখার ন্যায়ই একাধারে কোমলা ও বীর্যময়ী, মধুরা ও অনমনীয়া, অন্ধকার দূরীকরণে উৎসর্গীকৃতা। 'Aggressiveness'র এই মহামন্ত্র সকলকেই শিক্ষা দিতে তিনি ছিলেন সমুৎসুকা। বিশেষ ক'রে তাঁর অসহ্য বোধ হ'ত যে, অতুলৈশ্বর্যশালিনী ভারতভূমি এই ভাবে দীনহীনার ন্যায় পশ্চাতে পড়ে আছেন। সেজন্যই তিনি বারংবার এই ভাবে তাঁর পূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ ক'রে বীর্যমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যে সুন্দর সম্পূর্ণ সত্য উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে নিবেদিতা আরম্ভ করেছেন, তা দিয়েই আমরাও আজ এই অধ্যায়টি শেষ করছি:

The true Hinduism, that made men work, not dream.

—যা প্রকৃত হিন্দুধর্ম, তা মানুষকে কাজ করায়, স্বপ্ন দেখায় না। (ক্রমশঃ)

পূজারি

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জানি একদিন চলে যেতে হবে
ভেঙে যাবে এই বাসা,
জীবনের পাখী উড়ে যাবে নভে
ফেলে রেখে সব আশা।

তবুও আমার হৃদয়ের মাঝে
কত কল্পনা অবিরত রাজে,
মায়া-মরীচিকা অতৃপ্ত তৃষা কেবলি আনে,
আমি চেয়ে থাকি প্রতি দিবসের নিমেষ-পানে

ধরার ধূলায় খেলাঘর পেতে
সাজায়ে পুতুল শত,
সংসার করি উৎসাহে মেতে
আগ্রহে অবিরত।

ক্ষণ অবসরে অন্তরে মম
জাগে আনন্দ আলেয়ার সম,
ফুলের পেলব স্বরভি লভিতে কত না সাধ !
মঞ্জুমনের কুঞ্জে করেছি দৃষ্টিপাত।

তবুও আমার নাহি মনে সুখ
কি যেন বেদনা জাগে,
বিঘ্নবিপদে ভেঙে যায় বুক
শোচনায় পুরোভাগে।

দিনগুলি মোর শঙ্কিতচিতে
যায় আসে কি যে দিতে আর নিতে,
বহু ঘটনার মূক বিবরণ লুকায়ে রহে,
বহু কামনার কল্লোল মোর মরমে বহে।

দূর হ'তে কার বন্দনা-স্থর
কানে আসে বারে বারে,
স্মৃতি-পিঞ্জরে শ্রবণ-মধুর
কে যেন ডাকিছে কারে ?

সংশয় দোলা পেয়ে নিরবধি
দূর করিবারে মোহ-দুর্গতি,
মোর প্রার্থনা মন্ত্র ধ্বনিতে মুখর করি,
চিদাকাশ হ'তে আলোকের ধারা পড়িছে ঝরি।

সে কি নিখিলেরে করেছে প্রসব
সে কি গো সারদা মাতা !
পেলে কৃপা তার পাবো বৈভব
গাহি তার স্তবগাথা।

এসেছিলে নব নর-কলেবরে
সাথে লয়ে ভোলা চিরসুন্দরে
শিবজ্ঞানে সেবা জীবেরে করিতে মহাজীবন,
শিখায়েছে এসে শক্তিরে করি উদ্বোধন।

আজিকে মায়ের অর্চনা-ক্ষণে
প্রাণের প্রণাম রাখি,
ধ্যানের গহনে অতি সযতনে
ভাবে আলিপনা আঁকি।

করুণা তাহার পাথেয় আমার,
পার হয়ে যাবো মরু পারাবার
চিরশান্তির অমৃতলোকে নয়ন মেলে,
সেই তো ধন্য যেজন সারদা মায়ের ছেলে !

কালিফোর্নিয়ার শেষ কয়দিন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস

[ডক্টর দাশ ১৯৫৪ খৃঃ স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে 'American Academy for Asian Studies' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ এবং হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়া কালিফোর্নিয়া গমন করেন। বর্তমান ভ্রমণকাহিনা তাঁহার তৎকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ। উ: সং]

জেমস ব্রাইস লিখছেন একটি ব্যঞ্জনাময় বাক্য—California, more than any other part of the union, is a country by itself, and San Francisco a capital. যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে কালিফোর্নিয়া বিশেষত্বময়, এটি শুধু রাষ্ট্র নয়, এটি একটি দেশ। নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় ও মানসতায় এ বর্ণাঢ্য, বহিরাঙ্গিক চমৎকারিত্ব তার ভুলবার মতো নয়, তার নিসর্গ চিত্রের চারুতাই শুধু হৃদয় স্পর্শ করে না, তার বহু বিচিত্র সমৃদ্ধিও মনপ্রাণ অভিভূত করে। আর সেই বিচিত্র রাষ্ট্রের ও বিচিত্র দেশের রাজধানী সানফ্রান্সিস্কো।

রুচিশীল মানুষের সমারোহ শুধু নয়, নানা ভাবের, নানাবর্ণের মানব-সাধারণের মিলনভূমি এই অনবদ্য নগর। প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট বিস্তৃতি দিয়েছে এর চিত্তে ভূমার বোধ, তাই বৃহত্ত্ব এর কাছে ভাবালুতা নয়, এর সহজ হৃদয়-সম্পদ্, যাযাবর মানুষের চঞ্চলতা ও উন্মাদনায় সে অধীর।

বুধবার। গেনসবরোর (Gainsborough) সাথে আলাপ হ'ল, তিনি আমাদের হাত-খরচ দুইশত ডলার দেবেন বললেন, তাতেই খুশী হলাম—এসেছিলাম সেপ্টেম্বরে এবং যাচ্ছি অক্টোবরে, সেই হিসাবে আরও কিছু দিলে হয়তো ভাল হ'ত, কিন্তু এই সব নিয়ে দর কষাকষি ক'রে মন কষাকষি করতে চাইলাম না। রাত্রে এখানে একটি সাধারণ বক্তৃতা দিলাম।

এটা একাডেমির একটা বিশেষত্ব। এরা চায় সাধারণ মানুষের মনের প্রসার। এদের বিশ্বাস এশিয়ার জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার খুলে দিতে হবে শিক্ষাব্রতীর জন্য যেমন, তেমন ভাবেই সাধারণের গণ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই বক্তৃতায় যেসব ডলার পাওয়া যায় সেটা বক্তার প্রাপ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুড়ি বাইশ জন মাত্র শ্রোতা এসেছিল, কিন্তু তারা সবাই শ্রদ্ধাশীল সমুৎসুক। তাই সারা অন্তর দিয়ে তারা শুনল ভাষণ। বক্তৃতার পর ছয় ডলারের বই বিক্রয় হ'ল।

মেরি ওয়া এসেছিল—শুক্রবার রাত আটটায় সে তার ওখানে এক বিদায়-সভার আয়োজন করেছে, নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। শোওয়ার আগে শিবরাম আর তার পত্নী সমাদর ক'রে ব'লল,—'চা বা কফি খান না?' মানুষ-দুটি খুব সরল, ওদের সহৃদয়তার মুগ্ধ হয়ে ওদের ঘরে গিয়ে কিছু আঙুর খেয়ে শুতে এলাম।

বৃহস্পতিবার। আজ বিমান-কার্যালয়ে গেলাম; তারা ব'লল আমার টিকিটে আমি যেখানে খুশি নামতে পারি—অর্থাৎ ইচ্ছা করলে Salt-Lake City, ডেলওয়ার (Delaware), চিকাগো (Chicago), ডেট্রয়েট (Detroit), ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) হ'য়ে নিউ-ইয়র্ক যেতে পারি।

রাত্রে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুরজিৎ সিংহ এলেন। প্রবন্ধ লিখবেন—'হিন্দু সমাজে

পিতৃত্বের প্রভাব'—তিনি তার সম্বন্ধে বলতে চাইলেন। হিন্দু দায়াধিকারে পিতৃতন্ত্র—ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও মাতৃতন্ত্র ছিল, কিন্তু পিতৃত্ব তাকে পরাজিত ক'রে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বললাম—'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ'—'পিতুরপ্যধিকা মাতা'—এই শ্লোক-দুইটির বিশ্লেষণ করুন—ওখানে মাতাকে উচ্চতর আসন দিলেও ব্যাপারটি কিন্তু মূলতঃ পিতৃ-দেবতার জয়স্তুতি। মনুর বচন বললাম, 'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ'।

পিতৃভক্তির এই আদর্শ আমাদের সমাজে এনেছে Continuity (ভাবসন্ততি) এবং Tradition (ঐতিহ্য), কিন্তু ক্ষতি করেছে—There is lack of initiative.—এই সব বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ চ'লল।

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর হরিদাস চৌধুরী এলেন। দাক্ষিণাত্যের নৃত্যকলাবিদ্‌ শিবরাম এই অতিথিদের আপ্যায়ন করবার জন্য চা ও বিস্কুট দিল।

শুক্রবার। আজ সকালে Civic Centre দেখতে গেলাম—এদের মেয়র রবিনসন ইওরোপে যাবেন, তাই তিনি ব্যস্ত—তাঁর সাথে দেখা হ'ল না। ওখানকার কর্মচারী সালিভানের (Mr. Sullivan) কাছে গেলাম—সে কালিফোর্নিয়া রাষ্ট্রের রীতি ও নীতি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল :

'আমেরিকা ফেডারেল গভর্নমেণ্ট—তাই নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের দান। কলম্বিয়া জিলা, কোন রাষ্ট্র নয়; তাই তাদের ভোটের অধিকার নেই।'—বক্তৃতান্তে সালিভান বিচারকদের খাস মুহুরী মিঃ কামিংসের (Mr. Cummings) সাথে আলাপ করিয়ে দিলে। তিনি জজ টোয়েন মাইকেলসনের (Judge Twain Michelson) কাছে নিয়ে গেলেন।

নম্র, সত্য ও সদালাপী টোয়েন বেশ চালাক, কিন্তু চাতুর্য তাঁর সহজ সৌজন্যকে নষ্ট করেনি। আমায় পাশে নিয়ে বসলেন, অনেকগুলি মোকদ্দমার কথা শুনলাম, তিনি মাঝে মাঝে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মেলোনি (Mr. Melony) ব'লে এক ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমায় নাবালক সন্তানদের কেমন ক'রে রাখা হবে, সেইটি তত্ত্বাবধান করবার ও বিবরণ দেওয়ার ভার তাঁর উপর। এখান থেকে ফিরে বাসায় এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম।

শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত। আমাদের মেসের পরিচালক বিল ব'লল ডাক্তারের কাছে যেতে। সেই উপদেশ গ্রাহ্য না ক'রে ঘরে এসে খানিক ঘুমালাম। শিবরামের কাছে আমার বড় ট্রাঙ্কটি পাঁচ ডলারে বিক্রি করলাম। ডিনার খেয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মেরি ওয়ার (Mary Wagh) বাসায়। সে তার চারজন বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের ছোট-খাট একটু বক্তৃতা শোনালাম। ওরা তিনখানি বই কিনল, আর দশ ডলার দিল।

শনিবার। প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন-ভোজন বাসায় বসে করলাম—লাইব্রেরির নানা বই ঘেঁটে সময় কাটলো। তার পর হাঁটতে শুরু করলাম—হেঁটে হেঁটে Mission Doloces নামে প্রাচীনতম গির্জায় গেলাম। এটা পর্তুগীজ কীর্তি, পাদ্রী জুনিবোরো ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। অগ্নি ও ভূমিকম্পের অত্যাচার সহ্য ক'রে এই প্রাচীন কীর্তি আজও বেঁচে আছে। আদিম আমেরিকানরা সবজির রস দিয়ে এর কড়ি বরগা রং করেছিল—সেই কাঁচা রং আজও

বেশ দেখা যায়। কড়ি ও বরগাগুলি চামড়া দিয়ে বাঁধা। স্পেনীয় যুগের স্মৃতি দেখতে পেলাম। তার পাশেই নূতন ও চমৎকার গির্জা হয়েছে। পুরাতনটি দেখতে ২৫ সেণ্ট দক্ষিণা দিতে হয়। পুরাতন ইতিহাসের মোহ ছাড়া দর্শকের মন ভোলাবার বিশেষ কিছু নেই। সেখান থেকে গেলাম ডক্টর চৌধুরীর বাসায়। পথে Twin Peaks এবং মাউণ্ট ডেভিডসন দেখে নিলাম, ডেভিডসন পাহাড় সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া; Twin Peaksকে সানফ্রান্সিস্কোর ভৌগোলিক কেন্দ্র বলা হয়, এখানে বড় টানেল আছে। পাহাড়-দুটির উপর থেকে নগরের এবং পূর্বোপসাগরের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে।

চৌধুরী-গৃহিণী আহারের খুব আয়োজন করেছিলেন। মুগডাল, বেগুনভাজা, চিংড়ি মাছ, রুইমাছের কালিয়া, টমাটোর চাটনি, পায়স প্রভৃতি ক'রে এক বিরাট ভোজের আয়োজন—তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল।

আজ শিবরাম ও জানকীর নাচ দেখলাম। শিবরাম বিষ্ণুর নানা অবতারের ভঙ্গী, শিবের নটরাজ নৃত্য, ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা পর্বতের পক্ষচ্ছেদ, কামদেবের মৃত্যু, ঘুড়ি ওড়ানো, ব্রহ্মপূজা প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকপ্রদ ও ভাবসুন্দর নৃত্যকলায় দর্শককে মুগ্ধ ক'রল। ব্যাসি (Bassie) ও আমি এলথিয়ার (Althea) গাড়ীতে বাসায় ফিরলাম। বিল ব'লল, 'আমেরিকায় পরদেশী অতিথিদের আতিথ্য প্রদর্শনের এক সভা আছে, তার নাম Opendoor Institution; এই সভার সভ্য যারা, তারা অতিথির সেবা যত্ন করে।' আমি বললাম, 'দাও ঠিকানা, তাদের চিঠি লিখি।' ঠিকানা নিয়ে চিঠি দিলাম আট দশ খানি, শুতে রাত হ'ল অনেক। ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো, তখন মনে হ'ল Salt-Lake City আর যাব না।

Salt-Lake City দেখার একটা ইচ্ছা ছিল, কারণ এটা Mormon নামক এক অদ্ভুত সম্প্রদায়ের আড্ডা। মর্মন চার্চের যারা ভক্ত, তারা ধূমপান করে না, মদ চা কফি পান করে না। এদের আর এক নাম Latter Day Saints. প্রত্যেক সভ্য তার আয়ের দশমাংশ গির্জাকে দেয়, কাজেই সেটি খুব বিভব- এবং প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু অবশেষে এই লোভ সংবরণ ক'রে আমার ভ্রমণ-তালিকা থেকে উটা (Utah) রাষ্ট্রকে বাদ দিলাম। প্রথম রাতের লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নূতন ক'রে চিঠি লিখলাম

রবিবার। টিকিট কিনে চিঠিগুলি ডাকে ফেললাম, তারপর 'যোগ' সম্বন্ধে কতকগুলি বই নাড়াচাড়া করলাম। দেড়টার সময় মিস্টার ডেলিং এভেরী এলেন—তাঁর সঙ্গে এদের মাউণ্ট ডেভিডসনের বাড়ীতে গেলাম, মিসেস এভেরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার বক্তৃতার দিন। এই মহীয়সী নারীর আন্তরিকতা জীবনে ভুলব না। এদের একটি মাত্র ছেলে, ওদের বন্ধু স্যালি (Sally) ব'লে একটি মহিলা, এক এটর্নি-দম্পতী আর মিস ড্যানিস—সবাই মিলে গল্পগুজবে বেশ কাটলো কয়েক ঘণ্টা। এটর্নি-দম্পতী বললেন, তাঁদের বন্ধুদের কাছে পরিচয়-পত্র দেবেন।

সেখান থেকে গেলাম রাজকুমারী অমৃত কাউরের সংবর্ধনা-সভায়। বলা ও চলার ভঙ্গীটি রাজকন্থার মতোই—তবে দু-ডলার চাঁদা দিতে হ'ল—সেটা খুব মনঃপূত হ'ল না। কিষন আজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু কি কারণে তারিখ বদলে গিয়েছিল, তার বাসায় তাই আর খাওয়া হয়নি। তাকে তার

গাড়ীতে বাসায় পৌঁছে দিতে বললাম। তার স্বর আগ্রহান্বিত নয় ব'লে বাসেই বাসায় ফিরলাম।

মঙ্গলবার। সত্য আগরওয়ালের পরিচিত বান্ধবী মিস লেভি (Levy) আজ তার গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। তরুণী লজ্জাশীলা, অপরিচিত আমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ করলেন না। সুরজিতের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি যেদিন গিয়েছিলেন সেই দিনই কলমটা ভুল ক'রে নিয়ে এসেছিলেন।

সে কথাটি যদি আমাকে ফোনে বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিতেন, আমাকে হয়রানি ভোগ করতে হ'ত না। কিন্তু এই প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধির অভাবই আমাদের জাতির স্বভাব, আমরা বুদ্ধিশীল, কিন্তু সে প্রজ্ঞা আমাদের প্রগতির পন্থা হয়ে উঠছে না—আমাদের চারিত্রিক দৌর্বল্যের জন্য, আমাদের নৈপুণ্যের অভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে, কিন্তু আজ মঙ্গলবার সেটা বন্ধ থাকায় দেখা হ'ল না। তারপর এদের নৃতত্ত্ব-মিউজিয়ামে গেলাম। ডক্টর গিলোর্ড কানে কম শোনেন, কিন্তু এমনই খুব সুন্দর মানুষ—সব তন্ন তন্ন ক'রে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর ডেভিড মেণ্ডেল বামের (Mendel Balm) সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করলাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভোজনাগারে। মেণ্ডেল বাম আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারলেন না ব'লে দুঃখ জানালেন।

লাঞ্চের পর মিসেস সাদি এলেন, গাড়ী ক'রে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ওদের বাড়ী East Bay Areaতে—এটি জনবিরল, এদের রাস্তাগুলি ছায়াশ্যাম, সাদির বাড়ীটি চমৎকার একটি উচ্চ টিলার উপর, সামনে সমুদ্র গর্জন করছে—ফুলের কেয়ারি ভরা—খুবই ভাল লাগলো। মিসেস সাদি এক বাক্স কেক উপহার দিলেন। এই ভারতীয়া নারীর স্নেহমধুর আত্মীয়তা জীবনের এক পরম সঞ্চয় হয়ে রইল।

ফিরে এসে ডক্টর রায়ের নিকট লেখা হুমায়ুন কবীরের চিঠি পেলাম, কি করতে পারে দেখবে—এই তার সারমর্ম। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল কিছু করবে না, কিছু করে-নি। প্রতিবাদ করা ব্যর্থ, তবু প্রতিবাদ জানিয়ে রাখি।

দেওয়ান চমনলালের 'Hindu America' হিন্দু আমেরিকা বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন দক্ষিণ আমেরিকার ভারত-উপনিবেশের সন্ধান। মায়া (Maya) এবং আজটেক (Ajtec) সভ্যতার এবং পেরু বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায়।

বোম্যান (Bowman) রাত সাড়ে আটটায় এলেন। ডক্টর চৌধুরীর সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শুনে বোম্যান দুঃখ প্রকাশ করলেন। বোম্যানকে একখানি ভারতীয় সাবান দিলাম। ডক্টর চৌধুরীকে একখানি তোয়ালে ও দুখানি সাবান দিলাম। যাত্রাপথে ভারবহন করা আমার রুচিমাফিক নয়। তাই যতটা লঘু হয়, তারই চেষ্টা। গল্পগুজব ক'রে ওঁরা বিদায় নিলেন রাত ৯·৪০ মিনিটে।

বুধবার। মিসেস এডওয়ার্ডস্ এবং মিসেস এগান সকালে মোটর নিয়ে এলেন—মা ও মেয়ে—স্বামিপরিত্যক্তা মেয়েকে বুড়ী এডওয়ার্ডস্ সান্ত্বনা দেয়—ওরা আমার Public Lecture (বক্তৃতা) শুনে খুব খুশী হয়েছিল। তাই আমার কাছে নিতে এসেছে অমৃত-প্রলেপ—যদি

শোকাতুরা কন্থার অন্তরে জাগাতে পারি আলো—এই তাদের মনের গোপন কথা।

ওরা বেড়াতে নিয়ে চ'লল, প্রথমে Golden Gate Parkএ গেলাম। এই বিরাট রম্যোদ্যান সানফ্রান্সিস্কোর এক অত্যুজ্জ্বল গৌরব। এর মধ্যে মানুষের শিল্পচেষ্টার যে পরিচয়, তার সম্যক্ বর্ণনা অসম্ভব। আমরা এর পর Summer House দেখতে নামলাম; কাচের ঘরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা রঙের ও নানা আকৃতির ফুল, এখানে একটি ভারতীয় মাধবীলতা দেখে খুশী হলাম। সেখান থেকে Seal's Rock দেখতে গেলাম—কূলের নিকট ছোট একটা জলমগ্ন পাহাড়—সেখানে সিন্ধু-ঘোটকেরা মাতামাতি করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দেখা মিলল না, তারা চলে গেছে দূর-দূরান্তরে। Sea-Cliff Restaurant নামক রেস্তোরাঁর ওখানে রয়েছে দুটি রম্য মূর্তি—জাপানী Kounan (কাউনান দেবী)। অন্ধ-বিশ্বাস—তাদের সামনে পয়সা ফেলে যে-প্রার্থনা করা যায়, তা নাকি সফল হয়। দু-পেনি ফেলে আমেরিকায় আমার পর্যটন-সাফল্য প্রার্থনা করলাম। রাত্রে পেলাম নেব্রাস্কার নিমন্ত্রণ। হয়তো কাকতালীয়—তবু যোগাযোগ আছে ব'লে মনে হ'ল। ওখান থেকে গেলাম Merced Lake দেখতে—সেখান থেকে West Lake District হয়ে Sunny Cliff Lake Area নামক স্থানে—এখান থেকে শহরে জল সরবরাহ হয়—ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় গিয়ে Early Lunch খেলাম—ওরাই খাওয়াল—তারপর Twin Peaks ঘুরে ওরা আমায় ব্যাঙ্কে নামিয়ে দিয়ে গেল।

বিকালে ৭-৩০ মিনিটে মা ও মেয়ে আবার এলেন। আমরা Metaphysical হলে বক্তৃতা দিতে চললাম। ওরা খুব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল:

ডক্টর দাশ বিশ্ব-পর্যটক—তিনি যোগ-শাস্ত্রের ইতিহাস বলবেন। ৭৫ সেণ্ট দক্ষিণা। আসুন, শুনুন—যোগ আধ্যাত্মিক, মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক অভ্যুদয় আনতে পারে। যোগ বিধাতার সাথে মিলনের বস্তু—ডক্টর দাশ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত—তিনি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন—এই অপূর্ব সুযোগ হারাবেন না। কর্মযোগ দেহে শক্তি ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন করে। রাজযোগ মানসিক অভ্যুদয়ের পন্থা দেখাবে—অবসাদ দূর হবে—আসুন যোগ দিন।

৮টা ১০ মিনিটে বক্তৃতা শুরু হ'ল, ৯-৪০ মিনিটে শেষ হ'ল। শ্রোতা বেশী নয়—জন কুড়ি পঁচিশ—কিন্তু তারা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে শুনল।

বুড়ী খুব সহৃদয়া, যখন শুনল আমায় মাত্র সাড়ে দশ ডলার দিয়েছে, তখন ওদের খুব ব'কল। বাসায় এসে ডক্টর প্যাটার্সনের চিঠি পেলাম। তিনি নেব্রাস্কার দর্শনের অধ্যাপক।

বৃহস্পতিবার, আজ সানফ্রান্সিস্কোয় শেষ দিন। কোথাও গেলাম না, সব জিনিস ঠিক ঠাক ক'রে নিতে হবে—সেই ভাবনায় অধীর হলাম। একজন ধর্মযাজকের উপদেশ পড়েছি: ভগবানের হাতে অনন্ত সময়, তাই তার কোনই তাড়া নেই, সব কাজই তার নিয়মের ছন্দে গাঁথা, তেমন ক'রে নিজেকে চালাও—ব্যস্ততা, তাড়াহুড়া, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুলতা শুধু ক্ষয় ও অপচয়। কিন্তু সে উপদেশ পালন করতে পারি না।

জুলি ড্যানিশ কুড়ি ডলারের বই নিয়েছিল। সে টাকাটা আর দিল না, তাকে ফোন ক'রে ধরতে পারলাম না, তার ভাবগতিক সে দেবে

না; তাকে চিঠি লিখেও টাকাটা আদায় হয়নি। সব দেশেই সব রকমের মানুষ আছে, জুলি ড্যানিস আছে, আবার মেরি ওয়াও আছে। তাই নালিশ করি না, এই বিচিত্রতাকে দেখবার জন্যই জীবন-দেবতা পাঠিয়েছেন।

এলেন ওয়াট্‌স্‌কে বললাম, 'কাল যাচ্ছি'।

ডক্টর সিন—চীনা অধ্যাপকটি বললেন যে তিনি সঙ্গিহীন হবেন—তার দরদ-ভরা কথায় হৃদয় ভরে উঠল।

সানফ্রানিস্কো—সুন্দর ও মনোহর। পাহাড়ের, সেতুর, ফুলের শোভায় শোভাময় স্বপ্ন-জাগা শহর। এর একটি বর্ণনার কথা মনে পড়ছে—A fabulous city of hills, bridges, cable cars, flowers and beautifully dressed women. Its romantic and vigorous history has left its impression in a reflected aura of story-book mystery, a magical quality. though elusive, can be distinctly felt both by the visitor and the resident.

কল্পনার নগর—পর্বত, সেতু, বৈদ্যুতিক তারের যান, পুষ্প এবং সুসজ্জিতা সুন্দরী ললনাগণের নগর। নাগরিক হোক, কিংবা ভ্রমণকারী হোক—এর অতীতের রোমাঞ্চকর ইতিহাস এই নগরের নামের সাথে জড়িয়ে রেখেছে এক কল্পনার যাদু, অবিস্মরণীয় স্পর্শ।

বিলাসিনী নগরীর সেই বিভ্রম-কুহক—সেই আধ-চেনা আধ-অচেনা রাজ্যের চমক আমি ধরতে পারিনি, তবু ব'লে যাব—তোমায় ভাল লেগেছিল, ভাল লেগেছিল তোমার আলোভরা বুক—তোমার সমুদ্রস্নাতা চারুতা আর বিচিত্র নিসর্গ-লীলা।

অকৃতজ্ঞ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

অকৃতজ্ঞ তাই
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

রূপ, রস, গন্ধে, নব নব ছন্দে
ভরিয়া রেখেছ সব ঠাঁই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

সদা রহ কাছে কাছে
বিপথে না যাই পাছে
তবুও ভুলিয়া কভু ডাকি নাই, ডাকি নাই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

অঞ্জলি ভরিয়া দান দিয়েছ সুমহান্
পেয়েও ভুলেছি তবু, বলিয়াছি পাই নাই।
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

মরণ-দুয়ার হ'তে তুমি নিলে কোল পেতে
বুঝিয়াও বুঝি নাই—
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

জীবন সায়াহ্নে আজ বুঝিয়াছি মহারাজ
তুমি ছাড়া কেহ নাই—
অকৃতজ্ঞ তাই
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই।

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ ছিলেন প্রাগ্‌মধ্যযুগীয় ভারতে সুপ্রাচীন যোগধর্মের একজন অনন্যসাধারণ প্রভাবশালী প্রচারক। তিনি ভারতের সকল প্রদেশে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে যোগের ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত যোগিসম্প্রদায় নাথ-যোগী, সিদ্ধযোগী, অবধূতযোগী, দর্শনীযোগী, কানফাটা যোগী ইত্যাদি নামে ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে গোরক্ষনাথের নামে মঠ মন্দির আখড়া প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান নাই। তিনি যে যোগের আদর্শ লইয়া সমগ্র দেশে একটা বিরাট্ ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মহাযোগীশ্বরেশ্বর শিবকে তিনি শুধু ব্রহ্মস্বরূপে বা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিধাতা পরমেশ্বররূপে নয়, তৎসঙ্গে সকল জ্ঞানী যোগী ভক্তদের আদিগুরু এবং চিরন্তন জীবনাদর্শ-রূপে সর্বসাধারণের সমীপে সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। শিবকেই 'আদিনাথ'-নামে তৎপ্রচারিত যোগধর্মের আদিপ্রবর্তক-রূপে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ আদিনাথ শিবের নিকট হইতেই মহাজ্ঞান ও মহাযোগের দীক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোরক্ষনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবাবতার বলিয়া সর্বত্র যোগী- ও ভক্ত সমাজে পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং পার্থিব দেহেই তিনি কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া অমর হইয়া এখনও বিদ্যমান আছেন ও লোকচক্ষুর অগোচরে জীবকল্যাণ করিতেছেন, ইহা যোগিগণ বিশ্বাস করেন। তিনি কোন্ শতাব্দীতে কোন্ প্রদেশে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণ এখনও নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

আমরা সাধারণতঃ 'দার্শনিক' বা 'দর্শনাচার্য' বলিতে যাহা বুঝি, সেই অর্থে মহাযোগী গোরক্ষনাথ 'দার্শনিক' বা 'দর্শনাচার্য' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহারা বিশেষ কোন একটি তাত্ত্বিক মতবাদ পোষণ ও প্রচার করেন, যুক্তি-তর্ক-বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন করেন ও তৎসম্পর্কে সম্ভাবিত সর্বপ্রকার আপত্তি-নিরসনের প্রচেষ্টা করেন, এবং যুক্তিতর্কের প্রখর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সেই সব মনীষিবৃন্দই 'দার্শনিক পণ্ডিত' বা 'দর্শনাচার্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কপিল, বাদরায়ণ, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ এইরূপ মহান্ দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু এই অর্থে নারদ, শুকদেব, গোরক্ষনাথ, কবীর, নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন ধর্মোপদেষ্টা ও সম্প্রদায়প্রবর্তক হইলেও তাঁহাদিগকে 'দার্শনিক' আখ্যা দেওয়া হয়তো অনেকের মতে সমীচীন হইবে না। এই সব মহাপুরুষদের কোন প্রকার দার্শনিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, অথচ ইঁহারা সকলেই সাধনোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বোপদেশও দিয়াছেন। সাধ্যের নির্ণয় ব্যতীত সাধনার সুনিরূপণ সম্ভব নয়। সাধ্যের নির্ণয় তত্ত্বজ্ঞানের

উপরই নির্ভর করে। এই সব মহাপুরুষ আপনাদের আন্তর অনুভূতির দিব্য আলোকে তত্ত্বের উপদেশ দেন এবং সাধনার পথ নির্দেশ করেন, তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না।

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে সবই সেই মহাযোগীর নিজের রচিত কি না, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। অনেক গ্রন্থ তাঁহার উপদেশকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার পরবর্তী ভক্ত ও যোগীদের দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সব গ্রন্থে প্রায়শঃ যোগসাধনারই উপদেশ, তত্ত্বোপদেশ তাহার অঙ্গীভূত। ঠিক ঠিক দার্শনিক গ্রন্থ খুবই অল্প। 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ' নামে একখানা গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মুখ্যতঃ দার্শনিক অর্থাৎ তত্ত্বনিরূপক গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থেও যুক্তি-তর্কের অবতারণা এবং স্বমতস্থাপন ও পরমতখণ্ডনের দার্শনিক প্রচেষ্টা নাই। হিন্দী ভাষাতেও গোরক্ষনাথের নামে অনেক গ্রন্থ আছে, এবং তাহাই হিন্দীভাষার আদিম সাহিত্য। তন্মধ্যে যে-সব গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে-সব একসঙ্গে 'গোরক্ষবাণী' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় গোরক্ষনাথের স্বরচিত কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যও নাথসাহিত্য,—গোরক্ষনাথ, তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্তীদের চরিতাবলী ও উপদেশাবলী অবলম্বনেই রচিত। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও প্রাচীন সাহিত্যের উপর গোরক্ষনাথ ও তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় গোরক্ষনাথ-সম্প্রদায়ের একটা বিরাট্ সাহিত্য বিদ্যমান থাকিলেও 'দার্শনিক গ্রন্থ' বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সে-জাতীয় গ্রন্থের খুবই অভাব দেখা যায়।

ইহাতে মনে হয়, ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ দার্শনিক তর্কযুক্তির জাল-বিস্তার পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে অবশ্য দার্শনিক কূটতর্কের জাল বুদ্ধের পরবর্তী কালে বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং সেই হেতু তাঁহার সম্প্রদায় বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্তও হইয়াছিল। কিন্তু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে পর-বর্তী কালেও এই জাল তেমন প্রসার লাভ করে নাই। পরবর্তী যুগেও তাঁহার সম্প্রদায়ে অনেক মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী ও যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন সিদ্ধযোগীর আবির্ভাব হইলেও মহান্ দার্শনিক পণ্ডিত বা আচার্যের আবির্ভাব প্রায় দেখা যায় না।

গোরক্ষনাথের সময়ও সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কলহ তীব্রভাবেই ছিল। তিনি ও তাঁহার অনুবর্তী অবধূত যোগিগণ বলিতেন :

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্ ॥
যদি সর্বগতো দেবঃ স্থিরঃ পূর্ণো নিরন্তরঃ।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥

(অবধূতগীতা)

কেহ কেহ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী এবং অপর কেহ কেহ দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী। (এইরূপ বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত হইয়া দার্শনিক বিচারকগণ প্রায়শঃ বাদবিসংবাদে প্রমত্ত হন এবং ফলে তত্ত্বতঃ সমদর্শিত্ব লাভ না করিয়া প্রায়ই বিভিন্ন মতবাদ হেতু বৈষম্যদর্শীই থাকিয়া যান)। তাঁহারা কেহই সম-তত্ত্বকে বিদিত হন না, সম-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেন না। জীবজগতের মূলীভূত যে পরম তত্ত্ব, সেটি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ সম-তত্ত্ব। (দ্বৈতনিষেধ-পূর্বক অদ্বৈতের প্রতিপাদন দ্বারা সেই সমতত্ত্বের

নিরূপণ হয় না, আবার অদ্বৈতনিষেধপূর্বক দ্বৈতপ্রতিপাদন দ্বারাও সেই চরম ও পরম তত্ত্বের নিরূপণ হয় না)। যদি উপলব্ধি হয় যে, এক স্বপ্রকাশ পরম দেবতা নিত্যপূর্ণ নিত্যস্থির ও সর্ববিধ ভেদরহিত এবং তিনি সর্বগত, বিচিত্র নামরূপে লীলায়মান, তবে দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা নিতান্তই নিরর্থক। এরূপ বিকল্পনাই মায়া, ইহাই মহামোহের নিদর্শন।

এই দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সম-তত্ত্ব সম্বন্ধে গোরক্ষনাথ বলেন :

ভাবাভাববিনির্মুক্তং নাশোৎপত্তি-বিবর্জিতম্।
সর্বসংকল্পনাতীতং পরব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥
হেতুদৃষ্টান্তনির্মুক্তং মনোবুদ্ধ্যাদ্যগোচরম্।
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্ত্বং তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

সেই পরম ও চরম সম-তত্ত্বকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের উপলব্ধি যে-সব মহাযোগীর হয়, তাঁহারা অনুভব করেন যে, এই পরম তত্ত্ব ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব হইতেও বিনির্মুক্ত, ('অস্তি-নাস্তির বহির্ভূত'), নাশ- ও উৎপত্তি- (এবং সর্ববিধ বিকার) -বিরহিত, এবং সকল প্রকার কল্পনা বিকল্প ও বিতর্কের অতীত। তিনি 'এইরূপ' বা 'এইরূপ নহেন', কোন প্রকার হেতু বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়; (তাঁহার সম্বন্ধে কোন 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হওয়া সম্ভব নয়, তাঁহার নির্ধারণের জন্য কোন সমীচীন অন্বয়ী বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তও আমাদের অভিজ্ঞতার রাজ্যে মিলে না, কারণ তাঁহার সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় কোন কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না)। তিনি মন বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর; (যেহেতু দ্বন্দ্বের রাজ্যেই মন-বুদ্ধ্যাদির বিহার ও বিলাস। যে-তত্ত্বে সব দ্বন্দ্বের, সব ভেদের, সব 'হাঁ' ও 'না' এর সম্যক্ পর্যবসান, যে-তত্ত্বে কোন বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই, সেই তত্ত্বকে মন ও বুদ্ধি কল্পনা বা বিচারের বিষয় করিবে কিরূপে?); কিন্তু সমাধিতে সেই তত্ত্বের উপলব্ধি হয় নির্মল নিশ্চল নিরবচ্ছিন্ন আকাশবৎ স্বয়ং-সৎরূপে, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ি-ভেদ-বর্জিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-ভেদ-বর্জিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে এবং আনন্দ অর্থাৎ স্বয়ং-পূর্ণতার আস্বাদনরূপে। চরম সমাধিতে যে চরম তত্ত্বের অনুভব হয়, তাহা মনের প্রত্যক্ষ বা কল্পনার বিষয়ও নয়, বুদ্ধির নৈয়ায়িক যুক্তি-বিচার-অনুমানাদির বিষয়ও নয়, কোন প্রকার ভাষায় ব্যক্ত করিবার বিষয়ও নয়, অথচ তাহাই পরম সত্য; তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই তত্ত্ব বলিয়া জানেন। চরম সমাধিতে চরম সত্যের চরম অনুভূতিতে মন ও বুদ্ধি সেই সত্যের স্বরূপেই বিলীন হইয়া সত্যানুভূতি লাভ করে, সত্যকে বিষয় করিয়া অনুভূতি লাভ করে না। সুতরাং সেই অনুভূতির স্বরূপ কি প্রকার, ভেদরাজ্যবিহারী বিষয়-বিলাসী মন বুদ্ধি তাহা ধারণাও করিতে পারে না। অথচ সেই 'নিরুত্থান' অবস্থা হইতে 'ব্যুত্থান' অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মন-বুদ্ধির সুদৃঢ় ধারণা থাকিয়া যায় যে, সেই বিলীন অবস্থা বা একীভূত অবস্থাতে যে সমতত্ত্বে, যে অনির্বচনীয় ব্যোম-বিজ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ হইয়াছিল, তাহাই বস্তুতঃ পরম সত্য, পরম তত্ত্ব।

এই ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ মনোবুদ্ধ্যগোচর পরম তত্ত্বকে যোগি-গুরু গোরক্ষনাথ নির্বিকল্প সমাধিতে বিষয়বিষয়ি-ভেদ-রহিত অপরোক্ষ জ্ঞানে অনুভব করিয়া 'অনামা' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন :

যথা নাস্তি স্বয়ং কর্তা কারণং ন কুলাকুলম্।
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনামা বিদ্যতে তদা ॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

যখন স্বয়ং (অহংবোধ) নাই, কর্তা (কর্তৃত্ববোধ) নাই, কারণ (কার্য-কারণ ভাব) নাই, কুল ও অকুলের ভেদ নাই, পরমব্রহ্ম যখন সর্বতোভাবে অব্যক্ত, (কোন প্রকার উপাধির ভিতরে তাঁর অভিব্যক্তি নাই), তখন 'অনামা' বিদ্যমান থাকেন। (অর্থাৎ তখন যাহা থাকে, তার কোন নাম নাই, যেহেতু বিনা উপাধিতে কোন নাম হয় না, নাম উপাধিরই নামান্তর)। এই অনামাই 'স্বয়মনাদিসিদ্ধম্ একমেব অনাদিনিধনম্'। (সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)। ইহাই সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। সর্বোচ্চ স্তরের সমাধিতে এই স্বপ্রকাশ নিত্যসত্য তত্ত্বাতীত তত্ত্বেরই অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে।

উপদেশকালে উপদেশ-প্রদানের প্রয়োজনে যোগিগুরু এই অবাঙ্-মনসোগোচর অপরোক্ষানুভবসিদ্ধ তত্ত্বাতীত তত্ত্বকে বিভিন্ন নামে উপদেশ করিয়াছেন,—যথা ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, শিব, পরশিব, আত্মা, পরমাত্মা, সম্বিৎ, পরাসম্বিৎ, পদ, পরমপদ, নিরঞ্জন, শূন্য, পরমশূন্য, শূন্যাশূন্যবিলক্ষণ, পরমাকাশ, চিদাকাশ, সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি সার্থক নামই সেই নিরুপাধিক তত্ত্বকে কোন না কোন প্রকারে সোপাধিক-রূপে মন-বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত করে। অথচ নাম ব্যতীত তাহার ধারণাই সম্ভব হয় না, উপদেশই অসম্ভব হয়। নাম অবলম্বনেই নামাতীতকে চিন্তা করিতে হইবে, উপাধি অবলম্বনেই নিরুপাধিককে ধারণাগোচর করিতে হইবে, এবং চরম অনুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

উপাসনার দৃষ্টিতে গোরক্ষনাথ শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি শৈবধর্মের একজন অনন্য-সাধারণ প্রচারক। ভারতের সর্বত্র গ্রামে, নগরে, শ্মশানে, বনে, পর্বতশিখরে, অসংখ্য শিবলিঙ্গ তিনি ও তাঁহার অনুবর্তিগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শিবকে তিনি হিমালয়ের চূড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া ঘরে ঘরে জনগণের প্রাণের দেবতারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শিবকে তিনি একদিকে নামরূপাতীত চরম তত্ত্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহাকে নিত্য সিদ্ধ ক্লেশকর্মবিপাকাদি-রহিত মহাযোগীশ্বরেশ্বর-রূপে প্রচার করিয়াছেন, আবার তাঁহাকে অশেষ করুণানিধান সর্বলোকগুরু বাঞ্ছাকল্পতরু বর্ণাশ্রমভেদনিরপেক্ষ সর্বজীবপ্রেমী আশুতোষ-রূপে সকল নরনারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিব যেমন যোগী জ্ঞানী ত্যাগী তপস্বীদের পরমারাধ্য, তেমনি অসুর রাক্ষস চণ্ডাল ব্যাধ কিরাত প্রভৃতি সকল জাতির সকল শ্রেণীর নরনারীর পরম উপাস্য। তাঁহার পূজায় অধিকারভেদ নাই, পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই, পূজোপকরণের বাহুল্য নাই, সকলেই প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্যে বিনামন্ত্রে বিনা-আড়ম্বরে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অর্চনা করিতে পারে। তিনি সগুণ নির্গুণের ঐক্যভূমি, সোপাধিক ও নিরুপাধিকের ঐক্যভূমি, সর্বাতীত ও সর্বময় এবং সকলের আপন জন। তিনি অবধূত যোগীদের পরম আদর্শ, এবং সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বেদাচার-বহির্ভূত অবজ্ঞাত উপেক্ষিত নরনারীদের মধ্যেও তাঁর অবাধ গতি। যোগীগুরু গোরক্ষনাথ যোগীর ঈশ্বরকে মনুষ্যসমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত নামাইয়া আনিয়াছেন। ইহা তাঁহার সর্ব-ভূতানুকম্পী যোগি-হৃদয়ের অন্যতম নিদর্শন।

অথচ তাঁহার উপদেশে তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন। শুদ্ধ শৈব কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি :

শুদ্ধং শান্তং নিরাকারং পরানন্দং সদোদিতম্।
তং শিবং যো বিজানাতি শুদ্ধশৈবো ভবেৎ তু সঃ॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

শুদ্ধ (মলবিক্ষেপাবরণরহিত) শান্ত (সদাত্মসমাহিত) নিরাকার (রূপোপাধিবর্জিত) পরমানন্দঘন নিত্যস্বপ্রকাশ শিবকে যিনি পরিজ্ঞাত হন ও আরাধনা করেন, তিনিই শুদ্ধ শৈব হইয়া থাকেন।

গোরক্ষানুবর্তী স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'তে 'শাম্ভবী মুদ্রা' প্রসঙ্গে শিবতত্ত্ব বা শম্ভুতত্ত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন :

শূন্যাশূন্যবিলক্ষণং স্ফুরতি তৎ তত্ত্বং পরং শাম্ভবম্।

—শ্রীগুরুপ্রসাদে শাম্ভবী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ হইলে 'শূন্যাশূন্যবিলক্ষণ' পরম শম্ভুতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব অন্তরে স্ফুরিত হইয়া থাকে।

ইহার ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেন :

ভবেৎ চিত্তালয়ানন্দঃ শূন্যে চিৎসুখরূপিণি।

—চিৎসুখরূপ 'শূন্যে' চিত্তলয়ের পরমানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোরক্ষনাথ সত্যের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন :

সত্যমেকমজং নিত্যমনন্তং চাক্ষয়ং ধ্রুবম্।
জ্ঞাত্বা যস্তু বদেদ্ ধীরঃ সত্যবাদী স উচ্যতে॥
(বিবেকমার্তণ্ডঃ)

—সত্য এক অজ (উৎপত্তিরহিত), নিত্য (বিনাশরহিত), অনন্ত (সীমারহিত) অক্ষয় (বিকাররহিত) ও ধ্রুব (সংশয়াতীত বাস্তব তত্ত্ব)। এই সত্য জানিয়া যে ধীর ব্যক্তি শুধু এই বিশুদ্ধ সত্যের কথাই বলেন, তিনিই বস্তুতঃ সত্যবাদী।

গোরক্ষনাথ নানাভাবে এই পরম সত্যের কথাই শান্তিপিপাসুদিগকে বলিতেন এবং এই সত্যের দিকেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। জীবনকে পরমসত্যময় করাই পরম পুরুষার্থ, এবং তদুদ্দেশ্যেই তিনি সকলের নিকট যোগের উপদেশ করিতেন। যোগকে তিনি সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, উভয় রূপেই নির্দেশ করিতেন। তিনি যোগের লক্ষণ বলিয়াছেন, 'সংযোগ যোগ ইত্যাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ' (বিবেকমার্তণ্ডঃ)—ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ ব্যষ্টি-আত্মা) এবং পরমাত্মার (অর্থাৎ বিশ্বাত্মার) সংযোগ (অর্থাৎ অভেদানুভব) যোগ নামে আখ্যাত হয়। যোগীদের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে 'আদেশ, আদেশ' বলিয়া অভিবাদন করেন; এই রীতি সম্ভবতঃ গোরক্ষনাথই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আদেশের তাৎপর্য তিনি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।
ত্রয়াণামৈক্যসম্ভূতিরাদেশঃ পরিকীর্তিতঃ॥
আদেশ ইতি সদ্বাণীং সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়াবহাম্।
যোগিনং প্রতিবদেত স বেত্ত্যাত্মানমীশ্বরম্॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

—আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা,—উপাধি-বিচারে এক আত্মা বা ব্রহ্ম বা শিবেরই এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই তিনের যে সম্যক্ ঐক্যানুভূতি, তাহাই 'আদেশ' শব্দের তাৎপর্য। 'আদেশ'—এই সদ্বাণী সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতভাবের ক্ষয়কে নির্দেশ করে। এই তাৎপর্য হৃদয়ে রাখিয়া প্রত্যেক যোগী অপর প্রত্যেক যোগীর প্রতি এই বাণী প্রয়োগ করিবেন। তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা বা ঈশ্বরের অনুভূতি উদ্দীপিত হয়।

একই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা শিব বা ঈশ্বরই সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী আত্মারূপে পরমাত্মা, ব্যষ্টিপিণ্ডের অভিমানী আত্মারূপে জীবাত্মা, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি সকলের অবভাসকরূপে আত্মা বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথ বিশ্বপ্রপঞ্চকে শিব বা ব্রহ্মের 'মহাসাকারপিণ্ড' বা 'সমষ্টিপিণ্ড' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং জীবদেহকে 'ক্ষুদ্র-সাকারপিণ্ড' বা 'ব্যষ্টিপিণ্ড' বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। সব দেহে এক শিব বা ব্রহ্মই দেহী, তিনিই সব দেহে বিরাজমান।

অলুপ্তশক্তিমান্ নিত্যং সর্বাকারতয়া স্ফুরন্।
পুনঃ স্বেনৈব রূপেণ এক এবাবশিষ্যতে ॥

(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

—অলুপ্তশক্তিমান্ শিব বা ব্রহ্ম দেশে কালে নিত্যই বিচিত্র দেহ পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র আকারে স্ফুরিত হইতেছেন, আবার দেশ-কালাতীত স্ব-স্বরূপে তিনি নিত্যই এক অবিক্রিয় চৈতন্যানন্দসত্তায় বিরাজমান। তিনি নিত্যই একস্বরূপ, নিত্যই বহুরূপ, নিত্যই দেশকালাতীত, নিত্যই দেশকালে বিলসমান, নিত্যই নিষ্ক্রিয় নির্বিকার, নিত্যই অনন্তক্রিয় অনন্তবিকারাধার, নিত্যই আত্মসমাহিত, নিত্যই সংসারবিলাসী।

'একাকারোঽনন্তশক্তিমান্ নিজানন্দতয়া অবস্থিতোঽপি নানাকারত্বেন বিলসন্ স্বপ্রতিষ্ঠাং স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ।' (সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতিঃ)

বিভিন্ন জীবদেহে তিনিই বিচিত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া বিচিত্রভাবে আপনার অনন্তত্বকে অসংখ্য স্তরবিভক্ত অগণিত সান্তরূপে আস্বাদন করিতেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁর চিদানন্দের বিলাস, প্রত্যেক জীবদেহেও তাঁর চিদানন্দের বিলাস।

উপনিষদ্ ও বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্মবাদের সহিত যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ শিববাদের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বা শিব-তত্ত্বই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। এই পরমতত্ত্ব সমাধিস্থ প্রজ্ঞার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের চরম ও পরম সত্যত্ব স্বীকার করিবার নিমিত্ত জীব-জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদন তিনি আবশ্যক মনে করেন না। সুপ্রাচীন সিদ্ধযোগি-সম্প্রদায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপানে নিমগ্ন থাকিয়াও বিশ্বপ্রপঞ্চকে কখন মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। পতঞ্জলির 'যোগদর্শন' দার্শনিক বিচারে সাংখ্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও সাধনমার্গের উপদেশে তিনি প্রাচীন সিদ্ধ-যোগীদের পন্থাই অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ কপিল বা পতঞ্জলির তত্ত্ববিচার গ্রহণ করেন নাই, যদিও তিনি তাঁহাদেরই সাধনপন্থার অনুবর্তী। তত্ত্ববিচারে তিনি উপনিষদের ঋষিদের সহিত একমত এবং ইহাই প্রাচীনতম আগমশাস্ত্রের মত। তিনি বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা শিবকে বিশ্বজগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে এই কারণত্ব শুধু প্রাতীতিক বা আধ্যাসিক নহে, ইহা তাত্ত্বিক বা বাস্তব। ব্রহ্ম মিথ্যা-জগতের মিথ্যা-কারণ নহে, দেশকালপ্রসারিত সুনিয়ত পরিণামশীল অনাদি অনন্ত সত্য জগৎপ্রবাহের সত্য কারণ। ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয় না। এই জগৎকে তিনি 'চিদ্ বিবর্ত' না বলিয়া 'চিদ্-বিলাস' রূপে বর্ণন করেন। এ বিষয়ে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত তিনি একমত।

ব্রহ্ম বা শিব নিত্য দেশকালাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকিয়াও আপনার স্বরূপভূতা পরমাশক্তি দ্বারা আপনাকে অনাদি অনন্তকাল অনন্ত-বৈচিত্র্যসমাকুল জীবজগদ্রূপে লীলায়মান করিতেছেন। উভয় রূপই সত্য। সমাধিতে তাঁহার দেশকালাতীত দ্বৈতবিহীন চৈতন্য-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং সমাধিজ-প্রজ্ঞালোকিত বিশুদ্ধ জাগ্রদ্‌বুদ্ধির সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র দ্বন্দ্বময় পরিণামশীল বিলাসরূপের পরিচয়

হয়। তিনি স্বরূপতঃ এক থাকিয়াও শক্তি-প্রকাশে বহু, স্বরূপতঃ নির্বিকার থাকিয়াও স্বকীয় শক্তিপ্রসূত বহুবিধ বিকারের আধার ও আশ্রয়। এই বিশ্বজগৎ তাঁহারই লীলাবিলাসরূপ।

ব্রহ্ম বা শিবের আত্মভূতা এই মহাশক্তিকে গোরক্ষনাথ মিথ্যা বা অনির্বচনীয়া মায়া আখ্যা না দিয়া সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি মহামায়া যোগমায়া প্রভৃতি রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের সহিত বর্ণন করেন। ব্রহ্মের স্বরূপভূতা মহাশক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত; এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিরই দেশকালব্যাপী অনন্তবৈচিত্র্যোজ্জ্বল প্রকট মূর্তি। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা শিবের সহিত তাঁহার শক্তির কোন পার্থক্য নাই। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। বিশ্বাতীত স্বরূপে তিনি শিব বা ব্রহ্ম, বিশ্বে লীলায়মানরূপে তিনিই শক্তি। গোরক্ষনাথ বলেন:

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

শিবের অভ্যন্তরে শক্তি, শক্তির অভ্যন্তরে শিব; শিব ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি করিবে না। যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় কোন ভেদ নাই, তেমনি শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। তিনি আরও বলেন, 'সৈব শক্তির্যদা সহজেন স্বস্মিন্ উন্মীলিন্যাং নিরুত্থানদশায়াং বর্ততে, তদা শিবঃ স এব ভবতি।' যে শক্তি বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব ধারণ ও বিলয়কারিণী, যিনি 'নিজাশক্তি' 'আধারশক্তি' 'পরাশক্তি' ইত্যাদি নামে কথিত হন, সেই শক্তিই যখন সহজভাবে আপনার মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া নিরুত্থানদশায় স্ব-স্বরূপে বিরাজমান হন, তখন তিনি 'শিব' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

গোরক্ষনাথের দর্শনে পরমতত্ত্বের আত্মভূতা পরমা শক্তির নিত্যই দ্বিবিধ রূপে অভিব্যক্তি। এই দুই রূপকে তিনি 'প্রকাশ' ও 'বিমর্শ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকাশ-শক্তির অভিব্যক্তিতে পরমতত্ত্ব নিত্যই বিশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপে প্রকাশমান থাকেন, বিমর্শ-শক্তির অভিব্যক্তিতে সেই পরম তত্ত্বই আপনার অদ্বয় চিদানন্দস্বরূপ আবৃত করিয়া আপনাকে আপনি বিচিত্র নামে বিচিত্র রূপে বিচিত্র উপাধিতে অলংকৃত করিয়া দেশে কালে লীলায়িত হইয়া বিচিত্র ভাবে আস্বাদন করেন। বিমর্শ-শক্তি শিব বা ব্রহ্মকে আবরণ ও বিক্ষেপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। বিমর্শ-শক্তিই ব্রহ্মের আবরণ-বিক্ষেপাত্মিকা ত্রিগুণময়ী শক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার বিমর্শ-শক্তিরই বিলাস। বিমর্শশক্তি-বিলসিত ব্রহ্ম বা শিবই বিশ্বরূপ। তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করেন। আবার প্রকাশ-শক্তি-সহায়ে তিনি নিজেকে নিত্যই বিশ্বাতীত-স্বরূপে আস্বাদন করেন। শক্তির এই উভয়রূপই ব্রহ্ম বা শিবের আত্মভূতা, স্বরূপভূতা, তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ হইতে অভিন্না। গোরক্ষনাথ ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ ও বিশ্বময় স্বরূপ উভয়ই স্বীকার করেন। আপন স্বরূপের উভয়বিধ আস্বাদন লইয়াই ব্রহ্ম বা শিব অদ্বয় পরম তত্ত্ব। ব্যাবহারিক বিশ্বাত্মক স্বরূপকে যুক্তি-জাল দ্বারা মিথ্যাপ্রতিপাদন করিয়া পারমার্থিক বিশ্বাতীত স্বরূপকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তিনি প্রচার করেন নাই।

জীবাত্মার জীবত্ব তিনি মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, পক্ষান্তরে জীবাত্মাকে তিনি স্বরূপতঃ 'বহু' বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। জীবাত্মা অণুপরিমাণ কিংবা বিভু-পরিমাণ কিংবা মধ্যম-পরিমাণ, তাহা লইয়াও তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ কিংবা ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইয়াও

ব্রহ্মের অধীন ও আশ্রিত, এ-সব তর্কও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। চৈতন্যস্বরূপে পরিমাণের কোন প্রশ্ন উঠে না, অংশ-অংশী-ভেদ এবং আশ্রয়-আশ্রিত-ভেদও ঔপাধিক। গোরক্ষনাথের উপদেশ অনুসারে, শিব বা ব্রহ্মই আপনার শক্তি-পরিমাণকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য দেহপিণ্ডে অসংখ্য জীবাত্মা-রূপে অসংখ্য স্তরের আবরণ-বিক্ষেপ-প্রকাশের ভিতর দিয়া আপনাকে ও আপনার বিশ্বরূপকে আপনি বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিতেছেন। অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে আপনি খুঁজিয়া হয়রান হওয়া, নানাপ্রকার দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণায় ছটফট করা, নানাবিধ বাসনা-কামনা দ্বারা জর্জরিত হওয়া এ-সবই তাঁহার বিমর্শ-শক্তি অবলম্বনে লীলা-বিলাস। এ-সকলের ভিতরেই তাঁহার নিজেকে নিজে আংশিক-ভাবে আস্বাদন। সকল জীবাত্মার মধ্যে সাক্ষিরূপেও তিনি নিত্য বিরাজমান। তিনিই জীবাত্মারূপে নিজেকে নিজে দেহাভিমানী ও বদ্ধ বোধ করেন, মুক্তি-পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া তিনিই নিজে নিজের পারমার্থিক স্বরূপ অন্বেষণ করেন। আবার প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তি-সাধনার ভিতর দিয়া তিনিই নিজের পারমার্থিক স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মুক্তির আস্বাদন করেন।

যে স্বতন্ত্রা জ্ঞানময়ী ইচ্ছাস্বরূপিণী মহাশক্তি বিশ্বাভিব্যক্তির অন্তরালে অদ্বয় পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা শিবের বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে লীনা হইয়া অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, সেই শিবানী মহাশক্তিই পরা অপরা সূক্ষ্মা ও কুণ্ডলিনী শক্তি-রূপে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিয়া শিবের মহা-সাকারপিণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড দেহ রচনা করেন; আবার সেই মহাশক্তিই বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র ব্যষ্টিপিণ্ড বা জীবদেহ-রূপে আপনাকে লীলায়িত করিয়া শিবকে অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ দেহধারী জীব-রূপে বিচিত্র দ্বন্দ্বময় সংসারের বিচিত্র রসের আস্বাদন করান। শিবাত্মভূতা অচিন্ত্যা মহাশক্তির অনন্ত লীলাবিলাস। আত্মবিকাশ ও আত্মসঙ্কোচ তাঁহার চিরন্তন স্বভাব। সর্ব-প্রকার বিকাশ সঙ্কোচময় লীলাবিলাসের মধ্যেই শিব তাঁহার আত্মা, তাঁহার স্বামী, তাঁহার লীলাস্বাদক। সমষ্টিজগতে ও ব্যষ্টিজগতে শিবাভিন্না শিবসেবারতা মহাশক্তির অনন্ত লীলাবিলাসে, অসংখ্য স্তরে অসংখ্য ভাবের সঙ্কোচ-বিকাশে, নিত্য স্বরূপানন্দ-সমাহিত শিবের বিচিত্র উপাধি, বিচিত্র নামরূপ, বিচিত্র ভাব ও রসের আস্বাদন।

'নিজা পরাঽপরা সূক্ষ্মা কুণ্ডলিন্যাসু পঞ্চধা।
শক্তিচক্রক্রমেণোত্থো জাতঃ পিণ্ডঃ পরঃ শিবঃ।'
(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)

যে শিবময়ী মহাশক্তি অনন্ত বৈচিত্র্য-সমন্বিত বিশ্বপ্রপঞ্চের রচয়িত্রী, নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড জননী, সেই মহাশক্তিই আপনাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সীমিত করিয়া, কুণ্ডলীকৃত রূপে প্রকটিত করিয়া, প্রত্যেক জীবদেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজ করেন। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই জীবের বিচিত্র দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমন-বুদ্ধির সংগঠনকারিণী, তিনিই সব জীবের আধ্যাত্মিক প্রেরণার আধার ও উৎস, তাঁহার অলক্ষিত প্রেরণাতেই সব জীব ক্রমশঃ আত্মোৎকর্ষের জন্য উৎসুক ও প্রযত্নশীল হয়, তাঁহারই অনুপ্রাণনাতে জীবের অন্তরে সীমার মধ্যেও অসীমের সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, জীবত্বের মধ্যেও শিবত্বের আস্বাদনের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক লালসা জন্মে। মানবদেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির এই অন্তঃপ্রেরণা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। তথাপি অধিকাংশ মনুষ্যের স্বভাবেই এই আধ্যাত্মিক

অন্তঃপ্রেরণা প্রায় প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহাদের অন্তশ্চেতনায় এই প্রেরণার ক্রিয়া হইতে থাকিলেও স্ফুটচেতনায় ইহার অনুভব হয় না। এই সব মানুষকে 'বদ্ধ জীব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিযুক্ত দেহের মূলপ্রদেশে (মূলাধারে) কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় ব্রহ্মদ্বার (সুষুম্নামার্গ) আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যমান থাকেন ; তিনি যেন একটি নিদ্রিত সর্প—কুণ্ডলী পাকাইয়া ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন, যোগিগণ এরূপ বর্ণনা করেন। অথচ তাঁহারই অন্তঃপ্রেরণায় তাঁহাকে জানাইবার জন্য মনবুদ্ধির ভিতরে ঔৎসুক্য সমুদিত হয়। গুরুনির্দিষ্ট যোগসাধন অবলম্বনে বিচারশীল বুদ্ধি প্রাণমন-ইন্দ্রিয়সমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করিয়া নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীকে (অর্থাৎ অবিকশিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে) জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হয়। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া যায়, সুষুম্নামার্গ অবলম্বনে এই প্রবুদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রার-স্থিত শিব-সুন্দরের সহিত পুনর্মিলনের জন্য ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠিতে থাকে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশে জীব ক্রমশঃ আপনার শিবত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অবশেষে তত্ত্বালোকিত সমাধিতে সচ্চিদানন্দঘন শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোরক্ষনাথ প্রভৃতি মহাযোগিগণ এই ব্যষ্টিদেহের মধ্যেই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চকে উপলব্ধি করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ বলেন, 'পিণ্ডমধ্যে চরাচরং যো জানাতি স যোগী পিণ্ডসংবিত্তি-র্ভবতি'—এই দেহ মধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চকে যিনি উপলব্ধি করেন, সেই যোগীরই দেহের সম্যক্ জ্ঞান হইয়াছে, নিজ দেহের সহিত সম্যক্ পরিচয় হইয়াছে। ব্যষ্টিপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সমরস সাধন, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-পিণ্ডের সহিত পরমানন্দ বা শিবস্বরূপের সমরস সাধন, জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বের সমরস সাধন, লীলাবিলাসিনী শক্তির সহিত দেশ-কালাতীত ব্রহ্ম বা শিবের সমরস সাধন,—এইরূপ সর্বাঙ্গীণ সমরস সাধিত হইলেই সমতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হয় এবং যোগে সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপ সমরস সাধিত হইলে এই স্থূল দেহও আর জড় পার্থিব দেহ থাকে না, এই দেহ চিন্ময় হইয়া যায়, এই দেহেই পূর্ণ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ হয়।

যে সব স্তর ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত বা অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাব হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সম্যক্ পূর্ণতম প্রবুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন এবং শিবের সহিত পূর্ণভাবে একীভূত হন, এবং জীবচেতনা শিবচেতনায় পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য সিদ্ধ যোগিগণ সেই সব স্তরকে চক্ররূপে ও পদ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দেহের মধ্যেই তাঁহারা সেই সব চক্রের ও পদ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। এই সব চক্র ভেদ করিলে বিশ্বপ্রপঞ্চেরও সমস্ত চক্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় এই দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চ মাঝখানে থাকিয়া যেন জীব ও শিবকে পৃথক্ করিয়া দুই প্রান্তে রাখিয়াছে। দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চের চিন্ময়ত্ব সাধন করিতে পারিলেই জীব ও শিবের কোন ব্যবধান থাকে না, তখন সব শক্তিবিলাসের মধ্যে অন্তরে বাহিরে জীব এই এক অদ্বিতীয় শিব বা ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করে। যুক্তিদ্বারা দ্বৈত নিরসনপূর্বক অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা নয়, সব দ্বৈতের মধ্যে এক অদ্বৈতেরই জাজ্বল্যমান সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই যোগের লক্ষ্য।

কালোর চোখে আলোই কালো

(কথিকা)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বড় নামডাক তার,
আশ্চর্য গণককার,
রাজার সভায়
বলে : "আমি হে রাজন্
যোগে সবাকার মন
জানি লহমায়।"

মন্ত্রী করে ব্যঙ্গ : "জানি—
জ্যোতিষী সবাই জ্ঞানী,
ধ্যানী, অন্তর্যামী ;
তবু বলো দেখি শুনি
কারে এ-ভুবনে গুণী
জ্ঞানী গণি আমি ?"

কহিল গণক : "মান
তারে তুমি করো দান
যে রহে বাহিরে
কর্মাসক্ত অনুক্ষণ
চিন্তা করি' বিসর্জন ;
মজে না গভীরে ;

প্রচার যে করে নিতি
বাহুবল ; দেয় বিধি
শক্তি মদ ভরে ;
বিক্রমাদিত্যের কীর্তি
গণে যে পরম সিদ্ধি,
চায় যে অন্তরে

প্রজার ভয়েরি অর্ঘ ;
কামনা-রঙিন স্বর্গ
গৌরবে সাজায় ;
শাশ্বতে না চেয়ে হায়
স্বর্ণমৃগ তরে ধায়
লুব্ধ বাসনায়।"

রাজা কহে হাসি' : "মন
সবার জানো যখন,
বলো দেখি আমি
বরেণ্য গণি বা কারে,
ধুপ-দীপ-উপচারে
নিবেদি' প্রণামী ?"

কহিল গণক : "মান
তারে তুমি করো দান—
নির্লক্ষ্য গতির
যে পূজারী নিশিদিন,
চায় শুধু প্রদক্ষিণ
করিতে মহীর

চারিধারে মত্তপ্রায়
উল্কার ঝলকে হায়,
যে দর্পে রটায়—
'গতি বিনা গতি নাই,
আরো বেগে ধাও তাই
নির্লক্ষ্য নেশায়।'

হে রণেন্দ্র! ভক্তি শান্তি
তুমি মনে করো ভ্রান্তি,
চাও নির্বাসিতে
তব রাজ্য হ'তে ছলে
বলে কি বা সুকৌশলে
যারা ধরণীতে

প্রেমের সাধনা করে ;
রুষি' তাহাদের 'পরে
ব্যঙ্গবাণ হানো ;
শিব সত্য সুন্দরেরে
লাঞ্ছি' দৃপ্ত অশান্তেরে
মহাজন মানো।

শুধু প্রভু, সাবধান!
মিথ্যারে সত্যের মান
যে দেয় ধরায়,
বিপরীত বুদ্ধি তার
আনে টেনে হাহাকার
আসুরী মায়ায় :

কালোরে যে বাসে ভালো
আলোরে সে দেখে কালো,
বরি' আত্মঘাত ;
ভগবানে সে না মানি'
উন্মাদেরে গণে জ্ঞানী,
জ্ঞানীরে উন্মাদ।"

মন্ত্রী মহাক্রোধে কহে :
"হে লোকেশ! নাহি সহে
এহেন স্পর্ধার—"
রাজা বলে : "নাহি ক্ষতি
প্রমাণ দেখাতে যদি
পারে এ-কথার।"

কহিল সে : "পারি—তবে
অপেক্ষা করিতে হবে
ত্রিসপ্তাহ—যবে
ঘোর অমাবস্যা-রাতে
নামিবে অঝোর-পাতে
মোহমদ ভবে—

দানবী আসব-ধারা—
পান করি' দিশাহারা
হবে জনে জনে ;
কোরো না সে-সুরাপান,
তা হ'লে পাবে প্রমাণ
সেই দুর্লগনে।"

কাল অমাবস্যা-রাতে
সে-বারুণী-ধারাপাতে
মাতিল এ-মহী ;
শুধু ওরা দুই জন
করিল না আস্বাদন
কৌতূহল বহি'।

দেখিতে দেখিতে কারা
আসে ওই আত্মহারা
ফাটায়ে গগন
আসুরিক অট্টহাসে
চমকিয়া মহাত্রাসে
নিরীহ ভুবন।

কেহ করে নৃত্য, কেহ
চায় লালসার গেহ
বরি' অন্ধকার ;
কেহ বা করে প্রলাপ,
কেহ দেয় অভিশাপ,
কেহ বা টঙ্কার

করে বিশ্বধ্বংসী ধনু ;
কেহ ধায় নগ্নতনু ;
কেহ পঙ্কে লোটে ;
কেহ বা উল্লাসে মাতি'
অন্ধসম আত্মঘাতী
দিগ্বিজয়ে ছোটে।

কেহ বলে : "বর্ম চর্ম
পরি' চলো, কোথা ধর্ম?
কোথা দয়াময়?
প্রতি অণুদৈত্যে গতি-
দীক্ষা দিলে সর্ব ক্ষতি
পূরিবে নিশ্চয়।"

রাজার প্রাসাদে এসে
প্রমত্তেরা কহে হেসে :
"ওঠ্, মূঢ় ! চল্ !
জ্বালায়ে মশাল বাতি
পিঙ্গলিয়া অমারাতি
আজ যে পাগল

আমাদের হ'তে হবে
তাণ্ডবের মহোৎসবে,
শুধু মত্ততায়
আনন্দের পাবি দিশা,
পোহাবে তমিস্রা-নিশা
হিংস্র মহিমায়।"

চলে রাজা মন্ত্রী সাথে,
ভয়াল লোহিত রাতে
শোনে—ওরা বলে
"এরা আমাদেরি মতো
রক্তরসাতলব্রত
তাই সাথে চলে।

যারা অন্ধ—শুধু তারা
জানে না যে, আত্মহারা
যাহারা না হয়,
তারাই উন্মাদ ভবে ;
লক্ষ্যহীন গতিস্তবে
মিলিবে অভয়।"

রাজা মন্ত্রী ভয়ে বলে :
"না না আছে ধরাতলে
জ্ঞানী স্নিগ্ধ স্থির।
তোমাদের মতো ভ্রান্ত
তারা নয়, তারা শান্ত,
প্রেমল, সুধীর।"

উন্মাদেরা হেসে মরে :
"শুনে যা প্রলাপ ওরে,
বদ্ধ পাগলের—
বলে কিনা—ভক্তি প্রেমে
আসে ভ্রান্তি বুকে নেমে
শান্তি অনন্তের !

দেখ্, ফল মূঢ়তার—
করে না যে অনিবার
গতিরে বন্দন,
চায় ধ্যান-শান্তি-ধাম—
হয় তার পরিণাম
কী ঘোর ভীষণ !

বিনা শক্তি-উন্মাদনা
এ-জীবন বিড়ম্বনা ;
প্রবৃত্তি বিহারী
যে চঞ্চল, স্বয়ম্বরা
হ'য়ে দেয় বসুন্ধরা
মালা গলে তারি।"

মোহান্ধেরা দলে দলে
জয়ধ্বনি ঘোষি' চলে
গণমন-গৌরবের আনন্দে অধীর :
"শুধু মত্ত গতি ব্রতে
দিশা মিলে এ জগতে
নিরীশ্বর বস্তুবাদী বিজ্ঞানী সিদ্ধির।"

জনসংঘ মদমত্ত
সে-সংক্ষোভ মাঝে সত্য
দেখে হায় অপ্রমত্ত দু-জন কেবল।
অসংখ্যেরা অট্টহেসে
বলে : "দেখে যারে, এসে
জ্ঞানীদের দেশে কে দুটো পাগল !"

শিশুশিক্ষায় মন্তেসরীর আকর্ষণ

শ্রীমতী রেণুকা সেন

কলিকাতার একটি নামকরা বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতে করতে দেখলাম, ওপরের শ্রেণীগুলিতে পড়াতে মন্দ লাগছে না, বিশেষ ক'রে মেয়েদের নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, পিকনিক করা, তাদের দিয়ে অভিনয় করানো, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো চলাফেরা বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই আমার প্রশ্ন জাগলো, ওপরের শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি যে-ভাবে নজর রাখা হয়, নীচের শ্রেণীগুলিতে কেন সে-রকমটি হয় না? বিদ্যালয়ের আধা-অন্ধকার ঘরগুলিতে সারি সারি বাঁকা তোবড়ানো বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি ক'রে বসেছে চল্লিশ-পঞ্চাশটি মেয়ে, তাদের বয়স তিন চার বছর থেকে সাত আট বছরের বেশী নয়। তার ওপর পড়াশোনাও তাদের ঠিকমত হয় না। অর্ধেক দিন দেখি, শিক্ষিকা অনুপস্থিত, শিশুরা ক্লাসের মধ্যে কাজের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু কারও সেদিকে দৃষ্টি নেই। আশ্চর্য লাগলো।

এই সব দেখে শুনে শিশুদের জন্য আমার সাধ্যমত কিছু একটা করার প্রেরণা অনুভব করতে লাগলাম। অবশ্য আগে থেকেই গঠনমূলক কোন একটা কাজ করার ইচ্ছা আমার ছিল। এইবার শিক্ষকতা করতে এসে পথ খুঁজে পেলাম। শিশুর প্রতি সব দিক থেকে সমাজের অবহেলা আমাকে সচেতন ক'রে তুললো এই দিকের কিছু কাজ করতে। ভাবতে লাগলাম, শিশুশিক্ষার অভাব কি ক'রে দূর করা যায় এবং কোন্ পথে গেলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হওয়া সম্ভব। নানা রকম বই এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদের লেখা পড়ে চেষ্টা করতে লাগলাম সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুশিক্ষার একটা পথ খুঁজে বার করতে। রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি আমাকে প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে যে, চিরাচরিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের শিশুদের শিক্ষা কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্রিকায় মাদাম মন্তেসরীর আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা পড়ে ভাল লাগলো; কিন্তু মন্তেসরী-প্রণালীতে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে আমি কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিনি।

তাই যখন বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবার একটা সুযোগ এসে গেল, তখন আমার মন্তেসরী ট্রেনিং-এর কথাই প্রথমে মনে প'ড়ল। হিতৈষীরাও বললেন, 'তোমার যখন শিশুশিক্ষার দিকে উৎসাহ, তখন তুমি মন্তেসরী-প্রণালীর শিক্ষাই ওখান থেকে নিয়ে এস।' কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, শিশুদের বিষয়ে কোন ট্রেনিং আমার নেওয়া হ'ল না। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের তাগিদে আমাকে বড় ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই ট্রেনিং নিয়ে আসতে হ'ল। কিন্তু বড়দের পড়াতে আর ভাল লাগে না; বড়দের ক্লাসে বসেই মনে হ'ত, একবার দেখে আসি, ছোটরা এখন কি ভাবে আছে, কি করছে, ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? সময় পেলেই কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম। ওরা প্রায়ই আমার কাছে পড়তে চাইত; কাজ করতে চাইত, আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। ছবি আঁকা, কাগজ কাটা, রকমারি ছোট ছোট

খেলার জিনিস বানানোয় দেখতাম তাদের প্রচুর উৎসাহ।

বিদেশের বিভিন্ন শিশুবিদ্যালয়ে এই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করেছি। মাদাম মন্তেসরীর লেখাতেও পড়েছি যে, আনন্দ ও স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে শিশু যা শেখে তা অনায়াসে ও সহজে শেখে, প্রত্যেক চরিত্রেই এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য শৈশব স্বভাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা বিকশিত হ'তে পায় না। বয়স্কদের নিষেধ, শাসন ও বিরোধিতার ফলে শৈশবেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। মাদাম মন্তেসরীর মতে আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্যে ছাড়া পেলে সেই বৈশিষ্ট্য শিশুর স্বভাবে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন শিশুর চার পাশে আনন্দপূর্ণ একটি স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করা। আবার বয়স্কদের সস্নেহ সহযোগিতা ছাড়া সেটি হওয়াও সম্ভব নয়। বড়দের যাতে আনন্দ, ছোট শিশুর যে তাতে আনন্দ, তা নয়। শিশুর প্রথম ও প্রধান আনন্দই হ'ল খেলা। সদা-চঞ্চল শিশু সর্বদাই কোন একটা খেলা নিয়ে মেতে থাকতে চায়। মন্তেসরী-প্রণালীতে তাই উপকরণগুলিকে (apparatus) খেলার সামগ্রী মনে ক'রে খেলাচ্ছলে শিশু সবকিছু নিজেই শিখে নেয়।

মন্তেসরী-শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতা থাকে অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা-দান-পদ্ধতির প্রবর্তন মাদাম মন্তেসরীই প্রথম করেন। শিশু স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের কাজ ক'রে যাবে। শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজন মতো তাকে সাহায্য করবেন, নির্দেশ দেবেন মাত্র, কিন্তু তার কোন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না।

মন্তেসরীর সুস্থ ও মুক্ত আবহাওয়াতে লাগামছেঁড়া শিশু-মন যে সত্যি সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ আমি কিছুদিনের মধ্যেই পেলাম। উচ্চ বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে, মন্তেসরী ট্রেনিং না নিয়েই শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে ট্রেনিংপ্রাপ্তা শিক্ষিকার সাহায্যে কয়েকজন শিশুকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাদের ক্রমোন্নতি দেখে আশ্চর্য হলাম। মন্তেসরীর প্রতি আমার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল।

অমল ও অরুণ দুই ভাই ভরতি হ'ল জানুআরি মাসে। বড় ভাই অমল লক্ষ্মী ছেলের মতো সব কাজ ক'রে যেতে লাগলো; কিন্তু মহা মুস্কিল হ'ল তিন বছরের অরুণকে নিয়ে। সে কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না, বারান্দায় বসে থাকবে আর কেউ তাকে বুঝিয়ে ঘরে নিতে গেলে তাকে আঁচড়ে, কামড়ে, চুল ছিঁড়ে, গায়ে থুথু দিয়ে একাকার করবে। অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তার সামনেই অন্য কয়েকটি শিশুকে মন্তেসরীর নানা রঙবেরঙের উপকরণ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি আড়াল থেকে অরুণের মতিগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম। প্রথম দিন দেখলাম, সে সারাক্ষণ অবাক্ হয়ে উপকরণগুলির দিকে একবার এবং অন্য শিশুদের দিকে একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় দিনে দেখলাম, কিছুক্ষণ নিজের জায়গায় বসে থেকে হঠাৎ উঠে গেল যেখানে অন্য শিশুরা বসেছিল সেখানে এবং একজনকার কাছ থেকে তেকোনা টুকরো কতকগুলি ছিনিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেল। তখন মন্তেসরী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তার উপযুক্ত উপকরণ সামনে রেখে দেখিয়ে দিলেন। অরুণ তখন মহানন্দে সেগুলি নিয়ে কাজ করতে শুরু ক'রে দিল। তারপর থেকে একদিনও সে

অনুপস্থিত হয়নি বা বিদ্যালয়ে এসে অবাধ্যতাও করেনি। এসেই নিজের কাজ ক'রে যেত, কারও সঙ্গে কাজের সময় কথাও বলতো না।

আড়াই বছরের টুটুলকে প্রথমে দেখতাম, কেবল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব উপকরণগুলি বাইরে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা। আর কিছুতেই একটা জিনিস নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করবে না। অল্প একটু করেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু এক মাস পরে তাকেই দেখলাম, বেশ মন দিয়ে কাজ করছে, দুমাস পরে দেখলাম টুটুল অনেক কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে করতে শিখে গেছে। চার বছরের টুটুল পড়াশোনার দিকেও অনেক এগিয়ে গেল। আমি আর একবার বিস্মিত হলাম।

সাড়ে তিন বছরের দেবাশিস ছিল আর এক ধরনের! কোন কিছুতেই তার উৎসাহ ছিল না। এমন কি খেলাধূলার সময়েও সে একপাশে চুপ ক'রে একলাটি বসে থাকত। গান, ছবি আঁকা, গল্প, ড্রিল কোন সময়েই তাকে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যেত না। তার সামনে বিভিন্ন উপকরণ সাজানো থাকত, কিন্তু সেদিকে তার যেন কোন খেয়ালই ছিল না, কেবল অন্য শিশুদের দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে থাকত। শুনেছিলাম, সে দাদু-দিদিমার কোলে কোলে আদরে মানুষ হয়েছে। তাই আমার মনে হ'ত যে, তার নিজের ওপর বিশ্বাস খুব কম, আর কোন ব্যাপারেই আত্মনির্ভরতা তার একেবারেই যেন ছিল না; হেঁটে চলে বেড়াতে পারলেও তার মনে হ'ত যেন পড়ে যাবে। ভাবগতিক দেখে তার বাড়ীর লোকেরা প্রায়ই এসে আমাকে বলতে লাগলেন, 'দেবাশিসের কোন উন্নতি হচ্ছে না কেন?' আমি মনে মনে খানিকটা দমে গেলেও তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, 'ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই ও উন্নতি করবে, তবে একটু বেশী সময় লাগবে, এই যা।' আমার কথা এখন সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। দেবাশিস আজকাল নিজের কাজকর্মে ও পড়াশোনায় বেশ সুফল দেখাচ্ছে। আত্মনির্ভরতাও তার অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে মা-দিদিমাকে দেখলেই কোলে ওঠার জন্য বায়না ধ'রত; আজকাল ছুটির পর তাঁদের দেখলেও ছুটে চলে যায় বাইরে খেলতে, স্লিপে চড়তে। তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় একটু আস্তে আস্তে সে সব কিছু শিখেছে।

এই অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, মন্তেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিশু ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল, হাসিখুশি, মুক্তগতি অথচ সংযমী। শিশুর দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, ও সামাজিক—সবগুলি সত্তাই এক সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হ'য়ে ওঠে এই নতুন শিক্ষাধারার মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের নামে যে একটা আতঙ্ক বা ভীতি, সেটা তাদের একেবারেই থাকে না। বিদ্যালয়কে তারা মনে করে তাদের নিজেদেরই আর একটি বাড়ী (second home), যেখানে তাদের অবাধ স্বাধীনতা আছে আপনার সুকুমার বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার, অথচ কোন কিছুতেই বিশৃঙ্খলা নেই।

আমার মতো হয়তো অনেক আগ্রহশীল শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা শিশুদের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে গিয়ে মন্তেসরী-শিক্ষাপ্রণালীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন ও সুফল পেয়েছেন। শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন সংস্থাতেও হয়তো বহু শিশুদরদী আছেন, যাঁদের কাছে মন্তেসরীর আকর্ষণ প্রবল। সেই মহীয়সী জননী ডাঃ মন্তেসরীর নামে প্রতিটি মানুষকে যদি আজ শিশুর প্রতি উৎসাহী ক'রে তুলতে পারা যায়, তা হ'লে কত মধুর হবে আমাদের

এই সমাজ। তাই আজ এই নতুন শিক্ষা-প্রণালীকে কেবলমাত্র শিক্ষকসমাজে এবং শহরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা ঠিক হবে না। সমাজের প্রতি-স্তরের মানুষকে—প্রধানতঃ অভিভাবকদের নিয়ে আসতে হবে এই কাজে; বিশেষ ক'রে মায়েরা সম্ভবমত যদি মন্তেসরী পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, তবেই তাঁদের শিশুদের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হ'তে পারে। মায়েদের সহযোগিতা পেলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা খুবই সহজ, এ কথা মাদাম মন্তেসরী বহুবার ব'লে গেছেন। এই ব্যাপারে গ্রামের ও শহরের শিশুশিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন ও সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যেতে পারে।

বিজয়া-দশমীতে

শ্রীশান্তশীল দাশ

বছর পরে এলি মা তুই, আবার নাকি যাবি চলে ?
চলে-যাবার ও-পথখানি পিছল হ'ল চোখের জলে।
আবার আসিস্, আসিস্ মাগো,
ভুলে মোদের থাকিস্ না গো—
বারে বারেই এই কামনা জানাই মা তোর চরণতলে।

যাওয়া-আসা কোথায় মা তোর, বিশ্বময়ী বিশ্বমাঝে !
চিরদিনের আসনখানি উজল হয়ে নিত্য রাজে।
কত উদয়, কত বা লয়,
ও-আসনের আছে কি ক্ষয় !
মিছেই বলি যাওয়া-আসা, অবোধ শিশু কী না বলে।

সংস্কৃত-ভাষার সেবায় কম্বুজ-নারী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মালয় সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত পঠন-পাঠন চলে আসছিল অতি ব্যাপকভাবে--কেবল বিগত কয়েক শতাব্দীতে তা হ্রাস পেয়েছে। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে—বিশেষভাবে বঙ্গদেশের সঙ্গে এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ছিল নিগূঢ় সংযোগ। হিন্দুভারত ও বৌদ্ধভারত—দুই-ই এঁদের হৃদয় গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সর্ব ধর্মতত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ে এঁদের ছিল খুবই আগ্রহ। বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধজননীর প্রতিও এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। উমা, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীরা এখানে পূজা লাভ করেছেন শত শত শতাব্দী ধরে। কম্বুজ-দেশের (কাম্বোডিয়া) অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ আকর্ষণ করেছিলেন সংস্কৃত-জননী। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট পাণিনি ; তার অন্যতম বৃত্তি জয়াদিত্য—বামন-কৃত 'কাশিকা' ; তার টীকা বাঙালী বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'ন্যাস'। এই 'ন্যাস' অতি ব্যাপক ও গভীরভাবে পড়ানো হ'ত এই অঞ্চলে। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের শিষ্য এখানে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচার করতে ; তিনি সেখানে 'রাজগুরু'র আসন লাভ ক'রে শঙ্কর-মত প্রচার করেছিলেন। 'হরি-হর' পূজাও এখানে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

কিছু পরবর্তী সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মও এখানে প্রচারিত হ'ল, মহাযান বৌদ্ধধর্মও সমধিকভাবে—যার বিশিষ্ট সকল ধর্মগ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। ফলে—কম্বুজ-দেশবাসী হিন্দু-ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীই হোন, ধর্ম-শিক্ষার জন্য তাঁরা সকলেই সংস্কৃত বিশেষভাবে শিক্ষা করতেন। মাতৃজাতিরও ধর্মপ্রচারে প্রচুর উৎসাহ ছিল। তাঁরাও সংস্কৃতে নিষ্ণাতা হয়ে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় দিকেই অভ্যুন্নতির নিমিত্ত—কেবল সার্থকতা-লাভে ধন্য হননি, স্বকীয় রচনার মাধ্যমে স্থায়ী কীর্তিও উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হচ্ছেন—ইন্দ্রদেবী।

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী-বিরচিত জয়বর্ম-দেবের সময়ের ফিমলক (Phimlok) প্রস্তরলিপি আঙ্কোর থোমে (Angkor Thom) মন্দিরের নিম্নস্থ ভূগর্ভ থেকে প্রোথিত হয়েছে।[১] এই লিপিটি ১০২টি সংস্কৃত শ্লোকে সম্পূর্ণ। উপজাতি, বংশস্থা, বসন্ততিলক প্রভৃতি ছন্দ এতে প্রযুক্ত হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী এই রচনায় নিজের বিষয়ে, নিজের ভগিনীর বিষয়ে, রাজা জয়বর্মদেবের বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন। লিপির প্রথমাংশ অতি খণ্ডিতভাবে আমাদের হাতে এসেছে ; শেষের দিকটায় অনেকটা অব্যাহত আছে। তা থেকে ইন্দ্রদেবীর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি।

ইন্দ্রদেবী নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রশংসায় মুখর। তিনি নিজেই তাঁকে সংস্কৃত ভাষায়

১ BEFEO (Bulletin d' Ecole Francaise d' Extreme Orient, Hanoi), XXV. 372 ; Coedes, Inscriptions du Cambodge. II. 161

পরম-পণ্ডিতা ক'রে তুলেছিলেন। তিনি নিজে নগেন্দ্রতুঙ্গ, তিলকোত্তর এবং নরেন্দ্রাশ্রম—এই তিন স্থানের বিহারসমূহের ভিক্ষুণীবৃন্দকে বিশেষ ক'রে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

এই লিপিতে কম্বুজদেশ-নিবাসী জয়বর্মদেবের চম্পার রাজধানী শ্রীবিজয়-বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানের বর্ণনা আছে। জয়বর্মদেবের হস্তে চম্পারাজ যশোবর্মদেব (দ্বিতীয়) নিহত হন এবং জয়বর্মদেব জয়লাভ করেন।

জয়বর্মদেব যখন চম্পা আক্রমণে নির্গত হন, তখন তাঁর পত্নী কি কঠোর তপশ্চর্যায় দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে ৪০—৫৮ সংখ্যক শ্লোকে :

শ্রীইন্দ্রদেব্যগ্রভবানুশিষ্টা
বুদ্ধং প্রিয়ং সাধ্যমবেক্ষমাণা।
দুঃখাম্বু-তাপানল-মধ্যবর্তি-
বর্ত্মা২চরৎ সা সুগতস্য শান্তম্ ॥ ৫৮

এমন কঠোর তপশ্চর্যা তিনি করেছিলেন, যার ফলে যেন সর্বদা নিজের পতিকে চোখের সম্মুখেই দেখতে পেতেন (শ্লোক ৬১—৬৪)। পতির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি ধর্মচর্যার মাত্রা কমাননি, বরং অধিকতর ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করলেন (৭১—৯৩)। জাতক থেকে ঘটনা অবলম্বনপূর্বক একটি নাটক রচনা করিয়ে তিনি ভিক্ষুণীদের দিয়ে তা অভিনয় করিয়েছিলেন। বিশিষ্ট মন্দিরসমূহে কত অজস্র দান করলেন তিনি।

ঈদৃশী তপোবৃদ্ধা রাজমহিষীর দেহপাতের পরে রাজা জয়বর্মদেব মহিষীর অগ্রজা ইন্দ্রদেবীর অর্থাৎ বর্তমান শিলালিপির রচয়িত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজার অনুমতিক্রমে তিনি বিদ্যাদানে মনোনিবেশ করলেন।

"স্থিতা নরেন্দ্রাশ্রমনাম্নি ধাম্নি যা
নরেন্দ্রকান্তাধ্যয়নৈর্মনোরমে।
ররাজ শিষ্যাভিরজস্রচিন্তিতা
সরস্বতী মূর্তিমতীব তদ্বিতা ॥" ৯৯

ভগিনীর অপূর্ব জীবনচর্যা এবং পতি জয়বর্মার বিজয়গৌরব প্রভৃতি কীর্তন-মানসে তিনি রচনা করলেন এই মন্দিরগাত্র-লিপি :

স্বভাবভূতপ্রতিমা বহুশ্রুতা
সুনির্মলা শ্রীজয়দেববর্মভাক্।
ইদং প্রশস্তং বিমলং বিধায় সা
নিরস্তসর্বাণ্যকলা বিদিত্যতে ॥ ১০২

১০০ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়—ইন্দ্রদেবী ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা; বিবাহ করেছিলেন ক্ষত্ররাজকে। অন্যান্য রচনা থেকেও মনে হয় না ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিবাহে কোনও বাধা ছিল।

কম্বুজ-দেশের আর একজন মহিমময়ী সংস্কৃতবিদ্যানিপুণা রমণী 'নমঃশিবায়'-পত্নী এবং ভূপেন্দ্রপণ্ডিত-জননী 'তিলকা দেবী'—যাঁর পরবর্তী নাম 'বাগীশ্বরী ভগবতী'। তাঁর কীর্তি-গাথায় কম্বুজ-দেশের সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ। বংশপরম্পরা-ক্রমে তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রগণ রাজগুরু এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতৃরূপে দেশের করেছেন অকৃত্রিম সেবা।

এভাবে এশিয়ার অনেক দেশেই সংস্কৃতের সেবা চলেছিল অব্যাহতভাবে।

ভগবতীর অর্চনা-কালে এই মাতৃ-'গণ'কে প্রণতি নিবেদন করি।

সমালোচনা

Reminiscences of Swami Vivekananda : By His Eastern and Western Admirers. Published by Swami Gambhirananda, President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Centre : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pp 404 ; Price : Rs. 7·50.

আসন্ন শতবার্ষিকীর পটভূমিতে স্বামীজীর শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের এই স্মৃতিসঞ্চয়নটি আবার আমাদের নতুন ক'রে সেই দেবমানবের সান্নিধ্যে উপনীত করেছে।

এজন্য অদ্বৈত আশ্রম-কর্তৃপক্ষ সাধারণ পাঠকদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। বাস্তবিক অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথার যে মধুর বৈচিত্র্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত, তার ফলে বিবেকানন্দ-জীবনের বহুমুখী প্রভাব সম্বন্ধে অনায়াসে একটি সামগ্রিক ধারণা জন্মাতে পারে। সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিষ্য হরিপদ মিত্র, গুণমুগ্ধ সুন্দররামা আয়ার ও মাদাম কালভে, নিবেদিতপ্রাণা ভগিনী ক্রিষ্টিন ও নিবেদিতা, ভক্তবন্ধু জোসেফাইন ম্যাকলাউড—এমনি নানা জনের স্মৃতিকথায় বিবেকানন্দের বাণী ও কাহিনীতে মিলে পরমসত্যের এই প্রাণদীপ্ত প্রকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতি পাঠকচিত্তকে সশ্রদ্ধ অনুরাগে উদ্ভাসিত করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথন। এমন সরল প্রাণময় বর্ণনাভঙ্গী সাহিত্যে দুর্লভ সামগ্রী।

এই অমূল্য গ্রন্থটির অধিকাংশই মূলতঃ ইংরেজী রচনা। তাদের মধ্যে যে-সব রচনা এখনও বাংলায় অনূদিত হয়নি, সেগুলি অনুবাদ ক'রে এ গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ যথাশীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণীয়, লেখকদের ব্যক্তি-পরিচয় না থাকলে স্মৃতিকথা অপূর্ণ থেকে যায়।

শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এই গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। যাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আগ্রহশীল, এ গ্রন্থ তাঁদের নিত্যসহচর হয়ে উঠবে— এ কথা বলাই বাহুল্য।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কুমারবিজয়- ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দির, পোঃ—কুণ্ডা, দেওঘর (এস. পি.)। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি মহিষাসুরের ইতিবৃত্ত, গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, কুমারবিজয় ও কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা বর্বরীক—এই কাহিনী-চতুষ্টয়ের সংকলন। ইহার প্রথম সংস্করণ 'তপঃকুমার' নামে প্রকাশিত হয়। স্মরণাতীত কাল হ'তে এপর্যন্ত জগতে যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রত্যেকেরই মাতা-পিতা কঠোর সংযমী ও তপস্বী। আত্মসংযম ও তপস্যা ছাড়া কখনও সুসন্তান লাভ হয় না—কাহিনীগুলিতে এই এই শিক্ষাই নিহিত। কাহিনীগুলি সুখপাঠ্য ও সৎশিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল—সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থটিতে গুরুপূজা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ত্ব, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, শিবরাত্রি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের 'মণিরত্ন-মালা'র শ্লোকগুলি পদ্যানুবাদ-সহ সংযোজিত। রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল। ইহা প্রচারের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Precepts for Perfection—Teachings of the disciples of Sri Ramakrishna—Compiled by Sabina Thorne. Ganesh & Co. (Madras) Private Ltd. Madras 17. Pp. 235 ; Price Rs. 10.

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের বাণী-সঙ্কলন। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—পূর্ণতার উপলব্ধি; শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সময়ে যে-সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নির্বাচন করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়সূচীক্রমে সাজানো হইয়াছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধর্ম, বেদান্ত, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, কর্ম, জন্মান্তর, মৃত্যু, অমরত্ব, আধ্যাত্মিক রূপান্তর, গুরু, মহাপুরুষসঙ্গ, সেবা, তীর্থভ্রমণ, নৈতিকতা, সত্য, কর্তব্য, দয়া, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, আত্মসংযম, বিচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, পুরুষকার, বিনয়, অহংকার, ভক্তি, শরণাগতি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, আনন্দ, পূজা, প্রাণায়াম, প্রার্থনা, জপ, ধ্যান, অনুভূতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। এই সব বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশও উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং গৃহী ভক্ত গিরিশচন্দ্র, মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) ও নাগ মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই ধরনের বাণী-সঙ্কলন প্রশংসনীয়। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি-কামী ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকটি পাঠ করিলে লাভবান্ হইবেন।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

মহাবোধ—মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক: অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ২২, মূল্য পঞ্চাশ নঃ পঃ।

পুস্তিকাটি ২৬টি কবিতার সঙ্কলন, তন্মধ্যে 'রাষ্ট্রনেতা', 'বিশ্বমৈত্রী', যৌথকাজ', 'জনধর্ম' উল্লেখযোগ্য।

গৌরভাবিনী—(নবপর্যায়) শ্রীভবন, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পৃষ্ঠা ২৪, বার্ষিক মূল্য এক টাকা। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী শতবার্ষিকী, প্রাচীন ভারতের ছাত্রশালা, ভারতযুদ্ধ প্রভৃতি আলোচিত।

বিদ্যার্থী (৩৭ বর্ষ, ১৩৬৭) : প্রকাশক—স্বামী সন্তোষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৬।

কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ-পরিচালিত সুমুদ্রিত 'বিদ্যার্থী' পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট রচনা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী নির্বেদানন্দের দুইটি রচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনা' ও 'Tittle-Tattle' পত্রিকাটি অলংকৃত করিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাবীকাল' লেখাটিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতে স্বামীজীর ভাবধারা যে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা যুক্তিপূর্ণ ভাষায় আলোচিত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: স্পুটনিক, জন্মাষ্টমী, 'পূরবী'র কবি রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়া'গান, পুরীর পথে, Lord Buddha, What next? 'আমাদের আশ্রম' রচনাটিতে আশ্রমের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও জীবন-ধারা বিবৃত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা)—সপ্তদশ বর্ষ (১৩৬৭-৬৮): সম্পাদক—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস; প্রকাশক—শ্রীশরদিন্দু বসু, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ৪১; মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই খণ্ডটি প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা, অঙ্কিত চিত্র এবং তাঁহার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দ্বারা পত্রিকাটি অলংকৃত। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তাঁহার রচনা যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান-সময়ে তাঁহাকে লিখিত কবির পত্রের প্রতিলিপি-মুদ্রণ সময়োপযোগী হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'ভগ্নহৃদয়', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'খেয়া', 'গোরা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'ঘরে বাইরে' ও 'শেষ সপ্তক'এর একটি করিয়া পৃষ্ঠা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর উদ্দেশে রচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রতিকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'সংবর্ধনা'—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘর' অভিনয়ে, সুহৃদ্বর্গসহ, 'সাধনা'-সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, জাপানে, রাশিয়ায়, তিরোধানের এক বৎসর পূর্বে, আশি বৎসরের জন্মোৎসবে

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। মূল্যবান্ বিষয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখিবার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে:—যথাযোগ্য গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকায় পূজার কয়দিনই মঠে বহুলোকের সমাগম হয়। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন; অন্য দুইদিন হাতে হাতে বহু ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্ট ও সোনার গাঁ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অন্তর্দেশীয় ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বারোদ্‌ঘাটন ও উদ্বোধন

কলিকাতা: গত ১লা নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের (Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Calcutta 29) নূতন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের (East-West Cultural Conference) উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। ইনস্টিট্যুটের বিবেকানন্দ হলে ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। ইনস্টিট্যুটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ এই ভবনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা বর্ণনা করেন। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের পর ইউনেস্কোর (UNESCO) প্রতিনিধি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি-সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বক্তৃতা দেন। সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ভাষণ প্রদান করিলে পর ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথিবর্গ ও সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শেষে 'জনগণমন' গীত হয়।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। নানা দেশের বিভিন্ন বক্তাগণ সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিবেন।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসব

বেলুড়: গত ৫ই হইতে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে চারিদিবসব্যাপী উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রারম্ভে ব্রহ্মচারিবৃন্দ বেদমন্ত্র দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিলে পর শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদগান করেন। স্বামী বিমুক্তানন্দ কবিপ্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া শতদীপ প্রজ্বালনের দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করিলে স্বামী তেজসানন্দ সমাগত সুধীমণ্ডলীকে স্বাগত

জানান। কবিগুরুর ভারতচিন্তা এবং বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব—এই দুইটি বিষয় প্রথম দুইদিনের সাহিত্য-সভায় আলোচিত হয়। প্রথম দিনের সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত এবং ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই দুই দিনের সাহিত্য-সভায় বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীশীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং শ্রীপুলিনবিহারী দাস অংশগ্রহণ করেন।

তৃতীয় দিন বিশ্বভারতী সঙ্গীত-ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। কথায় ও গানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য-রূপায়ণ ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কণ্ঠসঙ্গীতের দ্বারা সভাপতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকবৃন্দ ঐ দিন কবিগুরুর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটি দক্ষতার সহিত মঞ্চস্থ করিয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হন।

চতুর্থ দিন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ এবং অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উদ্যমে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। বিদ্যামন্দির-ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর 'গুরুবাক্য', 'অন্ত্যেষ্টি-সৎকার' এবং 'শারদোৎসব'—এই তিনটি নাট্যাভিনয় এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছাত্রবৃন্দের অপূর্ব অভিনয়-সাফল্য সকলকে চমৎকৃত করে।

বক্তৃতা-সফর

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন স্থানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা করেন।

তারিখ	স্থান	বিষয়
মার্চ, ২৪	পাটন (উত্তর গুজরাত)	বর্তমানে প্রয়োজন (হিন্দী)
২৫	পাটন টি. বি. স্যানাটেরিয়াম	স্বাস্থ্যই মানব-জীবনের পরম সম্পদ্ (ইংরেজী)
এপ্রিল, ৮	কলিকাতা বলরাম-মন্দির	জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ
৯	পুরুলিয়া রামবাগান	ভারত-গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণ
১০	রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়	বর্তমানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা
১১	দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ	চরিত্র-গঠনের শিক্ষা
১৯	কলিকাতা পূর্ব রেলওয়ে অফিস	জগতের ধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান
২০	বারাসত শিবানন্দ-ধাম	স্বামী শিবানন্দের জীবন ও বাণী
২০	গবর্নমেণ্ট হাই স্কুল	শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ শিষ্যগণ
২২	ভুবনেশ্বর হাইস্কুল হল	বর্তমানে যে শিক্ষার প্রয়োজন
২৩	কলামন্দির	বর্তমানে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা (ইং)
২৭	কটক নারী-সঙ্ঘ	নব ভারত গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের দান (ইংরেজী)
মে, ৩	কলিকাতা আনন্দ আশ্রম	জীবনের উদ্দেশ্য
১৮	বোম্বাই বিড়লা হল	সর্বতোমুখী শিক্ষা
১৯	বোম্বাই সারদা-সঙ্ঘ	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

তারিখ	স্থান	বিষয়
মে, ২৫	হুগলি মহসীন কলেজ	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী
২৬	ইন্‌স্টিটুট্যট অব্ টেক্‌নোলজি	শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
অগস্ট, ২৪	বোম্বাই ওরলি টেম্পল	বৈদিক ধর্ম
সেপ্টে, ১৭	কলিকাতা মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন	স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই : বেদান্ত-সোসাইটি—১৯৬০ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জনসাধারণ এবং নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্যা ৪৬। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তগণ ধ্যানভ্যাস করেন।

(৩) অতিরিক্ত সভা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে ছাত্রদের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং 'হিন্দুর দৃষ্টিতে জীবন' বিষয়ে বক্তৃতা ও ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

(৪) উৎসব : শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্‌ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, পূজা, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হয়।

(৫) অবকাশ : অগস্ট ও সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে গ্রীষ্মাবকাশের সময় বেদান্তানুরাগী ভক্তবৃন্দ রবিবার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন।

(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে ৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন। ইঁহাদের অনেকেই উপাসনায় যোগদান করেন। সেণ্ট লুই হইতে কয়েকজন স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই আসেন।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ ৮৫ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(৮) গ্রন্থাগার : সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৯) প্রচারের পরিধি বিস্তার : ক্যানসাস শহর, মিস্থুরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার কার্য ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। 'ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী', 'ধ্যান', 'ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন' বিষয়ে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

পোর্টব্লেয়ার: গত ১৫ই সেপ্টেম্বর চীফ কমিশনার শ্রী বি. এন. মহেশ্বরী আই. এ. এস বিশিষ্ট অতিথি ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ সেণ্টারের' গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। শ্রীমহেশ্বরী তাঁহার ভাষণে বলেন, ভগবানের দরবারে উচ্চনীচ ভেদ নাই, সেখানে সকলেই সমান। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, এই প্রতিষ্ঠান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে।

সমাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিনয়কুমার লাহিড়ী বলেন, সত্যকারের সুখ এবং শান্তি একমাত্র ধর্মের পথেই পাওয়া সম্ভব। বর্তমান জগৎ ধর্মের পথ ত্যাগ করিয়া অলীক মায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের নিকট হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

সভায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাবিষয়ক একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া শোনানো হয়। কুমারী মনোরমার শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী পাঠ এবং শ্রীসাকলানীর ভাষণ মনোগ্রাহী হইয়াছিল। ধর্ম ও ভক্তি সঙ্গীত গাহিয়া অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

কার্যবিবরণী

চেতলা: শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপের বার্ষিক (১৯৫৮-৬১) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আলোচ্য বর্ষগুলিতে এখানে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, উৎসব ও নরনারায়ণ-সেবা নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুইটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রতি বর্ষে দশ হাজারের অধিক রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। সমিতির দুগ্ধ-বিতরণ কার্যও উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপের ফলতা শাখা-আশ্রমটি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতমহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা সম্প্রতি একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, ভারতমহাসাগর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে নিম্নলিখিত ২২টি রাষ্ট্র সহযোগিতা করিতেছেন: অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি জাপান, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, চীন প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ভারত, ইণ্ডোনেশিয়া, ইজরায়েল, নেদারল্যাণ্ডস, পর্তুগাল, মালয়, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, পূর্ব-আফ্রিকার বৃটিশ রাজ্যাঞ্চল এবং মরিশাস।

ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ইউনিয়নস এবং রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমীক্ষায় ৪৫টি জাহাজ নিয়োগ করা হইতেছে। ভারত-মহাসাগর সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এই মহাসাগরের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই এই অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বায়ুপ্রবাহ, নূতন নূতন রাসায়নিক পদার্থ, সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং সমুদ্রতলের পর্বত ও পাহাড় সম্পর্কে বহু নূতন

তথ্যের সন্ধান করা হইবে এবং মানচিত্র তৈয়ার করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর প্রতিক্রিয়া সামুদ্রিক প্রবাহের উপর রহিয়াছে—এ-সম্পর্কে বিশেষ তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে ও অতলান্তিক মহাসাগরের ভূসংস্থানিক অবস্থা একপ্রকার নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে ভারত-মহাসাগরের সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা যাইবে। ইহাতে যে-সকল অগভীর অঞ্চল রহিয়াছে সেখানে প্রচুর মৎস্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন।

(মার্কিন বার্তা হইতে)

পাল আমলের শিল্প-কলার নিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার বর্ধমান জেলার উচালনে এক প্রাচীন স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থানটিতে অতীত যুগের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পাল আমলের এক প্রকাণ্ড নির্মাণ-কার্যকে আচ্ছন্ন করিয়া যে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য যুগের রমণীয় মূর্তিশিল্পসৃষ্ট যে দেবীমূর্তি এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে খৃঃ ১০ম শতকের শেষভাগে পাল শিল্পের ছন্দোময় যুগের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় প্রসিদ্ধি এই যে, উচালন নামটি ঊষা ও অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী হইতে উদ্ভূত।

মধ্যযুগীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ জঙ্গলাকীর্ণ গড়মান্দারণের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারের জন্যও উক্ত অধিকার চেষ্টা করিতেছেন। খৃঃ ১১শ শতকে বরেন্দ্রভূমিতে যে কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়, উহা দমনের জন্য পাল আমলে একদা এই দুর্গের সৈন্যদল রামপালের অভিযানে যোগদান করেন।

এই সকল অনুসন্ধানের ফলে প্রায় ১,০০০ বৎসর পূর্বের প্রস্তর-নির্মিত একটি উপাসনা-স্থানের বিরাট ধ্বংস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই আবিষ্কার যেমন আত্মরক্ষার্থ সুবিস্তীর্ণ ও উচ্চ মাটির ঢিবি-সমন্বিত গড়মান্দারণের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে, তেমনি এই অভিযানে রূপনারায়ণগামী শিলাবতীর উপনদী আমোদরের তীরবর্তী শিরোমণিপুরের পার্শ্বভূমিতে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুদ্র হাতিয়ার-সমন্বিত স্থানেরও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। হুগলি জেলার কামারপুকুরের নিকটবর্তী এই প্রাগৈতিহাসিক স্থানটি রূপনারায়ণের দক্ষিণ-কূলের সন্নিকটস্থ প্রাচীন সভ্যতার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত

গুপ্তযুগের মুদ্রা

সম্প্রতি হুগলি জেলার মহানাদ গ্রামে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাটির একদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দণ্ডায়মান অবস্থার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, মহারাজার বামহস্তে একটি বৃহৎ ধনু এবং দক্ষিণ হস্তে বাণ। অপর দিকে অঙ্কিত আছে সিংহাসনে উপবিষ্টা ধনদাত্রী লক্ষ্মী-দেবীর মূর্তি, তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধনরত্ন দান করিতেছেন। ক্ষুদ্রলিপিতে একদিকে 'শ্রীচন্দ্র' লিখিত আছে এবং অপর দিকে 'শ্রীবিক্রম'।

নবাবিষ্কৃত মুদ্রাটি গুপ্তযুগে বাংলার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর আলোকসম্পাত করিতেছে।　　(সঙ্কলিত)

কলিকাতার জনসংখ্যা

সাম্প্রতিক লোকগণনা অনুসারে :

কলিকাতায় বসতির ঘনতা চরমে উঠিয়াছে, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি স্থানে বসতি কমিয়াছে।

	১৯৫১	১৯৬১	মন্তব্য
বহুবাজার	৪০,৭৯৪	৩৯,৩৩৮	—
বড়বাজার	৫৩,৮৪৬	৪৭,৯৫৮	–
জোড়াবাগান	১,২০,২০০	…	প্রায় স্থির
বেলগাছিয়া	৪৪,৯২৪	…	+ প্রায় ২০০০
কাশীপুর	…	…	+ ২৭৩
ভবানীপুর	…	…	— ৩,০০০
টালিগঞ্জ	১,৯২,৯৮৯	২,০০,০০০	+
আলিপুর	৬৪,৭০৪	৮০,৬৮৯	
ট্যাংরা	…	…	+ ১৭,০০০
বালিগঞ্জ	…	…	+ ৫,০০০
বেলিয়াঘাটা	…	…	+ ১১,০০০
মাণিকতলা	…	…	+ ১২,০০০
নিউ আলিপুর	…	…	+ ১২,০০০
কলিকাতা (নূতন)	…	২৯,২৬,৪৯৮	
কলিকাতা (পুরাতন)	২৫,৪৮,৬৭৭	…	+ ১,১০,০ ৫
টালিগঞ্জের (নূতন ৫টি পল্লী)		২,৬৭,৬১৬	

কলিকাতার ৮০টি পল্লীর মধ্যে বাগমারি উল্টাডাঙ্গার লোকসংখ্যা সর্বাধিক—৭৪,৭১৭, তারপর যাদবপুরের— ৭০,২৮৩

কলিকাতায় মোট পুরুষ—১৮,১৪,১৩১
নারী ১১,১২,৩৬৭

পল্লীহিসাবে শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বাধিক যাদবপুরে,

	কলিকাতা	যাদবপুর
মোট শিক্ষিত	১৭,১২,৫৭৩	৪৯,১১৪
পুরুষ	১১,৩৯,৪০২	২৭,৮৪৫
নারী	৫,৭৩,১৭১	২১,২৬৯

শতকরা হিসাবে ডালহৌসি নর্থ (৩৮ নং) পল্লীতে শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ—প্রায় ৭০%।

যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত আয়

যুক্তরাজ্যে (U. K.) ব্যক্তিগত আয়ের মোট পরিমাণ ৪০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই বিপুল অর্থের ৩০% জমিজায়গা, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির জন্য ব্যয় হয়। ২০% স্টক ও শেয়ারে, ১৭% গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে, ১৭% নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা এবং ১৬% সমাজসংগঠনে।

(সঙ্কলিত)

আবেদন

বিহারে বন্যার্ত-সেবা

বিহারে মুঙ্গের জেলায় বারহিয়া (Barhiya) থানায় (কিউলের পরে তৃতীয় স্টেশন) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তদিগের সেবা (Relief) করা হইতেছে। বারহিয়া থানাটি সাম্প্রতিক বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যাপীড়িতদের সর্বপ্রকার সাহায্যই প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে তুলার কম্বল, ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের পোষাক দেওয়া হইতেছে।

এই সেবাকার্যে অর্থ-সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি। রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সকল প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

৩১.১০.৬১

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া



অ ব্রহ্ম

যস্মাৎ সর্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজগজ্জায়তে
যস্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে কল্পানুকল্পে পুনঃ।
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দন্তি মোক্ষং ধ্রুবং
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলম্ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ ১।১

এই -রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগৎ কোথা হইতে আসিল? তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ইহা মায়ারচিত। মায়া কোথায় অধিষ্ঠিত? সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মই অনির্বচনীয়া মায়ার অধিষ্ঠান। তাই ব্রহ্মের ধ্যান এবং উপাসনাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা।

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতেই পুনরায় বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ যিনি প্রপঞ্চ-বিরহিত, সেই পরমতত্ত্বকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ মোক্ষপদ লাভ করেন; 'পুরুষোত্তম'-নামে অভিহিত নিত্য নির্মল নিশ্চল অন্তর্যামী সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকে আমি বন্দনা করি।

সর্বদা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, নির্লিপ্ত, তর্কের অতীত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর আদি মধ্য অন্ত আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সকলের নিকট প্রকাশিত হউন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা,—ভক্তের হৃদয়ে তিনিই ভগবান্, তাঁহাকেই আমরা বন্দনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে

'এক পৃথিবী'র অভিমুখে

'পৃথিবী এক, না দুই, না বহু?'—এ প্রশ্ন উঠিয়াছে আজ নয়; বিভিন্ন সময় এ প্রশ্ন বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, এবং যুগভেদে নানাবিধ উত্তরও পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ঊর্ধ্বলোক অধোলোক—শুধু পৃথিবীকে নয়, মানুষকে—মানুষের মনকে বিভক্ত করিয়াছে। দেবতা-অসুর, আর্য-ম্লেচ্ছ, ইহুদী-জেণ্টাইল, ক্রিশ্চান-হিদেন, মুসলিম-কাফের—প্রভৃতি দ্বন্দ্বাত্মক নামের মাধ্যমে 'আমরা ও তোমরা'—এই সহজ সর্বনামই বিচিত্র নামে শ্রুত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে এই 'আমরা ও তোমরা'ই আবার নূতন নূতন রূপে দেখা দিয়াছে, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, আধ্যাত্মিক (চেতনবাদী) ও জড়বাদী, ধর্মে বিশ্বাসী ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী। সম্প্রতি আবার এই বিভেদ ও বিভাগ আর এক নূতন আকারে দেখা দিয়াছে, এখানেও পৃথিবী যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছে; স্বাধীনতাপন্থী গণতন্ত্র ও একনায়কপন্থী সাম্যবাদী। প্রথমটিকে বলা হয়, 'মুক্ত পৃথিবী'; দ্বিতীয়টি যবনিকার অন্তরালে।

এ সকল বিভেদের মূল রহস্যের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া দেখি, যখন যে দেশ বা মনুষ্যগোষ্ঠী কি ধর্ম- ও কৃষ্টি-ব্যাপারে, কি রাজনীতিক ও ঐহিক ব্যাপারে উন্নত হইয়াছে, তখনই তাহারা অপরাপর দুর্বল অনুন্নত প্রতিবেশীদের হীন ভাবিয়াছে, তাহাদের প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে—যেখানে সম্ভব হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনীতি ও সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাই মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এইখানেই প্রশ্নটি আর একরূপে প্রতিফলিত হয়: 'মানবজাতি—এক, না দুই, না বহু?' ভৌগোলিক পৃথিবী যদি বা এক হয়, তাহাকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তো এই মানুষ? এই মানুষকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতেছে কোন শক্তি?

সৃষ্টির মূল ঊর্ধ্বদিকে না অধোদিকে, বিরাট পরমাত্মা না ক্ষুদ্র পরমাণু? যে দিকেই হউক, যদি একটি মূল স্বীকার করি, তবে প্রশ্ন ওঠে: বিভেদ কোথা হইতে আসিল—কেন আসিল?

যদি বলি, সৃষ্টির মধ্যেই এই বৈপরীত্যের বীজ অন্তর্নিহিত, তাহা হইলে সৃষ্টির স্বরূপ হয়তো কিছুটা বর্ণিত হইল, কিন্তু প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর মিলিল কি?

যাহাই হউক সৃষ্টির মধ্যে বিপরীত-ধর্মী দুইটি শক্তির পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ—সংস্পর্শ ও সংঘাত নূতন সৃষ্টির সূচনা করে। ইহা সকল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য—জড়বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এমন কি সমাজবিজ্ঞানেও ইহা পরীক্ষিত।

এখানে আমাদের প্রশ্ন জড় মাটির পৃথিবীকে লইয়া তত নয়, যত পৃথিবীর মানুষকে লইয়া। এই মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইতেছে—প্রথমে ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠীতে, তারপর গোষ্ঠী হইতে জাতিতে, এখন যে যুগ আসিতেছে—তাহাতে জাতিকে মহাজাতিতে অথবা মানবকে বিশ্বমানবে পরিণত

হইতে হইবে। বিভিন্ন জাতির সহ-অবস্থান (co-existence) যদি সম্ভব না হয়, সহ-অবসান (co-extinction) তবে অনিবার্য।

পূর্ব পূর্ব যুগের অনেক বিভাগই আজ অচল হইয়া গিয়াছে। একদিন ছিল যখন সভ্যতার সোপানে অগ্রসর এক মানবশ্রেণী নিজেদিগকে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে অপরাপর জাতিদের স্থাপন করিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নামদুটি এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কলম্বাসের 'পশ্চিম ভারত' আবিষ্কারের পর, ম্যাগিল্যান ও ড্রেকের পৃথিবীর প্রদক্ষিণের পর হইতে মানুষ বুঝিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম নিতান্তই আপেক্ষিক! তথাপি বলিতে হয়, এই বিভাগের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত হইয়া গিয়াছে।

ইওরোপের তুলনায় এশিয়া প্রাচ্য; এশিয়ার তুলনায় ইওরোপ পাশ্চাত্ত্য। কিন্তু আমেরিকার আবির্ভাবের পর ভৌগোলিক দিক হইতে এই ধারণার আর কোন মূল্য থাকিতে পারে না। কারণ আমেরিকার তুলনায় ইওরোপ প্রাচ্য, এশিয়া পাশ্চাত্ত্য! এখন আমরা ভৌগোলিক অর্থ ত্যাগ করিয়া কথা দুটির রূঢ় অর্থে উপনীত হই! 'প্রাচ্য' অর্থে এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টিজাত আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস, 'পাশ্চাত্ত্য' অর্থে ইওরোপীয় কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সমাজ, যন্ত্রসভ্যতা, যুক্তিবাদ প্রভৃতি! প্রাচ্য প্রাচীন, পাশ্চাত্ত্য আধুনিক।

এই বিভাগও আজকাল আর চলিতেছে না। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সহিত পৃথিবীর সর্বত্র এক প্রকার সমতা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বিমানযোগে যাঁহারা বড় বড় রাজধানীর উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা বাহ্যতঃ কোথাও কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করেন না—এক ভাষার বিভিন্নতা ছাড়া। বাহ্য পণ্যদ্রব্য-গত সমতা সত্ত্বেও দেশে দেশে ভাব-গত বৈষম্য অস্বীকার করা যায় না।

যে কোন কারণেই হউক, এক-একটি দেশ বা জাতি এক-একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া জীবন ধারণ করে এবং সেই ভাবটির চরমে পৌঁছিবার চেষ্টা করে, সেই ভাবের সাধনাতেই সেই জাতির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। এই ভাব একেবারে ছাড়িয়া দিলে সেই জাতি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বিশ্বপরিকল্পনায় তাহার আর কোন অংশ থাকে না। তবে একটি জাতি যে একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়াই চলিবে, এমন কোন কথা নাই। তবে অন্য ভাবগুলি গৌণ, একটি হইবে মুখ্য! বিভিন্ন জাতি—কখন ব্যবসাক্ষেত্রে, কখন যুদ্ধক্ষেত্রে, সর্বশেষ উচ্চতর ভাবের ক্ষেত্রে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতেছে; পরস্পরকে আঘাত করিতেছে—একে অপরকে প্রভাবিত করিতেছে!

মানবেতিহাসের প্রথম বাণী 'চরৈবেতি', 'চল, চল'—এই গতির ছন্দই মানুষকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই, স্থাণু হইয়া যাইতে দেয় নাই। বিচরণশীলতাই বা পরিক্রমণের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আজ 'এক পৃথিবীর' প্রতি টানিয়া লইয়া যাইতেছে—কোন দেশের গণ্ডিতে, কোন জাতির গণ্ডিতে বা কোন ভাবের গণ্ডিতে তাহাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়; প্রত্যেকেই চাহিতেছে তাহার ভাব সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে, অনেকেই চাহিতেছে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠভাব একত্র করিয়া একটি মহত্তম ভাব সৃষ্টি করিতে। পণ্যদ্রব্যের মতো ভাবও দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়, এবং দেশ-বিদেশের ভাব আবার একদেশে ঘনীভূত হয়। পরবর্তী যুগে ঘনীভূত ভাব চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। ইতিহাসে বহুবার এই প্রকার ঘটিয়াছে।

পুরাকালে কখন চীন বা ভারত হইতে, কখন গ্রীস, মিশর, আরব বা পারস্য হইতে সেই সেই যুগের মূলভাব প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে ইওরোপ-আমেরিকাই এই ভাব প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। আমাদের দেখিতে হইবে, সেখানে আজ কোন্ ভাব ঘনীভূত হইতেছে—কারণ ভবিষ্যতে এই ভাবই সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করিবে। এই ভাবের মধ্যে যদি মূলগত কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে, তবে তাহা এখনই দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত; নতুবা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎই বিপন্ন। এখন আর কোন সমস্যা শুধুমাত্র একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অতি সত্বর তাহা সংক্রামিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ভাল ভাবও যেমন ছড়াইয়া পড়ে, মন্দ ভাবও সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে। মন্দগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ভাল ভাবগুলি কি ভাবে মানব মনে প্রোথিত করা যায়, তাহাই আজ চিন্তনীয়।

বর্তমান যুগে যে দুইটি আপাতবিরোধী শক্তি মানুষের উপর ক্রিয়া করিতেছে, সহজ ভাষায় তাহাদের নাম দেওয়া যায়—'বিজ্ঞান' ও 'ধর্ম'। বিজ্ঞান জড়বস্তুর বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি আয়ত্ত করিয়া নানাভাবে তাহা কাজে লাগাইতেছে, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব এ যুগের মানুষ কেন বিজ্ঞানের সমর্থক হইবে না?

অপর পক্ষে ধর্ম বলিয়া সাধারণ্যে যাহা পরিচিত, তাহা ইহজীবন অপেক্ষা পরজীবনকেই বড় করিয়া দেখে; 'ইহজীবনে দুঃখ-কষ্ট-ত্যাগ-তপস্যা কর, মৃত্যুর পর সুখে-স্বচ্ছন্দে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিতে পারিবে'—সাধারণ মানুষ 'ধর্ম' বলিতে তো এইরূপই একটা কিছু বুঝিয়া থাকে। এই ধর্মের প্রতি কোন বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী মানুষের মন আকৃষ্ট হইতে পারে না। ধর্মকে আজ যুক্তি ও অনুভূতির দৃঢ়-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রাজনীতিকদের পাঁচশালা হইতে পঁচিশ-শালা পরিকল্পনাতে পর্যন্ত মানুষ আজ বিশ্বাসী, তাহার জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করিতে বা পরিশ্রম করিতে রাজী। যদিও পঁচিশ বৎসর পরের ভবিষ্যৎ তথাকথিত বাস্তববাদীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহিরে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এ যুগের মানুষ অবিশ্বাসী নয়, ত্যাগতপস্যায় পরাঙ্মুখও নয়; মনের মতো উদ্দেশ্য হইলে মানুষ তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে পারে,—তুষার-শৃঙ্গে আরোহণ করাই হউক বা সাঁতারাইয়া সাগর-উপসাগর পার হওয়াই হউক। একটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কিছুর উপরেই আধুনিক মানুষের মোহ। সেই জন্যই জড়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির পারে যে মহাসত্য লুকাইয়া রহিয়াছে—তাহার সাধনায় সে আকৃষ্ট হইতেছে না; অথচ প্রকৃত সত্য যে প্রত্যক্ষ নহে, অপরোক্ষ—এটুকু বুঝিবার মতো ধৈর্য ও অবসর আজ মানুষের নাই।

যে কেহ যাহা কিছু আলোচনা করিতেছে, সে বলিবে, সত্যের সন্ধানে করিতেছি। প্রত্যেকেই মনে করে, সে সত্যের সাধক। ইতিহাসের গবেষক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নিরীক্ষক প্রত্যেকেই সত্যকে খুঁজিতেছেন? কিন্তু কি সেই চরম সত্য? কি তাহা লাভের উপায়?—এই প্রশ্নে সকলেই দিশাহারা!

প্রাচীনকালে এবং প্রাচ্যদেশে কিন্তু এরূপ

ছিল না, সে যুগে সেই মহান্ সাধকগণ যখন বুঝিয়াছিলেন, জীবনের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করিতে হয়, তখন তাঁহারা 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' বলিয়া বসিয়া গিয়াছিলেন—একাকীর সাধনায়। সত্য লাভের পথ সত্যই অতি সরল এবং সংকীর্ণ (narrow and straight)। প্রশস্ত রাজপথে নানাবিধ দ্রুতগামী যান চলাচল করিতে পারে, কিন্তু তুঙ্গশীর্ষে উঠিবার পথে পাশাপাশি দুজন যাওয়া যায় না, গতিও অতি ধীরে ধীরে।

মানুষ যদি মানুষ বলিয়াই পরিচিত থাকিতে চায়, তবে তাহাকে যুগে যুগে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। এ-যুগের সাধনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে; এ-যুগের সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও আমরা পাইয়াছি, কোন্ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই সংঘর্ষ-বহুল যুগের শান্তি, তাহাও বিঘোষিত হইয়াছে। আমরা কেহ শুনিয়াছি, কেহ শুনি নাই! বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সফলতায় আমরা অন্ধপ্রায়, যন্ত্রের ঘর্ঘর কোলাহলে আমরা বধিরপ্রায়। বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কারের ফলে আজ মানুষের শান্তি নাই, নিরাপত্তাও বিপন্ন। মানুষ আজ ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছে, আলাদিনের দৈত্য আজ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত, বিজ্ঞানের কল্পতরু আজ বিষফল প্রসব করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের চিন্তায় নূতন ধারা দেখা দিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী যান্ত্রিক বিজ্ঞানের (materialistic mechanistic science) স্থলে দেখা দিতেছে এক অতিবিজ্ঞান (metaphysics)। আজিকার চিন্তাশীল মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে এক নজরে দেখিতে চায় (Total view), সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে শুনিতে বা বলিতে চায়, সমগ্র বিশ্বজীবনের তথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক অখণ্ড দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়া বুঝিতে চায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারে নাই; অখণ্ড সত্যকে ধরিবার কোন শক্তিমান্ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই, এইখানেই আজ মানুষকে অপেক্ষা করিতে হইবে; হয় বিজ্ঞানের আরও উন্নতির জন্য, নতুবা পথ পরিবর্তনের জন্য। বিজ্ঞান দ্রুতগামী বিমান সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; সে আকাশজয় করিয়াছে, কিন্তু মনকে জয় করিতে পারে নাই; সে পরমাণু বিভাজন করিয়াছে, কিন্তু মনকে বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই;—এইখানেই বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।

তবে আশার কথা এই, এ-যুগের যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা বলিতে শুরু করিয়াছেন—Man is greater than machine, man is greater than mind even (মানুষ যন্ত্রের চেয়ে বড়, মানুষ মনের চেয়েও বড়)। সহস্র সংঘাত ও সংঘর্ষের পর এ-যুগের মানুষ আরও বুঝিয়াছে: কাহাকেও ঘৃণা করিয়া নয়, বর্জন করিয়া নয়, শুধুমাত্র সহন করিয়াও নয়, সর্বতোভাবে গ্রহণ (not merely tolerance, but acceptance) করিয়াই সত্যের পথে—শান্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পথই পথ, এই পথেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে! এ পথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর সামঞ্জস্যের পথ, এ পথ সশ্রদ্ধ বিনিময়ের পথ। এই পথেই আসিবে মানবজাতির ভাব-সমন্বয়, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে 'এক-পৃথিবী'।

চলার পথে

'যাত্রী'

তুমি কে এলে, ওগো ভয়ঙ্করা, ভয়হরা, ভীষণা,ভ্রুকুটি-ভঙ্গী-রঙ্গিনী ? তুমিও কি আমার মা ? এ কেমন মা ! তোমার সেই সুকোমল অঙ্ক কই ? কই সেই পীযূষস্তন্যদায়িনী শ্যামল শান্ত স্বরূপ ? কই সেই আপন সন্তানকে কোলে-জড়িয়ে রাখার মঙ্গলময় মোহন রূপ ? ক্রন্দন থামিয়ে সন্তানকে বুকের 'পরে আঁকড়ে ধরে রাখার সেই সুতীব্র ব্যগ্রতাই বা কই ? তোমায় দেখে কি সন্তান তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে তার জ্বালা মেটাতে চাইবে, মা ?

ওগো রক্তময়ী, কি সুতীব্র রক্তলেখাতেই না নিজেকে সাজিয়েছ ! তোমার লেলিহান জিহ্বায় রক্ত, তোমার উন্মুক্ত খর্পরে রক্ত, তোমার হস্তধৃত ছিন্নশির বেয়েও রক্ত ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ছে রক্তের ঝিলিক তোমার ঐ দীর্ঘায়ত আগুন-জাগানো চোখের ব্যঞ্জনায়। তোমার চরণ-দুটিতেও কেমন এক পিঙ্গল অলক্ত-রাগ লীলায়িত। তোমার সব কিছু ঘিরেই লোহিত প্রাণের ছোপ—যার মধ্যে স্বপ্ন-সঞ্চয়ের এতটুকুও গোপন আর্তি নেই। তাই ভাবি—তুমিও কি আমার মা !

অমাবস্যায় তোমার আবির্ভাব। দুর্গম, গহন-জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ও হত্যা-হননের আদিম অন্ধলোকে তোমার আগমন। বাহিরের দৃষ্টিতে তোমার ঐ ভয়াল রূপ কেমন এক ত্রাসের সঞ্চার করে। আবার মানসরূপে এর মধ্যেই অন্য আর এক আনন্দময় দ্যুতি উদ্ভাসিত হয়। এই বিরুদ্ধের, এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তোমার কি প্রয়োজনে, মা ? তুমি কি বোঝাতে চাও—সন্ধ্যা-সকাল, দিবস-রজনী, শীত-বসন্ত, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মিলন-রেখার মহাসত্যকে ? হয়তো তাই হবে। তাইতো তোমার নানা স্তোত্রে তোমার রূপবর্ণনার কত না চাতুরী ! আর তুমি কত রূপেই না সাধককে দেখা দাও। কখন কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, কখন বা ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, আবার কখন বগলা মাতঙ্গী কমলা !

হে অদৃষ্টস্বরূপা, কর্মফলদাত্রী, অজ্ঞানবিনাশিনী কালিকা, তুমি এস। এস, মা। এস, ওগো শরণদা, আমাদের মোহজাল ছিন্ন ক'রে দিতে এস। এস আমাদের জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ দূর ক'রে দিতে এস। মৃত্যুর বিরাট মুখব্যাদানের ভেতর আমরা তো প্রতিনিয়তই প্রবেশ করছি—আয়ুও নাশ হয়ে যাচ্ছে, যৌবনও হয়ে যাচ্ছে ক্ষয়িত। গত দিন আর ফিরবে না—এও জানি। আর চপলার মতো জীবনের এই ক্ষণিক দ্যুতি নিমেষেই মিলিয়ে যাবে। এই চেতনা যে মুহূর্তে পাই সেই মুহূর্তেই, ওগো উন্মাদিনী, তোমাকে আর ভয় করি না। ভয় করিনা তখন আর তোমার হস্তধৃত খড়্গাকে কিংবা রক্তঝরা মুণ্ডকে। জানি, বাসনার কালিমা অপনোদন করতেই তো তুমি হয়েছ মেঘবর্ণা, দিগম্বরা। তুমি ক্ষেমঙ্করী, তাই তো তোমার ঐ কলুষ-নাশিনী গভীর গহন বর্ণাঢ্য। শবরূপী শিবোপরি আরূঢ়া, ওগো মুক্তকেশী, ওগো জীব-দুঃখ-হারিণী, ওগো ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী, ওগো অদ্বিতীয়া, তুমি যে আমাদের মা, তুমি কি আমাদের কোলে তুলে না নিয়ে পারো ! আমরা এই মাতৃরূপ বুঝি না বলেই তোমার ঐ রূপ দেখে ভীত হই। কিন্তু সেই

রূপের আড়ালে যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে, তা বুঝি কই? শাস্ত্র-মত সংগ্রহ ক'রে বলি কই— যে তুমিই যথার্থ সংসার-ভয়-বিনাশিনী, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, নিত্যানন্দ-বিধায়িনী, শাস্ত্রার্থ-স্বরূপিণী; নিত্যলীলাময়ী, দয়াময়ী আমার মা! বুঝি কই যে তুমিই বরাভয়াকরা, সংসারের সারভূতা, অন্তর্যামিনী! বুঝি কই যে তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করেই মানব অনায়াসে সংসার-সাগর অতিক্রম ক'রে চলে যেতে পারে!

আর কি করেই বা বুঝব—তোমার ঐ অপার রূপ, তুমি বুঝিয়ে না দিলে? আমরা যে সদাই মিথ্যা-মোহদ্বারা পীড়িত, নিজ শরীরসুখেই সতত নিবিষ্ট। আমরা যে পরাধীন, নিদ্রা ও আলস্যে ব্যয়িত আমাদের জীবন। তাই তো বুঝতে পারি না যে তুমি শুধু এই পৃথিবীর নয়, ত্রিলোকেরও পাপ-রাশি নাশ করতে সমর্থা। পরমানন্দ-সম্ভোগে নিমগ্না তোমাকে ধ্যান করলে তুমি যে তোমার সচ্চিদানন্দ-শক্তি দিয়ে অতি মূঢ় ব্যক্তিরও জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ক'রে দিতে পারো—এ-টুকুও আমরা বুঝি না। তাইতো আজ পৃথিবী-জোড়া এত অবিশ্বাসের রাজত্ব, এত হানাহানি—এত শিবাদলের আম-মাংসলোলুপতার রেষারেষি—এই পৃথিবীব্যাপী মহাশ্মশানের এই বীভৎস রূপ তো আজ এই কারণেই।

হে মহাকালমোহিনী, তুমি আমাদের এই অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে দাও,— ব্যর্থতার তত্ত্ব দাও ভুলিয়ে, আমাদের ধৃষ্টতা ক্ষমা কর মা। হে সর্বজীবপালিকা, হে বিশ্বজীব-জননী, আমাদের এই পৃথিবী-শ্মশানে আবির্ভূতা হও। আবির্ভূতা হও আনন্দের ডালি নিয়ে আমাদের হৃদয়পদ্মে। আমাদের চেতনা দাও, চৈতন্য জাগাও। নিজ কৃপায় আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্না হও। ক্রন্দনাতুর আমরা আমাদের কোলে তুলে নিয়ে মাতৃস্তন্যদানে কান্না থামাও। আমাদের অন্তরের ষড়রিপু বলি দিয়ে তোমাকে পূজা করতে শেখাও। হে মাতঃ, এ পৃথিবী-পাত্র নিদারুণ বিষে ভরা। এখানে সহজ দাক্ষিণ্য নেই, আলোকের পরশ নেই। বিশ্ব-প্রাঙ্গণের পুতুলখেলায় আছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার নৃত্য। কবরের অন্ধকারে বাস ক'রে আমরা যে হাঁপিয়ে উঠেছি; হে দুঃখবিনাশিনী সন্তানদের প্রতি প্রসন্ন হও মা।

চল পথিক, আজ ঐ ভয়ঙ্করীর—তথা ক্ষেমঙ্করীর আবাহনে চল। চল ঐ আনন্দসত্তার মাধুর্যময়তায় হৃদয় মধু ক'রে নেবে চল। চল আর দেরী নয়, মাকে ডাকবে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

জাগ্রত দেবতা*

স্বামী বিবেকানন্দ

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে
সব হাতে তাঁরি কাজ
সব পায়ে তাঁরি চলা
তাঁরি দেহ তোমরা সবাই ;—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা

মহামহীয়ান যিনি, দান হ'তে দীন,
একাধারে কীট ও দেবতা যিনি,
পাপী পুণ্যবান,
দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান,—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

অতীত জীবনধারা নাই তাঁর মাঝে,
অথবা আগামী কোন জনম-মরণ,
নিয়ত ছিলাম মোরা তাঁহাতে বিলীন,
চিরকাল এক হ'য়ে রবো তাঁরি বুকে ;—
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

ওরে মূর্খদল !
জীবন্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব-কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিমা।

* 'The Living God' : ১৮৯৭, ৯ই জুলাই আলমোড়া হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত পত্রে একটি কবিতার অনুবাদ : শ্রীপ্রণব রঞ্জন ঘোষ।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

[নিবেদিতা-বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর রমা চৌধুরী

অতএব দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল—কি সেই কাজ? আমাদের সম্মুখে রয়েছে কি কর্তব্য কর্ম, সাধারণভাবে এক্ষেত্রেও নিবেদিতা সেই একই কথা বলছেন—তেজের কথা—সাহসভরে, দৃপ্তভাবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া, সকলকে মুক্তহস্তে স্বীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দান করার কথা। তিনি এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন তাঁর গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুন্দর তেজোদৃপ্ত বাণী উদ্ধৃত ক'রে—

Forgiveness, if weak and passive, is not good; fight is better. Forgive, when you can bring legions of angels to an easy victory.

অর্থাৎ যে ক্ষমা দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচায়ক, তাকে কোনক্রমেই ভাল বলা চলে না। তার চেয়ে সংগ্রাম শ্রেয়ঃ। যদি তোমার সহস্র দেবতাকে সহজেই জয় করবার শক্তি থাকে, তাহলেই কেবল তুমি ক্ষমা করতে অগ্রসর হয়ো।

সেজন্য ক্ষমাকে হ'তে হবে সবলের ক্ষমা, বীরের ক্ষমা, দুর্বলের নয়। এই ভাবে অন্তরের তেজ, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমাদের বর্তমান কর্তব্য-কর্মে অগ্রসর হ'তে হবে

এই কর্তব্য নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্থির ক'রে নিতে হবে, এই যুগের বিশেষ সমস্যার বিষয়। এই যুগের বিশেষ সমস্যা -- পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই যোগাযোগ বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেজন্য যোগাযোগ যখন আছেই, তখন তা সুষ্ঠুভাবে, শোভনভাবে, যথোপযুক্ত-ভাবে থাকাই তো কর্তব্য। এই কারণে বর্তমান যুগে কেবল স্বীয় স্বতন্ত্র স্থিতি নিয়েই ব্যস্ত থাকলে চলবে না; সেই সঙ্গে চিন্তা করতে হবে পরস্পরের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের কথাও। এই সম্বন্ধেরও আছে দুটি দিক—যা পূর্বেই বলা হয়েছে—গ্রহণ এবং দান; নিজেকে পূর্ণ করা, এবং অপরকেও পূর্ণ করা। সেজন্য একদিকে যেরূপ আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাকব না, ঠিক তেমনি অন্য দিকে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাও ক'রব না। সেজন্য একদিকে যেমন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার্য, ঠিক তেমনি অন্যদিকে অতি-বিশ্বজনীনতাও হাস্যকর। কারণ স্বভাবতই যিনি নিজেকে উন্নত করতে পারেন না, তিনি অপরকেও উন্নত করতে পারেন না; যিনি দেশকে ভালবাসেন না, তিনি বিদেশকেও ভালবাসতে পারেন না; যিনি নিজেকে ও নিজের দেশকে নিঃস্ব ব'লে মনে করেন, তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করবেন কি প্রকারে? সেজন্য যে-যুগে 'Inter-nationalism' বা 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' হয়ে উঠেছে প্রায় একটি মহাধর্মপর্যায়ভুক্ত, সে-যুগেও নিবেদিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতা-সহকারে বলছেন:

Only the tree that is firm-rooted in its own soil can offer us a perfect crown of leaf and blossom. ... Only the fully national can possibly contribute to the cosmo-national.

অর্থাৎ যে বৃক্ষটি তার নিজের ভূমিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, সেই কেবল আমাদের পত্র-পুষ্পের পূর্ণ শোভায় আনন্দদান করতে পারে। একই ভাবে, যিনি পূর্ণভাবে স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বদেশ-সেবক, তিনিই কেবল বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্ব-সেবক হ'তে পারেন।

এইভাবে Nationalism (জাতীয়তা)-কে Inter-nationalism (আন্তর্জাতিকতা) অথবা Cosmo-nationalism (বিশ্বজাতীয়তা)-র উপর স্থান দিয়েছেন ব'লে, নিবেদিতাকে কিন্তু কোনক্রমেই অনুদার অথবা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া ব'লে গ্রহণ করা চলবে না। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ ক'রে তিনি নির্ভয়ে বাহির হয়েছিলেন সেই চিরসত্যের সন্ধানে যা দেশকাল-পাত্রাতীত; যা কোন বিশেষ ধর্মে, কোন বিশেষ দর্শনে, কোন বিশেষ নীতিতত্ত্বেই কেবল আবদ্ধ হয়ে থাকে না; যা তার স্থির শাশ্বত গৌরবে চিরভাস্বর। কোন অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা তাঁকে সেদিন বাধা দান করতে পারেনি। অপরপক্ষে সত্য সর্বত্র বিরাজিত হলেও তার আভা বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ রঙে প্রতিফলিত হয়, যেমন একই শুভ্র সূর্যালোক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিভিন্ন সাতটি রঙে প্রকাশিত হয়। কোন্ সাধন-বলে কে জানে, সত্যের এই এক একটি রঙ ধরে যায় এক একটি চিত্তে কোন এক শুভ মুহূর্তে। তখন সত্যের সেই আধার—সেই দর্শন, সেই ধর্ম এবং সেই দেশ হয় সেই ব্যক্তির আত্মার আত্মীয়—তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার মহা-উত্তর, তাঁর জীবন-পিপাসার মহা-শান্তি, তাঁর মাতৃভূমি, সাধনক্ষেত্র, মোক্ষ-সোপান। তারপরে এই সবেরই ভিত্তিতে তিনি জগতে ভিত্তিলাভ করেন। নিবেদিতাও তাই করেছিলেন। এই হ'ল নিবেদিতার Nationalism-এর ভিত্তিতে Inter-nationalism অথবা Cosmo-nationalism-এর মর্ম-কথা। অসীম উত্তাল সংসার-সমুদ্রে আমরা ভেসে চলেছি অহরহ তৃণগুচ্ছ-সম আমাদের কি একদিন প্রয়োজন হয় না নোঙরের? নয়তো সমুদ্রে এই ভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে ভেসে বেড়ানোই তো আমাদের সার হবে, সেই অনন্তের সঙ্গে প্রকৃত যোগই বা আমাদের হবে কি ক'রে। যোগ হ'তে পারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্থিতির সঙ্গে স্থিতির, ভিত্তির সঙ্গে ভিত্তির—ব্যক্তিত্ববিহীন স্থিতিবিসর্জিত ভিত্তি-বিবর্জিত কারও সঙ্গে নয়। দেশের মধ্যেই আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, আমার সত্তা; জগতের মধ্যে তেমনি আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, আমার স্বদেশ-সত্তা। এর মধ্যে কূপমণ্ডূকতাই বা কোথায়, আর বদ্ধচিত্ততাই বা কোন্‌খানে?

বিশেষ ক'রে নিবেদিতা যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল নিঃসন্দেহে। কারণ সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মোহে দেশের যুব-সম্প্রদায় দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যেন হীনচক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন; এবং স্বদেশের সব কিছুই মন্দ, এবং বিদেশের সব কিছুই অনিন্দ্য, এই ভাবটিই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করেছিল। তেজস্বিনী নিবেদিতা এরূপ দুঃখকর, অপমান-জনক প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। সেজন্য বারংবার মুক্তকণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, বিনা-দ্বিধায় তিনি বলছেন:

And similarly, only the heart that responds perfectly to the claims of its immediate environment, only the character that fulfills to the utmost its stint of civic duty, only this heart and mind is capable of taking its place in the ranks of the truly cosmopolitan.

অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি যে-চিত্ত পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারে, সামাজিক কর্তব্য যে-চরিত্র পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারে—সেই চিত্ত ও মনই কেবল যাঁরা সত্যই আন্তর্জাতিক বা সর্বজনীন স্বভাব-সম্পন্ন, তাঁদের মধ্যে স্থানলাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা দুটি চরম—এবং সেজন্য ত্যাজ্য—মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। একটি হ'ল—অতি-উদারতা অথবা অতি-বিদেশপ্রেম, অপরটি হ'ল—অতি-সঙ্কীর্ণতা অথবা অতি-স্বদেশপ্রেম। দুটিই অবশ্য সমভাবে নিন্দনীয়, বর্জনীয় ও অসহনীয়। তা সত্ত্বেও প্রথমটি দ্বিতীয়টির অপেক্ষা অধিকতর মন্দ, যেহেতু তা আত্মসম্মানকে, জাতীয় সম্মানকে ব্যাহত করে; বিদেশের নিকট স্বদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করে; অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতাকে এক মহাবস্তুরূপে গ্রহণ করে। জগৎসভায় এরূপ নির্বোধ ব্যক্তির সম্মান ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক নয়, নিঃসন্দেহ। কারণ বিশ্ব-সম্পদ্‌ভাণ্ডারে যদি তাঁর দানযোগ্য কিছুই না থাকে, তা হ'লে তাঁর প্রয়োজনই বা কি, আর প্রকৃষ্টতাই বা কোথায়? অপর পক্ষে অতি-স্বদেশপ্রেমও সহস্রগুণে অধিক আত্মসম্মানজনক ও পৌরুষব্যঞ্জক হলেও সমভাবে নিরর্থক। নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের বলেছেন, 'Vulgar' অথবা অশিষ্ট বা অসভ্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের 'Provincial' অথবা সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণমনা এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে, 'Vulgar' হওয়া অপেক্ষা 'Provincial' হওয়া শ্রেয়ঃ। তা সত্ত্বেও Vulgarism ও Provincialism উভয়ই যখন সমভাবে কাম্য নয়, তখন দুটির মধ্যবর্তী একটি তৃতীয় পন্থা গ্রহণই বাঞ্ছনীয়।

এই মধ্যম-পন্থার প্রথম লক্ষণের বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হ'ল 'Nationalism'র ভিত্তিতে Inter-nationalism অথবা Cosmo-nationalism; অর্থাৎ প্রথমে স্বদেশকে ভালবেসে, স্বদেশকে উন্নত ক'রে, স্বদেশের সেবা ক'রে, পরে বিশ্বকে ভালবাসা, বিশ্বকে উন্নত করা, বিশ্বের সেবা করা।

দ্বিতীয় লক্ষণ হ'ল: স্বদেশের সমস্ত অতীতকে বিশ্বের সমস্ত বর্তমানের মধ্যে মিলিত ক'রে উপলব্ধি করা। তাঁর স্বভাবগত সরল ও সতেজ-ভাবে নিবেদিতা বলছেন:

What the time demands of us is that in us our whole past shall be made a part of the world's life. This is what is called the realisation of the national idea. But it must be realised everywhere in the world idea. (P. 17)

অর্থাৎ বর্তমান যুগের প্রয়োজন হ'ল, আমাদের সমগ্র অতীতকে বিশ্বের জীবনের অংশ ক'রে তোলা। একেই বলা হয়, জাতীয় ভাবধারার প্রকাশ। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয় ভাবধারাকে প্রকাশিত করতে হবে বিশ্বের ভাবধারার মধ্যে।

জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শকে এই ভাবে বিশ্বের ভাবধারা ও আদর্শের মধ্যে মূর্ত করার করার অর্থ কি? অর্থ হ'ল এই যে, যা নিবেদিতা বারংবার বলেও যেন শেষ ক'রে উঠতে পারছেন না— স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও এক সর্বজনীন সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এই যে সর্বজনীন সত্তা, এই যে বিশ্বজীবন, এই যে সর্বব্যাপী চিত্ত, তা হ'ল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের ভাষায়, একটি Concrete Unity or Organic whole, অথবা একটি পরিপূর্ণ অংশী, যে-স্থলে অংশসমূহ অংশী এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিশ্ব এরূপ একটি সুন্দর অংশী অথবা সমগ্র সত্তা, যার মধ্যে প্রত্যেক অংশই স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য অথবা

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সেই অংশী অথবা সমগ্র সত্তার সমগ্র জীবনকে স্পন্দিত করছে, লীলায়িত করছে তার সৌন্দর্যকে, উচ্ছলিত করছে তার মাধুর্যকে, উদ্বেলিত করছে তার ঐশ্বর্যকে। কি অপূর্ব এই অংশী-অংশের সম্বন্ধ, কি অনুপম এই দান-প্রতিদান, কি অতুলনীয় এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। উচ্চ-নীচ, অধিক-অল্প, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ, আশ্রয়-আশ্রিত, আধার-আধেয়ের সম্পর্ক এ নয়—এ সম্পর্ক সমপদস্থ সমগৌরববিমণ্ডিত সমশক্তিমান্ বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক। সংসারের চতুর্দিকেই একবার চোখ মেলে, প্রাণ খুলে, মন ঢেলে তাকিয়ে দেখুন - দেখবেন সেই একই লীলা—একের সঙ্গে দুয়ের, দুয়ের সঙ্গে বহুর সেই একই প্রীতির লীলা, উচ্চ-নীচ ভেদহীন, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ, সমপদস্থ প্রীতির লীলা। দেখুন, নববসন্তের আগমনে বৃক্ষের শাখায় শাখায় অজস্র মঞ্জরী ধরেছে। সেই সমস্ত বৃক্ষের প্রাণের রস প্রকাশ করবার জন্যই তো তাদের এ শুভাবির্ভাব—তাদের তুচ্ছ বলবে কে, কারণ তাদের একটি মুকুল ঝরে পড়লেও সমগ্র বৃক্ষটির দিক থেকে হবে অপরিসীম অনিষ্ট। দেখুন, সাগরে ঊর্মিমালার মধ্যে নৃত্য করছে অসংখ্য ঊর্মি, প্রত্যেকেরই নৃত্যের ঝঙ্কারে পূর্ণ হয়ে উঠছে সাগরের মন্দ্র-গীতধ্বনি। একটি ঊর্মিও যদি অকস্মাৎ নৃত্যে বিরতি দেয়, সমগ্র সাগরেরই কলনৃত্য হয়ে যাবে শেষ মুহূর্ত মধ্যেই, তার অনন্ত সুষম ছন্দের তাল যাবে কেটে। দেখুন, দিগন্তব্যাপী আকাশপটে কত মেঘের সমারোহ, কত রঙের সমাবেশ, কত গ্রহ-নক্ষত্রের সম্ভার, কিন্তু কি একটি একক সমগ্র চিত্র—কে তাতে উচ্চ, কে তাতে নীচ—সকলেরই দান সমান, গৌরব সমান, প্রয়োজনীয়তা সমান। এই তো হ'ল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক রূপ, প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, অন্তর্নিহিত সত্য। সেইজন্যই ইওরোপীয় দর্শনে বিশ্বকে বলা হয় 'Cosmos, not a chaos'—একটি সুশৃঙ্খল সমগ্র সত্তা, বিশৃঙ্খল বস্তুসমাবেশ নয়।

বিশ্ব-সংস্কৃতির রূপটিও এই। বহু রূপ, বহু রস, বহু শব্দ, বহু স্পর্শ, বহু গন্ধ সম্মেলনে গঠিত যেমন এই সুন্দরী ধরণী, ঠিক তেমনি বহু জ্ঞান, বহু ভক্তি, বহু কর্ম, বহু চিন্তা, বহু কবিতা, বহু গীতি, বহু প্রীতি, বহু মৈত্রী, বহু শান্তি দিয়ে রচিত তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার সম্পদ্। এরূপে সর্বত্রই তো সেই একই নিয়ম—বহুর মিলনে এক, একের প্রকাশে বহু। এই মূলীভূত তত্ত্বটিকে স্মরণে রেখে তবেই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হ'তে।

সুতরাং এই রীতি অনুসারে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের পদ্ধতি হ'ল, যা নিবেদিতা বারংবার বলেছেন—নিজেকে বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বকে নিজের মধ্যে সাদরে, সানন্দে, সগৌরবে স্থাপন করা। প্রথমটির অর্থ হ'ল—নিজের সম্পদ্ অপরকে দান; দ্বিতীয়টির অর্থ হ'ল—অপরের সম্পদ্ নিজে গ্রহণ। বারংবার তো সেই একই কথা এসে পড়ছে—দান প্রতিদান, অর্পণ-গ্রহণ, স্বতন্ত্রতা-সম্পুষ্ট সর্বজনীনতা —সর্বজনীনতা-সমাশ্রিত স্বতন্ত্রতা।

নিবেদিতাও বারংবার এই মহাতত্ত্বেরই উল্লেখ ক'রে বলছেন :

> Cosmo-nationality of thought and conduct, then, is not easy for any man to reach, only through a perfect realisation of his own nationality can any one anywhere win to it And, Cosmo-nationality consists in holding the local-idea in the world-idea. (P.17)

অর্থাৎ এরূপে চিন্তা ও কার্যের সর্বজনীনতা লাভ করা কারও পক্ষেই সহজ নয়। কেবল-

মাত্র পরিপূর্ণ জাতীয়তা-ভাব লাভ করতে পারলেই বিশ্বজনীন ভাব লাভ করা সম্ভবপর হয়। এবং এই আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্বজনীন ভাবের অর্থ হ'ল: আন্তর্জাতিক ভাবধারার মধ্যে জাতীয় ভাবধারাকে ধারণ করা।

কিন্তু এই ভাবে আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্বজনীনতার কথা বললেও নিবেদিতার প্রাণ পড়ে ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই চিরকাল। শেষ পর্যন্ত সেজন্য তিনি ব'লে যাচ্ছেন:

In order to attain a larger power of giving, we may break through any barrier of custom. But it is written inexorably in the very nature of things that, if we sacrifice custom merely for some mean or selfish motive, fine men and women everywhere will refuse to admit us to their fellowship. (P. 17)

অর্থাৎ যাতে আমরা অধিকতর দানশক্তি লাভ করতে পারি, সেজন্য আমরা প্রচলিত রীতি-নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করতে পারি নিশ্চয়ই। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এ কথাও সত্য যে, যদি আমরা কোন হীন বা স্বার্থপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি বর্জন করি, তা হ'লে সর্বত্রই ভাল লোকেরা আমাদের তাঁদের বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে অস্বীকার করবেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, নিবেদিতা ভারতীয়-সমাজে 'Custom' বা পূর্বপ্রচলিত অনড় অচল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যে পুনরায় এস্থলে বলছেন, অকারণে স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে 'Custom' বর্জন করবে না—সে-কথা স্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়। তার কারণ দুটি। একটি হ'ল যে, 'Custom'মাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কারণ প্রাচীন রীতি-নীতির মধ্যেও তারতম্য আছে; কোন-কোনটা ভাল, কোন-কোনটা দেশাচার-ক্রমে মন্দ, ইত্যাদি ভেদ আছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, উপরেই যা বলা হ'ল, নিবেদিতার স্বদেশপ্রেম, আত্মসম্মানজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব এরূপ প্রখর ছিল যে, তিনি কোনক্রমেই যেন দেশকে মন্দ ব'লে ভাবতেই পারতেন না—ভাল-মন্দ সব কিছু জড়িয়ে দেশ তো একমাত্র দেশই, আমাদের প্রাণের দেশ, আমাদের অতি আদরের দেশ, আমাদের চিরস্বপ্ন, চিরকল্পনা, চিরসাধনার ধন দেশ। তার সব কিছুই তো আমার, আমারই নিজের, আমারই পাপপুণ্যের ফল। দেশই তো আমি, আমিই তো দেশ। সুতরাং তার কোন কিছুকেই 'আমার নয়' ব'লে অস্বীকার করা যাবে না, যেরূপ কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না নিজের জীবনকে, নিজের সত্তাকে, নিজের আত্মাকে। নিবেদিতা-চরিত্রের দুটি মূলীভূত সত্য হ'ল—তেজস্বিতা এবং স্বদেশপ্রীতি। সেজন্য তিনি চিরকাল ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য তার কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুরীতি-নীতির বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করলেও দেশের সংস্কার-প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন, এবং অকারণ বিদেশীর অনুকরণ ও পদলেহন ছিল তাঁর দুই চক্ষুর বিষ।

এই ভাবে নিবেদিতা বলছেন, বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল জাতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যে সগৌরবে স্থাপন করা। সেজন্য আজ আমাদের বিশ্বের ভাব-ধারা, চিন্তা-প্রবাহ, আকৃতি ও প্রাপ্তির বিষয়ে সর্বপ্রথম জানতে হবে পরিপূর্ণভাবে, শ্রদ্ধা-সহকারে, বিনয়-ভরে। সেই দিক থেকে আমাদের আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি-পাত করতে হবে। বস্তুতঃ বিশ্বসংস্কৃতির বিষয় জানতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে

বাহিরের জ্ঞানমাত্রই নয়, অন্তরের সহানুভূতি, সাক্ষাৎ উপলব্ধি। দূরদর্শী নিবেদিতা সেজন্য পূর্বাহ্ণেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলছেন:

It is well-known that culture is a matter of sympathy, rather than of information. It would follow that the cultivation of the sense of humanity as a whole is the essential feature of a modern education. (P. 17)

অর্থাৎ একথা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতি জানবার মূল উপায় হ'ল সহানুভূতি, কেবল বাহিরের সংবাদ আহরণ-মাত্রই নয়। সেজন্য আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হ'ল 'Sense of Humanity' অথবা বিশ্বাত্মবাদের অনুশীলন করা।

কি মধুর, কি গভীর, কি বিরাট এই দুটি শব্দ 'Sense of Humanity'—এ হ'ল 'Sense' বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অথবা অনুভূতি। এইভাবে বিশ্বকে আজ কেবল মস্তিষ্কে নয়, কেবল জ্ঞানের ভারাক্রান্ত বদ্ধ গৃহে নয়, কিন্তু হৃদয়ে, সুধাসিক্ত অন্তরের উন্মুক্ত অঙ্গনে সাদরে সানন্দে স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য কি? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বিশ্বকে জানতে হ'লে কেবল ভূগোল-জ্ঞানই যথেষ্ট। কিন্তু নিবেদিতার মতে ভূগোলের ন্যায় ইতিহাসও সমভাবে প্রয়োজন। ভূগোল দিতে পারে কেবল বিশ্বের দেহের সংবাদ, কিন্তু তার প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে তার ইতিহাসেই কেবল; তার আশা-নিরাশা, উন্নতি-অবনতি, সাফল্য-অসাফল্য, তার পুঞ্জীভূত ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, ঐশ্বর্য প্রভৃতির চিত্র আর অন্য কোথায় পাওয়া যাবে?

এই ভাবে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে 'Comparative Study' অথবা তুলনামূলক অধ্যয়ন একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। যেমন প্রাণিতত্ত্ব-শিক্ষাকালে কুকুরকে কুকুর, গাভীকে গাভীরূপে জানলেই তো আজ আমাদের চলে না—আমাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে তাদের প্রকৃত পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বহু তত্ত্বও একই সঙ্গে।

শিল্প ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কথা প্রযোজ্য। এই সব ক্ষেত্রেও তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বিচার বর্তমানে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। নিবেদিতা সর্বদাই সাহিত্য ও শিল্পকে সম-মর্যাদা দান করতেন। তখনও আমাদের দেশে শিল্পের সমাদর পূর্ণভাবে হয়নি; কিন্তু নিবেদিতা শিল্পোন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, সাহিত্য ও শিল্প উভয়ই তো মানবজীবনের চিত্র। সেজন্য শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনও সমধিক; এবং সাহিত্যিকের ন্যায় শিল্পীও দেশকে অমর ক'রে রাখেন তাঁদের অমূল্য সৃষ্টিতে।

এই ভাবে বিশ্বকে সুষ্ঠুভাবে জানবার জন্য একদিক থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রব নিশ্চয়ই। অন্যদিক থেকে দেশকে জানবার জন্যও আমাদের সমভাবে প্রাণপণ ক'রে চেষ্টা করতে হবে। হয়তো মনে হ'তে পারে যে, দেশকে জানবার জন্য কোন বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন আমাদের নেই, কারণ দেশ তো আমাদের নিজেদেরই, আমাদের সম্মুখেই প্রসারিত, আমাদের চতুষ্পার্শ্বেই বিস্তৃত, আমাদের করতলগত ও আয়ত্তাধীন। সুতরাং সেই দেশকেই জানবার জন্য এরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন হবে কেন পুনরায়?

কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে, একটি পরাধীন জাতির পক্ষে দেশকে জানা বিদেশকে জানা অপেক্ষা শতগুণ কঠিনতর। কারণ স্বভাবতই বিদেশী

শাসকগণ নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাবধারা, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিজিতগণের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন এবং দেশীয় সংস্কৃতিকে অবহেলা করেন। সেজন্য পরাধীন জাতির বালক-বালিকারা শিশুকাল থেকেই হয় দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায় অথবা মন্দ ধারণা পায়। ভারতবর্ষেও তো ঠিক তাই হয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ অসুবিধা হ'ল এই যে, অতি প্রাচীন এই দেশ, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ঐশ্বর্য, ভাবধারা-রীতিনীতির সঙ্গে যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বর্তমান যুগের কোনরূপ সম্বন্ধই নেই।

সেজন্যই দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিবেদিত-প্রাণ নিবেদিতা বিদেশকে জানা অপেক্ষা স্বদেশকে জানার দিকেই বারংবার অধিক জোর দিয়েছেন। বস্তুতঃ যা পূর্বেই বলা হয়েছে—সেই সময়ে ভারতবর্ষের যা অবস্থা ছিল, তাতে বরং বিদেশকে জানা সহজতর ছিল স্বদেশকে জানা অপেক্ষা।

এই কারণে 'আমাদের সম্মুখের কর্তব্য কর্ম কি?' —এই যে প্রশ্ন নিয়ে নিবেদিতা আরম্ভ করেছিলেন, তার উত্তর তিনি এখন সব মিলিয়ে দিচ্ছেন, পূর্বের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে, তাঁর পরমপ্রিয় বিষয়েরই বারংবার উল্লেখ ক'রে। তিনি সক্ষোভে বলছেন যে, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে বহু 'ফাঁক'—শূন্যস্থান আজও রয়ে গিয়েছে। যেমন প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের অজ্ঞতা আজও গগনস্পর্শী। একই ভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানও বিদেশীদের অতি অল্প। তার কারণ হ'ল এই :

The Indian Mind has not reacted out to conquer and possess its own land as its own undeniable share and trust in the world as a whole. It has been content even in things modern, to take obediently whatever was given to it. (P. 19)

অর্থাৎ আজ পর্যন্ত ভারতীয় মন জয় করতে পারার মতো শক্তি অর্জন করেনি; বিশ্বের দরবারে তার ন্যায্য দাবি-দাওয়াও সে পেশ করতে পারেনি। এমন কি আধুনিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও সন্তুষ্টভাবে যা কিছু তাকে দেওয়া হয়েছে, তাই সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু নিরাশার কোনও কারণ নেই। কারণ আমাদের লক্ষ্য তো আমরা পূর্বেই স্থির ক'রে নিয়েছি—'Aggression'—আক্রমণ। পুনরায় শুনুন নিবেদিতার তেজোদৃপ্ত বাণী :

But to-day, in the deliberate adoption of an aggressive policy, we have put all this behind. ...Our part henceforth is active and not passive. ...We accept no more programmes. Henceforth, we become the makers of programmes. We obey no more policies. Henceforth, do we create policies.

— আজ থেকে যখন আমরা স্বেচ্ছায় একটি আক্রমণশীল পন্থা অবলম্বন করেছি, তখন সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংসার যে যুদ্ধ—এই মহাতত্ত্ব যখন আমরা গ্রহণ করেছি, তখন যারা আমাদের বিরুদ্ধে বাধা-রূপে বিরাজ করছে, তাদের যুদ্ধে পরাজিত করাও আমাদের অবশ্য-কর্তব্য কর্ম। এইভাবে বিশ্ব-সংস্কৃতিতে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়—স্মরণ রেখো—শুধু গ্রহণ নয়, দান। এইভাবে আমরা এখন সক্রিয় হবো, নিষ্ক্রিয় নয়। 'এইভাবে, ভারতে ভারতীয়ত্ব আনতে, আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ করতে, আমাদের যাত্রাপথ স্থির করতে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর নির্ভর ক'রব, অপরের উপর নয়। এইভাবে আমরা অন্যদের দ্বারা কৃত কার্যপন্থা আর গ্রহণ ক'রব না, নিজেরাই সেই পন্থা স্থির ক'রব। আমরা অন্যদের দ্বারা

উদ্ভাবিত নিয়ম-কানুন আর পালন ক'রব না, নিজেরাই নিয়ম-কানুন স্থির ক'রব। আমরা নিজেদের জ্ঞানের দিক থেকে মুক্ত ব'লে বিধান দেব।'

ভগিনী নিবেদিতার অন্তরের অন্তঃস্থলে এই 'Aggressive Policy'র আকৃতি যে কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল, কত শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি বারংবার ছত্র-ছত্র পরে-পরেই এর উল্লেখ করেছেন। সেজন্য পুনরুক্তি-দোষের ভয় ছেড়েও আমরাও বারংবার তাই করেছি, তিনি আক্রমণশীলতার প্রতি কি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা বোঝবার জন্য। [ক্রমশঃ]

ভর্তৃহরি থেকে

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিজনে দয়া-ভাব,
অনুগত আত্মীয়-স্বজনে,
দুর্জনের সাথে শাঠ্য,
আর প্রীতি সদাশয়-সনে,
রাজনীতি নৃপ-সাথে,
পণ্ডিতের সঙ্গে নম্র নতি,
শত্রু-সাথে শৌর্য রাখা,
সহিষ্ণুতা গুরুজন প্রতি,
যুবভাব নারী-সঙ্গে,—
এই সব বিবিধ কৌশল
যে-জন আয়ত্তে রাখে,
জীবনে সে সম্যক্ সফল।

*

সুরসিক কবিগণ সর্বজয়ী
সুকৃতির ফলে :
তাঁদের যশের গতি জরা-মৃত্যু-
ভয়ে নাহি টলে।

সাধুসঙ্গ ফলবান,
মূর্খতার গ্লানি করে নাশ,
চিন্তা-মাঝে এনে দেয়
সত্য-দীপ্ত বাণীর প্রকাশ।
পাপ-বোধ অহংকার
দূর ক'রে প্রগতির পথ
সর্বদা উন্মুক্ত রাখে,
এনে দেয় আকাঙ্ক্ষা মহৎ।

*

উঞ্ছজনের বিঘ্ন-ভয়ে
মহৎ-কর্মে বিমুখ বহু লোক,
অনেকে হায় মহৎ পথে
বাধা পেলেই হঠাৎ থেমে যায়,
অসাধারণ তারাই, যারা
হাজার বিপদ তুচ্ছ ক'রে ধায়
লক্ষ্য পানে অবিরত,
সরণী সে যতই ভয়াল হোক।

সূক্ষ্মশরীর

স্বামী সুন্দরানন্দ

সামান্য সন্ধান করিলেই জানা যায় যে, দৃশ্যমান স্থূলদেহমাত্রেরই কারণরূপে উহার অভ্যন্তরে অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান। জরায়ুজ, স্বেদজ ও অণ্ডজ জীবদেহের জন্ম হয় অতি সূক্ষ্ম অণুপরিমিত প্রাণবান্ ভ্রূণ (embryo) হইতে এবং উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদির জন্মের কারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুর বা বীজ। সকল ক্ষেত্রে সূক্ষ্মই অনুকূল অবস্থাধীনে স্থূলে পরিণত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ। সূক্ষ্মশরীরমাত্রেরই পশ্চাতে আবার কারণ-শরীর আছে, এবং 'সর্বকারণকারণানাং' ব্রহ্মই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ—সকলেরই কারণ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-মতে অন্নের পরিণাম পাঞ্চভৌতিক দেহ। ইহা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়- ও পঞ্চবায়ু-সমবায়ে গঠিত অন্নময়-কোষ নামে অভিহিত। এই কোষই দৃশ্যমান স্থূলশরীর। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময়-কোষ হইতে স্বতন্ত্র অথচ তদভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইয়া মনের প্রাধান্যবশতঃ মনোময়-কোষ নামে বর্ণিত। এই কোষ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও ইহার অভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ বুদ্ধির সমবায়ে নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানময়-কোষ বিরাজিত। বিজ্ঞানবাহুল্য এবং আত্মার আবরকত্বপ্রযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই নামটি প্রদত্ত। এই প্রাণময় বিজ্ঞানময় ও মনোময়-কোষের সম্মিলনে সূক্ষ্মশরীর গঠিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহাই অষ্টপাশাবদ্ধ জীবাত্মা।

এই কোষচতুষ্টয় তরবারির স্থূল খাপের ভিতরে সূক্ষ্মতর ও তদভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম খাপের ন্যায় অবস্থিত। সর্বসাক্ষী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সকলের ভিতরে বর্তমান এবং তাঁহার অধিষ্ঠান-বশতই কোষগুলিও প্রাণবান্ ও ক্রিয়াশীল। সূক্ষ্মশরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অনুমাপক বলিয়া 'লিঙ্গশরীর' নামে বেদান্তে বর্ণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে; তখন অন্নময়-কোষে মন থাকে। তার পর সূক্ষ্মশরীর—লিঙ্গশরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময়-কোষে মন যায়। এর পর কারণ-শরীর। যখন মন কারণ-শরীরে যায়, তখন আনন্দ, আনন্দময়-কোষে মন আসে। এইটি চৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। এর পর মন লীন হয়ে যায়; মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা। অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জানো? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্তরে এস কপাট বন্ধ ক'রে। অন্দর-বাড়ীতে যে-সে যেতে পারে না। আমি দীপশিখাকে শিরে আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সবের ভিতরে কাল খড়কের মতো ভাগটাকে বলতুম কারণ-শরীর।

অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: এই কারণের উপরে আছে মহাকারণ (তুরীয়)। তাঁহার স্বরূপ বাক্যমনাতীত। এই মহাকারণই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—সকলের উৎস। স্থূলশরীরের জীব-কোষগুলিও সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুই প্রকার: হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীর এবং তৈজস ব্যষ্টি-সূক্ষ্মশরীরের অধিষ্ঠান। উভয়ের

প্রভেদ কেবল উপাধিগত ; প্রকৃতপক্ষে বন ও বৃক্ষের ন্যায় উভয়ে এক ও অভেদ।

বেদান্তমতে অক্ষর-ব্রহ্মের মায়াশ্রিত সংকল্প হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত এবং তাহা হইতে পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র উপনিষৎ সমস্বরে বলেন যে, সৃষ্টির পূর্বে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অক্ষরব্রহ্মমাত্র ছিলেন ; তিনিই মায়াশ্রয়ে সংকল্প করিয়া বহু হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ঘোষণা করেন : 'অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ'—আত্মা (ব্রহ্ম) মায়াশ্রিত অনীশ্বর জীবরূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন হেতু অর্থাৎ বিশ্বকে ভোগ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং জীবে জীবে অধিষ্ঠিত দেহেন্দ্রিয়মন ইত্যাদি যুক্ত কর্মফলভোক্তা জীবাত্মা সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই জীবোপাধিক পরিচ্ছিন্ন রূপ।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন : এই জীবাত্মা 'প্রাণশরীরনেতা মনোময়ঃ'—মনোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা বা পরিচালক। কঠোপনিষৎ-মতে ইনিই 'অশরীরং শরীরেষু'—বিভিন্ন স্থূলশরীরে অতি সূক্ষ্ম এক অনির্বচনীয় অশরীরী-রূপে এবং অনিত্য দেহে এক অত্যাশ্চর্য নিত্যসত্তারূপে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—সকল জীবের হৃদয়ে অতি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। উপনিষৎ ঘোষণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলেও 'কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ'—ভোক্তৃত্ব চরিতার্থের জন্য সূক্ষ্মশরীরস্থ কর্মফলভোগী পুরুষ (জীবাত্মা) অভিপ্রেত ভোগ্যবিষয়সমূহ নির্মাণ করিয়া সর্বদা জাগ্রত থাকেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন : 'নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ'—পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নয়টি দ্বারযুক্ত (চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্য) দেহপুরে অবস্থান করিয়া বাহ্য ভোগ্যবিষয়-গ্রহণে সচেষ্ট।

গীতা বলেন, 'দেহাধিপতি জীবাত্মা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রূপ-শব্দাদি পঞ্চবিষয় মনের সাহায্যে ভোগ করেন।' সূক্ষ্মশরীরের অধিপতি জীবাত্মা তাঁহার ভোগের প্রেরণাতেই স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়ে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বেদান্তে ব্যষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্য স্থূলভোগের কর্তা বাহ্য আত্মা বা 'বিশ্ব' এবং ব্যষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্য সূক্ষ্মভোগের কর্তা অন্তরাত্মা বা 'তৈজস' নামে পরিচিত। স্বপ্নকালে তৈজস অভিব্যক্ত। এইরূপে সমষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী চৈতন্যকে 'বৈশ্বানর' এবং সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্যকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। সূক্ষ্মশরীর যেন ভোক্তা জীবাত্মার অন্তর্বাস এবং স্থূলশরীর যেন তাঁহার বহির্বাস।

মহারাজ যেমন সুরম্য প্রাসাদে বাস করিয়া বহু ভৃত্যদ্বারা সযত্নে সেবিত হইয়া নানাবিধ বিষয় ভোগ করেন, ভোক্তা জীবাত্মাও সেইরূপ সূক্ষ্মশরীররূপে রমণীয় প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পঞ্চপ্রাণ দশেন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধি—এই সপ্তদশ অপঞ্চীকৃত অতি সূক্ষ্ম অবয়বধারী ভৃত্যকর্তৃক সসম্মানে সেবিত হইয়া সূক্ষ্মবিষয়সমূহ ভোগ করিতেছেন। ইহাতে মনের অত্যন্ত প্রাধান্য বিদ্যমান। দেখা যায়—গৃহস্বামীর ভোগের জন্যই গৃহাদি নির্মিত। দেহরূপ গৃহের স্বামী জীবাত্মার ভোগের উদ্দেশ্যে তাঁহারই নির্দেশে দেহেন্দ্রিয়ের সকল কর্ম পরিচালিত না হইলে উহাদের সংহতি সম্ভব হইত না এবং কার্যসমূহও নিরর্থক ও বিশৃংখল হইত। এই ভাবটি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে কঠোপনিষৎ দেহকে রথ, জীবাত্মাকে রথী, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব,

বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম ও ভোগ্য বিষয়সমূহকে রথের গমনপথ বলিয়া মনোমুগ্ধকর কবিত্বের ভাষায় এই জটিল বিষয়টি পরিবেশন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন যে, সর্বেন্দ্রিয়পথে যে ভোগ আহৃত হয়, মনই সেই ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। কেবল ইহজন্মে নহে, পরন্তু জন্মজন্মান্তর যাবৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে মনরূপ অপার অসীম মহাসমুদ্রে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অনন্ত বিষয়-ভোগের যে সংখ্যাতীত বৃত্তিতরঙ্গ উঠিতেছে, উহাদের এবং অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের পরিকল্পনারূপ অগণন বৃত্তি-তরঙ্গ ও উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রগুলিও মনে যে অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত আছে, ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। ইহাদের অধিকাংশ অতীত বৃত্তিই মনের অচেতন ও অবচেতন জ্ঞানস্তরে লুক্কায়িত। এইজন্য মনের এই দুইটি স্তর সুবিশাল এবং ইহাদের শক্তি ও সম্ভাবনা অপরিমেয় এবং অসীম। এই দুই স্তরের অনেক বৃত্তি সময়ে সময়ে অবস্থাধীনে চেতনস্তরে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বহুকালের বহুবিধ নিদ্রিত জ্ঞান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত সংস্কারে পরিণত হইয়া মনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছে।

মানসিক ও শারীরিক সর্ববিধ শক্তি মনেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মানব-জীবন মনের বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোটি কোটি পরস্পর-বিরোধী বৃত্তি আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়াও মন তথা সূক্ষ্মশরীররূপ অত্যাশ্চর্য দুর্ভেদ্য রাহস্যিক শক্তির প্রাসাদে সমবেত থাকিয়া সতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতে উন্মুখ। মন অনন্ত শক্তির আধার চেতনশক্তিসম্পন্ন অপঞ্চীকৃত অস্থূল অতিসূক্ষ্ম এক ভাবময় বাক্যমনাতীত রাহস্যিক সত্তা-বিশেষ বলিয়াই ইহাতে মহাসমুদ্রের ন্যায় সংখ্যাতীত বৃত্তি-তরঙ্গ এবং ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইতেছে। স্থূলদেহস্থ অচেতন জড় স্থূল স্নায়ুসমূহের পক্ষে মহাসমুদ্রের ন্যায় সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ মনোবৃত্তিতরঙ্গের প্রতিটির বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া উহাদিগকে একাধারে সমবেত রাখা এবং উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একেবারেই সম্ভব নহে।

বেদান্ত বলেন, 'কর্মানুরূপেণ গুণোদয়ো ভবেৎ, গুণানুরূপেণ মনঃপ্রবৃত্তিঃ'—বাহ্য ও আভ্যন্তর কারণজাত মনোবৃত্তি অনুসারে মনে গুণের আবির্ভাব হয় এবং ঐ মতে মনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, দশটি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে মানুষ যাহা কিছু করে, তাহাই কর্ম। তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্ম প্রারব্ধ, অতীত জীবনের কর্ম সঞ্চিত এবং যাহা কিছু সে করিতেছে, উহা ক্রিয়মাণ নামে অভিহিত।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ঈশ্বরে পরমানুরক্তি বা ভক্তি, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পরার্থ কর্ম, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অথবা কর্মফল ভোগ-দ্বারা কর্মের নাশ হয়। যে পর্যন্ত ঐ উপায়ে কর্মফল বিনষ্ট না হইবে, সে পর্যন্ত মনঃপ্রধান সূক্ষ্মশরীর তথা মনই উহার গুণানুযায়ী 'গতাগতিঃ পুনঃ পুনঃ'—বাধ্য হইয়া বারংবার দেহ পরিগ্রহ করে। গীতা বলেন, 'বায়ু যেরূপ গন্ধ বহন করে, শরীরান্তর-গ্রহণকালে জীবও সেইরূপ পূর্বদেহ হইতে মনাদি সঙ্গে লইয়া যায়।' অর্থাৎ পূর্বদেহের মনাদি সূক্ষ্মশরীর নূতন দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং বলা যায় যে, মনই একদেহ ত্যাগ করিয়া,

অপর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। মনের এইরূপ অসাধারণ কারণের জন্য প্রাচীন যুগের আচার্য শংকর এবং বর্তমান যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ মনকেই 'সূক্ষ্ম শরীর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাসনাশ্রিত মনই উহার ভোগ চরিতার্থের জন্য বারংবার দেহধারণ করে। মন তমঃ ও রজঃ গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সত্ত্বগুণময় হইলে বাসনানাশে অমনীভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মনের নাশ হইয়া থাকে। মনরূপ উপাধিনাশে দ্বৈতজ্ঞান চিরতরে চলিয়া যায়। 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' বলেন যে, মনোনাশ বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান—একটি অপরটির সাপেক্ষ, অথবা একটি হইলে অপর দুইটির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য মনোনাশ আর সূক্ষ্মশরীর-নাশ একই কথা। মনোনাশ হইলে সূক্ষ্মশরীরের নাশ হয় এবং জীবাত্মা সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতায় বা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার (Ramakrishna Mission Institute of Culture) এবং ইউনেস্কো (Unesco)-র মিলিত প্রচেষ্টায় কলিকাতায় গোলপার্কে ইনস্টিট্যুট-ভবনে ১লা নভেম্বর হইতে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত একটি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি সম্মেলন (East-West Cultural Conference) হইয়া গেল। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার (Dr. C. P. Ramaswami Aiyar)। নয়টি দেশের বহু বিশেষজ্ঞ এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) মিঃ ক্যালিস ও হোয়েবল্, অস্ট্রিয়ার কাউণ্ট কৈশরলিং, কানাডার মিঃ লেড্ডি, ভারতের ডক্টর মহাদেবন, রমেশ মজুমদার ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বার্মার মং, জার্মানির মেনশিং, ইরানের মঃ সাফা, জাপানের টনাকা, যুক্তরাজ্যের (U.K.) মিঃ টমলিন।*

*1. Helmut G. Callis, Professor of Oriental History, University of Utah.
2. E. Adamsom Hoebel, Professor of Anthropology, University of Minnesota.
3. Count Arnold Keyserling, Formerly Director of the Kriterian, the Philosophical Institute in Vienna.
4. John F. Leddy, Professor of Classics, Saskatchewan University.
5. T. M. P. Mahadevan, Professor of Philosophy, Madras University.
6. R. C. Majumder, Formerly Vice-Chancellor of Dacca University.
7. E. Maung, Minister of Education, Burma.
8. Gustav Mensching, Professor of Comparative Religion, University of Bonn.
9. Radhakamal Mukherjee, Director, J. K. Institute of Sociology, Lucknow, Formerly Vice-Chancellor of Lucknow University.
10. Z. Safa, Professor of History of Persian Literature, Teheran University.
11. Otoya Tanaka, Professor of Indian Philosophy, Chuo University, Tokyo.
12. E. W. F. Tomlin, British Council.

শেষ পর্যন্ত দুইজন প্রতিনিধির পক্ষে এই অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই—মং (Maung) ও টমলিন (Tomlin)। টমলিন অবশ্য তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মং কোন ভাষণ পাঠাইতে পারেন নাই।

সমগ্র অধিবেশনটি ইউনেস্কো প্রাচ্য-প্রতীচ্য প্রধান পরিকল্পনার (Unesco East-West Major Project) সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেই পরিকল্পনার একটি রূপায়ণ। অধিবেশনের মূল আলোচনার বিষয় ছিল :

Reactions of the peoples of East-West to the basic problems of modern life—আধুনিক জীবনের মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া। অধিবেশনের বহু পূর্বেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিকট উদ্যোক্তাদের কর্তৃপক্ষ আলোচনার বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে (Questionnaire) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উত্তর-গুলি দেখিবার সুযোগ পান। এই প্রশ্নোত্তর-গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। অধিবেশনে আলোচনার সময় এই পুস্তকখানি প্রত্যেক প্রতিনিধি সমগ্র আলোচনার মূল দলিল হিসাবে ব্যবহার করেন। আলোচনা ও বিতর্ক ঐ প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে।

আলোচনার (Symposium) বিষয়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল : (1) Religious thought as a component of cultural values. (2) Modern Socio-Economic patterns as affecting Cultural values. (3) Cultural values as affecting the evolution and inter-relations of cultures.—(১. সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের উপাদানরূপে ধর্মীয় চিন্তা। ২. সংস্কৃতির উপর আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ধরনের ব্যবস্থার প্রভাব। ৩. বিভিন্ন কৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর সংস্কৃতির প্রভাব)।

প্রতিদিন সকালে প্রতিনিধিরা ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এই আলোচনায় যোগদান করেন। সভাপতি প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পরিবেশন করেন। সমগ্র আলোচনার সার সংকলন করিয়া শেষ দিন ৯ই নভেম্বর তারিখে অপরাহ্নে এক সাধারণ সভায় সভাপতি তাঁহার ভাষণ দেন।

প্রথমদিনের আলোচনা

সমগ্র আলোচনা প্রীতি- শান্তি- ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিমণ্ডলে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক দিক হইতে ডক্টর মজুমদার সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করেন, হোয়েবল্ দেখেন নৃতত্ত্বের (anthropology) দিক হইতে, এবং ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক অখণ্ড বিশ্বদৃষ্টিতে (cosmic view-point) সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার জন্য আবেদন জানান।

তুলনামূলক ধর্মের (comparative religion) দিক হইতে দেখিয়া অধ্যাপক মেনশিং বলেন : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মের বিচার করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই লক্ষ্য এক। অনুভূতিমূলক ও বিশ্বাসমূলক ধর্মের (mystical religion and prophetic religion) মধ্যে পার্থক্যটি তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল দেশের চিন্তাশীল লোকের প্রতি আবেদন জানান—সাম্প্রদায়িক অহমিকা (group-egoism of the members of a religious organisation) পরিহার

করিবার জন্য। মেনশিং-এর মতে ধর্মের সংজ্ঞা হইল : Emotional encounter of man with holy reality and an answering action of certain people which is somehow under the impact of this holy reality. (পবিত্র সত্তার সহিত মানুষের ভাব-সংঘর্ষ এবং পবিত্র সত্তার সংঘাতে প্রভাবান্বিত কতকগুলি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া)।

ডক্টর মহাদেবন অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির উপর বিশেষ জোর দেন এবং 'যত মত তত পথের' সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বাহিরের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত সার সত্য এক অদ্বয় অনুভূতি।

কৈশরলিং বলেন যে, বিজ্ঞান ধর্মানুভূতির উপর একটা সংঘাত (impact) আনিয়াছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায় (বিশেষতঃ অস্ট্রিয়াতে) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (scientific point of view) হইতে ধর্মকে দেখিতে চায় এবং মনে করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা কেবল আন্দাজ (guess-work) করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে ধর্মের মধ্যে নির্ভুল যথাযথ ভাব (exactitude, precision) আনিতে হইবে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষার (scientific terminology) সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ আনিতে হইবে। তিনি ধর্মের গোঁড়ামি (orthodox religious thought) এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় চিন্তার (private religious thought) পার্থক্য দেখান।

হোয়েবুল্ বলেন : Mankind is one, civilizations are many. Man is exceedingly plastic in nature.—(মানবজাতি এক, সভ্যতা অনেক, মানুষ নমনীয় স্বভাবের)। সেইজন্য সে অন্য সমাজগোষ্ঠীর আচরণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারে। হোয়েবুল্ প্রকৃত ও আদর্শ সংস্কৃতির (real culture and ideal culture) মধ্যে পার্থক্য দেখান। প্রত্যেক মানুষ একটি আদর্শ সংস্কৃতি লইয়া থাকে। এই আদর্শ সংস্কৃতি হইল এক-মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাহার দৈনন্দিন ব্যবহারে সে এই এক-মনুষ্যসমাজের প্রতিনিধিরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহার কারণ দুই জাতির মধ্যে ভৌগোলিক বাধা (geographical barrier between one nation and another) দূরীভূত হইলেও সামাজিক প্রাচীর (social barriers) এখনও আছে। ইহা দূর করিতে হইলে মূল্যায়নের সাধারণ মান (common standard of value-judgments) খুঁজিতে হইবে। মানুষে মানুষে সংযোগ আজ সহজ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত করিতেছে। যে উড়ো জাহাজে চাপিয়া আমরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এখানে আসিলাম, সেই উড়ো জাহাজ হইতেই বোমা ফেলিয়া আমাদের সকলকে ধ্বংস করা যাইতে পারে।

ডক্টর মজুমদার ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি দেখান যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী (freedom of thought and rational outlook) আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী কুসংস্কার ও ধর্মের প্রতি অন্ধমোহ ত্যাগ করে। আজ আর পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি বলিতে কোন ধরাবাঁধা (rigid and absolute) পার্থক্য বোঝায় না। তাহার মতে বর্তমানে ভারতবাসী ধর্মের প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়,

যেমন অনুরক্ত সে ছিল এক শতাব্দী আগে। ইহার পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি ডক্টর মজুমদার বিশ্লেষণ করেন। তথাপি নৈতিক আদর্শের মধ্যে ভারতবাসী বরাবর বিশ্বজনীনতাকে খুঁজিতেছে। বর্তমান ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যাক্লিষ্ট জীবনে অবশ্য ধর্ম আর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

ডক্টর সাফা ফরাসী ভাষায় যাহা বলেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ :

Every prophet and saint has a path of his own, but in taking to God, all are one. According to one Iranian thinker, all those who have firm faith in their own convictions are worthy of respect, whether they be idol-worshippers or monists[১]. Who gave beauty to the idol? If God willed it not, who would have become an idol-worshipper!

—প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক ও মহাপুরুষেরই নিজস্ব একটি পথ থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য সব পথই সমান। একজন ইরানী চিন্তানায়কের মতে : যাঁহাদের নিজেদের রীতি-নীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান, তাঁহারা পৌত্তলিক বা একেশ্বরবাদী যাহাই হউন না কেন, শ্রদ্ধার পাত্র। মূর্তিকে কে সৌন্দর্য দিয়াছেন? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইত, তবে কেই বা মূর্তিপূজক হইতে পারিত?

মিঃ লেড্ডি বলেন : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাতত্ত্বে একরূপতা (uniformity) নাই। আমরা যে আদর্শ (—মানবজাতির ঐক্য) লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা হয়তো একদিন উত্তর আমেরিকার জীবনে রূপায়িত হইবে, কিন্তু এখনও দেখি যে, যুবসম্প্রদায় ধর্মের সমস্যায় বিব্রত নহে। তাহারা ঐহিক উন্নতি লইয়া বিশেষ ব্যগ্র। কিন্তু তাহাদের মনে একটা শূন্যতা (vacuum) আসিতেছে, ইহা শীঘ্রই নাস্তিকতাবাদের (nihilistic trend) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, যদি না আমরা একটা সাধারণ আদর্শ (common ideal) খুঁজিয়া পাই। [ক্রমশঃ]

১ Monotheists ?—উঃ সঃ

East and West

Each of these types has its grandeur, each has its glory. The present adjustment will be harmonising, the blending, of these two ideals. To the oriental the world of spirit is as real as to the occidental is the world of senses....To the occidental the oriental is a dreamer. To the oriental the occidental is a dreamer. Each calls the other a dreamer. But the oriental ideal is as necessary for the progress of human race as the occidental, and I think it is more necessary.

—*Swami Vivekananda*

প্রার্থনা

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

স্পষ্টির গহনলোকে
কালের গঙ্গোত্রীপারে,
বাক্যের অতীত লক্ষণা
যেথায় ধূসর হয়ে আসে—
সেই অদ্বৈত সত্তার সমুচ্চ কোটিতে
অকল্পিত স্তব্ধতাকে তরঙ্গিত ক'রে
যে এষণা অভীপ্সিত হয়ে উঠেছিল—
বিম্বে বিম্বে ফেনে ফেনে
সেই কি বিবর্ত-তরঙ্গে—
মহাকালে বিসর্পিত হয়ে ফুটে ওঠেনি
স্পষ্টির ফুলে ও ফলে—
বীজে অঙ্কুরে শ্যামল স্বপনে ?

হে অরূপ, তুমি কি অপরূপ আলোকে
উদ্ভাসিত করনি ঋষির ধেয়ানকে ?
দেবের মূঢ়তাকে দীর্ণ ক'রে
হৈমবত্যতিতে—
কনকোজ্জ্বল রূপ আর রেখায়
হে অম্বিকে,
বিভাসিত করনি কি মেঘের স্বপ্নপুরীকে ?

মুনির মনন-ভূমি
সন্তের মানস-পট
ভক্ত-বিদগ্ধের সাধনতীর্থ
রোমাঞ্চিত—অভিষিঞ্চিত হয়েছে
তোমার বাৎসল্যের প্লাবনে।

কিন্তু জননি,
বিবর্তের রূপবাহ কি নিঃশেষিত হবে
শুধু মনেরই শিল্পপটে!
তুমি কী কেবল জ্ঞানী গুণী ধ্যানীরই জননী ?
বিমূর্ত তুমি—বিমুক্ত হও
স্থূলে—আরো স্থূলে—আরো স্থূলে··
নভোবাহী বিবস্বান্ রূপ
বিম্বিত হোক ঘটে ঘটে জড়ে জড়ে।

বরেণ্যের কল্পপুরী হ'তে
হে অম্বিকে, আবির্ভূত হও
নগণ্যের স্নায়ুঘেরা আঁখির সম্মুখে!
চিন্ময়ী তুমি—মৃন্ময়ী হও—মৃন্ময়ী হও!
মানব-জীবনের নগ্নতা খিন্নতা অসম্পন্নতার মাঝে
উদিত হও পরমার্থিকে!
হে তুরীয়ানন্দ-বিহারিণী, মহাকাল-কল্লোলিনী,
উদ্বর্তিত হও—লীলায়িত হও—বিলসিত হও
পৃথিবীর পঙ্কজের দলে দলে
সৌরভে ও অশ্রুর শিশিরে
সার্থক হোক অসার্থক মানুষ।

চল্লিশ বছর পরে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

শোকসন্তপ্ত ও জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজিত মানব যখন জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়, ভবিষ্যৎ যখন ঘনতমসাচ্ছন্ন এবং বর্তমান যখন তাহার নিকট নিতান্ত বিষময় ও দুর্বিষহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র সুদূর অতীতের সুমধুর স্মৃতিগুলিই তাহার ভগ্নহৃদয়ে ও ব্যথিত-চিত্তে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ ও শান্তি-বারি সিঞ্চন করে। তাহারই কিয়দংশ, আজ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সমীপে উপস্থিত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আজ ঠিক স্মরণ নেই, বোধ হয় জীবনে সর্বপ্রথম সেই আমার মায়ের সঙ্গে ১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে দোতলার ঘরে জগদারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণ-কমল স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। যাইবার পূর্বে আমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মা, তুমি আজ কোথায় যাবে?' মা বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে, মা-ঠাকরুনকে দর্শন ক'রে আসবি।' আমার তখন ১০।১১ বছর বয়স এবং আমার জননীর মুখে 'মা-ঠাকুরানী' শব্দটি শ্রবণমাত্র আমার মানস-পটে এক ত্রিশূলধারিণী রুদ্রাক্ষ-বিলম্বিতা ভৈরবীমূর্তির চিত্র প্রতিফলিত হইল এবং ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কম্পিত হইয়া উঠিল। সভয়ে আমি মাকে বলিলাম, 'না, আমি যাব না।' আমার মাতৃদেবী সন্তানের ভীতিবিহ্বল মুখ দর্শনে মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'চল্, তোর কিছু ভয় নেই, তাঁকে দেখলে তোর খুব আনন্দ হবে।' তখন অগত্যা আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সহিত আমরা তখনকার সেই খর্বকায় 'অশ্বিনীকুমার-দ্বয়'-বাহিত, আমার অত্যন্তপ্রিয় থার্ডক্লাস অশ্বযানে বৈকালে বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার এই হতভাগ্য জীবনের সেই একমাত্র মধুর ও চিরস্মরণীয় দিবস।

সদরে প্রবেশ করিয়া বামদিকের যে ঘরখানি দেখা যায় তাহাতে বসিয়া, ছোট একটি হাত-ডেস্কে লিখিতেন এবং তাম্রকুট সেবন করিতেন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহপাঠী মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ তিনি আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, মাকে ও আমাকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া আমার পিতৃদেবের সহিত কথোপকথনে রত হইলেন। আমি শঙ্কিত-চিত্তে ও স্পন্দিত-হৃদয়ে আমার জননীর পিছু পিছু দোতলায় রাস্তার দিকের ঘরখানিতে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পূর্বে আমার মানস-পটে মা-ঠাকুরানীর যে জটাজুটধারিণী গৈরিকবসনা রুদ্রাক্ষহারশোভিতা ত্রিশূল-ধারিণী ভৈরবীমূর্তি চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা যে আমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-ধারণা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলাম। শুধু দেখিতে পাইলাম, একজন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর সাধারণ গৃহস্থ-বেশ-ধারিণী সুহাসিনী সরলা প্রশান্তবদনা নারীকে পরিবেষ্টিত করিয়া অন্যান্য পাঁচ-ছয়টি স্ত্রীলোক কথোপকথন করিতেছেন। তিনি আমার মাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'এই যে, আসুন, অনেক দিন আপনি আসেননি। এটি কি আপনার ছেলে?' মা আমাকে ঈষৎ

ধাক্কা দিয়া ইসারা করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে। আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অবনতমস্তকে সেই জীবন্ত জগদ্ধাত্রী-রূপিণী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানার পদরজঃ লইয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলাম। সে যে কী এক অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহা আজও স্মরণ করিলে সাংসারিক দুঃখ ও অশান্তি সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়া যাই। প্রণাম করিবামাত্র তিনি স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত মৃদুহাস্যে আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'দীর্ঘজীবী হও, সুখে থাকো, বাবা।' শ্রীশ্রীমায়ের সেই সুধামাখা কোমল করস্পর্শ আজ ষাটবছর বয়সেও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন্ত প্রতিমা স্বচক্ষে যিনি দর্শন করিবার ও তাঁহার পদরজঃ লইবার এবং তাঁহার অমিয়-বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না, শ্রীশ্রীমায়ের সেই বালিকা-সুলভ সরলতা ও স্বর্গীয়-জ্যোতি-উদ্ভাসিত করুণাময়ী মূর্তি কি! কী মধুর কল্যাণময়ী ছিল তাঁহার সুকোমল করস্পর্শ ও আশীর্বাণী!

আমার মায়ের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল আলাপ করিলেন। আমি সেখানে উপবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ-নেত্রে দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমা ও মদীয় জননী উভয়ে কত সুখ-দুঃখের কথোপকথন করিতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাতে একগাছা করিয়া স্বর্ণালঙ্কার ও পরিধানে দেখিলাম সরুপাড় ধুতি। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক ধরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর কত গল্প ও হাসি হইল, কিন্তু সেদিনকার সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, সেদিন আমার মা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল—সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ, আপদ্-বিপদ্; কোন প্রকার গুরু-গম্ভীর ধর্মালোচনা শুনিলাম না। বাহির হইতে কাহার সাধ্য, বুঝিতে পারে যে, ইনি মৈত্রেয়ী-সদৃশা ব্রহ্মবিদুষী!

আমার জননী সুনিপুণভাবে কার্পেটের উপর সূচিশিল্পে নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তি আঁকিতে পারিতেন। মা স্বহস্তে ঐরূপ এক-খানি 'নাড়ুগোপাল' করিয়া, ফ্রেমে বাঁধাইয়া শ্রীশ্রীমাকে ভক্তি-উপহার দিয়াছিলেন। নাড়ু-গোপালের ঐ ছবিখানি ঐ ঘরেই দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখা ছিল। যখন কোন ভক্ত আমার মাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করিতেন, 'ইনি কে?' শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ দেওয়ালে নাড়ুগোপালের পশমের চিত্রখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, হাসিয়া পরিচয় দিতেন, 'ইনি গোপালের মা।'

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর কথা-বার্তায় প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন সাধু আসিয়া দ্বারদেশ হইতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, 'শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর যে বন্ধুর স্ত্রী উপরে এসেছেন, তিনি কি আপনার দর্শন পেয়েছেন?' শ্রীশ্রীমা আমার মায়ের দিকে চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'বলো যে, তিনি খুব ভালভাবেই দর্শন পেয়েছেন।' এইবার আমরা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে প্রণামান্তে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি মাকে বলিলেন, 'আবার আসবেন। আর একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন, যদি আমার আইবুড়ো ভাইঝি রাধুর জন্য একটি সৎপাত্র পান।'

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আমার জীবনে বোধ হয়, এই প্রথম ও এই শেষ। আমার জননী মাঝে মাঝে বাগবাজারে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে

দেখিতে আসিতেন। আমার পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার সোদর-প্রতিম বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শরৎ মহারাজকে দেখিতে এই উদ্বোধন অফিসে আসিতেন। বাবাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিতেন, 'এস জ্ঞান, এস; এবারে অনেকদিন পরে এসেছ। এস, তামাক খাও।' জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার কথা হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সেক্রেটারি ও পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বিরাট পুরুষ স্বামী সারদানন্দ এবং তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ঘোরসংসারী আমার পিতৃদেবের মধ্যে কী সরল, প্রাণখোলা, কতই না সুখ-দুঃখের আলোচনা হইত, আর তামাক পুড়িত! আমি বাবার কাছে বসিয়া এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও এক ঘোরসংসারী—দুই বাল্যবন্ধুর এই অপূর্ব মিলন ও পরমানন্দে তাম্রকূট-সেবন নিরীক্ষণ করিতাম।

ফিরিয়া আসিবার সময় শরৎ মহারাজের কথায় তাঁহার লিখিত কোন না কোন পুস্তক আমার পিতা প্রায়ই ক্রয় করিয়া আনিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে, তখন সবেমাত্র স্বামী সারদানন্দ-লিখিত সর্বজনপ্রিয় 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। শরৎ মহারাজের অনুরোধে একদিন আসিবার সময় বাবা ঐ পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন। আর একবার কিনিয়া আনিয়াছিলেন 'ভারতে শক্তিপূজা', 'সাধু নাগ মহাশয়' ইত্যাদি। বাবা উঠিবার উপক্রম করিলে শরৎ মহারাজ সস্নেহে আমার বাবাকে বলিতেন, 'জ্ঞান ভাই, আমাকে ভুলে থেকো না। আবার এস, দেরি ক'রো না।'

আমি শৈশবাবধি বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলাম বলিয়া, বাবা আমাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা আমাকে বলিতেন: 'হেয়ার স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) আমার সঙ্গে প'ড়ত। স্কুল-কলেজের ছুটির পরে মাঝে মাঝে একত্রে শরৎ ও আমি শরতের বাড়ীতে বেড়াতে যেতুম। শরতের মা আমাকে বড় ভালবাসতেন ও যত্ন ক'রে খাওয়াতেন। শরতের বাবা খুব সজ্জন ছিলেন এবং তিনিও আমাকে বড় স্নেহ করতেন।' আমার পিতৃদেব গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিলেও একদিনের জন্য কদাচ তাঁহার বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের প্রীতি ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

১৯১৭ খৃঃ—প্রথম মহাসমর চলিতেছে। এই সময়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র শান্তিময় সংসারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব পরলোক গমন করিলেন। সংসারে কেবল মা আর আমি। আমি স্কুলে পড়িতেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িব অথবা চাকরি করিব, এই সমস্যায় পড়িলাম। আমার মাতৃদেবী শোকে কাতর হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন।

মা একদিন আমাকে বলিলেন, 'তুই একদিন তাঁর বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের কাছে যা, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কী উপদেশ দেন, শুনে আয়, আর তাঁকে জিজ্ঞসা করিস্, মা বলেছেন, আমার বিয়ের জন্য কী ক'রব দয়া ক'রে পরামর্শ দিন।' একদিন সকালে ৮।৯টার সময় বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে সদর দরজায় প্রবেশ করিয়া সেই বামদিকের ঘর-খানিতে প্রবেশ করিলাম। সামনে সেই ছোট

হাত-ডেস্কখানি; শরৎ মহারাজ তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 'দাঁড়াও বাবা, হুঁকোটা আগে রাখি।' হুঁকোটি রাখিয়া তিনি করজোড়ে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিতে লাগিলেন, আর আমি তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিলাম। সস্নেহে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা শুনিয়া তিনি বাবার মৃত্যুসংবাদে, ব্যথিত অন্তরে দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের সংসারে এখন কে আছে? তুমি কী ক'রছ?' আমি বলিলাম, 'সংসারে শয্যাশায়িনী আমার মা ও আমি। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। মা আমাকে আপনার নিকটে পাঠালেন, এখন কী ক'রব, আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে এবং মায়ের ইচ্ছা, তিনি আমায় সংসারী করবেন। দয়া ক'রে বলুন, এখন কী করা কর্তব্য?' মহাপুরুষ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, 'আমার মনে হয়, কলেজে পড়ার চেয়ে কোন কিছু শিখিয়া কিছু উপার্জন করাই তোমার পক্ষে ভাল। তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছা আছে?' তদুত্তরে আমি বলিলাম, 'মায়ের ও আমার উভয়ের ইচ্ছা, আমি Shorthand-Typewriting শিখি, আপনার কী ইচ্ছা দয়া ক'রে বলুন।' তিনি সানন্দে বলিলেন, 'Shorthand খুব ভাল, তাই মনোযোগ দিয়ে শেখো, ভাল হবে। বিবাহ ক'রো না। মাঝে মাঝে এখানে এসো।' স্বামী সারদানন্দের পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীকে মহাপুরুষের মতামত আদ্যোপান্ত বলিলাম।

ষড়্‌রিপুর বশে আমরা নিজেরা জীবনে ভুল-ভ্রান্তি করিয়া দুঃখকষ্ট পাই; অবশেষে জগজ্জননী মহামায়ার উপরে দোষারোপ করিয়া বলি, 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।'

Shorthand শিখিয়া আমি চাকরিতে প্রবেশ করিলাম। এদিকে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, মা অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। প্রায় বছর-দেড়েক অতিবাহিত হইলে মাতৃদেবী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। মহাপুরুষের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন করিয়া ঘোর সংসারী হইলাম।

ইতিপূর্বে হাতীবাগানে অবস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ কিছুকাল আমাকে সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' সযত্নে পড়াইয়াছিলেন।

অনতিকাল পরে একদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্তদের জন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী-দিগের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া, একদিন প্রাতে বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে প্রবেশ করিয়া, ঐ পুরাতন বস্ত্রগুলি ও অর্থ বন্যার্তের সাহায্য-কল্পে জমা দিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরে স্বামী সারদানন্দের পদধূলি গ্রহণার্থে প্রবেশ করিলাম।

স্বামী সারদানন্দ বসিয়া তাঁহার সেই ছোট ডেস্কটিতে লিখিতেছেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম, তিনিও কলমটি রাখিয়া করযোড়ে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিতে লাগিলেন। পিতৃদেবের নাম করিয়া পরিচয় দিবামাত্রই তিনি আমাকে সস্নেহে আমার বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তোমার সংসারে আর কে আছেন?' অপরাধীর ন্যায় আমি

ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে বলিলাম, 'আমি বিবাহ করেছি।' আমি বিবাহিত শ্রবণ করিয়া, অন্তর্যামী মহাপুরুষ বিমর্ষভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি বিবাহ করেছ?' কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, 'আজ আমি ব্যস্ত আছি। আচ্ছা এস।' আমি পুনর্বার তাঁহার শ্রীচরণে জন্মের মতন প্রণাম করিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বিবেক-দংশনে অস্থির হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি অন্তর্যামী আত্মদর্শী মহাপুরুষ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধুর পুত্রের ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থেই তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সংসারের জ্বালায় ও শোকতাপে দগ্ধ হইয়া আজ আমি আমার জীবনের সায়াহ্নে অনুতাপ করিতেছি, কেন সেই আমার অশেষকল্যাণকামী মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন করিলাম?

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

'আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা…'

বিবাহ না করিলে স্ত্রী-বিয়োগের শোক পাইতে হইত না, কন্যাদায়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে হইত না। তিল তিল করিয়া তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না!

ষাট বছর অতিক্রম করিয়াছি। জীবনে ভালমন্দ উভয় প্রকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। বাল্যাবধি ভূরি ভূরি বক্তৃতা ও ধর্মালোচনা শুনিয়াছি। বাল্যকালে স্বদেশী যুগে বহু তেজস্বী বক্তার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা এবং পরে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর ধর্মবক্তৃতাও শুনিয়াছি। তারপর এখন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-অনুযায়ী 'মনে, বনে, কোণে' সেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'কে স্মরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি। নির্জন স্থানে, ভাগীরথী-তীরে, অথবা পার্কের বেঞ্চে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তাই আমার এখন ভালো লাগে।

* * *

আজ শনিবার, ২২শে জুলাই ১৯৬১; প্রায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের ঐ বাড়ীতে এই সুদীর্ঘ কাল আর আমার যাতায়াত নাই। সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রায়ই বৈকালে একটু বেড়াইতে যাই, গন্তব্য স্থানের কোনই স্থিরতা নাই। কোন দিন বাগানে, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন আত্মীয়-বন্ধুর গৃহে যাইয়া আমার মানসিক অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করি। সত্য কথা বলিতে কি, যে কারণেই হোক আর কীর্তন-কোলাহল বা ধর্মালোচনা, বক্তৃতা—এ-সব কিছুই ভাল লাগে না। যথারীতি বৈকালে ভাবিতেছি, আজ কোথায় যাওয়া যায়? শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল; ছাতাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে আসিয়া উত্তর দিকে অর্থাৎ বাগবাজারের দিকে চলিলাম। বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখি, দুইজন সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল, আজ শনিবার কিছু ধর্মালোচনা বা কীর্তন—কিছু একটা হইবে। এখানেও প্রবেশ করিলাম না। মনে হইল, কী যেন আনন্দময়, একটা অদৃশ্য শক্তি আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে, আমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাগবাজার স্ট্রীটে পড়িয়া, বামদিকে ভাঙিয়া রামকৃষ্ণ লেনে প্রবেশ করিলাম। উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, কেমন দিশাহারা হইয়া গিয়াছি; উদ্বোধন অফিস কোন্ দিকে—বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। স্মৃতি-শক্তির অপরাধ কী? প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ওখানে আমার যাতায়াত নাই।

অবশেষে একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই আমার পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত চিরপরিচিত শ্রীশ্রীসারদা মা-ঠাকুরানী ও মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দের অমরস্মৃতিময় উদ্বোধন অফিসের সদরে প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে সভয়ে স্পন্দিতবক্ষে অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলাম। নীচেকার বামদিকে যে-ঘরে মহাপুরুষের পদধূলি-গ্রহণান্তে বসিয়া কথোপকথন করিতাম, সেদিকে চাহিয়া দেখি, সে মহাপুরুষ নাই, তাঁহার সেই লিখিবার আসবাবসহ হাত-ডেক্সটিও নাই। পার্শ্বের অফিস ঘরের সম্মুখে একজন দৃঢ়কায় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিলেন, আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তাঁহার নির্দেশে উপরে উঠিলাম, দক্ষিণ দিকের কক্ষের দিকে চাহিয়া দেখি, খাটের উপরে একজন অধিকবয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট হইয়া একজন ভক্তের সহিত কথোপকথনে রত। ভক্তটি বিদায় লইলে আমি সেই সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে পরিচয়-প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি?' আমি কেমন ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'চল্লিশ বছর পরে, এখানে এলুম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'চল্লিশ বছর পরে এলেন কেন?' প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বিহীন নির্বোধের ন্যায় আমৃতা আমৃতা করিয়া জবাব দিলাম, 'এই, এই, আসিনি।' বরাবরই দেখি, একটু বিলম্বে আমার বুদ্ধির বিকাশ হয়। পরে আমার মনে হইল, বলিলেই হইত—'চল্লিশ বছর পরে শ্রীশ্রীমা নিজেই আমায় এখানে টেনে আনলেন।' আমার বোধ হয়, তাহা হইলে বেশ ভাল শ্রুতিমধুর জবাব হইত।

এইবার উত্তর দিকে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। সুদূর অতীতের কত মধুর-স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র সেই ঘরখানি! কিন্তু হায়! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী করুণাময়ী আমার সেই জীবন্ত শ্রীশ্রীমা আজ কোথায়? যে মহাদেবীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া একদিন আমরা মাতাপুত্রে একাধিক ঘণ্টা পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলাম, আমার পূজনীয়া গর্ভধারিণীর সহিত যিনি পরমাত্মীয়ার মতো অবাধে কত আলাপ করিতেন, আজ সেই সদানন্দময়ী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মা কোথায়? সশরীরী জীবন্ত সদাহাস্যময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পরিবর্তে, আজ তাঁহার ছবি রহিয়াছে। সেই গানটি মনে পড়িল, 'তুমি কী কেবলি ছবি, শুধু পটে লেখা?' আরও মনে পড়িল, কবি Cowper-এর 'My mother's picture' কবিতার সেই পঙ্ক্তিটি Ah, those lips had language!

অশ্রুপূর্ণলোচনে মাকে প্রণাম করিলাম। মায়া-মমতা-বিহীন দুরন্ত এ মহাকালের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কবে মিটিবে? অতঃপর ধীরে ধীরে পূর্বদিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীসারদানন্দের বিরাট আলোকচিত্র। নিষ্পলক নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, আর ক্ষোভে দুঃখে ও বিবেকের তীব্র দংশনে, আমার জ্বালাময় অনুতপ্ত হৃদয় আরও লক্ষ গুণ জ্বলিতে লাগিল। 'হে প্রভো! আপনার কথা অবহেলা করিয়া যে ভুল করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আজ শোকতাপ ও অমানুষিক পীড়নে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিকলচিত্ত হইয়া অশান্তির তুষানলে পুড়িয়া মরিতেছি। আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমারই মঙ্গলের জন্য।' তারপর অনুতপ্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঐ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে সাশ্রুনয়নে প্রণাম করিয়া

সোপান বাহিয়া অবতরণ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দণ্ডায়মান আমার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু। আমাকে হঠাৎ এই মন্দিরে দেখিতে পাইয়া তিনি বোধ হয় খুবই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এখন নামিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ কী, নেমে এলে যে? আবার ওপরে চল, আরতি দেখে বাড়ী যেও।' তথাস্তু, আবার উপরে উঠিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখে দালানে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া ও সুমধুর ভজন শ্রবণ করিয়া, নীচে অবতরণ করিলাম। সদানন্দময় সাধুটি—যিনি আমায় উপরে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, 'আবার কবে আসছেন?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা আনলেই আবার আসবো।' শরৎ মহারাজের বসিবার সেই ঘরখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথ চলিতে চলিতে স্বামীজীর সেই প্রিয় সঙ্গীতটি আমার মনে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল: 'মন চল নিজ নিকেতনে।' কিন্তু কোথায় আমার সেই 'নিজ নিকেতন?' আজও তাহা খুঁজিতেছি

প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের কবি

শ্রীমতী উমা চৌধুরী

বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অপূর্ব ভাব ও রসের সংমিশ্রণে তাহা বৈষ্ণব কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বা পদাবলী-সাহিত্য বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব ভাবসম্পদ্‌। আপনার দয়িত বা দয়িতার সহিত মিলনের করুণ আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-নিবেদনের কোমল আগ্রহ, পূর্বরাগের সুমধুর চিত্র, প্রেমিকার অনবদ্য রূপ-বর্ণনা, বিরহ-বেদনাক্লিষ্ট প্রেমসর্বস্ব কবিগণের নিভৃত অশ্রুর করুণ আর্তনাদের রেশ পদাবলী-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমিক কবির আকুল বেদনার সকরুণ ইতিহাস। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমবিহ্বল ভাবনার অন্তরে ফল্গুস্রোতে বহিয়া চলিতেছে অলৌকিক আধ্যাত্মিক চেতনার ভাব-সুরধুনী। মানবীয় প্রেমলীলা আপন বিরহ-বেদনার ইতিহাস জানাইতে গিয়া প্রায় স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিয়াছে। ভোগবতী মিলিয়াছে মন্দাকিনীতে। সান্ত সসীম মানবীয় প্রেম আপনার বেষ্টনী হারাইয়া অসীম অনন্ত ঈশ্বরীয় বিরহ-মিলনের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ আপন আপন ব্যক্তিগত বিরহ-মিলনানুভূতির হাসি ও অশ্রুর ডালিখানি অপূর্ব ছন্দ সুর ও ভাবে সাজাইয়া অর্ঘ্য পাঠাইয়াছেন দেবতাদের উদ্দেশে। মানবীয় প্রেমের সকাম রূপ ঈশ্বরীয় চেতনার নিকষ-পাথরে ঘষিয়া মাজিয়া নিষ্কাম অপার্থিব

অনুভূতির মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই চণ্ডীদাসের প্রেমানুভূতি 'নিকষিত হেম-সম।'

কবি জয়দেব কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার যে ঝরনা উৎসারিত করিয়াছেন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি পরবর্তী বঙ্গকবিগণ তাহাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। চণ্ডীদাসের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিদ্যাপতির কবিতায় স্বভাবতই মৈথিল-ভাষার প্রাচুর্য থাকিলেও তাহা বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারেরই সম্পদ্। কারণ পরবর্তী বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত 'ব্রজবুলি' তো বাংলাভাষার সমগোত্রীয় হইয়া গিয়াছে। তবে বিদ্যাপতির কাব্যে প্রেম-সম্ভোগ, মিলন-মাধুর্য, আনন্দোচ্ছ্বাস ও সুখানুভূতি চণ্ডীদাসের বিরহ-বেদনার করুণ ক্রন্দনের সুরে ও হতাশার অশ্রুজলের মাঝে যেন হারাইয়া যায়। বিদ্যাপতির যৌবনোচিত উদ্দাম উদ্দীপনা চণ্ডীদাসের প্রৌঢ় গাম্ভীর্য হইতে স্বতন্ত্র। দুঃখপ্রেমিক, বেদনা-বিলাসী বাঙালীর হৃদয় যেন চণ্ডীদাসের কাব্যলহরীর মাঝে আপন অন্তরের করুণ বাণী শুনিতে পায়। যৌবনের চঞ্চলতা বয়সের গাম্ভীর্যের কাছে বড় অগভীর বলিয়া মনে হয়। পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার রূঢ়তাই জীবনে সত্য হইয়া যায়, অল্পবয়সের আনন্দ হাসি সেখানে আর ঠাঁই পায় না। তাই চণ্ডীদাসের বিরহ-বেদনার সকরুণ ইতিহাসই একান্ত সত্য। তাই মানুষের একান্ততম জীবন-দর্শন, মানুষের আশাক্ষুব্ধ জীবনের চরমতম সত্যোপলব্ধি এই যে—

'সুখ-দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।'

ইহা তো শুধু ক্ষণিকের কল্পনাবিলাসমাত্র নহে, ইহা মানুষের বিক্ষুব্ধ জীবনের হাহাকারের মর্মবাণী। সুখাভিলাষী জীবনের সকল আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়া মানুষকে একদিন পরম হতাশ্বাসে বলিতেই হয়—

'সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।'

ইহা শুধু ব্যক্তিগত কবির ব্যষ্টি-জীবনের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নহে, ইহা যুগ-যুগান্তরের প্রেমিকচিত্তের আশা-মুখরিত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী। এমন করিয়া অন্তরের ভাষাটিকে গহনতম প্রদেশ হইতে টানিয়া আনিয়া কে বুঝিতে চাহিয়াছে? চণ্ডীদাসের কবিতায় তাই এত ভালবাসা, তাই এত ভাল-লাগা।

অনেকের মতে চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি বিদ্যাপতির কবিখ্যাতির নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির মতো শাস্ত্রজ্ঞান চণ্ডীদাসের না থাকায় এই ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রেমরসধারা যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, কাব্যপ্রতিভা যার জন্মান্তরীণ সম্পদ্, ভাবে যার চিত্ত বিভোর, শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব তার কি অভাব সৃষ্টি করিবে? প্রেমের স্বভাবসুন্দর রূপখানি যে আপন অনুভূতিতে আস্বাদন করিতে পারে, শাস্ত্রের বাহুল্য তার নিকট শুধু নিষ্প্রয়োজন নহে, প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। চণ্ডীদাসের কবিতায় মধুর প্রেমই মুখ্য—ভাষার গাম্ভীর্য আর অলংকারের বাহুল্য সেখানে গৌণ! চণ্ডীদাসের কবিতা করুণ ও মধুর ভাষার সংমিশ্রণে এক অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার ভাষা সহজ, বর্ণনা সরল ও অনুভূতি বড় সুন্দর। তাঁহার কবিতায় শাস্ত্রজ্ঞানের আলোক পড়ে

নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিদগ্ধ সমাজে তাহা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া যায় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু সেই রসসুধা পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। চণ্ডীদাসের মানবীয় প্রেম অলৌকিক প্রেম-রাজ্যের ভাবসম্পদ্। আপন প্রেমের দর্পণে, আপনার অশ্রুসিক্ত নেত্রসীমায় প্রেমরসিক মহাপ্রভুর দিব্য আঁখিদুটির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। রাধিকার ধ্যানবিভোর স্বর্গীয় রূপখানির মাঝে প্রতিফলিত হইয়াছে কৃষ্ণ-প্রেমাতুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক রূপরেখা। আপন দয়িতার প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্যে তাই তাঁর অত সশ্রদ্ধ শালীনতা, প্রেমের প্রতি অত পবিত্র সম্ভ্রম। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সমাদরই কবির প্রেমকে চিরপবিত্র চিরসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামানুরাগও মানবীয় প্রেমের ইতিহাসে অশ্রুত। আপন প্রাণসুন্দরের নাম গাহিতে গাহিতে সাধকের ভক্তিবিহ্বলচিত্ত দেহের সীমা ছাড়াইয়া, ইন্দ্রিয় চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডি হারাইয়া এক উচ্চতম আদর্শ স্বর্গে উত্তরিত হইয়া গিয়াছে। প্রেমধন্যা প্রণয়বিধুরা রাধিকাই সুপরিচিতা, কিন্তু কানুপ্রেম-বিরহিণী রাধিকার বৈরাগ্যরূপ চণ্ডীদাসেরই মানসী কল্পনা। রাধিকাচিত্র চণ্ডীদাসের তুলিকায় কেবল সুন্দরী দয়িতার আলেখ্যই নয়, জগৎ-প্রেমিক আনন্দঘন নিমাই-প্রেমিকের পবিত্র-সুন্দর চিত্রপটের ছায়াই সেখানে প্রতিফলিত।

চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রেমের সুগভীর সাধনমন্ত্রে সার্থক। এই স্তোত্রগুলি গায়কশ্রেণীর কণ্ঠে সুমধুর সুর-সম্ভাষিত হইয়া গীত হয়। চণ্ডীদাসের নাম, চণ্ডীদাসের গান, চণ্ডীদাসের প্রেম, তাঁহার বিরহ, সেই বিরহের সার্থক বর্ণনাভঙ্গী—সকলই নূতন। শিশির-সিক্ত শেফালিকার মতো তাহা চিরতরুণ ও চিরনবীন —ইহা যেন ভুলিবার নয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমিকজনচিত্তের একটি রসঘন হেমপদ্ম !—যেমন করুণ, তেমনই মধুর !—বিরহের রসজাহ্নবীসিঞ্চিত কোরকের মালিকা। রসিকজনের অন্তরে বেদনার বাণী বহন করিয়া লইয়া যায়।

চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে মতভেদের অন্ত নাই। দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস—এই অগণিত চণ্ডীদাসের মধ্যে খাঁটি চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করা কঠিন। এই বিবিধ চণ্ডীদাসের মধ্যেও একজন একক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রসস্রষ্টার স্বাক্ষর পদাবলী-সাহিত্যে মেলে, যাহা একান্তভাবে একজনের, তিনি চতুর্দশ শতকের কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং দেবী বাশুলার পূজারী। তাঁহার নিবাস অজয়-বিধৌত, রাঢ়-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লী নান্নুরের সুরম্য ছায়ানিকেতনে। এই গ্রামেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন বাশুলী। চণ্ডীদাস পৈতৃক-সূত্রে বাশুলী-পূজার অধিকার লাভ করেন। নকুল নামে তাঁহার এক সহোদরও ছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস যে চতুর্দশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নাই। চণ্ডীদাস যে নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন, তাহা বহুজনস্বীকৃত। চণ্ডীদাস দ্বাদশ শতকের জয়দেবের পরবর্তী ছিলেন, তাহাও সত্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনও সংঘটিত হইয়াছিল। রামীর শোক-গাথার মধ্যেও চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণ-কীর্তন' চণ্ডীদাসেরই রচনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শক্তিবাদ

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

মুখবন্ধ

একটি বিশাল বৃক্ষ যেমন অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমষ্টি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, সনাতন হিন্দুধর্মও তেমনি বহুসংখ্যক শাখা-ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাধারণ বৃক্ষ হইতে ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের পার্থক্য এই যে, সাধারণ বৃক্ষের মূল থাকে নীচে আর শাখা-প্রশাখা থাকে উপরে; অপর পক্ষে ধর্মরূপ বৃক্ষের মূল থাকে উপরে আর শাখা-প্রশাখা থাকে নীচে। সাধারণ বৃক্ষে উঠিতে হইলে মূল বাহিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়, আর ধর্মরূপ বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ প্রশাখা ও শাখাগুলি অতিক্রম-পূর্বক মূলে পৌঁছিতে হয়। ধর্মের মূলে পৌঁছানো মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তথায় পৌঁছিলে আর ঐহিক দুঃখ-কষ্ট, ভোগ-বাসনা প্রভৃতি কিছুই মানুষকে ক্লেশ দিতে পারে না। মানুষ তখন পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-লাভের ফলে সতত আনন্দ-সাগরে আনন্দস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

বৈষ্ণব ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম উল্লিখিত বহু-বিস্তৃত হিন্দুধর্মরূপ মহাবৃক্ষের একটি সমৃদ্ধ শাখা। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি আরও বহু শাখাদ্বারা এই মহান্ ধর্মতরু সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়—এক শ্রেণীর লোক না বুঝিয়া, অথবা দুরভিসন্ধিবশতঃ হিন্দুধর্মের উল্লিখিত শাখাসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সহজে অনুভব করিতে পারে না; ফলে উক্ত অপপ্রচারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্বজাতি এবং স্বধর্মের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট বেদবৎ প্রমাণ। যদিও কোন হিন্দুই এই মহাপুরাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারেন না, তথাপি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকটই ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব এবং শাক্ত-ধর্মের মধ্যে যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই, বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা দ্বারা আমরা তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তিদেবতাকে প্রণাম করেন না, এমন বৈষ্ণব অনেক আছেন। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, শক্তি-দেবতারাও তাঁহাদের মতো ভগবান বিষ্ণুর অধীন; অতএব বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী মনুষ্য হইতে শক্তিদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য নহে। এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহাও বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইবে।

মায়াশক্তির প্রভাব

মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়—কোনটাই সম্ভব নহে। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হন, তখনও দেখি—তিনি দেবকী ও বসুদেব উভয়কেই যথাক্রমে জননী ও জনকরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। মায়াশক্তির অংশ দেবকীকে ছাড়িয়া কেবল বসুদেবের কাছে তিনি আসেন নাই। কংসের হস্ত হইতে নিজের শিশু-দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্যও তিনি মায়াশক্তির

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মায়ার প্রভাবেই সেই সময়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ হইয়াছিল। গভীর খরস্রোতা যমুনা যে শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহাও মায়াশক্তিরই প্রভাবে। নন্দগোপের গৃহে স্বয়ং ভগবতী মায়াশক্তি কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এবং বসুদেব-কর্তৃক কংস-কারাগারে নীত হওয়ার পর যখন সেই দুর্বৃত্ত নৃপতি দেবকীর সন্তানজ্ঞানে শিশুকন্যাটিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রকাশ-পূর্বক গগনমার্গে উঠিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মায়াশক্তির এতগুলি লীলা প্রকট হইয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তির অংশরূপিণী গোপবালাগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্য নূতন লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন। গোপীলীলা-প্রসঙ্গে মায়াশক্তির সংযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের উদ্বাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও মায়াশক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাসলীলা-সম্পাদনের নিমিত্ত যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। কেবল কৃষ্ণাবতারেই নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কার্য-সাধনের জন্য ভগবান যে মায়াশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাও ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমুদ্রমন্থনের পর অসুরদিগকে বিমোহিত করিবার জন্য ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে (৮।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই দেখি ঋষিগণ সূতকে প্রশ্ন করিতেছেন :

আখ্যাহি হরের্ভগবন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥

ঋষিগণ জানিতেন, মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে ভগবান কখন একাকী লীলায় প্রবৃত্ত হন না; তাই তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবান মায়া-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া কিভাবে লীলায় প্রবৃত্ত হন, তাহা আমাদিগকে বলুন।' বলা বাহুল্য, সূতের উত্তরেও সর্বত্রই মায়াশক্তির অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক হইতে জানা যায়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং প্রলয়কর্তা রুদ্র সকলেই শক্তির সাহায্য লইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দশম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে অধিকতর পরিষ্কার ভাষায় অনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে ; যথা :

য এষ ঈশ জগদাত্মলীলয়া
স্বজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥

সৃষ্টিকর্তা যে এই শক্তির সহায়তা লইয়াই প্রথম সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিষ্কার উল্লেখ ১।২।৩০ শ্লোকে রহিয়াছে :

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হইল যে, ভগবান স্বয়ং নির্গুণ ; কিন্তু গুণময়ী নিজ মায়া-শক্তির সহায়তায় তিনি প্রথম সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন

পুরাণ-মতে সৃষ্টি চারি প্রকার : যথা—প্রাকৃতিক, নৈমিত্তিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক। তন্মধ্যে হরিশয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া যে সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নৈমিত্তিক সৃষ্টি নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, নৈমিত্তিক সৃষ্টির আদিতে সর্বব্যাপী সলিল-রাশির উপর ভগবান নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই সময়ে মহাশক্তি যোগমায়া নিদ্রারূপে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া

রাখেন, এবং ফলে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সর্ববিধ ক্ষমতা সাময়িকভাবে অপ্রকট থাকে।

বর্তমান সৃষ্টির আদিতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। এই সময়ে নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটিলে নারায়ণেরই কর্ণমল-সমুদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণু জড়বৎ অবস্থান করিতেছেন, আর দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল—যোগনিদ্রার স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে জাগ্রত বিষ্ণু অবশ্যই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মা তখন ভগবতী যোগনিদ্রা বা যোগমায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। মহাশক্তি যোগমায়া বিষ্ণু-নেত্রপত্রের আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং নিদ্রোত্থিত বিষ্ণু দানবদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে :

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥

প্রভৃতি শ্লোকে উল্লিখিত উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এখানে স্বয়ং ভগবান অপেক্ষা তাঁহার মায়াশক্তির অধিকতর প্রভাব স্বীকৃত হইল। উল্লিখিত আখ্যায়িকার পশ্চাতে একটি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে।

ভগবান যে তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারাই সৃষ্টি করেন, তাহা নানা শ্লোকে[১] অভিহিত হইয়াছে।

এই মায়াশক্তির লোকাতীত মহিমা দেখিয়া দেবর্ষি নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হন, এবং ইঁহাকে যোগিগণেরও দুরধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করেন। বিস্ময়াভিভূত দেবর্ষি শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন (১০।৬৯।৩৮) :

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি যোগিনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্! নির্ভাতা ভবৎপাদ-নিষেবয়া॥

এইভাবে ভগবতী যোগমায়ার বিশ্ববিমোহিনী শক্তির কার্যকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মায়াশক্তির স্বরূপ এবং শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ

যে মায়াশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, যিনি নারায়ণকে পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখেন, তাঁহার স্বরূপ কি—তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকে এই মায়াশক্তি 'প্রকৃতি' নামে অভিহিতা হইয়াছেন। তৃতীয় স্কন্ধে মহর্ষি কপিল দেবহূতির নিকট সাঙ্খ্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রকৃতির স্বরূপও বর্ণনা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যমতে, সৃষ্টির প্রাক্কালে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থাই 'প্রকৃতি' নামে অভিহিতা হন। ইহাদ্বারা সম্ভবতঃ মহর্ষি কপিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতে যখন অন্য কিছুই থাকে না, তখনও ভগবতী আদ্যাশক্তি সূক্ষ্মভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। ক্রমে এই প্রকৃতিতে বিকার উপস্থিত হইলে তাহারই ফলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আবার প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি বা মায়াশক্তি আদিঅন্তহীন অর্থাৎ নিত্য। নিত্যপদার্থের কোন আকৃতি থাকা সম্ভবপর নহে, অতএব ভগবতী মায়াশক্তি নিরাকারও বটেন। তবে

১ ১।৫।২৭, ১।৫।৩১, ৩।২।১০, ৩।৪।৩, ৩।৫।২৫, ৩।১০।১২, ৩।১৬।১৫ প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখযোগ্য।

তিনি সর্বশক্তিময়ী বলিয়া ইচ্ছা করিলেই যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকৃতিদেবীর পাঁচটি বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখা যায়, যথা :

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥

অর্থাৎ মনুষ্য, তির্যক্ প্রভৃতি যাবতীয় গণসমষ্টির জননী এই প্রকৃতিদেবী কখন দুর্গারূপে, কখন বা লক্ষ্মী সরস্বতী বা সাবিত্রীরূপে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুর্গারূপে তিনি আমাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, রাধারূপে দেন মুক্তি, লক্ষ্মীরূপে দেন ধনরত্ন যশ ইত্যাদি, সরস্বতীরূপে দেন বিদ্যা, আর সাবিত্রীরূপে করেন জীব প্রভৃতির সৃষ্টি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই : ভগবানের সহিত এই দেবীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, এবং থাকিলে তাহা কি প্রকার? ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকে 'দেবস্য মায়য়া' (৩।২।১০), 'যোগমায়াস্তে' (১০।৬৯।৩৮) প্রভৃতি উক্তিদ্বারা ভগবানের বাচক-শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীবিভক্তির যোগ করা হইয়াছে। কোন একটি সম্বন্ধ বুঝাইলে তবেই ষষ্ঠী বিভক্তির যোগ হইতে পারে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাগবতের মতে মায়াশক্তির সহিত ভগবানের একটি সম্বন্ধ আছে। 'সম্বন্ধ' নানাপ্রকার হইতে পারে। যদি স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়—মায়াশক্তি ভগবানের অধীন। ৬।১৯।১১ শ্লোকে ভগবানকে মায়াশক্তির অধীশ্বররূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা :

ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া।
তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত শ্লোকটি ভগবানের স্তুতিতে বলা হইয়াছে। যখন যাঁহার স্তব করা হয়, তখন অতিরঞ্জিতভাবে তাঁহার গুণ বর্ণনা করা হইয়া থাকে; সুতরাং স্তবস্থিত উল্লিখিত শ্লোকটি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে কি না, তাহা বিতর্কের বিষয়।

নৈমিত্তিক সৃষ্টির বর্ণনা-প্রসঙ্গে যোগনিদ্রার সহিত নারায়ণের যে সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়—ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রার অধীন ; কারণ যোগনিদ্রা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

প্রথম স্কন্ধের অষ্টম-অধ্যায়স্থিত কুন্তীর একটি উক্তিতে উল্লিখিত আপাতবিরোধী উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের একটা প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের পরম ভক্ত পাণ্ডব-জননী কুন্তী বলিয়াছেন (১।৮।১৯) :

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

অভিনয়-প্রদর্শনকালে অভিনেতারা যেমন নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া নূতন নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, ভগবানও তেমনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য মায়াশক্তিদ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া রাখেন। কোন ব্যক্তি যখন দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন যেমন সাধারণ দর্শকেরা তাহার ব্যক্তিগত বাস্তব পরিচয় লাভ করিতে পারে না, অজ্ঞ মানুষও তেমনি মায়াশক্তিদ্বারা আবৃত শ্রীভগবানের বাস্তব রূপ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যাহারা ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাহারা যেমন সাজ-সজ্জার অন্তরালে তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগণও তেমনি শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-রহিত যথার্থ রূপটির তত্ত্ব অবগত হন।

কোন কোন টীকাকার উল্লিখিত শ্লোকটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'মায়াজবনিকাচ্ছন্ন' শব্দটিদ্বারা বুঝা যায়, ভগবান মায়ারূপ-জবনিকাদ্বারা অচ্ছন্ন অর্থাৎ অনাচ্ছাদিত থাকেন। ইঁহারা বলিতে চাহেন—কুন্তীর মতে, ভগবান মায়াশক্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হন না। বস্তুতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে একদিকে যেমন মায়াকে জবনিকাতুল্য বলা ব্যর্থ হয়, অপরদিকে তেমনি 'নটো নাট্যধরো যথা' এই উপমাটিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

কুন্তী-প্রদর্শিত উল্লিখিত উপমাটি হইতে বুঝা যায়, তিনি মায়াশক্তির সাময়িক প্রাধান্য-মাত্র স্বীকার করিয়া মায়া-রহিত ভগবানের স্থায়ী প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। নট যেমন করিলেই নিজের বাহ্য সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারে, উক্ত মত স্বীকার করিলে তেমনি বলিতে হয়—ভগবান ইচ্ছা করিলেই মায়াশক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন।

ভাগবতের ৪।১৫।৩ শ্লোকে ঋষিগণ মায়া-শক্তিকে পুরুষরূপী ভগবান বিষ্ণুর অনপায়িনী-শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপায় শব্দের অর্থ 'বিশ্লেষ'; সুতরাং 'অনপায়িনী' বলিতে বুঝায়—যাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে ভগবানের ভগবত্তাই থাকে না বুঝিয়াই সম্ভবতঃ ঋষিগণ ইঁহাকে শ্রীভগবানের অনপায়িনী-শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নটের সজ্জা এবং ভগবানের মায়া-শক্তি সমধর্মাক্রান্ত নহে। ভগবান ইচ্ছা করিলেও সকল সময়ে মায়াশক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না। এই জন্যই যোগমায়ার আবেশ হইতে শ্রীভগবানকে মুক্ত করিবার জন্য যোগমায়ার স্তব করা ব্রহ্মার প্রয়োজন হইয়াছিল। বস্তুতঃ মায়াশক্তি ভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়াই তাঁহাকে ত্যাগ করা ভগবানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভগবান এবং মায়াশক্তি যে বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহার পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে ভাগবতের ১১।২৪।১০ শ্লোকে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ং ত্বহম্॥

—প্রকৃতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ-স্বরূপ; পরমপুরুষ (বা বিরাট্ পুরুষ) ইহার আধারসদৃশ এবং কাল সমুদয় বিদ্যমান পদার্থের প্রকাশক। ব্রহ্মরূপ আমি এই তিনটি হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি কুন্তী উপরের শ্লোকে অযথার্থ কথা বলিয়াছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, কুন্তীর উল্লিখিত উক্তিটি সম্পূর্ণ অযথার্থ নহে; ভক্তির আতিশয্যে অধিকারী-বিশেষের অনুভূতি যে উক্তপ্রকারও হইতে পারে, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

মায়াশক্তি এবং শ্রীভগবান যে বস্তুতঃ অভিন্ন তাহার অন্যবিধ প্রমাণও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়। ১।১৭।২৩ শ্লোকে পরম-ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন:

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ॥

এই শ্লোকে মায়াশক্তিকে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইল। উপনিষৎসমূহে একমাত্র পরব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর (অবাঙ্-মনসোগোচরম্) বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম এবং মায়াশক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই এক্ষেত্রে রাজা পরীক্ষিৎ মায়াশক্তিকেও উল্লিখিত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে সকল শ্লোকে ভগবান ও মায়াশক্তির উল্লেখক্রমে ভগবানের বাচক-শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ প্রকাশিত হইতেছে না। 'রাহোঃ শিরঃ' (রাহুর মস্তক) প্রভৃতি প্রয়োগে যেমন অভেদ-সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, উল্লিখিত স্থল-সমূহেও তেমনি অভেদ-সম্বন্ধেই ষষ্ঠী হইয়াছে। রাহু এবং মস্তক যেমন অভিন্ন, মায়াশক্তি এবং শ্রীভগবানও তেমনি অভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা কেবলমাত্র লোকব্যবহারবশতই করা হইয়া থাকে; বাস্তব অর্থে নহে।

ইহার পরও প্রশ্ন উঠিতে পারে—ষষ্ঠী বিভক্তি না হয় অভেদ-সম্বন্ধেই স্বীকার করিলাম; কিন্তু ভাগবতের কোন কোন স্থলে যে ভগবান ও মায়াশক্তির একত্র উল্লেখে ভগবানের বাচক-শব্দের সহিত প্রথমা বিভক্তি যোগ করিয়া মায়াশক্তির সহিত তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন? যদি সহার্থে বা করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ভগবান হইতে মায়াশক্তি অপ্রধান হইয়া পড়েন; আবার অনুক্ত কর্তায় বা হেতু-অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিলে মায়াশক্তি হইতে ভগবানকে ন্যূন বলিতে হয়।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলাঃ বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥

প্রভৃতি শ্লোকে মায়া-শব্দের সঙ্গে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, মায়াশক্তি-কর্তৃক ভগবানের অবতারসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপে 'মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্' (১।৯।১০) প্রভৃতি পদেও অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া ভগবান হইতে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যাইতে পারে।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥

প্রভৃতি শ্লোকে ভগবানকে প্রকৃতি বা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ (প্রকৃতেঃ পরঃ) বলা হইয়াছে। আবার অন্যান্য স্থলে যে কোথাও মায়ার শ্রেষ্ঠত্ব, কোথাও বা মায়া ও ভগবানের অভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ ভক্তগণ নিজ নিজ রুচি ও ধারণা অনুসারে কখন ভগবানকে, কখন বা যোগমায়াকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভগবান এবং যোগমায়ার মধ্যে বাস্তব ভেদ প্রমাণিত হয় না।

মাতা শ্রেষ্ঠ না পিতা শ্রেষ্ঠ—এইরূপ প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামানো যেমন সন্তানের কর্তব্য নহে; তেমনি ভগবান শ্রেষ্ঠ না মায়াশক্তি শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে অধিক বিচার-বিতর্কও শোভা পায় না। কোন কোন সন্তান মনে করে—তাহার মাতার চেয়েও পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা মাতারও গুরুজন। আবার অন্যেরা মনে করে—পিতার চেয়েও মাতা শ্রেষ্ঠ, কারণ গর্ভধারণ ও লালন-পালনের জন্য মাতার কাছেই তাহারা অধিকতর ঋণী। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও দ্বিবিধ উক্তিই দেখা যায়। কোথাও দেখি—'মাতা-ভস্ত্রা, পিতুঃ পুত্রঃ' অর্থাৎ সন্তানের জন্মব্যাপারে মাতা যন্ত্রমাত্র, সন্তান বস্তুতঃ পিতারই। আবার অন্যত্র দেখি, 'সহস্রন্তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেণা-তিরিচ্যতে'—অর্থাৎ সহস্র পিতার চেয়েও মাতার গৌরব অধিক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মাতা ও পিতার মধ্যে কে বড় আর কে ছোট—ইহার

মীমাংসা করা সহজসাধ্য তো নহেই, হয়তো বা সম্ভবপরও নহে। সন্তানের কাছে মাতা-পিতা দুইজনই দেবতুল্য, দুইজনই সমান পূজ্য। এখানেও আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে, ভগবতী আদ্যাশক্তি আমাদের সকলের জননী, এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবান আমাদের সকলের জনক। এই আদ্যাশক্তি ও শ্রীভগবান বস্তুতঃ দুই ব্যক্তি নহেন। একই মহাশক্তি কখন শ্রীভগবানরূপে কখন বা শক্তিরূপে—ভগবতীরূপে ভক্তগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল আমাদেরই কথা নহে; শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় যদি অন্যবিধ হইত, তাহা হইলে এই মহাগ্রন্থের ১১।২৪।১৯ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেকে মায়াশক্তি হইতে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২২।২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ!' কোন কোন টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—এক্ষেত্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 'পরস্পর ভিন্ন'। এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে তো প্রকৃতি এবং ভগবানের অভিন্নত্ব স্বীকার করা চলে না। উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে সকল টীকাকার উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া চলে না; কারণ তাহা যে কেবল ভাগবতের অন্যান্য উক্তির বিরোধী এমন নহে, ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও বিরোধী বটে।[১]

উল্লিখিত ১১।২২।২৯ শ্লোকে বিকল্প শব্দদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকৃতি এবং পুরুষের মৌলিক অভিন্নতাই প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ একই মহাশক্তি কখন প্রকৃতিরূপে, কখন বা পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন—ইহাই উল্লিখিত ভাগবত-বাক্যের অভিপ্রায়।

'স্ত্রীণাস্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্॥'

এই শ্লোকেও শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

ভাগবতে শক্তিপূজার বিধান ও ব্যবহার

শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে মায়াশক্তির অর্চনার বিধান এবং গোপকন্যা প্রভৃতি কর্তৃক শক্তিপূজার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণ-পাঠের পূর্বে দেবীসরস্বতীকে প্রণাম করা বিধেয়:

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ঐশ্বর্যলাভের জন্য মায়াশক্তির অর্চনা কর্তব্য, শ্লোক ২।৩।৩ যথা:

দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥

পুংসবন-ব্রতের বিধান-প্রসঙ্গে মহামতি শুকদেব যে অবশ্য-পাঠ্য মন্ত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ভগবতী মায়াশক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। উল্লিখিত মন্ত্র (৬।১৯।৬):

---

১ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 'ব্যবস্থিত-বিভাষা'। এই ব্যবস্থিত-বিভাষা কেবলমাত্র পদের বিভিন্নতা সম্পাদন করে; অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। 'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা ॥ ৮।৪।৪৫ ॥' এই পাণিনিসূত্রে বিকল্পবিধানের দ্বারা বলা হইয়াছে—অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত যর্ বর্ণস্থানে বিকল্পে অনুনাসিক বর্ণ হয়। ফলে এতৎ+মুরারিঃ এই সন্ধিতে একবার এতদ্-মুরারিঃ এবং অন্যবার এতন্মুরারিঃ এইরূপ দুইটি পদই হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উভয় পদেরই অর্থ সম্পূর্ণ অভিন্ন। এইরূপে 'মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু ॥ ২.৩।১৭ ॥ এই পাণিনিসূত্রদ্বারা মন্ ধাতুর কর্মে বিকল্পে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী দুইটি বিভক্তিই হয় বটে, কিন্তু মূল অনাদররূপ অর্থ অভিন্নই থাকে।

'বিকল্পস্তুল্যবলয়োর্বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ।'

এই বিকল্প-অলঙ্কারের লক্ষণদ্বারা বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরাও অনুরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'নমযন্তাং শিরাংসি ধনূংষি বা' প্রভৃতি বিকল্প অলঙ্কারের উদাহরণে নতিস্বীকাররূপ মূল অর্থ অভিন্নই থাকে।

বিষ্ণুপত্নি ! মহামায়ে ! মহাপুরুষলক্ষণে !
প্রীয়েথা মে মহাভাগে ! লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥

দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি, শ্রীভগবান ভগবতী যোগমায়াকে বলিতেছেন : হে দেবি ! যেহেতু তুমি মানুষের সর্ববিধ অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকো, এই কারণে মানুষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তোমার অর্চনা করিবে। মানুষ কি কি নামে দেবীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অর্চনা করিবে, তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ শ্রীভগবান করিয়াছেন। শ্রীযোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি (১০।২।১০-১২):

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্বকাম-বরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥

দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি—কংসকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া শিশুরূপিণী যোগমায়া যখন গগনমার্গে আরোহণ করিলেন, তখন কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ প্রদান করত তিনি আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্হিতা হইয়া যান বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেন নাই। দেবীর এই লোকাতীত প্রভাব দেখিয়া তাহার পর হইতে অধিক-সংখ্যক লোক নানা স্থানে নানা নামে দেবীর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক নূতনভাবে তাঁহার অর্চনা আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪।১৩) বলিয়াছেন :

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনাম-নিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥

দশম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—গোপকন্যাগণ নন্দগোপের পুত্রকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই কাত্যায়নী যে দেবী মহামায়া ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, পূজার মন্ত্রগুলি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গোপীগণ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর নিকট নিজেদের বাসনা নিবেদন করিয়াছিলেন (১০।২২।৪):

কাত্যায়নি ! মহামায়ে ! মহাযোগিন্যধীশ্বরি !
নন্দগোপসুতং দেবি ! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

উল্লিখিত কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় নাই, কারণ ইহার ফলে গোপকন্যাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

১০ম স্কন্ধেরই ৫৬তম অধ্যায়ে স্যমন্তক-মণির উপাখ্যান-প্রসঙ্গে আবার দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গ দ্বারকার অন্যান্য অধিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার উপাসনা করিতেছেন। উদ্দেশ্য—সত্রাজিতের কবল হইতে যেন শ্রীকৃষ্ণ নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিতে পারেন। এখানে মূল শ্লোকে 'দুর্গা' শব্দটিরই উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়গণের এই দুর্গাপূজা ব্যর্থ হয় নাই; কারণ ভগবতী দুর্গা তাঁহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই সম্মুখে আবির্ভূতা হন, এবং 'শ্রীকৃষ্ণ বিপন্মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবেন' এই বর দিয়া অন্তর্হিতা হন। তাহার অব্যবহিত পরেই স্যমন্তকমণি উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে :

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥
তেষান্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা সহ।
প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থানেও কোথাও শক্তিপূজার সমর্থন, কোথাও বা তাহার সমর্থনের ইঙ্গিত দেখা যায়।

উপসংহার

আমাদের বিবেচনায় যে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ও মায়াশক্তির মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ স্বীকার করা হয় নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শক্তিপূজার বিধান এবং তাহার আচরণের দৃষ্টান্তও যে ভাগবতে রহিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—মানুষ যদি নিজ নিজ রুচি, প্রকৃতি ও ধারণা অনুসারে একই ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে পূজা করে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিভিন্ন ফল-কামনায় ভগবান ও মায়াশক্তির অর্চনা করা হইয়া থাকে, এইরূপ বলা যাইতে পারে কি না? ঋগ্বেদ বলিয়াছেন (১।১৪৮।৩৬):

একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি,
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

তন্ত্রশাস্ত্র (কুলার্ণব-তন্ত্র) বলিয়াছেন:

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে এমন কথা বলা হয় নাই যে, বিভিন্ন ফলকামনায় একই পরব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে অর্চনা করা হয় না। সুতরাং উপরের লেখা-মত ব্যাখ্যা করার পক্ষে তো কোন বাধা দেখা যায় না।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও উক্ত প্রকার অভিমত গ্রহণই সঙ্গত মনে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিয়াছেন: 'মা' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্য' আর 'যা' শব্দের অর্থ 'প্রাপণ'; সুতরাং যাঁহার অর্চনার ফলে সত্বর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া যায়, তিনিই 'মায়া' নামে অভিহিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ২৭শ অধ্যায়ে:

রাজন্! শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্তিতা॥

ঐশ্বর্য-কামনায় যে দেবী-মায়ার উপাসনা করা হয়, উপরে প্রদর্শিত 'দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামঃ (২।৩।৩)' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে।

অন্যপক্ষে আবার 'কৃষ্ণ'শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'কৃষি'শব্দের অর্থ সংসার এবং 'ন'শব্দের অর্থ নিবৃত্তি; সুতরাং যাঁহার উপাসনা করিলে বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয়, তিনিই কৃষ্ণ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীহরির উপাসনা করিলে যে মানুষ নির্গুণ বা আসক্তিহীন হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও (১০।৮৮।৫) এই কথাই বলা হইয়াছে:

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥

এতদ্ব্যতীত,

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ॥

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতেও মুক্তি-কামনাতেই জনার্দন বা বিষ্ণুর উপাসনা করিবার কথা বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন ফলকামনায় বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করা হয় বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। এইরূপ নিয়ম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে 'প্রায়িক নিয়ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

শ্রীভগবান যেমন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, মায়াশক্তিও তেমনি উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্যই সাধন করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত-প্রকার উক্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ তো পরিষ্কার ভাষাতেই মায়াশক্তির বর্ণনায় বলিয়াছেন :

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥

অর্থাৎ এই আদ্যাশক্তিই বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়—সমুদয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানও যে কেবল মুক্তিদানই করেন, এমন নহে, তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা অনুসারে তাহাকে ঐহিক ভোগও দান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণাবতারে গোপীগণের প্রার্থনা-পূরণে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দানবকে বিনাশ করিবার সময় তিনি স্বকীয় রুদ্ররূপও প্রকটিত করিয়াছেন। ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত মায়াশক্তি এবং ভগবান উভয়েই পুনঃ পুনঃ দানবগণকে বিনাশ করিয়া সাধর্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন।

দেবী যোগমায়ার ক্ষেত্রে দেখি, তিনি কখন দুর্গারূপে ভক্তের দুর্গতি-হরণ, কখন বা শিবা মঙ্গলচণ্ডীরূপে তাহার অন্যবিধ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। প্রার্থিগণের প্রার্থনা-অনুসারে তিনি তাহাদিগকে রূপ, জয়, যশ, ধন, রাজ্য, মনোরমা পত্নী—সব কিছুই দান করিয়া থাকেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদের শত্রুনাশ বা অধিকারী-ভেদে মুক্তিদানেও তিনি পরাঙ্মুখ হন না। 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' প্রভৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডীর উক্তিগুলিই ইহার প্রমাণ।

দুর্গাপূজার বিধানেও দেখিতে পাই, অধিকারী-ভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ত্রিবিধ পূজারই উল্লেখ রহিয়াছে। সাত্ত্বিক পূজার ফলে হয় জ্ঞান ও মুক্তিলাভ, আর রাজসিক পূজা করিলে হয় ঐশ্বর্যলাভ, তামসিক পূজার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

উল্লিখিত বিধান ও শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে-কোন মানুষ যে-কোন কামনা লইয়া অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ভগবতী বা ভগবানের যে-কোন রূপে পর-ব্রহ্মের উপাসনা ও অর্চনা করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে শক্তিপূজার বিরোধী নহেন, আশা করি উপরের লেখাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

স্বামী তেজসানন্দ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে মানবের চিন্তা ও কর্মজগতে বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধিকল্পে ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লববিচিন্তাসমন্বিত যে-সকল মানব দেশে দেশে স্ব-স্ব অমূল্য অবদানের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। যে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল বলিয়া প্রতিভাত হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা ও অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রকাশের পক্ষে সেইরূপ পরিস্থিতিরই যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। সেই যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভাঙাগড়ার যে প্রবল প্লাবন সমাজের উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই আবর্ত-সঙ্কুল স্রোতোমুখে কত মনীষী তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা—তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কৌতূহলী মনকে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর উপাসনায় মগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যায়তনের নির্দিষ্ট পুঁথিপুস্তকের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে চিরতরে শৃঙ্খলিত রাখিয়া তিনি গতানুগতিকভাবে প্রতিভা-বিকাশের চেষ্টা কখনও করেন নাই; অথবা মনুষ্যসমাজকে বর্জন করিয়া গভীর অরণ্যে বা নির্জন গিরিদরীতলে যোগাসনে কৃচ্ছ্রসাধনেও নিমগ্ন হন নাই। তাই তিনি 'মুক্তি' কবিতায় স্বকীয় সাধনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন,—সে নহে আমার।
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর—মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আত্মিক মিলনের প্রয়াসের মাধ্যমেই তিনি মানবজীবনের গূঢ়-রহস্য-উদ্‌ঘাটনে নিজেকে অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধর্ম সম্বন্ধে নিজেই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন:

আমার ধর্ম বস্তুতঃ কবির ধর্ম। সঙ্গীতের অজ্ঞাত প্রেরণার মতই এক অচেনা রেখাহীন পথ বাহিয়া আমার ধর্ম আমার অন্তরে স্পর্শ দিয়াছে। আমার কবি-জীবন যে-ভাবে বিকশিত হইয়াছে, ধর্মজীবনও ঠিক সেইরূপ দুর্বোধ্য রহস্যময় পথ অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহারা উভয়েই এক অচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে সম্বদ্ধ। কিন্তু কখন কিভাবে যে ইহাদের মিলনপর্ব শুরু হয়, তাহা দীর্ঘকাল আমার নিকট অজ্ঞাতই ছিল। সহসা এক শুভমুহূর্তে এই মিলন আমার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে।

কবির এই সহজাত ধর্ম তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়া একদিকে যেমন আত্মবিকাশের পথের

সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরের নিভৃত প্রদেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে উদাত্ত গম্ভীর সুরে মন্ত্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ে কেমন করিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহাই রূপায়িত করিয়া কবি গাহিয়াছেন:

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

'অরূপরতনে'ও ঠিক এই একই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে:

যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভামাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

তাই প্রগতিবাদী হইয়াও প্রকৃতির গভীরে যে নিগূঢ় সনাতন সত্য নিহিত, তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে তিনি কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বিশাল উদারতা ও মহামানবতার পূজারী করিয়া তুলিয়াছিল। বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐকতান শুনিতে পাইয়া কবি গাহিয়াছেন:

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্তকল্লোল॥

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতোই যাঁহার দরদী হৃদয় পাষাণকারা ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মানবকল্যাণে ধাবিত হইয়াছিল, সেই মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরঙ্গমঞ্চের খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া বিদায়বেলায় অন্তরের উপলব্ধি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন:

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

বলা বাহুল্য, এই গভীর অনুভূতিই রবীন্দ্রসাহিত্যকে এত রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মানবেতিহাসে এ-দৃশ্যও বিরল নহে—স্বদেশবাসীর সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীর কল্যাণেই সমগ্র চিন্তা ঢালিয়া দিয়া কেহ কেহ বিশ্বপ্রেমিক সাজিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমিকতা স্বদেশবাসীকে বাদ দিয়া বা দেশবাসীর লাঞ্ছনা দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কোন দিনই বহির্দেশে ধাবিত হয় নাই। তাঁহার সর্বজনীনতা একদিকে যেমন জাতিধর্মনির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিতে শিখাইয়াছিল, তেমনি স্বদেশের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে মিলিত করিয়া দেশবাসীর বেদনাভরা মর্মের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে সাড়া দিয়া তাঁহাকে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। তাই তো তিনি গাহিয়াছেন:

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখ রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

ঐক্যমন্ত্রের উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যগঠনকল্পে প্রতীচ্যের সম্পদ্‌কে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অবদানের অপূর্ব সম্মিলন ও সামঞ্জস্যের মধ্যেই ভারত ও ভারতের সমগ্র দেশের কল্যাণবীজ নিহিত রহিয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন :

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে,
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশবাসীর জাড্য-তামসিকতা ও প্রাণহীন আচার-পদ্ধতিকে যেমন তীব্র কশাঘাত করিয়াছে, তৎকালীন বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ-নীতির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্ব-দরবারে তাহাদের কদর্য স্বরূপ প্রকাশ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হয় নাই। স্বদেশবাসীর যুগসঞ্চিত পঙ্কিল আবর্জনা বিদূরিত করিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশসেবকরূপে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। যেখানেই মহাসর্বনাশ নিষ্পলক-নেত্রে জাতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের দরদী হৃদয় নির্ভয়ে দেশবাসীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছে। নিপীড়িত দেশবাসীর আর্তনাদে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ সিংহবিক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের প্রাণে উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ আসন্ন বঙ্গ-চ্ছেদের ঘনঘটা যখন বাংলার ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিল, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলার সন্তানগণকে মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আবেগময় উদাত্ত সুর রবীন্দ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল :

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন—
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লিখিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই; তিনি বিক্ষুব্ধ জন-সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভদ্র-অভদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-নির্বিচারে সকলের হস্তে মিলনের রাখী বাঁধিয়া দিলেন; সকলকে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে বাংলার নরনারীর বুকে সেদিন যে অমিত বিক্রম ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার দুর্বার বেগ প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের হৃদয়েও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। সেদিনের সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাদেশিকতা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া জয়যাত্রার পথের সমগ্র বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কুটনীতিজ্ঞ ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তকে সমূলে বিচ্ছিন্ন করিয়া একপ্রাণতা ও সংঘশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দিল। সত্যের জয় বিঘোষিত হইল।

১৯১৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সহসা তথাকথিত সভ্য ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের জনৈক সেনাধ্যক্ষ নিরীহ নরনারীর উপর অতর্কিত গুলি বর্ষণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে তিন শত উনআশী জন শিখ, হিন্দু, মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া মানবেতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই লোমহর্ষণ কাহিনী রবীন্দ্র-

নাথের মর্মস্থানে তীব্র আঘাত হানিয়া তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন 'নাইট' উপাধি বর্জনের মাধ্যমেই তাহা প্রকৃষ্টভাবে প্রকট হইয়াছিল। এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি ১৯১৯ খৃঃ ৩০শে মে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনালব্ধ শক্তির কি প্রদীপ্ত প্রকাশ আমরা তাঁহার এই তীব্র প্রতিবাদ ও দেশবাসীর লাঞ্ছনায় স্বীয় অপমান-বোধের মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার রুদ্রবীণা তাই একদিন দীপক-রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

পরাধীন জাতির ইতিহাসে এইরূপ মর্মন্তুদ ঘটনা দিনের পর দিন ঘটিয়া থাকে। ১৯৩১ খৃঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলী জেলে নিরস্ত্র নিঃসহায় বন্দীগণের উপর ব্রিটিশ সৈনিকের গুলিবর্ষণ জালিয়ানওয়ালাবাগেরই পুনরভিনয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ সংবাদ রোগ-শয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার স্বাধীন চিত্ত কখনও মনুষ্যত্বের এত লাঞ্ছনা ও অপমানের নিকট নতিস্বীকার করিতে শিখে নাই। তাই জাতির প্রতিনিধিরূপে উন্মুক্ত অম্বরতলে কলিকাতা মনুমেণ্টের পাদমূলে লক্ষাধিক ক্ষুব্ধ নরনারীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা অচিরকালমধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। স্বাধীন ভারত আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি মদগর্বিত ইংরেজকে সতর্কবাণী শুনাইয়া বলিয়াছিলেন :

এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ; এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি? এ-কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের উপরেই বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশবাসীকেও সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন : এ-কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজেদের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা ক'রে পাপের মূলগত প্রতি-কারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।

ভারতের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও মানবতার বাণী সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ-কথা আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ভারতের মর্মবাণী বহন করিয়া যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সমবেত সুরে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ভারতের তথা প্রাচ্যের সমুন্নত আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে

চেকোশ্লোভাকিয়া পরিভ্রমণকালে তদানীন্তন প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Mortiz Winternitz প্রাগ শহরে তদ্দেশবাসীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভার অমূল্য অবদানের প্রতিই তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বদেশে বা বিদেশে যখনই সত্যের অমর্যাদা ঘটিয়াছে, যখনই বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা বন্ধুত্বের মুখোশ পরিয়া একটা জাতির সর্বনাশ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে, তখনই রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে তীব্র প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার তথাকথিত বন্ধুবর্গের অমার্জনীয় দুর্বলতা ও জার্মান-ভীতি ইওরোপীয় ইতিহাসে Munich Betrayal-রূপ এক মসীলিপ্ত অধ্যায় রচনা করিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন চেক মনীষী Vincent Lesny-কে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সত্যসন্ধ জাতিমাত্রেরই অন্তর্বেদনার উত্তপ্ত উৎসার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তিনি স্বাধীনতাপ্রিয় সমগ্র জাতিকে অসত্য ও কপটতার বিরুদ্ধে সদর্পে দণ্ডায়মান হইবার জন্য যে উদাত্তগম্ভীর আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত Call-কবিতার প্রতি ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে :

......Come young nations,
Proclaim the fight for freedom,
Raise up the banner of invincible faith.
Build bridges with your life
across the gaping earth
Blasted by hatred,
Do not submit yourself to carry
the burden of insult upon your head.
Kicked by terror,
And dig not a trench
with falsehood and cunning
To build a shelter
for your dishonoured manhood;
Offer not the weak
as sacrifice to the strong
To save yourself.

সেই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোধূলিলগ্নে তাঁহার অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর শুভবাসরে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাঁহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ ভাষণে মানবজাতির সম্মুখে যে চিন্তাসম্পদ্ পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন :

...The demon of barbarity has given up all pretence and has emerged with unconcealed fangs and teeth, ready to tear up the world and spread devastation. From one end to another poisonous fumes of hatred defile the atmosphere. This plauge of persecution which lay dormant in the civilization of the West has at last roused itself to create havoc and desecrate the spirit of man. In our present luckless, helpless and hopeless poverty, have we not already seen this world-wide destruction at work? A mortal combat has begun between one power and another, and no one knows what it will bring about in the end.

The wheels of Fate will some day compel the English to give up their Indian empire. But what kind of India will they leave behind, what stark misery? When the stream of their centuries' administration runs dry at last, what a waste of mud and filth will they leave behind them! I had at one time believed that the springs of civilisation would issue out of the heart of Europe. And today when I am about to quit the world, that stubborn faith has gone bankrupt altogether.

ভারতবন্ধু ইংরেজ Sir Daniel Hamilton-এর কণ্ঠেও ভারতে ইংরেজ-শাসনের পরিণতি

সম্বন্ধে ঠিক একই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। তিনিও লিখিয়াছেন :

If Britain has to leave India as suddenly as Rome had to leave Britain, then England shall leave behind a country minus education, minus sanitation and minus money.

ভাগ্যের কি তীব্র পরিহাস! দুর্নিবার ঘটনা-পরম্পরায় ভারতের পরাধীনতার সুচির শর্বরীর অবসান হইতে বিলম্ব হইল না। যে সাম্রাজ্যবাদ 'Rule Britannia'—সঙ্গীত-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিল, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহাই আবার ভাটার টানে গা-ভাসাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। শৃঙ্খল-মুক্ত ভারত সিন্ধুসলিলে মুক্তিস্নান করিয়া সমুন্নত শিরে বিশ্বসভায় সগর্বে সম্মানিত আসন অধিকার করিল। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, বাণী ও সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের এই শুভলগ্নে* আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করি। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একই সুরে গাহিব :

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয় ;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
যজ্ঞশিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে॥

* বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-উৎসবের উদ্বোধন-দিবসে (৫.১০.৬১) পঠিত ভাষণ হইতে সংকলিত।

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (দ্বিতীয় ষট্‌ক—শ্রীধর-টীকা সহ): স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড় (হাওড়া)। পৃষ্ঠা ২৯২ + ৪৪ ; মূল্য ৫৲।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রথম ষট্‌কের ন্যায় প্রতি শ্লোকের মূল, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা ও তাহার আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের গীতাভাষ্য হইতে বহু উদ্ধৃতি এবং মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শঙ্করানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারের বহু বাক্য এবং নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা-সহ গীতার অর্থ-প্রকাশের জন্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুবোধিনী টীকায় যে সব শ্রুতি-বাক্য বা শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহা পাদটীকায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় টীকার তাৎপর্য উপলব্ধির সহায়ক হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অলৌকিক গীতাধ্যান' ও 'কল্কিগীতা' ও শেষাংশে 'কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে' প্রবন্ধ-তিনটিতে এমন সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সব বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি উৎকৃষ্ট টীকার অনুবাদ-সহ এইগুলি প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বের আলো শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৯০ ; মূল্য টাকা ১·৫০।

আলোচ্য পুস্তকটি ছোটদের উপযোগী ক'রে লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বংশপরিচয়, জন্ম ও বাল্যকাল, কলকাতায় আগমন, দক্ষিণেশ্বরে গদাধর, সাধকরূপে ঠাকুর, বিবাহ ও শ্রীশ্রীমা, তীর্থযাত্রা, ভক্তসমাগম, দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর প্রভৃতি আলোচিত। ইহা ছাড়া দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের কথা এবং ৮ জন গৃহী ভক্তের বিষয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮টি উপদেশ লিপিবদ্ধ। বইটি বালক-বালিকাদের জন্য লেখা হলেও একসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকায় বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য-ভক্তদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা বইটি থেকে পাওয়া যাবে।

সরল গীতা—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। প্রকাশক: পি. কে. ঘোষ এণ্ড কোং, ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭ ; মূল্য টাকা ১·৫০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহজ গদ্যানুবাদ। অনুবাদ আক্ষরিক করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও গীতার বিষয়বস্তু ও শিক্ষার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

বাল্মীকি রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড)—সারাংশের পদ্যানুবাদ: আশালতা সেন। প্রকাশক: শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৩নং কাশীনাথ চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। প্রাপ্তিস্থান:

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২২০ ; মূল্য টাকা ৩·৫০।

আদিকবি মহামুনি বাল্মীকির অপূর্ব গ্রন্থ রামায়ণ সরলতায়, ভাবসম্পদে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, কাব্যসৌন্দর্যে অনবদ্য। বাল্মীকি-রামায়ণ একাধারে মহাকাব্য ও মহাসঙ্গীত। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই রামায়ণের জ্ঞান থাকা উচিত। মূল বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনেই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয়, ইহা শুধু যুদ্ধকাণ্ডের সারাংশের পদ্যানুবাদ হইলেও যুদ্ধকাণ্ডের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের পরিচয়-প্রদানের উদ্দেশ্যে আদিকাণ্ডের প্রথম দুই সর্গের অধিকাংশ শ্লোক সানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধকাণ্ডস্থিত কাহিনীগুলি যথা—নাগপাশ-বন্ধন, রাবণের যুদ্ধ-সজ্জা, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, রাবণের শোক খুব হৃদয়স্পর্শী। পুস্তকটি পাঠ করিলে মূল রামায়ণের বৈশিষ্ট্যের সহিত কিঞ্চিৎ কাব্যাস্বাদও লাভ হইবে। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সহজ, অথচ মূলানুগ।

সম্পূর্ণ বাল্মীকি-রামায়ণের মূল সহিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইলে পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে।

কয়েকটি পূজার তত্ত্ব—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১ ; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থটিতে গুরুপূজা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ত্ব, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, শিবরাত্রি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের 'মণিরত্ন-মালা'র শ্লোকগুলি পদ্যানুবাদ-সহ সংযোজিত। রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল।

—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিদ্যামন্দির পত্রিকা—(রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-সংখ্যা, ১৯৬১)—প্রকাশক : স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১০২।

রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে প্রকাশিত সুমুদ্রিত 'বিদ্যামন্দিরে'র এই বিশেষ সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত। অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'যুগসমস্যা-সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'Talking about History', 'A new experiment in the field of education at Belur.'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সৎসঙ্গানন্দের দেহত্যাগ

গত ৩রা নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি ১০-৪৩ মিনিটের সময় স্বামী সৎসঙ্গানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর সরকারী কর্ম হইতে উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম দিকে তিনি কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে দীর্ঘকাল তপস্যায় রত ছিলেন। শেষ জীবনে ১৫ বৎসরের অধিককাল জয়রামবাটী মঠে থাকিয়া সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তিনি খুব ধ্যানজপ পরায়ণ সাধু ছিলেন। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কার্যবিবরণী

শিলংঃ ১৯২৪ খৃঃ আসামের রাজধানী শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরে শেলাগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ নংওয়ার, চেরাপুঞ্জি, শিলং-এ কার্যধারা বিস্তৃতি লাভ করে। শিলং কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২৯ খৃঃ এবং ১৯৩৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপযুক্ত পরিচালনার জন্য শেলা ও নংওয়ার বিদ্যালয়ের সহিত চেরাপুঞ্জিকে ১৯৪৯ খৃঃ স্বতন্ত্র কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে।

শিলং কেন্দ্রের জানুআরি '৬০ হইতে মার্চ '৬১ বার্ষিক বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭, ৫২৮ (নূতন ২৮,৬৩৬) ও ১৮,৮২০ (নূতন ১১,৩৩৩)। ল্যাবরেটরিতে ১,১৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষিত রোগীর সংখ্যা ২৮০। চক্ষু ও E.N.T. বিভাগে যথাক্রমে ৫৪৫ জন ও ৯২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়; সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা ২৪১। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে ৩,৪২৯ গ্রামবাসী চিকিৎসা লাভ করে।

বিবেকানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৪,৯১৪ (নূতন সংযোজিত ২৩৬); পাঠাগারে ১২টি সংবাদপত্র ও ২৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়; দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪৩।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২৭ জন (৪ জন ফ্রি) বিদ্যার্থী ছিল। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য ১২০টি ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা হয়। হরিজন কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নারটিয়াং নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ ও ২১। সারদা-সংসদ শিশু-বিদ্যালয়ে অঙ্কন সঙ্গীত প্রভৃতি শিখানো হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য শতাধিক ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সাপ্তাহিক ধর্মসভার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ১৬; শ্রোতৃ-সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ১০১ ও ৫৮। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠের জন্মতিথিগুলি এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৬০ খৃঃ এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী

বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ এখানে আসেন এবং তিন সপ্তাহকাল থাকিয়া ১২টি ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

এই আশ্রম কর্তৃক আলোচ্যবর্ষে 'সৎপ্রসঙ্গ' (২য় ভাগ)—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং স্বামী সারদেশানন্দ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব' প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচী-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

কলিকাতাঃ গত ২রা হইতে ৪ঠা এবং ৬ই হইতে ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে (Gol Park, Calcutta 29) নব-নির্মিত বিবেকানন্দ-হলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের মনীষিগণ বিভিন্ন ভাষায় (প্রধানতঃ ইংরেজীতে) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

২রা: অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সভ্যতার বিশ্বজনীন নীতি ও প্রকার';

৩রা: অধ্যাপক মেনশিং 'বিশ্বে ধর্মগুলির সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার উদ্দেশ্য ও প্রকার' এবং অধ্যাপক মহাদেবন 'ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্বভৌম আবেদন';

৪ঠা: অধ্যাপক লেঁড্ড 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে পারস্পরিক গুণাবধারণ' এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'আধুনিক জীবন-সমস্যায় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া';

৬ই: অধ্যাপক হোয়েবেল 'নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে আধুনিক জীবনের মূল সমস্যা' এবং অধ্যাপক টনাকা 'সাহিত্য-প্রচারে ধর্ম';

৭ই: অধ্যাপক কৈশরলিং 'কৃষ্টি কি অপরিহার্য?' এবং অধ্যাপক সাফা 'কৃষ্টিগত ঐক্য';

৮ই: অধ্যাপক ক্যালিস 'প্রাচীন ঐতিহ্য ও এক-জগৎ সমস্যা'।

৯ই: প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার নিজস্ব মন্তব্যের সহিত কয় দিনের আলোচনার (Symposium) সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনে যে সব বিষয়ের সুচিন্তিত আলোচনা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। ভারত, ইওরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীল অধ্যাপকগণের এই গবেষণামূলক বৈঠক আমাদের চিন্তার পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদের জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা-সফর

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের এবং লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অনুরোধে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা- ও সংস্কৃতি-বিভাগের মন্ত্রী-দপ্তরের উদ্যোগে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ইওরোপের ১৬টি দেশে গত এপ্রিল হইতে অগস্ট মাসে বক্তৃতা সফর করেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতার প্রধান বিষয়গুলি ছিল: (১) ভারতীয় কৃষ্টির শক্তি, (২) ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন, (৩) উপনিষদের (বেদান্তের) মাধুর্য, (৪) গীতার সার্বভৌম বাণী, (৫) ভারতের মহাপুরুষগণ, (৬) বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, (৭) বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পটভূমিকা, (৮) উপাস্য খৃষ্ট, (৯) শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, (১০) স্বামী বিবেকানন্দে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন, (১১) বর্তমান জগতে বেদান্তের আবেদন, (১২) বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম, (১৩) ভারতের নব জাগরণ, (১৪) নারী-জাতির ভারতীয় আদর্শ, (১৫) শিল্প-যুগে আধ্যাত্মিক জীবন, (১৬) ভগবদ্গীতার মূল কথা।

নিম্নে তারিখ ও স্থান প্রদত্ত হইল :

তারিখ	দেশ	নগর
এপ্রিল, ১১—১৬	গ্রীস	এথেন্স
১৭—২০	ইটালি	রোম
		ফ্লোরেন্স, আসিসি
২১—	যুক্তরাজ্য (U.K.)	লণ্ডন
মে ১১		অক্সফোর্ড, মাঞ্চেস্টার
		লীডস্, বার্কিংহাম
		কেমব্রিজ, নিউক্যাস্ল্
		এডিনবার্গ, গ্যাসগো
মে, ১২—১৫	ডেনমার্ক	কোপেনহাগেন
		এলসিনোর
১৬—১৯	নরওয়ে	ওস্লো
২০—২৩	সুইডেন	ষ্টকহল্ম্, কিরুনা
২৪	ফিন্ল্যাণ্ড	হেলসিঙ্কি
২৯—২৯	হল্যাণ্ড	হেগ
৩০,—জুন ১	বেলজিয়াম	ব্রাসেল্স্
জুন, ২—১০	জার্মানি	ষ্টাট্গার্ট
		হিডেলবার্গ, মারবার্গ
		গটিন্জেন, হামবুর্গ
		মিউনিক
১১—১৫	অষ্ট্রিয়া	ভিয়েনা
১৬—১৮	পোল্যাণ্ড	ওয়ার-স
১৯—২৩	চেকোস্লোভাকিয়া	প্রাগ
২৪—২৭	সুইট্সারল্যাণ্ড	জুরিখ, বার্ন
২৮ ৩০	স্পেন	মাদ্রিদ
জুলাই, ১—৯	ফ্রান্স	প্যারিস, অরলিয়েন্স
১০ ৩১	ইংলণ্ড	লণ্ডন
অগষ্ট, ১—৮	রাশিয়া	মস্কো, লেনিনগার্ড

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান ফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) : নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জুলাই মাসের শেষ বুধবারের বক্তৃতাটি দেন স্বামী পবিত্রানন্দ। অগস্ট মাসে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কোন বক্তৃতা হয় নাই।

জুন : ঈশ্বর-দর্শন না হইলে ধর্মজীবনে কি লাভ? গীতায় ঈশ্বর-তত্ত্ব ; সকলেরই ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করা উচিত ; গীতার আধ্যাত্মিক শিক্ষা ; আত্মশক্তি ; মানস ও অতিমানস ; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর ; স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ।

জুলাই : প্রাচ্য জগতের জন্য বুদ্ধদেবের যেরূপ বিশেষ বাণী ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের সেরূপ পাশ্চাত্যের জন্য ; যোগ—নূতন ও পুরাতন ; কিরূপে ও কাহাকে উপাসনা করিব? শক্তি কিভাবে জাগরিত হয়? যদি তুমি জানিতে, তুমি কে? শ্রীগুরু ও দীক্ষার অর্থ।

সেপ্টেম্বর : ধ্যান ও একাগ্রতা ; ধর্ম ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মৃত্যু ও জীবন দীপ্তি ; স্বপ্নের আধ্যাত্মিক অর্থ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্' আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্য দিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত-ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়। জুলাই মাসে পুরাতন মন্দিরে ক্লাস ও দর্শনাদি বন্ধ থাকে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় দর্শন-সম্মেলন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী জয়ন্তীর অঙ্গরূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় দর্শন-মহাসভার ৩৬ তম অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে শান্তি-নিকেতনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা ভারতীয় চারুকলার যে পুনরভ্যুত্থান ঘটাইয়াছে, সে বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি সভাপতি ডক্টর টি. আর. ভি. মূর্তি অসুস্থ হওয়ায় মহাসভার কর্মসমিতির সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মূল সভাপতির কার্য করেন। 'বর্তমানে সামাজিক জীবনে ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি-রক্ষায় ভারতীয় দার্শনিকদের কর্তব্য' বিষয়ে তিনি সারগর্ভ ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় ডক্টর সুধীরঞ্জন দাস, ডক্টর শচীন সেন, অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়, ডক্টর সরোজ-কুমার দাস, ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং ডক্টর আর. জে. কুপার ভাষণ দেন। আর এক আলোচনা-সভায় 'রাষ্ট্রের কোন দর্শনের আবশ্যকতা আছে কি না?'—এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

তর্কশাস্ত্র- ও তত্ত্ববিদ্যা-শাখার সভাপতি ডক্টর মোহান্তি, দর্শনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক কে. কে. ব্যানার্জি মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতি ডক্টর মাসি এবং নীতিশাস্ত্র- ও সমাজ-দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক অনিরুদ্ধ ঝা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এ সব শাখায় অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়।

ডক্টর তান্ ইউন্ সান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বুদ্ধ-জয়ন্তী বক্তৃতা এবং ডক্টর জে. এন. চাব বেদান্ত-সম্বন্ধে শ্রীমন্ত প্রতাপ শেঠ বক্তৃতা প্রদান করেন। শেষে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতি রক্ষার্থে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে। এজন্য তিনি দর্শনানুরাগী জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন এবং অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (৫৯-বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা ২৯) সাহায্য পাঠাইতে বলেন।

কার্যবিবরণী

বিকানীর: শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের বার্ষিক (১৯৫৮-৬০) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। রাজস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা ও বেদান্ত প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে নিত্য পূজা ও সাময়িক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হইয়া থাকে।

একটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। হিন্দীতে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনচরিত, গীতাবোধ, শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ভক্তিতত্ত্ব, মহাপুরুষ-বাণী, জ্ঞান-দীপিকা। প্রতি বৎসর বিকানীরের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে চিত্রকলা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

কটক: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সম্প্রদায়ের বার্ষিক (১৯৫৫-৬০) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির আদি নাম ছিল রামকৃষ্ণ ভিক্ষু-সম্প্রদায়। ১৮৯৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বালক গৃহে গৃহে চাউল সংগ্রহ করিয়া এই সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করে। বর্তমানে 'রামকৃষ্ণ কুটীর' নামে নিজস্ব ভবনে ৩২ জন বিদ্যার্থীর থাকিবার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস পরি-চালিত হইতেছে; এখানকার ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভাল হইয়া থাকে। পরিচালিত গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৯৫৫; গ্রন্থাগারে কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়।

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের' নূতন (৬৪তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম-ও ঠিকানা সহ বার্ষিক চাঁদা ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭টা হইতে ১০-৩০ টা; বিকাল ২-৩০ হইতে ৫টা; রবিবার ৩টা হইতে ৫টা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ,
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা ৩



ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার

[খ্রীষ্ট-বিষয়ক]

স্বামী বিবেকানন্দ

যীশুখ্রীষ্ট ভগবান ছিলেন—মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর। বহুরূপে তিনি বহুবার নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমরা শুধু তাঁর সেই রূপগুলিরই উপাসনা করতে পারো। পরব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের ঐ ভাবকে উপাসনা করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ যীশুখ্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর ব'লে পূজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর কোন কিছুর পূজা কেউ করতে পারে না। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক্ কোন ভগবানের উপাসনা যত শীঘ্র ত্যাগ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনা-নির্মিত যিহোবার কথা ধর, আবার সুন্দর মহান্ খ্রীষ্টের কথাও ভেবে দেখ। যখন খ্রীষ্টের ঊর্ধ্বে কোন ভগবান সৃষ্টি কর, তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করতে পারে, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের ঊর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস মানুষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি মুক্তি চাও তো খ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও; তোমাদের কল্পিত যে-কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। যদি মনে কর যে, খ্রীষ্ট একজন মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর উপাসনা ক'রো না। কিন্তু যখন ধারণা করতে পারবে—তিনি ঈশ্বর, তখনই তাঁর উপাসনা ক'রো। যারা বলে—তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে পূজাও করে, তারা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় অধর্মের কাজই করে। এখানে মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে', আর পুত্রকে না দেখে কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু লম্বা লম্বা কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পনা! যদি আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে ধরে থাকো।

দার্শনিক দিক দিয়ে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ ব'লে কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম। কোরানে মহম্মদ বার বার বলেছেন, খ্রীষ্ট কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি—ও একটা রূপকমাত্র ; খ্রীষ্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না।

যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্নস্তর দ্বৈতভাব, আর 'একের মধ্যে তিনে'র অবস্থিতিই উচ্চতম। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুস্যূত ; ঈশ্বর জগৎ এবং জীব—এই 'একের মধ্যে তিন'-কেই আমরা দেখছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই দেহটি যেমন জীবাত্মার আবরণ, তেমনই এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার আবরণ বা দেহ। 'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা, ঈশ্বর তেমনই আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই তুমি রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকও বটে।

আবার আর এক প্রকারের 'ত্রিত্ব' (তিনে এক) আছে, অনেকটা খ্রীষ্টানদের 'ট্রিনিটি'-র মতো। ঈশ্বরই পরব্রহ্ম, এই নির্বিশেষ সত্তায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না ; শুধু 'নেতি নেতি' বলতে পারি মাত্র। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যসূচক কয়েকটি গুণ কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি। প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ আনন্দ,—অনেকটা যেন তোমাদের 'পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার' অনুরূপ। পিতা হচ্ছেন সৎ-স্বরূপ, যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি ; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বরূপ। খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। খ্রীষ্টের পূর্বেও ঈশ্বর সর্বত্র ছিলেন এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন ; কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে আমরা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পেরেছি। ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মার আবেশ। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহূর্ত থেকে তুমি খ্রীষ্টকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ ; আর তাতেই হবে তিনের একত্ব সাধন।*

* The Divine Incarnation or Avatara : বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ
(দ্রষ্টব্য : Complete Works Vol. VIII, pp. 190—191)

কথাপ্রসঙ্গে

'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে'

স্বর্গরাজ্যের সন্ধানে মানুষ বাহির হইয়াছে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম দিন হইতেই। ইহুদী পুরাণের মতে মানুষ ভগবানের অবাধ্য স্বর্গচ্যুত সন্তান, স্বর্গে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার জীবনের সার্থকতা—পরিপূর্ণতা। ইহা যে নিছক পুরাণ বা কল্পনা, তা নয়। ইহার মধ্যে মানুষের একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অভীপ্সা লুক্কায়িত রহিয়াছে; ইহার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের ভাল হইবার ইচ্ছা, সম্ভাবনা ও চেষ্টা। অতএব স্বর্গের কল্পনাকে আমরা যতই আদিম মনে করি না কেন, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারি না।

কোন মানুষই বর্তমান পরিস্থিতিতে সুখী নয়; তাহার দুই চক্ষু—একটি অতীতে, অপরটি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন তাহার ইতিহাস ও পুরাণ, ভবিষ্যতের সুখের পরিকল্পনাই তাহার ধর্ম ও নীতি—হাঁ, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি, সবই ইহার অন্তর্গত।

বর্তমানের অসম্পূর্ণতা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, ভবিষ্যৎ সুখশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে—এই আশা লইয়াই তো মানুষ বাঁচিয়া আছে। তবে এই ভবিষ্যৎ কখন অদূরে, কখন সুদূরে। শেষ পর্যন্ত মানুষ মনে করে, যদি ইহলোকে আশা পূর্ণ হইল না তো পরলোকে নিশ্চয় হইবে। ইহজীবনে না হয়, পরজীবনে সুখদুঃখের একটা হিসাব-নিকাশ হইবেই। দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে মানুষ জীবনের পরিসমাপ্তি ভাবিতেই পারে না। তাই তাহাকে কল্পনা করিতে হইয়াছে মৃত্যুর পরেও জীবন আছে—সেখানে ভগবানের ন্যায়বিচারে পাপী শাস্তি পাইবেই, পুণ্যবানও তাহার পুণ্যের ফলভোগ করিবেই। এই কল্পনা হইতেই স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি, কর্মফলের অমোঘতায় বিশ্বাস। এই সকল ধারণা ও বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়া দেশে দেশে মানুষের জীবন চালিত করিতেছে, সংযত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা যতই পৃথক্ হউক, কয়েকটি বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সর্বপ্রথম—স্বর্গে সকলই সুখ, স্বর্গে মৃত্যু নাই, অভাব নাই, এতটা বৈষম্য নাই। স্বর্গে শুধু তাহাদেরই স্থান, মর্ত্যে যাহারা ভাল কাজ করিয়াছে। অবশ্য ভাল কাজ যে কি, তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

একদা ছিল—যজ্ঞে আহুতি দিয়া অভীষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই স্বর্গে যাওয়া যাইত। পরবর্তী যুগে দেখা গেল—শস্ত্রাঘাতে সম্মুখ যুদ্ধে মরিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত! গ্রীক পুরাণেও দেখা যায় স্বর্গ শুধু বীরদের বাসভূমি, বীর্য বা বীরত্ব এবং virtue সে ভাষায় সমার্থক। কোন কোন দেশের শাস্ত্রে শোনা যায়—বিদেশী, শত্রু বা বিধর্মীকে হত্যা করিতে পারিলে স্বর্গের চাবি হস্তগত হয়।

অবশেষে স্বর্গের নানা চিত্র আমরা পাই সাহিত্যে। ভারতীয় মহাকাব্যে তো কথাই নাই, সেখানে স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন ঘটিয়াছে বহুস্থলে বহুভাবে। গ্যেটে তো কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় স্বর্গ-মর্ত্যের এরূপ একটি মিলন দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন। স্বর্গচ্যুত

মানবকে স্বর্গে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া মিলটন মহাকবি হইয়াছেন! দান্তে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা করিয়াছেন সৌন্দর্য-পিপাসু প্রেমপিপাসু মানবাত্মার পরিপূর্ণতা-লাভের চরম অভিযানে।

এ পৃথিবীই শেষ নয়, এ জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুই পূর্ণচ্ছেদ নয়,—ইহাই যেন মানবাত্মার চিরন্তন মর্মবাণী সর্ব দেশে, সর্ব কালে! কখন ঋষির কণ্ঠে, কখন কবির কাব্যে, কখনও শিল্পীর শিল্পে এই আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—নানা ছন্দে নানা ভাবে। পৃথিবীর পরে স্বর্গ আছে, মৃত্যুর পরে অমৃত আছে, জীবনের পরে আরও জীবন আছে, চরম সার্থকতা লাভ না করা পর্যন্ত জীবন আছে।

এই খানেই শুরু হয় দার্শনিকের যুক্তি ও অনুভূতি! এই ভাবেই শুরু হইয়াছে কর্মবাদের কঠিন শৃঙ্খল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাঙিবার মহামন্ত্র! বন্ধনবোধের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা! ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম এই চেষ্টাকেই জাতীয় সাধনায় রূপান্তরিত করিয়াছে। এই সাধনায় স্বর্গও কাম্য নয়—স্বর্গও বন্ধন, স্বর্গও শৃঙ্খল—স্বর্ণ-শৃঙ্খল! মানবাত্মাকে সূক্ষ্মতর ভোগে বাঁধিয়া স্বর্গসুখ উচ্চতর সত্যানুভূতির পথে বাধা দেয়। উচ্চতম সত্যানুভূতি লাভ করিতে হইলে স্বর্গসুখও ত্যাগ করিতে হইবে। সত্যের সাধককে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে আসিয়া আবার সাধনা করিতে হইবে। স্বর্গই চরম লক্ষ্য নয়; চরম লক্ষ্য ইহজীবনে আত্মানুভূতি। স্বর্গবাসী দেবতা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ! স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ভারতের দর্শন-ভিত্তিক ধর্মের এই যে ভাব, ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়।

কিন্তু মানুষের মন যতই যুক্তিপ্রবণ হইবে, যতই অন্তর্মুখী হইবে, ততই এই মতের সত্যতা ও সারবত্তা বুঝিয়া বিবেকবৈরাগ্য সহায়ে ত্যাগতপস্যাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের সর্ববিধ ভোগ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ইহজীবনেই জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজ করিবে, ইহাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থা লাভের কথাই উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে।

এই উচ্চতম ভাবের কথা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়া দেখা যাক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ স্বর্গের ভাব লইয়া কিরূপ আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ধারণা—পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে গিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদের মতো জীবন যাপন করিতে পারি আমরাও স্বর্গে যাইব। চীন, জাপান, ভারতেও এই ধারণা প্রচলিত।

অলিম্পাসের স্বর্গে যাইবার জন্য গ্রীক বীরগণ হাসিমুখে যুদ্ধে প্রাণ দিত। ইহুদীগণ এই পৃথিবীতেই 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আশা করিয়াছিল; তাই খৃষ্ট যখন বলিয়াছিলেন, 'স্বর্গরাজ্য অতি সন্নিকট; প্রস্তুত হও; অনুতাপ কর; পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করিলে তোমরা কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না' তখন ইহুদীরা তাঁহাকে বোঝে নাই।

রোমের শাসনে নিপীড়িত ইহুদীরা ভাবিয়াছিল এবার তাহারা স্বাধীন হইবে, তাহাদের রাজা আবির্ভূত হইয়াছেন! কিন্তু খৃষ্ট যখন বলিলেন 'সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও; ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও' তখনও তাহারা বুঝে নাই—খৃষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতেছেন, তাহা বাহিরে নয়, ভিতরে। এই ভুল বোঝার মাশুল তাহারা আজও

দিতেছে। কিন্তু যাহারা খৃষ্টকে মানে বলিয়া মনে করে, যে ইওরোপীয় জাতিগুলি খৃষ্টের নামে 'পবিত্র সাম্রাজ্য' স্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই কি তাঁহার এই কথার মর্ম বুঝিয়াছে! তবে আর ইওরোপে সহস্র বৎসর ধরিয়া কখন যুদ্ধ, কখন যুদ্ধের মহড়া চলিতেছে কেন?

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পতাকাবাহী আধুনিক মানবও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে; তবে তাহাতে অশরীরী জিহোবা বা সশরীরী কোন ঈশ্বরের স্থান নাই। মানবের ভ্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা জীবজন্তুর ক্রমবিকাশ মানুষের বাহ্য সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-রাষ্ট্রও প্রাচীন স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিচ্ছায়া। 'ইউটোপিয়া' ব্যর্থ কল্পনায় পর্যবসিত।

প্রাচীন জাতিগুলি ইতিহাসের বহু উত্থান-পতন দেখিয়াছে, ধর্মের গ্লানি ও ধর্মস্থাপন ভারত বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছে, পৌনঃপুনিকতাই জড়-জগতের ধর্ম; বুঝিয়াছে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি এ জগতে নাই, স্বর্গেও নাই, যদি থাকে তো আছে মানুষের মনে।

'স্বর্গরাজ্য বাহিরে নয়, ভিতরে!' স্বর্গ শব্দের অর্থ যদি হয় সুখ, শান্তি, কল্যাণ, তবে সর্বপ্রথম এইগুলির প্রতিবন্ধক কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির মনের কুভাব-গুলিকে দূর করিতে হইবে! স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাহিরের সংগ্রাম অপেক্ষা প্রয়োজন ভিতরের সংগ্রাম ও সাধনা। স্বর্গরাজ্য একটি মানসিক রাজ্য, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে লব্ধ জ্ঞানময় শান্তিময় কল্যাণময় জ্যোতির্ময় একটি জীবন, যাহার আলোকে শত শত জীবন আলোকিত হয়, যাহার স্পর্শে শত শত জীবন শান্তিলাভ করে।

গীতা এই অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিহীন এই বৈকুণ্ঠ স্বর্গেরও উর্ধ্বে। স্বর্গ হইতেও পুনরাবৃত্তি হয়, বৈকুণ্ঠ হইতে হয় না—কারণ সেখানে বাসনা কামনা নাই। এই বৈকুণ্ঠ ভক্তের শুদ্ধ হৃদয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণও কি বলেন নাই, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা'? এখানে তাঁহাকে পাওয়া যায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা ঈশ্বররূপে নয়, শাস্তি-পুরস্কার-বিধাতা কর্মফলদাতারূপে নয়, নিকটতমরূপে, প্রিয়-তমরূপে, অন্তরতমরূপে, পিতামাতা-বন্ধুরূপে, অতি আপনভাবে, সকল ঐশ্বর্য-বিবর্জিত পরম-মাধুর্য-বিমণ্ডিতভাবে। ঈশ্বরকে অন্তর্যামীরূপে অনুভব করিয়াই আমরা বুঝি খৃষ্টবাণীর প্রকৃত মর্ম:

'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে।'

চলার পথে

'যাত্রী'

ভারতের দিকে দিকে মন্দির। আর তাতে কত না বিগ্রহ, কত না রূপ! যখনি তা চোখে পড়েছে, তখনি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—এই রূপ-সৌন্দর্যের উৎস কোথায়? কেন ভারতের শিল্পীরা তাঁদের প্রাণ-ঢালা আবেগ দিয়ে এঁদের রূপায়িত করেছেন? এ সব কি নিছক মূর্তিপূজা, না এর পেছনে কোন মহৎ অনুভূতিকে রূপায়িত করবার প্রয়াস আছে? এই কথা নিয়ে কত মনীষী কত বিচার করেছেন—সেই বাঙ্ময়ী পূজার বেদীমূলে আর এক পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করি।

মানবের মধ্যে প্রাচীন আর্যেরাই বোধ হয় অসীম আকাশে প্রতীয়মান গোলার্ধকে মন্দিরের আকাশের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রাচীন আবাসভূমি পর্বত-গহ্বরকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা এবং তন্মধ্যস্থ স্থিতধী ঋষিকে বিগ্রহরূপে আহ্বান করার কথাও অনেকে বলেন। কপিল, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষির বিগ্রহরূপ ঐ কথারই সমর্থন করে। চণ্ডীতে পড়ি, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্' অর্থাৎ দেবী-নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁর মূর্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, সে-কথা ধরলে মহান্ আকাশের তলে ঐ পরব্রহ্মকে আকর্ষণ করলে মন্দির ও বিগ্রহের মূলসূত্রের ব্যাখ্যা বুঝতে পারি। অবশ্য ভারতের বিগ্রহ কেবল ইঁট-কাঠ-প্রস্তরে তৈরী জড়-বিগ্রহ বা পুতুল-পূজা নয়, এ-কথা দেবীসূক্তেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, 'মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে' অর্থাৎ যা থেকে জীব জগৎ প্রভৃতি নির্গত হচ্ছে সে-সকলের কারণস্বরূপ আমিই তা পরব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমানা। এর মর্ম বুঝলে মূর্তির পেছনে যে অমূর্ত ঐশী শক্তি রয়েছে তা বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই।

কারও মতে মন্দির বলতে দেহ-মন্দির এবং মূর্তি বলতে দেহস্থ আত্মাকে বোঝায়। আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহই, তার পরমবিকাশের কারণস্বরূপ আত্মাকে নিয়েই, এ জগতে আবির্ভূত হয়েছে—এ কথা ভাবলে আমরা জন্মাবধিই মূর্তি-পূজারী হবো এবং দেহরূপ মন্দিরকে শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে স্বীকার ক'রব, এতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য আত্মার রূপকল্পনা—বিশেষতঃ যার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—সত্যই অসম্ভব। তবু এ-যুগের মহাবাক্য—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করলে এর একটা হদিশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে তিন'; আবার বলেছেন: গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়, মানুষেই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান। সেই মানুষের মনের অভিব্যক্তিতে--শিল্প ও কলাতে—ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ থাকাই তো স্বাভাবিক। সেই কারণেই ভারতে দেহরূপ মন্দিরের বিকাশ করতে গিয়ে মস্তিষ্করূপ গর্ভগৃহের মধ্যে আত্মারূপ দেবতার প্রকাশ চিন্তা করা হয়েছে এবং দেহ-কাণ্ডরূপ 'জগমোহন' সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জগমোহনে'র দু-দিকের চত্বরই দেহরূপ মন্দিরের হাত ও পা এবং এই উভয় পাদমূলের মধ্যকার পথই সিংহদ্বার। তান্ত্রিক মতের কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম অবস্থা বা দ্বার যে মূলাধার তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ক্রমশঃ হৃদয়পদ্মে বা মন্দিরের 'জগমোহনে'র মধ্যস্থ আলোচনা-বেদীতে প্রবেশ করা যায় এবং শেষে ঐ শ্রেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ সহস্রারে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলে তবেই আত্মরূপ বিগ্রহের দর্শন সম্ভব।

আত্মার বা ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা আমাদের সাধনার প্রথম সোপান—সেই কারণেই বলা হয়: সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে: রক্তমাংসে গড়া নারীমূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার স্তুতি করাই পৌত্তলিকতার—পুতুলপূজার চরম অভিব্যক্তি, কারণ এই পূজায় বাহ্য কায়াকেই কায়ামাত্র-বোধে আরাধনা করা হয়। বেড়ালের বেড়ালত্ব ভুলে পূজা করলে বা পুতুলের জড়ত্ব ভুলে তাতে চেতন খুঁজলে তখন আর তা পুতুলপূজা থাকে না, বরং তখন তা এক প্রতীকের সাহায্যে অতনু অপ্রাকৃত সেই ঐশী শক্তির পূজাতেই পর্যবসিত হয়। অরুন্ধতী নামক ক্ষুদ্র তারকাকে দেখাতে হ'লে যেমন তার নিকটস্থ অন্য বড় তারকাকে নির্দেশ করতে হয় বা বালককে চাঁদ দেখাবার জন্য সামনের গাছের ডালের দিকে প্রথমে নজর করতে ব'লে চাঁদ দেখাতে হয় (শাখাচন্দ্রবৎ বা অরুন্ধতীন্যায়) তেমনি মূর্তিপূজার নির্দেশে সেই অমূর্তকে দেখাবার প্রয়াসেই ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার এত ছড়াছড়ি।

স্বামীজী বলেছেন: সাধনার প্রথমাবস্থায় সকলেই মূর্তি বা প্রতীক পূজারী। তাইতো মুসলমানও কাবাকে (পাথর) পশ্চিমে স্মরণ ক'রে নামাজ পড়ে। খৃষ্টান ঘুঘুরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব কল্পনা করে। আর হিন্দু মনুষ্যাকৃতি দেবদেবীরূপে বা নর-নারীরূপে ঈশ্বরের পূজার অর্ঘ্য সাজায়। একটি গ্লোব দেখিয়ে যদি ছাত্রদের বিশ্বের বা পৃথিবীর রূপকল্পনায় সাহায্য করা যায়, কিংবা একটি ম্যাপ দেখিয়ে যদি দেশ বা মহাদেশের ধারণা দেওয়া যায়, তবে মূর্তির প্রতীক দেখিয়ে অমূর্ত বিরাটকে বোঝানো এমন আর কি অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার?

তা-ছাড়া জগৎটাতো সমস্তই প্রতীকের খেলা—নামরূপের খেলা, ভাষার যে নিহিতার্থ, লেখার মাধ্যমে যে প্রতীকের ছায়াছবি, সবই তো কোন-না-কোন ভাবে মূর্তিসাধনা—নামরূপের অভিনব বিকাশ-কল্পনা। এই নামরূপের খেলা ছাড়লে আমাদের তো নির্বাক্ জড়রূপে থাকা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাই আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সাহায্যে মূর্তিকে টেনে আনায় দোষ কি? বরং বহুভাষাভাষী ভারতে মূর্তি একটি সাধারণ ভাষা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তাই তীর্থে তীর্থে মন্দির ও মূর্তি দর্শনে একই উদারভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এই একই ভাষার সাহায্যে সকল ভাষাভাষীকে কথা যোগায়। আমাদের ভারতবর্ষে তাই মূর্তি বা মন্দির একটি সাধারণ ভাষা (common language)। এর লিপিশিল্প (script) এক, ভাব এক, অর্থও এক। অসমীয়া, বাঙালী, উৎকলবাসী, পাঞ্জাবী, অন্ধ্রপ্রদেশবাসী বা মগের মুলুককে এই একই ভাষার সাহায্যে কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়। মন্দিরাত্মা ভারতের এ এক অদ্ভুত একতাবোধের সচেতন রূপ। এইরূপকে ধরেই শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ অরূপে পৌঁছেছেন।

তাই বলি পথিক, নিজেকে পুতুলপূজারী ব'লে মনে ক'রো না। দেহবাসী যে আত্মাকে নিয়ে তুমি দেহ-পূজক বা মূর্তিপূজক হয়ে জন্মেছ, তারই তো চরম অভিব্যক্তি তোমার ভারতের মন্দিরে মন্দিরে। সেই পূজার পটভূমিকার দর্শনকে আয়ত্ত ক'রে তুমি শ্রেষ্ঠ পূজারী সাজো। তাই বলি, চল মন্দিরে, চল মূর্তিপূজায়—সেই নাম-রূপকে ধরে চল নাম-রূপের পারে। চল, চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

আবেদন

[হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে সেবাকার্যে সাহায্যের জন্য]

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আগামী ৪ঠা মার্চ, ৪ঠা এপ্রিল ও ১৩ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ পূর্ণকুম্ভ স্নান উপলক্ষে আনুমানিক ২০।২৫ লক্ষ স্নানার্থী, সাধু ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। ইঁহাদের সেবার জন্য কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। সাহায্যকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :

(১) সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর হাসপাতালে অতিরিক্ত ৭৫ বেড্।

(২) যে সকল রোগী সেবাশ্রমে বা অন্যান্য সাহায্যকেন্দ্রে যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সেবাদল।

(৩) প্রায় পাঁচশত সাধু, ব্রহ্মচারী ও তীর্থযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্য সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি আশ্রয়-বিভাগ।

সেবাকার্য-পরিচালনার জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, পুরুষ-শুশ্রূষাকারী, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক এবং বস্ত্র ও ঔষধপত্রাদি আবশ্যক। এই সকল কার্যের ব্যয়নির্বাহার্থ ৩৫,০০০্ টাকার প্রয়োজন। মেলা উপলক্ষে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বয়স ও যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ৩১শে জানুআরি, ১৯৬২এর পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

এই মহৎ কার্যের জন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আর্থিক ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আবেদন করিতেছি। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

(১) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
পোঃ কনখল, জেলা সাহারানপুর, (ইউ. পি.)

(২) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম
৫, ডিহি ইণ্টালি রোড্, কলিকাতা ১৪।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী

[নিবেদিতা-বক্তৃতা : পূর্বানুবৃত্তি]

জীবনলক্ষ্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিবেদিতার মতে 'Spirituality' অথবা আধ্যাত্মিকতা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও শ্রেষ্ঠ দানের বস্তু, এবং এইটিই হ'ল আমাদের জীবনলক্ষ্য।

বস্তুতঃ জীবনপথে জীবনলক্ষ্য অতি প্রয়োজনীয়। লক্ষ্যহীন যাত্রা যাত্রাই নয়। বিশেষ ক'রে পূর্বোক্ত 'Aggressive Policy' গ্রহণ করবার পরে জীবনলক্ষ্যই হয়েছে জীবনের সব। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, এরূপ 'আক্রমণশীল নীতি'র মূল কথাই হ'ল সক্রিয়তা, নিরলসতা, গতি। কিন্তু গতির স্থিতি লক্ষ্যে। এই কারণে গতিবাদী মতবাদে লক্ষ্যের স্থান অতি উচ্চে। নিবেদিতা বলছেন :

We sight now nothing but the Goal. Means have become ends ; ends, means.

—আমরা এখন লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখি না। উপায় হয়েছে উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্য উপায়।

নিবেদিতা বলছেন, এই 'Aggressive attitude of mind'—মনের এরূপ আক্রমণশীল সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র জীবন ও জীবনতত্ত্ব যেন পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছে। সাধারণ জীবনে প্রথমতঃ লক্ষ্যের বিষয় কেই বা ভাবেন? তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীঘ্র-সমাপ্য বিষয় ও কার্যই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সব, দূরদর্শিতার কোন চিহ্নই থাকে না এক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্যের বিষয় যদি বা চিন্তা করা যায় ক্ষণকাল, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সাহসের অভাব আমাদের পঙ্গু ক'রে রাখে। তৃতীয়তঃ কর্মবাদের কদর্থ ক'রে বলা হয় যে, পূর্বজন্মের কর্মেই তো এ জন্মের কর্মপন্থা স্থির হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি কথাগুলি নিরর্থক বলেই মনে হয়।

সেইজন্য প্রারম্ভেই নিবেদিতা এরূপ নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: তিনটি মূল তত্ত্বই না হয় এস্থলে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক; সেই তিনটি হ'ল—কর্ম, শক্তি, ইচ্ছা।

ভারতীয় কর্মবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল এই যে, কর্মবাদ—নিষ্ক্রিয়তা, উৎসাহহীনতা ও অলসতার জনক। কারণ কর্মবাদ-অনুসারে পূর্ব পূর্ব জন্মের অভুক্ত কর্মফল ভোগ করবার জন্যই আমাদের বর্তমান জন্ম। এই কারণে আমাদের বর্তমান জীবন যেন আগে থেকেই আমাদের পূর্ব জীবন দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে—নূতন ক'রে তার জন্য আমাদের করণীয় কিছুই নেই, থাকতেও পারে না, যেহেতু কর্মের অমোঘ বিধান অন্যথা করতে কেউই পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এটি হ'ল কর্মবাদের কদর্থ মাত্র। কর্মবাদ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন প্রচেষ্টা ব্যাহত করে, তা মোটেই নয়। উপরন্তু কর্মবাদের মূল কথাই হ'ল, স্বীয় কর্মের দ্বারা—অপরের সাহায্যের দ্বারা নয়, ঈশ্বরের প্রসাদ দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল স্বীয় কর্মের দ্বারাই

লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া। পূর্ব কর্ম আমাদের প্রভাবান্বিত করে, আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি করে; আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, দেশগত—বিশেষ বিশেষ অনুকূল সুযোগ-সুবিধা, অথবা প্রতিকূল সুযোগাভাব, অসুবিধা প্রভৃতির সম্মুখীন করে নিশ্চয়ই। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় কর্মবাদ স্বীকার করেন না, তাঁদেরও এগুলি অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ, সাধারণ দিক্ থেকে দেখতে গেলেও প্রত্যেক কর্মই কয়েকটি বাইরের অবস্থা ও পরিবেশ এবং ভেতরের গুণ, শক্তি, উদ্দেশ্য, আকৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অথচ সমগ্র কার্যটিকে বলা হয়, Voluntary Action—পরপ্রণোদিত কার্য নয়, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বাধীন কার্য। তার কারণ হ'ল এই যে, বাহ্য ও আন্তর, এই সকল অবস্থা সত্ত্বেও পরিশেষে কার্যটি Free Action—অথবা স্বাধীন কার্য, যেহেতু কর্মকর্তার স্বাধীন ইচ্ছাই পরিশেষে এর প্রকৃত কারণ, এবং সকল পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও পরিবেশের উর্ধ্বে ওঠবার শক্তি তার আছে। একেই ইওরোপীয় দর্শনে বলা হয়, 'Self-determination'। ভারতীয় কর্মবাদও এরূপ 'Self-determination'-এর একটি দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ সাধারণ নিয়ম হ'ল এই যে, পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। পূর্ব কর্ম বা এ-জন্ম একইভাবে পরবর্তী কর্মকে প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু তার অধিক কিছুই নয়। ভারতীয় কর্মবাদের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি উপলব্ধি ক'রে নিবেদিতাও অতি সুন্দরভাবে বলছেন:

Words have changed their meanings. Karma is no longer a **destiny**, but an **opportunity**. (P. 26).

অর্থাৎ 'Aggressive Attitude' বা উপরে বর্ণিত সতেজ সক্রিয়ভাব অবলম্বন করবার পরে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সত্যই, ভারতীয় কর্মবাদকে নানা লোকে নানাদিক্ থেকে, নানাভাবে দেখে। যাঁরা স্বভাবতই নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় অলস-প্রকৃতির, তাঁরা কর্মকে দেখেন 'Destiny' রূপে—অদৃষ্টবাদী ভাগ্যনির্ভরশীল তাঁরা, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের পূর্ব কর্মই তাঁদের বর্তমান জীবন সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ক'রে রেখেছে, তাঁদের আর নূতন ক'রে অগ্রসর হয়ে সাহস ভরে করবার কিছুই নেই। তেজস্বিনী আত্ম-নির্ভরশীলা আত্মবিশ্বাসপরায়ণা নিবেদিতা এরূপ নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ জীবনধারণ-প্রণালীর বিরুদ্ধে সতেজে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে বলছেন যে, প্রত্যেক কর্মই প্রত্যেক কর্তার সম্মুখে একটি নূতন সুযোগ-সুবিধার প্রতীকরূপেই উপস্থিত হয়, তাকে অবহেলা করা নির্বোধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইভাবে প্রত্যেক বারেই নবোৎসাহে নির্ভয়ে কর্ম করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম করতে হবে শক্তির সঙ্গে। 'শক্তি'র একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলছেন:

Strength is the power, to take our own life at its most perfect, and break it if need be, across the knee.

—সেই হ'ল শক্তি, যা আমাদের অতি সুন্দর সুষ্ঠু পূর্ণ জীবনকেও অনায়াসে বিসর্জন দিতে বল দেয়।

সাধারণ জীবনের দিক্ থেকে জীবন ত্যাগ করা অতি কঠিন। এই যে জীবনধারণের ইচ্ছা, যাকে বলা হয় Instinct of self-preservation' (আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি), তা জীবের একটি অতি সাধারণ

মূলীভূত প্রবৃত্তি। সেই জীবনকেই অনায়াসে বিসর্জন দেওয়া সাধারণ সাংসারিক জীবের পক্ষে অতি কঠিন। সেই জন্যই নিবেদিতা উপরের অতি যোগ্য উদাহরণ দ্বারা শক্তির স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার কথা। সাধারণতঃ দর্শন ও ধর্ম উভয় দিক্ থেকে, বিশেষ ক'রে ভারতীয় দর্শনের দিক্ থেকে, বাসনা-কামনাকে সাধক-জীবনের প্রথম পরিত্যাজ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন যে, এরূপ জৈব সঙ্কীর্ণ বাসনা-কামনা ও উচ্চ-আধ্যাত্মিক ইচ্ছা বা আকুতির মধ্যে প্রভেদ মূলগত। তিনি বলছেন :

Our desires have grown innumerable. But they are desires to give, not to receive. We would fair win that we may abandon to those behind us and pass on.

—এই সক্রিয়ভাব অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা বা আকুতিও বেড়ে যাচ্ছে। এই সব অসংখ্য আকুতি হ'ল- অর্জনের আকুতি নয়, ত্যাগের আকুতি; গ্রহণের আকুতি নয়, দানের আকুতি।

এরূপে নিবেদিতার মতে জীবনের লক্ষ্য হ'ল এরূপ আত্মবিকাশ, যাকে তিনি পূর্বে 'Aggressive Attitude' বলেছেন। যখন এরূপ বিকাশ লাভ হয়, তখন কি অবস্থা হয় আত্মার ? তখন যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সাধারণ ভারতীয় দার্শনিক নাম হ'ল 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি'। ভারতীয় দর্শনের মতে এইটিই হ'ল জীবনের পরম লক্ষ্য, চরম লাভ, সকল সাধনার সিদ্ধি, সকল তপস্যার পূর্ণতা, সকল আকুতির পরিসমাপ্তি। সমগ্র ভারতীয় দর্শন এই মুক্তির অতুল মহিমায় মহিমান্বিত। সেই শ্রেষ্ঠ ধন মুক্তি কি ? কি থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণ ? মুক্তি জীবত্ব থেকে, 'অহং-মমত্ব' থেকে, জড়ত্ব থেকে মুক্তি। এই সম্বন্ধে কত আলোচনায় ভারতীয় দর্শন পরিপূর্ণ। সে-সবের বিস্তৃত বিবরণীর স্থান এ নয়। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সেটি হ'ল এই যে, মুক্তি সকল পাপতাপের অতীত অবস্থা। তারও উপরে এতে আনন্দের অস্তিত্ব আছে কিনা—সে অবশ্য অন্য প্রশ্ন এবং জীবন্মুক্তি সম্ভবপর কিনা, অথবা কেবল বিদেহ-মুক্তি সম্ভব—সেও একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। এইভাবে মুক্তপুরুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়।

তাঁর 'The Ideal' শীর্ষক নিবন্ধে নিবেদিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঋজুতা-সহকারে এই সকল দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অথবা বাদানুবাদের মধ্যে একেবারেই প্রবেশ করেননি। তিনি কেবল নয়টি প্রধান দিক্ থেকে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অতি সুললিত ভাবে, তাঁর প্রাণপ্রিয় তত্ত্বানুসারে। আমরা জানি যে, তাঁর প্রাণপ্রিয় তত্ত্ব হ'ল পূর্বোক্ত 'Aggressive Attitude' বা সক্রিয় ও সতেজ ভাবে আত্মবিকাশের তত্ত্ব। সেই তত্ত্বানুসারে তিনি বলছেন যে, এরূপ আত্মবিকাশ লাভ হ'লে আমাদের সমগ্র জীবনই পরিবর্তিত হয়ে যায়, স্বভাবতই—উদ্দেশ্য ও সাধনের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্যই হয় জীবন, জীবনই উদ্দেশ্য। অপূর্ব মহিমময়, মধুরিমময়, মঙ্গলময় এই জীবন। এরূপ জীবনই জীবনের পথপ্রদর্শক। সেজন্য এরূপ মুক্তপুরুষ আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন কত দিক্ থেকে, কত ভাবে, কত সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে মাধুর্যে। তাঁদেরই আদর্শে মুমুক্ষু আমরাও নূতন রূপে, নূতন রঙে, নূতন রসে, নূতন গন্ধে জীবন গড়ে তুলছি কি অতুলনীয় গরিমায়। এইভাবে প্রধান নয়টি দিক্ থেকে নিবেদিতা

মোক্ষ বা পরম লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করছেন।

প্রথমতঃ কর্মের দিক্। এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে। যিনি মুক্ত ও যিনি মুমুক্ষু উভয়েই সমভাবে হবেন নিষ্কাম কর্মী, অথচ তেজই হবে তাঁদের জীবনকেন্দ্র। মুক্তের দৃষ্টান্তানুসারে মুমুক্ষুও অদৃষ্টবাদী হবেন না। অদৃষ্টজয়ী হবেন, কর্মের দ্বারা কর্মকে বর্ধিত না ক'রে কর্মের দ্বারাই কর্মকে ক্ষয় করবেন, অদৃষ্ট যে কোন অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি নয়, সম্পূর্ণরূপে নিজেরই সৃষ্টি, এই কথা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ক'রে নূতন উৎসাহে নূতন জীবন গঠন করবেন। এই তো হ'ল কর্মের প্রকৃত মর্ম, এই তো হ'ল শাশ্বত ধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ শক্তির দিক্। এ সম্বন্ধেও কিছু পূর্বে বলা হয়েছে। যিনি মুক্ত, তিনি আত্মজয়ী, সেজন্য বিশ্বজয়ী। 'আত্মজয়ে'র অর্থ কি? আত্মজয়ের অর্থ—জীবত্ব জয়, ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি। সেই দিক্ থেকে সত্যই 'জয়ের' কোন প্রশ্ন এস্থলে নেই, কারণ আত্মা চিরস্থায়ী, নিত্য পূর্ণ, অনন্তস্বরূপ। আত্মা চিরকালই আত্মা, অবিনশ্বর আত্মা, অজেয় আত্মা, অনমনীয় আত্মা—তাকে জয় করবে কে? তা হ'লে নীতি ও দর্শনশাস্ত্রের এই একটি সাধারণ শব্দ 'আত্মজয়ে'র অর্থ কি? অর্থ হ'ল: 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতম্' স্বীয় মহিমায় স্থিতি, আত্মস্থিতি —কেবল আত্মাতেই স্থিতি—বিশ্বে নয়, দেহে নয়, বুদ্ধিতে নয়—কেবল ব্রহ্মে, কেবল আত্মায়, কেবল জ্ঞানে। এই তো হ'ল 'ব্রাহ্মী স্থিতি'; এবং শক্তির অর্থ হ'ল: এই ভাবেই স্বীয় শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিরস্থিতি।

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার দিক্। এ-সম্বন্ধেও পূর্বে কিছু বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব হ'ল ইচ্ছাবিহীন স্থিতি, ইচ্ছাবিহীন কর্ম। মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে ইচ্ছা হ'ল স্থিতি ও কর্ম: Static এবং Dynamic, উভয় দিক্ থেকেই সমান মূলীভূত—প্রথমটি 'Will to live' (বাঁচবার ইচ্ছা), দ্বিতীয়টি 'Will to attain' (পাবার ইচ্ছা)-এর প্রকাশিত রূপ মাত্র। এরূপ Will (ইচ্ছা) দমন করাই হ'ল আত্মসংযম। সেজন্য ভারতীয় দর্শন ও নীতি-শাস্ত্র অনুসারে এরূপ ইচ্ছাসমূহকে সংযত করাই কাম্য। এমন কি, মোক্ষের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ইচ্ছার লেশমাত্র থাকলে চলবে না। 'মুমুক্ষু' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল অবশ্য 'মোক্ষের জন্য ইচ্ছাশীল'। কিন্তু এ ইচ্ছা সাধারণ অর্থে 'ইচ্ছা' নয়, যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা ফলভোগের ইচ্ছা, এবং নিষ্কাম-কর্মই মোক্ষের সাধন ব'লে স্বভাবতই এরূপ ফলভোগসমন্বিত ইচ্ছার অস্তিত্বই এস্থলে থাকতে পারে না। সেজন্য এমন কি, মুমুক্ষুও মোক্ষকে ফলরূপে অভিলাষ করেন না, যেহেতু সেক্ষেত্রে তাঁর মোক্ষ প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে একটি সকাম-কর্ম মাত্র। তা হ'লে তিনি 'মুমুক্ষু' অথবা মোক্ষপ্রয়াসী কেন? তিনি 'মুমুক্ষু' এই অর্থে যে, তাঁর সমগ্র জীবন-প্রবৃত্তি মোক্ষের দিকে; তাঁর সমগ্রস্বরূপ তারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি। এরূপে সাধারণতঃ 'বুভুক্ষু' এবং 'মুমুক্ষু'র মধ্যে প্রভেদ করা হয় এই ব'লে যে, 'বুভুক্ষু' সাংসারিক বস্তুসমূহের বিষয়ই কেবল লাভ করতে ইচ্ছুক; 'মুমুক্ষু' মোক্ষলাভ করতে ইচ্ছুক। উভয়েই ইচ্ছুক নিঃসন্দেহ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরূপে 'বুভুক্ষু'র ক্ষেত্রে থাকে কোন অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করবার কামনা; কিন্তু 'মুমুক্ষু'র ক্ষেত্রে জীবন নূতনরূপে প্রাপ্য অথবা সৃজ্য জীবন নয়। অনাদি অনন্তকালব্যাপী শাশ্বত জীবন, যাকে লাভ করতে হয় না নূতন ক'রে, বিকশিত অথবা প্রকাশিতই

করতে হয় কেবল, এ অনুভূতি বা অবস্থা লাভ ব্যতীত জীবন তো জীবনই নয়। সুতরাং যে বস্তু আমাদের নেই, তা লাভ করবার ইচ্ছায় যে কর্ম, তা সকাম-কর্ম। কিন্তু যা আমাদের চিরকাল আছে, তা প্রকাশিত করবার ইচ্ছায় যে কর্ম, তা 'নিষ্কাম কর্ম'—কারণ তা স্বরূপ-প্রকাশ মাত্র। যেমন সূর্য আলোক বিকিরণ করছে, পুষ্প গন্ধ বিতরণ করছে—এ তো তাদের স্বভাব মাত্র, এতে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য কামনার কোন প্রশ্নই নেই। একইভাবে মোক্ষ বা মুক্ততাও আমাদের স্বভাব মাত্র, তা কামনা-বাসনার বস্তু নয়, প্রকাশের—প্রকটনের বস্তু মাত্র। এই অর্থে মুমুক্ষু সকাম-কর্মী নন, নিষ্কাম-কর্মী।

নিবেদিতাও ভারতীয় ঋষিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই একই কথা, সেই শাশ্বত কথাই বলেছেন বারংবার। মুক্ত ও মুমুক্ষুর ইচ্ছা আছে নিশ্চয়; কিন্তু তা সম্পূর্ণ-রূপেই অপার্থিব ইচ্ছা। তিনি অলস, নিষ্ক্রিয় কোন ক্রমেই নন, এবং প্রকৃতকল্পে তাঁর কর্ম, তাঁর ইচ্ছা যে-কোন সাধারণ জনের কর্ম ও ইচ্ছার অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক, বহুগুণ গভীর, বহুগুণ তীব্র। এই ইচ্ছা বিশ্বাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বসেবার নিরন্তর ইচ্ছা। কি সুন্দরভাবেই না নিবেদিতা বলছেন:

The whole of life becomes the quest of death. (P 27)—সমগ্র জীবনই হয়ে দাঁড়ায় মরণের অনুসন্ধান।

মনে হয় না কি যে, এটি একটি অদ্ভুত স্ববিরুদ্ধ কথা? 'জীবন' পুনরায় 'মরণ' হবে কিরূপে? এবং 'মরণের' অনুসন্ধান বাতুল ব্যতীত আর কে করে?

কিন্তু এই তো প্রকৃত জীবন-রহস্য, এই তো সাধনা, এই তো সিদ্ধি। ইংরেজী দর্শনে একেই প্রকাশ করা হয়েছে 'Die to live'এর মহানীতি-তত্ত্বে। মরণের মাধ্যমে জীবন, জীবনের জন্য মরণ—জড়-দেহের মরণ, অজড় আত্মার জীবন, স্বার্থান্বেষী বুভুক্ষুর মরণ, স্বার্থ-হীন মুমুক্ষুর তথা মুক্তের জীবন, অল্পের মরণ, ভূমার জীবন, জীবের মরণ, ব্রহ্মের জীবন;—এরূপ মরণ, এরূপ জীবনই আমাদের বরণ ক'রে নিতে হবে সকল পাপতরণ-তাপহরণ-রূপে। কি অপূর্ব ত্যাগ-মহিমময় এই জীবন, যার আলোকে আমাদের সমগ্র ভারতীয় দর্শন সমুজ্জ্বল। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণ করুন সুবিখ্যাত ঈশোপনিষদের সেই রোমাঞ্চকর সর্ব প্রথম মন্ত্রটি:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

—'ঈশ্বর দ্বারা ঢেকে রাখ ধরা,
যা কিছু গমনশীল।
ত্যাগ-সহকারে ভোগ কর তাঁরে,
কামনা ত্যজি আবিল ॥'

ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং ছিলেন এই মহা-ত্যাগ-মন্ত্রের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

চতুর্থতঃ ব্রহ্মচর্যের দিক্। সকলেই জানেন যে, এটিও ভারতীয় দর্শনের আরএকটি মূলীভূত তত্ত্ব। 'ব্রহ্মচর্যের' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল ব্রহ্মে বিচরণ। যিনি পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে নিষ্কাম-কর্মী, শক্তিশালী ও ত্যাগব্রতী, তিনি তো স্বভাবতই হবেন 'ব্রহ্মচারী', ব্রহ্মে বিচরণশীল, জীবে নয়; আত্মায় বিচরণশীল, দেহে নয়; ভূমায় বিচরণশীল, অল্পে নয়। সুতরাং এই যে জীবের কামনাময় জীবন, এই যে দেহের ভোগপঙ্কিল জীবন, এই যে অল্পের স্বার্থ-সঙ্কুল জীবন—মুমুক্ষুরও নয়, মুক্তেরও নয়। এরূপে যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি নিজেকেও উপলব্ধি করেন পরিপূর্ণ আত্মারূপে,

অপরকেও ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতা বলছেন :

Celibacy, here, is only the passive side of a life that sees human being actively as minds and souls. (P. 28)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অথবা আত্মসংযমের অর্থ কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছাকে দমন করাই নয়—উপরন্তু সমগ্র সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করা—নিজেকে, অপরকে, সকলকে শুদ্ধ আত্মা-রূপে উপলব্ধি করা এবং সেইভাবে সম্মান করা।

আমাদের নীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিবেদিতাও বলছেন যে, এরূপ ব্রহ্মচর্য যে কেবল মুমুক্ষুর কেবল মুক্তের জীবন-ব্রত, তা নয়, সাধারণ গৃহীরও ব্রত—সমভাবে। সেই জন্যই তিনি বলছেন :

Marriage itself ought to be, in the first place, a friendship of the mind. And, there is a Brahmacharya of the wife, as well as of the nun. (P. 28)

—বিবাহের সর্বপ্রথম কথা হ'ল মনের বন্ধুত্ব। সেজন্য সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী উভয়েই সমভাবে ব্রহ্মচারিণী হ'তে পারেন।

এটিও ভারতবর্ষের একটি মহিমময় তত্ত্ব। নিবেদিতা যে 'Exchange of thoughts and communion of struggle'—হৃদয়বিনিময় ও সমপ্রাণতাকে বিবাহের মূল মন্ত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন, তা ঋগ্বেদের বিবাহ-মন্ত্রেই আছে :

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,
মম চিত্তম্ অনুচিত্তং তেঽস্তু।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।

—আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দান কর।
আমার চিত্ত তোমার চিত্তের অনুগামী হোক।
তোমার যে হৃদয়, আমার হোক,
আমার যে হৃদয়, তোমার হোক।

পঞ্চমতঃ তপস্যার দিক্। তপস্যা কি? তপস্যা হ'ল : প্রচেষ্টা। কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? আত্মধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা। আত্মোপলব্ধি ক'রে, আত্মধারণ ক'রে আত্মস্থিতি—এই তো হ'ল মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তুতঃ উপলব্ধি, ধারণ ও স্থিতি সমার্থক। যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে থাকে না, যা ধৃত হয়ে স্থিতি করে না—তার মূল্য কতটুকু? এই কারণে ভারতীয় দর্শন-মতে, প্রকৃত উপলব্ধি শাশ্বত, এবং উপলব্ধি, ধৃতি ও স্থিতি এই কারণেই সমার্থক। যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সেজন্য তাপস, অথবা মহিমায় চির-ভাস্বর; এবং যিনি মুমুক্ষু, তিনি এই মহোপলব্ধি লাভের সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্য সচেষ্ট হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দান ক'রে নিবেদিতা বলছেন :

In the life of Tapasya is constant renewal of energy and light. (P 28)

—তপস্যা-জীবনে সাধকের শক্তি ও জ্ঞানানুভূতি সর্বদা নতুন হয়ে উঠেছে।

আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, আলোক, আনন্দ, অমৃত; সাধক-স্তরে এই সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাস্বর ক'রে নিতে হয়। এই অর্থেই নিবেদিতা এস্থলে 'renewal' অথবা 'নবীনীকরণের' কথা বলেছেন। প্রকৃতকল্পে আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও আলোক, তার 'নবীনীকরণের' কোন প্রয়োজন অথবা সম্ভাবনামাত্র নেই, যেহেতু যা নিত্য, তা পুনরায় নবীনীকৃত হ'তে পারে না। তা সত্ত্বেও সাধকের পক্ষে মোক্ষের পন্থা স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে কঠোপনিষদ্ অতি সুন্দর

ভাবে বলেছেন : ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

—শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম, অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই মোক্ষমার্গ। অতএব সেইপথে প্রয়োজন নিরন্তর তপস্যার, নিরন্তর সাধনার, নিরন্তর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার।

এইভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উভয়ের জীবনই ওতপ্রোতভাবে তপস্যাবিমণ্ডিত—অবশ্য কিছু বিভিন্ন অর্থে।

সুবিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদে মানুষের—সাধারণ মানুষ, মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ—সকলেরই জীবন যে তপস্যাময়, এই তত্ত্বটি অনুপমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 'পুরুষ-বিদ্যা' অথবা 'পুরুষ-যজ্ঞ' প্রকরণে (৩-১৭)। এস্থলে পুরুষকে (জীব বা জীবনকে) তুলনা করা হয়েছে একটি যজ্ঞের সঙ্গে :

অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্য বচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। (৩-১৭-৪)

—তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্য বচন—এই সমুদয় এই পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা।

যাঁরা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্যা-দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূপ প্রকৃষ্ট পঞ্চ গুণবিশিষ্ট রূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই 'আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি।' (৩-১৭-৭)। —যে জ্যোতি-পরব্রহ্মে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজ-স্বরূপ, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন। তাঁরাই আনন্দে বলেন : উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।

—অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি,—সেই জ্যোতিকে স্বীয় অন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করেছি।

জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই আসল জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তাঁর সুধন্য জীবনের প্রতিপদে।

স্থানাভাবে অবশিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ আর করা গেল না।

উপসংহার

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতা দর্শনের মাধ্যমে, ধর্মের মাধ্যমে, নীতির মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার রূপ তো সেই একটিই। শুনুন তাঁর শেষ বাণী :

Strong as the thunderbolt, austere as Brahmacharya, great-hearted and selfless—such should be that Sannyasin who has taken the service of others as his Sannyasa; and not less than this should be the son of Militant Hinduism. (P. 32).

—জীবনের মহাদর্শ কি? সেই মহাদর্শ হ'ল একটিই—সন্ন্যাসীর মহাদর্শ। সন্ন্যাসী কে? প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি বজ্রের ন্যায় শক্তিমান্, ব্রহ্মচর্যের ন্যায় তপোযুক্ত, উদার ও নিঃস্বার্থ; যিনি পরসেবাকেই সন্ন্যাসরূপে গ্রহণ করেছেন। সংগ্রামশীল হিন্দুধর্মের প্রত্যেক সন্তানকেই তো এরূপ সন্ন্যাসী হতে হবে।

পুনরায় শুনুন, এই মহালক্ষ্য-লাভের পন্থা :

Renunciation, Renunciation, Renunciation! In the panoply of Renunciation plunge thou into the ocean of the unknown.

ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর! এই ত্যাগের বর্ম পরিধান করেই সেই অজ্ঞাত সমুদ্রে

ঝাঁপ দাও। তোমার দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে, এই মহাযাত্রার জন্য তোমার নিজের তরণী তুমি নিজেই নির্মাণ ক'রে নাও। মনে ক'রো না যে, তোমার পূর্বগামীদের অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রে তুমি এই ভবসাগর পার হ'তে পারবে। তাঁরা তোমাকে কেবল এই আশ্বাসই দিতে পারেন যে, তাঁরা যে যাত্রায় সফল হয়েছেন, তুমিও তাতে সফল হবে। কিন্তু তোমার নিজের যাত্রাপথ তোমাকে নিজেকেই স্থির ক'রে নিতে হবে। অতএব তরণী নির্মাণ কর, এবং নির্ভয়ে যাত্রা আরম্ভ কর। যাত্রা আরম্ভ কর—নিজেকে অনুসন্ধান করতে, নিজের আত্মাকে লাভ করতে; এবং যাঁরা এখনও যাত্রা করেননি, তোমার এই যাত্রা তাঁদের যেন উদ্বুদ্ধ করে।

নিবেদিতার এই অপূর্ব তেজোদীপ্ত বাণীর ঝঙ্কারে আমাদের নীরব জীবন-বীণাটিও আজ যেন ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—এই প্রার্থনা।

যুগান্ত সাধনা মূর্ত আরাধনা
সমুদিতা লোকমাতা।
দেবতানৈবেদ্য রূপ নিরবদ্য
নমি সেই নিবেদিতা॥
পূজ্যা বিদেশিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী
নিরন্তর সেবানতা।
নিবেদিতা ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে,
নমি সেই নিবেদিতা॥

শেষ অভিযান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন-পথের প্রান্তে কী পেলি পথিক ?
সহস্র কর্মের ডাক, খ্যাতির বাতিক,
সংসার গড়ার নেশা, পুত্র-পরিবার,
রাশি রাশি পুঁথি নিয়ে রজনী কাবার—
এরা কি মর্মের শূন্য পেরেছে ভরাতে ?
ঘুরে ঘুরে কামনার তপ্ত সাহারাতে
কী লভিলি ওরে মূঢ় ? দাহ, অশ্রুজল !
জর্জর করেছে চিত্ত মৃত্যুর শৃঙ্খল !
যাঁরে পেলে আর সবই তুচ্ছ মনে হয়,
নিত্য যিনি আনন্দের শাশ্বত নিলয়—
তাঁর পানে জীবনের শেষ অভিযান
শুরু হোক এইবার। নিঃশঙ্ক-পরাণ
চলে যাবো উচ্চশিরে মৃত্যুর ছায়ায়—
চরম জয়ের মাল্য দুলিবে গলায়।

মানসলোকে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

উদ্বোধন লেনে 'মায়ের বাড়ী'র আশে-পাশের পরিবেশ মনে হয় প্রায় একই রকম আছে। সেই স্বল্পপরিসর গলি, সেই সামনের বিরাট বস্তি এবং আশে-পাশে ও পিছনের দিকে ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকটি কোঠা বাড়ী। সেদিন কর্তব্য-ব্যপদেশে মধ্যরাত্রে ঐ অঞ্চল ঘুরিয়া বেড়াইবার পর 'মায়ের বাড়ী'র রোয়াকে কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া পড়িলাম। রাত্রি অন্ধকার। স্বল্প-আলোকিত গ্যাসগুলি সামান্য আলোক বিকিরণ করিলেও স্থানটি প্রায় অন্ধকার হইয়া আছে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। কোলাহল-মুখর কলিকাতা যেন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামে মগ্ন। বস্তির মধ্যে অনেক দূরে একটি শিশু মাঝে মাঝে এই নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছে।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে যেন অতীতে ফিরিয়া গেলাম। নিচের ঘরে পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ ও মায়ের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানেরা বোধ হয় নিদ্রিত। শ্রীশ্রীমা উপরের ঘরে অবস্থান করিতেছেন। গোলাপ-মা, যোগেন-মা প্রভৃতি ভক্ত নারীরা পাশের ঘরে—বোধ হয় নিদ্রিতা। উপর ও নিম্নতল হইতে একটি পুষ্প চন্দন ও ধূপ মিশ্রিত সুগন্ধ যেন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। এই বস্তির মাঝখানে, এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে একটি দেবী-নিকেতন। যেন চতুর্দিকে পঙ্কের মধ্যে একটি পঙ্কজ ফুটিয়া আছে।

রাস্তা হইতে যে দুই-তিনটি সোপান দরজা অবধি উঠিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও আরও কত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মহান্ সন্তান, নাগ মহাশয়, মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ কত অগণিত ভক্ত, ভগিনী নিবেদিতা (?) গৌরী-মা ও অন্যান্য কত ভক্ত নারী ঐ সোপান অবলম্বন করিয়াই 'মায়ের বাড়ী'র ভিতরে গিয়াছেন ও মাকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ পাইয়াছেন। মানসনয়নে ঐ সোপানের উপর আমি তাঁহাদের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের 'বাসুকি' পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ কি আন্তরিক ভাবেই না মায়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মায়ের সঙ্কটাপন্ন অসুখের সময় তাঁহার কি সজাগ দৃষ্টি! মায়ের নিকট হইতে মুড়ির বাটি সরাইয়া আনিবার পর তাঁহার কি অস্থিরতা ও মাকে নিজ-হাতে বার্লি খাওয়াইবার সময় তাঁহার কি আনন্দ! সেই ধন্য সন্তানের কথা মনে পড়ায় মনে গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। মায়ের দীন সেবক ভাবিয়া নিজেকে 'দরোয়ান' বলিয়া পরিচয় দেওয়া—সেই একান্ত শরণাগত ভাব মনে পড়িয়া চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

মাষ্টার মহাশয়ের 'কথামৃত'-সংগ্রহ হইতে পাঠ এবং তাঁহার প্রতি মায়ের আশীর্বাদ, সাধু নাগ মহাশয়ের সেই আকুল ক্রন্দন 'বাপের চেয়ে মা দয়াল', তারপর মায়ের প্রসাদ পাতাশুদ্ধ খাইয়া ফেলিয়া মায়ের দেওয়া কাপড় মাথায় বাঁধিয়া সানন্দে নির্গমন—সমস্ত যেন চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। আবার যেন দেখিতে লাগিলাম, পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মায়ের নিকট স্বরচিত

'সারদা-স্তোত্র' পাঠ করিতেছেন। যখন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেছেন :

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়াম্।
তদ্ভাব-রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

তখন মায়ের শ্রীমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মা যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দুটি চক্ষু হইতে মুক্তাসম বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের পূজারত মূর্তি দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের সম্মুখে বসিয়া মা যেন বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা হইয়া পূজায় নিবিষ্টা। চতুর্দিক পরিচ্ছন্ন; পুষ্প, চন্দন, ধূপ ও ধুনায় ঘর আমোদিত; তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের নিশ্চল নির্বিকল্প মূর্তি; ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মার যেন সংযোগ হইয়াছে। সমস্ত অবয়বে দেবীভাব; শ্রীমুখ উজ্জ্বল। সর্বাঙ্গ হইতে যেন একটি শান্ত স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। কখন তন্ময়তা, কখন স্মিত হাস্য—মুখমণ্ডলে অপরূপ ভাবের বিকাশ হইতেছে। ঠাকুরের সহিত মা যেন কত ভাবে আলাপনে রত। সে স্বর্গীয় মূর্তি যাহারা দেখিয়াছে—এবং দেখিয়া সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা যথার্থই ভাগ্যবান্।

কত কথাই মনে হইতেছে। মহাপূজার একদিন—শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন। আশে-পাশে ভক্ত নারীমণ্ডলী। জনৈকা সাধিকা তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননীরূপে বিরাজমানা। সেই করুণাঘন আয়ত নেত্র, মুখে সেই মৃদু হাসি, সেই অন্নপূর্ণা—আবার জগদ্ধাত্রী মূর্তি। পাঠ শেষ হইল। মা তখনও বরাভয়-মূর্তিতে অধিষ্ঠিতা। সাধিকা বলিলেন, 'আজ আমার কি সৌভাগ্য, স্বয়ং চণ্ডীকে আজ চণ্ডীপাঠ করিয়া শুনাইতে পারিলাম।' মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সাধারণ ভক্ত-নারীমণ্ডলীর কথা মনে করিতে লাগিলাম। কত শত নারী কত প্রকারের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী মাকে শুনাইতেছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও কত আতিশয্য ও কত বিরক্তিকর ব্যবহার। গোলাপ-মা, যোগেন-মা তাঁহাদের ব্যবহারে উষ্মা প্রকাশ করিতেছেন। মায়ের কিন্তু বিরক্তি নাই। শ্রীশ্রীমা শান্ত সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি বলিতেছেন, 'আহা, বলুক না; আমাকে ছাড়া ওরা আর কাকে বলবে!' ভক্ত নারীদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। অনেককে দিয়া মা কাজ করাইতেছেন। কেহ ঘর পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ বিছানা পাট করিতেছেন, কেহ বা কাপড়-চোপড় পাট করিয়া রাখিতেছেন। এঁদের মধ্যে এমন অনেকে সচ্ছল ঘরের মেয়ে আছেন, যাঁহারা নিজ-হাতে বাড়ীতেও এ সব কাজ করেন না। যোগেন-মা পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, 'এখানে কেন এলে? ধর্মের কথা শুনতে এসে সকলে বাজে কাজ ক'রে ম'রছ!' মা প্রতিবাদ করিয়া উপদেশ দিলেন, 'মেয়েদের কখন বসে থাকতে নেই, মা। সব সময় কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে হয়। এতে মনের অনেক শান্তি। আজেবাজে কথা মনে আসতে পারে না।' ভক্তনারীদের কিন্তু মায়ের কাজ করিতে অপার আনন্দ! মা কাহাকেও কোন কাজ করিতে বলিলে তাঁহারা অতিশয় আনন্দ পাইতেন। আরও মনে হইল কত কৃপা, কত দীক্ষা, কত প্রসাদ ও কত আশীর্বাদ! সমস্ত পুরানো কথা, কতবার কতভাবে বলা হইয়াছে; কিন্তু আবার বলিতে, আবার শুনিতে কত ভাল লাগে!

খড়ো-কেদারের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। বাগবাজারের কেদারনাথ খড়ের ব্যবসা করে। তাহার কত ভাগ্য যে তাহার জমিতে মা-জননীর এই অসামান্য মন্দিরের পত্তন হইল এবং শ্রীশ্রীমা এখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। বাগবাজার বড় পুণ্যস্থান! এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কতবার কত স্থানে যাতায়াত করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমা কতদিন এখানে বাস করিয়াছেন!

*　*　*

'মায়ের বাড়ী'র রোয়াকে বসিয়া যখন একান্তচিত্তে শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁহার অগণিত ভক্তের কথা ভাবিতেছিলাম, তখন একটি মাতালের গুন্‌গুনানি গানে চমক ভাঙিল। মাতালটি 'মায়ের বাড়ী'র সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। পদ্মবিনোদের কথা মনে পড়িয়া গেল। এইরূপ গভীর রাত্রে সেই মদ্যপায়ী পদ্মবিনোদ এই ভাবেই এই গলি দিয়া যাইত এবং 'মায়ের বাড়ী'র সামনে আসিয়া আকুলকণ্ঠে গাহিত :

উঠো গো করুণাময়ী, খোল গো কুটিরদ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁদে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার,
সন্তানে রাখি বাহিরে—সুখে আছ অন্তঃপুরে।
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার?

তাহার এই ব্যবহারে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ চাপা ভৎর্সনায় তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিতেন। তাঁহার শঙ্কা হইত যে, এই অসময়ে সঙ্গীতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ভক্ত পদ্মবিনোদ একইভাবে গান গাহিয়া যাইত। একদিন শ্রীশ্রীমা খট্ করিয়া জানালার পাখিটি খুলিলেন। জানালা খোলার শব্দ হওয়া মাত্র পদ্মবিনোদ জগজ্জননীর দর্শন পাইয়া আকুল হইয়া রাস্তায় মাথা ঠুকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মনে হইল—এখন সেই মাতাল পদ্মবিনোদ নাই, কিন্তু অন্য মাতাল এখনও মায়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গান করিতে করিতে যায়। একান্তমনে কান পাতিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কি কেহ এখন ঐরূপ জানালা খুলিয়া মাতালকে দেখা দিবে? আবার কি জানালা খোলার সেইরূপ আওয়াজ হইবে? আবার কি সেইরূপ মদ্যপায়ী রাস্তায় মাথা ঠুকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম জানাইবে? ভক্ত পদ্মবিনোদের মতো মাতোয়ারা না হইলে কি করিয়াই বা সেই কৃপা পাওয়া যায়?

*　*　*

বস্তিতে একটি গণ্ডগোল হইতেছে। মনে হয়, কোন লম্পট স্বামী অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। অনেক লোক উঠিয়া পড়িয়াছে। মনে ক্রোধ হইল। এমন পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বিরক্তি বোধ করিলাম। বস্তির মধ্যে গিয়া সেই লম্পট লোকটিকে তিরস্কার করিলাম। 'মায়ের বাড়ী'র এত কাছে থাকিয়া তাহাদের এইরূপ ব্যবহার অতিশয় লজ্জাজনক, এই কথা বলিয়া তাহাদের লজ্জা দিলাম। একটি পাহারাওয়ালা আসিয়া পড়িল। সে লোকটিকে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিবার অপরাধে থানায় লইয়া যাইতে চায়। স্ত্রীলোকটি করুণ মিনতি করিতে লাগিল এবং পরে যেন বিরক্ত হইয়া সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। তাহার মতে—ইহা নিছক স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। তাহার স্বামী তাহাকে আঘাত করে নাই। পাহারাওয়ালাটিকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়া বস্তি হইতে বাহিরে আসিলাম

মনে হইল ঠিক এইরূপই ঘটনা ঘটিয়াছিল

'মায়ের বাড়ী'র সম্মুখে এই বস্তিটারই কোন এক ঘরে। এইরূপ একটি স্বামী এমনই একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল। স্ত্রীলোকটির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া করুণাময়ী মা গর্জাইয়া উঠিলেন, 'বলি ও মিনসে, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি?' মায়ের এইটুকু বলাতেই সব থামিয়া গেল, কলহ মিটিয়া গেল।

পরিবেশ প্রায় সেইরূপই আছে। ঘটনাও প্রায় ঐরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু সেই মমতাময়ী 'মা' কোথায়? মা কি আজও তাঁহার এই পুণ্য বাড়ীতে বাস করিতেছেন? যাঁহার অনুভূতি আছে, যাঁহার দেখিবার মতো চক্ষু আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, হ্যাঁ, তিনি এখনও আছেন। তাই দেখি, মায়ের ভক্তেরা আকুল হইয়া মায়ের ঘরের দিকে সজল নয়নে বসিয়া আছেন। গায়ক তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া একের পর এক গান গাহিয়া যাইতেছেন, কেহ বা নীরবে মাকে দেখিতেছেন। ভক্তদের আসা-যাওয়া, তাঁহাদের এই বাড়ীর মধ্যে—বিশেষ করিয়া মায়ের ঘরের সম্মুখে ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, আজও যেন সেই মমতাময়ী মা স্নেহময়ী হইয়া তাঁহার ঘরে মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা!

তোমার চরণে আসি

শ্রীশান্তশীল দাশ

যত ব্যথা পাই ঘন বেদনায় নয়নের জলে ভাসি,
তত দিনে দিনে সে-বেদনা সাথে তোমার চরণে আসি।
দেখি চেয়ে, তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে,
ও দু-টি কমল-চরণ বাড়ায়ে;
দু-নয়নে ঝরে কী করুণা ধারা, মুখে কী মধুর হাসি!

এ জীবন ভরে যারা দিল ব্যথা, ঝরালো নয়ন-ধারা,
মনে হয় আজ কত প্রিয়জন, কত না বন্ধু তারা।
আঘাতে আঘাতে নয়নের জলে,
এনে দিল তারা ও-চরণতলে;
আমার বেদনা শতদল হয়ে ওঠে আজ উদ্ভাসি।

ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

সার্থকনামা রবীন্দ্রনাথ যে পুণ্যলগ্নে ভারতের তথা বিশ্বের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তার শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আজ সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁর উদ্দেশে জানাচ্ছে প্রণতি। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে তাঁর যে ভাবরূপটি রয়েছে, সে সম্বন্ধেই আমি একটু আলোচনা ক'রব।

রবির দ্যুতি যেমন কিরণমালায় প্রকাশিত, রবীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি বিবিধ ভাবধারায় অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেমন ছিলেন কবি, কথাসাহিত্যিক, নিবন্ধকার, নাট্যকার, সমালোচক ও শিল্পী, তেমন ছিলেন বিজ্ঞানপ্রিয়, স্বদেশবৎসল ও বিশ্বপ্রেমিক। কিন্তু এই বিবিধ প্রকাশের কোনটাই তাঁর সর্বজনীন স্বীকৃতির মূল হেতু নয়, যেমন নয় তাঁর ব্যাবহারিক জীবন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর বাণী তাঁকে সর্ব মানবের প্রিয় ক'রে তুলেছে ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা সত্য হলেও আংশিক সত্য-মাত্র, কারণ বিশ্বমৈত্রীর বাণী আর যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁদের পক্ষে অনুরূপ স্বীকৃতি-লাভ সম্ভব হয়নি। যেমন রবির অন্তঃস্থিত প্রচণ্ড তাপরাশি বিকীর্ণ হয়ে কিরণমালা-রূপে হয়েছে জাগতিক প্রাণশক্তির হেতু, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে পরম বস্তুটি ছিল, তাই উৎসরূপে বিবিধ প্রকাশের মাধ্যমে রয়েছে তাঁর সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে ও সেই পরম বস্তুটি হচ্ছে তাঁর ভাবমূর্তি—তাঁর দার্শনিক ও ধর্মীয় অনুভূতির সমষ্টিগত রূপ। যে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মকে অস্বীকার ক'রে গর্ব বোধ করতেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা। এই ধর্ম কোন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়; ইহা মানবাত্মার ধর্ম, সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসনা।

সত্যের প্রকারভেদ নেই, কিন্তু প্রকাশভেদ রয়েছে—অর্থাৎ সত্য এক, তা নানা রকমের হ'তে পারে না; কিন্তু উপলব্ধির বৈষম্য অনুসারে তার প্রকাশে তারতম্য ঘটতে পারে। যে-কবি যে-পরিমাণে সত্যের প্রকাশে সক্ষম, মানব-মনে তার আবেদনও ঠিক সেই মাত্রাতেই হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথে হয়েছে সত্যের মহৎ প্রকাশ। 'সত্য' হয়েছেন তাঁর কাছে 'শিব ও সুন্দর' রূপে প্রতিভাত এবং তারই ধারা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা উপধারায় ফল্গুস্রোতের ন্যায় অলক্ষ্যে তাঁর বিশাল রচনা-বলীর ভিতর দিয়ে প্রবহমান। এই সত্যানু-ভূতিমূলক ধর্মই ছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ভিত্তি ও সেই বলে বলীয়ান্ হয়েই তিনি দ্বিধাহীন অবিকম্পিত চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন জীবনের পথে, কোন অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপস না ক'রে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁর একটি কথাও নিজ বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত নয়। এমনটি ছিলেন বলেই বিশ্বমনের গ্রাহকযন্ত্রে উঠেছে তাঁর বাণীর স্বাভাবিক অনুরণন ও তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে চলেছে প্রশস্তির এক মহাসমারোহ।

এই ভাবরূপী রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক

মহিমার এক অপরূপ প্রকাশ, কবিসত্তার জীবন্ত রূপ। উপনিষদের ঋষির অনুভূতি, ভগবৎ-সাযুজ্য ও শান্তির কথা তিনি মানব-কল্যাণে প্রচার ক'রে গেছেন কবির ভাষায় সুললিত ছন্দে।

যখন তাঁর 'খোকা মাকে সুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?'

তখন কি মনে হয় না যে, এ বালসুলভ কৌতূহলমাত্র নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন জিজ্ঞাসা—আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার স্বরূপ কি ?

কবির এই আত্মানুসন্ধানমূলক ভাবজীবনে ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্ট। তাঁর অন্তরাত্মা পরমাত্মারূপী সত্যকেই করেছিল জীবনের লক্ষ্য 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম, আর সেই প্রিয়তমের প্রতীক্ষাতেই তিনি বসেছিলেন সারা জীবন—'দূরের পানে মেলে আঁখি'—'একা দ্বারের পাশে।' মনে ছিল তাঁর শবরীর মতো ক্ষণে ক্ষণে অধীর জিজ্ঞাসা—

'তোরা শুনিসনি কি, শুনিসনি
তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে।

তারপর প্রিয়তমের উপস্থিতির অনুভূতি—

'মন্দিরে মম কে আসিল রে ?
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি
দূরে—দূরে ॥'

এবং সেই অনুভূতিজাত প্রসন্নতার অভিব্যক্তি :

'দিনরজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
তাঁরিমুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।'

অবশেষে প্রিয়তমের স্বরূপ উপলব্ধি :

'এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।'

কবির প্রিয়তম তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছেন প্রেমময়রূপে—

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে,
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে।'

আর যিনি প্রেমময়, তিনিই কল্যাণস্বরূপ ; তাই এখন 'সত্যম্' তাঁর কাছে 'শিবম্' বা মঙ্গলময়—

'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।'

আর মঙ্গলময়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা :

'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।'

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ (Keats) বলেছেন, 'A thing of beauty is a joy for ever.' অর্থাৎ তাহাই যথার্থ সুন্দর, যাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস। সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান বস্তু-নিচয়ের আত্যন্তিক বিশ্লেষণে কবি জেনেছেন যে, একমাত্র সেই অতীন্দ্রিয় সত্তাই—'সত্যম্ শিবম্'ই শাশ্বত আনন্দের আকর। তাই 'সত্যম্ শিবম্' হয়েছেন তাঁর কাছে 'সুন্দরম্'। এখন তাঁর অনুভূতিতে ভীষণের মধ্যেও সুন্দরের প্রকাশ, বজ্রনির্ঘোষেও তার বাঁশির সুর ধ্বনিত—

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।'

এই সুন্দরের সাযুজ্যলাভে তিনি ধন্য—

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।'

কবি এখন তাঁর প্রিয়তমকে জেনেছেন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'রূপে এবং এই জানার অভিজ্ঞতা থেকে গেয়েছেন—

'তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

তাই এখন জগতের কেহই তাঁর পর নয়, সবাই তাঁর আপন। এই জন্যই বিশেষ ক'রে দুর্গত উৎপীড়িত সবহারাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসিক অভিযান। তাঁর দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের ভিত্তিভূমিও এইখানে। এই দার্শনিক উপলব্ধি যেমন তাঁর দেশপ্রেমে করেছিল আবেগের সঞ্চার, তেমনি তাঁকে কল্পনাবিলাসী কবি থেকে কর্মযোগীতে পরিণত ক'রে তাঁর বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নকে, পৃথিবীর সামগ্রিক রূপের কল্পনাকে করেছিল বিশ্বভারতীর বাস্তবরূপে রূপায়িত, যার শিক্ষায় ও প্রেরণায় একদিন না একদিন বিশ্বের জাতিসমূহ এই ভারততীর্থে মিলিত হয়—

'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।'

এরূপে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি যাতে মানুষের সকল প্রচেষ্টা কল্যাণমুখী হয় ও মানবাত্মার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে বলেছেন: শিক্ষা হবে এমন জিনিস, যার দ্বারা মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে, হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃত যুগের আবর্জনা-রাশি দূর করতে পারবে, এবং জড় বিধিকে প্রাধান্য না দিয়ে জাগ্রত বিধাতাকে স্বীকার ক'রে চলতে শিখবে।—এই উপলক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের কথা। বিশেষ ক'রে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে বলেছেন: এরা ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়ে বড় ক'রে চাইতেও শিখলে না। অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই, কারণ তাহা বাহিরের; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মতো লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর নেই, কারণ এ দারিদ্র্য আত্মার।

প্রেমবিহ্বল কবির মনে প্রিয়তমের প্রতি মান-অভিমান নেই। প্রিয়তম তাঁর সম্মুখ থেকে কেবলই সরে যাচ্ছেন, কিন্তু কবির বিশ্বাস অটল:

'এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে।'

প্রেমের পথে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তমকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, হে প্রিয়, যে তোমার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে—

'না থাকে তার মান-অভিমান লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।'

আমাদের মধ্যে দুটি আপাতবিরোধী মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। তাদের একটি ভগবৎকৃপার ও অপরটি কর্মফলের প্রভাব সম্বন্ধে। কেহ কেহ—বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, ভগবৎকৃপায় মানুষ কর্মফলের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। আবার কেহ কেহ—বিশেষতঃ বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ, এই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, কর্মফল

অমোঘ; মানুষের বর্তমান তার প্রাক্তন কর্মের ও ভবিষ্যৎ তার বর্তমান কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এই দুই মতবাদের এক সুন্দর সামঞ্জস্য। তাঁর প্রিয়তম তাঁর প্রতি করুণা-বশতঃ স্বীয় নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের অবতারণা ক'রে যুক্তিহীন খামখেয়ালির পরিচয় দিন, এ তাঁর অভিপ্রেত নয়। কৃতকর্মের অনিবার্য ফলে দুঃখ-তাপ-বিপদ যা-ই আসুক না কেন, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য, কর্মফলের অমোঘ প্রবাহকে প্রতিহত করার জন্য, তিনি প্রিয়তমের কাছে কৃপাপ্রার্থী নন। শুধু দুঃখ-তাপ-বিপদকে সহ্য করার, জয় করার শক্তি যেন তাঁর থাকে প্রিয়তমের কাছে এইটুকুমাত্র তাঁর প্রার্থনা—

'বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।'

কৃতকর্মের অনিবার্য ফলে দুঃখ-তাপ-বিপদের জ্বলন্ত কটাহে দগ্ধ হওয়াকে কবি তাঁর প্রিয়তমের নিষ্ঠুর আশীর্বাদ-রূপে গ্রহণ ক'রে বলেছেন:

'এই করেছ ভালো, নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।'

আঘাতের মাঝেও কবি এখন তাঁর প্রিয়তমের মঙ্গল হস্তের পরশ অনুভব ক'রে পুলকিত হন—

'যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।'

কবি তাঁর আধ্যাত্মিকতার আলোকে উপলব্ধি করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'পাকা আমি' ও 'কাঁচা আমি'র কথা। 'পাকা আমি' তার পরমদেবতার উপর নির্ভরশীল; কাজেই সে উদার, ফলনিরপেক্ষ ও প্রচণ্ড পুরুষকার সম্পন্ন হয়ে কর্ম ক'রে যায় কর্তব্য-বোধে; পরিণাম—মিলন ও মুক্তি। আর 'কাঁচা আমি' অহমিকার মাদকতায় পরমদেবতা থেকে বিচ্যুত; সুতরাং সে আত্মসর্বস্ব, ফলাসক্ত ও নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে মত্ত হয়ে চলে জীবনপথে; পরিণাম—বিচ্ছেদ ও বন্ধন। তাই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ও সংসারাবর্তের ঘূরপাক থেকে মুক্তিলাভের জন্য 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'-তে পরিণত করতে কবির দীর্ঘ ও একাগ্র সাধনা এবং প্রিয়তমের কাছে একান্ত আত্মনিবেদন।

শেষে দ্বৈতভাবের—ভক্ত ভগবান-সম্পর্কের চরম অবস্থা, নিজের মধ্যে প্রিয়তমের প্রকাশ—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।'

ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সমাবেশ—যেন তাঁর শুভ্রজীবনবলাকা জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ও প্রেমের পক্ষপুটে ভর ক'রে উড়ে চলেছে অনন্ত আকাশে—দূর হ'তে দূরে; ক্রমে তা মিলিয়ে গেল কৃষ্ণমেঘের কোলে অস্তরাগ-রক্ত দিগন্তে।

শব্দাপরোক্ষবাদ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

আজ বহু বৎসরের কথা। পুণ্যতোয়া নর্মদাতীরে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃক্ষসংলগ্ন কাষ্ঠফলক দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে হিন্দীভাষাতে যাহা বিজ্ঞাপিত ছিল, তাহার মর্ম এই: পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, এই সুযোগ পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।—কৌতূহল হইল। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত এই সংসারবন্ধন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না। ইহাই শাস্ত্র ও আচার্যগণের বাণী। সেই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যদি মাত্র পাঁচ মিনিটে লব্ধ হয়, কোন মূর্খের পক্ষেই সেই সুযোগ পরিত্যাজ্য নহে। উক্ত কাষ্ঠ-ফলক-নির্দিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ একটি সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূরে এক কুটীরে জনৈক সন্ন্যাসীকে উপবিষ্ট দেখিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিই বিজ্ঞপ্তিকর্তা জানিয়া সাহুনয়ে ব্রহ্মাত্ম-বিদ্যাগ্রহণাঙ্গভূত কিঞ্চিৎ পূর্বানুষ্ঠেয় কৃত্য সমাপনান্তে তিনি 'তত্ত্বমসি' (তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ), এই মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। জিজ্ঞাসু আমার সংসারবন্ধন কিন্তু ছিন্ন হইল না; পুনঃ পুনঃ সংশয় ও জিজ্ঞাসার বিরাম হইল না। তিনি উপনিষদুক্ত নানা পদ্ধতি অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। তথাকথিত শিষ্যের সংসারবন্ধন কিন্তু 'যথাপূর্বং' থাকিয়াই গেল। তখন সেই গুরুজী বলিলেন, 'বেদে এর চেয়ে বেশী কিছু নাই, তুমি মহা হতভাগ্য, দূর হও এখান থেকে।' শিষ্যের অগত্যা না চলিয়া গিয়া উপায়ান্তর ছিল না। ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই তো, উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যোপদেশের কথাই আছে। বহুবার তাহা শুনিয়াছি, আলোচনাও করিয়াছি। জ্ঞানোৎপত্তি হইতেছে না কেন?

অপর এক সময়ের কথা, উত্তর ভারতে বিনা-ভাড়ায় রেল-ভ্রমণকারী জনৈক ভেকধারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহা তো আপনার চুরি, চুরি করেন কেন? আপনার ন্যায় ব্যক্তির ইহা উচিত নহে।' তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইলাম: চুরি কেন হইবে? আমি 'তত্ত্বমসি' উপদেশ লাভ করিয়াছি।—অর্থবোধে অসমর্থ বিবৃতবদন আমার অবস্থাদৃষ্টে তিনি বলিলেন, 'তুমি তো মহামূর্খ হে, আবার গেরুয়াও পরেছ দেখছি; 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থটাও জানো না।' আমি অসামর্থ্য অঙ্গীকার করিয়া বিনা-ভাড়ায় ভ্রমণ ও 'তত্ত্বমসি' বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন: 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মস্বরূপ)—এই জ্ঞান হয়। আর জানো তো ব্রহ্মবস্তু সর্বাত্মক। সুতরাং আমি যদি ব্রহ্মস্বরূপই হইলাম, রেলগাড়ী কি আমা হইতে ভিন্ন? সুতরাং ভাড়া কে দিবে, কাহাকে দিবে এবং কেন দিবে? অগত্যা মূর্খতা অঙ্গীকারকারী আমার বিবৃত বদন বিবৃততর হইয়া পড়িল!

আবার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ দিক্পালসদৃশ বিদ্বান্‌কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এক গীতা-গ্রন্থে দেখিলাম, 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিতে করিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান উদিত হয়, তাহার

ফলে অশেষ দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি। বুঝিলাম না, তাঁহাদের বক্তব্য কি। কেহ যদি গ্রামোফোনে ব্যবস্থা করিয়া অনবরত 'তত্ত্বমসি' শ্রবণ করিতে থাকে, তাহার ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইবে কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তর কি? লোককল্যাণকারিণী অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত সত্যই উপদেশ করিতেছেন, 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ (ছাঃ ৭।১।৩), 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি। আমরা সকলেই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মহাবাক্য শ্রবণ করিতেছি, অবিদ্যার উচ্ছেদ তো হইতেছেই না, উপরন্তু সমাজে উপরিউক্ত অপসিদ্ধান্ত ও অপব্যবহার পরিদৃষ্ট হইতেছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্যই যেন লোকমধ্যে অনির্ণীত অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। সেইহেতু উক্ত বিষয়াবলম্বনে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ, কতটা কৃতকার্য হইব, জানি না।

শব্দাপরোক্ষবাদ কাহাকে বলে?

'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানের উদয় হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান, ইহাই জীবের সংসারবন্ধন নিঃশেষে ধ্বংস করে, ইহাই ভগবতী শ্রুতির সিদ্ধান্ত। শব্দশ্রবণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই মতবাদকে বলা হয় 'শব্দাপরোক্ষবাদ'। উত্তরমীমাংসা-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ এই মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিরোধী আরও কয়েকটি মতবাদ আছে। তন্মধ্যে 'মনোঽপরোক্ষবাদ' অন্যতম। ইহা উত্তরমীমাংসার 'ভামতী' নামক টীকার রচয়িতা পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র এবং তাঁহার অনুগামিগণের মতবাদ। বোধসৌকর্যের জন্য শব্দাপরোক্ষবাদের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই মনোঽপরোক্ষবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; প্রথমে তাহাই করিতেছি।

মনোঽপরোক্ষবাদ

নিষ্কামকর্ম- ও তপস্যাদি-বলে যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে ও অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থাতেও তাঁহাদের সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে; শ্রুতি (বৃঃ ৪।৩.২০) ইহাই বলেন, যথা: 'অহমেব ইদং সর্বম্ অস্মি ইতি মন্যতে' —স্বপ্নকালে মনোব্যতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে না। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের সম্ভাবনাও তৎকালে নাই। অথচ সর্বাত্মভাবের অনুভূতি হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, মনই ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু, 'তত্ত্বমস্যা'দি শব্দ নহে।

'দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' (কঠ ১।৩।১২), 'যন্মনসা ন মনুতে' (কেন ১।৬), 'অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈঃ ২।৯) ইত্যাদি বাক্যসকল পর্যালোচনা করিলে শুদ্ধ সংস্কৃত ও একাগ্র মনই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, অশুদ্ধ অসংস্কৃত ও বিক্ষিপ্ত মন নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্তু মনকে একাগ্র সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিবার উপায় কি? শ্রুতি বলেন: 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন' (বৃঃ ৪।৪।২)—নিষ্কাম কর্ম, দান ও তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা মন শুদ্ধ হয় ও ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। আবার 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'(বৃঃ২।৪।৪), 'তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (মুঃ ৩।১।২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন

(ধ্যান) যে মনকে সংস্কৃত ও একাগ্র করিবার উপায়, ইহাও অবগত হওয়া যায়। এই শ্রবণ মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ কারণ। প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতঃপর 'যাহা শুনিলাম, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না' এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্য হয় মননের (বিচারের) প্রবৃত্তি। আর মননের দ্বারা বিচার্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলেই তদ্বিষয়ে ধ্যানের প্রবৃত্তি উদিত হয়। অনন্তর সাধক অনন্যব্যাপার হইয়া ধ্যানেই নিবিষ্ট থাকেন। অপরোক্ষ যে 'ত্বং' পদার্থ (জীব-চৈতন্য), তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি ঔপাধিক অংশকে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত নিরুপাধিক 'তৎ'পদার্থের (শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর) সহিত অভিন্নভাবে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন চিন্তনই সেই ধ্যান। এই প্রকার ধ্যানপ্রভাবে সাধকের মনে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রকার অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। শ্রুতি তাহাই বলেন, 'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্' (শ্বেঃ ১।৩) ইত্যাদি। এইরূপে দেখা গেল, শ্রবণ মনন ও ধ্যান ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের কারণ, কিন্তু করণ[১] নহে। ব্যাপারস্থানীয় সেই শ্রবণ মনন ও ধ্যান দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র মনই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ। এই যে মতবাদ, ইহাই মনোঽপরোক্ষবাদ।

১ কাষ্ঠচ্ছেদনের প্রতি কুঠার ও কুঠারের উত্থমন নিপতন (উঠা ও নামা) সকলই কারণ। এই কারণ-সকলের মধ্যে কুঠারের উত্থমন ও নিপতনকে ব্যাপার এবং কুঠারকে 'করণ' বলা হয়, যেহেতু তাহাই কাষ্ঠচ্ছেদনের যাবতীয় কারণসকলের মধ্যে অসাধারণ কারণ।

মনোঽপরোক্ষবাদে যুক্তি

ইঁহারা বলেন, 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্য অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে, যেহেতু শব্দ সর্বত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক। শ্রুতিও বলেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈঃ ২।৯), সুতরাং অসংস্কৃত ও একাগ্রতা-হীন মনের ন্যায় বাণী, অর্থাৎ 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ নহে। আর এক কথা, শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ শ্রবণের ফলেই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে সেই বিষয়ে 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা'[২] উদয়ের কোন প্রকার সম্ভাবনা না থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনে (ধ্যানে) কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। যদি বলা হয়, মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ হইলে 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যত্বের ব্যাঘাত হইবে। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন, শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে যদি মনের প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলেই উক্ত বিরোধ হইত। তাহা কিন্তু হয় না, কারণ উপনিষৎশ্রবণ-জন্য জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের নিমিত্ত মননা-

২ অসম্ভাবনা—ইহা দুই প্রকার, প্রমাণবিষয়ক ও প্রমেয়বিষয়ক। তন্মধ্যে শ্রবণের দ্বারা প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয়। প্রমাণ-শব্দে বেদান্ত (উপনিষৎ) গ্রহণীয়। উপনিষদ্বাক্যসকল অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অথবা অন্য কিছুকে প্রতিপাদন করে—এই প্রকার যে সন্দেহ, তাহাই প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনা। মননের দ্বারা প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা নিরাকৃত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য অথবা অভিন্নতাই সত্য—এই প্রকার যে সন্দেহ, তাহাই প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা। নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা নিরাকৃত হয়, এবং চিত্ত একাগ্র হইয়া সূক্ষ্ম অর্থ নির্ধারণে ও ধারণে সমর্থ হয়। দেহাদি সত্য পদার্থ, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও সত্য—এই প্রকার জ্ঞানকেই বলে বিপরীত ভাবনা। ইহা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

দিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইহেতু তাহারা উপনিষদ্রূপ-জীবী হওয়ায় ব্রহ্মের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার অসঙ্গতি না থাকায় শ্রবণ-মনন- ও নিদিধ্যাসন-সংস্কৃত মনই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শব্দাপরোক্ষবাদ

শব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলেন, মন ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের করণ হইতে পারে না, যেহেতু অন্য-ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে বর্তমানকালীন কোন পদার্থের গ্রহণ-সামর্থ্য তাহার নাই। ব্রহ্মবস্তু সদাই বর্তমান ও অতীন্দ্রিয়, স্থতরাং মনের দ্বারা তিনি কি প্রকারে গৃহীত হইবেন ? অন্য-ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের গ্রহণ-সামর্থ্য মনের আছে বটে, স্বগতাদিভেদ-বিহীন নিত্য ব্রহ্মবস্তু কিন্তু অতীত ও অনাগত নহেন, ওতপ্রোতভাবে সদাই বর্তমান, 'স এবাদ্য স উ শ্বঃ' (কঠ ২।১।১৩)। এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই মনের নাই। 'তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে কিন্তু ব্রহ্ম একমাত্র উপনিষদ্গম্য, ইহা অবগত হওয়া যায়। স্থতরাং উপনিষদে বর্ণিত 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি শব্দই (মহাবাক্যই) অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ, মন উক্ত শব্দরূপ প্রমাণের সহকারী মাত্র, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

শব্দাপরোক্ষবাদে যুক্তি

এই বিষয়ে যুক্তি এই—'প্রমাণস্য প্রমেয়াব-গমং প্রতি অব্যবধানাৎ' (বিবরণাচার্য)—প্রমাণ প্রযুক্ত হইলে প্রমেয় পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারে ঘটদেশগত ঘটাকারা বৃত্তির সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বিলম্ব হয় না। শব্দপ্রমাণ-স্থলেও তদ্রূপ 'শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রাত অব্যবধানেন কারণং ভবতি' (বিবরণাচার্য)—শক্তি ও তাৎপর্য-বিশিষ্ট শব্দের জ্ঞানই প্রমেয় পদার্থের অবগতির প্রতি অব্যবধানে কারণ হইয়া থাকে। যেমন 'দশমস্ত্বমসি'—তুমিই দশম ব্যক্তি[৩] ইত্যাদি স্থলে হইয়া থাকে। এই প্রকারেই 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর শব্দের শক্তি এবং তাৎপর্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মস্বরূপ), এই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

শব্দ মাত্র পরোক্ষজ্ঞানের হেতু নহে, স্থলবিশেষে অপরোক্ষজ্ঞানেরও হেতু

কিন্তু শব্দ তো পরোক্ষজ্ঞানের হেতু। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন, শব্দের ইহাই স্বভাব যে, বস্তু ব্যবহিত হইলে তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই তাহা উৎপাদন করে, যথা—'স্বর্গে দেবতা আছেন' ইত্যাদি। কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যদি অব্যবহিত হয় এবং তাহা যদি 'অসি' (হও), 'ইহা' (এই) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা হইলে তাহা অপরোক্ষজ্ঞানেরই জনক

---

৩ দশজন সরল গ্রাম্য ব্যক্তি নদী পার হইয়া 'আমরা সকলে পারে আসিয়াছি কি না' জানিবার জন্য নিজদিগকে গণনা করিতে থাকে। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করার জন্য প্রতিবারই প্রত্যেকে দেখিল মাত্র নয় ব্যক্তি আছে। এক ব্যক্তি নিমজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া তখন তাহারা শোক করিতে থাকে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাপারটা বুঝিয়া তাহাদের একজনকে পুনরায় গণনা করিতে বলেন। যখন সেই ব্যক্তি নবম পর্যন্ত গণনা করিল, তখনই তিনি বলিলেন—'তুমিই দশম ব্যক্তি'। এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই স্বীয় দশমত্ব-বিষয়ে সেই ব্যক্তির অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হয় এবং শোকও নিবৃত্ত হইয়া যায়।

হইয়া থাকে[৪] যথা—'তুমিই দশম ব্যক্তি', 'এই যে দশম ব্যক্তি', 'ইহাই তো দশম বস্তু' ইত্যাদি। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, সুতরাং জীব হইতে ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন, অতএব অব্যবহিত হওয়ায় 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক মহাবাক্য হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) এইপ্রকার অপরোক্ষজ্ঞানেরই উদয় হইয়া থাকে। 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ' (ছাঃ ৬।১৬।৩)—'তত্ত্বমসি' শ্রবণের অনন্তর 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে জানিয়াছিলেন, 'তমসঃ পারং দর্শয়তি' (ছাঃ ৭।২৬।২), 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি বাক্যসকলের পর্যালোচনা হইতে আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই অপরোক্ষব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের উদয় হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যই উপদেশ করেন (ছাঃ ৬।৮।৭—৬।১৬।৩)। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ', ইহাই সিদ্ধ হয়।

শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হইলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ অবিদ্যাধ্বংসে অসমর্থ

এক্ষণে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা হয়—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য তো আমরা সকলেই শ্রবণ করিতেছি, অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় তো হইতেছে না! তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, অপরের না হইলেও শব্দের শক্তি ও তাৎপর্যাদি বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ; যেমন 'তুমিই দশম ব্যক্তি' স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে সংসার-বন্ধনের উচ্ছেদ হয় না কেন? বলিতেছি—উক্ত শ্রোতা যদি উত্তম অধিকারী না হন, তাঁহার যদি নানাপ্রকার পাপ, অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা, চিত্তের চাঞ্চল্য ও বহির্মুখতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকসমূহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শব্দোত্থ সেই অপরোক্ষজ্ঞান স্থির দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল হইতে না পারায় অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। যেমন চঞ্চল দীপশিখার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ। সেইহেতু এই অপরোক্ষজ্ঞান যেন পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তই[৫] হইয়া পড়ে। তখন তাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম পুরুষকে বিধেয়[৬] শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে (ধ্যানে) প্রবৃত্ত হইতে হয়। শাস্ত্র তাহাই বলেন, যথাঃ 'প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ। নচেৎ মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে॥' (শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪)।

৪ কিন্তু বস্তু অব্যবহিত হইলেও যদি 'অস্তি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোধিত হয়, যথাঃ 'দশম ব্যক্তি আছে' 'জীবাভিন্ন ব্রহ্ম আছেন' ইত্যাদি, তাহা হইলে শব্দ হইতে অব্যবহিত বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে।

৫ 'শব্দাৎ প্রথমম্ অপরোক্ষং বা ব্রহ্মজ্ঞানং জাতমপি ভাবতা এব নিশ্চলাপরোক্ষাত্মতত্ত্বরূপেণ প্রতিষ্ঠায়া অভাবাৎ অপ্রাপ্তমিব ভবতি'—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ। ২।২২৮ পৃঃ, বসুমতী সংস্করণ।

৬ 'বিধেয়শ্রবণ' অর্থ বিধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রবণ। কর্মী পুরুষ যেমন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্য-সহকারে কর্মানুষ্ঠান করে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানার্থী সাধকও তদ্রূপ বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান করেন। এইস্থলে নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি বিষয়ে নানাপ্রকার বিচার আছে। আমরা তাহার অবতারণা করিব না। তবে অনন্যকর্মা হইয়া সাধককে উক্ত শ্রবণাদি সাধনসকলেই প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য। এই শ্রবণ তিনপ্রকার, উপশ্রবণ, বিধেয়শ্রবণ ও চরমশ্রবণ। পঠদশাতে ছাত্র যে 'তত্ত্বমস্যা'দি শ্রবণ করে, তাহাকে বলে উপশ্রবণ। বিধেয়শ্রবণ উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে শ্রবণের পরই অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বলে চরম-শ্রবণ। বলা বাহুল্য নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ অধিকারীর উপশ্রবণও 'চরমশ্রবণ' হইতে পারে। সাধকের অবস্থানুসারে 'শ্রবণ' উক্ত ত্রিবিধ আখ্যা লাভ করে।

'স্বয়মেবোপজায়তে' ইহার অর্থ—শব্দনিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়, এইরূপ নহে। স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য ; ইহা পরে পরিস্ফুট হইবে

ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিক্রম

প্রতিবন্ধকযুক্ত পুরুষের অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির ক্রম এই—নিষ্কামভাবে স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পাপক্ষয় না হইলে কাহারও বিবিদিষার উৎপত্তি[৭] ও বিধেয় শ্রবণে অধিকার হয় না। উৎপন্নবিবিদিষা নিষ্পাপ পুরুষের শমদমাদি সাধনসকলের বলে চিত্তের বিপরীত প্রবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়। বিধেয়-শ্রবণের দ্বারা বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয় এবং 'শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট' নামক প্রতিবন্ধকনাশকারী পুণ্যবিশেষের উৎপত্তি হয় (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩।৪।১৪ অধিঃ)। মননের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয় এবং 'তৎ' ও 'ত্বং'পদার্থের শোধন (ঈশ্বর ও জীবের উপাধিবিনির্মুক্ত শুদ্ধ স্বরূপের নিরূপণ) হয়। নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণযোগ্যতা সম্পাদিত হয় এবং বিপরীতভাবনা নিরাকৃত হয় (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ ২।২২৮ পৃঃ, পঞ্চদশী ৭।১০৯ ইত্যাদি দ্রঃ)। যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনসকলের প্রবৃত্তিও এইসময় সার্থকতা লাভ করে, অর্থাৎ সমাধিপর্যন্ত যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনসকলকে এই নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। গীতাব্যাখ্যার প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য মধুসূদন তাহাই বলিয়াছেন, যথাঃ 'ততস্তৎপরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা। যোগশাস্ত্রস্ত সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥' (১৭ শ্লোঃ)। তাহার ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং 'ত্বং'পদলক্ষ্য শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্বাবগাহী নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে সাধকের চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন যে সাধকের পূর্বশ্রুত 'তত্ত্বমসি'শব্দোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান প্রতিবন্ধকবশতঃ অপ্রতিষ্ঠ (চঞ্চল, অস্থির) হইয়া যেন পরোক্ষই হইয়া পড়িয়াছিল, এইপ্রকার অবস্থায় উপনীত নিবৃত্তনিখিলপ্রতিবন্ধ তাঁহার পুনঃ 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের শ্রবণ, অথবা স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল[৮] অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই নির্বিকল্প-সাক্ষাৎকারাত্মক ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। ইহাই মূলাবিদ্যাসহ নিখিল কার্যপ্রপঞ্চকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ফলে সাধক নিরতিশয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন। (গীতা ৬।২৯, মধুসূঃ দ্রঃ)।

'জীবন্মুক্তিবিবেক' নামক গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা

এক্ষণে আমরা কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করিব। পূজ্যপাদ আচার্য বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে এবং পূজ্যপাদ আচার্য মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতা ৬।৩২ টীকাতে—'তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও কোন কোন সাধক জীবন্মুক্তিসুখ লাভ করিতে পারেন না, সেইহেতু তাঁহাদের জন্য মনোনাশ

---

৭ 'বিবিদিষা'শব্দের অর্থ মাত্র ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছামাত্র নহে। কিন্তু দেহাভিমানরহিত বুদ্ধির শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এইপ্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, যথাঃ 'বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্‌প্রবণতা' (গীতা, শ্রীধরী, ১৮।২)। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন, 'কর্ম কত দিন? যতদিন দেহে অভিমান থাকে'। (কথামৃত ৪।২১।৩।২১৪)।

৮ 'প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপন্নম্ অপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্নিশ্চলং ভবতি' (বিবরণ প্রঃ সঃ ২।২২৮ পৃঃ)। 'ততঃ শব্দজনিতাপরোক্ষজ্ঞানং নিশ্চলং প্রতিতিষ্ঠতি।' (ঐ)। 'ধ্যানেনৈকাগ্ৰমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ' (পঞ্চদশী ১৫.৩০) ইত্যাদি দ্রঃ।

ও বাসনাক্ষয় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ইঁহারা এই পদার্থত্রয়ের স্থূলতঃ এইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন : 'আত্মাই পরমার্থ সত্য বস্তু, নিখিল দ্বৈত পদার্থ মায়ার দ্বারা তাঁহাতে কল্পিত, আমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই 'তত্ত্বজ্ঞান'। মনের বৃত্তিসকলের নিরোধকে বলে 'মনোনাশ'। পূর্ব পূর্ব বিষয়ানুভবজনিত যে সংস্কারসকল চিত্তে অবস্থান করে, সহসা যাহারা ক্রোধাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে বলে 'বাসনা'। মনের নিরোধ হইলে সংস্কারসকলের উদ্বোধক নিমিত্ত না থাকায় তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই 'বাসনাক্ষয়'। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে তত্ত্বজ্ঞান, যাহার উৎপত্তির পরেও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য প্রযত্নের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান, অথবা অবিদ্যাধ্বংসী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান? প্রথম পক্ষে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নাই। আমাদের মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্যগণের ইহাই অভিপ্রায়, অন্যথা তাঁহাদের নিজেদের উক্তিই পূর্বাপর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কি প্রকারে? দ্বিতীয় কোটিতে তাহা পরিস্ফুত হইতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি বলা হয়—সেই তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যাধ্বংসী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান। তাহা হইলে মহান্ বিরোধ হইয়া পড়ে। তাহা এই প্রকার সমাধিবলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বাবগাহী ধ্যানে মনের নিরোধ[১] না হইলে 'আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মা' এইপ্রকার অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের, অর্থাৎ অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উক্তপ্রকার অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলেও সাধকের মনোনাশ হয় নাই, তাহার জন্য প্রযত্ন আবশ্যক, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করা যায়? আবার বলা হইয়াছে—যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেহপাত হইলে তাঁহাদের মুক্তির ব্যাঘাত না হইলেও প্রারব্ধকর্মের ফলে সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে তাঁহারা দুঃখ অনুভব করেন, জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়, এই তিনটিরই যুগপৎ অভ্যাস করিবেন, ইত্যাদি। ইহাতেও মহান্ বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। তাহা এই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপদ্যতে' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), 'আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ' (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে মূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ব্যুত্থানকালে যদি ব্রহ্মাত্মবিদের দুঃখই অনুভূত হইতে থাকে, তাদৃশ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের মূল্য কি? দুঃখ অজ্ঞানের কার্য, সুতরাং ব্রহ্মাত্মবিদের দুঃখদৃষ্টে অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সুতরাং যে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান অজ্ঞানকে ধ্বংসই করিতে পারিল না, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-পদবাচ্য কি প্রকারে হইবে? মুক্তিই বা কি প্রকারে প্রদান করিবে? যদি বলা হয়, দেহপাতকালে উদিত সেই বিজ্ঞান অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিবে। তদুত্তরে বলা যায়, তাহাতে নিশ্চয়তা কি? যে অবিদ্যাধ্বংস ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান একবার অজ্ঞানকে ধ্বংস করিলেও

১ সিদ্ধান্তে যোগশাস্ত্রোক্ত 'সর্ববৃত্তির নিরোধ' (যোঃ সূঃ ১।১৮, ব্যাসভাষ্য) মুক্তির উপায়রূপে অঙ্গীকৃত হয় না। 'নিরোধস্তর্হি অর্থান্তরম্ ইতি চেৎ' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিতে যে মনের একাগ্রতা, তাহাতেই মনের অবরোধ, ইহাই সিদ্ধান্তসম্মত মনোনিরোধ। ইহা মোক্ষের অন্যতম সাধন।

পুনরায় উদিত হয়, তাহা দেহপাতকালে অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে গেলে উপরে উদ্ধৃত আচার্যোক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে। প্রারব্ধকর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ এইপ্রকার হয়, ইহাও বলা যায় না—কারণ 'অজ্ঞানজন-বোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ' (অপরোক্ষানুভূতি ৯৭, বিবেকচূড়ামণি ৪৬৩) ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্‌বচনবলে অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিদের স্বদৃষ্টিতে প্রারব্ধও থাকে না। আর যদি প্রারব্ধ অঙ্গীকারও করা হয়, তাদৃশ প্রতিকূল প্রারব্ধ থাকিলে তাহা অপরোক্ষ-ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিবে না। কারণ অনুকূল প্রারব্ধলব্ধ শরীরেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এইপ্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে। আর যে তাঁহারা ব্যুত্থানকালে 'তত্ত্বজ্ঞানা-ভ্যাসের' কথা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ আচার্যপাদ সুরেশ্বর বলিয়াছেন—'দৃষ্টে এতস্মিন্ প্রত্যগাত্মনি কেবলে নাস্তি জ্ঞানম্ অনুৎপন্নং নাপ্যধ্বস্তং তথা তমঃ' (বৃ-ভাষ্য বার্তিক ২।৪।২৩০)। সুতরাং ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয়ে তমঃ অর্থাৎ মূলাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কোন জ্ঞানই অনুৎপন্ন থাকে না, ইহাই বস্তুস্থিতি। অতএব ব্যুত্থিত ব্রহ্মাত্মবিদের তত্ত্বজ্ঞান থাকে না, তাহা অভ্যাস করিতে হইবে, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করা যায়? ব্যুত্থানকালে তত্ত্বজ্ঞানের বিস্মৃতি হয়, ইহাও বলা যায় না, কারণ পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য বলিয়াছেন, 'তদ্বাসনা নিমিত্তত্বং যাতি বিদ্যা-স্মৃতেঃ ধ্রুবম্' (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৮)—ব্রহ্মানুভবজনিত সংস্কারসকল ব্রহ্মবিদ্যার স্মৃতির প্রতি ধ্রুব (নিশ্চিত) হেতু হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবিষয়ক স্মৃতি ব্যুত্থানকালেও থাকায় তাহার বিস্মৃতির প্রশ্ন উঠে না। এই মতাবলম্বিগণ আরও বলেন, 'শুকদেব প্রথমে নিজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,...তাহাতে সন্দেহ গেল না বলিয়া তিনি রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করিলেন' (জীবন্মুক্তিবিবেক, দুর্গাচরণ, ৩১২ পৃঃ) ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি—ভগবান শুকদেবের এই যে তাৎকালিক তত্ত্বজ্ঞান, তাহা অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ, অথবা পরোক্ষ? প্রথম পক্ষে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব-সংশয়াঃ' (মুঃ ২।২।৮) এই শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে; কারণ অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞান হইবে, অথবা সংশয়ও উদিত হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। অগত্যা এইস্থলে দ্বিতীয় পক্ষই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তবে ব্যক্তিটি যেহেতু শুকদেব, সেইহেতু তাঁহার সেই তাৎকালিক তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ়নিশ্চিত, প্রায় তত্ত্বাবগাহী পরোক্ষজ্ঞানমাত্ররূপে অঙ্গীকার করিতে কোন বাধা নাই। অতএব অবিদ্যা-ধ্বংসী অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের অনন্তর জীবন্মুক্তিসুখলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান ও মনো-নাশাদির জন্য অভ্যাসের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করা যায় না, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 'জীবন্মুক্তিবিবেকা'দি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কি, তাহা চিন্তার বিষয়।

স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি, ইহার তাৎপর্য

এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব—উপরে বলা হইয়াছে পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যের শ্রবণ অথবা স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, ইত্যাদি। এইস্থলে 'স্মর্যমাণ' বলিবার তাৎপর্য কি? বলিতেছি—অন্যান্য মানস বৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য। সেইহেতু প্রথম 'তত্ত্বমসি' শ্রবণকালে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাই নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের

অবিদ্যাধ্বংসকাল পর্যন্ত অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার যায় না। অথচ 'তত্ত্বমসি'শব্দজন্য জ্ঞানই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। যদি সাধকের তৎকালে পুনঃ মহাবাক্য শ্রবণের সুযোগ হয়, উত্তম। অন্যথা স্মর্যমাণ 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্য হইতেই তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হয়। শব্দ বাক্যার্থজ্ঞানের করণ নহে, কিন্তু শব্দজ্ঞানই করণ। পূর্ব পূর্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্দ-জ্ঞানজন্য শব্দবিষয়ক' সংস্কারের উৎপত্তি হয়। পরবর্তিকালে প্রতিবন্ধকসকলের নিবৃত্তি হইলে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকের 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের স্মৃতি[১০] সম্পাদন করে। তখন সেই স্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয় নিশ্চল অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হইয়া অবিদ্যাকে ধ্বংস করে; সাধক কৃতকৃত্য হইয়া যান।

ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কখন অবিদ্যা ধ্বংস করে?
'নিশ্চল বৃত্তি' শব্দের তাৎপর্য

এক্ষণে প্রশ্নের উদয় হয়, ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে নিশ্চল ও অবিদ্যাধ্বংসী বলা যাইবে? তদুত্তরে বলা যায়—এই বিষয়ে দুইপ্রকার অভিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ বলেন, প্রতিষ্ঠ জ্ঞান নিশ্চল রূপেই উৎপন্ন হয়, স্বোৎপত্তিক্ষণেই তাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। অপরে বলেন—স্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহা অবিদ্যা ধ্বংস করে (সংক্ষেপশারীরক ৪।২৪-২৫)। শেষোক্ত বাদিগণের অভিপ্রায় এই: একই ক্ষণে কারণের ও কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে, কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের স্থিতি আবশ্যক। অন্যথা কার্যকারণভাবই বিঘটিত হইয়া পড়িবে। আর 'জায়তে' 'অস্তি' 'বর্ধতে' ইত্যাদি প্রকারেই উৎপদ্যমান বস্তুর পরিণাম হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্বে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা কি প্রকারে অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে? অতএব জ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই অবিদ্যার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে প্রথম পক্ষাবলম্বিগণ বলেন—যে-ক্ষণে নিশ্চল জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ('জায়তে'ক্ষণ), সেইক্ষণে অবিদ্যা থাকে, অথবা থাকে না? বাদী অবশ্যই বলিবেন—'থাকে'। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্তমান থাকিলেও সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারিল না, তখন দ্বিতীয় ক্ষণে যে তাহা পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই নিশ্চল জ্ঞান অবিদ্যাকে ধ্বংস করে, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। বায়ুশূন্য গৃহে নিশ্চল দীপশিখা স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। ভগবান শঙ্করাচার্য এই পক্ষের সমর্থক। 'আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য), 'যদৈব আত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপদ্যতে' (বৃঃ ১।৪।৭ ভাষ্য), 'প্রমাণব্যাপারসমকালৈব আত্মনি অনর্থনিবৃত্তিঃ' (মাণ্ডুক্য ৭, ভাষ্য) ইত্যাদি বচন হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক, যাঁহাদের মতে ক্রিয়োপলক্ষিত কালই ক্ষণ-পদার্থ, তাঁহাদের মতে কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ বিভিন্ন হওয়ায় যদি দ্বিতীয় ক্ষণে অবিদ্যানাশ অঙ্গী-কৃত হয়, হউক। ইহা দৃষ্টিভেদে উপপত্তিমাত্র।

এই বিষয়ে আরও আশঙ্কা হয়, নিশ্চল জ্ঞান অবিদ্যার নাশক, ইহা বলিতেছ; কিন্তু চঞ্চল ও নিশ্চল শব্দ তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন একই বস্তু কোন কালে চঞ্চল ও কোন কালে

১০ 'নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ। বাক্যার্থস্যাপি বিজ্ঞানং পদার্থস্মৃতিপূর্বকম্।' 'অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থঃ স্মর্যতে ধ্রুবম্।' নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।৩১।৩২, উপদেশসাহস্রী ১৮।১৯০-৯১ দ্রঃ)।

স্থির হয়। তোমার ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি কিন্তু মানস বৃত্তি হওয়ায় তৃতীয়ক্ষণনাশ্য। সুতরাং তাহা উৎপত্তিক্ষণে চঞ্চল, স্থিতিক্ষণে নিশ্চল, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তাহাতেই যদি তুমি তৃপ্ত হও, তবে তাহাই হউক। পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর কিন্তু বলিয়াছেন—'যঃ এব অবিদ্যাদিদোষ-নিবৃত্তিফলকৃৎপ্রত্যয়ঃ, আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততঃ বা সঃ এব বিদ্যা ইতি' (বৃঃ ১।৪।১০ ভাষ্য)। অর্থাৎ যে জ্ঞান অবিদ্যাদিদোষের নিবৃত্তিরূপ ফলের জনক, তাহা প্রাথমিক হউক, অথবা চরম হউক; অবিরতভাবে একের পর অন্যটি উদিত হইতে থাকুক, অথবা একবারমাত্রই উদিত হউক, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা অঙ্গীকৃত হয়, ইত্যাদি। সুতরাং উদয়-কালেই নিশ্চল হউক. অথবা দ্বিতীয় ক্ষণেই হউক, ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। যাহা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে, তাহাকেই আমরা নিশ্চল বৃত্তি বলিব। বস্তুতঃ এই প্রকার অঙ্গীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কারণ শ্রুতি এই বিষয়ে নির্বাক্, অন্ততঃ তাদৃশ শ্রুতিবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আর বাক্যমন- ও দেশ-কালাতীত বিষয়ে সমাধিলীন পুরুষের পক্ষে 'কতক্ষণে অবিদ্যা ধ্বংস হইল', ইহা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবও নহে। অতএব আশঙ্কা উত্থাপনের অবসরই এখানে নাই।

শব্দ- ও মন-বিষয়ক আক্ষেপের সমাধান

এই মতবাদে পুনঃ আশঙ্কা হয়—শ্রুতি বলেন, 'যদ্বাচা অনভ্যুদিতম্' (কেন ১।৫), 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদি। সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের 'করণ' কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে শব্দা-পরোক্ষবাদী বলেন—শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যসকলের তাৎপর্য। বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণা-বৃত্তিবলেই 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন (শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান) হয়। যদি শব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলেও তাহা অঙ্গীকৃত না নয়, তাহা হইলে 'তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যাহত হইয়া পড়িবে। যদি শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি তোমরা অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমরা যে শব্দ হইতে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান অঙ্গীকার কর, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অতএব শব্দকরণতাবাদে তোমরা বিরোধ উদ্ভাবন করিতে পার না। কিন্তু মন যদি করণ না হয়, তাহা হইলে 'মনসা অনুদ্রষ্টব্যম্' (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যের গতি কি হইবে? তদুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে মনের একাগ্রতা অপেক্ষিত হওয়ায় উক্ত শ্রুতি ব্যর্থ হয় না।

প্রসঙ্গের উপসংহার

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের প্রতি করণ, মন নহে। সাধক মহোদয় লক্ষ্য করুন—শব্দই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ হউক অথবা মনই হউক, সাধকের ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা দার্শনিকগণের সূক্ষ্মতত্ত্বনির্ণয়ের বিচারমাত্র। অসংখ্য জন্ম ব্যাপিয়া কেবলমাত্র 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই কাহারও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, তদ্দ্বারা বিনা-ভাড়ায় রেলভ্রমণের যোগ্যতাও অর্জিত হয় না এবং নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক অধিকারী না হইলে পাঁচ মিনিটে কাহাকেও ব্রহ্মজ্ঞান দানও করা যায় না। মনই জ্ঞানের করণ হউক বা শব্দই হউক, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান তীব্র সাধনসাপেক্ষ এবং ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য। ভগবান শারীরক-ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন, 'তদনুগ্রহহেতুকেনৈব বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১ ভাষ্য) ইত্যাদি॥ ওঁ

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁহাকে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট-হলে নাগরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি সঙ্কলন-কালে জনৈক বন্ধু কথায় কথায় আমাকে বলেন, 'বেলুড় মঠে বর্তমানে একজন খুব বড় সাধু আছেন—মহাপুরুষ মহারাজ; আপনি যদি তাঁহার সহিত আলাপ করেন তো প্রচুর আনন্দ পাবেন।'

তার পর একদিন পূঃ মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই; পৌঁছিয়া দেখিলাম—তিনি মঠের বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমি প্রণাম করিলাম; তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিবার জন্য আসিয়াছি শুনিয়া তিনি অতি কোমলভাবে বলিলেন, 'বাবা! আজ আমি বড় ব্যস্ত, আমাদের মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) অসুস্থ হইয়া (বাগবাজার) বলরাম-মন্দিরে আছেন, আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাবা, আর একদিন এস।' এই কথা-কয়টি এমন স্নেহভরে বলিলেন যে, আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং কথা-কটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। প্রত্যুত্তরে বলিলাম, 'আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তা এস না বাবা, এতে আর আপত্তি কি?' এই বলিয়া তিনি মঠ হইতে হাঁটিয়া গিয়া বেলুড় স্টীমার-ঘাট হইতে স্টীমারে উঠিয়া বাগবাজার স্টীমার-ঘাটে নামিলেন। আমিও তাঁহার সহিত 'বলরাম-মন্দিরে' গিয়া অসুস্থ অবস্থায় রাজা মহারাজকে দর্শন করিলাম। রাজা মহারাজের অসুস্থতার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে বড়ই চিন্তিত দেখিয়া সেদিন আর তাঁহার সহিত বেশী কথা বলিবার সাহস হইল না। কিছুদিন পরেই পূঃ রাজা মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাই।

* * *

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৯ (সেপ্টেম্বর, ১৯২২), আমি প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের লেখক শ্রীম-র সংস্রবে আসি। তাঁহার কথামত প্রত্যহ ভোরে স্টীমারে করিয়া কাশীপুর হইতে মঠে যাইতাম। মঠে সাধুসঙ্গের নিমিত্ত তিনি এইরূপ অনেককেই পাঠাইতেন। মঠে গঙ্গা-স্নান, শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া সে স্টীমার শিবতলা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেই ঐ স্টীমারেই বাড়ী ফিরিতাম। ইহাতে কাজ-কর্ম কিছু ব্যাহত হইত না। ইহার ফলে মঠের ও সাধুদের সহিত বেশ একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

কোন কোন ভক্ত বিনা-সংবাদে কখন কখন মঠে প্রসাদ পান শুনিয়া মাস্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন: মঠে যখন তখন প্রসাদ পাইতে নাই। ইহাতে আশ্রম-পীড়া করা হয়। একদিন কোন ভক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও সাধুসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যথারীতি মঠে গিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলে পর তিনি স্নেহভরে বলিলেন, 'ওরে, আজ মঠে ঠাকুরের ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। আজ তুই এখানে পেসাদ

পেয়ে যাবি।' আমি তখন মঠে নূতন যাওয়া-আসা করিতেছি। মহাপুরুষ মহারাজের এই কথার গুরুত্ব তখন বুঝি নাই। আমি তখন মাস্টার মহাশয়ের পূর্বোক্ত সাবধান-বাণী মনে করিয়া ভাবিলাম, মঠে প্রসাদ পাইলে তো আশ্রম-পীড়া করা যাইবে। অতএব প্রসাদ না পাইয়াই চলিয়া আসিলাম। মাস্টার মহাশয় তখন মিহিজামে ছিলেন। এই ঘটনা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলাম যে, আশ্রম-পীড়ার আশঙ্কায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনি নাই এবং প্রসাদ ধারণ না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। আমার চিঠি পাইয়া মাস্টার মহাশয় ৩রা নভেম্বর ১৯২২ খৃঃ মিহিজাম হইতে লেখেন :

> আপনি শ্রীযুত মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও মঠে ৺মহাপ্রসাদ পান নাই শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সাধুদের নিমন্ত্রণ অনেক ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ফলমিষ্টান্ন লইয়া আপনি যদি পূজার্থে মঠে নিবেদন করেন ও সেই দিনেই মঠে ৺মহাপ্রসাদ নিজে প্রার্থনা করিয়া ভোজন করেন, তবে বড় ভাল হয়।

মাস্টার মহাশয়ের আদেশ-মত আমি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরে একদিন মঠে মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়াছিলাম।

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের উপর আমার এমনি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, মঠে গিয়া তাড়াতাড়ি প্রথমে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। প্রতিবারেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কিরে ঠাকুরঘরে গেছলি?' প্রত্যেক বারেই বলিতে হইত, 'না, মহারাজ, যাইনি।' তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া দোতলার উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার তাঁহার নিকট আসিতাম। তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং তাঁহার ঘরে একটু বসিয়া থাকিলেই হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত, এবং মন একটি উচ্চভূমিতে উন্নীত হইত, তাঁহাকে কখন কোন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না; দর্শন করিলেই মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

এক রবিবার মঠে গিয়াছি— সেদিন আমার কাপড়জামা একটু ময়লা ছিল। মহারাজ ঠিক ধরিয়াছেন, 'হ্যাঁরে, তোর জামাকাপড় ময়লা কেন?' আমি বলিলাম, 'মহারাজ! আজ রবিবার, মঠে এলাম। আপনাদের সকলের নিকট তো আমি পরিচিত। মনে করিলাম, আপনাদের সামনে একটু ময়লা কাপড় প'রে এলেই বা ক্ষতি কি? আগামী কাল সোমবার, আপিসে যেতে হবে, অনেক সময় কাজের জন্য বড় সাহেবের সামনে যেতে হয়, তখন ময়লা কাপড় চলে না। আগামী কাল সোমবারে কাপড় ছাড়তেই হবে ব'লে আজ আর কাপড় ভাঙিনি।' এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ওরে, ঠাকুর যে আমাদের বড় সাহেব রে! মঠে যখন আসবি, কখনও ময়লা কাপড় প'রে আসবি না—ঠাকুর আমাদের ময়লা কাপড় প'রে ঘোরা পছন্দ করতেন না। এখানে যখনই আসবি, ফর্সা কাপড় প'রে আসবি।'

১৯৩০ খৃঃ আমার স্ত্রীবিয়োগের দুই দিন পরে মঠে গিয়াছি সকালে প্রায় ৮টার সময়। দেখি, তিনি স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব বারান্দায় আরাম-কেদারায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কিরে! তোর পরিবার কেমন আছে?' আমি বলিলাম, মহারাজ

পরশু মারা গেছেন।' শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'বাবা, আর দুঃখ করতে হবে না। কিন্তু দেখিস বাবা, আর যেন বিয়ে করিসনি।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যেন ঠিক থাকতে পারি, আর যেন সংসারে মাথা গলাতে না হয়।' তখন তিনি তাঁর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন, 'আশীর্বাদে এইটি হয়। নিজের মনে জোর করতে হবে বাবা! তারপর জেনো আমাদের আশীর্বাদ তো আছেই।'

আঠার দিনের একটি শিশু সন্তান রাখিয়া আমার সহধর্মিণী পরলোক গমন করেন। ২।৩ মাস পরে একদিন মঠে গিয়াছি, মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, তোর ছেলেটা কেমন আছে?' মায়ের দুধ না পাওয়ায় ছেলেটির শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'মহারাজ! ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে।' তিনি বলিলেন, 'রিকেটী হয়ে গেছে! আচ্ছা, একদিন তাকে আনিস, দেখবো কেমন হয়েছে।' এই বলিয়া তাঁহার পরিচিত এক ডাক্তারের নিকট যাইতে বলিলেন।

পরে একদিন ছেলেটি লইয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম। মহারাজ তাঁর পদ্মহস্ত ছেলেটির গায়ে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমাদের আর কি ওষুধ আছে বাবা! শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃতই আমাদের যা কিছু ওষুধ। তুই ছেলেটিকে একটু চরণামৃত খাইয়ে দিবি ও আর একটু গায়ে মাখিয়ে দিবি। শ্রীশ্রীঠাকুর ওকে ভাল ক'রে দেবেন।'

মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদে ছেলেটি সারিয়া গেল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তাঁহার অপার স্নেহের কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

* * *

সৌভাগ্যক্রমে আমি ১৯২১-২২ খৃঃ হইতেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে যাইবার সুযোগ পাই। তাঁহার যে স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইত, যেন আমাকে উনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। কিছুদিন পরে মঠের জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে এত ভালবাসেন, তুমি ওঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছ না কেন?' আমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত বলিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে আগ্রহ করি নাই। আমার মনে হইত, মহারাজ আমাকে এত ভালবাসেন, আমার আর দীক্ষা লইবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয় বলিতেন, দীক্ষা একবার হইলেই হয়। পুনরায় দীক্ষা লওয়ার দরকার হয় না। সুতরাং উক্ত সন্ন্যাসীকে মাস্টার মহাশয়ের কথাও বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ও নিয়ম ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আচ্ছা মাস্টার মহাশয়কে তুমি এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রো।'

মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, 'তুমি যাঁর কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেছ, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।' তদনুসারে একদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কুলগুরুর নিকট পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ কথাও বলিলাম। তিনি শুনিয়াই বলিলেন, 'কিরে! তোকে দীক্ষা দিইনি! আচ্ছা কালই আসবি।' আমি বলিলাম, 'সে কি মহারাজ! এত শীঘ্র আমি কি ক'রে প্রস্তুত হবো! আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।' তিনি বলিলেন, 'কিছু প্রস্তুত হ'তে হবে না, ভাঁড়ার থেকে একটা হরীতকী চেয়ে নিয়ে আয়, সেইটাই আমাকে দক্ষিণা

দিবি। তোকে আর কিছু দিতে হবে না।' আমি অবশ্য তার পরদিনই কিছু ফলফুল লইয়া আসিলাম এবং যথাসময়ে তিনি আমায় কৃপা করিলেন।

*   *   *

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তখন তত ভাল নয়। ডাক্তারের নির্দেশমত বাহিরের লোককে বড় একটা তাঁর নিকটে যাইতে দেওয়া হয় না। তবে যদি কেউ কোন উপায়ে তাঁহার নিকট যাইয়া পড়ে তো যতক্ষণ না কথা শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে বাহির করিয়া দিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। একদিন বিকালে আমি ও বন্ধু হি—বাবু মঠে যাইয়া দেখি, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের সামনের দরজা বন্ধ। হি—বাবু বাল্যকাল হইতেই মঠে যাতায়াত করেন এবং মঠের সাধুরা সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করেন। উনি সব কৌশল জানিতেন। আমাকে লইয়া স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব দিকের বারান্দা হইয়া রাজা মহারাজের ঘরের মধ্য দিয়া একেবারে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে উপস্থিত। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, 'কিরে, তোরা এসেছিস্! আয়, আয়, বোস।'

এইরূপে তাঁহার সহিত হাসিখুশি ও গল্প করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, এই অল্পক্ষণ তাঁহার সান্নিধ্যে থাকায় মনও আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। পরে আমরা যেমন ঘরের বাহির হইয়াছি, অমনি সেবক-মহারাজ আমাদের ধমকাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে এতটুকু আঘাত লাগিল না বা একটুকুও দুঃখ হইল না, তখন অন্তরে যে অপার আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে, তাহার নিকট এ ধমক কোথায় ভাসিয়া গেল। সাধুদের তিরস্কার তো আশীর্বাদ! সে যাহা হউক মহাপুরুষ-সঙ্গ তো করিয়া লইয়াছি! এতক্ষণ তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছি! পরে আবার মঠে যাইলে সেই সেবক-মহারাজই আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওরে, তোদের এত বকাবকি করি কেন জানিস? তাঁর শরীর খারাপ। ঐ অবস্থায় বেশী কথা কইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে। সেইজন্য একটু বলি। তা কিছু মনে করিসনি।'

সেইসব পুরাতন দিনের মধুময় স্মৃতি মনে হইলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। তাঁহার অসীম ভালবাসার ফলে মঠ যে আমাদের কত প্রিয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। * *

স্বামী শিবানন্দের একটি পত্র

[শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী-বিষয়ক]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, Belur, Howrah

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ 5-8-20

শরণম্

শ্রীমান সু—

ন-কে যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্রীমার স্থূলদেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য, এবং তজ্জন্য ভক্তদের খুব দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তদের ইহা পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, তিনি সাধারণ মানবী নন বা সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা জগজ্জননীর এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা। তিনিই এইবার ভগবান—অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তেরা তাঁর কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁদের মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। তাঁরা যখনই 'মা' বলিয়া তাঁকে কাতরে দেখিতে চাইবেন, তাঁকে দেখিতে পাইবেন, নিশ্চয়ই। তুমি কখনই হতাশ হইও না। গর্ভধারিণী মা দেহ ত্যাগ করিলে সন্তানেরা আর তাঁকে দেখিতে পান না সত্য। সহস্র ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না। কিন্তু এ মা যে জগজ্জননী, জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ভক্তেরা কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন। তোমরা যে মহা ভাগ্যবান্ সাক্ষাৎ তাঁর কৃপা পাইয়াছ। তোমরা যখনই তাঁর বিচ্ছেদে কাঁদিবে, তখনই তিনি তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। তুমি পত্রে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইরূপ দুঃখ যখনই তাঁর কাছে জানাইবে, তখনই তিনি তোমায় শান্তি দিবেন। ইহা মানবীয় ব্যাপার নয়, ইহা দৈবী, ঐশ্বরিক ব্যাপার। সুতরাং তুমি কখন হতাশ হইবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। গলা কাটিয়া ফেলিলে ও জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তোমার এ বিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে—আমি মা জগজ্জননীর ছেলে, তিনি আমায় দয়া করিয়াছেন, আর আমার জগতে কিসের ভয়, কিসের ভাবনা? আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি, এই বিশ্বাস তোমার মনে সদা সর্বদা জাগিবে। এ সকল কথা তোমায় সান্ত্বনা দিবার জন্য বলছি না। এ সকল প্রকৃত সত্য কথা, আমাদের প্রাণের কথা। অধিক আর কি লিখিব, তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মা তোমায় শান্তিতে রাখুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শিবানন্দ

মা

শ্রীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ

কত ক্ষুদ্র শব্দটুকু মাতৃ-সম্বোধন,
মা ব'লে ডাকিলে শুধু জুড়ায় জীবন।
শান্তি, তৃপ্তি এ বিশ্বের যা কিছু আরাম
কেন্দ্র ক'রে আছে সব একাক্ষর নাম।
নিঃসঙ্গ প্রথম সেই জীবন-প্রভাতে
মা ছাড়া ছিল না কেহ আনন্দ-আঘাতে,
মা-ই দেয় ধীরে ধীরে ক'রে পরিচয়—
তখন সবাই এসে আপনার হয়।
যে ব্যথা জননী সহে সন্তানের তরে
যে নিবিড় স্নেহ রয় মায়ের অন্তরে,
উৎকণ্ঠায় তাঁর যত রাত্রিদিন কাটে
তুলনা কল্পনা মাত্র ;—কথা নাহি আঁটে।
জন্ম জন্ম সেবা করি যদি রাত্রিদিন
পরিশোধ নাহি হয় তবু মাতৃঋণ।

তোর কাজ

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

অজানারে জানতে হবে
এই দুনিয়ার মাঝখানে,
নইলে জীবন বৃথায় যাবে
সম্পদে আর যশ-গানে।
বেদান্তের জটিলতায়
লাভ কিরে তোর ? শোন্ না রে-
প্রশ্ন করা বৃথাই যে তোর
জবাব পাবি অন্তরে।
তোর দুয়ারে দিবানিশি
ঘুরছে যে সে তার দায়ে ;
বিশ্বাসেতে নুয়ে পড়ে
বিকিয়ে দে মন তাঁর পায়ে।
তাঁকে যে তোর পেতেই হবে
এ জীবনটা না যেতে,
ভক্তিভরে ধরে থাক মন
গুরুর চরণ দুই হাতে।

প্রার্থনা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আঁধারের জন্ম-মৃত্যু হেরিলাম জীবনে আমার,
বাষ্পাচ্ছন্ন নীহারিকা উল্কাপুঞ্জ কুজ্ঝটিকা কত !
অবিনাশী দেহ-বীজ ভূত-সূক্ষ্মে রহে অনিবার,
চেতনার আবির্ভাব অচেতন বস্তু হ'তে শত।
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে জেগে ওঠে চিত্ত-অনুভূতি,
তাই নিয়ে ছায়াময় অবাস্তব কল্পনা-বিলাস,
গতিধর্ম অবসন্ন। ঋষি-হৃদয়ের দিব্যস্তুতি
বিশ্ব করে প্রদক্ষিণ অমৃতেরে পরিচর্যা করি ;
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি, হেরি তার মহাশক্তি রূপ,
সৃষ্টির স্বরূপ সাথে মিশে গেছে জৈবলীলা মাঝে।
প্রাণের কুসুমে কেন বসে আছে মায়ার মধুপ ?
শিক্ষা দাও সত্যধন, হে দেবতা, অজ্ঞান আবরি।

জীবনদেবতা

শ্রীমতী বিভা সরকার

জীবনের অন্তঃপুরে বসিয়া একেলা
স্মিত হাস্যে কি দেখিছ তুমি ?
কিসের প্রকাশ ?—নীরবে বাহিরে এস
প্রিয়তম তোমায় প্রণমি !
মোর জন্ম-জন্মান্তের চির-পুণ্যলোকে
তব, করুণা-নির্ঝর তলে আসি ;
জ্যোতির প্রকাশ হোক ভেদি অন্ধকার
মর্ম মোর উঠুক উদ্ভাসি !
কামনা হয়েছে সোনা পরশের রসে
লভিয়াছি চির স্পর্শমণি।
অপূর্ণ হয়েছে পূর্ণ, মুগ্ধ মোর মন
ধন্য করি দিয়েছ আপনি !

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন

[বিবৃতি-মূলক প্রবন্ধ—পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

প্রথম অধিবেশনের শেষ কথা

প্রথম অধিবেশনের শেষদিকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এই: নিজের ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া এবং সেইভাবে জীবনযাপন করিয়া কি অপরের ধর্মমতের প্রতি সমাদর জানানো চলে?

অধ্যাপক লেড্ডি বলেন: অপরের ধর্ম-মতের প্রতি অসহিষ্ণুতার কারণ—আমাদের অপর ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। যদি আমরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অপরের ধর্মশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমরা অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতে পারি।

ডক্টর মেনশিং বলেন: অপরাপর ধর্মমতের গুণাবলী উপলব্ধি করিয়া সমাদর করিতে হইলে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমার ধর্ম আমার দেশের ঐতিহ্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইলে আমার আমিত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর মহাদেবন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও অপরোক্ষানুভূতি ব্যাখ্যা করিয়া দেখান, মানুষ কেমন করিয়া অপরের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও নিজের ধর্মমত ও ধর্মবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল: সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কেমন করিয়া বর্তমান জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে এই প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নূতন ধরনের মূল্যবোধ আসিয়াছে, না পুরাতন মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হইয়াছে? চিরাচরিত মূল্যবোধ, যথা—সত্যের প্রতি অনুরাগ, গুণীর সমাদর, জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা—এই সব মূল্য বর্তমান সমাজে কি একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে? জাতি-ভেদ-প্রথা কোন কোন সমাজে এখনও দৃঢ়মূল হইয়া সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন ধরিতেছে, একান্নবর্তী পরিবার যেভাবে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাতে মানুষ অতিমাত্রায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে—ইহার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? শিল্পোন্নয়ন মানুষের সঙ্গে তাহার সমাজের সম্পর্ক কিভাবে রূপান্তরিত করিতেছে? নগরবাসী ও গ্রামবাসী পারস্পরিক জীবনে সহায়তা করিতেছে কিনা এবং করিলে কিভাবে করিতেছে?

ডক্টর ক্যালিস্ বলেন: প্রত্যেক দেশেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়াছে সত্য এবং তাহার ফলে মানুষ এখন আর নিজের দেশে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবী এখন তাহার নিজের

দেশ। তথাপি হাজার বছর আগেকার মানুষের মনে যে জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল, সত্য ও মঙ্গল সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন ছিল, এখনও সেই প্রশ্ন মানুষের মনকে উৎকণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং-এর মতে: প্রাচীন সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; ইহার কারণ পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থই সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অপেক্ষা একটি শিল্পসংস্থার উর্ধ্বতন কর্মচারীর সম্মান অনেক বেশী।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজের ভাঙন ধরিয়াছে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমানে যে সমাজ-ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বর্জন নহে, তাহার রূপান্তরমাত্র। বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, নারীজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বাড়িয়াছে, জাতিভেদ-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে যদিও অস্পৃশ্যতা অপরাধ, তথাপি অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে উঠিয়া গিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। অধ্যাপক টানাকা বলেন, জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে জাপানের অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের অনুরূপ।

সমাজের সর্বনিম্নস্তরে যে কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও আলস্য বিরাজ করিতেছে, সেই প্রসঙ্গে প্রত্যেক প্রতিনিধিই বলেন, শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ ধীরে ধীরে দূর হইবে।

অধ্যাপক টমলিনের মতে: বৃটেনে পরিবারের আকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। একান্নবর্তী পরিবার বলিয়া কিছুই নাই। স্বামী স্ত্রী ও সন্তান লইয়া পরিবার। সন্তান বড় হইয়া উপার্জনশীল হইলে সে পিতৃগৃহ হইতে আলাদা হইয়া থাকে, কাজেই পিতা-মাতার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: অর্থনৈতিক কারণে এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিবার ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন নিজেদের মধ্যেই হইতেছে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে শিশুসন্তানের জীবনের উপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে।

অধ্যাপক হোবেল বলেন: আমেরিকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ই বিবাহ করিয়া থাকে। ইহার ফলে একদিকে স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনা, তেমনি অপর দিকে তুচ্ছ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও আছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং সমাজের উপর শিল্পোন্নয়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং যুবসম্প্রদায় শিল্পোন্নয়নকে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পোন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে এবং পুরাতন সমাজের নানাবিধ রূপান্তর ঘটিতেছে।

ডক্টর ক্যালিস নগর-সভ্যতার প্রভাব মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে রূপান্তরিত করে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন: প্রকৃতির সংস্পর্শে না থাকিলে মানুষ ধীরে ধীরে স্বাধীনতার স্পৃহা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি সম্ভ্রমবোধ প্রভৃতি মূল্যবোধ হারাইয়া ফেলে।

অধ্যাপক টমলিনের মতে: শিল্পোন্নয়নের ফলে বৃটেনে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। বৃটেনের সামাজিক জীবন প্রায় দেড়-শ বছর

ধরিয়া শিল্পায়নের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। বৃটেনের সাধারণ মানুষও নগরবাসী। কাজেই বৃটেনে সমস্যাটি অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে গ্রামসংরক্ষণ করিবার জন্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা বৃটেনে যেভাবে হইতেছে—টেলিভিসন প্রভৃতি দ্বারা—তাহার ফলে যান্ত্রিক জীবনের কুফল অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে। টমলিনের মতে—'নিজে শেখ', 'নিজে কর' প্রভৃতির ফলে মানুষ যন্ত্রজীবনের কুফল হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে; কারণ অবসর-সময়ে অহিতকর কোন নেশায় মত্ত না হইয়া সে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছে।

শিল্পায়নের ফলে মানুষের মূল্যবোধ যে পরিবর্তিত হইয়াছে, এ কথা প্রায় সকল প্রতিনিধিই স্বীকার করেন। তবুও প্রতিনিধিরা এই আশা প্রকাশ করেন যে, যদিও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটি মানবিক দর্শনের সম্ভাবনা দেখা যায়, যে দর্শন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দর্শন নয়। পৃথিবীর সকল মানুষের দর্শন (a global oriented humanistic philosophy and a cosmological world-view)।

প্রতিনিধিরা, বিশেষ করিয়া কাউণ্ট কাইজারলিং ও ডঃ মেনশিং, আর একটি আশার কথা বলেন: প্রাচীনকালে মানুষ আধ্যাত্মিক মূল্যগুলি বিনা-বিচারে গ্রহণ করিত; এখন মানুষের মননশীলতা এত তীক্ষ্ণ হইয়াছে যে, বিনা-প্রমাণে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না। ইহা এক দিক দিয়া আশার কথা সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল: সাংস্কৃতিক মূল্য কেমন করিয়া মানুষের সামাজিক বিবর্তন ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করে

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার দুঃখ করিয়া বলেন যে, সাধারণ মানুষ—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ—এখন আর দর্শন, ধর্ম বা সংস্কৃতির উচ্চ আলোচনায় এবং মনন-শীলতায় আত্মনিয়োগ করিতে চায় না। লঘু চিত্র, লঘু উপন্যাস, লঘু তামাসা তাহাকে বেশী আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া যাঁহারা শিল্পী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন। সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদান হয় না। সেইজন্য সংস্কৃতির যতখানি ব্যাপক প্রসার আমরা আশা করিয়া থাকি, ততখানি হইতেছে না। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্বন্ধেও বলা চলে যে, spiritual groups বা 'ধর্মসংঘ' প্রাচীন কালের মতো এখন আর তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। মানুষের ধর্মবোধ এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যখন সে আন্তর অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করে, তখন সে একক এবং অসঙ্গ।

'Tradition বা ঐতিহ্য বলিতে কি বুঝিব?' এই প্রশ্ন লইয়া ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডক্টর মেনশিং বিশদ আলোচনা করেন। প্রাচীন মূল্যবোধ যদি আমরা সত্যই হারাইয়া ফেলিয়া থাকি, তবে তাহা পুনরুদ্ধারের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর মজুমদার বলেন, পিতামাতা ও শিক্ষক উভয়ের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় বালকবালিকাদিগকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন পিতামাতা শিক্ষক ও বয়স্ক লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, প্রতিবেশীর ও অতিথির প্রতি আতিথেয়তা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করা, সমাজের কল্যাণপ্রদ কাজে আত্মনিয়োগ করা, সত্যাশ্রয়ী হওয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া—এই সকল গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করিতে হইলে এই গুণগুলির সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন।

ডক্টর মেনশিং-এর মতে—অন্ধভাবে কোন দেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করা নিরর্থক। যে ঐতিহ্য—যে মূল্য মৃত, তাহাকে বাঁচাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পুরাতন মূল্য (values)-গুলিকে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

টমলিনের মতে—বৃটিশ জাতি তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বৃটিশ জাতি এই ঐতিহ্যকে দৃঢ়তর করিতে চায়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রাচীন ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ সমাজে যে সকল অন্যায় ঢুকিয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: তাঁহার দেশে (অস্ট্রিয়াতে) প্রাচীন ভাবধারার সম্যক্ অনুশীলন হইতেছে না। এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, রাজনৈতিক সংস্থার সংহতি রক্ষার জন্য, দেশ-শাসনের জন্য যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করা উচিত জাতীয় সংস্কৃতি-সংরক্ষণের জন্য। দেশবাসীর মধ্যে যদি শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা সম্ভব হয়, তবেই অন্তর্বিরোধ দূর হয়, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা সম্ভব হয়।

সাংস্কৃতিক ঐক্য কেমন করিয়া স্থাপন করা সম্ভব? এই প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক লেড্ডি বলেন: সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া একটা ছাঁচে-ঢালা সংস্কৃতি কেহই কামনা করে না, কারণ তাহা অবাস্তব। সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন বলিতে আমরা বুঝিব—এমন কতকগুলি মূলসূত্রের স্বীকৃতি, যাহা দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কাউণ্ট কাইজারলিং 'national culture' (জাতীয় সংস্কৃতি) কথাটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন; কারণ পৃথিবীর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক এক জন শিল্পী যে দান করিয়া থাকেন, তাহার মূল্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর যতটা নির্ভর করে, ততটা তাঁহার জন্মভূমির উপর বা তাঁহার জাতিগত সত্তার উপর করে না। ভিয়েনার একজন চিকিৎসক আফ্রিকার চিকিৎসকবৃন্দের সঙ্গে যতখানি আন্তরিক ঐক্য অনুভব করিবেন, ভিয়েনার একজন শ্রমিকের সঙ্গে তিনি ততখানি মানসিক ঐক্য অনুভব করিবেন না।

টমলিন অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সঙ্গীত আজ সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছে, যদিও শ্বেতাঙ্গ-জাতি কৃষ্ণাঙ্গ-জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দিতে খুব তৎপর নয়। কাজেই দেখা যায় যে, যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়, ভাব বা হৃদয়ের দান সেখানে অনেক সময় কাজ করিতে পারে। তাই মিঃ টমলিন সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য—যুক্তিতর্ক, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির পরিবর্তে মানুষের হৃদয়ের আবেদন দ্বারা তাহার অন্তরের ভাবসম্পদকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আবেদন জানান।

সমাপ্তি

৯ই নভেম্বর তারিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার প্রতিনিধিদের মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন এবং পর্যবেক্ষকগণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে অনুরোধ জানান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আলোচনার ফলাফল কি, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য। পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আলোচনা করেন শ্রীনাসিফ (ভারতে লেবাননের রাষ্ট্রদূত), ডক্টর রিয়াদ-এল্-এট্র্ (যুক্ত আরব রিপাবলিকের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি), অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক।

পরিসমাপ্তির সময়ে প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন: সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগাইবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব্ কালচার এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ আরও প্রতিষ্ঠান দেশে বিদেশে গড়িয়া উঠুক।

মাতৃ-সঙ্গীত

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[কেদার-ইমন কল্যাণ—একতালা]

জগতধাত্রী সারদা দেবী কৃপা করি এলেন এ ধরায়।
ত্রিতাপ-তাপিত জীব উদ্ধারিতে অকাতরে সবে করুণা বিলায়॥
ত্যাগতিতিক্ষার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে।
আহুতি দিলেন বৈরাগ্য-অনলে স্বার্থসুখ (সব) অবহেলায়॥

জাগাতে ভারত এলেন ভারতী ঘুচালেন ভেদ বর্ণ ধর্ম জাতি।
এস সব মিলে হাতে পুষ্পদলে ভকতি-চন্দনে পূজিয়ে মায়॥
করুণা-আধার মা সবাকার হৃদয়-আসনে রেখো অনিবার।
লভিতে বিমলা শান্তি অপার নাহি যে জগতে অন্য উপায়॥

মাতৃ-আবির্ভাব

কথা ও সুর : স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আসিল আসিল—
আসিল আসিল এই যে জননী আসিল !
রূপের আভায় করুণা-বিভায় বিশ্বভুবন ভাসিল—
মা আসিল ॥
আদ্যা শকতি মহাবিদ্যা মহাকালিকা মহামায়া
মহাসরস্বতী 'সারদা' ঈশ্বরী শ্যামাসুতারূপে প্রকাশিল ॥
জগত-জননী প্রণত-পালিনী অনাথ-অশরণ-তারিণী
সর্বসিদ্ধি-দায়িনী জননী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী।
বিতরে অযাচিতে ভকতি মুকতি সাধু পাপী তাপী নাহি বিচার
সর্বদেবদেবী-বাঞ্ছিত পদে লাঞ্ছিত জনে তুলে নিল ॥

সিন্ধু-বিজয়—তেওরা

+ ২ ৩ | + ২ ৩
II সা রা মা রা মা পা ধা | মা পা া া া া া I
আ সি ল আ সি ল ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
সা রা মা রা মা পা া | র্সা র্সা র্সা ণা ণা পা া | রমা পধা পা মা গা া া I
আ সি ল আ সি ল ০ | এ ই যে জ ন নী ০ | আ ০ সি ল ০ ০ ০

+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩
I মা মা মা রা া সা সা | সা রা মা রা মা পা পা | র্সা া র্সা ণা া পা পা
রূ পে র আ ০ ভা য় | ক রু ণা বি ০ ভা য় | বি ০ শ্ব ভু ০ ব ন

| + ২ ৩
| রমা পধা পা মা জ্ঞা া া I
| ভা০ ০০ সি ল ০ ০ ০

| + ২ ৩
| Iরা মা জ্ঞা রাজ্ঞ রা সা া I |
| মা ০ আ সি০ ০ ল০ |

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩

Iপা রা́ রা́ রা́ সা́ া রা́ া | মা́ জ্ঞা́ মা́ রা́ া সা́ া | রা́ সা́ রা́সা́ ণা ধা পাধা

আ ০ দ্যা শ ক তি ০ | ম হা ০ বি ০ দ্যা ০ | ম হা ০ ০ কা ০ লিকা

| + ২ ৩

| না পা না সা́ া া া

| ম হা মা য়া ০ ০ ০

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩

পা সা́ না সা́ না সা́ রা́ | ধা সা́ ণা ধপাধপা মগামা | পা সা́ ণা ধপা ধা পাপা

ম হা স র ০ স্বতী | সা র দা ঈ০ ০ ০ শ্ব০ রী | শ্যা মা সু তা০ ০ রূপে

| + ২ ৩

| রা রা মজ্ঞা রা া সা াI

| প্র কা ০০ শি ০ ল ০

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ১ ৩

Iসন্‌াসন্‌াসা রসারসা রা া | রা জ্ঞা মা রা জ্ঞরা সাসা | সা রা মা রা মা মামা

জ০ গ০ ত জ০ ন০ নী ০ | প্র ণ ত পা ০ ০ লিনী | অ না থ অ শ র ণ

| + ২ ৩

| পা ধা মা প া া া

| তা ০ রি ণী ০ ০ ০

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩

মা ণা ণা ণা া ণা সা́ | ধা ধসা া ণা ধা ধা পা া | রা মা রা মা ধা পা া

স ০ র্ব সি ০ দ্ধি ০ | দা য়ি০ নী জ ন নী ০ | শ্রী রা ম কৃ ০ ষ্ণ ০

| + ২ ৩

| রা মা জ্ঞা রাজ্ঞরা সা াI

| স ০ ঙ্গি নী০০ ০ ০

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩

Iপা রা́ রা́ রা́ রা́সা́ সা́ সা́ | রা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ রা́ রা́ সা́ া | ণা রা́ সা́ ণা ধা পাধা

বি ত রে অ যা০ চি তে | ভ ক০ তি মু ক তি ০ | সা ধু পা পী ০ তাপী

| + ২ ৩

| না পা না সা́ া সা́ া

| না হি বি চা ০ র ০

\+ ২ ৩ | + ২ ৩ | + ২ ৩

পা সা́ না সা́ না সা́ রা́ | ধা সা́ ণা ধপাধপা মগামা | পা সা́ ণা ধপাধপা পাপা

স ০ র্ব দে ব দেবী | বা ০ ঞ্ছি ত০ ০ ০ প০দে | লা ০ ঞ্ছি ত০ ০০ জ নে

| + ২ ৩

| রা রা মজ্ঞা রসা রা সা াII

| তু লে ০ ০ নি০ ০ ল ০

সমালোচনা

স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা—৬১৩+২০; মূল্য ১২৲।

এই বৃহৎ পুস্তকটিতে সুসাহিত্যিক সাধক ও সুরসুধাকর দিলীপকুমার তাঁর জীবনের অনেক ছবি তুলে ধরেছেন। মনের বাতায়নে জীবনের যে আকাশ তাঁর শিল্প-মানসে রঙ ঢেলেছে তা তিনি সরস ও সুন্দর করেই আঁকতে পেরেছেন। এ ধরনের লেখা যে আত্মকেন্দ্রিক হবে তা স্বাভাবিক। তবে এই আত্মকেন্দ্রকে ঘিরে স্মৃতির বৃত্তটির পরিসর কতখানি, তার বিচারও অপ্রাসঙ্গিক নয়; এবং এ-বিচারে এর পরিসর কেবল যে সরস সাহিত্যকে ঘিরেই দাঁড়িয়েছে তা নয়, ইতিহাসের অনেক পাতাই এতে নূতন ক'রে সংযোজিত হয়েছে বলা যায়। যে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ঘুম ভেঙেছে, তাতে শিশুমনের নূতন-দেখার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের সাথে সাথে বিজ্ঞ মনের মিলন, তথা বিদগ্ধ সাহিত্যিকের পরশ লেখাটিকে পাঠকের কাছে কেবলমাত্র কৌতূহল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, সুধী-মনের অনেক বিচারেরও পথিকৃৎ হয়ে ফুটেছে। তাই এ বইটিতে যেমন বিশ্লেষণমূলক আলাপ-আলোচনার সমাবেশ আছে, তেমনি আছে লেখকের 'আধ্যাত্মিক অভীপ্সা'র ক্রমবিকাশের অলৌকিক আভাস। ভাগবত মহিমার অঙ্কুরোদ্গম কিভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়, তার সংবাদসংগ্রহে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরা এই পুস্তকটিতে অনেক নূতন কথা পাবেন। তা ছাড়া এতে যে-সব চরিত্র-চিত্রণ স্থান পেয়েছে, তাতে লেখকের চোখের রঙ মিশে থাকলেও তার মধ্যকার চিত্রণগুলির সঠিক মূল্যায়ন করতে অনেকেরই কষ্ট হবার কথা নয়। বরং এই নিজস্ব-রঙে রাঙানো চরিত্র-চিত্রণগুলির সরসতা অনেককেই আকৃষ্ট করবে।

সত্য-দৃষ্টির কথা তুললেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই পৃথিবীর যে-কোন বস্তুকে দুটি লোক একই ভাবে দেখতে পারে না। তাদের উভয়ের চোখের মাপ, উপাদান, দৃষ্টিশক্তি, মস্তিষ্ক-শক্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণ এক হলেই তা সম্ভব হ'ত। তা যখন নয়, তখন বৈজ্ঞানিক বিচারেও দুজনে একই বস্তু একই ভাবে দেখি—তা দাঁড়ায় না।

এ পৃথিবীতে একই মানুষের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পায়ের পাতার মাপ কখনও এক হয় না। তা যদি হ'ত, তা হ'লে পাদুকালয়ে পাদুকার মাপ দিতে গিয়ে কিংবা চশমা কিনতে গিয়ে লোকের অমন বিভ্রাট ঘ'টত না। তাই বলি, যথার্থ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি কায়িক শরীরে সম্ভব নয়। ওতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেও personal error-এর যোগ থাকবেই। তাই দিলীপকুমার তাঁর বইয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন—এতে কিছু ভুল হয়নি, বরং তা না হ'য়ে ব্রহ্মানুভূতির দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে সব বলতে পেরেছেন বললে কথাটা নির্জলা মিথ্যা হ'ত। ছবিতে আঁকা বাঘের দু-ইঞ্চি দূরে হরিণ রয়েছে—বাস্তবে তা কখনও সম্ভব নয়, অতএব তা ভুল—বাস্তব-বাদের এই দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা শিল্প ও সাহিত্যকে দেখেন, তাঁদের এ পথে না আসাই ভাল। সেই একই কারণে যোগীর আকাশ ও ভোগীর

আকাশ কেন এক হবে না? এই যুক্তির উত্তর দেওয়াও শক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের লক্ষ্য করেই তাই বলেছিলেন—যে শুঁড়ি-পাড়ার ভেতর দিয়েই কখন গেল না, সে মদের কথা আবার বিচার করবে কি! রসিক না হ'লে তাই রসের বিচার অসম্ভব। আর এই রসের বিচারে আমাদের বইটি পড়তে ভাল লেগেছে বলতে বাধা নেই। তবে কয়েক জায়গায় তাঁর সঙ্গে অনেকের মতের মিল নাও হ'তে পারে। তবে সব জড়িয়ে, মন্দটার চেয়ে ভালোটার সমাবেশ অনেক বেশী বলেই আমরা রসিক পাঠককে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। নিছক গল্প শোনার মন নিয়েও বইটি পড়তে বসলে শেষ না ক'রে ওঠা শক্ত হবে বলেই বিশ্বাস। তবুও 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' কথাটা তো আছেই। বইটির পরবর্তী 'পর্ব'গুলি পড়বার ইচ্ছা নিয়েই এ-লেখা শেষ করছি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েছে। —মহানন্দ

ছাত্রজীবন—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। প্রকাশক: শুভশ্রী; ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯। পৃষ্ঠা ১৩৬; মূল্য ২৲। [ভূমিকায় লিখিত: 'The popular price of the book has been possible through a subvention received from the Government.]

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও সুপরিচিত শিক্ষা-ব্রতীর লেখনীপ্রসূত 'ছাত্রজীবন' সম্বন্ধে পুস্তক-খানিতে ছাত্রজীনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে—যথা পিতামাতা ও শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ, বিভিন্ন ভাষা- ও বিষয়-শিক্ষার সমস্যা, সর্বোপরি স্বাবলম্বন, মিতব্যয়িতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা, বেশভূষা, খাদ্য, ক্রীড়া কিছুই বাদ যায় নাই। সর্বশেষে সৎসঙ্গ, স্বদেশপ্রেম, চরিত্রগঠন ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্যও আলোচিত হইয়াছে।

উপক্রমণিকায় লেখক লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধ-গুলি বিশেষত স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের উদ্দেশে লিখিত।' কিন্তু পুস্তক-নির্বাচন, সংস্কৃত ও বাংলার ব্যাকরণের তুলনামূলক সমালোচনা প্রভৃতি আরও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেগুলি শিক্ষকদেরই আগে পড়িতে হইবে।

লেখা বহুস্থলে প্রবন্ধাকার ও উপদেশমূলক হইয়াছে; ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করিতে হইলে উদাহরণমূলক গল্পের প্রয়োজন। পুস্তকখানিতে তাহার অভাব অনুভূত হইল।

Sister Nivedita—Pravrajika Atmaprana. Published by Pravrajika Shraddhaprana, Secretary, Sister Nivedita Girls' School, 5 Nivedita Lane, Calcutta 3. Pp. 297; Price Rs. 7·50.

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা নিবেদিতা নারীজাতির উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিমোজ্জ্বল জীবন যুগ যুগ ধরিয়া সেবাব্রতীদের উদ্বুদ্ধ করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার জীবন বিস্তৃতভাবে আলোচিত। নিবেদিতা-জীবনের গতি ও পরিণতি-বিষয়ক কয়েকটি পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হইল:

Early life, Seeker of Truth, Swami Vivekananda the Master, The Ramakrishna Math & Mission, Wanderings in North India, Amarnath & Kshir-Bhavani, Kali and Kali-worship, Plunge into Action, New Thoughts, The Holy Land of Buddha, Political stirrings, Nation and nationality, Nivedita Girls' School, With the Holy Mother, Life Literature and Art, Passing into Eternity.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা পুস্তকখানিকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে। মোট ৪৭টি অধ্যায়ে সুলিখিত পুস্তকখানি ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য ইংরেজী জীবনীরূপে সমাদৃত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-প্রণীত বাংলা জীবনী পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছে।

বৈদিকী—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: বাণীতীর্থ, ২৬-বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৭০; মূল্য ২৲।

ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা ঋগ্‌বেদের সূক্ত অবলম্বনে অভিব্যক্ত। 'বৈদিকী' গ্রন্থে ঋগ্‌বেদ হইতে যে সূক্তগুলির বাংলা কবিতানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু-সূক্ত, রাত্রি-সূক্ত, উষা-সূক্ত, বরুণ-সূক্ত, অগ্নি-সূক্ত, পর্জন্য-সূক্ত, সূর্য-সূক্ত, ইন্দ্র-সূক্ত, মিত্র-সূক্ত, সোম-সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত, দেবী-সূক্ত ও সৃষ্টি-সূক্ত।

অনুবাদ সহজ, ভাষা আধুনিক। দুরূহ শব্দ সাবধানতা-সহকারে বর্জন করা হইয়াছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুন্দর। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে লেখক ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিলে ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারতীয় চিন্তাধারা ও উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হইবে।

বাংলায় উপনিষৎ—(প্রথম খণ্ড): অনুবাদক ও সম্পাদক—শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু। প্রকাশক: শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু, পি. ৩৭৮ কেয়াতলা লেন, কলিকাতা। পরিবেশক: সায়ান্স বুক এজেন্সি, ১৩৩-বি লেক টেরেস, কলিকাতা ২৯; পৃষ্ঠা ৩৭০ + ১৮৶০; মূল্য মূল্য ছয় টাকা।

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার। উপনিষদের এমন কোন অনুবাদ নাই, যাহা পাঠে মূল সংস্কৃতের সহায়তা ব্যতীত উপনিষদের ভাবরাশির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। এই অভাব দূরীকরণের জন্যই লেখকের 'বাংলায় উপনিষৎ' লিখিবার প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষিতকি, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর এই দশখানি উপনিষদের সরল বাংলা অনুবাদ এবং আচার্য শঙ্কর রামানুজ ও মধ্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের অভিমত দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: যাঁরা বাংলাভাষাভিজ্ঞ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মূল উপনিষৎপাঠে অসমর্থ বা শঙ্কান্বিত, তাঁদের পক্ষে 'বাংলায় উপনিষৎ' অত্যন্ত উপযোগী হবে। এতে তাঁরাও উপনিষদের আলোক দেখতে পাবেন এবং জীবনে কিছু প্রসাদ ও প্রশান্তি লাভ করবেন।

আমাদের সহিত পাঠকবর্গও ইহা সমর্থন করিবেন, আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৬শে নভেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

নূতন নির্মাণ-কার্য

সারগাছি আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালয়, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে কর্মী-ভবন (block for Auxiliary Staff-Quarters) এবং পরিষেবিকা-ভবনের বর্ধিত অংশ, কামারপুকুর আশ্রমে গ্রন্থাগার-ভবন, নরেন্দ্রপুরে লাইব্রেরি ও স্কুলের ছেলেদের জন্য ৩টি ছাত্রাবাস, মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোমে শিল্পবিদ্যালয়ের ভবন (Technical Institute Building) এবং বেলুড় সারদাপীঠে জনশিক্ষা-মন্দিরের হল উদ্বোধন করা হয়। রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে একটি নূতন ওয়ার্ডের উদ্বোধন এবং রোগী ও কর্মীদিগের জন্য নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬০-৬১ খৃঃ হইতে বেলুড় বিদ্যামন্দির ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৩ খৃঃ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইতেছে। আসানসোলে বহুমুখী বিদ্যালয়ের নূতন ব্লক এবং রহড়া বালকাশ্রমে দুইটি বিদ্যার্থী-ভবন উদ্বোধন করা হয়। নূতন স্থানে বৃন্দাবন সেবাশ্রম-হাসপাতালের নির্মাণ-কার্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

গভর্নিং বডির নূতন সদস্য

স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী ভাস্বরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ৩০শে মার্চ, ১৯৬১ বেলুড় মঠের নূতন ট্রাস্টী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মিশনের গভর্নিং বডির সদস্যও হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

১৯৬০ জানুআরি হইতে ১৯৬১ মার্চ, এই সময়ের মধ্যে মিশনের ৫ জন সাধু-সদস্য ও ৪ জন ভক্ত-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ষশেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩২ (সাধু ৩২১, ভক্ত ৩১১)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬১ মার্চ মাসে মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৩ ; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২ ; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া ; বাকী ৫৯টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে : পশ্চিমবঙ্গে ২৪, মাদ্রাজে ৯, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িশ্যায় ২ ; দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া। [মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফঃ ১৯৬০ জুলাই মাসে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক নরনারী নিরাশ্রয় হইয়া আসাম হইতে নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। আশ্রয়প্রার্থীদের অনেককে জলপাইগুড়ি ক্যাম্পে রাখা হয়। মিশন হইতে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা, সলিসাবাড়ি, আলিপুর-দুয়ার জংশন ও আলিপুরদুয়ার শহরে সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়। শিলং, নওগাঁ, গৌহাটি এবং দোমোহানিতেও সেবাকেন্দ্র খুলিতে হয়। কলিকাতার পৌরপ্রধানের সাহায্য-ভাণ্ডারের (Mayor's Relief-Fund) ১০,০০০ টাকা সমেত প্রায় ২৬,০০০ টাকা আসাম-রিলিফে ব্যয় করা হয়।

যখন আসামে রিলিফ চলিতেছিল, তখনই মিশনকে ওড়িষ্যায় রিলিফ-কেন্দ্র খুলিতে হয়। বন্যার ফলে কটক ও বালেশ্বর জেলা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুরে ৩রা সেপ্টেম্বর মিশনের সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে সরকার চাল ও অন্য জিনিসপত্র সাহায্য দেন। মিশন, হইতে ধুতি ও শাড়ি, ছেলেদের পোশাক বিস্কুট ও বার্লি, চিনি, পশু-খাদ্য ও নগদ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কটক জেলায় জেনাপুর হইতে গুঁড়া দুধ হইতে দুধ তৈয়ার করিয়া খাওয়ানো হয়। ওড়িষ্যায় বন্যার্ত-সাহায্যে মোট ১৪,০৮২ টাকা ব্যয় করা হয়, ওড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর তহবিলের ৩,০০০ টাকা ইহার অন্তর্গত।

মে মাসে কাঁথি আশ্রম হইতে এবং অক্টোবর মাসে লখনৌ আশ্রম হইতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়। সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতেই পাঠানো হয়।

সুরাটে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন ও ভাঙ্গীদের জন্য কলোনি-নির্মাণের কার্য আরম্ভ হয় ১৯৫৯ খৃঃ এবং '৬০ খৃঃ মে মাসে শেষ হয়। কলোনি-নির্মাণের কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,৫৭,৮২৭ টাকা।

(২) চিকিৎসাঃ ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

১৯৬০ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৮টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ৮৮৮; ২৩,৯৯৪ রোগী ভরতি করা হয়। ৫২টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে ৩০,২৭,৮৬৮ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দিল্লী এবং রাঁচিতে কেবলমাত্র টি.বি. চিকিৎসা হয়; সালেম ও বোম্বাই-এ বহির্বিভাগের সহিত যথাক্রমে ৬টি ও ১২টি শয্যা আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

(৩) শিক্ষাঃ মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা
কলেজ	মাদ্রাজ	
" (আবাসিক)	বেলুড়, নরেন্দ্রপুর	১,৬৩২
বি. টি. কলেজ	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৬৩
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	৩	১২৯
শারীর শিক্ষা "	কোয়েম্বাতুর	৬৯

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ	কোয়েম্বাতুর	২০৭	
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয়	„	৫১	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	২৯৭	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৪	১,৩৪৫	
জুনিয়র টেকনি-স্কুল	৭	৪৬১	৩২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রম সহ)	৭২	৫,৮৮৯	৫১৬
চতুষ্পাঠী	২	২৪	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১০	৩,৮৭৪	৮০৮
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২	৭৭৭	
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪	৯,৭৩৫	৪,২৮৫
সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়	৮	৮৫৯	৯৩০
জুনিয়র „ „	২০	২,৩০১	৮৪১
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়	১০২	১৩,১১০	৮,৪৪২

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিসেবিকা-শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩৪ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৪০,৯২১ ছাত্র এবং ১৬,২৮৩ ছাত্রী শিক্ষা পাইয়াছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর বেলুড়, সরিসা, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরাপুঞ্জি, কলিকাতা, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই, কালিকট এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাস, স্কুল বা কলেজ মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কার্যের নিদর্শন।

(৪) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য:

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত:	৯৩	১৬২	
সাময়িক:	৪৪৭	১১৫	২

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪,৯০১ টাকা। ইহা ছাড়া ৮০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উদ্বাস্তুদিগকে দেওয়া হয়। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৫,০৪৭৲।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি: মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ ভাষণ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে সকল কর্মই উপাসনা—এই আদর্শ যথাযথ রূপায়িত হয়, তাহার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের জীবনালোকে কাজ করিতে বলেন।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৭শে মে হইতে ১১ই অগস্ট পর্যন্ত রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম, চূড়ামন, খামরুয়া, তপন, গঙ্গারামপুর, পতিরাম, কুড়াহা, বালুরঘাট, কড়দহ, মারনায়, চাঁচোল, বগচড়া, মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ শহর, বুলবুলচণ্ডী, আইহো, মিলকী, শোভা-নগর, মানিকচক, ধরমপুর, কাটিহার রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং কাটিহার রলারাম ইন্স্টিটিউশনে 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের অবদান', 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'নারীর আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী', 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাত্রজীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে মোট ৪৭টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৪২টি আলোকচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৬ই নভেম্বর বৈকাল ৫-১৫ মিনিটের সময় স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি রক্তচাপ-বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন, গত ১লা অগস্ট মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে তিনি শয্যাগত হন।

১৯২৮ খৃঃ নাগপুরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। ১৯৩১ খৃঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন, তাঁহারই নিকট হইতে তিনি মন্ত্রদীক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বে তিনি ব্যবহারজীবী (pleader) ছিলেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুর আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ছিল। ঐ অঞ্চলে তিনি 'ডাক্তার মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বশিষ্ঠানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৪শে নভেম্বর বেলা ৪টার সময় স্বামী বশিষ্ঠানন্দ (সমর মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৭ই নভেম্বর সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে সেবাশ্রমে ভরতি করা হয়, ২৩শে নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়।

১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খৃঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। কিছুকাল তিনি এলাহাবাদ আশ্রমে ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ সরকার

প্রখ্যাত সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার কিছুকাল রোগভোগের পর গত ২৯শে নভেম্বর ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং এই পত্রিকার সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের। তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, মধুর ব্যবহার, শান্ত ও সরল প্রকৃতি সকলকেই মুগ্ধ করিত। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন সেবা- ও প্রচার-কার্যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার বেদান্ত-কেন্দ্রগুলিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'উদ্বোধনে' সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। যতীন্দ্রবাবু অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভারতে শিক্ষার হার

১৯৫১ খৃঃ ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল ১৬·৬% ১৯৬১ খৃঃ উহা ২৩·৭% হইয়াছে। লিখিতে পড়িতে সমর্থ লোকের মোট সংখ্যা ১০৩,২১৫,৭৮০। ১০ বৎসরে দিল্লীর শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাইয়া সর্বাধিক হইয়াছে। ১৯৫১ খৃঃ কেরালার শিক্ষিতের হার ছিল সর্বাধিক (৪০·৭)।

রাজ্যাহসাবে শিক্ষিতের হার

রাজ্য	মোট শিক্ষিত	শিক্ষিতের হার
অন্ধ্র প্রদেশ	৭,৪৮৮,৬১৮	২০·৮
আসাম	৩,০৫৫,৫৭৬	২৫·৮
বিহার	৮,৪৭০,৪২৬	১৮·২
গুজরাট	৬,২৪৬,৭৮৮	৩০·৩
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৮১,৭৫৩	১০·৭
কেরালা	৭,৮০০,২৮৪	৪৬·২
মধ্য প্রদেশ	৫,৪৭২,২৮৬	১৬·৯
মাদ্রাজ	১০,১৬৮,০৯৫	,৩০·২
মহারাষ্ট্র	১১,৭৩১,২৭২	২৯·৭
মহীশূর	৫,৯৫৫,৯৫৫	২৫ ৩
ওড়িষ্যা	৩,৭৭৯,৫৬৫	২৭·৫
পাঞ্জাব	৪,৮১৪,৯১১	২৩·৭
রাজস্থান	২,৯৫২,৫৩৩	১৪·৭
উত্তরপ্রদেশ	১২,৮৯১,০৯৯	১৭·৫
পশ্চিম বঙ্গ	১০,১৮০,৬৮৫	২৯·১
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২১,৩১৪	৩৩·৬
দিল্লী	১,৩৪৯,৪১৪	৫১
হিমাচলপ্রদেশ	১৯৭,৫৩৩	১৪·৬
ত্রিপুরা	২৫৩,০৩৩	২২·২

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১০৯তম শুভ জন্মতিথি আগামী ১৪ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

